

ପ୍ରାଣଗନ୍ଧା

ଶ୍ରୀଅବିନାଶ ମାହା

ସ୍ତ

ନ-କ-ର-ଅ-କା-ନ- । କ-ନ-କା-ତା-୬

প্রথম সংস্করণ : জন্মাষ্টমী, ১৩৬৩

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে
গৌর মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩ বিনোদবিহারী সাহা
স্মরণে

ডানা দেয় নি বিধাতা—
তোমাব গান দিয়েছে আমাব স্বপ্নে
ঝড়ো আকাশে উড়ো প্রাণেব পাগলামি

॥ লেখকের অন্ত্যস্ত বই ॥
॥ নির্বাচিত গল্প ॥
॥ নবজন্ম ॥
॥ ঢাকাই গল্প, জীবন দেবতা, অন্তরাল ॥
॥ ধুম মজিল, রক্ত গোলাপ, তরঙ্গ ॥
॥ ছোটদের গল্পগুচ্ছ, বসন্ত রাগ ॥
॥ বসন্ত বিদায়, পূবের আকাশ ॥
॥ নবীন যাত্রী ॥
॥ জন্ম ॥

জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি। দিন দিন ভয়াল হয়ে উঠছে পদ্মা। এক পারে দাঁড়ালে আব-এক পার দেখা যায় না। যেন আকাশ গন্ধাই স্বর্গেব সিঁড়ি বেয়ে দিগন্ত নেমে আসছে।

দীপ্ত অস্তরে কেঁপে ওঠে। মাঠ ভর্তি ধান পাট। গোটা বছরের মুখের গ্রাস ঐ শস্য ভাগ্য। বৃকের রক্ত আব হাতের শেষ সম্বল পণ কবে সমস্ত ঋতু চাষ আবাদ কবেছে। মহাজনের কাছে ঋণও হয়েছে কিছ। চড়া সুদ। একমাত্র ভবসা ঐ ধান আর পাট। মা লক্ষ্মীব রূপায় ফলন বেশ ভালই হয়েছে। সামনের আর দুটো মাস ওত্বালেই ভর্তি হবে লক্ষ্মী-গোলা, হাঁড়ি—কলসী—জাল। লক্ষ্মী-গোলাব ধানে পূজো হবে লক্ষ্মীদেবীর। আত্মীয়স্বজন আসবে। যাত্রাগান, কবিগানে মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ি। শুরু হবে বছরের আনন্দ উৎসব। তারপর ধর্মমাস কাতিক মাসে আবার অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, মণ মণ চালের মহোৎসব। নিমন্ত্রণ যাবে আশ পাশের সমস্ত গায়ে। দলে দলে আসবেন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা। প্রহরে প্রহরে গান করবেন, দু'বাহ লে নাচবেন, পাতজুড়ে পরিবেশিত হবে সুগন্ধি অন্নের মহাপ্রসাদ।...মোড়ল দীপ্ত অস্তায় বছরের মতো এবারও স্বপ্ন দেখে। বেশ একটু রং চড়িয়েই দেখে। অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপ্পান্ন প্রহর নাম-যজ্ঞ হবে এবার। ওর ঠাকুরদার আমলে একবার হয়েছিল। দশ গায়ের লোক এখনো তার স্মৃতি করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এবারও তাই হবে...

আষাঢ়ে পদ্মা আরও ফুলে ওঠে। নাগিনীর জিভের মতোই লক লক করছে অনন্ত জলরাশি। দিন রাত ফৌস-ফৌসানীর বিরাম নেই। বছর কয়েক ওপারের চরই ভাঙছিল। কিন্তু এবারের দৃষ্টি যেন কানীপুরের দিকেই। জল যতো বাড়ছে চাপ চাপ জমি হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তীর থেকে। যেন হাঁ করে ব্যাঙ গিলছে নাগিনী।

নদীর উচ্ছলতায় ভাবনা বেড়ে যায় দীপ্তর। পদ্মার পারের চাষী মাজই জানে, রান্ধুসীর ভাঙন কি সর্বনেশে। রাতারাতি গ্রামকে গ্রাম সাক। ছোটবেলায় একবার ভীষণ ঝাড়া গেছে ওর। সেও ছিল আষাঢ় মাস। ঝুট-ঝুটে

অমাবস্তার অন্ধকার। পদ্মা ওদের বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে। ঘরে গবম বলে সকলেই ওরা নৌকোর ওপর শুয়েছে। শ্রোতের তোড়ে মাদল বাজছে পদ্মার বুকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে যে যার মতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হঠাৎ সূতের স্বপ্নই দেখতে থাকে। হঠাৎ বিকট শব্দে দুপুর রাতে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মাছ সব একসঙ্গে আর্তনাদে কেটে পড়ছে। গম্ গম্ শব্দ উঠছে মাটির ভেতর থেকে। ভূমিকম্পই যেন হচ্ছে পাতালে। ঘরদোর, গাছপালা, বন্ বন্ মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে। মাটি ফেটে চৌচিব। মাইল খানেক জুড়ে বিবাট এক চাপ তলিয়ে যাচ্ছে, রূপকথার গল্পই যেন। মর্তের সকল মাছ একযোগে দল বেঁবে যেন পাতালে প্রবেশ করছে...

জীবনের মায়ায় সব ফেলে যে যে দিকে পারছে পালাচ্ছে। হাস, মুবগী, গরু, বাছুর উধ্বাসে দৌড়াচ্ছে। ভয়ে খর খর করে কাঁপতে থাকে ওরা নৌকোর ওপর। দীহুর বাবা বিপিন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে যায়। দাত রজনীনাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, খপ করে চেপে ধরে জোয়ান ছেলের হাত। ওতো মাটি নয়, ফুটো বলসী—এক্ষুনি তলিয়ে যাবে। জমি-জিরাত, গরু বাছুর, তৈজস সব ষাক। জীবনে বাঁচলে সব হবে আবার। তাই বলে জেনে শুনে ধনের সঙ্গে প্রাণ দেবে নাকি মাছ! বজনীনাথ নিজেই উত্তোঙ্গ হয়ে নৌকোর কাছি খোলে। এক্ষুনি গিয়ে মাঝ নদীতে পৌঁছোনো চাই। নয়তো আবর্তের টানে নৌকো-স্বচ্ছ গিলে ফেলবে রাঙ্গুসী। বাপ-বেটায় তাড়াতাড়ি হালে চাড় দিয়ে এগুতে থাকে।

বিপিন স্বর্গে গিয়েছে। মহাজনের ঋণ ছাড়া উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগ্যে আর কিছুই জ্বোটেন দীহুর। চাষীর বরাত্রে এ তো বিধির লিখন। তবু উদয়ান্ত খেটেই চলে দীহুর। পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়। ঋণ শোধ হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই আবার মা লক্ষ্মীর আসন পাকা হয়। চাষের জাম, টিনের দর, গরু, বাছুর—নিয়ে সোনার সংসার।...সেই সংসারে আবার ইদানীং ফাটল দেখা দিয়েছে। পদ্মার বুকে আবার সেই দুর্লক্ষণ ধানিয়ে আসছে। রাঙ্গুসী মার-মুখো হয়ে উঠছে দিন দিন। গেরয়া রঙের জলের ওপর এবারও কালচে ছোপ পড়েছে। ক সেই একই-ই-রকম তর্জন গর্জন। ধানের ক্ষেতে শীঘ্র দেখা দিয়েছে। কচি সবুজ শীঘ্র। টিপলে সাদা দুধ বেরোয়। মাস খানেক পরে পাটও ধরে উঠবে। কিন্তু পদ্মা যে এরই ভেতর কণা তুলে ধেয়ে আসছে।

মোড়ল দীহুর বাড়িতে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়। সকলে মিলে চাঁদা তুলে গন্ধাদেবীর পূজা আরম্ভ করে। জোড়া পাঠা, কচি ডাব, দুধ, ঘি, চিনি ষার ষেমন

সাধা গলবন্ধ হয়ে মানত কবে জুড় দেবতার উদ্দেশ্যে। পুৰোহিতরা অহোরাত্র মা গঙ্গার স্তোত্র পাঠে তন্ময়। প্রতি সন্ধ্যায় ঘাটে ঘাটে দ্বীপ জেলে আরতি শুরু কবে পুরনারীবা। স্বর্গন্ধি ধূপেব ধোঁয়ায় মেঘ-ঘন আকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মন্দিবে মস্জিদে চলে সমবেত প্রার্থনা। না, কিছুতেই যেন প্রসন্ন নন বিরিক্তি তনয়া। কণা তুলে তুলে দিন দিনই গর্জে উঠছে ভয়ংকরী।

অমাবস্ত্যাব গাঢ় অন্ধকার। সাবান্দিন ইলশেগুড়ি চলেছে। সন্ধ্যা থেকে পদ্মাব বৃক থমথমে গোকরা বাস ছেড়ে নীলাশ্ববী পবে নাগিনী। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে নীলাঞ্চল। কাশীপুবেব আবালবৃদ্ধ ভয়ে তটস্থ। সকলে মিলে বলদূব পর্যাস্ত ঘুবে ফিবে দেখতে থাকে, কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা। না, সে বকম কোথাও কিছু লক্ষ্য হয় না। তবু যথা সাধা সতর্ক থাকে সবলে। বাসন কোসন যে যেমন পাবে সরিয়ে রাখে। যাব নৌকো আছে সে নৌকোব ওপবেই ঘুমোয়। তপূব বাত পর্যাস্ত সকলে খোল বাজিয়ে কীতন কবে কবিমেব বাড়ি 'দয়াল চানেব' আসবেও আবাব কেউ কেউ জমায়েত হয়।

আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই। থম থম কবছে চাবদিকেব অন্ধকার। অন্ন অন্ন বৃষ্টিব মধ্যে থেকে থেকে বিড়্যাং চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে কোথাও কোথাও। বাত একটা, হঠাৎ গাছেব চূড়া নড়ে ওঠে। শোঁ শোঁ মাই মাই শব্দে প্রবল বেগে শুরু হয় তুফান বৃষ্টি। ঘুমিয়ে ছিল মানুষ, অতর্কিতে লাফিয়ে ওঠে। শিশুবা মায়ের বৃকে মুখ খুবড়ে চেঁচাতে থাকে। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, মানুষ একযোগে আতর্নাদে ফেটে পড়ে। কড়াং কড়াং—বান্ বান্—কড়্ কড়্ কড়্ শব্দে ঢেউ টিনেব চালগুলো উদ্ধাব মতো ছুটতে থাকে। ভয়ে হাত পা সিটিয়ে গেছে দীন্নুব। স্ত্রী কুন্নুম মেঝেব ওপব দাড়িয়ে ঠক্ ঠক্ কবে কাঁপছে। ঘরে চাল নেই। সূচেব মতোই এসে বিঁচ্ছে বৃষ্টিব ফলক। সহসা করিমেব-চীংকাব শোনা যায়, ভাইজান, সাবধান। পোলাপানগ বৃকেব মংগ চাইপা ধব। ছাও ছুটছে।

গলা পঞ্চমে চড়িয়ে দীন্নু উত্তব দেয়, আব বঙ্গ। নাই ভাইসাব। সব গেল, সব গেল...

ভয় নাই, আমরা আইলাম। ভয় নাই...স্ত্রী, পুত্রকন্যাসহ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে থাকে করিম। ওর বাড়ি ঘরদোর সব সাফ। প্রতিবেশী সকলেব অবস্থাই তাই। সকলেই ছুটতে থাকে দীন্নুর বাড়ির দিকে। একমাত্র বৈরাগী

বাড়িই যা টিনকাঠ দিয়ে পাকাপাকিভাবে তৈরী। আর তো সব খড়ের চাল ঝাঁপের বেড়া। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতোই উড়ে গেছে। আশ্রয়হীন মানুষ আশ্রয়ের আশায় দলে দলে ছুটেতে থাকে। কিন্তু একি! খড়ের ঘরের চেয়ে ধে টিনের ঘর আরো ভয়াল হয়ে উঠেছে। টিন ছুটেছে না তো যেন এক একটা বর্শা ফলকই ছুটে চলেছে। কোনগতিকে এক-আপটা উড়ে এসে গায়ে গড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে দু' আধখানা। এখন তাহলে যায় কোথায় ওরা? এত জলই বা আসছে কোথেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো ওদেরই ডিঙ্গি। ঘাটে বাঁধা ছিল। তবে কি...

'বান ডাকচে, বান ডাকচে,' নদীর পারের ভয়াত মানুষের চিংকার একটানা ভেসে আসতে থাকে।

সকলে মিলে একযোগে আর্তনাদ করে ওঠে। বুড়োদের মধ্যে একদল কাঁদতে কাঁদতে এসে করিমের পা চেপে ধরে, ফকির শব্দ, আমাগ বাঁচান। আপনার সিদ্ধাইড়া একবার ছাড়েন। আমাগ বাঁচান...

করিম নিরুপায়। ভূত প্রেত খেলাবার মন্ত্র জানা থাকলেও উত্তাল পন্নীর সঙ্গে যুঝবার মতো ফুসমন্ত্র ওর জানা নেই। কিন্তু কে শুনছে আর সে-কথা। কবিম দমে না। গুরুগম্ভীরভাবেই সকলকে সান্ত্বনা দেয়, ভয় নাই। দয়াল চানরে ডাক হগলে। দীন-দয়ালই রক্ষা করব।

হতবুদ্ধি মানুষ কিছুটা বল পায় করিমের সান্ত্বনায়। করিমের সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গিগুলোকে শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে থাকে। পা দিয়ে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, নারী, শিশু এক এক করে, সকলকেই মাচার ওপর তুলতে থাকে। পাকা শালকাঠের ঝুটির ওপর বিরাট মাচা দীঘুর। ভিটি থেকে পাঁচ ছ' হাত ঊঁচু। অসময়ে ধান, পাট, মুগ-মটর তোলা থাকে। বিপদে পড়ে মানুষ আজ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। কোমরে গামছা বেঁধে দীঘুও কাজে যোগ দেয়। মরবে তো নিশ্চয়ই তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। মাথার ওপরের চাল নেই। তীরের মতোই এসে বিঁধছে ঝুটির ফলস। হাত, পা ভিজে জবজবে। মায়েরা পারে তো পেটের ভেতরে সৈধিয়ে রাখে বাচ্চা-কাচ্চাদের। কাতর কণ্ঠে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে থাকে কেউ কেউ। জয় হরি, জয় মধুসূদন, খোদা, দীন দয়াল...

ঘণ্টা খানেক ধকল যাবার পর ঝড়ের বেগ কমে আসে। ঝুটি এখন এক রকম নেই বললেই হয়। সামান্য গুড়ি গুড়ি পড়ছে। কিন্তু কালীপুরের মানুষ নিশ্চিন্ত

হতে পারে না। এখনো হাঁটু তলিয়ে যাবে জল উঠোনে! করিমের নির্দেশেই আমগাছের উঁচু ডালে নতুন করে মাচা বাঁধা শুরু হয়। কেউ কেউ নিজ নিজ নর দোরের খোঁজেও বার হয়। বাচ্চা-কাচ্চাদের চিংকার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সকলে মায়ের স্তনে মুখ গুজে নির্ভয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে। ডিঙ্গি গুলোও গাছের গুড়ির সঙ্গে ঠিকই বাঁধা আছে। অপূরণীয় ক্ষতি হলেও প্রাণে বোধ হয় সকলেই বেঁচে গেলো এ যাত্রা। নিশ্চিত না হলেও কতকটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে গায়ের মানুষ।...

মুখের কথা মুখেই থাকে। মাচা বেঁধে নেমে আসারও ফুরসত হয় না অনেকের। আবার তোড়ে আরম্ভ হয় ঝড় বৃষ্টি। শাখায় শাখায় ঠোঁকাঠুকি চলে। মূল থেকে খসে পড়ে বোধ হয় কোনটা। দেখতে দেখতে পদ্মা হুস্বাব ছেড়ে এসে বাড়ির উঠোনে পড়ে। হাঁটু জল, কোমর জল, না না, গোটা মানুষই তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। ভিটে মাটি জলে টেটুস্বর। মাচার ওপরের জীব-জন্তু মানুষ আবার আতনাদ করে ওঠে। জোয়ান মানুষবা হাতের কাছে যাকে পায় সেলে তুলে দেয় গাছের ওপব। ছাগল, ভেড়া, গরু, বাছুরের দড়ি খলে দিয়ে যে যেভাবে পারে গাছে এসে ওঠে। জল গাছের গুড়ি ছাপিয়ে মূল শাখা ছোঁয় ছোঁয়। বৃকের ধুক-পুকানী বেড়ে যায় দীঘল। করিমকে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে দেখা যায়। কুসুম চোখ মেলে চাইতে পারে না। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ওপরের ডাল থেকে কে যেন ছিটকে পড়ে গেলো জলের ওপর। যে যার আপনজনের নাম ধরে চিংকার করতে থাকে। কেউ সাড়া পায়, কেউ পায় না। আশঙ্কায় ডুকরে ওঠে কেউ কেউ। পাষাণী পদ্মা সমুদ্রের চেয়েও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

ঝড় একটানা বয়ে চলেছে। খুব কাছেই একটা বাজ পড়ে। মুহুমূহুঃ বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। সহসা চোখ মেলে চাইতেই আলোর বলসানীতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দীঘল, মগ্ন গাঙ্গে ওটা কি ভাইসা যায় গ নিশার মা। ধান পাট বৃজি আর একটাও ক্ষ্যাতে রইল না। ঐ ছাহ, ধবলী, আমাগ ধবলী ভ্যা ভ্যা করতে করতে আমাগ ছাইড়া চলল। পাচ সের দুধ দিত ধবলী। হায় হায়, কি খাইয়া গোলাপানে বাঁচব! তোমরা আমারে ছাইড়া ছাও—ছাইড়া ছাও—, আমিও ধবলীর লগে যাই, ছাইড়া ছাও...বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জলের ওপর লাফিয়ে পড়তে যায় দীঘল।

একা কুসুম, ছেলে সামলাবে না জোয়ান মরকে। এক হাতে নিশিকে

বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আর-এক হাতে দীহুর কোমর জড়িয়ে ধরে! আকুল হয়ে ইষ্টদেবকে ডাকতে থাকে, জয় হরি, জয় ছিমদুন্দন, রক্ষা কর—রক্ষা কর আমাগ। সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দিমু ঠাকুর, বক্ষা কর...

কুসুমের পক্ষে একা আর সম্ভবপব হয় না দীহুকে ধরে রাখা। চেঁচামেচি শুনে করিম চোখ মেলে তাকায়। তাড়াতাড়ি পেছনের ডাল থেকে লাফিয়ে এসে থপ্ করে চেপে ধরে দীহুর হাত। বিরাক্তর সঙ্গেই ধমক দেয়, কর কি বৈরাগীর পো! ক্ষেপলা নাকি? পোলাপানের দিগে চাও...

দীহু শাস্ত হয়। করিম আবার চোখ বোজে।

সমস্ত রাত ধকল যাবার পর শ্রান্ত পদ্মা শাস্ত হয়। সর্বনাশী এবার যেন স্নেহতুরা অভয়্যার রূপ ধবে কুলকুল-নাদে বয়ে চলেছে। সম্ভানের দুঃখে ডুকবে ডুকবে কাঁদছে যেন। স্থূথ কিরণে দেখা যায়, বাড়ি, ঘরদোর সব সাফ। ক্ষেতখামারের চিহ্ন পথস্ত নেই কোথাও। প্রাণনাশও হয়েছে অগণিত। দীহুর বুকের ভেতবটা আছড়াতে থাকে। সমস্ত স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে যায়। আকুল হয়েই ডাকতে থাকে, কাঙালের ঠাকুর, বড় সাদ আঁচল পবাণ ভইরা তোমারে ডাকুম, নামগান করুম। চরণে কি অপবাধ অইচে দেবতা যে সব কাইড়া নিলা। .. গাছের ডালে মাথা ঠুকে ঠুকে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। কুসুম স্বামীকে সাঙ্ঘনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না।

বন্ধার জল তীব বেগে নেমে চলেছে। ভেসে চলেছে অগুণতি মবা জীব-জন্তু গাছপালা। আজ পাঁচদিন পব আবার পরিদাব হয়ে বোদ উঠেছে আকাশে। রাতভোর প্রাণপণ যুঝে অধিকাংশ মানুষই জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন খিদের জ্বালাতেই সকলকে মবতে হ'ল। পেটে তো হতাশনই জ্বলছে। ঘুম থেকে উঠে কাবো বরাদ্দ ছিল একবাটি পাস্তা, কারো বা এক কাঠা গুড় মুড়ি। আজ ভাণ্ডাব-সুদ্র অবলুপ্ত। ভিথিরা, অতিথি এসে যে বাড়ি থেকে কখনো ফেরেনি বাতারাতি সে বাড়ির মালিকও ফফির বনে গেলো। বাসুসী পদ্মা সব গিলে খেয়েছে। অশ্বিনী এরই মধ্যে 'মুড়ি ছাও, মুড়ি ছাও' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। নিশি কুসুমের কাঁধের ওপবেই ক্লাস্তিতে নেতিয়ে পড়েছে। ধবলী নেই যে গরম গরম দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বেচারী কুসুমের শরীরও আর বইছে না। এখনো মানুষ তলিয়ে যাবে জল উঠানে। গাছ থেকে নেমেও কোন ফায়দা নেই।

ছোট ডিক্সিখানা শিকল দিয়ে গাছেব সঙ্গে বাঁধা আছে। হয়তো রক্ষা হয়ে থাকবে। বিপদে একমাত্র ভবসা। দীল্লু দড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করে। কুসুম সঙ্গে সঙ্গে আবাব হাত চেপে ধবে স্বামীব। বাঁধা পেয়ে দীল্লুও দমে যায়। এখনা ভীষণ কাটাল। নামতে গেলে হয়তো ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। তাছাড়া রক্ষা যদি হয়েও থাকে তবু এত জ্বলেব ভেতব থেকে কখনো একা একা টেনে তোলা সম্ভবপব নয়। দীল্লুব ভাবনা বেড়ে যায়, লক্ষ্মী চবাব মাত্র উজাড়। পাঁচশ টাকা ঋণ মহাজন মধু পালের কাছে। হাতে একটা কানা কড়িও নেই।

ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে বৃকে শেল বেবে দীল্লু কবিমব কিন্তু তবু না গিঃস উপায় নেই। সমস্ত ক্ষেতময় পড়েছে কচকচে বাণি মধু পালের কাছে উভয়ে গিয়েছিল। যদি নতুন কবে কিছু কর্ণপায় তা হলে চেষ্টা কবে দেখবে আবাব বাণিব ওপব সোনা ফলানো যায় কি না। কিন্তু মধু পাল বাজি হয়নি। আগব টাকাব জন্মই সে নিজব বৃক চাপড়িয়েছে, মোড়লের পো, তোমবা তো মবলষ্ট, আমাবেও মাইবা গেলা। আবাব টেকা দিমু কোথান থন

দীল্লু হাত পা জড়িয়ে ধবে। কবিম আল্লাব কসম খায়। কিন্তু মধুব এক কথা, “আগব টেকা ছাও, পবে কথা কও।”

কথা আব নতুন কবে বলাব উপায় নেই। চোখেব জল মুছতে মুছতেই ফিবে আঃস দুই মিতায়। ঘবদোর নেই। বহুাব সময় মাচাব ওপব যা ওঠাতে পেরেছিল তাই-ই একমাত্র সম্বল। ঠাকুবব দয়ায় যে উভয়েব ডিক্সি দু’থানা বক্ষা পেয়েছে, সেই ঢেব ভাগ্যা। খেজুব পাতাব পাটিতে ছে দিয়ে ডিক্সিব ওপবেই আবাব নতুন কবে ঘব বাঁবে দু’জনে। ভোব লগ্নে ছেড়ে যাবে কাশীপুব।

ছেলে কোলে কবে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিল ফতিমা। মালপত্র বোঝাই শেষ। এখন ছেলেপুলে নিয়ে ফতিমা আব কুসুম ডিক্সিত উঠলেই ছেড়ে যাওয়া যায়। ফতিমার উদ্দেশ্যে কবিম তাড়া দেয়, কৈগ বহিমাব মা, বলি পোলা কোলে কইবা খাড়ইয়া খাড়ইয়া খালি কানবা, না নায়ে উঠবা ?

তাড়া খেয়েও কোন সাড়া দিতে পাবে না ফতিমা। বলে কি রহিমের বাপ। ছেলেপুলে নিয়ে ভবা গাং পাড়ি দেবে। ঘবদোর তো সবই গেছে, এবার পেটের ক’টাকেও জলে দিতে চায় নাকি !...ডাক ছেড়েই কাঁদতে ইচ্ছা করে ফতিমার।

পেছনের গলুইতে বসে ছকো টানছিল করিম। ফতিমার কান্না দেখে নিজের বৃকের ভেতরটাও আছড়াতে থাকে। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটে

যাটি। ছুঁদিন আগেও সব ছিল। ভিটে, ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গরু-বাছুব নিয়ে স্থখের সংসাব। আজ পথের ভিথিরী। নেই বলতে কিছু নেই। কোমব থেকে গামছাখানা খুলে ছু' চোথ পুছে ফেলে।

ফতিমা দাঁড়িয়েছিল, এবাব বসে পড়ে বিলাপ শুরু করে। কোথায় যাবে ও কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। দব-দোবই যখন বাখলো না বাসুসী তখন তো ছু'খান ডিক্কি এক খাবায় গিলে থাকে।...

কবিম নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ধবা গলায় সাঙ্ঘনা দেয়, পোলাপানেব সামনে অমুন কইবা কাইন্দ না। আল্লার দোয়া যে তল গচ্চায় পড় নাই। ছাবাবেব ভাঙ্কনেব কতা মোনে নাই তোমাব। রাতারাতি গেবামকে গেরাম তলাইয়া লইয়া গেল। তল দিয়া কাইটা দেয় কেউ টারই পায় না। কান্না খুইয়া গঠৈতে জল দিয়া নায়ে ওঠ। পবাণে যখন বাচ্চ, তহন আল্লার দোহ অইলে সব আবাব পাইবা।...

ফতিমার তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। ছু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে।

নিকপায় কবিম ফতিমাকে ছেড়ে কুসুমকে তাড়া দেয়, কৈগ মা লক্ষ্মী, তুমিও অবুজ অইলা নাকি। নায়ে ওঠ। বেলাবেলি পদ্মা পারি দেওয়ন চাই। বিকালে ঝড় তুফানের কতা কওয়ন যায় না।

কুসুম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডিক্কির কাছে আসে। কোলে নিশি, পায়ে পায়ে আঁচল জড়িয়ে অধিনী। কান্নায় ছু'চোথ ফুলে উঠেছে। অর্থে জলে ভেসেই-যেতে হবে।

কুসুমের দেখাদেখি ফতিমাও আঁচলে চোথ মুছে রহিম, মৈছদ্দিন আব মেহেরকে সঙ্গে কবে ডিক্কির কাছে আসে। দুই পবিবারের দুই গিনি গলুইতে জল দিয়ে ইষ্টদেবতাব নাম করতে কবতে ডিক্কির ওপরে ওঠে।

দীল্ল কবিম হালে চাড় দিয়ে ডিক্কি ভাসিয়ে দেয়। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি। বৈঠায় খোচ দিতে দিতে বার বার ফিরে তাকায় উভয়ে সজল চোখে। দেখতে দেখতে দুটি ঝাপসা হয়ে আসে। এক এক কবে মিলিয়ে যেতে থাকে চারিদিকের ঘর দোর গাছপালা। ঐ তো এখনো দেখা যাচ্ছে বাড়ির বড় আম গাছটা। দবলী বাঁধা থাকতো ওখানে—শক্তি প্রদায়িনী। ঐ গাছটাই তো জীবন রক্ষা করেছে, ঐ চর আর ঐ ধূলিকণার সঙ্গে রয়েছে স্থখ দুঃখ বিজড়িত জীবনস্মৃতি। আর কি কখনো ফিরে আসতে পারবে ওনা ওখানে, আর কি কখনো...ভাবতে ভাবতে অগ্নমনস্ক হয়ে পড়ে দীল্ল।

পাশাপাশি করিম হাল ধরে চলেছে। দীহুকে অল্পমনস্ক দেখে হুশিয়ার করে দেয়, ভাইজান, শক্ত কইরা হাইল ধর। সামনা দিয়া কোম্পানীর জাহাজ যাইবার নৈচে, ঢেউ আসব।

করিমের ডাকে দীহু আচমকা উত্তর দেয়, আমাগ একবারে মরণ নাই ভাইসাব। ভগবান রুষ্ট অইচেন। তিলে তিলে মারব। এত বড় ঢেউয়েই যখন তলাই নাই তখন আর জাহাজের ঢেউয়ে কি করব।...

করিম পান্টা ধমক দেয়, তুমি পোলাপানের সামনে অমুন কথা কইও না। অরা মোনে কষ্ট পাইব। আল্লার দোয়া অইলে সব ফিরা পামু। শক্ত কইরা হাইল ধর।

দীহু আর কথা বাড়ায় না। সংযত হয়েই হাল ধরে। ঢেউয়ে ডিক্কি ঢলতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরে ফতিমা কুশুমের চেঁচামেছি শোনা যায়।

করিম বৈঠায় খোঁচ দিয়ে সাহঁস দেয়, ভয় নাই। পোলাপানগ বৃকের মণ্ডে চাইপা ধর।

ঢেউ একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরের চেঁচামেচিও বন্ধ হয়ে যায়। শ্রোতের টানে দৌড়ে চলে দুজনের ছোট্ট দু'খানি ডিক্কি।

॥ ২ ॥

বর্ষার ভরা পদ্মা! অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে দিগন্তে। এক পারে দাঁড়ালে অল্প পার নজরে পড়ে না। কালনাগিনী যেন ফণা তুলেই আছে। বাগে পেলেই ছোবল মারবে। কিন্তু উপায় কি? সাপের মাথার মণি আহরণ করতে গেলে ছোবলের ভয় করলে চলে না। দীহু হুকোচায় সজোরে একটা টান দিয়ে গলুইয়ের পাশে নামিয়ে রাখে। শক্ত করে দু'হাতে হাল চেপে ধরে করিমের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, ভাইসাব, জমিন না অইলে বাঁচন যাইব না। আর ইপারে আমাগ কেউ জমিন দিবও না। চল, পারি দিয়া ওপারে যাই।

হ হ, ঠিক কইচ ভাইজান। তবে পদ্মার পারে আর নয়। সর্বনাশী আমাগ আর থাকবার দিবার চায় না। খেদাইয়া দিবারই চায়। চল, যমুনার পারে যাই। ছনচি ওহানে ইরকম ভাঙন নাই। মিলবারও পারে ছটাক মটাক, করিমও হুকো টানতে টানতে মনের আবেগে সায় দেয়।

যমুনায় পদ্মার মতো ভাঙন না থাকলেও শ্রোতের বেগ ভয়ংকর। একবার ভরা বর্ষায় আক বোঝাই ডিক্সি নিয়ে জনকয়েক উজাতে চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি বইঠা ঠেঙ্গিয়েও সফল হতে পারেনি। আজ উভয়েই একক মাঝি। ডিক্সি দু'খানাও অপেক্ষাকৃত ছোট। দীলু দমে যায়। করিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাতে সাহস পায় না।

দীলুকে নিরন্তর দেখে করিম পুনরায় জের টানে, কি, ভয় পাইলা নাকি মোড়লের পো? আরে আমাগ মতন পোড়া কপাইলা মাইনঘের মরণ নাই। বাদাম খাটাইয়া পারি ছাও আল্লা বইলা।

হ হ, ঠিকই কইচ ফকিরের পো। নদীর কিনারের জমিন না অইলে চাষ কইরা স্থখ নাই। পদ্মার পারে আর জমিন পাওন যাইব না। চল, যমুনার পারেই যাই। কৈ গ, হাইলডা একটু ধরবার পারবা নাকি? আমি বাদামডা খাটাইয়া লই, কুসুমকে তাড়া দেয় দীলু।

ছৈয়ের ভেতর কাৎ হয়ে শুয়ে নিশিকে মাই দিচ্ছিল কুসুম। দীলুব সম্বোধনে চমকে ওঠে, তুমি কও কি! এই ঝড় তুফানের দিনে পোলাপান লইয়া ভরা গাং পারি দিবার চাও। তোমার কি মাথা খারাপ হৈছে?

হ হ. আমার মাথাই খারাপ হৈছে। না খাইয়া মকম নাকি তোমাব কথায়?

পাশাপাশিই চলে.ছ করিমের ডিক্সি। কুসুমের কাতর কণ্ঠে চমক ভাঙে। ছৈয়ের ভেতরে রতিমের মা-ও বিস্ময় প্রকাশ করছে তার দিকে চেয়ে। মেজাজটা একটু খাদে নামিয়েই উত্তর করে করিম, হাইজান, মা লক্ষ্মী ভাল কতাই কৈচে। কাম নাই ভরা গাং পারি দিয়া। তার খনে চল বাঁক ঘুইরা ধলেশ্বরীর মাঁতু দিয়া যাই। ট্যাঙর ছাশের মানুষ গাঙের কিনারের জমিন পছন্দ করে না। গাঙের কিনারের জমিন কি কইরা চাষ করার লাগে তাও তারা জানে না। আমাগ স্তবিদা অইবার পারে।

কথাটা মনে ধরে দীলুর। সোৎসাহেই সায় দেয়, হ, ঠিকই কৈচ। তবে তাই চল দেখি, কি আছে বরাতে।

ধলেশ্বরীর তীর ঘেসেই চলেছে দু'খানি ডিক্সি। পদ্মা যমুনা অপেক্ষা কস্তা ধলেশ্বরী আকারে ছোট হলেও বিক্রমে কম নয়। সেই একই রকম তর্জন গর্জন ফৌস-ফৌসানী। পূর্ববঙ্গের নদীগুলো সবই যেন এক একটা কেউটে সাপের বাচ্চা। কণা তুলেই আছে—বাগে পেলেই ছোবল মারবে।

দীক্ষু করিম শক্ত হাতে হাল ধরে। কালনাগিনীর ছোবল এড়িয়ে চলবার মতো ফুলমঞ্জু জানা আছে ওদের। সময় বুঝে পথ চলে। সময় বুঝে খালের মব্যে লগি পুঁতে বিশ্রাম নেয়।

দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে চলেছে ডিম্বি। এক হাতে তাল, কলা, শসা, আক কিনে আর-এক হাতে বেচে দেয়। সামান্য দু'দশ পয়সা মুনাফ। তা দিয়েই চলে ঘর সংসার—হাট বাজার। শুধু চারটে চাল আর একটুখানি ছুন। পযাপ্ত মাছ তো মুফতই পাওয়া যায়। অবসর সময়ে একটা ছিপ ফেলে ধরে নিলেই হলো। টাটকা জলজ্যান্ত মাছ। খোলা জলে প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস। দীর্ঘ এই মাসখানেকের ভ্রমণে শরীর ওদের কারো থারাপ হয় না। জলো হাওয়ায় বরং সকলেই বেশ মুটিয়েছে। এখন চাই জমি। জমি হলেই মনের শান্তি ফিরে আসবে। আবার চাষ আবাদ হবে—ঘরবাড়ি।

আষাঢ় থেকে আশ্বিন এমনিই কাটে। কার্তিকে জলে টান ধরে। শ্রোতের বেগ বেশ মগ্নর। এখন এগুতে হলে শক্ত হাতে বইঠা বেয়েই এগুতে হবে। রীতিমতো আয়াস সাব্য। কিন্তু মিছিমিছি পরিশ্রম করে লাভ কি? নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থান জানা নেই। সামনেই তে'মোনা। ব্রহ্মপুত্র-নন্দন বংশী এসে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে। বংশীর পূর্বপারে গঞ্জ সাভার—বিখ্যাত জনপদ। হাজার হাজার মণ মুগ, কলাই, ধান, পাট, কেনাবেচা হয় সাভারের হাটে। স্থায়ী দোকানপাটেও গঞ্জ সাভার জমজমাট। প্রতি শনি মঙ্গলবারে হাট বসে। দশ বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ফল পাকুড় তরি তরকারী থেকে আরম্ভ করে অগ্ননতি জিনিসের সমাবেশ। দূর দূরান্ত থেকে হাটুরেরা আসে। রুজি রোজগারে প্রতিপালিত হয় হাজার কয়েক সংসার। দীক্ষু করিম লগি পুঁতে তিন চার হাট বেচাকেনায় মন দেয়। এর আগ পযাপ্ত যা রুজি রোজগার হয়েছে তাতে কোনরকমে দিন গুজরান সম্ভবপর হয়েছে। হাত থেকেছে সদাসর্বদা শূণ্য। কিন্তু সাভারের হাটে বেচাকেনা করে সংসার চালিয়েও কিছু কিছু হাতে থাকছে। অনেক ঝড় ঝাপটার পর ঈশ্বর বোধ হয় এতদিনে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন ওদের। সাভার ছেড়ে ওরা আর এক পাও নড়বে না। এখানেই মাটির সন্ধান করবে। প্রয়োজন হলে চিরজীবন অপেক্ষা করবে।

সাভারের ওপারে চারফুট নগর সবে জাগতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

সঙ্কমস্থল থেকে বদ্বীপের মতো উঠে চলেছে বিরাট চর উত্তর দক্ষিণে। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে ছুই পড়নী ঐ চরকে কেন্দ্র করে। চর নয়তো যেন মা লক্ষ্মীর আসনই ধীরে ধীরে জাগছে। মনের স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে। মা লক্ষ্মীর আসন স্থায়ী করে পাতার এই উপযুক্ত মাটি। এই মাটিতেই ফলবে ধান পাট সোনালী শস্ত। কিছ্ব কে দেবে এই চরের নিশানা? কার কাছে গেলে পাবে অকুলেতে কূল? মাটি—মাটি—মাটি, না হলে প্রাণের জালা জুড়াবে না। মাটি না হলে ছেলেপুলেরা বাঁচবে না। মাটি না হলে ঘর বাঁধা চলবে না। জীবনে মরণে সর্বস্তরে চাই মাটির মায়ের কোল,— দীলু করিম কাজের শেষে সকাল সন্ধ্যা হুঁকো খায় আর বসে বসে ভাবে।

॥ ৩ ॥

চরফুটনগর একটু একটু করে জাগছে। দীলু করিমের মনে বইছে খুল্লীর হাওয়া। সাভারের হাটে খোজ পেয়েছে, কাশিমপুরের বড় তরফের দখলে ঐ চর। কেউ ওখানে চাষ আবাদ করে না। বিলি ব্যবস্থাও এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি। নায়েব রাখাল গোসাইয়ের ওপরেই সকল ভার গুস্ত। বেশ নাতুস হুহুস চেহারা গোসাইজীর, খানদানী মানুষ। কিছু দিলে থুলে আশা আছে। দীলু করিম দুরাশার স্বপ্ন দেখে।

চর অনেকটা জেগেছে। কচকচে বালুর ওপর কোথাও কোথাও সামান্য সামান্য পলির আস্তরণ। একদিন দু'জনে চরের ওপর গিয়ে মাটি হাত দিয়ে পরখ করে দেখে। এখনো চাষ চলবে না। তবে এ দেশের মানুষ হয়তো জানেই না কি করে এই উষর ভূমিকে শস্ত শ্রামল উর্বর ভূমিতে পরিণত করা যায়। দু'জনে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায়। এখনো সবটা চর জাগেনি। তবু কোথা থেকে কি ভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে ছুয়ে মিলে মনে মনে জরিফ করে। ঈশ্বরের দয়ায় যদি বিলি ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে একবারের বর্ষেই পলি ধরা যাবে। ধান পাট না হোক রবিশস্ত ফলানো কেউ আটকাতে পারবে না। দু'জনে হুমুঠো মাটি হাতে করে ডিক্কিতে ফিরে আসে। হুঁকো খায়—সজ্জা করে। তারপর হাটের রোজগার থেকে যা বাঁচাতে পেরেছে তা নিয়ে গুনতে বসে। গোসাইজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা না করে শুধু হাতে কাছারিতে গিয়ে কোন লাভ নেই। দুটো বাঁশের চোঙের

মধ্যে গচ্ছিত দুজনের ধনভাণ্ডার। মাত্র ক’দিনের উপাঙ্গন। গুনলে আর কতই বা হবে? পয়সা, সিকি, আনি, দু’ আনিতে মিলিয়ে—মাত্র টাকা পাঁচেক হয়। উহ, এতে গোসাইজীর মন উঠবে না। দোকানে বসে দই খেতে খেতে কান্দনী ঘোষের নিকট সব খোঁজ পেয়েছে। গোসাইজীর পেটটা একটু ডাগরই। তা ছাড়া আছে এদিক সেদিকের খরচা।

বিরিট চন্দ্রব জুড়ে বাংলা ধরনের পাকা একতলা কাছারি বাড়ি। পূব, উত্তর, দক্ষিণ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমে বংশীর তীর—ঘাটলা বাঁধানো। বর্ষায় কানায় কানায় ফুলে ওঠে বংশী। ত’তিন বছর অস্তর এই সময়েই পোদ মালিকের “গ্রীনবোর্ট” ঘাটলায় এসে লাগে। করিতকর্মা বাথালের তৎপরতা বেড়ে যায়। গোঁষামোদে মুখর হয়ে ওঠে। বড়ান স্থবা পান করে মালিক অষ্টপ্রহর বিভোব হয়েই আছেন। প্রায়শঃই কাছারিতে নামা প্রয়োজন বোধ করেন না। ‘গ্রানবোর্টে’ বসেই এক আববাব আঁধি মেলে হিসেবের খাতায় নজর দেন। চুলচেবা হিসেব কড়া ত্রাস্তিতে মিল। পাইক পেয়লা পাঠিয়ে কিছু কিছু গরীব প্রজা আর চাটুকারদের ডেকে আনে রাখাল। প্রয়োজন বোধে প্রণামী আর নজরানাব স্থূল অংশটা নিজেব টেক থেকেই চাটুকারদের হাতে গুঁজে দেয়। নগদ লাভে ডগমগ হয়ে ওঠেন প্রভূপাদ। মনে মনে রাখালের তারিফ করেন।

ঘাটলা দিয়ে উঠেই দু’দিক জুড় ফুল বাগিচা। উত্তর দিকেব-দেয়াল ধেবে আমলা মুহুরীদের থাকবার ঘর। দক্ষিণে বিরিট ফটক। স্থূলপথে কাছারিতে প্রবেশ করার দরজা। পশ্চিমের ঘাটলার ওপরও একটি ফটক আছে। উভয় ফটকেই সশস্ত্র প্রহরী অষ্টপ্রহর মোতায়েন। কাছারি নয়তো যেন একটি প্রমোদ উগান। কেয়ারিতে কেয়ারিতে মরশুমী ফুলের বাহার নিয়তই পথিকজনের চোখ বাঁধায়।

মঙ্গলবারের হাটবাব। বিকেল প্রায় চারটে। দীহু করিম ভাবে, সোজাস্বজি কাছারির ঘাটলায় ডিক্খিখানা বেধে গোসাইজীর সঙ্গে দেখা করে। কস্ত সাহসে কুলোয় না। কানাঘুঘোয় শুনেছে, খাটলায় নোকো বাঁধা সাধারণের জ্ঞান নিবেধ। প্রথম যাত্রাই কি গোসাইজীর বিষ নজরে পড়বে? ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূতের মতো শিখ প্রহরী। কাজ নেই বাবা। হালে চাড় দিয়ে ঘাটলা ছাড়িয়েই একপাশে গিয়ে ডিক্খি বাঁধে। পরিষ্কার করে হাত পায়ের কাদা মাটি ধুয়ে দক্ষিণ ফটকে এসে দাঁড়ায় উভয়ে। সেখানেও

প্রহরী। কিন্তু আজ আর ফিরে গেলে চলবে না। চর অনেকটা জেগেছে। হয়তো এর মধ্যেই আবার কেউ এসে বাগড়া দেবে। এ কদিন সংসার খরচা একরকম বন্ধ রেখেই গোটা পঞ্চাশ টাকা যোগাড় হয়েছে। ফরমাস তো অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। ছেলে বউয়ের কাপড় গামছা ছিঁড়ে কুটি কুটি। নিজেদের পরনের মধ্যেও চলেছে তালির পর তালি। সব কিনলে কাটলে টাকা কটা আর এমন কি? হয়তো কুলোবেই না। না না, সবার আগে চাই জমি। জমির মধ্যেই রয়েছে বাঁচার উৎস। খানিক ইতস্ততঃ করে পাঞ্জাবী প্রহরীর শরণাপন্ন হয় দুজনে। মুসা সিং মুখে কোন জবাব না দিয়ে সোজা দেখিয়ে দেয় কাছারি ঘর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় উভয়ে ভেতরের দিকে।

নাকের ডগায় নিকেলের পুরু চশমাটা নামিয়ে দিয়ে গদীর ওপর বসে হিসেবের খাতা দেখছিল রাপাল। তক্তাপোনের ওপর ফরাস বিছানো গদী। তিন দিকের দেয়াল ধেসে আলমারীর ওপর থরে থরে সাজানো রাশিকৃত থেকুরা মোড়া হিসেবের খাতা। ওপর দেয়ালে রামদা, হরিণ মুণ্ড, ঢাল, তলোয়ার, বাঘছাল। একটা বড় তৈলচিত্র পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে। শিকারীর পোষাকে সূক্ষ্মিত বলিষ্ঠ দেহ। মোম দিয়ে চাড়ানো গোফ। মুণ্ড সমেত বাঘছালে মোড়া একটা পা-দানীতে ভর করে সদস্তে দাঁড়িয়ে আছেন বর্তমান জমিদার কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। হাতের বন্দুক উল্টো করে মাটির সঙ্গ ঠেকানো। করিম, দীলু খতমত খেয়ে যায়। মহাজনের গদীতে গিয়ে টাকার জলুধর্না দেওয়া ওদের অভ্যাস আছে। মহাজনের সামনে চটের ওপর বসে কঙ্কের পর কঙ্কে তামাক সেজেও খেয়েছে। সময় বিশেষে তার তর্জন গর্জনও দেখেছে। কিন্তু জমিদারের কাছারি কি বস্ত্র জীবনে কখনো দেখেনি। খাজনা কড়ি তসিলদার নিজে বাড়ির ওপর এসে নিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি। কোনরকম ঝঙ্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। জীবনে এই প্রথম কাছারিতে পদক্ষেপ। খ বনে যায় করিম দীলু। ভেবে পায় না, কি করে মনের কথা খলে বলবে। রাখাল যেন ডুবে আছে হিসাবের খাতায়। দেখেও দেখছে না। কিন্তু আজ যে কোন রকমেই ফিরে যাওয়া চলবে না। চর প্রায় সবটাই জেগে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। নয়তো পাকা ধানেই বা বাজ পড়বে কেন? দীলু সাহসে নির্ভর করেই সন্ধান করে, দণ্ডবৎ হই কস্তা।

বাখাল কপালের ওপর চশমাটা তুলে আড়চোখে প্রশ্ন করে, কি চাই ?

আইজা, আপনাদের ঐ চরটুকুনের লাইগা আইচিলাম, হাত কচলাতে কচলাতে উত্তর করে দীহু।

কি নাম ?

আইজা আমাব নাম দীহু বৈরাগী। আব উনি মিতা করিম ফকির।

নিবাস ?

আগে ফবিদপুর জিলার কাশাপুরে আছিল। এহন—দীহুর কণ্ড আবেগে বদ হয়ে আসে।

এখন কোথায় ?

এহন জলেব উপব ভাসচি কত্তা। বাইক্ষসী পদ্মা আমাগ সব গিলা খাইচে। আপনার ছিচবণে তাই একটু আশ্রয় চাই।

বাখাল সহসা হৃদিস কবতে পারে না কোন্ চরের কথা বলছে ওরা। ধলেশ্বরীর ওপারে প্রতি বছর শীতকালে যে চর জাগে ভুলেও তো এ পর্যন্ত কেউ কোনদিন তার খোজ করতে আসেনি। প্রজাবিলি তো দূরের কথা সাময়িক ভাবেও কেউ কোনদিন ইজাবার কথা বলেনি। শুধুই তো কচকচে বালির চিপি। বোশেখ থেকেই আবার তলাতে থাকে। বর্ষায় একেবারেই তলিয়ে যায়। নুখেঁরা কি ঐ বালির চরেই ঘর বাঁধবার ফন্দী আঁটছে!

বাখালকে ইতস্ততঃ করতে দেখে করিম মুখ খোলে, দয়া কইরা দেন কত্তা আনাগ ঐ চরটুকুন। আন্না আপনার মোঙ্গল করব।

বাখাল আর এক নজরে উভয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝে নেয়, আনাড়ী দুটো ঐ শুল্ল চরের জন্তাই ধনী দিচ্ছে। তাই দাঁও বুঝেই কোপ মারে, ও চরের জন্তে তো অনেকেই আসছে হে। ঠিক মতো নজরানা দিতে পারবে কি? অনেক দাম ঐ চরের।

আমরা গরীব মাছুষ। নজরানা কুথায় পামু হজুর? দয়া কইরা দেন একটু আশ্রয়। আন্নায ভাল করব আপনার, পুনরায় অহুরোধ করে করিম।

খালি হাতে জমিদারের দয়া হয় না বাপু। মালকড়ি যদি কিছু এনে থাক দয়া করে বা'র করো।

আপনাগ ছিচরণে নিবেদন করবার মতন ধন দৌলত কি আমাগ মতন কাঙালের ঘরে আছে কত্তা? তবে এই ষৎকিঞ্চিং পেনামী আনচি। দয়া কইরা কলা কয়ডা সেবায় লাগাবেন দেবতা। দীহু গামছায় জড়ানো বেশ

স্বপ্ন ও পুষ্টি একছড়া মর্তমান কলা গদীর ওপর রেখে টাকার খলির জন্ত কোমর হাতড়াতে থাকে ।

করিমও ঠিক সেই একই ভাবে গড়া পাচেক মুরগীর আঙা গামছার বাবন খুলে গদীর ওপর রাখতে যায় । দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল ছকার ছাড়ে, আরে কর কি—কর কি ! নীচে রাখ নীচে রাখ ! রাখা কৃষ্ণ—রাবা কৃষ্ণ—হরি হে—

করিম খতমত খেয়ে ডিমগুলো নীচে নামিয়ে রেখেই দীহুর মতো টাকার খলি খুলতে থাকে । কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে । ভয়ে আর একটি কথাও বলতে পারে না । মুখ কাঁচুমাচু করেই টাকার খলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে ।

রাখাল বাস্তব সমস্ত হয়ে ভূতা হরির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে, হরে, এই হরে— ? হরি হয়তো নিকটেই কোথাও ওতপেতে ছিল । ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে ।

রাখাল পুনরায় দাঁত খিঁচোয়, এই যে নবাব পুতুর । এতক্ষণ ছিল কোথায় ? আইজ্ঞা—মাথা চুলকাতে থাকে হরি ।

আর ‘আইজ্ঞাতে’ কাজ নেই । চট করে এক কক্ষে তামাক দিয়ে ডিমগুলো ভেতরে নিয়ে যা । ছুঁবেলা গিলবার বেশ ভাল স্বযোগই জুটলো ।

হরি তাড়াতাড়ি ডিমগুলো আঁচলে জড়িয়ে বেরিয়ে যায় । রাখাল দীহুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, প্রথম কিস্তিতেই যে জমিদারকে কলা দেখালে মোড়লের পো ।

কি যে কন কত্তা !—ঈশং হেসে উত্তর করে দীহু ।

করিমও দীহুর সঙ্গে সর মিলিয়ে বোকার মতো খানিক হাসতে থাকে ।

রাখাল স্বযোগ বুঝে পুনরায় প্যাঁচ কমে, ও কলা মূল্যায়ন হবে না হে । রূপটাদ কত এনেছ চট করে গুণে ফেলো ।

দীহু করিম সোৎসাহে খলির মুখ খুলে মাটির ওপর বসে গুনতে থাকে । সিকি, আনি, দু’ আনিতে মিলিয়ে নগদ পঞ্চাশ টাকা গদীর ওপর রাখে ছুঁজনে ।

রাখাল যেন তেমন খুশী নয় । তাচ্ছিল্য ভরেই কি যেন বলতে যাচ্ছিল, উভয়ে একযোগে উঠে এসে পা জড়িয়ে ধরে : কত্তা, আর একটা কানাকড়িও নাই আমাগ । পোলাপান লইয়া জলের উপুড় ভাসচি । দেন একটু আশ্রয় ।

তোমরা দেখছি আমাকে ঠেকাতে চাও ! বিধা প্রতি যে কুড়ি টাকা আদায়ের রীতি রয়েছে মালিকের ।

আপনি কাঙালের মা বাপ। আমাগ মুখের দিকে চাইয়া দয়া করেন,—
আরো শক্ত কবে পা চেপে ধবে দীলু।

আঃ,, কি মুশকিল, পা ছাড়ো। কি বল হে বিকাশ, দেওয়া যায় নাকি ?

মুহূবী বিকাশ দত্ত—পঞ্চাশউধর বয়স। পাশে বসেই খাতা লিখছিল।
সেতাবেব ঘাটেব মতো একই সুরে বাধা। কৃত্রিম দবদ ঢেলেই সম্মতি জানায়,
কি আব কববেন ? এবা তো দেখছি নাছোড়বান্দ। শেষ পর্যন্ত মালিকেব
কাছে আমাদেবই গালমন্দ শুনতে হবে।

দেখ হে বাপুবা, নিমক-হাবামী কবো না। যাহোক একটা ব্যবস্থা কবে
দিচ্ছি। আমাকে না হয কলাই দেখালে। কিন্তু সামনেব হাটে এদেব অন্ততঃ
কিছু দিয়ে য়ো—নযতো ধর্মেব কাছে ঠেকা থাকবে, বিকাশ আব হবিব উদ্দেশ্বে
ইঙ্গিত কবে বাখল।

কত্তা, আব আমাগ মাইবেন না। ঘবে একটা কানাকড়িও নাই। আল্লায়
দিন দিলে ছোট কত্তাব জন্ত যা পাবি দিয়া যামু, কথা দিলাম। এহন ছান
আমাগ একটা ব্যবস্থা কইবা, কবিম পুনরায় কাকুতি জানায়।

বিকাশ তুমিও যখন বলছ তখন দাও দু'জনকে দু'খানা দাখিলা লিখে।

বাখালেব সম্মতিতে দীলু কবিম কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বিকাশ আলমাবী
খলে বসিদ বই বাব কবে লিখতে যায়। বাখাল পুনরায় নির্দেশ দেয়, হ্যাঁ, এখন
এক এক জনকে দশ বিঘাব দাখিলা দাও। বিঘা প্রাপ্তি বার্ষিক এক টাকা
খাজনা। হাঁ হে, চব তো দু'ভাগে ভাগ হয়ে উঠেছে, কে কোন দিগটা নেবে ?—
বিকাশকে নিদেশ দিয়ে দীলুকে প্রণ কবে বাখাল।

আপনাব পছন্দ মতন ছান যাবে যেদিগে খুশি। আমাগ কোন আপত্তি
নাই। তবে বিঘা পঁচিশেব কমে কিন্তু চাষ কইবা সূখ নাই কত্তা। গবীবেব
আর্জিডা বাখেন, দীলু হাত জোড় কবে পুনরায় আন্সাব জানায়।

তোমবা দেখছি বসতে পাবলে শুতে চাও হে। যা দিচ্ছি তাতেই মালিকেব
কাছে কি গালাগাল শুনতে হবে জানিনে। তার ওপব আবাব পঁচিশ বিঘে।
না হে না, ওসব বাড়াবাড়ি করলে আমি কিছুই করতে পারবো না। সরে
পড়ো।

মুখ কাঁচুমাচু কবে উত্তর কবে দীলু, তবে যা দিচিলেন তাই ছান কত্তা।
গবীবেব আপনারা না দেখলে আর কেরা দেখব ? এহন আব না ছান না
দিলেন ; তবে পরে ঘ্যান বন্ধিত না হই।

আচ্ছা হে আচ্ছা, পরের কথা পরে। আগে দেখি তোমরা কি রকম চাষ
আবাদ করো তারপর অগ্র কথা।

আশীর্বাদ করেন কত্তা, মুখ ঘ্যান্ থাকে। আপনাগ ঘ্যান্ খুশী করবার
পারি,—গদ গদ হয়েই করিম উত্তর করে।

বেশ, ভাল কথা। দীমু, তাহলে তোমার রইলো উত্তর অংশ আর কবিমের
দক্ষিণ অংশ।

মনের মতো জমি না পেলেও প্রথম প্রচেষ্টা সকল হওয়ায় উভয়েই
খুশী হয়। রসিদ দু'খানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে পুনরায় রাখাল আর বিকাশকে
প্রণাম করে কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে। হ্যা, অসম্ভবই সম্ভব হলো আজ।
অনেক দিন পর আবার হাতে মাটি এল। এখন মা লক্ষ্মীব দয়া হলে
অচিরেই ভরে উঠবে গোলা গোয়াল। পূজো পার্বনে আবার মুখব হয়ে উঠবে
সমস্ত বাড়ি।... দুই মিতার আনন্দ আর ধরে না। টাঁকে একটা পয়সাও
নেই। তবু আজ আর কোন দুর্ভাবনা হয় না। মা লক্ষ্মীব ভিত্ত যখন পাকা
হলো তখন আর ভাবনার কি?.. মনের খুশীতেই ডিক্কিতে এসে ওঠে উভয়ে।
ফুকক ফুকক শব্দে হুকো টানতে থাকে!

দীমু করিম কাছারি ছেড়ে বেরিয়ে এলে বিশ্বয়ের সঙ্গে মস্তব করে
রাখাল, ও বিকাশ, আনাড়ী দুটো বলে এক হে, রালুর ওপব চাষ করবে!

আনাড়ী না হলে আমাদের চলে কি করে দাদা?—হাসতে হাসতেই জবাব
দেয় বিকাশ।

ঠিক বলেছ। এখন নজরানার খাতায় দশ টাকা হিসেবে বিশ, টাকা জমা
করে নাও। বাকীটা—হে-হে-হে, খাসা কলার ছড়াটা এনেছে হে। খাবে
নাকি দুটো? হরে, এই ব্যাটা হরে,—হকার ছাড়তে ছাড়তে দুটো কলা
অনিচ্ছা সবেই বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয় রাখাল।

যথা লাভ মনে করে কলা দুটো হাত বাড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখে বিকাশ।

হরি আনতো, ওরা দু'জনে, উঠে গেলেই পুনরায় ওর তলব পড়বে। তাই
ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটে আসে।

রাখাল ওর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী ফাটে, কিরে ব্যাটা, ডিমগুলো এরই
ভেতর সব সেদ্ধ বসিয়ে দিলি নাকি?

আইজ্ঞা না। তবে হাতের খেইকা পইড়া দুইডা ডিম ভাইকা গেচ, মাখা
চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে হরি।

তোর মাথা ভাঙবো গাড়ল ! যা, বাকী সবগুলো একুশি নিয়ে আয় এখানে ।

হরি বেরিয়ে গেলে রাখাল পুনরায় মস্তব্য করে, বুঝলে বিকাশ, ব্যাটারী সব ওত্ পেতেই আছে । স্বযোপ পেলেই ভাগ বসাবে ।

হরি ইত্যবসরে ডিম নিয়ে পুনরায় ফিবে আসে । ভাগের আশা ও ছেড়েই দিয়েছে—মুখ চোখ গস্তীর । কিন্তু বাখাল ওস্তাদ খেলোয়াড় । সে জানে, খোদ মালিকের পিয়ারেব চাকব এই হরি । কিছু কিছু দিয়ে-থুয়ে মুখ বন্ধ না কবতে পারলে নিশ্চিত হবার জো নেই । দুটো ডিম ভেঙে ফেললেও ফের দুটো ডিম হবির হাতে দিয়ে সেখান থেকে ওকে তাড়ায়, যা ব্যাটা যা, এই দুটোই বেঁধে খা গে । এক সঙ্গে বেশী ডিম খেলে পেট ছাড়বে ।

দুটো ডিম ভাঙবার পবেও পুনরায় দুটো ডিম পেয়ে হরি আশাতীত খুশী হয় । বাখালকে আব-এক কলকে তামাক দিয়ে বেশ ফুঁতির সঙ্গেই হেঁশেলের দিকে ছোটে ।

হবি বিদায় হলে এক-একটা ডিম হাতে নিয়ে ঘুবিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে বাখাল । খুশীতে গদ গদ । বিকাশকে লক্ষ্য করে পুনরায় উচ্ছ্বাস জানায়, বেশ বড় বড় টাটকা মুবগীর ডিম হে বিকাশ । তোমার চলে নাকি ? আমাদের তো হাঁড়ি হেঁশেলেই ঢুকবার জো নেই । বাড়ীতে রাধা গোবিন্দজীর বিগ্রহ বয়েছে । তবে সেবার বুকেব ব্যামোটা চাড়া দিতে ডাক্তাব দত্ত ‘হাপ্ বয়েল’ কবে খেতে বলেছেন । তাই লুকিয়ে চুরিয়ে—হে-হে-হে । নাও, তুমিও গোটা পাঁচেক নিয়ে যাও । সকালে আধ সেদ্ধ করে খেয়ো । বেশী করে খাটতে পাববে । বিকাশের তরফ থেকে উত্তবেব অপেক্ষা না কবেই পাঁচটা ডিম তার দিকে এগিয়ে দেয় ।

বিকাশ ঈষৎ হাল্লে ডিম পাঁচটা আলমারীর নীচে রেখে হাত বাঙ্গ খুলে ত্রিশটা টাকা রাখালের হাতে দিতে যায় ।

বাখাল একটু ইতস্ততঃ করে বাধা দেয়, না হে না, তুমিও খেতেছ । তোমারও কিছু পাওয়া দরকার । ও থেকে পাঁচটা টাকা রেখে দাও । অসময়ে কাজ দেবে ।

বিকাশ আরো কিছু বেশীই আশা করেছিল কিন্তু মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারে না । পাঁচ টাকা নিজের পকেটে রেখে বাকী পঁচিশ টাকা রাখালের হাতে দেয় । ডিম, কলা আর টাকা নিয়ে অগ্রদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই বাড়ির দিকে রওনা হয় রাখাল ।

অজ্ঞানের শেষাশেষি। চরফুটনগর সম্পূর্ণ জেগেছে। উত্তরুরে হাওয়ায় ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠছে বালির স্তর। দীহু করিম ডিক্কি থেকে নেমে চরের ওপর ঘর বাঁধে। সামান্য চালাঘর। খড়ের ছাউনি—পাট কাটির বেড়া। নদীর ভাবগতি না দেখে পাকা কিছু করা সমীচীন নয়। তাছাড়া অত পয়সাই বা কোথায়? শুধু একটু মাথা গুঁজবার ঠাই। দীর্ঘকাল পর ছেলেপুলেরা আবার একটু মাটির মায়ের স্পর্শ পাবে। ডিক্কির ওপর থেকে দিন দিন ঘেন অসার হয়ে পড়ছে। খোলা চরের ওপর একটু দোঁড়ঝাঁপ। মাটির মায়ের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠবে কচি প্রাণ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ে চৈত্র। কাঠ ফাটা বোদ খাঁ খাঁ করে চরের ওপর। ঘূর্ণি হাওয়া ওলটপালট করে দিয়ে যায় ঘর-দোর। কিন্তু দীহু করিম দমে না। আবার খুঁটি পুঁতে বাঁধে ঘর—সোনালী ভবিষ্যৎ।

বৈশাখে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে। আকাশে ভেসে বেড়ায় রাশি রাশি ক্লষ্ণ মেঘ। বর্ষার পদধ্বনি শোনা যায় গগনে ভুবনে। একটু একটু করে আসছে নতুন জল। এবার কোমর বেঁধে কাজে লাগার পালা। জমি হারিয়ে অচল হয়ে পড়েছিল ওরা। উজ্জ্বলিত মধ্যই কাটলো এ ক'মাস। গ্রহের ফের হয়ত বা কেটেছে। আবার জমি হাতে এসেছে। সোৎসাহে কান্ডে টোকা বার করে দুই মিতায়। চাষ নয়, জমি তৈবীর কাজ। বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে মা লক্ষ্মীর আসন। দেবীর রূপা হলে গঞ্জের মানুষ দেখবে যাদুর খেলা। উষর মরুভূমি উর্বর শস্ত্র শ্রামলা হয়ে উঠবে।

একটু একটু করে বাড়ছে জল। নদীর পার খেঁষে পুঁতে দেয় দু'জনে খোকা খোকা কচি করচার চারা। সঙ্গে ধন্ডে গাছ। গঞ্জের লোক দাঁত বার করে হাসে। আনাড়ী ছোটোর মাথা খারাপ হয়েছে। আঘাতে যাবে সব ওলিয়ে।...

আঘাত আসে। চর ডুবে যায়। দীহু করিম আবার এসে ডিক্কিতে আশ্রয় নেয়। চালের খড় বেড়ার পাটকাটিতে আলানীর কাজ চলে। কিন্তু ধন্ডে করচা ভাবে না। সজাগ প্রহরীর মতোই হাত ধানেক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়ই মাঝখানে বাঁধা থাকে উভয়ের ডিক্কি—দু'খানি ছোট্ট সংসার।

বিধাতা বোধ হয় ওদের ওপর কিছুটা প্রসন্নই এবার। বর্ষাব ধকল এবার অনেকটা কম। বংশীর দৃষ্টিও যেন পড়েছে গঞ্জের দিকে। গঞ্জের পাড়ই দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে! চরফুটনগরের ওপর দিয়ে বইছে মৃদু শ্রোত। দূর দূরান্ত থেকে নদনদী বয়ে আনছে লক্ষ্মীর আশীস-কণা—জমির প্রাণশক্তি পলি মাটি। দীহু করিম আসন বিছিয়েই রেখেছে। এখন মা-লক্ষ্মী এসে পায়ের ওপর পা তুলে কেবল বসবেন। ধনুচে করচার গায়ে বেশ পুরু হয়েই ধবা পড়ে শস্তপ্রাণ। কার্তিকে আবার টান পড়ে জলে। করচা ধনুচের গায়ে বেশ পুরু হয়ে জমেছে শেওলা। কচকচে বালির পবিবর্তে গোড়ায় জমেছে পাক। কাস্তে দিয়ে ঝটপট কেটে দেয় ধনুচে করচার গাছ। হেমস্তের টানে থকথকে হয়ে আসে পাক দিন কয়েকের মধ্যে। উভয়ে মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দেয় বীজ কলাই চবময়। ভিটির ওপর আবো উচু হয়ে বালি পড়েছে। চর বেড়েছে দ্বিগুণ হয়ে। দীহু করিমের সংসার আবার মাটিতে নেমে আসে। নতুন করে গোছ-গাছ চলে ঘর-দোরের। প্রাণে আর আনন্দ ধবে না দুজনের। প্রথম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে।...

লক লক করে বেড়ে চলেছে কলাইয়ের ডগা। আর ক'দিনের মধ্যেই শুঁটি দেখা দেবে। নতুন পলির ওপর প্রথম আবাদ। ফলন বেশ ভালই আশা করা যায়। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে চৈত্রেরই ঘরে উঠবে দেবীর আশীস-কণা। গঞ্জের লোক হতবাকই হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ এসে কুতূহল জানিয়ে যায়। ফড়েরা এসেও টোপ ফেলবার চেষ্টা কবে। দীহু করিম অষ্টপ্রহর তদারকে নিযুক্ত। গরু বাছুরের মূখ লাগলে বাড় বাড়ন্ত দমে যাবে কচি কচি ডগাগুলোর। মানুষের চোথকেও বিশ্বাস নেই। এক এক জনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাথানো থাকে। চোখ পড়লেই জলে যায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাঁশের মাথায় কালো হাঁড়ি বেঁধে চুন দিয়ে পুত্তলী এঁকে দেয় উভয়ে। করিম ভাল ঝাড় ফুক জানে। বংশ পরম্পরায় ফকির ওরা। ফকির বংশ নামেই বংশের পরিচয় ওদের। বংশী এখন এমনভাবে শুকিয়ে গেছে যে হেঁটে পার হয় গরু, ঘোড়া, ছাগল, মেঘ। জায়গায় জায়গায় পায়ের পাতা পর্যন্ত ডোবে না। ওপার থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে উৎপাত শুরু করে। চোখের পলক ফেলবার উপায় নেই। শুধু পশুপক্ষীই বা কেন? মানুষ চোরও কম নয়। তনুতনে শুঁটির লোভ অনেককেই হাতছানিতে ডাকে।...

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। শুঁটিতে পাক ধরতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সোনালী শস্তের বল্মলানী। আর ক'টা দিন, তারপরেই শুরু হবে কাটা। কম করেও পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মণের আশা করে এক এক জন। খুশী আর ধরে না। সন্ধ্যার পর করিমের দাওয়ার ওপর বসে দুই মিতাতে কথা হচ্ছিল। হুকো খেতে খেতে দীলুই প্রথম কথা পাড়ে, ভাইসাব, ধান পাট বুনবার না পারলে স্মৃথ নাই। অভাব কিছুতেই ঘুচব না। চল আব একদিন গোসাইজীর কাছে যাই! চর ত অনেকটা জাগচে। কান ভাঙানি দিবার মাইনষের অভাব নাই।

আল্লার দোয়া অইলে সবই অইব ভাইজান। আর কয়ডা দিন সবুর কর। খালি হাতে গেলে কি তাগ মন পাইবা? কলাই কয়ডা ঘবে উঠুক, কিছু হাতে কইবাই যাওয়ন যাইব, হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে নিতে করিম উত্তর করে।

কলাই উঠতে আর মাসটাক। তদ্দিনে সব খতম অইব। দেখবাব পাও না, মাইনষে কেমন ঘুর ঘুর করবাব নইচে?

আমাগ আল্লা ভরসা। ইছাড়া উপায় কি?

উপায় একটা আচে ভাইসাব।

কি উপায় মোড়লের পো?—করিম সবিন্ময়ে প্রশ্ন করে।

আচে আচে, একটু ভাইবা ছাহ, মৃহ মৃহ হাসতে থাকে দীলু।

আরে ধুংতর ভাইবা ছাহ, তুমি কও না?

দীলু সহজভাবেই বলতে থাকে, আরে আমাগ খালেব মুখে ডাল-পালা দিয়া রাখচি, দেখ্চ ত?

হ, তাত দেখ্চিই।

ঐগুলি উঠাইয়া পলো ফেললে কিছু বড় মাছ উঠব না?

হ, তাতে উঠবই। তবে মাছ দিয়া তুমি কি উপায় করবা? জাইলার মত মাছ বেচবা নাকি হাটে বাজারে?

তোমাংর দেখচি বৃইড়া বয়সে ভীমরতিতে ধরচে। মাছ বেচুম্ ক্যান! ঐ মাছ দিয়াই আসল কাম সারুম।

মাছ দিয়া কাম সারবা!

হ, হ, মাছ দিয়া কাম সারুম। তুমি বোজ না ক্যান? বড় বড় গোটা দুই গরমা যদি গোসাইজীর চিচরণে নিবেদন করবার পারি, তাইলে কাম হইব না?—দীলুর ওঠে হাসি ধেলে।

কিন্তু করিম সায় দিতে পারে না। না, ভাইজান, ও মাছটাছ লইয়া গিয়া কাম নাই। হেবার দেখলা না, আণ্ডা দেইখা গোঁসাইজী কেমন রাগ করল ?

তুমি কোন খবরই রাখ না ফকিরের পো। ও রাগ-টাগ নোক ছাখানো। হরির মুখে আমি ছনচি, গোটা আষ্টেক বাদে ও সব আণ্ডাই তিনার প্যাটে গেচে। মাছ মাংস পাইলে আর কিছুই চাই না ওনার।

তুমি দেখচি আদা জল খাইয়া লাগচ। তবে আর কথা কি ? লও, কাইল খেইকাই কামে লাগি।

হ হ, কাইল খেইকাই। আর দেরি করলে আমাগ কপালে আর জমি আইব না। হরি কইল, আর অনেক নাকি কাছারিতে যাওয়া আসা করচে।

করিম সে-কথায় সায় দিয়ে ভেতর বাড়ির উদ্দেশে ছাঁক ছাড়ে, কৈরে রহিম, কইলকাজ একটু বদলাইয়া দে। আর বেড়ার মত্তি খেইকা এক-তাবডাও দিচ একবার। মোড়লের পো, আহ, দয়াল চানরে আইজ একটু ডাকি।

হ ভাইসাব, আমিও তোমারে তাই কইবার চাইচিলাম। অনেক দিন তোমাব মুখে নাম ছনি না।

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে রহিম আসে। ফতিমা কয়েক খিলি পানও সঙ্গে দিয়েছে। হুকোয় গোটা কতক টান দিয়ে একতারা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। দাঁহু দোহারের জন্ত তৈরী হয়। বসন্তের মাতাল বাতাস বয়ে চলে দাওয়ার ওপর দিয়ে। স্বচ্ছ চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রাণের আবেগে গান ধরে করিম। উভয়ের মিলিত কণ্ঠ অমুবনিত হতে থাকে চরময় :

তুমি কোন বা ছাশে রইলা রে দয়াল চান।

আমি তোমার লাগিগা যগিনী সাজিলাম

হারা-ইলাম কুলমান ॥

জালা-ইয়া প্রেমের বাতি

বইসা রইলাম সারা রাতি

তুমি না আসিলা গুণনিধি

বল কেমনে বাঁচে পরান ॥

চৈত্রের মাঝামাঝি কলাই ঘরে ওঠে। উভয়ের জমি আলাদা আলাদা। দীক্ষু সস্তর মণ পেয়েছে। করিম একাত্তর মণ। যেমন বড় বড় দানা তেমন ঘিয়ের মতো রং। নতুন শাড়ী পরে দুই গিন্ধী প্রথম শস্ত ঘরে তোলে। কতিমা পীরের শিমির জন্তু নতুন মাটির কলসীতে আলাদা করে এক মণ কলাই উঠিয়ে রাখে। কুন্সুমও গোপীনাথের ভোগের জন্তু মণ খানেক আলাদা করে রাখে। সেবার দীক্ষুর ইচ্ছে ছিল অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপান্ন প্রহর নাম গান করায়। কিন্তু সে সাধ ওর পূর্ণ হয়নি। রাক্ষুসী পদ্মা সব তছনছ করে দিলে। নিজেয়াও এতদিন জলের ওপর ভেসেছে। ঠাকুরের রুপায় আজ একটু আশ্রয় মিলেছে। অষ্টপ্রহর ছাপান্ন প্রহরের খরচা যোগানো এখনো সম্ভবপর নয়। এখন যৎসামান্য ভোগ নিবেদন মাত্র। মা লক্ষ্মীর পূজোও কোনরকমে সারতে হবে। গত বছর তো জলের ওপর ডিঙ্গির মধ্যে হয়েছে। দেবীর রুপা হলে আবার কবিগান যাত্রাগান হবে। আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের পায়ে ধুলো বাড়িতে পড়বে। আরার উৎসব-মুখর হয়ে উঠবে দশদিক।...স্বপ্নে স্বপ্নে রঙীন হয়ে ওঠে সোনালী ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবারের হাটবার। মাত্র চার আনায় পাচ সের কলাই বেচে দেয় দীক্ষু। সবটা দিয়েই গোপীনাথের আখড়ায় গিয়ে বাতাসা কিনে ভোগ দিয়ে আসে। ঠাকুর দেবতার ভোগ না দিয়ে একটা কানাকড়িতেও হাত ছোঁয়ানো চলবে না। মরে গেলেও না। প্রথম শস্ত বেচা পয়সা—ও তো ঠাকুরেরই প্রাপ্য। তাঁর দয়াতেই তো অকূলে কূল পেয়েছ—ক্ষত ভর্তি ঘি-কলাই। বেশ ঘটা করেই হরিলুট দেওয়া হয় চার আনায় পাচপো বাতাসা। গোবিন্দ কীর্তনিয়া আসে। সঙ্গে শ্রীধর খোলী, অথও সাধু। দীক্ষু নিজেও দোহার টানে—খোল বাজায়। ঘণ্টা দুই চলে নাম গান। তারপর রুমুরের সঙ্গে অঙ্গ ছলিয়ে নৃত্য। মেঘরা উলু দেয়। মোহন চরণ দাস মন্দির থেকে ছিটিয়ে দেন মুঠো মুঠো লুটের বাতাসা। যে যেভাবে পারে লুকে নেয়। যে না পারে তাকে পরে হাতে হাতে বেঁটে দেওয়া হয়। মাত্র চার আনায় প্রাণগঙ্গা বয়ে যায়।

রাখাল গোসাঁইকে দুটো বড় গরমা ও বুদ্ধি খানেক গলদা চিংড়ী ভেট দিয়ে পাঁচ বিঘে করে আরো দশ বিঘে জমির দখল পায় দুই মিতায়। কলাই বেচে

পঁচিশ পঁচিশ করে নগদ টাকাও দিতে হবে পঞ্চাশটি। আর ছুটো দিন দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। পদ্মার পার থেকে অল্প একদল চাষী এসে নাকি ধনী দিতে শুরু করেছিল। রাখাল নিতান্ত খাতির করেই ওদের দিলে। তাইতো বললে সে। নাকগে, ঠকা জেতা যাই হোক—জমি তো হাতে এল। এখন দায় শুধু ঐ পঞ্চাশটি টাকার। তা দর যতো মন্দাই হোক এতগুলো কলাই বেচে এ টাকা শোধ দেওয়া যাবেই।...দীলু করিম অনেকটা নিশ্চিত। গজ থেকে দলে দলে সব ফড়েরা আসছে। অবশিষ্ট কলাই রেচে ফেলবার জন্য উস্কানীরও অস্ত নেই। কিন্তু ওরা পাকা চাষী। কখন দর ওঠে আর কখন দর নামে পূর্ব অভিজ্ঞতায় সে-পাট ওদের জানা। এখন চাই ধৈর্য। দাঁতে দাঁত চেপে থাকা। অভাব তো সংসারে লেগেই আছে। ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলোও যেন এক-একটা খুদে রাক্ষস। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাই এক বাটি পান্ডা নয়তো এক কাঠা গুড় মুড়ি। তা ওদেরই বা আর দোষ কি? ভালমন্দ তো আর কিছু মুখে দিতে পায় না। ঐ তো সামান্য দুটি ভাত আর মুড়ি। তাও না দিতে পারলে দাঁড়াবে কি দিয়ে? এ সময় হাটের রোজ্জগার নেই বললেই হয়। চৈত্রের মন্দায় কোন চাষীই হাতের জিনিষ বেচতে বাজী নয়। ফড়েরাও বসে বসে আঙুল চুষছে আর হা হতাশ করছে। অভাবের তাড়নায় দীলু করিমও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক-একবার ভাবে, কলাই ক'টা বেচে সব ঝগাট চুকিয়ে ফেলে! রাখালকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপরেই নিভর কবছে জমির পাকাপাকি বন্দোবস্ত। তাবপর এখন বলদের আবশ্যক না থাকলেও একটা ছুখেল গরু না হলে ছেলেপুলেদের বাঁচানো শক্ত। বর্ষার আগে ঘব-দোরের ওপরও নজর দেওয়া দরকার।...কিন্তু মোটে তো ঐ ক'টা কলাই সম্বল। এখনকার এই মাটির দরে বেচলে ক'টাকা আব হাতে থাকবে? ফড়েরা চরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুকো টানে। মুঠো ভর্তি কলাই হাতে নিয়ে যাচাই করে দেখে। কিন্তু দর আর কিছুতেই ওঠে না। সব শেয়ালেরই যেন এক রা। মাত্র একজন অতিকণ্ঠে দু'টাকা এক আনা দর দেয়, আর সকলেই দু'টাকা। কিন্তু তিন টাকার কম দরে বেচলে যে সংসার খরচাই কুলোবে না। দীলু করিম দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে।...

• বৈশাখের মাঝামাঝ। দু'টাকা দু'আনা দরে সব কলাই বেচে দেয় উভয়ে। না বেচে উপায় নেই। সামনের হাটে রাখালকে টাকা না দিলে সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে। জল আসার আগে সমস্ত চর জুড়ে লাগাতে

হবে ধনুচে করচ। এবার আর একা একা সব পেরে উঠবে না। কতিমা কুসুম সাহায্য করলেও জন দুই কামলা নিতে হবে। টাকার অভাবে গত বছর অপেক্ষা এবার বেশি দেয়িই হয়ে গেল। ভাগ্যিস জল এবার নামি আসছে। নয়তো বাড়তেই পারতো না ধনুচে করচার চারা। শিকড় ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তলিয়ে যেতো সব। মীরপুরের হাট থেকে গরু আনতে হলে সেও এই শেষ সময়। এবপব আর হাঁটা পথে গরু আনা সম্ভবপর হবে না। বড় নৌকায় চড়িয়ে গরু আনায় অনেক খবচ।...সাত পাঁচ ভেবে গোলা উজাড় করেই কলাই ক'টা বেচে দেয় দুজনে। বাড়ির উঠানে শক্ত কবে বাঁধা হয় মাচা। নদীর পার ঘেঁষে ধনুচে কবচাও টায় টায় লাগানো হয়ে যায়। রাখালের নিকট ওয়াদাও সময় মতোই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দুখেল গাই আর গোয়ালে আসে না। হাড় জিরজিব কবছে ছেলেপুলেগুলোর। মুখে আঙুল চুষেই দুখের তেষ্ঠা মেটায়। বুক ফেটে যায় দুজনেব। কিন্তু কিছু কবার উপায় নেই! অবস্থা চরমে ওঠে আঘাতে। কলাইয়ের মণ সাড়ে তিন টাকা। চোখের জলের সঙ্গে নদীর জল মিশে সমস্ত চব তলিয়ে যায়। তবু ভাগ্যি ভাল যে এবাব আর ডিক্কিতে উঠতে হয় না। মাচাব ওপরেই কোনরকমে টিকে যায়।

আবার ক'র্তিক আসে, জলে টান ধরে। চতুর্গুণ হয়ে জেগেছে চব। নাগিনী কণা ধলেশ্বরী কিমিয়ে পড়েছে। একদা বিষ-দাঁতে কেটে ক্ষেত খামার তছনছ করেছে। কিন্তু এখন আর ওর সে দাপট নেই। বর্ষায়ও এখন আর তেমন ফণা তুলে নাচতে পারে না। বালিতে বালিতে বৃকে যেন পাষণ চাপা পড়েছে। দু'চার বছর অন্তবই তাই ওকে বিশ্রান্ত ঘোষণা করতে দেখা যায়। প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগবলয়। ব্রহ্মপুত্র নন্দন বংশীও আজ নিশ্চভ। পিতৃদত্ত ব্রহ্মতেজ একেবারেই ত্রিয়মান। চবে চরে বিশুদ্ধ বক্ষকোষ। কোনরকমে এ ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে গড়িয়ে চলেছে মাত্র।

দীক্ষ করিম যথাবীতি কলাই ছিটিয়ে দেয় থকথকে পলির ওপর। সঙ্গে ছোলা মুগ। বিস্তৃত অঞ্চল আজ শস্ত-দায়িনী হয়ে উঠেছে। অল্পবর বালুকারাশি উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। খুশীতে উপচে পড়ে উভয়ে। আর বিধা দশেক করে জমি দখলে এলে মুখর হয়ে উঠবে সংসার। আবার যাত্রাগান, কবিগাঁন আর ধামাল উৎসবে মেতে উঠবে আনাচে কামাচে। লক্ষ্মীর পদধনী শোনা যাচ্ছে। শুধু বরণ করে ঘরে তোলা।

মরশ্বে মণ মণ বিক্রি হয় মুগ, কলাই, ছোলা। লক্ষ্মীর কাঁপি ফেঁপে ওঠে দিন দিন। রাখালকে পঞ্চাশের জায়গায় একশ দিয়ে আরো পাঁচ পাঁচ বিঘার অধিকার লাভ হয়েছে। কিছু ফলমূল মাছ মিষ্টিও দিতে হয়েছে। গঞ্জ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ঢেউ টিন আসে। শালের খুঁটি পুঁতে উঁচু ভিতের ওপর তৈরী হয় পাকা ঘর। কলাগাছের সারির ভেতরে সোনালী রদ্দুরে বিক্ৰমিক করে নতুন ঘরগুলো। গঞ্জের লোকের চোখ বলসায়। মাত্র বছর তিনেকের ভেতর স্বপ্ন দেখছে ওরা। চরফুটনগর এখন এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শস্ত-ভাণ্ডার। জমির দাম কাঠা প্রতি পঞ্চাশ ঘাট টাকা। রাখালের আফসোস হয় এতগুলো জমি হাতছাড়া করে দিয়ে। খোদ মালিকের কাছেও কটুক্তি শুনেতে হয়েছে ওদের। ইচ্ছে থাকলেও দীর্ঘ করিম আর অধিক জমির আশা করে না। বালির টিপি শস্তাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন তো জুয়াড়দের পাল্লা চলবে। ধাপে ধাপে চড়বে জমির দাম। যা হোক, মা লক্ষ্মী হাতে তুলে যা দিয়েছেন তাতেই ওরা খুশী। নাগ নাগিনী যদি আর ওদের ছুবলে না খায় তা হলে কেটে যাবে দিন কোনরকমে। পূজো-পার্বণে বংশের ধারাও রক্ষিত হবে। বংশী ধলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায় উভয়ে, দোহাই মহাদেব মহাদেবী, রক্ষা করো আমাদের। কাঙালদের আর মেরো না।...

এবার লক্ষ্মীপূজো ভিটির ওপরেই হয়। পূর্বরীতি অনুযায়ী গান-বাজনা না হলেও গঞ্জের জন কয়েক সাধু সজ্জনের পদধূলি পড়েছিল। পেট ভরেই প্রসাদ পেয়েছেন সকলে। মোহস্ত চরণ দাসের অনুগ্রহে গোপীনাথের ভোগও হয়েছে মণ খানেক চালের অন্ন দিয়ে। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অখণ্ড সাধু সকলেই যোগদান করেছিলেন। বেশ জমেছিল আসর নাম গান আর পালা গানে। তিন মণ দুধের শিল্পিতে নারায়ণ পূজোও সম্ভবপর হয়েছে শুভ গৃহ-প্রবেশ-লগ্নে। গঞ্জের আবালবৃদ্ধ দলে দলে এসে প্রসাদ পেয়ে গেছে। সঙ্কে মুঠো মুঠো কচকচে মুড়ি।...

করিমের বাড়িও উৎসব-মুখর। বছর তিনেক দায়ে পড়ে সব বন্ধ ছিল। ভিটে ছাড়া হওয়ায় শিশু সামন্তদের কোন খোঁজ খবর ছিল না। ইচ্ছে করেই কোন সংস্রব রাখেনি করিম। ছিন্নমূল মানুষের আবার পরিচয় কি? সে না ঘাঁটের না পথের। আজ খোদাতায়ালার ইচ্ছায় আবার সব হতে চলেছে। ঝাড়-ফুক এতদিন প্রায় বন্ধই ছিল। কাছের মানুষও এতদিন ওর গুণপনার কোন সন্ধান পায় নি। ফকিরাস্তি ওদের বংশের সাধনা। ফজি রোজগারের

ফন্দি নয়। তাই শত অভাব অভিযোগেও কারো নিকট হাত পাততে পারে নি। ও যেন ভুলেই গিয়েছিল সব মন্ত্রতন্ত্র। মিতা দীলু সব খবর রাখে। সম্পদে বিপদে সে-ই একমাত্র সাথী। কিন্তু দীলুও এতকাল সমগোত্র হয়ে জোয়াল টেনেছে। কারো কাউকে সাহায্য করার মতো সঙ্গতি ছিল না। দু'জনে একসঙ্গে নিরালায় বসে দয়াল চানরে ডেকেছে। খোদা দয়াময়। সংসারে দুঃখ আবার কি? বরং ভাগ্যবান ওরা। মিজতা ওদের অন্তরে বাহিরে। এক সঙ্গে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে এক সঙ্গে তীরে উঠেছে। এ যেন এক তন্ত্রীতে পৃথক সত্তা। একজন কাঁদলে আর একজন কাঁদবে, একজন হাসলে আর একজনও হাসবে।

মাঘী পূর্ণিমা। তিন বছর পর আবার করিম ফকিরের বাড়িতে ধামাল উৎসব শুরু হয়েছে। ফকিরাস্তির চরম উৎসব ধামাল উৎসব। দূর দূরান্তের শিষ্য সামন্তদের চিঠি লিখে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ ছুটে এসেছে, কেউ প্রণামীর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। একাদশী তিথি থেকেই খোলা হয়েছে মণ মণ চালের অন্নসত্র। চরফুটনগরের কারো বাড়িতে এ ক'দিন রান্না হবে না। অতিথ অভ্যাগতসহ খাও দাও আনন্দ কর। হোগলার ছাউনী দিয়ে নতুন নতুন ঘর তোলা হয়েছে চরময়। শত শত নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। দোকানীরা এসে দোকান খুলেছে। মেলায় পণ্যের বিপুল সমাবেশ। শূণ্য চর কলকণ্ঠে মুখর। যাছুই বোং হয় জানে দীলু করিম। উৎসাহী জনতার মধ্যে কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গেই মস্তব্য করে, আরে এই তো কথা। এত বড় গুণী না হলে বালির চরকে কেউ এমন করে গড়তে পারে? সব ভোজবাজী। করিমের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় আশপাশের সমস্ত গাঁয়ের লোকের। দলে দলে এসে মোমবাতি জ্বলে দিয়ে যায় ফকিরের আসনের সামনে। ফল ফুল বাতাসার ছড়াছড়ি। স্তূপাকার হয়ে পড়ে পয়সা, আনি, দু'য়ানি, টাকা। করিম এর একটি পয়সাও হাত দিয়ে ছোঁবে না। সব উৎসবে খরচ করে দিচ্ছে। আজ ওর পরম সোঁভাগ্য। অগুনতি মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে চরফুটনগরে। কারো তেলপড়া টাই, কারো বা জলপড়া। আপাদ মস্তক ঝেড়েও দিতে হবে কাউকে কাউকে। বিরামবিহীনভাবেই যথারীতি করে চলেছে করিম। বিরক্তির লেশ মাত্র নেই চোখ মুখে।

আজ পুণ্যাহ। সকাল থেকেই নিয়মিতভাবে ব্যাঙ বাজছে। আজ আর কোনরকম ঝাড়-ফুক হবে না। সমস্ত দিনরাতই চলবে গান। বির্রাট

চন্দ্র জুড়ে আসর তৈরী হয়েছে। আকাশে ধ্বজা উড়ছে পং পং করে। রান্না খাওয়ার আজ বিপুল সমাবেশ। টাকা-কড়ি যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে সব উজাড় করে খরচ করা হবে। কাপড়, গামছা সব বিলিয়ে দেওয়া হবে গরীব দুঃখীকে। যদিও সংসার আছে তবু ফকিরের কোনরকম সঞ্চয় রাখতে নেই। বিশেষ কবে দয়াল চানের নামে যা এসেছে তা তো নয়ই। করিম মহাখুশী।—সমস্ত চরফুটনগর জুড়েই যেন আজ খুশীর বান ডেকেছে। জীবনের বড় সঞ্চয়ই হলো আনন্দ। কবিম সেই আনন্দ সায়েবেই ডুব দেয়।...

এক-একটি বর্ষা যায় চরফুটনগরের এক-একটি অঞ্চল ফেঁপে ওঠে। বছর পাঁচেকের চেষ্টায় ক্ষুদ্র চর বিরাট এক পল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছরেই নতুন নতুন মাছ ঘর বাঁধছে। চাষের জমি মেলাই এখন ভাব। জমিদার রমেন্দ্র নারায়ণ বায় চৌধুরীর মরা গাঙেও আবার জোয়াব বইতে শুরু হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে লাটের কিস্তি বন্ধ হয় হয় অবস্থা। প্রজাব বুকব ওপর বাঁশ ডলাই করেও সংকুলান হচ্ছিল না। চরফুটনগরবেব চবই আবার নতুন সমৃদ্ধির সূচনা করেছে। ছোট ছোট ধণ্ডে 'চলেছে প্রজাবিলি। মোটা নজরানা। একসঙ্গে অধিক জমি কাউকে দেওয়া হয় না। নায়েব গোমস্তাকে আর বিশ্বাস নেই। বছর তিনেক নিয়মিত এসে ঘাটে লাগছে তাঁর "গ্রীণবোর্ট"। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে আগমন, আশ্বিন কার্তিকে প্রত্যাবর্তন। দীঘু করিম আর ছিটে-ফোঁটা জমিও পায় না। তা না পাক, মা লক্ষ্মী ওদের কুশলেই রেখেছেন। চরের মোড়ল ওরাই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও ওদেরই। বিপদে আপদে ওদেরই শরণাপন্ন হয় চরের মাছ। ছোট বড় প্রায় শ'খানেক ঘরের বসতি। লোকসংখ্যাও হাজারের ওপর।...

চর দু'ভাগে ভাগ হয়েছে, মাঝখানে খাল। দীঘুরা জাতিতে নমশূদ্র। উপাধি বৈরাগী। বংশ পরম্পরায় হরিভক্ত ওরা। প্রতি সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করা, বৎসরে একবার অষ্টগ্রহর মহোৎসব করা, বিপদে আপদে লুটের মানত করা ওদের বংশ-রীতি। জাত বোষ্টমের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। পুরোপুরি সনাতন পন্থী। কাছা দিয়েই কাপড় পরে। তবে তিন লহরে কার্ঠের মালা ওদের প্রত্যেকের গলাতেই শোভা পায়। বোষ্টম নয়—হরিভক্ত বৈষ্ণব। দীঘুর নাম অঘুসারেই খালের নাম বৈরাগীর খাল নামে পরিচিত। বর্ষায় কানায় কানায় ভরে ওঠে—শীতে শুকিয়ে যায়। রমেন্দ্র নারায়ণ গঞ্জে

এলে রাজিবাস খালেব মুখেই কবেন। সম্ভবতঃ ঝড় তুফানের হাত থেকে গ্রাণবোট রক্ষা করা। গত দু'বছর থেকে একটু নেক-নজবই পড়েছে যেন তাঁব চবফুটনগরেব ওপব। বর্ষে বর্ষে চরফুটনগব বাড়ছে—তা'ব আশা আকাজকাও। অর্থ চাই—প্রতিপত্তি। হয়তো আরো কিছু।

॥ ৬ ॥

বংশী বয়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণে, ধলেশ্বরী পূবে পশ্চিমে। নদ নদী'ব সঙ্গম কেন্দ্র থেকে বদ্বীপেব মতো উঠেছে চরফুটনগব। বংশী'ব পূর্ব পাড়ে গঞ্জ সাভাব। ধলেশ্বরী'ব দক্ষিণ পাড়ে চবধল্লা—বর্ধিষ্ণু খামাব বাড়ি। চব না বলে ধল্লাকে সমৃদ্ধশালী জনপদ বলাই সমীচীন। চবফুটনগব অপেক্ষা চবধল্লা'ব ভৌগোলিক স্থায়িত্বও কয়েক পুরুষেব। বেশ কয়েক ঘব সম্পন্নশালী গৃহস্থেব বাস। অধিবাসীরা অবিকাংশই মুসলমান। সাদাসিধে ওদেব চাল চলন—সহজ সবল মনোবৃত্তি। মিথ্যে কথা কেউ বলাতে পাবে না ওদেব দিয়ে। স্বয়ং পী'ব এসে বললেও না। চবধল্লা'ব মোডল পলান বেপাবি।

আম্বাজান ঘাট বছর বয়সে বেহস্তে গেলেন। পলান বছর দশেকের বালক। আম্বাজান তো শৈশবেই গত হয়েছেন। কি দিয়ে গেলো বহমৎ পলানকে? ছোট্ট একখানা খড়ের চালা ঘব আব গোটাকতক মাটি'ব সানকী দড়া, বদনী। পোড়া পেট কি আর ওতে চলে? বহমতের দোষ নেই। কিছু খামাব জন্ম তা'ব ছিল। গোটাকতক গরু বাছুবও। পলান তো 'কাল গাইযেব' দুধ খেয়েই মানুষ হয়েছে। গ্যাট্টাগোট্টা চেহারা তো সেই অতীতে'বই সাক্ষ্য। কিন্তু বান্ধসী বলেশ্বরী সব গিলে খেলে। জন্মজন্মা তলিয়ে গেল—আম্বাজানকে খেলো কাল নাগিনীতে।

আষাঢ়েব বাত। ঘুটঘুটে অমাবস্তার অঙ্ককাব ভেপসা গবমে ঘবে তিষ্ঠানো দ'ঘ। দাওয়'র ওপর খেজুব পাতার পাটি বিছিয়ে শুয়েছে ছালেহা। পলান তখন দুধের শিশু। সা'বা দিনের ষাটু'নীর পর এক নিমেঘে ছ'চোখ এক হয়ে আসে ছালেহা'ব। রহমৎ নিয়মিত মাচার ওপরেই শোষ। ও'ব আ'বাব ভিজ্জে মাটি সহ্য হয় না। স্নেহ'র ধাত—একটুতেই কাশির দমক ওঠে। দস্তি পলানকে বৃকে চেপে মাই দিতে দিতে অসাড়ই ঘুমিয়ে পড়ে ছালেহা। হঠাৎ বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ছো'বল পড়ে। "মলাম মলাম, কালিয়ে

নিল কালিয়ে নিল” বলে চীৎকারে সমস্ত বাড়িখানাই যেন ডুকরে ওঠে। রহমতের ঘুম পাতলা। চীৎকার শুনে শিয়রে রাখা রামদা নিয়ে মাচা থেকে এক লহমায় লাফিয়ে পড়ে। না না, চোর ছ্যাঁচর নয়। লঠন ধরিয়ে কাছে আসতে না আসতে বাজীমাত। মুখ দিয়ে গোলা উঠছে ছালেহার। অঝোরে খুন বরছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে। রাক্ষসী অনেকটা মাংস ছুবলিয়ে খেয়েছে। রহমতের বুকে দেবী হয় না। তাড়াতাড়ি পাটের দড়ি দিয়ে তিন জায়গায় তাগা বেঁধে ফেলে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। কালনাগিনীবি বিষ দমকে দমকে উঠেছে শিরা উপশিরায়। কিছুক্ষণ দাপাদপি করে নিস্তক হয়ে পড়ে ছালেহা। বহমতের বুক কেটে কান্না আসে। সোরগোল শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড় হয়। ওঝা ফকিরও আসে। তিনদিন তিন বাত্রি চলে ঝড় ফুঁক। কিন্তু ছালেহা আর জাগে না। রাক্ষসী ধলেশ্বরী ওর গোরস্থানটা পদন্ত উদরে পুবেছে। যাক—সব যাক। রহমতের কোন শোক আফসোস নেই। ছালেহাই যদি না বইলো তবে আর জমিজমা দিয়ে কি হবে? নদী আব নাগিনী কাকেও তোয়াক্কা করে নাও। বয়সেও ভাটি পড়েছে। এখন আর ওকে মেয়ে দেবে কে? তা ছাড়া কি আছে যে তাই দেখে পরেব ঝি হবে আসবে! সবই তো তলিয়ে গেল। নতুন করে ঘর বাধা আর হয় না রহমতের। পলানের দিকে চোখ তুলে চাইতে পাবে না। আধ আধ কথায় ‘আম্মা আম্মা’ বলে চীৎকার করে পলান। গলা শুকিয়ে ওঠে দুধের তেষ্টায়। এক হাতে চোখ পৌছে আর এক হাতে পলানকে সামলায় বহমৎ। কিন্তু পলানকে ভালভাবে মাতুষ করতে হলে গৃহলক্ষ্মীর দবকাব। মনকে শক্ত করতেও চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ঘব-দোরে পা দিলেই যে ছালেহার কথা মনে পড়ে। পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে গাঙের ঘাটে জল ভরতে যেতো ছালেহা। দাঁওয়ার ওপর বসে কঙ্কর পর কঙ্কে তামাক খেতো আর অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতো রহমৎ। মাঠ থেকে ফিরতে দোরি হলে নিজে ছুটে যেতো ছালেহা নাস্তা নিয়ে। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতো...অঁচল দিয়ে বাতাস করতো। ...রহমতের ছ’চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কালনাগিনী ওকে খায় না কেন? একবার বাগে পেলে বিষ দাঁত ভেঙে দেবো না।...না না, সবই খোদাতায়ালার মর্জি। কপাল ভাল হলে অসময়ে ছালেহাই বা যাবে কেন আর পলানেরই বা এত দুঃখ হবে কেন? গলায় কলসী বেঁধে ধলেশ্বরীর ঝলে ডুব দিলে সব জ্বালা

জুড়ায়। কিন্তু পলানের কি উপায় হবে? খাঁ বাড়ির আর রইলো কি পলান ছাড়া। ঘর-দোর জমি-জমা গরু বাছুর সবই তো গেল। একমাত্র পলানই যা ভরসা। ছালেহার বুকের রক্ত বইছে পলানের শিরায় উপশিরায়। পলানের মধ্যেই বেঁচে আছে ছালেহা। পলান—পলান পলান, ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরে রহমৎ পলানকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ওর কছি সোন মুখ।

মা ছাড়া দুধের শিশুকে মানুষ করা কঠিন কাজ। আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ কেউ নিতেও চেয়েছিল পলানকে। কিন্তু রহমৎ দেয়নি। সংসারে ওর আর এমন কি কাজ? ক্ষেতখামার সবই তো গেছে। একা পলানকে সামান্য একটু যত্ন-আত্তি করতে পারবে না? নিজের জগুও তো ছুটো চাল ফোটাতে হবে। পলানকে ভাসিয়ে দিলে বেহস্ত থেকে কি ছালেহাই ওকে ক্ষমা করবে?... অগ্র পর কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের জিম্মায়ই রাখে রহমৎ পলানকে। মাত্র দশে পা দিয়েছে পলান, রহমতেরও ডাক আসে ছালেহার পাশে।

দশ বছরের পলান আজ পঞ্চাশউর্ধ্ব পা দিয়েছে। জমিজমা, ক্ষেত খামার, বাড়িঘর, নৌকো, ডিক্কি সব হয়েছে। চরখল্লার মাথা আজ ও। ওর একটি মাত্র ইঞ্জিতে সমস্ত চর ওঠে বসে। সালিসী দরবার কোন কিছুই ওকে ছাড়া হয় না। চরের কোন চাষী মহাজনের কাছ থেকে কজ্ব নিতে গেলেও চাই ওর সহ-সাবুদ—জামিন হওয়া। পলানের সুখ সমৃদ্ধি অতুলনীয়। আল্লার মর্জিতে চরখল্লার কেউ কোনদিন না খেয়ে থাকে না। ঈদ, মহরম, রমজানেও প্রাণ খুলে মাততে পারে সকলে। চরখল্লার পসার লোভনীয়। গঞ্জ থেকে দলে দলে ফিরিওয়ালারা আসে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে। শাড়ী, গামছা, ফুলেল তেল নিয়েও আসে কেউ কেউ। সব নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। আর হবে নাই বা কেন? চরখল্লা তো এ অঞ্চলের মধ্যে পাটের একটি খুদে আড়ত। ক্ষেতের ধান, কলাইতে সারা বছরের খোরাক চলে। পাট থেকে আসে বাড়তি পয়সা। গঞ্জের বাজারে অগ্র অঞ্চলের পাট দশ টাকা দরে বিক্রি হলে চরখল্লার পাট বিক্রি হবে কম করেও দশ টাকা আট আনা দরে। এ অঞ্চলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাট বলতে চরখল্লার পাটকেই বোঝায়। ১৩৩২ সালে চড়া দরে পাট বেচেই সমস্ত চরময় নতুন টেউ টিনের ঘর উঠেছে। সোনালী রন্ধুরে বলমল করে চরখল্লা। গাঙের পথে নৌকোয় যেতে যেতে জিন্দে দিলী মানুষ হতবাক হয় চরখল্লার সমৃদ্ধি দেখে। ছোট বড় ঘরগুলোর

ওপর কলার-ঝাড় আর বাঁশ-ঝাড়ের ছায়াবাজী চলে বসন্তে শবতে। চর নয়
তো খেন এক ইঞ্জুরী।

হঠাৎ পাঁচ-সাত টাকা থেকে ত্রিশ-বত্রিশ টাকায় ওঠে পাটের মণ।
মহাজনের বাড়-বকেয়া কজ এক বছরে শেণ হয়ে যায়। গঞ্জের বাবু ভূইঞাবা
এবার আর ইলিশ মাছ ও ফজলী আম মুখে দিতে পারে না।

আসে কত চাই? দুই টেহা? নামাইয়া খোও মাঝির পো, আট আনা
ইলিশ দু'টাকায় কিনে নিয়ে যায় চরবল্লাব এক চাবী। পঞ্চাশ টাকার পাট
তিনশ' টাকায় বেচে হাত ভাঁও কবকরে নোট পেয়েছে আজকেব হাটে। আট
আনার ইলিশ দু'টাকায় খাবে তাতে আর হয়েছে কি? ক্ষেতে ফু বছর সোনা
ক'ন' ব। আনন্দে খাবে ঘুমাতে গান গাইবে। চাষের কলাকৌশল যখন জানা
আছে তখন আর ভাবনার কি? টাকায় চারটে দরের ফজলী আম দু'টাকা
দেখ তিনটে কিনে নিয়ে যায় আর একজন। হৃদয়ে রঙের বাছাই মাথায়
গঞ্জের এক বাবুশায় দব কথাকায় করে দাঁড়িয়েছিলেন।

ব'ন ঘান। হাঁড় ভর্তি মিঠাই মণ্ডা এক একজন চাবীর হাতে।
সাবারে কারো সাবা নেই পাট-চাবীর নজব বাচিয়ে কোন জিনিষ
কিনে ঘান।

আলস্য করনে সামনেব সন আর বান বুধুম না মিজা, একতাড়া নোট
গুণ ও গুণ.ও মস্তব) ক'ব একজন আর একজনকে লক্ষ্য কবে। সকলেব
খেং হাসিমুখ কাঁড়ি কাঁড়ি কাপড়-চোপড় আব ষাটসামগী কিনে ডিকি
ভাগ্যে দেখে ম'নব স্তখে। সারি গায়—চলে বঙ তামাস।

চরবল্লাব আব চবফুটনগবে চলে মিতালী। ধলেশ্বরী স্মৃতিকা কুগিলীব
ম এহঁ নিজীব না আছে শ্রোত না উচ্ছ্বাস। সন্ন এক কালি কপালী জরিব
দে ও খেন এঁকে বেকে চলেছে আপন খেয়ালে। হাঁটা পথেই পাবাপার চলে।
চবল্লাব মাষ্টর আসে চবফুটনগবে। চরফুটনগবেব মাষ্টর যায় চরবল্লাব।
হেমনস্ত জলে টান এবলেই ছোটবা একটু একটু করে পা ফেলতে শুরু করে।
গামছ বা লুঙ্গিখানা মাথায় জড়িয়ে দিবি্য পাব হয়ে যায়। বর্ষার ধলেশ্বরী
বিমাতার মতোই এতদিন ওদেব দুঁরে রেখেছিল। ডিকি বেয়ে ষাভান্নাত সব
সময় সম্ভবপর ছিল না। স্ত্রীষোগের অভাবে অনেক সময় মনের বাসনা চাপতে
হয়ছে। এবাব রাকুসী শায়ের্তা হয়েছে। ছোবল মারা তো দুঁরের কথা পাশ
ফিরবার ক্ষমতাও এখন নেই

ডান পা'টা কিছুদিন থেকেই কনকন করতে শুরু করেছে পলানের। গঞ্জের ভোলা কবুজের ওষুধে এক গাদা চাকা নষ্টই হয়েছে কেবল। ফল কিছুই হয়নি। পা'টার জন্ম দিন দিন বড় ভাবনাই হচ্ছে পলানের। বেঁচে থেকেও খোঁড়া হয়ে থাকবে নাকি ও! কাজের বল যতই থাক—পায়ের বল না থাকলে চাবার চলে কি করে।...করিম ফকিরের তো বাড়ফুঁকের স্থখ্যাতিব অন্ত নেই, গেলে হয় না একদিন? সাকিনা তো অনেক দিন থেকেই ওষুধ ছেড়ে ফকিরের শরনাপন্ন হতে বলছে। সেই ভাল, যাওয়াই যাবে একদিন, হুকো টানতে টানতে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল পলান।

সাকিনা মাস কলাই ফোটারানো একবাটি গরম সরসের তেল হাতে নিয়ে কাছে এসে বসে। আন্তে আন্তে মালিশ শুরু করে। একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে, কত দূর ছাশের মানুষ আইসা বালো হইয়া যাইবার নৈচে। আর তুমি কাচের খনে কাচে তাই যাইবার পার না?

পলান নিজের গরজেই যাবে বলে স্থির করেছিল। বউয়ের কথায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। হেসে হেসেই সম্মতি জানায়, তা তোমরা হগলেই যখন কইবার নৈচ তখন যামুনে একদিন ফকিরের কাছে।

সাকিনা খশী হয়। তাইতো, পুরুষ মানুষের ডান পায়ের বল। সেই ডান পা-ই যদি না রইলো তবে কাজকর্ম করবে কি দিয়ে? পলানের সম্মতিতে সোৎসাহেই জবাব দেয়, হ হ, তাই যাও। মিচামিচ আব দেবি কইরা কাম নাই। কাইল বিহানেই যাও।

পলান পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। স্বষোদয়ের আগেই চরফুট-নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শুনেছে, সকাল আর সন্ধ্যা বেলাই বাড়ফুঁকের উপযুক্ত সময়। কিছুটা অস্থবিধা হলেও তাই যায় পলান। পীর পয়গম্বরের কাছে যেতে হলে শুধু হাতে যেতে নেই। গতকাল বিকলেই একটা বড় তরমুজ ক্ষেত থেকে উঠিয়ে রেখেছে। বেশ বড়। পাঁচ সাত সেরের কম হবে না। কাটলে যেমন টুকটুকে রং তেমন মিষ্টি হবে। চতুর্থ পুত্র ফজলুলকে সঙ্গে নিয়ে চল। খোঁড়া পায়ের এত বড় তরমুজ বয়ে চলা সম্ভবপর নয়। ফজলুলই একটা ধামায় করে তরমুজটা নিয়ে চলে। পীর পয়গম্বরের কাছে আবার শুধু ফলও দিতে নেই। সঙ্গে মিষ্টি দিতে হয়। নয়তো কোন কলই পাওয়া যায় না। দিন কয়েক আগে নতুন আখের গুড় তৈরী হয়েছে। এক কলসী গুড়ও সঙ্গে দেয় সাকিনা।

সকালে দাওয়ার ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল করিম। মিতা দীহুও পাশেই বসে। চাষবাসের কথাই হচ্ছিল উভয়ের মধ্যে। আর কিছুটা বেলা হলেই পাস্তা খেয়ে মাঠে যাবে। পাটের নিড়ানি চলেছে। হুঁকোটা দীহুর হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বিস্ময়বোধ করে কবিম, ক্ষেতের আল ধবে ও পলান ব্যাপারী আসচে না!

হ, ব্যাপারী সাব্-ই তো!—দীহুও বিস্ময় জানায়।

আজ ক'বছর হলো ওবা চবে এসেছে। যৎসামান্য চাষাবাদ করে কিঞ্চিৎ সুখের মুখও দেখেছে। কিন্তু পলান ব্যাপারীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পাবে না। আট-দশখানা হাল পলানের বাড়িতে। তা ছাড়া আছে ধান চালের কাববাব। বড় বড় দু'টো গস্তি নোকোও আছে। হাজার মণ ধান ধবে এক-একটায়। হাটে বাজাবে অনেকদিন দেখা হয়েছে পলান ব্যাপারীর সঙ্গে। সৌভাগ্যশালী পুরুষকে দেখে মনে শ্রদ্ধাও জানিয়েছে উভয়ে। কিন্তু কখনো বাক্যালাপ করতে সাহস পায়নি। ভিন্ গায়ের মাহুঘ তাতে বড় লোক। ডেকে কথা না বললে কথা বলে কোন সাহসে?...পলান যতই ফকির বাড়ির দিকে এগিয়ে আস'ত ততই যেন ওরা হতবাক হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পলানের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা নেই। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা এসে ফকির বাড়ির উঠানে দাঁড়ায়। আগে থেকেই সহাস্তে আদাব জানায় করিম-দীহুকে। সাধারণ একখানা লুঙ্গি পরনে। কাঁধে ওপর আধ-ময়লা আর একখানা ঢাকাই চাদর খোপানো। গায়েব বং নিকম কালো। যেন তেল চোয়াচ্ছে সারা গা বেয়ে। মাথায় বেতের টুপি।

দীহু-করিমও যুগপৎ আদাব জানিয়ে খতমত খেয়ে যায়। এত বড় মাহুঘ, কোথায় কিসের ওপর বসতে দেবে ভেবে পায় না। কবিম একটা মাহুরের জুতা ভেতর বাড়ির উদ্দেশ্যে ডাক হাঁক শুরু করে।

পলান বাধা দেয়, আরে খাউক। মাহুরের কাম কি? মাটিই খাটি। খপ করে দাওয়ার ওপরেই বসতে যায়। ডান পায়ে টান লাগে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে।

করিম সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করে, কি অইল ব্যাপারী সাব্?

আর কন ক্যান্। এই পাওয়ার লাইগাই ত আপনার ঠাই আইলাম। বাতে ধরচে।

করিম উত্তর দেবার আগে দীহুই আলসের আঙনে নতুন করে তামাক

সেজে পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মস্তব্য করে, ওয়ার পাইগা কচু ভাবনার নাই। ককিয়ের পো'ব এক ফুঁ, কোথায় ছুইটা ঘাইব বাত টাত।...

হ হ, আল্লার কাছে তাই কন। একটা ফুঁতেই ধ্যান ভূত পলায়। অমাবইস্তায় পূন্নিমায় বড় কষ্ট পাই।

করিম জিজ্ঞাসা করে, বাসি মুখ ধুইয়া আইচেন নাকি ?

হ, নাকে মুখে ত জল দিচিই।

তাইলে কাইল বিহানে একবার না ধুইয়া আইবেন। খোদাব দোয়া হইলে তিন ফুঁর বেশী চাইব ফুঁ লাগব না। খান, তামুক খান। তরমুজটা তো বড় লববব আনচেন ?

হ, খোদাব দোয়ায় ইবার ফলন খুব জোবই হইচে। শ'চাবি বেচলাম ই পয়ষষ্ঠ। আব শতাবিদি অইব ক্ষ্যাতে আছে। ভাললাম পীবের কাছে যামু—খালি হাতে ঘাই কি কইবা। তাই এই গুড়-টুকুন আর তবমুজ্জা লইয়া আইলাম। দাওয়াত দিয়েন আসনের কাছে। বয়বে বাজান বয়। খাড়ইয়া রইলি ক্যান ?—ফজলুল ধামাটা উঠানের ওপব নামিয়ে বেগে দাঁড়িয়েছিল। ওকে বসতে বলে জোবে জোরে ছকো টানতে থাকে পলান।

ফজলুলকে এতক্ষণ বসতে না বসায় করিম লজ্জাই পায়। তাডাতাড়ি নিজের ভুল শোধরাতে চেষ্টা করে, ইদিকে এই ছেওয়াব মজি আইস' বস বাপ। আহা-হা চখ মুখে ধ্যান কালি ছড়াইয়া দিচে, কামডা বালো কবেন নাই ব্যাপাবী দাব। পোলা-পানরে দিয়া কি এত বড় মোট বয়ায় ? ই গা আপনাব-

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান উত্তর করে, আমার চতুর্থ ছাওয়াল ফজলুল। হে হে হে—, ফুরুক ফুরুক শব্দে ছকো টানতে থাকে আবার।

তাই কন। আয় বাজান আয়। এইখানে আইসা বয়।

ফজলুল ইন্ধিত মতো কাছে গিয়ে বসলে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে করিম। হাসিমুখেই অস্তঃপূরের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে, কইরে বিটি, কয়েক খিলি পান দিয়া যা। ব্যাপারী সাব, আইজ পবথম দিন আপনাগ পায়ের ধূলা পড়ল। কি দিয়া আব খাতির করম ! দুইজ ছাত্তু মুড়ি দেই ?

না না, আপনি অ্যাত উতালা অইবার নৈচেন ক্যান ? কপালের ফায়র না কাটলে কি আব আপনাগ মতন মাইনষের দেখা পাওয়ন যায় ? কতদিন খেইকাই ত ভাবচিলাম, আপনাগ চরে আহি। কিন্তু তা আর অইল কই !

ছাত্তু মুড়ি লাগব না। দয়া কইরা আমার পাওভারে সারাইয়া ছান। তাইলেই আমি আপনার বান্দা অইয়া থাকুম, বিনীতভাবেই প্রত্যুত্তর করে পলান।

তোবা তোবা। খোদাব দোয়া মাগেন। আমি কেডা? আমি 'ত' ভাব নকর।

আপনেইত আমার লাইগা তেনার কাচে নাশিশ করবেন। আমবা পাঙ্গী তাপি মাহুম কি আর তেনাবে ডাকবার পারি?

কন কি ব্যাপ্যাবী সাব। পরান খুইলা দীন দয়ালবে ডাকবেন হার আনাব কথা কি।

হ ও ব্যাপ্যাবী সাব. আহেন না একদিন সন্দা বেলা, ফকিবের পো'র মুখে গান হনবেন। দয়াল চানবে এমুন কইরা ডাকে যে পরান আপনার খেইকাঠ মোচড় দিয়া ওঠে, দীলু সায দেয়।

বৈবাগীব পো'বে চিনলেন নি ব্যাপ্যাবী সাব?—দীলুকে দেখিয়ে পুনবার জিজ্ঞেস ক'ব কবিম।

আবে কি যান কন। ওনাবে ই মুলুকে কেডা না চিনে। হগল (সকল) লাকেব মুখেই না ওনাব নাম। ই তল্লাটে ওনার মতন কলাই ফলাইবাব পাবচে কেডা? চবে এ্যান্দি আহি নাই বইলা কি গুণী মাইনযের খোদা খববও বাকি না?

কি যান কন। আপনার নখের যুগিয়া মাহুমও আমরা নই। পলান ব্যাপ্যাবীব নাম সাত গায়েব কেডা না জানে? দীলু অধিকতব বদান্ততা জানায়।

পলান উত্তবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—মেহেবা একখানি বেকাবিতে কবে কয়েক খিলি পান নিয়ে প্রবেশ করে। মুখের কথা মুখেই থেকে যায় পলানেব। মেহেবাব রূপ দেখে ছ'চোখ বিশ্বয়ে কেটে পড়ে। বছব দশ বার বয়স মেহেবাব। নিচৌল স্বাস্থ্য। গায়েব বং উজ্জল গৌরবর্ষ।

মনে মনেই ভাবতে থাকে পলান, আল্লা আমাকে অনেকগুলো ছেলে দিয়েছেন। কিন্তু এরকম ফুটফুটে মেয়ে একটিও দেননি। ফকিব সাহেব যদি দিতেন আমাকে এই মেয়েটিকে...

মেহেবা কাছে এলে করিম অভ্যর্থনা জানায়, ব্যাপ্যাবী সাব, পান খান। এই আমাব বেটি।

বাইচা থাউক, বাইচা থাউক। আপনি ও আসমানের চান কোলে পাইচেন ফকিব সাব।

মেহেরা রেকাবি রেখে ততক্ষণে পালিয়েছে। দীলু স্বযোগ বুঝে পলানের কথার জবাব দেয়, আসমানের চানরে আপনার ঘরে লইয়া যান না ?

কি ধ্যান্ কন্ ! ফকির সাব কি আমার কালা পোলার লগে ছাদের মতন ম্যায়া (মেয়ের) সাদী দিব ? ফজলুর ত আমার সাদী অইয়া গেচে। এহন বাকী কাশেমের। কাশেমের গায়ের রং ত না যান আলকাত্তর।

বেটা ছাওয়ালের আবার গায়ের রং দিয়া কি অইব ? চরিত্রের বালো রাইখা গতর খাটাইবার পারলেই অয় (হয়), উত্তর করে দীলু।

তা যদি কন তাইলে নিজের পোলার স্থখ্যাতিই ককম। চায় আবাদ ত এহন কাশেমই আছে। আর স্বথাব চরিত্রের কথ' মাইনঘেব জিগাইলেই পারবেন।

মাইনঘেবের আর জিগান লাগব না। আপনাব ঘরের পোলাপান বালো অইব না ত কার ঘরের পোলাপান বালো অইব ? এহন কথা জান, আসমানের চান আপনি ঘরে নিবেন কি না ?

ফকির সাব কি কন ?—দীলুকে পাশ কাটিয়ে কবিমকে জিজ্ঞেস করে পলান।

ইত আমার নচিবের কতা। আপনার ঘরে যদি মেহেবা ঘাইবার পারে তার খনে (থেকে) আর আনন্দের কি অইবার পারব ? দর দরজার ফ্যারে (ক্ষেত্রে) পইড়া তিমসিম খাইবার নৈচি তাই। নইলে কি আব আমাগ সব ঘরে এত বড় শায়না ম্যায়া থাকে ?

পলান খুশীতে ডগমগ। সোৎসাছেই বাধা দেয়, আল্লায় অরে আমার লাইগাই রাখচে ফকির সাব। বাড়ি গিয়া ফজলুর মারে কইগা। আম্মাজানরে নিজে আইয়া একবার দেইখা যাউক।

পোলার সাদী যহন তহন ত আপনেই কতা। আপনে কথা দিয়া যান, দীলু বাধা দেয়।

ঘাবলান ক্যান মোড়লের পো ? ই ম্যায়া দেখলে পোলার মায় আর না কইবার পারব না। কাশেম হারু (তার) আতুইরা গোপাল। টুক টুইকা বউ চাই হারু। মেহেরা মারে দেখলে পাগল অইয়া যাইব। আইজ তাইলে উঠি। কাইল বিহানে বাহি মুয়ে আলম (আসব)। পলান উঠে দাঁড়ায়।

তুইডা কিছু মুয়ে দিয়া গেলে খুশী হইতাম, বাধা দেয় কবিম।

পোলার সাদী অইলে ত রোজই আলম কুটুম বাড়ি, তহন যত পারেন

খাওয়াইয়েন। ঘুম খেইকা উইঠাই চইলা আইচি। হকালের (সকালের) কাম
কাইজ কিছুই অন্ন নাই। এহন কিছু মুকে দিবার পারুম না, পলান উত্তব কবে।

তাইলে বাপজান কিছু খাইব, পুনরায় আন্ধার কবে কবিম।

আইছা, দেন অরে আপনার ষা মন চায়।

করিম ফজলুলকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। দীন্তু আব এক কল্কে
তামাক সেজে পলানেব হাতে দেয়।

গোটা কয়েক টান দিয়ে মস্তব্য করে পলান, হ, তামুক বত দিবেন আমার না
নাই। তামুক না অইলে এক দণ্ডও চলে না আমার।

আর কন কাবে? আমারও ঐ কতা। তামুকেই বুদ্ধি খোলে তামুকেই
স্বপ্ন শক্তি জোয়ায়। খান, বালো মতিহাবী পাতায় তৈয়াব।

করিম দীন্তু অনেকটা পথ পলানকে এগিয়ে দিয়ে আসে। ফিরতি পথে দীন্তু
উচ্ছ্বাস জানায়, ভাই সাব, মা লক্ষীর রুপায় সবই এখন আপনাব খেইকা অইবার
নৈচে। ব্যাপারী সাব তো বাড়ি বইয়া আইহাই মেহেবা মাবে নিবার চাইল।
আর ভাবনার কিছু নাই।

সব কাম আগে মিটা ষাউক তারপর কইও। খোদাব মর্জি বোজন
যাষ না।

তুমি দিন রাইত কয়াল চানরে ডাক। দায়ল চান তোমার অমুজল করবাব
পাবে না।

জানে হুয়াল। এহন মেহেরাব মার কি মত হাজাও ছাহ।

মেহেরার মাই সাদীর কতা ছনলে (শুনলে) খুশীই অইব।

তবু ছার মত লওয়ন লাগব। ম্যায়ার সাদীব চিন্তায় ত ছার চক্ষে
ঘুম নাই।

হ, সব ম্যায়া মাইনুযেরই ঐ এক কতা। নিশার মাও পোলার বিদ্যার লাইগা
উতালা অইচে। দিন রাইত ঘ্যানর ঘ্যানরের কামাই নাই।

তা ভুবন বিশ্বাসের ম্যায়ার লগে না কাম ঠিক অইয়াই আছে। ছাও না
সাদী দিয়া?

না, অত দূর ছাশে ফুটুম বাড়ি করুম না। কেডা খাইব পন্নার পারে?

পোলার সাদী দিয়া বউ ঘরে আনবা ছার আবার দূর ছাশে কি করব?

হ, দেখি। একটা কিচু করন লাগবই। বেলা অইল, আমিও বাড়ি বাই।
আর এক ছিলুম তামুক খাইবা না? নও, তোমার ছামনেই মেহেরাব মার
কাছে কথাটা পারি।

তবে নও।—দুই মিতায় গল্পে গল্পে পুনরায় এসে দাঁওয়ার ওপর বসে।
তামাক টানতে টানতে কতিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ে দীন্ত। কতিমা
আশাতীত গশী হয়। পলান ব্যাপারীর ঐশ্বৰ্যের কথা তার কানেও গেছে।
স্নখেই থাকবে মেহেরা। পুন্স মাস্তমের গায়ের বংকে ও গাহ করে না।
বড় মধুময় মনে হয় আজকের এই সকাল।

॥ ৭ ॥

পলান বাড়ি কিরলে সাকিনা ছুটে এসে প্রশ্ন করে, কি কইল ককির সাব?
পাওজা বালো অইব ত?

পলানের চোখে বোধ হয় এখনো মায়্যা কাজল লেগে রয়েছে। সাকিনার
প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আপন খেয়ালেই জিজ্ঞেস করে, ছোট পোলার
সাদী দিবা নাকি কজলুর মা?

রাগে সাকিনার সর্বাঙ্গ জলে ওঠে। কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর করে, তুমি
তাইলে ফকিবের কাছে যাও নাই!

আরে যামু না ক্যান? হেইখান খেইকাই ত আইলাম। হাসতে হাসতেই
জবাব দেয় পলান।

যদি হেইখান খেইকাই আইছা থাক তবে কইল কি ককির সাব আগে
তাই কও!

বাহি মুকে ষাইবার কৈচে কইল। তিন ফুর বেশী নাকি চাইর ফু
লাগব না।

আল্লাম করক তাই য্যান অয়। আমি পাঁচ টেহার শিলী দিমু।

তুমি ইরা খোও—পাও আমার বালো অইয়াই গেচে। ককিরের কি আর
আমার পাও বালো কইরা না দিয়া উপায় আচে? নিজের গরজেই দিব নে।

ক্যান, ই কতা কও যে?

তোমারে ত কইলাম, পোলার সাদী দিবা নাকি। বউ পাইবা না ত য্যান
আসমানের চান পাইবা।

হ, তুমিত তিন পোলাব বউই আমাবে আসমানের চান আইনা দিচ।
তোমার কতায় আমি আব কাশেমের সাদী দিমু না।

আবে তাইত কই, কাইল বিহানে নও না আমাব লগে। নিজেব চক্ষেই
দেইখা আইছ (এসো)।

ফকিব সাবাব ম্যায়া আচে নাকি ?

ম্যায়া থাকব না তবে কি পোলাব লগে সাদীব কথা কইবার নৈচি নাকি
আমি ? ম্যায়া ত না যান আসমানের চান। ৬.দব মতন বং। এহন তোমাব
কাল মানিকেব লগে হাব। সাদী দেয কিনা তাই ছাহ।

না দেয না দেউক কাশেমও আমাব ফালিাব না। গায়ে গভবে
সোবাব দেখাত।

নিজেব পোলাব বউই নিজ কইব না। দশ জ্বনে কইলে তবেই
গাল।

কা, কেবা আমাব কাশেমবে মোন্দ কয় জনি ?

না, তোমার পোলা হীবাব টকবা।

হীবাব টকরা না অব না অইল বাইচা থাকল এমনেই কত আসমানের
চান আইচা গভাগডি যাইব

আবে বাগ কব কান ফকিব সাব ত তোমাব কাল মানিকেব লগে হাব
ম্যায়াব সাদীব কতা নিজেব পেইকাই কইল।

তাই কও। তুমি নিজেব চক্ষে দেখচ নাকি ম্যায়া ?

দেখচি না। না দেখলে তোমাবে এত কইবা কইবাব নৈচি কেমন কইরা ?

তবে ঠিক কইবা ফাল।

তুমি দেখবা না ?

কি যান কও। কটম নাডি ম্যায়া মাইনমে কোনদিন আগে যাব নাহি
না কি) ?

দেইখ, পাচে যান আমাবে গাইল মোন্দ কইব না। আমি কইলাম কাইলই
পাকা কতা দিষা আন্তম।

তোমাব পোলাব সাদী তুমি পাকা কতা দিবা না ত গায়েব নোক আইচা
দিব নাকি ?

হ, এহন বালো ম্যায়াব কতা ছইনা বুজি আমাব পোলা অইল।

আইছা, না অঘ আমার একলার পোলাই। এহন খোদাব দোয়র তোমাব

পাওজা সারলেই বাঁচি। নাচতা বাড়া ঠৈ চে। যাও, হাত পায়ে জল দিয়া আহ, কথার মোড় ঘুরিয়ে সাকিনা হেঁশেলেব দিকে রওনা হয়।

খিদেয় পলানের পেটও চৌ চৌ করছে। বদনীর পানিতে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পেতে বসে।

কবিম ককিরের কেরামতিতেই হোক কিংবা পূর্ব ব্যবহৃত কোন ওষুধের গুণেই হোক—পলানের পায়ের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। দিন তিনেকের ঝাড় ফুঁতেই পায়ের কনকনানি একরকম নেই বললেই হয়। বোয়াল মাছ আর কলাইয়ের ডাল খেতে নিষেধ কবেছে কবিম। অথচ এ দুটোই পলানের প্রিয় খাওয়া। তা হোক, খাবে না বোয়াল মাছ আব কলাইয়ের ডাল। পা সাবলে ঢুনিয়ায় খাবার জিনিষের অভাব নেই। কত ভাল ভাল খাবার রয়েছে।

তিনদিন সমানে যাতায়াতের পর কুরিমও একদিন আসে পলানের বাড়ি। মিতা দীল্লকে সঙ্গে কবেই আসে পলানের ঘববাড়ি দেখে ছুঁচোখ বিস্ময়ে ভাবে ওঠে ছ'ভনাব। গোয়াল ভর্তি গব বাছুর। সাববন্দী টেউ টিনের দর চারদিকে। বাব বাড়ি আব ভেতব বাড়িতে মস্ত বড় উঠোন। বাড়ি থেকে নেমেই ধু ধু কবেছে অনন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বাড়ি নয়তো যেন এক ফলস্ত বাগিচা। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ থেকে আবস্ত করে যাবতীয় ফলফুলের বিস্তৃত সমাবেশ। কবিম আপন মনেই ভাবে, মেহেবা যদি এ বাড়িব বউ হয়ে আসতে পাবে তবে সেটা ওর পরম সৌভাগ্য।

পলান একবকম জোব করেই বাঁচি ভর্তি ছুধ, মুড়ি ও পাঁচ সাতটা করে বড় মর্তমান কলা উভয়কে খাইয়ে দেয়। সাকিনা আড়াল থেকে দেখে ককির সাবকে - কাঁচা পাকা গৌফ দাড়ী মুখ ভর্তি। আলখাল্লার মতো ঢোলা সাদা পাঞ্জাবী গায়ের। পরনে সাদা লুঙ্গি। অত্যন্ত সাদাসিধে। ইঁা, এ রকম বাপের মেয়ে মর্সী না হয়ে যায় না। বেশ লম্বা চওড়া মানুষটা। কাশেমের বিয়ে এঁর মেয়েব সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে। সাদী পাকা করতেই মত দেয় সাকিনা। দিন পনেরো পরেই ধুমধাম।

আসমানের ঠাঁদ ঘরে আনে সাকিনা। চরখাল্লার মুখে মুখে মেহেরার রূপের প্রশংসা। হায়-আকসোসই করে অনেকে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল এতকাল? এতদিন তো কারো নজরেই পড়েনি। ভাগ্যানেরই ভাগ্য

গোলে। তবে এই মেয়ের সঙ্গে কি আর ঐ কলে-মানিককে মানায়? শুধু পয়সা দেখেই মেয়ের সাদী দিয়েছেন ফকির সাব।

বছর বারো বয়েস কাশেমের—বেশ গ্যাট্টাগোটা চেহারা। দোষের মধ্যে শুধু আবলুস কার্টের মতো রং। পাথুরে গোপাল বেন। বছর দুই গঞ্জের পাঠশালায় যাতায়াত করেছে কাশেম। সাকিনার ইচ্ছে, ছেলেদের মধ্যে অণ্ড কেউ লেখাপড়া না করলেও কাশেম অন্ততঃ কিছু শিখুক। কেউ যে কোরান গানও পড়তে পারে না! ওর বড়দা কত স্বন্দর করে পড়ে।...

বছর দুইয়ের চেষ্টায় অক্ষর পরিচয় হয় কাশেমের। খিত্তিয়ে খিত্তিয়ে চাপার অক্ষরবেব কিছু কিছু পড়তেও পারে। মোটামুটি লিখতেও পারে বড় বড় কবে। মিজ্বেব নাম—বাড়ির ঠিকানা—ভাই বেরাদারদের নাম। কিন্তু সাকিনাব পক্ষে আর বেশী দিন ধৈর্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ঐ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে তো আর কারো গোলামী করতে যাবে না কাশেম। কোবানখানা যখন পড়তে পারে তখন মিছিমিছি দৌড়ঝাপ করে লাভ নেই। বোজ় রোজ় নৌকোয় করে গঞ্জে যাওয়া সোজ়া কথা নয়। তাছাড়া ঝড় বাদল খবায় কষ্ট কি কম হয়? এক ফোটা ছেলে সোজ়া পরিশ্রম করেনি। দ'বছর সমানে টানা-হেচড়া করেছে। সকাল দশটায় ডিক্সিতে উঠেছে আর ফিরেছে সেই সূর্যি ডোবে ডোবে। মুখখানা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠতো। কাজ় নেই আমার বেশী লেখাপড়া শিখে। শেষটায় কি বাছা আমার মরবে?... পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কাশেমের। দিনকয়েক ওকে বন্ধু-বান্ধবদের জগ্ন মন-মর' হয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টায় নতুন করে উৎসাহ এসেছিল। কিন্তু অঙ্কুরেই ছাই চাপা পড়ল। কাশেম এখন দাদাদের সঙ্গে মার্চেই যায়। চাষ আবাদের কাজেই চলে নতুন করে হাতখড়ি। দিন কয়েকেব মধ্যেই ভুলে যায় বই খাতাপত্রের কথা।

ওসমান আর গণি ধান চালের কারবার করে। বড় বড় ছুটো গন্ডি নৌকোয় চলে আমদানী রপ্তানীর কাজ। হাজার মণ ধান-চাল ধরে এক একটায়। পাঁচ ছ'জন করে দাঁড়ি মাঝি প্রতিটিতে। চোর ডাকাত সাদা সর্বদা গুঁতপেতেই আছে। বাগে পেলেই লুঠ করবে নয়তো ছিনিয়ে নেবে মূলধন। কিন্তু গণি ওসমানকে ঘায়েল করা সহজ কাজ নয়। গায়ে এক এক জনের অঙ্কুরের বল। তা ছাড়া আছে জোয়ান জোয়ান মাঝিমাল্লারা। সকলেই চরের মাহুশ—চেনাশুনো। নির্ভয়েই কাজ করে চলেছে উভয়ে। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন

বাড়ি থাকতে পারে। বাকী পাঁচ দিনই কাটে গস্তিতে। সেখানেই আহা—
 সেখানেই নিদ্রা। কেরামৎ আর কজলুল দেখে ক্ষেত খামারের কাজ।
 পলানও প্রত্যন্ত মাঠে আসে। বাতে পন্থু হবার আগ পর্যন্ত নিজে হাল ধরেছে।
 এখন আর তা পারে না। ছেলেদের কাজেরই তদারক কবে। দাঁড়িয়ে
 দাঁড়িয়ে হুকো খায়। ভুলচুক হলে শুধরে দেয় সকলকে। উপরি মজুরবাণ
 কেউ ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চাম আবাদ।
 লোকজন গরু বাছুরে সদাসর্বদা সরগরম।

ওসমান আর গণির বউ সংসারের কাজে সাহায্য করে সাকিনার। চাকব
 চাকরাণীতে মিলেও আছে আরো দশ বারো জন। কিন্তু হলে কি হবে চাকররা
 তো সকলেই ক্ষেত খামারের কাজে বাস্ত। ওদের দিয়ে সংসারের কুটোগাছও
 ভেঙে ছুঁথানা করানো যাবে না। উল্টো ওদের ভাত জল করতেই সকলকে
 হিমসিম খেতে হয়। এদিক থেকে মাত্র দুটো চাকরাণীই যা সাহায্য করে।
 ঘাট থেকে বয়ে বয়ে জল আনাই তো এক চঃসাধ্য কাজ। নদী ছাড় কোথাও
 একবিন্দু জল নেই। রান্না-খাওয়া থেকে হাত-মুখ ধোয়া সমস্ত কাঙ্কই হবে ঐ
 নদীর জল দিয়ে। তারপর আছে ধান, চাল, মুগ, মস্তুরি ঝেড়ে পুঁছে গোলায়
 তোলা। দৈনিকের রান্না নয়তো যেন এক মুসাকিরখানার কাজ। অষ্টগ্রহব টুকুন
 জলছেই। এছাড়া আছে মুড়ি ভাজা, ধান ভানা, ঘরদোরের কাজ। কাপড়-
 চোপড় ময়লা হলে তাও বাড়িতে সেক করেই ঘাটে গিয়ে কেচে আনতে হবে।
 সকাল সন্ধ্যা যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায় সাকিনা টেরই পায় না। গণির
 বউয়ের আবার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা কোলে। কাজ করবে কি ওদের
 সামলাতেই ও দক্ষারফা। ভাগিস ওসমানের বউয়ের কোন ছেলেপলে
 হয়নি। কজলুর বউ তো এখনো লায়েকই হয়নি। আমিনা আনোয়ারাব সঙ্গে
 ওকে দিয়েও কেবল ফাই-ফরমাসের কাজই চলে। এদিক থেকে দেখলে
 কাশেমের বউ ঘরে এসে স্ববিধেই হয়েছে। তবু তো ছ' মাস জল গড়িয়ে দিতে
 পারছে' বয়েস হয়েছে, এখন আর কত খাটবে ও ?...মেহেরার কাপের কথা
 চিন্তা না করেই ছোট পোলার বউ ঘরে আনে সাকিনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে
 আমিনা আর আনোয়ারাকে নিয়ে। মেহেরাকে দিয়ে সংসারের কোন কাজই
 ওরা করতে দেয় না। নিজেরাও অনেকটা চিলে দিয়েছে। বাপ-মা মরা পরের
 মেয়ে কিছু বলারও জো নেই। পলান তো নিজের ছেলেদের চেয়েও ভালবাসে
 আমিনা আনোয়ারাকে। দুই সম্পর্কের এক ভাই—মৃত্যুশয্যায় ঝপে দিয়ে গেছে

মনাথা মেয়েতুটোকে। বয়েস এই তো সবে একজনের নয় দশ আর একজনের সাত আট। মেহেরাকে পেয়ে খশী আর ধরে না ওদের। অষ্টপ্রহর মেহেরার তদারকেই আছে ছু'বোন। কি দিয়ে যে সাজাবে ভেবেই পায় না। কখনও বা মেদি বেটে চিত্রিয়ে। দ.চ্ছ হাত পায়ের নখ। খোঁপায় দিচ্ছে খোকা খোকা কাশ ফুল। কপালে কাচ পোকার টিপ। মেহেরার মতো ভাবী সারা চরবল্লা খুঁজে কেউ বার করতে পারবে না। টুকটুক করছে গায়ের রং—বেলুনের মতো গাভ পা। কষ্ট হলেও সাকিনা কিছু বলে না। ক'দিন আব! একটু লায়েক গেলে আপনা থেকেই পরদোরের কাজে লাগবে। দিন কয়েক স্থখ করে নিক।...

কাশেমের সাজগোজও একটু বেড়েছে। দিনের মধ্যে বাব চার পাচ সাবান ধবে গায়ে মুখে। কিছু কালো রং কালোই থেকে যায়, কোন কায়দা হয় না। 'শিশি গন্ধ তেল আনি.য়ছে গন্ধ থেকে। ঘাড় আর জুলফি বেয়ে চোম্বায় .তস চেড়ির বাহাব তুলতেও এক প্রহর সময় লাগে। গঞ্জের বাবু দুই ক্রানের ছেলেপুলের মতোই জামা জুতো পবতে শুরু করেছে। সাকিনা দেখে .দখে হাসে। চূপি চূপি এক ফাঁকে এসে পলানের সঙ্গে তামাসা হোড়ে, কিগ .পালাব বাপ, তোমার ছোট পোলা যে ক্ষাত খামারে যাওয়াই ভুইলা গেল ?

পলান ভবাব দেয়, দিন কতক বাড়িব ক্ষাতই চাষ করুক। হি আলা, আমাগ ।দন কাইল সব গোচে, ঘরের মধ্যে একা পেয়ে সাকিনাব কোমর জড়িয়ে ধরে।

দিন দুপুইরে বুইড়া মন্দার ঢং তাত। আরে ছাড়, ছাড়। গণির বউ আসচে, বিবক্তির সঙ্গেই ছু'হাত দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে সাকিনা।

গলান লাড়িতে হাত ব্লাতে ব্লাতেই ঘব থেকে বেরিয়ে যায়। স্থখের সংসার চারদিকে। প্রতাহ সঙ্কায় ফকির-বাড়ি যায়। দাওয়ান ওপর বসে পান তামাক খায়। স্থরে স্থর মিলিয়ে দয়াল চানরে ডাকে—

আয় না প্রেমের ঝড়লী বাইয়া ঘাই নতুন পুকুরে...

অধিনীর বিয়ে দিয়ে দীস্থও বউ ঘরে আনে। কুস্থমের পক্ষ একা একা আর সবদিকে ভাল দেওয়া সম্ভবপর নয়। লোক রেখেও পোষাবে না। সবে তো চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এখনো হালের বলদ কেনা হয়নি। সব জমি ভালভাবে চাষ করতে হলে কম করেও দু'জোড়া হাল চাই। বিয়ে দিয়ে

ছেলের বউ ঘরে আনাই সবদিক থেকে স্ত্রিবিধে। তাছাড়া অগ্নিনীর বয়েসও তো বেশ হয়েছে। বারো পার হয়ে তেরোয় পা দিল।

আট বছরের পার্বতী বউ হয়ে ঘরে আসে। খুব স্ত্রী না হলেও ফেলনার নয়। বেশ আঁটসাঁট চেহারা। লায়ক হলে সংসারের কাজে খাটতে পারবে। নিশির জন্তুও পেড়াপিড়ি করে দীঘ। দুই পোলার বিয়ে একসঙ্গে দিলে খরচায় বেশ স্ত্রিবিধে হয়। বাড়ি খরচা এক। শুধু গয়না আর কাপড়-জামাই যা আলাদা। করিমও সেই পরামর্শই দেয়। কিন্তু কুসুম কিছুতেই বাজী হয় না। এত অল্প বয়সে কোলের পোলার বিয়ে দিতে ওর মন নেই। বাপের বাড়ি ব দেশে রায়বাবুদের বাড়ি দেখেছে, কত ডাগব ডাগব ছেলেমেয়েবা লেখাপড়া করে। কি সুন্দর তাদের আচাব ব্যবহাব—মুখেব কথা। তোক না কেন চাষার পোলা, লেখাপড়া কবায় দোম কি? “লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই,” সেই লীলার মুখে এ কথা ও বহুবাব শুনেছে। লেখাপড়া শিখে নিশি যদি গাড়ি ঘোড়া নাও চড়তে পাবে, তবু তো ভাল কবে ৩টা কথা বলতে পারবে। ভত্রলোকের সঙ্গে চলাফেবা করতে পাবে ..এখন বিয়ে দিলে তো চাষার পোলা চাষাই থাকবে। বিয়েব পরে আবার কেউ লেখাপড়া কবতে পারে নাকি! না, কিছুতেই কুসুমকে রাজী করাতে পাবে না দীঘ।

স্রীং দেওয়া পুতুলই যেন পার্বতী। টুকটুকে একথানা লাল বংয়ের শাড়ী পরে শাশুড়ীর সঙ্গে এঘর ওঘর করে। ভাল কবে ধর সংসাবেব কাজ করতে না পারলেও ছোট ছোট ফাই-ফরমাসে আটকায় না। স্বামী কি বস্ত ভাল করে তা না বুঝলেও তাকে দেখে ঘোমটা টানতে হয় ওব। গুণজনদেব সকলকে দেখেই। পুতুল খেলার আনন্দে যে মেয়েটি দু'দিন আগেও ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে সে আজ ছককাটা পথে বন্দিনী। এ যেন বনের মুক্ত বিহঙ্গীকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে পথের হেরকের ভাল করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জাগতিক নিয়মে মা হয়েছে পার্বতী। সর্বশেষ ধলেশ্বরীর বাঁকের মতোই একটি স্ত্রিতিকা কগিণী। অবশ্য ভাগ্য যদি ওর ভাল হয় তাহলে সবল স্ত্রুও থেকে যেতে পাবে। দীঘব ঘরে তো আর এখন খাওয়া পরার অভাব নেই! মানুষ হিসেবেও সর্বত্র তাব স্ত্রুখ্যাতি। কুসুমের গুণপনারও তুলনা হয় না। পিতা ভুবন বিশ্বাস ঘর বর অপেক্ষা স্বস্তর শাশুড়ীকে দেখেই কণা সম্প্রদান করেছে। নয়তো কোথায় পদ্মার পাড় আর কোথায় চরফুটনগর। এত দূরদেশে থেকে কি আর কুটুম্বিতা রাখা যায়?...

চরফুটনগরের চর বেড়েই চলেছে। এখন আর দশ বিশ টাকা ঘুঘঘাস কিংবা কলা মূল্য দিয়ে জমি পত্তন পাবার উপায় নেই। স্বরং রমেন্দ্র নারায়ণের শনির দৃষ্টি পড়েছে চরের ওপর। যেখানে বিঘা মিলতো বিশ পঞ্চাশে সেখানে কাঠাই বিকোয় সত্তর একশো'তে। দিন দিন বিরাট এক জনপদ আকাবে গড়ে উঠছে চব। চর নয়তো যেন সাজানো বাগান। দক্ষিণাংশে একমাত্র করিম ফকিরই জাগছে। সে ছাড়া আরো কয়েক দর মুসলমান বাসিন্দা এসে আশ্রয় নিয়েছে ধলেশ্বরীর মুখে। চর যদি আরও কিছুটা জাগে এই তাদের ভরসা। আর ষা-ই হোক, ষোল আনা লাভ রমেন্দ্র নারায়ণের। জলে-ডোবা জমিই মোটা নজরানায় বিলি হয়ে যায়। আশায় আশায় দিন গুনেতে থাকে নতুন মানুষেরা। চাষ আবাদ নেই—বর-দোরও ওঠে না। শুধু দিন মজুর খেটে দিন গুজরানো। দাঁহু করিমের মতো ওরাও পলি ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশাহুযায়ী সফল হয় না। নদনদীর কাটাল এখন গঞ্জের দিকে। বর্ষীয় চরফুটনগবেব চব অনেকটা ডুবে গেলেও শ্রোতের বেগ মন্থর। যেন অবশ ওদের এ অঙ্গটি। আগের মত তেমন করে আর চরও ডোবে না পলিও দব' পড়ে না। যাদেব তৈরী জমি আছে তাদের এখন চাষ করে খুব সুখ। কিন্তু নতুন করে জমি তৈরীর কাজে এখন আব এগোবার উপায় নেই। আগন্তুকদের আশা আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আব পূরণ হয় না। রমেন্দ্র নারায়ণও সংশয়ে পড়েন। ক'বছর থেকে তার গ্রীনবোট নিয়মিত এসে খালের মুখে নোঙর ফেলেছে। বিলাস ব্যাসনের সঙ্গে চলে জমি পরখের কাজ। কোন কোন দিন বোটের ওপরেই বসে দরবার। সেখান থেকেই মোটা নজরানা নিয়ে বিলি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। মোসাহেবরা এসেও জড় হয় সকাল বিকেল। বিকেলেই আসর জমোভাল। সুখ অস্ত্র যায়-যায় ডেক চেয়ারে এসে বসেন প্রভু। পাত্র-মিত্ররা মোড়ার ওপর। বিশেষ লাভালাভের ব্যবস্থা থাকলে ছ'দশ মিনিটে হাতের কাজ চুকিয়ে নেন। নয়তো বিকেলে আর অমথা দেখা সাক্ষাৎ করে রসভঙ্গ করেন না।

বর্ষার নদনদী কানায় কানায় ফুলে ওঠে। রমেন্দ্র নারায়ণের মনেও জোয়ার জাগে। কোনদিন বা খিচুড়ী ইলিশ মাছ ভাজা, কোনদিন বা মাংস-পরোটা চপ কাটলেট। মেজাজ হলে ভাজাভুক্তিতেও আপত্তি নেই। সঙ্গে রস্তিন সরাপ। নিরামিষ গান বাজনাও চলে কোন কোন দিন। কেননা, বছর কয়েক ধরে হাত চাঁন যাচ্ছে বলে ঢাকা থেকে আর হরি বাঈ আসছে না। মনের কোনে বিরহ দেখা দিলে ছুপাত্র বেশী করে চড়িয়েই ভুলতে চেষ্টা করেন সে খেদ

তাতেও আগুন চাপা না পড়লে পার্শ্বচরদের সঙ্গে খিস্তি-খেউড়ে মেতেই সময় কাটান। হাল আমলে রামকান্ত ভট্টাচার্যই সেরা পারিষদ। কি জানি কেন, রামকান্তকে বড় ভাল লাগে রমেন্দ্র নারায়ণের। সে এলে হরি বাঈয়ের কথা বড় একটা মনেও হয় না। খোশ গল্প গল্পে বেশ মাতিয়ে রাখতে জানে লোকটা। চালাক চতুরও আছে বলক্ষণ। চব্বের খবরাখবরও পাওয়া যায় ওর কাছ থেকে। শুধু আড্ডা ফক্কড়িই করে না। আদায় উশিলেও সাহায্য করে।

ভাগ্যস্বধী রামকান্ত পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ভাসছিল। দীহুর আহ্বানে চরে এসে আশ্রয় নেয়। কলপুরোচিতের ছুঃখ-ছুঃখা সহিতে পারে না দীহু চরের বাসিন্দা বাড়ছে। পূজা আরটা করে যুখে স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারবে রামকান্ত। সহজ সবল মানুষ, সরলভাবেই আহ্বান জানায়। কারে পড়ে রামকান্তও সাড়া দেয়। অনাথাব অনাথাব থেকে রক্ষা পায়।

রামকান্তর পিতা রাম নারায়ণ ছিলেন কাশীপুরের কুলপুরোচিত। পাঁচশ' ধর নমশূত্র মন্ত্রশিষ্য। যজন যাজন অপেক্ষা ইষ্টমন্ত্র কানে দেওয়াই ছিল তাঁর রীতি। শিষ্যরাও গুরুজী বলতে অজ্ঞান। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাগবৎ পাঠ করতেন রাম নারায়ণ। শিষ্যরা গোল হয়ে বসে শুনতো। খোল বাজিয়ে কীর্তন করতো। সিদা-সামগ্রীতে চলতো গুরুজীব ভরণপোষণ। কি আর এমন খরচা? নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। দিনান্তে একবেলা ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন। চলতেনও সাদাসিধেভাবে। স্ত্রী সত্যবতী পাঁচ বছরের রামকান্তকে রেখেই স্বর্গে যান। দ্বিতীয়বার আর ঘর বাঁধবার ইচ্ছে হয়নি রাম নারায়ণের। রামকান্ত মাতুলালয়ে মানুষ হতে থাকে।

ভাগবৎ মহাভারত পাঠ করে—কীর্তন আর মহোৎসবাদি করে পরমানন্দে স্বর্গে যান রাম নারায়ণ। শিষ্যরা চাঁদা তুলে তাঁর সমাধির ওপর একটি তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। শ্রাদ্ধাদি পর্বও চলে বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। কাশীপুর গ্রাম সত্যি সত্যি একজন ধর্মগুরুকে হারালো। রাম নারায়ণের জন্ম আবাল বৃদ্ধ বগিতা অশ্রু বধন করে। শ্রদ্ধেয় গুরুজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকান্তকেই সকলে মিলে বসাতে চায় সেই শূণ্য আসনে। কিন্তু রামকান্ত নাচার। মাতুলালয়ে ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে সে। মোটে তো খার্ড ক্লাসের বিছা। তাও আবার ক্রমাগত তিনবার কেল। তবু, রামকান্ত কিছুতেই রাজী হয় না। যজন যাজন তার ধাতে সহিবে না। কিছুতেই পারবে না সে ধেই ধেই করে বাহ তুলে কীর্তনের মাঝে নাচতে। তুলসীর মালা পলায় দিয়ে গদ গদ ভাবে ভাগবৎ পাঠও

তার দ্বারা হবে না। শেখবার ফেল করে বড় মামার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় রামকান্ত। দিনকতক এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাজধানী কোলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। বয়েস তখন কম হবেও খোল সতেরো। কোলকাতায় থেকেই আজীবন ও ভাগ্যের সঙ্গে লড়বে। প্রয়োজন হয় জীবন েব। তবু গুরু পুরোহিত সেজে ভিক্ষাপাত্র ের নেবে না। না, কিছুতেই না।

আজব শহর কোলকাতা। কুযোব ব্যাঙ সাংগে এসে পড়েছে। বামকান্ত হালে পানি পায় না। চাকবিব ধান্দায় ঘুবে বেড়ায় যত্র তত্র। তৃতীয় শ্রেণীর বিগা নিয়ে বেশী দূর অগ্রসব হওয়াও দুঃসাপ্য। হাতেব পয়সা উজাড়। হোটেলের ভাত বন্ধ হয় হয়, অনেক উমেদাবিব পব ভাগ্যগুণে কোন এক চিত্রগৃহের— ‘গেট কিপাবের’ পদ জুটে যায়। মাস মাইনে পনেরো টাকা—দু’টাকা রাখা থবচ। বড় বাঁচা বেঁচে যায় রামকান্ত। দশ টাকায় খাওয়া থাকা—দু’টাকায় টাম বাস ভাড়া। বাকী পাঁচ টাকায় জামা জুতো জল খাবাব সব। খশী না হলেও একেবারে অখশী নয় ও। এখন কিছুদিন দম নিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাবে। অগ্রিম পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে নতুন বেশভূষাব ব্যবস্থা কবে কাজে লাগে। চেহাবাটি রামকান্তর স্ত্রীাম। মনেব শাস্তি ফিবে আসায় দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ ঐজ্জলা ফিবে আসে। মালিক খশীই হন ওব আচার ব্যবহারে। ভাবেন, হয়তো টিকে যাবে ছোকরা।

টিকে রামকান্ত নিশ্চয় যেতো কিন্তু ভাগ্যই ওব প্রতি বিরূপ। সেজেগুজে মেয়েরা আসে সিনেমা দেখতে। একা একাও আসে অনেকে। রামকান্তর দিকে কেউ হয়তো এক বলক চোখ তুলে তাকালে। কারো ঠোঁটে হয়তো বা হাসিই খেলে গেলো তড়িৎ রেখার মতো। রামকান্ত ভাবলে, মেয়েটি নিশ্চয় ওকে ভালবাসে। আর হবে না-ই বা কেন? দেখতে-শুনতে কি ও খারাপ? সিনেমা ভেঙে যায়। যারা তাকিয়েছিল তারা হয়তো জ্রক্ষেপ না করেই চলে যায়। কিন্তু রামকান্ত সোজা কথাটা বাকা ভাবে নিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। দিনে রাতে তিনবার শো। পারে তো রামকান্ত তিনবারই বেশভূষা পরিবর্তন করে। ঘন ঘন চুলে চিরুনি চালায়। রুমাল দিয়ে মুখ পৌছে।

একবার শনিবার রাজের শোতে যুগলে আসে রাতের রহস্যময়ী দুই তারকা। তেমন ভিড় নেই। রামকান্ত একাকী দাঁড়িয়ে টিকেট চেক করছিল। ফুজি সিন্ডের সার্ট গায়ে—পরনে কোঁচানো দিগি তাঁতেন ধুতি। পায়ে আগ্রার নাগরা।

দু'জনের একজন রামকান্তর হাতে টিকিট দিতে গিয়ে কিং করে হেসে ফেলে। আর কথা নেই। বলি বলি করেও এতদিন যে কথা ও কাকেও বলতে পারেনি আজ লাগাম-ছাড়া ভাবেই এগিয়ে যায়। প্রশ্ন কবে, হাসলেন যে ?

মেয়েটি গদগদভাবেই উত্তর দেয়, এমনিই।

এমনিই ! বেশ মজা তো !

কথা আর হয় না। শেষ ঘণ্টা বাজছে। শো আরম্ভের ভাব বাকী নেই। ওরা দু'জনে এক তলাতেই উচ্চাসনে গিয়ে বসে। রামকান্তর মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমায়।

অন্যদিন শো আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই মেসে ফিরে যায় রামকান্ত। কিন্তু সেদিন আর তা পারে না। ইন্টারভেল পড়ে। রামকান্ত মেয়ে দুটোর সিটের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আশপাশে লোক রয়েছে। কোন কথা হয় না। যতক্ষণ না আলো নেভে সূর্য আর সূর্যমুখীর মতো শুধুই চোখাচোখি চলে। পুনরায় শো আরম্ভ হলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় রামকান্ত কিন্তু প্রাণধানা পড়ে থাকে ঐ সীট দুটোব ওপর।

সিনেমা যথারীতি শেষ হয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে ওরা দু'জনও বেরিয়ে আসে। গুটি গুটি পা ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রামকান্তও পেছ পেছ। না, কোন পুরুষ সঙ্গী নেই। রাশিকৃত গহনা গায়ে। দেখতে স্তন্যভেদেও স্ত্রী। ভয়-ডর কিছু নেই নাকি প্রাণে। রাত তো প্রায় বারোটাই বাজতে চললো। বিস্মিত রামকান্ত অধিকতর বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আবাব এক বলক হাসি খেলে ওদের দু'জনের ঠোঁটে।

রামকান্ত আর ধৈর্য রাখতে পারেনা। ভিড় অনেকটা কমে গেছে। সোজানুজি গিয়ে প্রশ্ন করে, হাসছেন যে ?

হাসি পায় তাই হাসছি, ভনী মেয়েটি হেসে হেসেই জবাব দেয়।

হাসি কি লোকের শুধু শুধুই পায় ?

পেলে কি করবো বলুন, অপরটি উত্তর করে।

রামকান্ত কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। খানিক ইতস্ততঃ করে পুনরায় প্রশ্ন করে, দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি আসবে নাকি ? কথা তো ছিল কিন্তু এলো কই ?—ভনীটিই উত্তর দেয়।

পৌছে দেখো ?

তা হলে তো বেঁচে যাই।

ইঞ্জিত মাত্র ট্যান্সী এসে দাঁড়ায়। বামকান্ত ড্রাইভারের পাশে, ওরা দু'জন পেছনের সীটে।

কোথায় যাবেন?—পুনবায় প্রশ্ন কবে রামকান্ত।

তব্বীটি উত্তর করে, নয়! রাস্তায়—

নয়! রাস্তায়!—ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না রামকান্ত।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার সায় দেয়, হাম সমজ গিয়া বাবু সাব, চলিয়ে।

পরের ইতিহাস গতানুগতিক। মকাবাদি যজ্ঞে মশগুল রামকান্ত। সোনার অঙ্ক ঝলসে যায় বছব খানেকের মধ্যেই। মাইনের টাকা কর্পূরের মতো উবে যায়। ধার-কর্জ আবস্ত হয়। প্রথম প্রথম ইয়াব-বন্ধুদের কাছে। তারপর চাকর দাবোয়ানের কাছে। তাতেও যখন কুলোয় না আসে কাবুলওয়াল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেমন মালিকের নেকনজরে পড়েছিল রামকান্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তেমন তাব বিষ-নজবে পড়ে। অবস্থা চবমে ওঠে যেদিন কাবুলওয়াল সিনেমাগৃহে এসে হামলা শুরু কবে। মালিককে আর জবাব দিতে হয় না। বামকান্ত নিজেই একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে গা টাকা দিতে বাধ্য হয়।

উপোস দিয়ে মবা ছাড়া এযাত্রা আব গতান্তর নেই। তাই-ই মরতে হবে। বড আশা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিল। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেলো। গায়ে থাকলে আব যাই হোক দুমুঠো ভাতের অভাবে মবতে হতো না। কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া মানে তো লোক হাসানো। না, এত সহজে পরাজয় স্বীকার কববো না।...

সত্যি, বিধাতা বোধ হয় একেবারে বিমুখ ছিলেন না ওর ওপর। কেমন কবে যেন ঘুবতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয় আসামের এক চা বাগানে। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাগান-আপিসের করানী। বেতন সামান্য—কিছু উপরি আছে। রামকান্তর স্বজাতি। একমাত্র অনুচা কণা ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই মহেন্দ্রনাথের। দেশ পূর্ববঙ্গেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সে সব ধুয়ে মুছে গেছে অনেককাল। এখন বাগানই ঘরবাড়ি—বাগানই কর্মক্ষেত্র। মহেন্দ্রর ভাবনা অল্পাধাকে নিয়ে। বেশ সেয়ানা হয়েচে মেয়ে, এখন একান্ত প্রয়োজন পাত্রস্থ করা। কিন্তু আসামের জমিদার কোথায় বা পাত্র আর কোথায় বা তার খোঁজখবর? ঘুম থেকে উঠে সন্দর্ভ তো শুধু কুলিকামিনের সঙ্গে। বড় বড় সাহেব স্ববেদারদের জন্ত ক্লাব আছে—

আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। সেখানে সমপর্ষায়ের লোকের দেখা-সাক্ষাৎও মেলে। কিন্তু নিম্নপদস্থদের জগ্রে সে-সবের কোন বালাই নেই। তারা তো চকিশ ঘণ্টারই দাসখং লিখে দিয়ে বসে আছে। হাতে কাজ না থাকলেও ইচ্ছে মতো কোন দল পাকানো চলবে না। আসামের জঙ্গলে অহুরাধারা যেন নির্বাসিতা। কাজে ইস্তফা দিয়ে আসারও কোন উপায় নেই। এক আছে পোড়া পেটের ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ পদে পদে আইনের বাধা। চোখে মুখে অঙ্কার দেখে মহেন্দ্র। নিজের মৃত্যুর পর অহুরাধার কি উপায় হবে?...

কথায় আছে, যত মুশকিল তত আসান। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল মহেন্দ্র, সহসা বাগানে রামকান্তর আবির্ভাব হয়। আগেকাব সে জর্জোলুস না থাকলেও, এখনো রামকান্তকে বিনা দ্বিধায় স্পৃহকর্য বলা চলে। কথাবার্তায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। মহেন্দ্র হাতে আসমানের চাঁদ পায়। প্রথমে চাকুরী— তারপর কন্ঠা সম্প্রদান। মাস পাঁচেকের মধ্যেই একেবাবে মুক্ত মহেন্দ্র। মুক্ত সবারকম ভাবনা চিন্তা আর ভবযজ্ঞণা থেকে। ..

জোয়ান স্বামীব সান্নিধ্যে এসে পিতৃশোক ভুলতে বেশী দেবি হয় না অহুরাধার। স্ত্রী-বত্নের সঙ্গে রামকান্তর হাতে আসে মহেন্দ্রর আজীবনের সঙ্কয়। বড় সাহেবকে ধরে বাগানের একটি পদেও ওকে বহাল করে গেছে মহেন্দ্র। একযোগে কামিনী আর কাঞ্চন লাভ। বিপদ কাটিয়ে ওঠে বামকান্ত। বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই বাটতে থাকে দিন। বছব না ঘুরতে অহুরাধারও মাতৃ-অঙ্ক ভরে ওঠে। সতিয়া, ও আজ গরবিনী, মা হতে চলেছে। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ওঠের হাসি মেলাতে না মেলাতেই সহসা দুঃখের বান ডাকে। বিকলাঙ্গ এক মৃত সন্তান প্রসব করে অহুরাধা। নিটোল স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙতে থাকে। রামকান্তর গোলাপী নেশায়ও ভাটা পড়ে। সামনেই তো রয়েছে চা বাগানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পুতুলের মতোই আশ্চর্য সুন্দর ধাসিয়া মেয়েগুলো। টুকটুক করছে গায়ের রং। ধাত্তেখরীর আকর্ষণও বড় একটা কম নয়। উঃ, কতদিন গলা ভেজানো যায়নি। এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে এতদিন ও কি করে উপোস দিয়ে আছে!...বাঘ বৃড়ো হলেও খাপ ভোলে না। ওর তো নবযৌবন। রঙিন সুরা আর সাকী নিয়ে আবার মেতে ওঠে রামকান্ত। তারপর তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বছর ধানেরকের মধ্যেই অহুরাধার ডাক আসে মহেন্দ্রর পাশে। রামকান্ত বড় বাঁচা বেঁচে যায়।

অহুরাধা মরে বাঁচে আর রামকান্ত বেঁচে থেকে মরে। হিসেবের খাতার

বিরাট গোলমাল দেখা যায়। টমাস সাহেব তো রাগের মাথায় বুট সমেত এক বা লাথিই বসিয়ে দেয় বৃকের ওপর। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে রামকান্ত। তারপব অতিকষ্টে রাতের অন্ধকারে আবার একদিন গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবার আর অগ্নি কোথাও নয়। সোজাস্বজি স্বগ্রামে। পিতার শিষ্য সামন্তদের মাথায় পা তুলে দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়াই স্থির হয়। শহরে আর ওর ঠাই হবে না। স্বথের ব্যবসা গুরুগিবির ব্যবসা। তোয়াজের ওপর থাকো, ভুঁড়ি বাগিয়ে খাও দাও ঘুমোও। তবে নিরামিষ খেতে হবে এই যা দুখ্য। তা হোক, এ ছাড়া আর উপায় কি?...রামকান্ত শত নিরাশার মধ্যেও আশা নিয়েই গ্রামে আসে। কিন্তু এখাতে পা দিয়েই মুণ্ডে পড়ে। শিষ্য সামন্তদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিজেদের বসত বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। তারপর অনেক গোজখবরের পর দীহুর আকুল আহ্বানে চরণ রাখে এসে চরফুটনগরে।

চরফুটনগরে পা দিয়ে দিনকতক বড় মুশকিলেই পড়ে রামকান্ত। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ওকে হরি-সভায় বসতে হয়। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক সুর করে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে হয়। কীর্তনের সঙ্গে ছ'বাহু তুলে নাচতেও হয় কোন দিন। নিজের প্রেম ভক্তি থাক আর না-ই থাক ওর মুখে পাঠ কীর্তন শুনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা গদগদ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি আর উলুধ্বনিতে প্রাণগঙ্গা বয়ে চলে। প্রভুপাদের কঠমহিমায় সকলেই পঞ্চমুখ। রামকান্তকে আর চাল ডাল তেল হুনের জন্ম ভাবতে হয় না। কাজের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা পদ-রজ বিতরণ আর পাঠ কীর্তন করা। বাপের বয়সী শিষ্য হলেও তার মস্তকে পদ-রজ দানে বাধা নেই। পাদোদকও দিতে হয় অনেককে। ব্যবস্থা ভালই। তবে পুরোহিতগিরি অপেক্ষা গুরুগিরিতেই স্বথ বেশী। পুরোহিত-দের পূজা পাবনে তবু খানিকটা খাটা খাটুনি আছে। কিন্তু গুরুগিরিতে সে বালাই নেই। দিবিা খাও দাও ঘুমোও। চাই কি খুশি হলে ঘরের ঝি বউকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতেও বাধা নেই! গুরু ব্রাহ্মণ তো সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারা তো সৌভাগ্যেরই কথা। সময় সময় মাছ-মাংসের জন্ম প্রাণটা আঁকুপাঁকু করলেও চরফুটনগর রামকান্তর কাছে ভালই লাগে। মোড়ল দীহুই যখন সহায় তখন আর ভাবনার কিছু নেই। তবে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে কিছুটা মোহন্ত চরণ দাসকে নিয়ে। বেটা কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেয় না। স্বয়ং প্রেমদাতা নিত্যানন্দই ষেন

চরে এসেছেন। ঘর ঘর মন্ত্র শিষ্টাও বড় একটা কম করে কেলছে না। দীক্ষ বৈরাগীরও যেন ভাবের অন্ত নেই। একজন কুলগুরু, একজন দীক্ষা গুরু, একজন সখাগুরু। গুরুর বহর যেন। সব বেটাকে নিয়েই নাচানাচি। মোহস্তটাই দেখছি সব পণ্ড করবে।...স্থ থাকলেও রামকান্তব মনে স্বস্তি নেই। দিন দিন ভাবনা বেড়েই চলেছে।

রোজ সন্ধ্যায় রমেজ্ঞ নারায়ণ গ্রীনবোটের ছাদের ওপর ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানেন। কখনো বা সিগারেট। কাঁটা-চামচের সাহায্যে জলযোগও করেন কোন কোন দিন ছাদের ওপর বসেই। রামকান্ত দাণ্ডয়ার ওপর বসে সখেদে ভাবে, আহা কি রোশনাই সর্বান্দে! পোষাক আশাকেরই বা কি জৌলুস। কোথাও ছন্দপতন নেই। আজ যেটা পরেন কাল আর সেটা পরেন না। অকুরস্ত বিধির ভাণ্ডার যেন। আর হবে না-ই বা কেন? একে বিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক—তাতে আবার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। আমার মতো চাঁড়ালের বামুনকে আর ক'জন ভদ্রলোক পৌছে? চাঁড়াল আবার একটা জাত...তার আবার গুরুপুরোহিত। এখনো হাজার বছর ওদেব পায়ের তলায় বসে শিখতে হবে।...

প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ামিত পার্টে বসতে হয় রামকান্তকে। মন না বসলেও বসতে হয়। গলায় বিনাস্থতোয় গাঁথা তুলসীর মালা। বাতাসে ফরফর করে উড়তে থাকে টাচর চিকুর। তিলক চর্চিত দেহ। ধ্যানগম্ভীরভাবেই আসরে বসে থাকে রামকান্ত। কিঙ্ক মনের খাতে বইতে থাকে দিবা রাত্রির স্বপ্ন। খোলে চাটি পড়ে। কীর্তিনিয়ারা উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে জয়ধ্বনি শুব করে। সইতে পারে না রামকান্ত, যত সব বর্বরের কাণ্ড। সকাল হতে না হতেই গরব পাল নিয়ে নার্ঠে যাও আর সন্ধ্যায় সমস্বরে জিগির তোল। সুরুচি বলতে কোন পদার্থ নেই এগুলোর রক্তে। কোলকাতায় যদি কোনরকমে টিকে থাকা যেতো! প্রকৃত মাহুশ আছে কোলকাতাতেই। উচুনীচুতে এমন দুর্লভ্য ভেদাভেদও নেই সেখানে। সাধারণ একটু ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে যে কোন লোক যে কোন লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। আর এখানে তো সব ধুলোয় অন্ধকার। একত্র মেলামেশা তো দুয়ের কথা, ছুঁলে হকোর জল পর্যন্ত ফেলে দেয় উচুতলার মাহুসেরা। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন দমে যায় রামকান্ত।...

আজ রু'দিন, চোখ বুজে বেদীর ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারছে না রামকান্ত। মন ঘুড়িটা কল্পনার মীল আকাশে কেবলই উড়ে চলেছে। কি হবে

এই ভাগবত পাঠ আব কীর্তনাদি কবে? দুনিয়ার স্থখ শান্তি তো সবই ওদের
 গুণ। ওবা একটানা কেবল স্থখ কবে যাবে আব আমবা পায়েব তলায় পড়ে
 মববো। না, তা হবে না। দু'দিনেব জীবন। নগদা যা পাওয়া যায় সেই-ই
 ভাল। ডিক্সি নিয়ে একাকী যুব যুব শুরু কবে বামকান্ত গ্রীনবোটের চাবপাশে।
 আশা, কুমাব বাহাদুর যদি ভুলেও একবাবটি চোখ তুলে তাকান। আহা,
 গানবোট তো নয় যেন একখানা ভাসমান প্রমাদ বাসব। কি নেই ওব ভেতর?
 শোবাব ঘব, বসবাব ঘব, বসুইখানা, মায স্নানাগাব পর্গম্ব। বসুইখানাব চিমনী
 দিযে অষ্টপ্রহর বোঁয়া বেরুচ্ছে। খোশবুতে ম ম কব'ছ চাবদিকের বাতাস। এ যেন
 শহরব কান বেস্তোবাঁয মোগলাই বাগ্না চেপেছ। বৈবাগীদেব পালায় পড়ে ঘাস
 পাতা খোয খোয তো পেটে চড়া পড়ে গেলো। মাছুম ক'দি. পান কামনা
 বাসনাক চেপে বাখতে? আব কেনই বা তা বাখবো? বামকান্ত আলগোছে
 ডিক্সিখানা গ্রীনবোটব পেছনে বেঁধে প্রাণওবে স্রাণ মনে থাক। কেমন কবে
 যেন এক নিমেষে দুব অতীতে পৌঁছে যায়: আঘাট মাস। তিনদিন অবিশ্রাস্ত
 বাবায় বৃষ্টি শচ্ছে। মহানগরী কোলকাতাব ঘান বাতন সব বন্ধ। যে যেভাবে
 পাবছে ঘবেব মধ্যেই আলস্তে দিন কাটাচ্ছে। দু'দিন আগে আপস থেকে
 মাইনে পেয়েছে বামকান্ত। নগদ পচিশ টাকা। অল্প সময়ে আশাতীত পদোন্নতি।
 খশাব হাওয়াই বইছে প্রাণে। খুশীতে গদগদ হয়েই এক বোতল হুইস্কিসহ
 গ্রাস ওটে স্তম্ভাব ঘবে। অতি অল্প দিনেব প্রেম। ভবা ভাদব জোয়াব লাগে।
 চুংপুবেব বেস্তোবাঁ থেকে আসে গবম গবম চিংডীব কাটলেট। হুইস্কি আর
 কাটলেট—সোনায সোহাগা যেন। তাবপব খিচুডি, হালশ মাছ ভাজা, মাংস।
 একটানা বৃষ্টিতে সোনাগাছিব গলি ঘিজি জলে টেটম্বব। দু'দিন দু বাত্রি চোখেব
 পলকে কেটে যায়। আজো যেন মুখে লেগে আছে সেই চিংডীব কাটলেট।
 বামকান্ত অল্পমনস্কভাবেই 'হোং' শব্দে পেছন টেনে বসনাব জল সন্দ্বণ কবে।

আঘাটের স্থধ কখন অন্ত যায় বোঝা যায় না। বৃষ্টি না থাকলেও জলভরা
 আকাশ খম খম করছে। বৈষয়িক ব্যাপারে আজ একটু ব্যস্তই ছিলেন রুমেশ
 নাবাযণ। চবে সাক্ষ্য দীপ সবে জলতে শুরু হয়েছে ডেক চেয়ারে এসে বসেন।
 বামকান্ত অতীত ভুলে যায়। যেন চাঁদ দেখছে আকাশে। কুমাব বাহাদুর
 কি সত্যি ওব দিকে চেয়ে আছেন। ডিক্সিতে চাড় দিয়ে সামনা-সামনি হতে
 চেষ্টা কবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো হরি হাত ইশারার ওকেই ডাকছে। হুইস্কি
 সত্যি তাহলে এতদিন পর দয়া হলো। মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে আর ভয়

নেই। দু'দিনেই বশ করা যাবে।...রামকান্ত গ্রীনবোটের সামনা-সামনি এনেট ডিন্জি বাঁধে। হরি ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানায়।

কুমার বাহাদুর আজ একাই আছেন। রামকান্ত সম্ভ্রান্তভাবে এসে কাছে পাঁড়ায়। ভাবে, এত বড় মানী ব্যক্তি, হাত জোড় করে নমস্কার করলে খুশী হবেন না। তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতে উত্তত হয়।

কুমারবাহাদুর আপত্তি করেন না। অত্নের উন্নত মস্তককে স্বীয় পদতলে অবনমিত করানোই ওদের বংশ-রীতি। মনে মনে খুশীই হন রামকান্তর ওপর। একদিনেই যখন এতখানি আন্তুগতা দেখা যাচ্ছে ভট্টচাষের মধ্যে তখন অনেক কিছু আশা করা যায়। বেশ একটু খাতির করেই পাশের মোড়াতীতে বসতে ইঙ্কিত করেন।

রামকান্ত আবার ভাবনায় পড়ে। হজুরের পাশে মোড়ার ওপর বসবে! সেটা কি ভাল দেখাবে?...

অবস্থা বুঝে হজুরই পুনরায় সমর্থন করেন, অত ভাবছো কি হে ভট্টচাষ? বসো বসো ওতে কোন দোষ নেই। তুমিও তো মাহুয!

দ্বিতীয়বার সম্মতি পেয়ে রামকান্ত গুটি স্তটি হয়ে মোড়ার ওপর বসে পড়ে। পুনরায় অবাক হয়েই ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, একেই বলে দিল। এত বড় লোক একটু মান অহংকার নেই। লক্ষ্মী কি আর সাধ করে ঘরে বাঁধা আছেন?..

রামকান্তর অবস্থা আরো চরমে ওঠে যখন বসতে না বসতে হরিকে আদেশ করেন ওর জন্ম ছুটো চিংড়ীর কার্টলেট এনে দিতে। পরিচয় নেই—জিজ্ঞাসাবাদ নেই—সরাসরি খাবার ব্যবস্থা! হবে, জীবনে ও আর ক'জন বড় লোককে দেখেছে আর তাদের আচার ব্যবহার জানতে পেরেছে! না বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বাক্য সরে না রামকান্তর।

আদেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা প্লেটে করে গরম গরম ছুটো কার্টলেট এনে হাজির করে হরি। বিস্মিত শুধু একা রামকান্তই হয় না। হরি নিজেও হতবাক হয়। প্রথম দিনেই কুমার বাহাদুরের তরফ হতে এত আদর আপ্যায়ন জীবনে ও খুব অল্পই দেখেছে।

কার্টলেটের খোশবুতে চারদিক ম ম করছে। এতক্ষণ যা ছিল স্বপ্নেরও বাইরে সহসা তা বাস্তব হয়ে ওঠে। কঠিন হলোও রসনাকে সংযত রেখেই রামকান্ত ইতস্তত: করতে থাকে।

কুমার বাহাদুর রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। রামকান্তর আড়ষ্টতা লক্ষ্য

করে—মুচকি হেসেই উৎসাহ দেন, কই হে ভট্টাচার্য, চট করে খেয়ে নাও। জ্বলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছুই স্বাদ পাবে না।

আমি একা খাবো হুজুর? আপনার—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেন রমেন্দ্র নারায়ণ, আমার এখনো অনেক দেরি আছে হে। তোমার তো আবার ওদিকে কীর্তনের সময় হয়ে এল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আজকের মতো এসো।

রামকান্তর তরফ থেকে আরো খানিকটা বিনয় প্রকাশ করাই হয়তো উচিত ছিল। 'কিন্তু রসনাকে আর অধিকক্ষণ সংযত রাখা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া সত্যিই তো, ইচ্ছে থাক আর না-ই থাক বৈবাগী বাড়িতে তো হাজিরা দিতেই হবে। সংসারের চাল ভাল তো এখনো ওখান থেকেই আসছে। তবে হুজুরের যদি দয়া হয়, নিদেন একটা মুহূবিব কাজও যদি দেন, তাহলে আর ঢ্যাং ঢ্যাং করে কীর্তনের মাঝে লাফালাফি করতে হবে না। একঘেয়ে ভাগবত পাঠি করেও আর মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে হবে না। না, হুজুরের একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে অনর্থক কেন ডেকে পাঠাবেন! এমন খাবারই বা খাওয়াবেন কেন!...আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই চোখের নিমেষে একটা কার্টলেট সাবড়ে দেয়। আঃ, কি মজাদার রান্না। বৈবাগীদের ঘাস গোবর খেয়ে খেয়ে মগজের খিলু যে লোপ পেতে বসেছে! দ্বিতীয়াটাও মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়।

ওর খাওয়া দেখে রমেন্দ্র নারায়ণ কৌতুক বোধ করেন। হেসে হেসেই পুনরায় জিজ্ঞেস কবেন, আরো গোটা দুই চলবে নাকি ভট্টাচার্য?

আঞ্জে না হুজুর, যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে আবার এক্সুনি কীর্তনে যেতে হবে।

মুখে যত জোর দিয়েই কথা কটা বলতে যায় না কেন রামকান্ত মনের ভাব বুঝতে কিছুমাত্র দেরি হয় না রমেন্দ্র নারায়ণের। আরো দুটো কার্টলেটের জন্ত হুকুম করেন।

আবার কার্টলেট আসে। খাওয়াও যথারীতি শেষ হতে চলে। রমেন্দ্র-নারায়ণ হাসতে হাসতেই টিপ্পনী কাটেন, আজ কার্টলেট পর্যন্তই থাক হে ভট্টাচার্য! একদিনে বেশী এগোনো ভাল দেখাবে না।

কি যে বলেন হুজুর, মুচকি মুচকি হাসতে থাকে রামকান্ত।

কুমার বাহাদুর বলেন, কেন, খুব খারাপ বলছি নাকি? তা কার্টলেট কেমন খেলে?

জীবনে কখনো এরকম সুস্বাদু কাটলেট খাইনি হজুর—, ঢোক গিলে উত্তর করে রামকান্ত ।

আচ্ছা, তা হলে এখন এসো ।

হাত ধুয়ে রামকান্ত আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায় । কুমার বাহাদুর বাধা দেন, থাক হে, বারে বাবে পায়ে হাত দিচ্ছ কেন ?

কি যে বলেন হজুর ! আপনি হচ্ছেন সং ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ের ধুলো নেনো এতো আমার পবন সৌভাগ্য ।

আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে, এখন এসো ।

রামকান্ত মোহাবিষ্টের মতোই আবার এসে ডিক্কিতে ওঠে । অপলক দৃষ্টি কুমার বাহাদুরের দিকে । খোশ মেজাজেই গড়গড়া টানতে থাকেন কুমার বাহাদুর, জালে বোব হয় মাছ এবাব পড়লো ।

॥ ৯ ॥

পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত চরফুটনগর । মণ্ডল পাড়া, বিশ্বাস পাড়া, ফকির পাড়া, বৈরাগী পাড়া । এক একজন মোড়লের নাম অল্পসাবে এক একটি পাড়া । ফকির পাড়া আর মণ্ডল পাড়াই আয়তন দড় । লোকসংখ্যাও এ দুটিতে অধিক । পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত শুধু পরিচয়ের সুবিবার জন্ম । নয়তো, চরফুটনগর আসলে এক । দীলু আর করিমই চরের মাথা । সকলে মিলেমিশে চাষ আবাদ করে—প্রাণ খুলে ধামাল উৎসব আর কীর্তনে মাতে । ছোটখাটো ঝগড়াও সময় সময় পরস্পরের মধ্যে হয় । কিন্তু ভিন্ গায়ের মানুষের সাধ্য নেই সেই সুযোগে চরের মানুষকে কিছু বলে । ঝগড়াই থাক অর মিতালিই থাক কেউ কিছু অগ্রায় করলে একত্র হয়েই তার ঘাড় মটকায় । চরের সম্মান সকলের সম্মান । নিজেদের ঝগড়া-বাঁটি নিজেদের মধ্যে মেটাতে হবে । বাইরের লোক যেন কেউ তার মধ্যে নাক গলাতে না আসে, দীলু করিমের কড়া নির্দেশ । চরের অনিষ্ট করলে চরে বাস করা কিছুতেই চলবে না । আর ঝগড়াই বা হবে কেন ? হয়তো বা ক্ষণিকের মন-কষাকষি । তারপর য়েই সকলে কীর্তন কিংবা ফকিরের আসরে এসে বসলে অমনি মনো-

মালিঙ্গ মিটমাট হয়ে গেল। একজন খাওয়ালে পাঁচ কলকে তামাক সেজে
আব একজন সাত কলকে। তাবপব মাতব্বববা খানিক দাঁত বাব কবে হাসলে—
তু'চারটে টিকা টিপ্তনী ঝাড়লে—পবস্পব গিষে পবস্পরেব গলা জড়িয়ে ধবলে।

অপরোধ যদি খব গুরুতব হয় তাহলে বসবে পঞ্চায়ত্ত। দীহু আব
কবিমেব বাব বাড়িব ঘব তাব জন্ত চিব উন্মুক্ত। বাটা ভর্তি পান স্পুবি আসবে,
কলকেব পব কলকে তামাক। আসব ভাল কবে জমবাব আগ পৰ্বন্ত হাসি
মস্ববা চলবে এ ও তাব মধো। তাবপব আসল বাদী বিবাদী কবজোডে
সতাকে দণ্ডবং জানিয়ে পেশ বববে নিজ নিজ আর্জি। মন দিষে সব শোনা
হবে। কেউ সভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কবলে মাতব্ববদেব মধো একজন গগনভেদী
এমকে বসিয়ে দেবে তাক। তাবপব চলব খানিক কান'-কানি ফিস-ফিসানী।
সবশেষে বায় দান। অপবাধেব গুণত্ব বুঝে দোষীকে মাবা হবে পাঁচ জুতো
যাতো দেওয়া হবে নাকে খত। সময় সময় তু'পাঁচ টাকা জবিমানাও আদায়
হয় কাবো কাবো কাছ থেকে পঞ্চায়ত্তেব জন্ত। বিচাব এইখানেই খতম। থানা,
পুলিশ আদালত কেউ কবতে পাববেনা। জমিব গোলমাল, বাড়িব গোলমাল,
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, বাপ-বেটায় মন কয়াকসি—সব মিটে যায় পাঁচজনেব
সালিসীতে।

মঙল পাড' নাম হযেছে মধু মঙলেব নাম অনুসাবে। মধুব আদি বাস ও
ছিল পদ্মাবই পাডে। কিছু কিছু লেখাপড়া জানে মধু। তাই তাব কথাবার্তা
অনেকটা মাজা ঘবা। চাষেব জমি-জমা আগেও বড় একটা ছিল না মধুব। তবু
বাড়িতে দুটো দুবেল গক পুষে এবং অগ্ৰেব জমি পত্তন নিয়ে এক বকম স্মখেই
দিন কেটেছে। কিন্তু কাল হল পদ্মা। কাশীপুবেব পাশাপাশি গ্রাম মোহনপুব।
তাই কাশীপুব যখন তলিয়া গেলো মোহনপুবও একেবাবে বেহাই পেলো না।
ক্ষতি মধুরও হলো। তবু দীহু কবিম পিতৃপিতামহেব ভিটা ছেড়ে এলেও
মধু তা পাবলে না। অধিকতব দুঃখ কষ্টেব মধোই দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু
পদ্মা যে হাঁ করেই ছিল। ওব বিশ্বগ্রাসী ক্ষুবাব মুখে মধু লড়বে কতক্ষণ? বছর
না ঘুরতেই ভিটেমাটি সব সাক। মধুও বাধ্য হয় অন্তত্ৰ মাথা গুঁজতে।

ভিন্ গায়েব মালুষ হলেও দীহু আর মধুস্ব মধো গলায় গলায় ভাব
ছিল। অঞ্চলের সেরা কীর্তনিয়া মধু মঙল। যেমন তার কৃষ্ণব তেমন
ভাব ও ব্যঞ্জনা। কিন্তু দীহু বৈরাগী খোল না বাজালে মধুর ভাব ফাসে না।

স্বতন্ত্রাং মাসের মধ্যে দু'দশবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো। দূর দূরান্ত থেকে মধুর ডাক আসে। দীল্লকেও খোল বাজাবার জন্ম সঙ্গে যেতে হয়। নৌকা বিলাস, মান ভঞ্জন, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালা গানে মধুর জুড়ি নেই। খোল বাজানায় দীল্লর নাম-ডাকও দেশ-বিদেশময়। মধুর নিমন্ত্রণ এলে দীল্লরও তা আসবে। মধু দীল্ল যেন যমজ দুই ভাই। স্বরং গৌর নিতাই-ই যেন কীর্তনের মাঝে অঙ্গ দুলিয়ে নাচতে থাকে। প্রতি বছর অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে দীল্লর বাড়িতে মধুর আসা চাই-ই। তিনদিন তিন রাত্রি বিরাম-বিহীনভাবে চলে নাম নহা-যজ্ঞ। চারদিক থেকে দলে দলে আসে অঞ্চলের কীর্তনিয়ারা। প্রাণ খুলে নাচে—নাম গান গায়। পেট পুরে ঢ'বেলা পায় মহাপ্রসাদ। উৎসবেব পরিসমাপ্তি হয় দধি-মঙ্গল আর মহোৎসবে। নাম যজ্ঞের আগে মাসাধিককাল নিয়মিত চলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পবে পালা গান। মহোৎসবের পরেও তাই বৈরাগী বাড়ির ঠাঁড়ি হেঁশেল সহজে বন্ধ হয় না। দূব গাঁ থেকে যে সব কীর্তনিয়ারা আসে তারা মধুর মুখের পালা গান না শুনে কেউ ফিবতে চায় না। গান নয়তো এক একটি কলিত যেন অন্তর বিগলিত হয়ে প্রাণ-গঙ্গা বয়ে চলে। পয়লা কার্তিক থেকে শুরু অত্রানব মাঝামাঝি শেষ।

প্রলয়ের পরে দীল্ল মধুকে অনেক কবে বলেছিল। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে মধু কিছুতেই রাজী হয়নি। তারপর তিলে তিলে যখন রাক্ষসী পদ্মা ভিটেটুকুও গ্রাস করলে তখন আর গত্যন্তর নেই। মধু নিজেই চিঠি দিলে দীল্লকে। চরফুটনগরে তখন জমির দর অনেক। তবু মধু কীর্তনিয়ার মতো গুণী লোক চরে আসবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? বেচারি, হালে পুত্র-শোক পেয়েছে। পরমেশ্বরের যে কি মর্জি বোঝা যায় না। এমন সাধু সজ্জন ব্যক্তি তাকেও কিনা মহাশোক ভোগ করতে হচ্ছে! সংসারে পা দিয়েই তো সংসার-ধন্বীকে হারিয়েছে। বছর খানেকের নিবারণকে রেখে মোক্ষদা স্বর্গে গেলো। সেই থেকে সন্ন্যাসীর জীবনই কাটাচ্ছে মধু কীর্তনিয়া। নিজে কোলে পিঠে করে মাছুষ করেছে নিবারণকে। অনেক কষ্ট করে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর বিয়ে দিয়ে হীরের টুকরো বউ ঘরে আনলে কিছু না পেয়ে না থুয়ে। মধুর সংসার নবলক্ষ্মীর আগমনে ভরে ওঠে। নিজে পালা গান করে দু'দশ টাকা পায়। নিবারণ চাষ-আবাদের

কাজ করেও আবার ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানীগিরি করে। দুটো দুখেল গরু গায়ালে। অভাব কিছু মাত্র নেই। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই নাতনীর মুখও দেখলে মধু কীর্তনিয়া। দয়াল হরির দয়া আর কাকে বলে? আগে দূর দূবাস্ত থেকে ডাক এলেও ওকে ছুটতে হতো। শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের জন্তই নয় পেটের ভাবনা ভেবেই। এখন আর তা হয় না। আশপাশের ডাক ন' থাকলে নাতনীকে কাছে বসিয়েই গান শোনায়। মনের আনন্দে কঙ্কে সেজে তামাক পায়। নাতনীও গায়ের রং বউমার মতো ফস। না হলেও মুখ-সৌষ্ঠব চমৎকার। দয় ওর রাধা-রমণই বোধ হয় নারীর বেশে পুনরায় ধরায় এসেছেন। ময়নার সয়েস বছর তিনেক। ওকে কাছে বসিয়ে খেলা দিতে দিতে হুকলি গানই বেঁধে ফেলে মধু :

ধনী—

কোথা ছিলে বল চাঁদবদনী।

আমি তোমার ও রূপে জলে মরি

কোথা ছিলে বল আদরিণী ॥

কৃষ্ণ নাম গানে, মহোৎসবে, স্তবের সংসারে পরমানন্দেই দিন কাটতে থাকে মধুব। অসময়ে মোক্ষদাকে হারিয়ে। এক সময় মনে যে খেদ হয়েছিল এখন আর তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। রাধাবরণ ওকে বেশ আনন্দেই রেখেছেন। দিব্যি খায় দায় পূজা-আহ্নিক করে। নাতনীকে কাছে বসিয়ে খেলা দেয়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুল ময়নার মাথা ভর্তি। ছোট্ট ছোট্ট দুধের মতো সাদা দাঁত। খিল খিল করে হাসে। মধুর আনন্দ ধরে না। পাড়া প্রতিবেশীরা অল্পযোগ করে, তবু তো নাতির মুখ দেখিনি মণ্ডল। নাতি হলে হয়তো মাটিতেই নামাতো না।

মধু হাসে। মনে মনেই বলে, নাতি আর নাতনীতে তফাত কি? সকলেই তো কৃষ্ণের জীব। ভগবান ওকে প্রথম নাতি না দিয়ে নাতনী দিয়েই ভাল করেছেন। নারীই তো গৃহলক্ষ্মী। সর্বপ্রথম সেই লক্ষ্মীর আগমন তো পরম সৌভাগ্যেরই কথা! তাছাড়া বেটাছেলে লায়েক হতে ঢের সময় লাগে। কৃষ্ণ-দাসী তো শীগগীরই ভাগর হয়ে উঠবে। রাধারানীর পাশে এসে দাঁড়াবেন রাধারমণ। নয়ন জুড়াবে। বাপ মা পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ময়না.

ময়না। কিন্তু মধুর কাছে ও কুম্বদাসী। মেয়েই বলো আর ছেলেই বলো বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তো পুরুষ। আর সকলেই নারী—তঁার দাসী।...
মধুর ভাবনা কুল পায় না। চিরানন্দময় জগৎ।...

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসেন। বটে! আনন্দ চাই? পাবে। তবে জেনে
রেখো :

যে করে আমার আশ,
করি তার সর্বনাশ।
তবু যে করে আশ,
হই তার দাসাধুদাস।

নিবারণের বয়েস কুড়ি একুশ—জোয়ান ছেলে। ভোরে উঠে পাস্তা খেয়ে
ক্ষেতের কাজে গিয়েছে। দুপুরে ফিরে এসে গরম ভাত খাবে। স্বপ্নের নিরামিষ
রাগা শেষ করে উঠনে মাছের ঝোল চাপিয়েছে দুর্গা। মধু ঘাট থেকে স্নান করে
এসে সবে আঙ্কিকে বসেছে। ক্ষেত থেকে আট দশ জন ধরাধরি করে
নিবারণকে বাড়ি নিয়ে আসে। দু'বার ভেদবমির পর অট্টোতটুই নিবারণ। ওঝা
আসে, বৈষ্ণব আসে, মায় এ্যালোপাথিক ডাক্তার। কিন্তু নিবারণের আর
জ্ঞান হল না। হৃদয়স্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

গনভেদী চীৎকারে ক্ষেটে পড়ে দুর্গা। কাটা পাঠার মতো দাপাতে থাকে।
ময়না ভাবাচাকা খেয়ে উচ্চস্বরেই কাঁদতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়
স্বজনের চোখও জলে টেটুধুর। কিন্তু জল নেই শুধু মধুর চোখে! চিরজীবন
নাম গান করেছে ও—গীতা পড়েছে। ও জানে, জীর্ণ বস্ত্রের মতোই তো পরমাত্মা
একদিন এ দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে! এতো অনিবার্য পরিণাম। মায়াময়
জগৎ। কে পুত্র, কে কন্যা, কে স্ত্রী?...হাতে আঙ্কিকের তিলক-মাটি ছিল।
আর ছিল প্রভুপাদের যুগল চরণের ছাপ। মধু মৃতপুত্রের সর্বাঙ্গে এঁকে দেয়
তিলক-রেখা। কণ্ঠে পরিয়ে দেয় জপের মালা। মুখে দেয় গঙ্গা জল। ওর হয়ে
আগে একাঙ্গ নিবারণেরই করার কথা ছিল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় ওকেই আগে
করতে হচ্ছে। বেশ তো তাই হবে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে একমাত্র
পুত্রের শাশাম কাঁধে করে ঘরে করে মধু। কিন্তু পরদিন সকালে আর নিজের
ঘরের দরজা খুলতে পারে না। রুদ্ধ অঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। রাধারমণজীর
চরণতলে বসে আকুল হয়েই কাঁদতে থাকে মধু।

পুত্র গেছে। চতুর্দিকে অভাব অনটন। ঘর বাড়িও গেলো। কিন্তু কর্তব্যে শেষ নেই। দুর্গা ময়নার ভরণ পোষণের ভার ওর। এ কর্তব্য পালন না করলে বাধারমণজীউ ওকে ক্ষমা করবেন না। তাই সব হাবিয়েও আবার সব পাবার জগু দীলুকে লিখতে বাধ্য হয়। যতদিন জীবন ততদিন কাজ করে যেতে হবে। আবার বাধতে হবে ঘব। যারা আশ্রিত তাদের আশ্রয়েব ব্যবস্থা না কবে উপায় নেই। প্রাণাধিক মধু-কীর্তনিয়াব পত্র পেয়ে দীলু স্থিব থাকতে পারে না। জমি-দাবেয় কাছ থেকে যদি জমি পাওবা না যায় ক্ষতি নেই। নিজের ওপক্ক আস্তা বেখেই মধুকে আসতে লিখে দেয়। একবাব শুধু পবামর্শ করে মিতা কবিমেব সন্ধে।

কবিম বলে, বল কি মিতা। এতবড় গুণীলোক আশ্রয়হাবা হয়ে পথে পথে ঘববে। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, বয়েসও ভাটিব পথে। আমবা না দেখলে কে দেখবে মঙলকে? তুমি লিখে দাও—দুজনে না হয় দু'বিষে ক'রে জমি ছেড়ে দেবো।

দীলুর আমন্ত্রণ পেয়ে মধু চবেই আসে। সঙ্গে দুর্গা ময়না। সামান্ত কিছু তৈজসপত্র। অনেকদিন পব কীর্তনিয়াব সন্ধে মুখোমুখি দেখা। চবে এসে গত দু'বছর কাতিক মাসে কার্তনিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দীলু। কিন্তু কীর্তনিয়া আসেনি। কেন আসেনি সেকথা আজ বুঝতে পাবছে। পুত্রশোক মাহুশকে বোধহয় এমনিই কবে ফেলে। ডাক ছেড়ে যদি মঙল কিছুদিন কাঁদতে পারতো তাহলে বোধ হয় ভাল ছিল। মঙলের মুখেব দিকে চাইলেই বুক ফেটে কান্না আসে। নীববেই অভ্যর্থনা জানায় দীলু মধুকে। খবব পেয়ে করিমও ছুটে আসে। তিন গুণা একত্রিত হয়। হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কারো কোন কথা ফোটে না। মধু যেন সকলকেই স্তম্ভিত কর ফেলেছে।

চবফুটনগরে চট করে জমি পাওয়া এখন আব সম্ভব নয়। রাখাল গোসাইকে দু'দশ টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করার জোও এখন আর নেই। এখন জমি বিলির কর্তা স্বয়ং রমেস্ত্র নাবায়াণ। জলো জমিই এখন বিলি হয় চড়া দবে। তদুপরি মোটা নজরানা। মধুর তো সখল বলতে কিছুই প্রায় নেই। টেনেটুনে শতাবধি টাকাও হবে কিনা সন্দেহ। এত অল্প টাকায় বাস ও চাষের জমি পাওয়া খুবই মুশকিল। গয়নাগাটি বেচলে অবশ্য আরো ৭ দুই টাকা হতে পারে। কিন্তু মোক্ষদার যা কিছু ছিল সে সবই তো দুর্গাকে ও দিয়ে দিয়েছে।

এখন দুর্গার কাছে কি করে এ প্রস্তাব করা যায় ? এ অঞ্চলে পালাগান গাইতেই বা ওকে কে ডাকবে ? দশ পাঁচ টাকা হয়তো তা থেকেও আসতো । আবার খেতে পরতেও কম টাকা লাগবেনা । দীলু বৈরাগী অবশ্য যথেষ্ট সম্মান দিয়েই তার বাড়িতে রেখেছে । বৈরাগী বউয়ের যত্ন-আস্তিরও ক্রটি নেই । ময়নাকে তো নিজের মেয়ে করেই নিয়েছে কুহুম । দক্ষিণ কোণের বড় ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছে ওদের তিন জনকে থাকার জন্ম । কিন্তু হলে কি হবে ! যত আদর আপ্যায়নই হোক—মানুষ অল্পের ঘাড়ে চেপে ক’দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে ? মধুর খাওয়া পরার ক্রটি নেই ! কিন্তু মনে স্থখ নেই । রোজই এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায় । ফাঁক ফুক দেখলে জমির দর জিজ্ঞেস কবে । কিন্তু টাঁকের কড়িতে নাগাল পায় না । দীলু করিম আসরে বসে সান্ধনা দেয়, ঘাব্রান ক্যান মণ্ডলের পো ? বিপদে যিনি ফেলচেন তিনিই কূল দিব ।...

কূল সত্যি সত্যি একদিন পায় মধু । চরের পশ্চিমদিক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে । রামকান্তকে ধরে অনেক তোষামোদের পর বিধা-তিনেকের মতো একটু স্থবিধাতেই পাওয়া যায় । উঁচু দিকটায় একখানা চালা বেঁবে দিন কোন রকমে কাটানো যাবে । পলি যদি ধরা যায় তাহলে চাষাবাদেরও কিছুটা স্থবিধা হতে পারে । হাতের সর্বস্ব পণ করেই জমিটুকু কিনে ফেলে মধু । দীলু করিমের সম্মতি নিয়েই কেনে । ওরা ছাড়া এ চরে কে আর ওর আপনজন আছে ? মোহনপুরের জলো জমি বিক্রি করে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল । হাতেও জমানো ছিল গোটা চল্লিশেক টাকা । বাকীটা নিবারণের মার খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার বেচে হয়েছে । বুদ্ধিমতী দুর্গাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয়নি । নিজের থেকেই ও বাঁপি খুলে শ্বশুরের হাতে গুঁজে দিয়েছে সব । শাশুড়ীর ছাড়া নিজের গলার সোণার হারছড়াও দিয়েছে । নইলে তিনশ টাকা হলো কি দিয়ে ?...স্বামী হারিয়েছে নিজের নিদানের সম্বলও খোয়ালে বেচারী । বৃকের পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যায় মধুর । তবু ওকে কঠিন হয়েই হাত পেতে সব নিতে হয় । ভিটে না হলে ঠাণ্ডাবে কোথায় ?...জমির দাখিলাখানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে চোখের জল মুছতে মুছতেই কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে ।

দীলু সান্ধনা দেয়, কাইন্দেন না মণ্ডলের পো । তিনিই ক্লপা অইলে সব পাইবেন । জ্বাহেন নাই, কি কাপরে পড়ছিলাম ? আপনাগ অশীর্বাদে দম্বাল চান বাচাইয়া রাখচে ত । প্যাট ভইয়া এহন দুইডা খাইবার পারতি ত ।...

পাষাণে বুক বেঁধেই চরে ফিরে আসে মধু । দীলুর পরামর্শ মতোই পলিধরার

কাজে মন দেয়। পাটকাটির বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একখানা ডেরা বাঁধে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে। দীর্ঘ বাধা দিয়েছিল, এবারের বর্ষাটা ওর বাড়িতেই কাটিয়ে যেতে! কুসুম তো কিছুতেই ছাড়বে না। এক রত্তি ময়না। ভিজ়ে মাটিতে অস্থখ কবে যদি! কিন্তু সব চেষ্টাই ওদের নিফল হয়। নিজের ভিটের চেয়ে স্বর্গও মধুর কাছে বড় নয়। ময়নার কোন অস্থখই ওখানে কবতে পারে না। উঁচু করে মাচা বেঁধেছে। ভিজ়ে মাটিতে কি কবরে? তাছাড়া চর ছেড়ে তো আর কোথাও যাচ্ছে না। যখন খুশি কুসুম ওকে দেখতে পাববে। জুদয়ের আবেগ দিয়েই সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ কুসুম গুছিয়ে দেয় ঘর-গৃহস্থলী।

ভক্তের ফাঁদে পা রাখেন মা লক্ষ্মী। দু'বছরের বর্ষায় বেশ পুক হয়েই পলি ধরা পড়ে। সামান্য জমি। ধান পাটের চাষ এখনো সম্ভবপব নয়। মুগ-কলাই যা ওঠেছে তার সঙ্গে দুটো দুপেল গক পুষে দিন কেটে যাচ্ছে। মধুর দেখা-দেখি আবো কয়েক ঘর এ অঞ্চলে সমানে যুবছে। সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম পাড়াও দিন দিন বেশ পুষ্ট হয়ে উঠছে। মধুর চেয়ে জমির পরিমাণ অনেকব বেশী। লোকবল অর্থবলেও অনেকেই বড়। তবু এ-পাড়ার মাতব্বর মধুই। মধুর নাম অনুসারেই পাড়ার নাম মণ্ডলপাড়া। সকলে খশী হয়েই এ-নাম ধাৰ করেছে। টাকাই তো মানুষের জীবনের একমাত্র কথা নয়। মধুর মতো এমন শিষ্টাচারী মানুষ চরে ক'জন আছে? অষ্টপ্রহর ভজন-পূজন নামগান কবে। কোনরূপ মিথ্যা বজ্জাতীর মধ্যে কখনো থাকে না। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়েও কখনো বগড়া করে না। এমন মানুষ মাতব্বর হবে না তো'কে হবে?

বছর পাঁচেক বয়েস ময়নার। মাত্র দু'বছর চরে এসেছে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ছোট বড় সকলকেই ও মায়ায় ফেলেছে। এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ওর অবাধ গতি। সকলেই ওকে ভালবাসে—স্নেহ করে। গায়ের রংটা একটু কালো। কিন্তু এ কালো যে জগতের আলো। কি স্তম্ভ টানা টানা চোখ জোড়া! কুসুম একদণ্ডও ওকে চোখের আড়াল করতে পারে না। নিজের পেটের মেয়ে নেই কুসুমের। বড় ছেলের বউ পার্বতী ধনী খেলে অনেকটা পূরণ করেছে। কিন্তু ময়নাকে পেলে বোধ হয় সে সাধ ওর বোলকলায় পূর্ণ হয়।

নিশি অপেক্ষা ময়না বছর তিনেকের ছোট। তবু গলায় গলায় ভাষ দু'জনার। একসঙ্গে খেলা করে একসঙ্গে খায়। কুসুম একবাটিতে দুধভাত মেখে দুজনকে

নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। দুষ্টমী করলে জুজুবুড়ীর ভয় দেখায়। রূপকথার গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দু'বছর তো ওর কাছেই আছে ময়না। বাড়িতে মা দাছুর কাছে আর কতক্ষণ থাকে? শুধু যা রাতটুকু। ভোর হতে না হতেই আবার ছুটে আসে নিশির খোঁজে। কুসুমের মনে হয়, নিশির বাপ তো দিনরাত ছোট পোলার বিয়ের জন্ত পেড়াপীড়ি করছে! তা মন্দ কি, ময়নার সঙ্গে নিশির বিয়ে হোক না? এমন মেয়ে খুঁজলে ক'টি মিলবে ওদের সম্বন্ধে?...আবার ভাবে, না এত ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। এখন বিয়ে দিলে নিশির আব লেখাপড়া কিছুই হবে না। হলোই বা চাষার পোলা সামান্য পুথিপত্রখানা লিখতে পড়তে না পারলে পুরুষ মানুষের চলে কি করে? আর না হোক, করে-কস্মে খেতেও তো মোটামুটি হিসেবের প্রয়োজন। অস্থিনীর তো কিছুই হলো না। দিনরাত কেবল হালের গুটিই ঠেলছে। না না, বিয়ে এখন কিছুতেই হতে পারে না। দিব্যি ছুটিতে মনের আনন্দে হেসে খেলে কাটাচ্ছে। বিয়ে দিলেই তো ময়না কলাবউ হয়ে ঘরে ঢুকবে! তাছাড়া ঠাকুর করলে এ-বিয়ে তো হয়েই আছে। মণ্ডল কীর্তিনয়ার সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব পোলার বাপের! কেউ কারো কথা ফেলতে পারবে না। নিশি এখন দিন কতক পড়াশুনো করুক। ময়না যেমন আছে থাক।...

ময়না প্রত্যহ বৈরাগী বাড়িতে আসে। সময়ে নিশিও মণ্ডল বাড়িতে যায়। দুর্গার বড় ভাল লাগে নিশিকে! কি সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য! গায়ের রং তো রীতিমতো ফর্সা। দোষের মধ্যে মাথায় একটু খাটো। তা ওর ময়নাও এমন কিছু ধেরাং লম্বা নয়। বৈরাগীরা বড় লোক। নয়তো ঘরে জামাই আনতে হলে এমন জামাই-ই কাম্য। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখে দুর্গা। নিজের শ্বশুরকে পর্যন্ত বলতে ভরসা পায় না। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। বৈরাগী-গিন্নী কি আর তার কোলের পোলার বিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে দেবে? তা রং যতোই ময়লা হোক দেখতে ময়নাও ফেলনার নয়। নাক, মুখ, চোখ, ভাঁট, চুল সবই তো নিখুঁত সুন্দর।...অপলক নেত্র চেয়ে থাকে দুর্গা নিশির দিকে। বাড়িতে এলে কিছু না কিছু ওকে খেতে দেবেই। নিশি কখনো একা থাকে না। বেশীটাই ময়নাকে দিয়ে দেয়। তারপর, পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা ধলেশ্বরীর চড়ায় কখনো বা মাঠে ঘাটে। দেখে দেখে মধুও হাসে। বুকভরা আশা নিয়েই ভাবে, এখন যা ছেলেখেলা, ছুদিন বাদে তাই হবে হয়তো জীবন-সত্য। মানুষ তো এমন

করেই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে। মায়া—সব মায়া। বাধারমণ স্মৃতে
রাখুন ওদের।।।

কাঁকড়া কাঁকড়া চুল মাথায় ময়নার। ছ'বছর চরে এসে খাসা গোলগাল
হয়েছে। রূপোব ছ'গাছা মোটা বালা স্তডোল দুই বাহুতে। পায়ে বল দেওয়া
খাড়ু। ঝুমুর ঝুমুব শব্দে এবাড়ি ওবাড়ি আসে যায়।

সেদিন দাঁওয়াব ওপর বসে একটা পেয়ারা খাচ্ছিল নিশি। ময়না হস্তদস্ত
হয়ে কাছে ছুটে এসে বায়না ধরে, এই নিশা, হব্রি-আম দে ?

দাত খিঁচিয়ে উত্তর করে নিশি, অল আমার অল্লাদিল, হব্রি-আম দিব
অবে। যা যা, ছাই দিমু তবে।

কি কলি, ছাই দিবি ! দাঁড়া তব মজা দেহাই, রাগে গজ গজ করতে করতে
দুপা এগিয়ে যায় ময়না।

হ, এইডা দিমু তবে—ছোঁচা কোঠানকার, জিত ভেঁচিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো
আঙুল দেখায় নিশি—

ময়না আরো খানিকটা কাছে এসে উল্টো ভেঁচি কাটে :

নিশি ঝয়ি ভাঙা শিশি—

কান মইলা দেয় পদ্মা পিসি।

ঢাখ রাইক্ষসী, তীব্র প্রতিবাদ করে নিশি।

কি দেখবরে, বলতে বলতে এসে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে বেচারি নিশি
ডিগবাজী খেয়ে মুখ খুবড়ে উঠোনেব ওপব গিয়ে পড়ে। ময়না একটু দূরে সরে
গিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে।

খব লাগে নিশির বাঁ হাঁটুতে...নাকের ডগায়। তব মনের রাগে গৌঁ গৌঁ
করতে করতে উঠে এসে ময়নার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কচ্ করে কামড়ে
দেয়।

যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠে ময়না। হেঁশেল থেকে ছুটে আসে কুসুম। সপ্নেহে
হাত বুলিয়ে দিতে থাকে ক্ষতস্থানে। নিশি সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওর ছ'গালে
ছোটো ঠোঁকনা দিয়ে ধমকাতে থাকে।

বেঁচারি নিশি, থ বনে যায়। ওকে যে আগে ধাক্কা মারলে সেকথা
একবারও বলছেন না উনি। ঠোট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদেই ফেলে।

অতি রাগেও হাসি পায় কুসুমের। কোন ঝকমে নিজেকে চেপে পুনরায়
হেঁশেলের ভেতরে যায়। একটা বাটিতে করে তাড়াতাড়ি খানিকটা ছুধের সর

তুলে নিয়ে আসে। দুজনকে কাছে বসিয়ে ভাগ করে খাইয়ে দেয়। মিটমাট হয়ে যায়-ঝগড়া। তক্ষুনি দু'জন দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট ধলেধরীর বঁকে।

এমনি দিনে দশবাব ভাব দশবার আড়ি। মনে মনে হাসে কুসুম। নিজেব বাল্যস্মৃতি মনের কোনে ঊঁকি দেয়। একরত্তি মেয়েই বৈরাগী বাড়িতে এসেছিল। নিশির বাপের সঙ্গে ঝগড়াও বড় একটা কম হয়নি। তবু তো...

মধুর যত না বয়েস পুত্র শোকে তার চেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়েছে। পালা গান করতে গিয়ে এখন আর দম পায় না। আসরে উপস্থিত থাকলেও প্রধান দোহার বৃন্দাবনই এখন মূল গায়নের কাজ করে। ভাবাবেগে কখনো-সখনো দু'একটা কলি ধরে টান দিতে গিয়েও অস্থির হয়ে পড়ে। কাশির দমকে দম আটকে আসে। কখন কি হয় বলা যায় না। ময়না হ্তো সাত পা দিলে। পিতৃপিতামহের ধারা বজায় বেখে কাজ করতে হলে এই-ই বিয়ের উপযুক্ত বয়েস। আটের ভেতরে গৌরীদান করতে না পারলে সাতপুষ্ট নবকে যাবে।...দীহুব বাড়ি কীর্তনে এসে মধু আজ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে। আসরের আর কেউ তখনো এসে জড় হয়নি। তামাক খেতে খেতে একটু জোব দিয়েই দীহুর নিকট কথাটা পাড়ে মধু, পুত্রা, ময়না নিশির চাইর হাত এক কইরা ছাও। আমার শরীরের অবস্থা ভাল না।

দীহু হাসতে হাসতে হুকোয় টান দিয়ে উত্তর করে, ধাবড়াও ক্যান তালই, সব ত ঠিক অইয়াই আচে? দয়াল চান করলে এত শিগ্গীর আব তুমি আমাগ ছাইয়া যাইবার পারবা না। আর কয়ড়া দিন সব্বর কর। নিশার মায় যে আবার হার পোলারে ভদ্র নোক বানাইবার চায়?

হ, নিশি ত দ্বেতি রোজই গঞ্জের ইস্কুলে যায়। তা শিকলনি কিছু?

হ। কতা অব মায়রে জিগাইয়। চাষার পোলার আবার নেকাপড়া। আরে বাবা, একটু ধম্মে কম্মে মতি থাকলেই অইল। নেকাপড়া শিকা আমাগ কি অইব?

মধু বাধা দেয়, না না পুত্রা, ওকথা কইয় না। ছাহ না, ভাগবতখানা পড়বার গেলেও নেকাপড়া জানা চাই, দু'হাত কপালে তুলে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মধু।

হ, তা পারলে ত বালোই অয়। এহন তোমাগ দশজনের আশীর্বাদ।

তা তুমি দেইখা নিয়, তোমার ও পোলা একজন অইব।

কথা আর বেশীদূর এগোয় না। ইতিমধ্যে আসরের আরো অনেকে এসে জড় হয়। সংসারের চিন্তা ছেড়ে কীর্তনেই মন দেয় উভয়ে।

॥ ১০ ॥

নিশির ওপর কড়া নজর কুসুমের। চেষ্টা যত্নের ক্রটি নেই। মনের কোণে স্বপ্ন-মায়া। গাঠশালার সময় এগারোটায়। নিশিকে ডিক্কিতে উঠতে হয় দশটায়। কুসুম নয়টার মবেই খাইয়ে দাইয়ে বই স্লেট গুছিয়ে দেয়। চরের আরো চার পাঁচটি ছেলে যায় নিশির দেখাদেখি। বড় বড় হরপের ওপর হাত ঘুরোয় নিশি। স্বরবর্ণ পরিচয় হয়ে গেছে। ব্যঞ্জনবর্ণও সোজাহুজি পড়তে পারে। তবে উণ্টো পাণ্টা পরলে বলতে পারে না। কুসুমের আনন্দ আর ধরে না। ওর কল্পনা অক্ষুরিত হয়েছে। দয়াল হরি দয়া করলে নিশি মানুষ হবে। বাবুভুইঞাদের মতোই কথাবার্তা বলতে পারবে। চিঠিপত্র লেখাতেও আর অঙ্কে তোষামোদ করতে হবে না।...স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয় কুসুম। ঠাকুর যদি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহলে সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দেবো। সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে এসে গলবস্ত্র হয়ে মানত করে।

বছর খানেকের ভেতর খিতিয়ে খিতিয়ে—‘অজ, আম, ইট, ইহ...’ পড়তে পারে নিশি। এখন আর ওকে তাড়া দিতে হয় না। পাঠশালার আকর্ষণ এখন ওর সবচেয়ে বেশী। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস। দশটায় রওনা হয়—কেবে বিকেল ছাঁটায়। এই স্মর্দীর্ঘ সময় ময়নার আর কাটে না। ইস্, সূর্যি যে ডুবু ডুবু! কখন নিশি আসবে—কখন ওরা খেলা করবে। একবার বাড়ি একবার ঘাট, ময়নার আর স্বস্তি নেই। ডিক্কি ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিশির গলা জড়িয়ে ধরে। কুসুম দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে দুভাত খাইয়ে দেয়। নিশির শুকমুখে হাসি ফোটে। শুরু হয় মজার খেলা। ময়না হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে ধলেশ্বরীর বাঁকে। জলের ওপর থপ্ থপ্ করে পা ফেলে দু’জনে পার হয়ে যায় ওপারে। চড়ার ওপর দাগ কেটে কেটে মস্তবড় একটা বাড়িই তৈরি করে কেলে অয়না। পরিশ্রমে গলা শুকিয়ে

কাঠ। গিন্নীর মতো স্থর নিয়েই আন্দার করে, এই নিশা, একটা কুয়া খোদ।
আমি জল খামু

নিশির হাসি পায়। সমতা রেখেই জবাব দেয়, জল খাবি গাঙের ঘাটে
যা না।

না, আমি কুয়ার জল খামু, ময়নার বায়না বেড়ে যায়।

ঠিক খাবি ত? নইলে কইলাম মজা দেহামুনে।

তুই খইদাই জাখ, খাই কিনা?

কথায় কথায় ছোট্ট একটা কুয়ো খদে ফেলে নিশি। বেশী গভীর না হতেই
বালি চুইয়ে জল বেরুতে থাকে। নিশি উল্লাসে হাঁক ছাড়ে, এই মইনি, জল
খাবি আয়।

অগমনস্বভাবেই উত্তর করে ময়না, বাবে, আমি বলে গ্রহন রানবার নৈচি!

কি, তুই জল খাবি না? ক্রোধে গর্জে ওঠে নিশি।

না, আমি খামু না, ঠোঁট উল্টিয়ে উত্তর করে ময়না।

তবেরে রাইক্ষসী, ছটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনে নিশি ময়নাকে
কুয়ার কাছে।

ময়না দৃঢ় থেকেই শাসায়, ছাড় বলচি? বালো আইব না কইলাম।

কি বালো আইব না ল?

ছাড় বলচি?

আগে তুই জল খা?

না, আগে তুই ছাড়?

ছাড়লে খাবি তো?

হ, খামু।

নিশি ছেড়ে দেয় চুলের মুঠি। ময়না এক লহমায় কুয়ার ওপর উপুড় হয়ে
দুহাতে কাদা জল ছিটাতো থাকে। নিশির গা, মাথা, কাপড় মুহূর্তে কাদা
মখোমাখি হয়ে যায়। দিশেহারা হয়ে ময়নাকেও ও জোর করে ধরে কুয়ার
মধ্যে চুবিয় দেয়। ছটে গিয়ে পা দিয়ে ভেঙে দেয় ওর তৈরী ঘর-বাড়ি। সারা
চরময় চলে দু'জনের দৌড়বাঁপ ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয় হয় ভয়ে দুজনেই কাঁপতে
থাকে। এভাবে বাড়ি ফিরলে কারো আর রক্ষা থাকবে না। ভেবে-চিন্তে
ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ জলে গিয়ে নামে। উভয়ে উভয়ের গা, মাথা, কাপড় পরিষ্কার
করে ধুইয়ে চুপি চুপি বাড়ির দিকে রওনা হয়।

নিশির দেখাদেখি ময়নাও বায়না ধরে পাঠশালায় যাবে। বুড়ো দাছ মধু আন্নার শুনে হাসে। তবু আদরের নাতনীর মর্জি মাকিক বই, প্লেট, পেন্সিল ঠিকনে দেয়। দিন তিনেক ডিক্কিতে চড়ে যায়ও ময়না গঞ্জের পাঠশালায়। নিশির ভারি মজা লাগে। কিন্তু গুরু মহাশয় রাজী হন না। মেয়েদের সময় সকালে। পড়তে হলে ময়নাকে সকালেই আসতে হবে। একত্র পড়া চলবে না। একা একা যেতে আর উৎসাহ বোধ করে না ময়না। দিন কয়েকের ঠোঁটায় দাছুর কাছেই বর্ণ পরিচয় হয়ে যায়। নিশির চেয়ে ময়নার মাথা ভাল। নিশি এক বছরে যা শিখেছে ময়না ছ'মাসেই তা শিখে ফেলে। নিশিকে নিয়ে কুহুমের উৎসাহ দমে যায়। ছেলের চেয়ে ছেলের বউ বেশী লেখাপড়া শিখবে নাকি? কাজ নেই আব কারো লেখাপড়া শিখে। পুণি পাঁচালি তো নিশি এক রকম পড়তেই পারে। পুস্প মাহুয়ের এখন কাজ-কর্ম শেখা দরকার। সংসারও এখন বেশ বড় হয়েছে। একা পার্বতীকে দিয়ে আব চলছে না। ময়নাও সংসাবে আঙ্গুক। মেয়ে মাহুয়ের দিক্কাপনায় কোন লাভ নেই। বয়েস তো শুনছি সাত পেবিয়ে চললো। এই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তো ও বৈরাগী বাড়ির হেঁশেলে এসে ঢুকেছে... নিশি ময়নার বিয়ে দিতেই উত্তোঙ্গী হয় কুহুম। প্রস্তাবটা দীহুর নিকট পেশ করতেই দীহু দাঁত বার করে হাসে। বলে, কি গ পোলার মা, তোমার পোলারে না ভদর নোক বানাইবা?

কথাটা কুহুমের ভাল লাগে না। তবু নিজের পক্ষ সমর্থন করেই উত্তর করে, ভদর নোক ত বানাইচিই। চ্যাষ্টা করচিলাম বইলাই না নিশা এহন বই পড়বার পারে। তোমাগ বংশে কেরা কবে লেকাপড়া শিখচিল?

হ হ, তাত ঠিকই। তবে ভয় পাইলা ক্যান?

ভয় আবার পামু ক্যান? বই পড়বার শিখচে এহন কাম শিকুক।

আমাগ মতন অশিক্কিতের কাছে কাম শিকলে কি আর কাম করবার পারব? তার খনে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া ছাও, শিক্কিত অইয়া আইব।

কতায় কতায় বাপের বাড়ির খোঁটা ছাও ক্যান তুমি? তারা কি কেউ তোমাগ খাইবার পরবার আহে?

না, খোঁটা আবার দিলাম কই? তাগ গুণগানই ত কল্লাম!

তাগ গুণগান করনের আর কাম নাই। সামনের হাটেই ময়নার লেইগা গয়না গড়াইবার ছাও। তালইর যদি অমত না অয় তাইলে সামনের মাসেই আমি নিশির বিয়া দিমু।

আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয় নিশি ! আবার শেষ হয়ে যায় । কিন্তু ময়নার বায়না বেড়েই চলে । একে একে তিন চারখানা গৎ বাজাবার পরও যখন ময়না থামে না তখন নিশির বৈধ্ব্যস্তি ঘটে । হ্রাতের বাঁশী দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেয় ময়নার পিঠের ওপর । ময়না ডুকরে ওঠে, ঝুপ করে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে । হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে কাঁদতে থাকে ।

নিশির চোখ দিয়েও জল বেরুতে চায় । ময়নার হয়তো খুবই লেগেছে । নিজেও লাফিয়ে পড়ে ডাল থেকে । কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, খুব লাগচে মইনি ?

যা, তুই আমার লগে কথা কইচ না, কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর কবে ময়না ।

কান্দিচ না । আর তরে মারুম না । এই বাঁশী ছুঁইয়া কই, নিশি ব্যাকুল ভাবেই সাঙ্ঘনা দেয় ।

চোখ ঢেকেই জিজ্ঞেস করে ময়না, ঠিক কচ্ ত ?

হ, ঠিক কই । আর কোন দিন তরে মারুম না ।

ময়না ফিক করে হেসে ফেলে আবার বায়না ধবে, তবে আর একটা গৎ বাজা ?

নিশি আবার বাজাতে থাকে :

- রাধে তোর তবে ছল করে বাজাই বাঁশী ।

জটীলা কটীলা আছে নয়ন জলে ভাসি ॥

দূর থেকে ওদের ছেলেখেলা দেখে দেখে অস্থিনীর হাসিই পায় । আপন মনেই ভাবে, হ্যাঁ, ময়নাকে শিগ্গীর পার্বতীর জা করে ঘরে নিতে হবে । ওদের আর বেশী দিন দূরে রাখা ঠিক নয়.....আশায় আনন্দে দিল ভরে ওঠে অস্থিনীর । শক্ত করে হালের গুটি ধরে । হুকো টানতে টানতে দীহুও স্বপ্ন দেখে ।

মা লক্ষ্মীর রূপায় সংসারে এখন দু'পয়সা সঞ্চয় হচ্ছে । পাঁচিশ ভবির ওপর রূপো দিয়ে গঞ্জ থেকে খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার তৈরী করে আনে দীহু ময়নার জন্ত । এখন বাকী কোমরের বিছা, নাকছাবি, আর হাতের রুলি । কুম্ভম গামছার বাঁধন খুলেই দীহুর ওপর ফুঁসে ওঠে, কোলের পোলার বিয়া দিমু মুটে এই তিন পদ গয়না দিয়া নাকি ? তোমার আকল কি ! ভাত খাও না ছাই খাও ?

দীলু হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়, যা ছাও তাই খাই। তবে মছ তালইয় ত কিছু দিব।

হায় গরীব মাছুম। দেয় দেউক—না দেয় না দেউক। আমি হার ভরসায় থাকুম নাকি? বাড়ি ভইরা ইষ্টি কুটুম থাকব। তাগ কাছে আমার নাক কাটা যাইব না!

বেগতিক দেখে দীলুও সায় দেয়, হ হ, তুমি ঠিকই কইচ। সামনের হাটে সব আনন যাইব। এহন খাইবার ছাও। বড় খিদা পাইচে।

আনন যাইব না। আনন নাগবই। আর নাকছাবটা সোনার আনবা। কত আর দাম অইব? আমি ঐড়া দিয়াই বউয়েব মুখ দেখুম, হাটেব সওদা গুছাতে গুছাতে পুনরায় বংকাব তোলে কুছুম।

আইছা—আইছা তাই অইব। তামুক কি অইল? তাড়াতাড়ি তামুক ছাও এক ডিলুম।

আনচে তামুক। বাবারে বাবা, কইলকার গোয়া আর জুড়াইবার পারে না, দিনের মধ্যে চৈদে বার কইরা তামুক খাওয়ন!

কুছুমের কথা শেষ হতে না হতে ভঁকোব মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হয় পার্বতা।

দীলু হাতে যেন স্বগ পায়। তার কোন কথা না বাড়িয়ে ফুৎক ফুৎক শব্দে অবিরাম টানতে থাকে।

কুছুম হাটেব সওদা গুছিয়ে রেখে খাবাব বাড়তে যায়।

সামনের মাসেই নিশির বিয়ে। কুছুম তাড়া দিয়ে বাড়ির উঠোনে আরো ঢ'খানা ঘর ওঠায়। ছোট ছেলের বিয়ে। বলতে গেলে এই তো শেষ কাজ। আত্মীয়-কুটুম কাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। সকলে যদি আসে তাহলে উপস্থিত যা ঘর আছে তাতে কুলাবে না। কুছুমের ইচ্ছে, পাকা টিনের ঘরই হোক। কিন্তু দীলু সাহস পায় না। খাওয়া-দাওয়া বাড়ি খরচায় একগাদা টাকার দরকার। তাছাড়া গয়নাগাটিতেও নেহাত কম খরচা হলো না। এরপর আছে নিকট আত্মীয়দেব ব্যবহারের কাপড়-চোপড় দেওয়া। নানাদিক ভেবে খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে উঠানের ওপর ঢ'খানা কাঁচা ঘরই তোলে দীলু, বেশ বড়সড়। কুছুম এ নিয়ে আর কথা বাড়ার না। হাজার হোক, ও তো আর অবুঝ নয়। এই তো মাত্র বছর সাতেকের কথা জলের

ওপর ভাসছিল। ঠাকুরের অশেষ দয়া যে একটু কূল পেয়েছে। একা মাহুঘ, অতো না পেরে উঠলে করবে কি? খুব খুশী হতে না পারলেও বেশ যত্ন করেই কুহুম ঘর দু'খানার মেঝে লেপে পুঁছে তক্তকে ঝকঝকে করে, তোলে। মুড়ি ভাজা, ঠৈ ভাজা, হলুদ লক্ষা কোটা—কোন কিছুই বাদ থাকে না। আর তো মোটে কয়েকটা দিন। তারপর সারা বাড়ি উৎসবে মেতে উঠবে। অশ্বিনীর বিয়েতে সখ আহ্লাদ কিছুই হয়নি। আত্মীয়স্বজনও কাউকে তেমনভাবে জিজ্ঞাস কবতে পাবেনি। এবার সব সাব—সব বাসনা ভালভাবেই মেটাবে। গোছগাছের কাজে সাহায্য করবার জগ্ন মাসখানেক হয় মাকে লোক পাঠিয়ে আনিয়েছে। বুড়ো মাহুঘ, বসে বসে নিদেশ দিলেও অনেক স্খবিধে হবে। নিজের পেটের দশটি ছেলেমেয়েব বিয়ে দিয়েছে। কোন কিছুতেই ভুল হবার নয়! তাছাড়া নিশি তো আজীমা বলতে অজ্ঞান। একমাত্র আজীমা আর পার্বতীর কাছেই তো মনেব কথা খলে বলতে পারবে ও। আর তো সকলেই সম্মমেব পাত্র। আজীমাকে অনেক আগে কাছে পেয়ে নিশিও বেশ চান্দা হয়ে উঠেছে।

মধুরও তোড়জোড়েব অস্ত নেই। দীহুর সঙ্গে নিজের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে তো আর একমাত্র নাতনীব বিয়েতে চুপচাপ বসে থাকার জো নেই। মনেব সাব আহ্লাদকে তো আব সব সময় অবস্থার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। ময়নাকে কেন্দ্র করেই ঘর সংসাব। নইলে আব কিসের বন্ধন? যেদিকে খুশি চলে যেতে পারে। দুর্গা মা-কে নিয়ে তো কোন ভাবনাই নেই। ভোগ স্খ ত্যাগী—সম্মাসিনী। ও আছে তাই। নইলে একাকিনী পথ চলতেও ভয় পাবে না দুর্গা মা...নানাদিক ভেবে সাধ্যাতীত ভাবেই বিয়ের উৎসবে মাতে মধু। চরফুটনগরের নোড়ল দীহু বৈরাগী। তার কোলের ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে। দু'পক্ষেরই শেষ কাজ। বরযাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। চরফুটনগরের সকলে তো আসবেই। তাছাড়া চরধল্লা গেঁকেও কেউ কেউ আসছে। বিশেষ করে পলান ব্যাপারী আর তার বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো নিশ্চয়ই। ব্যাপারীর সঙ্গে বৈরাগীর গলায় গলায় ভাব। তাছাড়া চরফুটনগরের নতুন কুটুম হয়েছেন ব্যাপারী সাহেব। ধরতে গেলে তো দীহুর নিজেরই মেয়ে মেহেরা। করিম আর দীহুতে হরিহর আত্মা। দীহুই তো মধ্যস্থ হয়ে কাজ করে দিলে। আর কেউ না আহুক মেহেরা তো আসবেই। বড় ঘরের বউ হয়েছে। ওর খাতির যত্ন না করলে চরের মান থাকবে না।

দিনের পব দিন ভেবে ঠিক হয়, আর যাই হোক, সকলের মুখ উঁচা রাখতে হলে গতাহুগতিক ভাত-মাছ খাওয়ানো চলবে না। বৈরাগী তো শুনছি তিন নিঠাইয়ের ফলার দেবে। তা দিক, সে বড় মাহুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলবে না। কিন্তু এক পদ লিঠাই না খাওয়ালে আর কি করে ইজ্জৎ থাকে? রসগোল্লা যদি না-ই পারা যায় অমৃতি তো করতেই হবে। সস্তায় বেশ খাবাব। চরের মাহুষ বড় বড় ঢাকাই অমৃতি খুবই পছন্দ করবে। সঙ্গে কান্দনী ঘোষের চন্দনচড় দই! এতে যদি সর্বস্বাস্ত হতে হয় তবু করতে হবে। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলে ক্ষেত-খামার টাকা-কড়িব আর তেমন দবকারই বা কি। একে দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাই যথেষ্ট। তাতে যদি না চলে, দুর্গা মাকে সঙ্গে করে কোন তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে থাকবে। সেখানে তো আর ভাতের অভাব হবে না। দু'বেলা নামগান করো—পেট ভরে প্রসাদ পাও।...মধু বাড়ি খরচ নিয়ে দীহুর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে তলায় তলায় রামকান্তর শরনাপন্ন হয়। কবিতকর্মা রামকান্ত যেন হাতে আকাশের চাঁদ পায়। তার পরামর্শে কুমার বাহাদুর ক্ষেত-খামাব বাঁধা রেখে নগদ দু'শ টাকা কর্জ মঞ্জুর করেন। রামকান্তব সঙ্গে চপি চুপি একদিন কাছারিতে গিয়ে টাকা দু'শ নিয়ে আসে মধু। পথে পা দিয়ে মনটা একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু মধু সে ভাবনাকে আমল দেয় নি। জীবনে কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেনি। দয়াল চানের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে এক বছরের শস্ত বেচেই এ ঋণ শোধ দিতে পারবে। হাতে বিশেষ কোন টাকা ছিল না। নগদ দু'শ টাকার করকরে নোট পেয়ে উৎসাহ বেড়ে যায়। দীহুর মতো মধুও ঘরদোরের কাজ গুছাতে থাকে।

প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণের জন্ত দিন গুণতে থাকে। মোড়ল বাড়ির বিয়ে, শুধু শুধু মাছ ভাত কেউ খাবে না। কিন্তু কথাটা দীহুর কানে দেয় কে? একমাত্র ভরসা রামকান্ত। সে বললে মোড়ল কিছুতেই তার কথা ফেলতে পারবে না। উৎসাহী জনকয়েক রামকান্তকেই ধরে। চরে তো এ পর্যন্ত কেউ পাকা ফলার দিলেই না। আর মোড়ল ছাড়া দেবার ক্ষমতাই বা কার আছে? কথাটা রামকান্তরও মনে ধরে। প্রতিশ্রুতি দেয়, আজকের আসরেই সে উত্থাপন করবে।

সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের পর খোল বাজিয়ে অনেকক্ষণ নাম সংকীর্তন চলে। আজকের আসর বেশ জমেছে। হরিলুটের ব্যবস্থার মধ্যেও আজ একটু নতুনত্ব রয়েছে। বাতাসার সঙ্গে কিছু ফল মিষ্টি। নিশির বিয়ে উপলক্ষেই দীহু এ.

ব্যবস্থা করেছে। লুট হয়ে যায়। জয়ধ্বনির পর আসর ভাঙ্গে ভাঙ্গে, রামকান্ত উঠে, দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাসতে হাসতেই আরম্ভ করে, আপনারা যাবেন না। দীহুকাকার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আপনারা বহ্নন।...

রামকান্তর চরিত্রে যত দোষই থাক ভাগবতের আসরে সে ভাব গম্ভীর। কখনো কোনরকম বাচালতা করে না। কিন্তু আজকের তার এই বাচন ভঙ্গীতে দীহু একটু বিচলিতই হয়। হাঁ করে রামকান্তর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জনতার মধ্যেও অনেকের অবস্থা তদ্রূপ। কেবলমাত্র যারা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তারাই বসতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের গা টেপাটেপি করতে থাকে।

রামকান্ত সমতা রেখেই পুনরায় আরম্ভ করে, না না, চিন্তা-ভাবনা করবার মতো এমন কিছু আমি বলবো না মোড়লকাকা। তবে এঁরা সব বলছিলেন, নিশির বিয়েতে কেউ ভাত মাছ খাবে না।

হ হ তালই, তোমার কোলের পোলার বিয়াতে মিঠাই না খাওয়াইলে আমরা কেউ খামুই না, পড়নী মদন বিশ্বাস আরো জোর দিয়েই রামকান্তকে সমর্থন করে।

দীহু যেমন বিম্বিত হয়েছিল প্রস্তাব শুন তেমনি খুশী হয়। তবু বিনয় সহকারেই আমতা আমতা করে বাধা দেয়, দশজনের মিঠাই খাওয়াইবার ভাগি কি আমার অইব?

না, অইব না। বলি বৈরাগীর পো, আমাগ এক প্যাট মিঠাই খাওয়াইলে আর তোমার গোলা ফুরাইয়া বাইব না, আবার নিজের কথায় জোর দেয় মদন।

দীহু মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। রামকান্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে। পান্টা রামকান্তকেও ছ'চার কথা বলতে দেখা যায়। তারপর ত্রাঁকিয়েই ঘোষণা করে রামকান্ত, আপনারা শুনে খুশী হবেন। মোড়লকাকা আপনারদের প্রস্তাবে রাজী আছেন। পদ হবে লুচি, অমৃত, দৈ।

সমস্ত সভা উল্লাসে কেটে পড়ে। ঘরের ভেতরে কুহুমের কানেও কথাটা পৌঁছোয়। ওর মতো খুশী বোধ হয় আর কেউ হয়নি। নিশির হাতে তাড়াতাড়ি বাটা ভর্তি পান সেজে পাঠিয়ে দেয় সকলের জন্ত। এই তো শেষ কাজ। অধিনী নিশি যদি বাঁচে, ঠাকুরের দয়ায় যদি ওদের ঘরে কাছা-কাছা হয় তবেই না আবার বাড়িতে ঢোল সানাই বাজবে। কিন্তু সে তো অনেক

পরের কথা। তদ্দিন কে থাকবে কে থাকবে না তা ঠাকুরই জানেন। ঐ তো পাবতী এক ফোঁটা মেয়ে। ময়নাকে তো দুধেয় শিশু বললেই হয়। ওদের আবার ছেলে মেয়ে, তাদের আবার বিয়ে থা...না না, যা হয় এখনি হোক। নিশির বাপ তো আর বে-হিসেবী মানুষ নয়। কোমরের জোর বুঝেই চরহুদ লোককে মিঠাই খাওয়াতে চেয়েছে।...পার্বতীও নাচতে ইচ্ছে করে। দয়াল হরি আবার তাহলে মুখ তুলে তাকালেন! আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই তো আত্মীয়স্বজন বাড়ি ভবে যাবে। প্রত্যেকের পাত জুড়ে পরিবেশিত হবে সুগন্ধি গাওয়া পিয়ের গবম গবম লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা। বেগুন আর ডাল নিজেদের ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু গোটা কয়েক ফুলকপি আর মশলাপাতি গঞ্জ থেকে নগদ পয়সায় আনতে হবে। হাঁ, ফুলকপি চাই-ই। ফুলকপি কি জিনিস তা এ তল্লাটের কেউ কোনদিন চেখেও দেখেনি। কি করে রাঁধতে হয় তাও কেউ জানে না। এই জিনিসই সকলকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। বাপের বাড়ির দেশে সেইদিন বিয়েতে সর্বপ্রথম খেয়েছে ও এই স্বস্বাদু তরকারি। কি চমৎকার রান্না! গঞ্জের অনুল্যাঠাকুর তো শুনি ভাল রান্না জানে। তাকে দিয়েই যত্ন করে রাঁধাতে হবে। মাছ দিয়ে কাজ নেই। মাছের বদলে ফুলকপিই হোক। শীতের নতুন তরকারি চরের মানুষ খেয়ে তারিফই করবে। তবে মিষ্টিই যদি খাওয়াবে বলে স্থির করে থাকে নিশির বাপ—তাহলে শুধু অমৃতি নয়। ছানার মিষ্টি এক পদ করতেই হবে। কলাইর ডাল আর চাল বাটার মিঠাই আবার একটা মিঠাই নাকি? কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে কখনো শুধু এ মিঠাই খাওয়াবে না। মানুষ তো আর দশ দিন ওদের বাড়িতে খেতে আসছে না! একদিন খাবে ভাল করেই থাক।...ভাবতে ভাবতে ডুবে যায় কুসুম স্বপ্ন-মায়ার।

বাটা ভর্তি পান হুপুরি পেয়ে আবার সরগরম হয়ে ওটে আসর। যাদের সম্পর্কে আটকায় না তাদের কেউ কেউ নিশিকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করে। কেউ কেউ কুসুমের সুগৃহিণীপনার তারিফেও পঞ্চমুখ হয়। মদন দীহুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, কি তালই, আইজ খেইকাই জুলাপ নিমু নাকি?

দীহু মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। নিশি পানের বাটা রেখে পালায়। রাত এগারোটা নাগাদ আসর ভাঙে। পাকা ফলার খাওয়ার আনন্দ বুকে করে পড়শীদের সকলেই গদগদ হয়ে বাড়ি ফেরে। একরাত্রের মধ্যেই সমস্ত চরময়

খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায়। স্বামী পুত্রকে রাত্রের ভাত বেড়ে দিতে দিতে
 সবিস্ময়েই ভাবতে থাকে গিন্নী-বান্নিরা, পাকা ফলার খাওয়ানো কি সহজ কথা!
 মুঠো ভর্তি টাকা চাই! বৈরাগীর না জানি কত টাকা হয়েছে! ...বিস্ময়ে
 আনন্দে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু ঘুমোতে পারে না একজন। সে
 ক্ষ্যান্তমণি। খিটখিটে মেজাজ ক্ষ্যান্তর। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, বালবিধবা।
 শুচিবাই। হাতে পায়ে থক থক করছে পাকুই হাজা। জলে নামলে
 উঠবার নাম নেই। চোষট্টবাব ডব দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় নিশি
 কোমরে গামছা বেঁধে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। স্নানার্থী অনেকের গায়েই
 তাতে জলের ছিটা যায়! বিরক্ত হলেও মুখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু
 ক্ষ্যান্ত গর্জে ওঠে, মর মর মুখপোড়া। যম তরে চোখে দেখে নারে? মর মুখ
 পোড়া, মর, ...নিশির মাথাটা পারে তো চিবিয়ে খায়।

ভরা কলসী কাঁকালে করে কুসুমও সে সময় জল থেকে উঠে আসছিল।
 ক্ষ্যান্তর গালাগালে থমকে দাঁড়ায়। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের প্রাণ
 টনটনিয়ে ওঠে। কলসীর জল ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিশির ছ'গালে দুই
 ঠোঁকনা বসিয়ে দেয়। অল্প সকলে এসে না ধরলে হয়তো জলে চুবিয়েই ও
 মেরে ফেলতো নিশিকে। কেন ও যার তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়? রাগে
 ছুঁখে কেঁদেই ফেলে কুসুম। ক্ষ্যান্তর মুখে অনর্গল তুবড়ী ছুটে থাকে। কুসুমের
 সাধ্য নেই ওর সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে ওঠে। অল্প দশজনই যার যা মুখে আসে
 ক্ষ্যান্তর গালাগালের প্রত্যুত্তর দেয়। সেই থেকেই ক্ষ্যান্তর সঙ্গে কুসুমের
 কথা বন্ধ।

বন্ধ তো বন্ধ' ক্ষ্যান্ত কাকেও তোয়াক্কা করে না। বৈরাগী বউয়ের
 মতো অমন ঢের বড় মাহুর ওর দেখা আছে। ও কারো বাড়ি হাত পাততে
 যাবে না...

ছ'মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি একটি দিনের জন্মও বৈরাগী বাড়ি-মুখো হয়নি
 ক্ষ্যান্ত। ষাটে পথে কুসুমের চোখে চোখেও কোনদিন চায় নি। কিন্তু আজ
 যে বড় বিপদ! আর ক'টা দিন পরেই তো পাকা ফলারের ধুম লাগবে বৈরাগী
 বাড়িতে। চরের সকলেরই নিমজ্ঞ হবে। একা শুধু ও-ই যা বাদ যাবে।
 হায়রে কপাল। ঝগড়া কি কখনো পড়নীতে পড়নীতে হয় না। রাগের
 মাথায় না হয় ছুটো কথা অজায়ই বলেছি, তাই বলে কি তার কোন ক্ষমা নেই!
 মাথার ওপর চন্দ্র সূর্য আছে। তারাই এর বিচার করবে। এত দেমাক

ভাল নয়।...কথাটা কানে যাবার পর থেকে সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটকট করতে থাকে ক্ষ্যাস্ত।

পরের দিম কুসুম জলের কলসী কাঁখে করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ক্ষ্যাস্ত তাঁর গুলে দাঁত মাজতে মাজতে এসে হাজির হয়। বাব বার তাকাতে থাকে তলচোখে। দেখে দেখে হেসেই ফেলে কুসুম। সাহস পেয়ে ক্ষ্যাস্তই প্রথম মুগ খোলে, কিগ বইন, তোমার ছোট পোলার বলে বিয়া ?

কসুমও বগড়াব কথা ভুলে যায়। সোংসাঃই উত্তর করে, হ দাদী, বাইয় কইলাম ? তোমরা পাঁচজন না দেখলে আমাবে আর কেবা দেখব ?

ছাঃচে কি কয়। আমাগ পাড়ার কাম আমবা না দেখলে কেবা দেখব ? গোলোমোন্দ কিছু অইলে পাড়াব দুন্নাম অইব বা!—একট দম নিয়ে আবার আরস্ত করে, তা নিশাবে কয়াদন দেতি না ক্যান ? গাচ্ছ ভইব হরিআম পাইকা বইচে। আইজ বিকালে পাঠাইয়া দিয় অব।

কুসুম গদগদ হয়েই বাবা দেয়, না দাদী, অরে আব তোমবা আস্কারা দিয় না। তোমার গাছেব ডালপালা ভাইস্কা কিছু রাখব না। বড় দুই, ওড়া।

তাই কি, পোলাপানে দুষ্টামী করব নাত কি করব ? তুমি অব বিকালে পাঠাইয়া দিয়।

আইচ্ছা, হাসতে হাসতেই কুসুম অগ্রসর হতে যায়।

ক্ষ্যাস্ত বাবা দেয়, পাকা ফলার নাকি দিবা ?

তাইত ইচ্ছা আচে। এহন ঠাকুর জানে কি অইব। কামের কয়দিন কইলাম বাড়তে রানবার পারবা না।—আমাগ ঐহানেই খাইয়া লইয়া কাম কুলাইয়া দেওয়ন লাগব।

আইচ্ছা আইচ্ছা, আমারে আবার নিমন্তন করবার কি আচে ? আমি ত গরের (ঘরের) মাহুষই।

না, ও-কতা কইলে ছাড়ুম না। বিয়ার দিন হকালেই যাইবা। এহন আহি। নিশার বাপ আবার গঞ্জে যাইব। জিনিসপত্রের জায় দেওয়ন লাগব।

হ, যাও। যগিয় কাম, মুকের কতা নয়। শরীল বালো থাকলে নিচ্ছয় যামু।

শরীল বালো-মোন্দ বুজি না। যাওয়ন তোমারে লাগবই, ভিজ়ে কাপড়ে সপসপ করতে করতে কলসী কাঁখে বাড়ি করে কুসুম।

ক্যান্সার বাড় থেকেও একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যায়। বাব্বা, কাল থেকে কি ভাবনাই না চলছে! ঠাকুরের দয়ায় এখন পেটটা দুটো দিন ভাল থাকলে ঝাঁচি। সেই ছোটবেলায় একবার পাকা ফলার খেয়েছি আর এই বৃদ্ধো বয়সে আর একবার সুযোগ আসছে...ক্যান্সার ঝটপট গিয়ে জলে নামে।

॥ ১২ ॥

সাতই অপ্রান নিশির বিয়ের দিন। চোঁঠা অপ্রান গোপীনাথের আখড়ায় ভোগের ব্যবস্থা হয়। আধমণ চালের অন্ন-ভোগ। কেবল মাত্র সাধু সন্তদের নিমন্ত্রণ করা হবে। পঞ্চাশজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব প্রসাদ পাবেন। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অথও সাধু গাইবেন ভোগ-আরতি। মধু মণ্ডলও সদলবলে উপস্থিত থাকবে। সামান্য এই ব্যাপারে স্বজাতি জাতি কুটুম কাকেও বলা হবে না। তারা সকলে পাকা ফলার খাবে বৌভাতেব দিন। শুভকাজের আগে বৈষ্ণব-সেবা বৈরাগী বংশের রীতি। অস্থিনী বিয়েতে তো কেবল মাত্র নিয়ম রক্ষা হয়েছে। মাত্র পাঁচজন বৈষ্ণবকে সিধে দেওয়া হয়েছিল। সে তো গেছে এক চরম দুর্দিন। সখ আহ্লাদ তো দূরের কথা ভাল করে খাওয়া খাকার ঠিক ঠিকানাই ছিল না। আজ মা লক্ষ্মী কিচুটা মুখ তুলে চেয়েছেন। তাছাড়া এই তো শেষ কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনের সকল সাধ এবারেই মেটাতে হবে। কুলগুরুকেও বিয়েতে উপস্থিত থাকার জ্ঞান নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। ফকির বাড়িতেও আসার বসছে আসছে পূর্ণিমা দিন। তার বাড়ি ফুঁকেই তো নিশি বেঁচে উঠেছে। দয়াল চানের দয়ায় এখন বেশ সবল সুস্থই আছে। কে ভেবেছিল নিশি বাঁচবে তার আবার হবে বিয়ে? রোগ বালাই তো জন্ম থেকেই লেগে থাকতো। সাতটি কড়ির বিনিময়ে ফকিরের কাছে বাঁধা আছে নিশি। ফকিরেরই ছেলে নিশি। যদি তার দয়ায় রক্ষা হয়। তিন বছরের রোগা ছেলে কোলে করে ফকিরের আসনের সামনে এসে ব.স কুম্ভম। হুঁচোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরে পড়ছে। ডাক্তার কব্ৰেজ সাফ জবাব দিয়েছে, আশা নেই। হাড় জির জির করছে সারা অঙ্গে। মায়ের প্রাণ দণ্ডে দণ্ডে মরছে। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটাকে তো ষমকে দিয়েছে; তবে কি নিশিও বাঁচবে না?...না বাঁচারই কথা ছিল। কিন্তু করিমের হাতে পড়ে সে-যাত্রা বেঁচে যায় নিশি। শুধু বেঁচেই যায় না, দেহও পুঁট

হতে থাকুক। সেই থেকেই তো ফকিরের কাছে বাঁধা আছে। করিম বলে, দয়াল চানেরই ছেলে। দশ বছর পার হলে ফল-মিষ্টি দিয়ে ওজন দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ দশ বছর ভীষণ ফাঁড়া আছে।

দশ পার হয়ে বারোও পার হতে চলে। কুসুম ছাড়াবার কথা শ্রুণেও আনে না। থাক না ফকিরের কাছে বাঁধা—তবু তো ছেলে ওর বেঁচে আছে। মায়ের বুক ঠাণ্ডা আছে।

বিয়ের আগে করিমই প্রস্তাব করে ছাড়িয়ে নিতে। আর কোন ভয় নেই। এখন চুল কাটতেও আপত্তি নেই। এ ক'বছর তো মাথায় ক্ষুর কাঁচি ছোঁয়ানোও নিষেধ ছিল। নিশির বিয়ে তো করিমের নিজের ছেলেরই বিয়ে। স্ততরাং শুভকাজের আগে দয়াল চানের আসব তো বসবেই। সমস্ত রাত্রি গান হবে, একুশ মোমবাতি জ্বলবে, নানা উপকরণে হবে শিল্পী নিবেদন। তারপর ফল-মিষ্টি একদিকে আর একদিকে নিশিকে বসিয়ে ওজন দিতে হবে। আশ-পাশেব আরো দশ বিশজন গুণীকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। সকলে মিলে এক সন্ধে দয়াল চানরে ডাকবে। নিশির বিয়ে ধুমধামের সন্ধেই হবে। আতসবাজীর কোয়ারা ছুটবে। হাউই-এব রডে আকাশে ফুটবে লক্ষ তারার কুসুম। সারা বাড়ি সারা চর ঝলমল করবে রংমশালের রোশনাইতে। শুধু ঢোল সানাই-ই বাজবে না। ইংরেজী ব্যাণ্ডও বাজবে। পলান ব্যাপারী তার পোলার সাদীতে যে ব্যাণ্ড আনিয়েছিল তাই আসবে। ...আহ্লাদে ডগমগ করিম। মনের কথা একদিন দীহুকে খুলেই বলে।

সখ দীহুরও হয়। কিন্তু কোথায় পলান ব্যাপারী—আর কোথায় দীহু বৈরাগী! কিসে আর কিসে। পলান ব্যাপারীর সন্ধে কি আর ওর তুলনা হয়? উচ্ছ্বাস চেপেই দীহু বলে, কি যান্ কও ফকিরের পো? ব্যাপারী সাবের লগে কি আর আমরা পাইরা উঠুম?

দীহুর উত্তরে করিমের টনক নড়ে। সে ঠিকই। চরধল্লার সমস্ত লোক অতিথিসহ তিনদিন সমানে ব্যাপারী সাহেবের বাড়িতে খেয়েছে। চরফুট-নগরের সকলেও স্ত্রী পুরুষ অতিথি অভ্যাগতসহ একদিন খেয়েছে। খাওয়া নয়তো যেন পেটে জ্বালা বাঁধা। মাছ, মাংস, মিষ্টির বিপুল আয়োজন। মিভা দীহু আর কি করে পারবে তার সন্ধে পাল্লা দিতে। রূপোর গহনা ক'ধানাই না হয় আমি দিয়েছি কিন্তু সোনার তিন পদ তো ব্যাপারী সাহেবই দিয়েছেন মেহেরাকে। গলার বিস্কুট হারছড়া পাঁচ ভরির কম হবে না।

অশুনতি পয়সার মালিক ব্যাপারী সাহেব। তাব সঙ্গে কি আর আমাদের চরের
মাঙ্কষের তুলনা হয়?—গলার স্বরটা একটু খাদে নামিয়েই কবিম উত্তর করে,
না পারি না পারুম। তাই বইলা সক আল্লাদ ককম না নাকি বাপজানের
সাদীতে?

হ, করবা। তবে ঢোল সানাই দিয়াই সাবন লাগব।

ইস, কি যান কও তুমি। ইংরাজী বাজনা তোমাব আননই লাগব!

খালি বাজনাই হনবা, খাইবা না কিছ?

খামু না ক্যান? পাকা ফলাবেব জায় না তুমি ধইবাই থুইচ?

পাকা ফলারও খাইবা আবার ইংবাজী বাজনাও হনবা?

হ, তাই খামু—তাই হুমুম।

তাইলে তোমার ধরে সিঁদ কাটন লাগব।

পাইবা এই কলাডা, ডান হাতের বুডো আঙুলটা উঁচু করে দেখায় কবিম।

কথা আর উভয়েব মধ্যে এগোয় না। যাকে নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল
সেই পলান ব্যাপারীই আজ একটু সকাল সকাল এসে হাজিব হয়। প্রায়
প্রত্যহই সন্ধ্যাবেলা আসে পলান। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাণেব আবেগে
দয়াল চানরে ডাকে। পায়ের বেদনাটা এখন ঢের কম। অমাবস্থা পূর্ণিমায়
একটু চাগাড় দেয় বটে। তবে করিম বলেছে, আসছে ধামাল উৎসবে বিশেষ
ক্রিয়া করবে। আশা করা যায় সম্পূর্ণই সেরে যাবে। যদি যায় তো ভালই।
না গেলেও ক্ষতি নেই। চলাফেরা এখন একরকম কবে করা যাচ্ছে। উঠোনে
পা দিয়ে করিমকে বুড়ো আঙুল উঁচাতে দেখে হাসতে হাসতেই রসিকতা
করে পলান, ভর সাইন্জ্যা বেলাই (সন্ধ্যা বেলা) যে কলা দেহাইলেন-
বরাতে আইজ কলাই আছে নাকি?

তোবা—তোবা—কি যান কন! আপনারে কলা দেহামু ক্যান? কলা
দেহাইলাম এই ইনিরে, দীক্ষকে দেখিয়ে উত্তর করে করিম।

মোড়ালর পো'রে কলা দেহাইলেন।

না দেহাইয়া আর ককম কি। উনি যে ধরে সিঁদ দিবার চায়! ধরে ভ
ওডা ছাড়া আর কিছু নাই।

সিঁদ দিব।

হ, সিঁদ দিব। নাইলে নাকি পোলা বিয়ার পাকা ফলারের ধরচ
জুটব না।

তোবা—তোবা! দীঘ্ন মোড়ল পোলার সাদীতে পাকা ফলার দিব তা একবার ক্যান, দশবার দশ গায়ের নোকরে দিবার পারে। সিঁদ দিবার যাইব কোন ছুথো?

হেই কতাডাই কন ওনারে। উনিত এহন থেইকাই ওল্লার গোয়ার থনে (পিপড়ের পাছা থেকে) গুড় টিপবার নৈচে, পলানের কথার জবাব দিয়ে মুহু মুহু হাসতে থাকে করিম।

বাপারী সাব ত নিজের মতনই হুগলেবে ভাবেন! বলি একবারের ঠেলাতেই ত পাছা দিয়া ধুমা বাইরইব তার আবার দশবার, করিমকে ডিঙিয়ে দিল্ল উত্তর করে।

পলান হাসতে হাসতেই বাবা দেয়, আরে যান! কি যান্ কন্! আল্লার মজিতে ফ্যাতের লক্ষ্মীত দিন দিনই ফাইপা উঠচে আপনার ঘরে। মুটে দশ টেকা লাগব। দিমুনে ইলাহিরে কইয়া। তিন দিন ভইরা মাং কইরা রাখবনে চররে। বড় বালো (ভাল) বাজায় ইলাহির দল।

দ-শ টে-কা! বিস্ময় করে পড়ে দীঘ্নর কণ্ঠে।

হ, দশ টেকা। এমুন কিচ বেশী না। দশজন নোক তিন দিন ধইরা সমানে বাজাইব।

আমি কই, আপনে ঠিক কইরা ফালান। বৈরাগীর পো'র ত সবটাতেই দোন্দর মোন্দর (দ্বিধা) করন চাই; কবিম জোরের সঙ্গেই সায় দেয়।

পলান বলে, হ হ বৈরাগীর পো, টেকা পয়সা জমাইবেন কার লেইগা? লগে কইরা আছেনও নাই লগে কইরা যাইবেনও না। দয়াল চান যা ছান দশজনেরে লইয়া ফুঁতি কইরা যান।

ধন দৌলতের ভাবনা দীঘ্নও বেশী ভাবে না। তবে হিসেবের বাইরে খরচ করতে ভয় হয় ওর। কারো কাছে হাত পাততেও লজ্জা বোধ করে। সংসারের খরচা তো দিন দিনই বাড়ছে। মাত্র তো ঐ বিঘা কয়েক জমি। জমানো তো দূরের কথা সব দিক বজায় রাখাই দুঃসাপ্য। কিন্তু সকলেই যখন বলছে তখন হোক ইংরেজী বাজনা। নিশির মা'ও খুলী হবে'খন। ছোট পোলার বিয়েতে তো কি করবে ঠিকই করতে পারছে না বেচারা। যাই কেন হোক না, বিয়েতে ব্যাণ্ড পাটি না হলে জমেই না।...ভাবনা রেখে প্রকাশেই সায় দেয় দীঘ্ন, তবে তাই ঠিক কইরা ফালান। আপনাগ দশজনের কথাত আর ফেলবার পারি না ঠেকলে আপনাগই চালাইবার লাগব।

পলান বলে, আরে চালাইবাব যে মালিক হে-ই চালাইব। আমরা কেরা ?
আহেন, এহন দয়াল চানরে একডু ডাকি। ককির সাব, একতারাডা লন।

একতাড়া আসে—সঙ্গে পান স্থপুরি। তিনজনে মৌজ করে পান তামাক
খেয়ে প্রাণ খুলে গাইতে থাকে :

(ও মন) আছে আপন ধবে-বে তোমাব

আছে আপন ধবে।

জ্ঞানব একটা বাতি জালিয়ে

তালাস কইরে দেখলি নাবে ॥

ছয় কোনাতে ছয় জন চোবা

পেইতে আছে বিষম মোড়া

ফাঁকে জুখে পাইলে পবে

ঠাইসা বুঝি ধবেব তবে ॥

॥ ১৩ ॥

আজ বহু প্রত্যাশিত সাতই অস্থান। গতকাল ভোর থেকেই দীঘুর
বাড়িতে পলে পলে ব্যাণ্ড বাজছে। সমস্ত চরফুটনগরই যেন তালে তালে
নাচছে। দীঘুর বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়াব ধুম নেই। কেবল বিয়েব
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াটুকুই সম্পন্ন হবে। আর যারা বরযাত্রী যাবে তাদের
সময় মতো ডাক খোঁজ করা। আজকের যত বন্ধি ঝামেলা মধুর বাড়িতে।
মঙ্গল উষায় ময়নার গায়ে-হলুদ হয়েছে। পুরনারীরা কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে
গান করেছে। ঘাটে গিয়ে জল-ভবা, বরণ ডালা সাজানো, ময়নার মুখে ক্ষীর
চিনি দেয়া—সবই একে একে করে চলছে এয়োতিরা।

শেষ রাত থেকে মণ্ডল বাড়িতে শুরু হয়েছে নহবত। মধু নাম-করা
কার্তনিন্যা। লীলা কীর্তন কবে করে কাব্য-রসে রসিক। চারুকলায় কোথায়
কি প্রয়োজন সে রসবোধ ওর আছে। বিয়েতে নহবত ওর মনের মতো বাজনা।
পলে পলে রাগ রাগিনীর সমতা রেখে বাজবে সানাই—কাড়া নাকাড়া। এর
চেয়ে স্নসন্মত বাজনা আর কি হতে পারে ? দীঘু ইংরেজী ব্যাণ্ড করেছে
ককক—ও কোন মস্তব্য করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িতে বাজবে শুধু ঢোল,
সানাই আর কঁাসর! এ শুধু অবস্থার কথা নয়। রুচির কথা। অবশ্য দীঘুর

মতো ও-ও যদি পাঁচজনের পাতে রসগোল্লা দিতে পারতো তা হলে খুশীই হতো। মিষ্টি বলতে তো ছানার মিষ্টিই বোঝায়। অমৃতি, বৃদে, আবার একটা মিষ্টি হলো নাকি? কিন্তু কি করা যাবে? হাতে আর একটিও বাড়তি টাকা নেই। টায় টায় কর্দ করা হয়েছে। লুচি, অমৃতি, আর রসকরা। বৃদে ওর ছ'চক্ষের বাব। বাঙ্গালীর খাবাবই নয় ও। টেনেটেনে রসগোল্লা অবশি হয়ে যেতো। কিন্তু বরযাত্রীকে পাকা ফলার খাইয়ে তো আর ময়নাকে খালি গায়ে শবুর বাড়ি পাঠানো যাবে না। বৈরাগী না হয় তার নিজের উদারতা দেখিয়েছে। একটা কড়িও যৌতুক চায়নি। কিন্তু তাই বলে বিয়েব কনেকে কিছু না দিয়ে পারা যায় কি করে? পাঁচজনেই বা বলবে কি? অগপশ্চাৎ ভেবেই মধু তালিকা থেকে রসগোল্লা বাদ দিয়েছে।

দক্ষিণ ভিটর বড় ঘরখানায় বসেছে ভিয়েন। তিন মণ ময়দার লুচি ভাজা হবে। অমৃতি মন দেড়েক। এছাড়া—রসকরা, ডাল, ডালনা, বেগুন ভাজা। কন্দনী ঘোষের চন্দনচূর দইও প্রচুর পরিমাণে সকলকে দেয়া হবে। চরের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে দীল্লুর মতো চরধলার সকলকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বেছে বেছে মাত্র কয়েক ঘরকে। পলান ব্যাপারী আর তার জাতি-গোষ্ঠীরা তো এমনতেই বরযাত্রী হয়ে আসছে। তবু নিজের তবফ পেকে নিমন্ত্রণ করে মুখ রক্ষা করা। নয় তো ব্যাপারী সাহেব কি মনে করবেন। ..

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। অম্বানের বেলা খুবই ছোট। তড়িৎতড়িৎ সব গুঁহাঁড়ে গিয়েও সময়ের সঙ্গে পারা যায় না। কিন্তু দীল্লু বৈরাগী যে রকম খুঁতখুঁতে মানুষ তাতে পাঁজি-পুথি ঠিক রেখে কাজ করতে না পারলে ঝগড়াই বাঁধবে। মধুর দম নেবার ফুরসত নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা অবশ্য যথেষ্টই সাহায্য করছে। কিন্তু সেতো শুধু হাঁটা খাটার ব্যাপারে। একটা বিয়েতে আনুষ্ঠানিক ঝামেলাই কি কম? সে সব তো ওর নিজেরই করতে হচ্ছে। বিকেল চারটে না বাজতেই কনে সাজাতে তাড়া দেয় মধু। চমৎকার মানিয়েছে ময়নাকে লাল টুকটুকে চেলা খানায়। চন্দন কাজলে ঢলঢলে মুখখানা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তবু তো সারাদিন উপোস যাচ্ছে। সারা দিনে খেয়েছে মাত্র একবাটি দই আর খই। যে মানুষ দিনে অন্ততঃ সাত আটবার খায় তার পক্ষে এ কম কথা নয়। কিন্তু ময়না

আজ লক্ষী মেয়ে । এতটুকুও গোলমাল করছে না । নতুন গয়নাগুলো শরীরের সঙ্গে লেপটে ধরেছে । যেন পটে আঁকা ছবি ।

বিকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই বরযাত্রীদের মধ্যে সাজসাজ রব ওঠে । ব্যাণ্ড বাজতে থাকে 'তালে তালে । চরধল্লা থেকে পলান ব্যাপারী আর কাশেম আসে । মেহেব' সকালেই এসেছে । নিশির বিয়ে তো ওর ছোট ভাইয়েবই বিয়ে । বউমার হাতে পলান একখানা আলপাকার শাড়ী পাঠিয়েছে । নতুন কুটুমিতা—আলপাকাব না দিলে ইজ্জৎ থাকে না । গঞ্জের হাট থেকে সাত টাকা বাবো আনা দিয়ে এনেছে এ শাড়ী । চামীর ঘরে এত দামের শাড়ী দেখে হয়তো অবাকই হবে অনেকে । তা হোক । সামান্য এটুকু না দিলে ইষ্টতা থাকে কি করে ? কুটুমের কুটুম দীলু বৈবাগী । শুধু শাড়ী নয়, শাড়ীর সঙ্গে এক ঠাঁড়ি মিঠাইও পাঠায় পলান ।

ধরতে গেলে কাশেম তো দীলুব জামাই-ই । নিশির চেয়ে বছর তিনেকের বড় । শালাব বিয়েতে বরযাত্রী বাচ্ছে ও, স্ততরাং কোনরকম খুঁত থাকলে চলবে না । একে চব্বধল্লার আত্মরে গোপাল, তাতে আবার হালে সাদী হয়েছে । সাজগোজের বাহাব কাশেমেরই বেনী । বুটদার বিলেতী অর্গেণ্ডীর পাঞ্জাবীর নীচ জাপানী সিন্ধের জালি গোলাপী গেন্জী । পরনে কালো ইঞ্চি পাড়ের সিমলাই কোরা ধুতি । পায়ে ডারবি স্ন । চিকন করে চুল ছাটা । ভূরভূব করছে লেবুব তেলের খশবু । বুক পকেটে লাল সিন্ধের কমালখানা কিঞ্চিং মস্তকের দিকে উড্ডীন । ঠিকবে বেকছে অগুরর উগ্রগন্ধ । এক শিশি অগুর গঞ্জ থেকে আনিয়েছিল কাশেম । অর্ধেক কমালে ঢেলেছে । বাকীটুকু খবচ হয়েছে বরযাত্রীদের আব দশজনকে বিলোতে । পলানও কয়েক ফোঁটা দাড়িতে বুলিয়ে নিয়েছে । বিয়েতে একটু রং মশলা খরচ না হলে আবার বিয়ে কি ? মজাদাব গন্ধই অগুরতে । নিজের দাড়ির স্নবাসে নিজেই মাতোয়ারা । কাশেমের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে করিম আর দীলুর গালেও কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে দেয় পলান । খশীর বান ঢাকে চোখে মুখে । করিমকেই মানিয়েছে ভাল । সাদা লুঙ্গি, সাদা আলখাল্লা, মাথায় বেতের টুপি । পলান পরেছে সবুজ লুঙ্গি আর সাদা ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী । দীলু তার বরাবরের বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছে । হাফ হাতা বুক কাটা নিমার ওপর ঢাকাই সাদা চাদরখানা কাঁধের ওপর খোপানো ।

ব্যাণ্ড এবার আরো জোরালো সুরে বাজতে থাকে । মদন, আনন্দ, রহিম,

ইলাহি বরযাত্রীদের প্রায় সকলেই এসে জড় হয়। আজ আর বৈরাগী বাড়িতে থাওয়া দাওয়ার পাট নেই! শুধু পান, বিড়ি, তামাক। ডান হাতের ব্যাপার আজ মধুর বাড়িতে। মদনের আর তর সয় না। সকলের চেয়ে সে-ই বেশী উৎসাহী বরযাত্রী। পেট নয় তো যেন একখানা খুদে জালা। আল্ থেকে গরু আনতে গিয়ে মণ্ডল বাড়িতে রান্নার খশবু শুঁকে এসেছে। গরম গরম গাওয়া দ্বি়ের লুচি—সঙ্গে ডাল ডালনা দই মিষ্ট।...ন', আর কত দেরি করবে এরা! গি়েদয় যে পেট জলছে...

সকলের সঙ্গে বসে হঁকো খচ্ছিল দীহু, মদন কাছে এসে তাড়া দেয়, কৈগ কাকা, তেমরা আর কত দেরি করবা? বেলা না গেল, ইআর পর গিয়া কি গাব লগন পাইবা?

দীহু হঁকো খেও খেতেই বলে, হা বাপ, তর কাহীরে (কাকীমাকে) একটু ভাড়া দেত। শিগগীর নিশারে বাইর কইরা দেউক।

দীহুর সমর্থন পেয়ে মদন তক্ষুনি ভেতর বাড়িতে ছোট্টে। আর বেশী দেরি হয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিশি এসে পালকিতে ওঠে।

চমৎকার মানিয়েছে নিশিকে। হলুদ মাথানো লালপাড় ধুতি পারনে। গলায় নতুন কাঠের মালা। গায়ে বন্দাবনী ছাপার রেশমী চাদর। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশি, ছুরি ও কচি কলার-মাজ। চন্দন চর্চিত ললাট-কপোল। সাদা সোলার টোপের মাথায়। মুখখানা হাসি হাসি।

এয়োতিদের বরণ হয়ে যায়! কসুম আসে মাতৃধারা দিতে। ডান হাতের তালুতে দুখ রেখে কসুমই চুইয়ে তা নিশির মুখে দেয়। একে একে তিন বার। ভাবখানা, আমি তোমাকে মাতৃধারা দিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার সেবার জগু দাসী আনতে যাচ্ছ।...চিরাচরিত প্রথায় প্রতিজ্ঞা করে নিশি। কুসুম প্রাণ খলে আশীর্বাদ করে ওকে। নিশি এসে ওঠে পালকিতে। ব্যাঙ এবার আরো জ্বোরে বাজতে থাকে। তালে তালে চলে শোভাযাত্রা। চ্যাংড়া বরযাত্রীরা সব আগে আগে—মাঝখানে পালকি। সর্বশেষ অভিভাবকেরা। কুমুমের ভাইপোদের হাতে রংমশাল। মাতুল পুলিন আর মদন ছাড়ছে তুবড়ী। হাউইয়ের ভার কাশেমের ওপর, খুব সতর্ক হয়েই একটার পর একটা ছেড়ে চলেছে কাশেম। আকাশে লক্ষ তারার দীপালি।...

বিয়ে গোধূলি লগ্নে। কিন্তু সমস্ত চর ঘুরে, শোভাযাত্রা মণ্ডল বাড়িতে পৌঁছতে এক প্রহর রাত হয়ে যায়। পরের লগ্ন সেই রাত তিনটেয়। বর-

কনের খুব কষ্ট হবে। তা আর করা কি? পাঁচজনকে নিয়েই কাজ। কাউকে কিছু বলা যাবে না। এখন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।...

১৫. বরযাত্রীরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মগলবাড়ি উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেখানকার ক্যাণ্ডিপাটিও সমানে পাল্লা দিয়ে বাজতে থাকে। সকাল থেকে শুধু ঢোল, কুঁসুর, নহবত-ই বাজছিল। এবার শুরু হয়েছে ব্যাণ্ড।

নিশিকে পালকি থেকে বরণ করে তুলে নিয়ে যায় এয়োতিবা প্রতীক্ষাগৃহে। স্বতন্ত্র নিয়ে না হবে ততক্ষণ বব-কনের চোখোচোখি হতে নেই। বাসরঘরে একা শুধু ময়নাই আছে। ওর খেলার সার্থীরা সারাদিন ঘিরে ছিল ওকে। এবার বরকে পেয়ে সকলে এসে জড় হয় প্রতীক্ষাগৃহে। এ-কথায় সে-কথায় চলে হাসি-তামাসা। নিশিকে বাঁশা বাজাবার জগুও কেউ কেউ আঙ্গার কবে। কিন্তু নিশির মুখে সাড়াশব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে একটুখানি মিষ্টি হাসি খেলো যাচ্ছে ওর নিম্ন ওষ্ঠে। ঠাকুরমা দিদিমা সম্পর্কের বর্ষীয়সীরা ফোড়ন দেয়, তরা কচ্ কিলো ছুঁড়ীরা। নিশি তগ বাঁশী হনাইব। তরা কি স্বর রাধা (রাধা)?

রাধা না আইলে বুকি আর বাঁশী হনা (শোনান) যায় মা ঠাকুরমা? বিশ্বাস বাড়ির তুলসী মুচকি হেসে আড় নয়নে বাধা দেয়।

অল ছুঁড়ী—না। বাঁশী যদি হনবার চাস তয় কদমতলায় যাইচ—যমুনায়। কিগ নাগর, তাই না? তুলসীর কথার জবাব দিয়ে নিশিকে প্রশ্ন করে ঠাকুরমা।

নিশি হেসে হেসেই স্বকীয়তা রক্ষা কবে।

তর তর করছে মগলবাড়ির মেটে উঠোন। উপরে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চার কোণে জ্বলছে চাবটে গ্যাসের আলো। বরযাত্রীরা দাওয়ার ওপর বসে পান শ্রমাক নিয়ে ব্যস্ত। কলার পাতা আর মাটির গ্লাস দিয়ে সারবন্দী জালগা করা হয়েছে। স্বজাতি সকলে এক বৈঠকেই বসে। করিম, পলান, কাশেম, রহিম প্রভৃতি মুসলমান অখিতরা বসে পৃথক বৈঠকে। ফকিরের আসরে একত্র পান ভোজনে কারো কোন আপত্তি না থাকলেও সামাজিক ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেখানে সকলে গুরুবাদী। সে গুরু হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক সকলেই তার মন্ত্রশিষ্য। কোনরকম

ভেদভেদ নাই তাদের মধ্যে। গুরুর আচার আচরণই সকলের আচার আচরণ। কিন্তু যেখানে সামাজিক ব্যাপার সেখানে ধর্মীয় রীতি না মেনে উপায় নাই। নিখাস পাড়ার মোড়ল গোষ্ঠে বিশ্বাস একসময় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শুধু দীঘর সমর্থন না থাকতেই আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু গোষ্ঠীর কোন সমর্থক ছিল না একথা বলা যায় না। ফকিরের যে যত বড় ভক্তই কেন হোক না সামাজিক ব্যাপার কেউ কাবো গণ্ডী ভাঙতে বাজী নয়। অন্ততঃ এখনো সে ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়ে এ বাস্তব উপলব্ধি দীঘর হয়েছে। স্বতরাং ও চায় না নিজের মতবাদ কারো ওপর জোর কবে চাপিয়ে দেয়। তাতে আর যা-ই হোক বিভেদ দূর হবে না। বিভেদের বীজ অন্তর থেকেই মুছে ফেলতে হবে। এবং তা সম্ভবপর হবে পরম্পরের মেলোমেশায়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যার যার সামাজিক রীতি মেনে চলাই শির হয। গোষ্ঠে আর মাথা তুলতে পারে না। কাশেমের বিয়েতে পলানও তার হিন্দু অতিথিদের অগ্র পৃথক বন্দোবস্ত কবেছিল। তাতে পীত্বের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে। মধুও সেই রাস্তাই বেছে। পলানেব চেয়ে মধুর স্বামেলা আরো কম। পলান খাইয়েছে মাছ, মাংস। মধু খাওয়াচ্ছে লুচি, মিষ্টি। কে কবে এ নিদান জাহির কবেছে জানা যায় না। ঘৃতপক্ক দ্রব্য নাকি কোন দোষ নেই। বিশেষ করে লুচি মিষ্টিতে। স্বতরাং বৈঠকেই শুধু আলাদা—পরিবেশনকারী এক এবং অভিন্ন। উঠোনে শামিয়ানার নীচে বসে থাকে স্বজাতির। আর দক্ষিণ ভিটির বারান্দায় বসে থাকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অতিথি-বন্ধুরা। পরম্পর দেখেছে পরম্পরের মুখ, তবু আছে ব্যবধান। এ যেন একই নদীর দুই তীর। প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা রয়েছে শাবার প্রত্যেকেরই একাঙ্গ।

লুচি ভেজে কল পাচ্ছে না দু'জন ময়রা। গরম গরম পাতে পড়ছে কি নেই। তরকারি আসে তো লুচি নেই। লুচি আসে তো তরকারি সাক। পরিবেশন করছে দু'জন ঠাকুর। গঞ্জের, জনকয়েক বাবু ভুইঞাদের নিমন্ত্রণ করেছে মধু। স্বতরাং সতর্ক হয়েই হাঁড়ি হেঁশেলের ছোঁয়াচ বাঁচাতে হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে বরযাত্রীদের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বাবেই সব চুকে যাবে।

বড় ভাল হতো যদি গোধূলি লগ্নে বিয়েটা হয়ে যেতো। মেয়েদের বৈঠক উঠতেও রাত দশটার বেশী হতো না। বাড়ির লোকের খেতে শুছোতে বড় জোর বারোটা। যজ্ঞি বাড়িতে এতো সামান্য রাত। প্রচুর সময় পাওয়া

যেতো ঘুমোবার। এখন সব কাজ শেষ করেও বিয়ের জন্তু জেগে থাকতে হবে। তা আর কি করা, কুসুমকে তো আর কিছু বলা যাবে না! কাঁছের থেকে কাছে, বৈরাগী একটু তাড়া দিলেই শতো।...মধু ময়না-নিশির জন্তু ভাবতে থাকে। খিদেয় বড় কষ্ট পাবে বেচারারা।

বৈঠকে ভাজা, ডাল, ডালনা পড়েছে। এরপব পড়বে চাটনী, দই, মিষ্টি। মধু গলবন্দ হয়ে যাচাই করে, ঠাকুর, গবম গরম কয়খান লুচি নিয়া আহ। কই ব্যাপারী সাব, কিছু যে খাইলেনই না? রান্দন বুঝি বালো অয় নাই?—পলানকে লক্ষ্য করেই বলে মধু।

পলান দাত বার করেই উত্তর দেয়, কন কি মোঙের পো। প্যাট যে ফইলা জয়ঢাক অইচে! আর রাখম কোন হানে?

করিম বাধা দেয়, মোঙলের পো, ব্যাপারী সাবরে ঠকাইবাব চাইয়েন না। মিঠাইর লাইগা জাগা রাখম লাগব ত।

মিঠাই আর আপনাগ পাতে দিবার পারলাম কই? আনা চাইল (আতপ চাল) আর কালাইব ডাইলের ডেলা কত খাইবেন?—সবিনয়ে মধু উত্তর করে।

কি কন আপনে? আমিত্তি (অমৃতি) কি খারাপ মিঠাই নাকি? আমাব কাছে ত ঘুব বালো মিঠাই, পলান বলে।

কেহুন, কইচিলাম না? লুচি রাইখা গঙা পাঁচেক আমিত্তি ফেইলা ছান উনার পাতে, করিম টিপ্তনী কাটে।

‘ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি ত কলা খাই না,’ বুজলেননি মোঙলের পো, পাঁচ গঙা মিঠাই কার লাগব?—পলান পাল্টা জবাব দেয়।

আমার গরীবের বাড়ি, আপনাবা যে দয়া কইরা আইচেন সেই আমার কপাল. বদাগুতা জানায় মধু।

গরীব! গরীব দনিব (বনীর) কি কতা ইহানে! আমাগ মোছলমানিব বিয়ায় ঘাবার কেব' কবে ছুচি মিঠাই কবে?—পলান বলে।

ছুচি মিঠাই আপনারা করবেন ক্যান? আপনারা যে নওয়াব বাদশার জাত। কালিয়া কোরমা খাওয়া অব্বাস (অভ্যাস), তাহাতে তাহাতে মধু জবাব দেয়।

হ, কেরা কত কালিয়া কোরমা খায় ছাহা আছে। পেইজ পাস্তা জোটে না তার আবার কালিয়া কোরমা। আপনি ঐ চ্যাংড়াগ দিগে যান। আমাগ

যা লাগব আমরা চাইয়াই নিম্নে। পাক বড় বালো হৈছে, খোলাখলিই উচ্ছ্বাস জানায় পলান !

মধু হাত জোড় কবে এসে দাঁড়ায় পুলিন আর মদনের কাছে। কিছু বলবার আগে মদন স্লে দেয় ওকে কাশেমের কাছে। বলে, আমাগ কিছু কওয়ন লাগব না। প্যাট যতক্ষণ আচে আমরাও ততক্ষণ আচি। গণ্ডা দশেক কইরা লুচি টান্ছি! এহন মিঠাইডা দেহন লাগব। আপনাগ জামাইর কি লাগব ছাহেন। কাশেম ভাই ত কোন কিছু দিবার আগেই জোড়আত কইবা বয়।

পুলিন আর মদনকে ছেড়ে মধু আসে কাশেমের কাছে। বলে, কি বাবাজী, কিছুই ত খাইলা না ?

বেচারি কাশেম লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সতি, বিশেষ কিছু খেতে পারেনি ও। মাছ মাংস না হলে ওর রোচে না। তবু ভদ্রতা রেখেই জবাব দেয়, আমাবে কিছু কওয়ন লাগব না। আপনে বহেন গা (ব:সন গিয়ে)।...

একে একে বরযাত্রীদের সকলকে ভালভাবে যাচাই ক:ব মধু অন্নাদিকে তাল দিতে যায়। বাত ন'টার মধ্যেই প্রথম বৈঠক ওঠে।

ক্ষ্যান্তমণি ববের পিসী কনের মাসী। মণ্ডল বাড়িতেও নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়। এক গাঁয়ে দু'ছুটো পাকা ফলার। এ স্মযোগ কি জীবনে কোন দিন এসেছে না আর কোনদিন আসবে! মধু কীর্তিনিয়া তো সম্পর্কে মামাই হয়। মামাবাড়ির দেশের মানুষ মামা হবে না তো কি হবে? তাছাড়া দিদিমার সই ছিল মধু কীর্তিনিয়ার মা। তবে আবার ওরা পর হ'লো কেমন করে? কীর্তিনিয়ার বেটার বউ দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তো আরও নিকটতর। ভাসুর পো'র সাক্ষাৎ শালীকে বিয়ে করেছে দুর্গার আপন মামাত ভাই। কুটুম্বিতা তো আর অমনি অমনি গড়ে ওঠে না। ক্রিয়াকর্মে আসা ধাওয়া করলেই কুটুম—কুটুম। নয়তো পরও যা কুটুমও তা!...

ক্ষ্যান্ত সম্পর্কের অলিগলি খুঁজে দিন কয়েক আগে থেকেই ঘন ঘন মণ্ডলবাড়ি যাতায়াত শুরু করে। ডাক খোঁজের মধ্যে মধু বর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। বিয়ের দিন তিনেক আগে শনিবারের এক সন্ধ্যায় পৈঠার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ময়নার চুল বেঁধে দিচ্ছিল দুর্গা। ক্ষ্যান্ত রোজকার মতোই হাজিরা দিতে

এসে বাধা দেয়, আঃ, কর কি বিয়াইন, ভবু সন্দা বেলা পা বুলাইয়া বইসা বিয়ার কয়নার চুল বান্‌বার নৈচ। পাও উঠাইয়া বহ। একজন আচেন ই চবে, বাও বাতাস লাগব !

দুর্গা নিজেও সংস্কার মুক্ত নয়। ক্ষ্যান্তর কথাটা ছ্যাং করে গিয়ে বুকেব মধ্যে বেঁধে। মুখ কাঁচুমাচু করে তাড়াতাড়ি মা মেয়েতে পা উঠিয়ে নেয়। খতমত খেয়েই অভ্যর্থনা জানায় : বহেন বিয়াইন।

কথাটা দুর্গার মনে ধরেছে দেখে ক্ষ্যান্ত খুশী হয়। পান দোক্তা চিবাত্তে চিবাত্তেই পৈঠার ওপর বসে পড়ে।

দুর্গা তাড়াতাড়ি বাবা দেয়, মাটিতে বৈহেন না। এই মইনী, মাঐমাবে একটা পিড়ী আইনা দে।

না না, পিড়ী লাগল না। আমি কি পর আইচি নাকি ? পিড়ী দিয় তোমার নতুন কুটুম আইলে। একটা কতা বইলা যাই, ম্যায়াবে ই কয়দিন একা একা ঘাটে পথে যাইবাব দিয় না। ওনার নজর বড খাবাপ।

শঙ্কায় দুর্গা কেমন যেন জড়সড় হয়।

ক্ষ্যান্ত সমতা রেখেই সাহস দেয়, ভয় কইর না কিচু। উনি যেমুন আচেন আমাগ চম্পও তেমুন আচে। চিনলানি চম্পবে ?

হ, গঞ্জের চম্পি জাইলানীর (জেলেনীব) কতা কইবার চান ত ?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়, আবে জাইলানী অইলে কি অইব, ওনাগ সাইক্ষ্যাং যম ; চম্পর মতো ওজা ই মুল্কে নাই। গঞ্জের ক্ষ্যাত্র বাইনার (বেনের) ব্যাটার বউরে বিয়ার দিন বাইত্রেই জিন পরীতে ধরছিল। বউ বালো কইরা কথা কয় না, খায় না, ঘুমায় না। ক্যাবল থাকে থাকে আর হি হি কইরা হাসে। মছে মছে ফিট অইয়া যায়। বালো করল ত আমাগ চম্পই। ওনারে এমুন শিকা (শিক্ষা) দিয়া দিল যে ভাক্সা জোতা (জুতো) কামড় দিয়া পালাইবার পথ পায় না। বউডা ত হারপর খেইকাই বালো আচে। পোলাপানও ঐচে (হয়েছে) কয়ডা।

দুর্গা বলে, হ ছনচি। চম্পি ত নিজে ঝাড়ে না, নেছ জাইলারে দিয়া ঝাড়ায়।

ছাই ছনচ তুনি। ম্যায়া লোকের ঝাড়ায় ত আর ম্যায়া লোকের ভুত ছাড়ে না ! তাই নেহুর মুখ দিয়া চম্প মস্তর পড়ে। যার লেইগা যেমুন আদেশ অয়, ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়।

দুর্গা বলে, তা যে ঝাড়ে ঝাড়ুক। আমাগ ফকির সাবের মতন এমুন
গুণা ই মুল্লকে কেউ নাই।

ছাই গুণী তোমাগ ফাকর সাব। হার নীলা (লীলা) খেলা ছাব-ছাবতা
লইয়া। ভূত প্যাতের ঝাড়-ফুক হায় কিচুই জানে না। ছাহ না, দিনে
রাইতে কত বড় বড় ঘরের মায়া মন্দার নাও বান্দা থাকে চম্পর ঘাটে ? দুর্গাব
কথায় কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েই বাধা দেয় ক্ষ্যান্ত।

দুর্গা আর কথা বাড়ায় না। ক্ষ্যান্তকে বসতে বলে সন্ধ্যা দিতে উঠে যায়।
ক্ষ্যান্তও ময়নার সঙ্গে খানিকক্ষণ রংচং করে সেদিনের মতো উঠে পড়ে।

বিয়েব দিন শ্বিব হবার পব বোজই এমন আসে ক্ষ্যান্ত। যেদিন যেভাবে
পাবে ভাব জমায়। পাকা ফলাব খাবার নেমস্তন্ত একরকম পাকাই হয়ে যায়।
এখন আব একটু এগিয়ে গিয়ে যদি আগে পাছেব আব দুটো চারটে ^{দুর্গাব} ~~দুর্গাব~~
অতিবিক্ত বাবস্থা কব' যায়।...

বিয়েব দিন নিজের বাড়ি থেকে বঁচি বয়ে এনে কুটনো কুটতে লেগে যায়
ক্ষ্যান্ত। গায়ের শক্তি দিয়ে একগাদা মশলা বেটে দিতেও পেছপা হয় না।
দুর্গা একে মনেপ্রাণেই সত্ত্ব কবে চলেছে। একথা সেকথা নিয়ে আগে দু'চার দিন
বচসা হলেও মধু এখন ওর পতি প্রসন্ন। নিজে বউমাকে বলে এক বাচি মুড়ি
মুড়কি ও দই খাইয়েছে সকালের জল খাবার হিসেবে। দুপুবেব ভাত পাবারের
সময়েও নেমস্তন্তেব রান্না থেকে খানিকটা কবে চাখিয়ে দেখিয়েছে। খেয়ে বেশ
সন্তুষ্টই হয় ক্ষ্যান্ত। এমন হুস্বাহু রান্না জীবনে ও কখনো খায়নি। মুখপোড়া
বামুনটা যদি পেছনে না লাগতো তাহলে দই, মিষ্টি, তবি-তরকারি পেট পুরেই
খেতে পারতো। কিন্তু গেঞ্জেলটার হাত দিয়ে যেন কিছু গলতেই চায় না। ওর
বাঁপ চৌদ্দ পুকষের ধন যেন দিচ্ছে হারামজাদা। ঝাড়া পাচ-পাঁচখানা লুচি
উন্ননে দিলে তবু একখানা পাতে ছোঁয়ালে না। উন্ননই যেন ওকে বলে দেবে
লুচিতে হুন ময়েম ঠিক হয়েছে কিনা। মুখপোড়ার কাছে আনন্দর পোলার নাম
করেও দুখানা লুচি চেয়েছিলাম। কিন্তু তাই কি দিলে?...আচ্ছারে আচ্ছা,
বৈঠকে বসলে তো আর না দিয়ে পারবিনে!...মধু মামা কাজটা ভাল করেনি।
ওদের কি চিনতে বাকী আছে? কাউকে কিছু খেতে না দিয়ে সব গায়েব
করবার তালে আছে।...আঃ কি খশবু ছাড়ছে ধিয়ের! গাড়লটা যদি দুখানা
লুচিও চেখে দেখবার সুযোগ দিতো!...

রাত দশটার মেয়েদের বৈঠক বসে। জায়গা ক্ষ্যান্তই করে। বেছে

বছে নিজের পাতাখানা বেশ বড়সড় দেখে নেয়। আলগা পাতও একখান পাশে রাখে। ভাবখানা—কেউ একটু পরে বসছে, যা দেবার সেখানাতেও দিয়ে যাও। খাওয়াব পব ফাউ পাওয়া। শীতের দিন নষ্ট হবে না। পরের দিন বেশ চলবে।

ক্ষ্যান্তর ফাঁদে প্রথম প্রথম সুব কিছুই পড়তে থাকে। বাইরের নিমজ্জিত লোকের খাওয়া হয়ে যাওয়ায় এখন পবিবেশন করছে বাড়ির লোকেরা। তারা ক্ষ্যান্তব চাতুরী সহসা ধরতে পাবে না। কিন্তু পব পর খাবার জমে জাওয়ায় দই পরিবেশনকারী এসে খমকে দাঁড়ায়। ক্ষ্যান্তকেই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস কবে। বড় লজ্জায় পড়ে ক্ষ্যান্ত। কেননা, চেয়ে ওই সমস্ত তবি-তরকাবি নিয়েছে। দই, মিষ্টটা পড়লেই লাঠা চুকে যেতো। কিন্তু ববাত মন্দ তাই ধরা পড়ল। নিশ্চয় কেউ কান ভাঙানি দিয়েছে।...

দই-ওয়ালার সঙ্গে ক্ষ্যান্তব মন কপাকবি ছিল। জব্দ করবার জন্তু তাই সে উঠে পড়ে লাগে। আব একটু হলে ঙয়তো দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেতো, দুর্গা পাতের কাছে এসে দাঁড়ায়।

লজ্জাব হলেও ক্ষ্যান্ত কতকটা বল পায়। আমতা আমতা করেই বলতে থাকে, ছাহত বিয়াইন, আমার ভাইপাব বাইত্রে আইবাব কতা আচে বইল; একটা পাবস নিবার নৈচি, তা মুখপোড়া কেনুন তরপাইবার নৈচে!

দুর্গা সবই বোঝে। তাই একটু হেসে দই-ওয়ালাকে ধমক দেয়, ওকি নিমাই, যা দিবার দিয়া যাও না। দিনভর খাটচে ব্যাচার, ভাইপোর লেইগা পারস না নিলে ছায় খাইব কি?...

ভাইপে' খাইব না ছাই! ও সব চালাকি আমবা বুজি। রাগে গজগজ করতে করতেই এক চামচ দই থপ করে পাতের ওপর ফেলে দিয়ে যায় দই-ওয়াল।

ক্ষ্যান্ত আব কথা বাড়ায় না। ধরা যখন পড়েছেই তখন ছ'কথা বলে বলুক।...

রাত বারোটার মধ্যে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে হাঁড়ি হেঁশেল গুছোনো হয়ে যায়। তিনটেয় শেষ লগ্ন। ভোর থেকে সানাই বাজছিল। বারোটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়। সবে অম্বান মাস, তবু চরে শীতের ধকল বেশ। ঠাণ্ডায় বেচারাদের গলা দিয়ে ফুঁ বেরুচ্ছে না। ব্যাঙ পাটির সঙ্গে রাত দশটা

পৰ্বস্তু থাকার চুক্তি ছিল। কিন্তু গোধূলি লগ্নে বিয়ে না হওয়ায় সব কিছুই পও হয়ে গেল। বিয়ের সময়েই যদি ব্যাণ্ড না বাজাবে তাহলে আর আমোদ হবে কি দিয়ে? ওরা তো কিছুতেই আর থাকতে চাচ্ছে না। আর এক জায়গায় নাকি রাত এগারোটা থেকে বায়না আছে। সে প্রায় মাইল খানেকের ওপর পথ। ভোর পর্যন্ত থাকতে হবে ওদেব ওখানে। মধুর মনটা খিঁচড়ে যায়। সেই পয়সা খরচ হবে অথচ সখ আহ্লাদ কিছুই হবে না। গোধূলিতে বিয়ে হলে সারা বাড়ি লোকজননে জম্জম করতে। হাউই রংমশালে হতো রূপ-দীপালি। ব্যাণ্ডেব তালে তালে ময়না বরণ করতো নিশিকে। কিন্তু এখন তো হবে সেই ছেলেপুলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে হরিলুট দেওয়া। ..

রাত একটা পর গোটা মণ্ডল বাড়িই যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বরযাত্রীদের অধিকাংশই ফিরে গেছে। বাতের শরীর বলে পলান ব্যাপারী থাকতে পারেনি। তার বদলে কাশেম অবশ্য আছে। কিন্তু নিশির সঙ্গে অনেকক্ষণ ঠাট্টা মস্করা করে শেষ পর্যন্ত ও-ও টাল সামলাতে পারেনি। বেশ নাকই ডাকছে এখন ওর। চ্যাংড়াদেব মধ্যে আবে যা দু-পাঁচটি আছে তাদের অবস্থাও তাই। দীহু নিজেও একটু আয়াস করতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে অবশ্য নিশি ময়নাকে এখনো জাগিয়ে রেখেছে এয়োতির। কিন্তু সে শুধু নামেই জেগে থাকা। হাসি নেই—কথাবার্তা নেই... দু'চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

দুর্গা এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—বেশ ছিল। কিন্তু বাড়ি নিঝুম হতেই বৃকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। যার আজ সব থেকে প্রয়োজন সেই-ই নেই। শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই। কিন্তু দুর্গা নিজের আঁধিকে বাগ মানাতে পারে না।

কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মধুও বোধ হয় ছেলের কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হয়তো পাযাণ চাপা বুকখানায় অগ্নুৎপাত হচ্ছিল। কিন্তু মধু তা কোনক্রমেই প্রকাশ হতে দেয় না। মায়ার এ সংসার। কে পুত্র, কে কন্যা, কে জায়া এখানে? শুধু কর্তব্য করে যাও... শক্ত করেই বুক বাঁধে মধু। সন্ধ্যা থেকে গ্যাসের আলোগুলো জ্বলছে। হয়তো দম ফুরিয়ে গেছে। নিতে যাচ্ছে কোনটা, কোনটার বা জল প্রয়োজন, মধু উঠে গিয়ে তদারক করে। প্রয়োজন বোধে পান্টে দেয় গ্যাস। আবার মিটমিট করে জ্বলতে থাকে আলোগুলো। ভাগাড়ে খেঁকি কুকুরগুলি বেশ সতেজ থেকেই বাসর জাগছে। মাঝে মাঝেই খেঁকানী শোনা যাচ্ছে। মধু বার বার উঠে

গিয়ে ঘড়ি দেখে। লগ্ন ঠিক রাখার জন্ত গজের অখণ্ড সাধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে ছোট টেবিল ঘড়িটা।

সারাদিন একটানা উপোস চলেছে। এ বয়সে এরকম উপোস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবু মনের জোরেই শক্ত আছে মধু। কি আর করা যাবে, হিন্দু শাস্ত্রে যখন খেয়ে কন্যা সম্প্রদান করার রীতি নেই তখন থাকতেই হবে। অনাচার করে তো আর একমাত্র নাতনীর অমঙ্গল করতে পারে না।...

আর হয়তো ঘণ্টাখানেক বাকী। দূরে প্রহর ঘোষণা করছে খেঁক-শিয়ালীরা। মধুর হুঁচোখ জুড়ে আসছিল—ধড়ফড় করে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখতে যায়। কিন্তু কিসে কি হলো বুঝা যায় না। হঠাৎ মাথা ঘুবে মেঝের ওপর পড়ে যায় মধু। দুর্গা নিকটেই বসেছিল, শব্দ শুনে ছুটে আসে। মধুর বুকে হাত দিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, বাবা—বাবা—

আর বাবা! সব শেষ। বৃকের স্পন্দন থেমে গেছে মধুর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

চৈচামেচি শুনে পাশের ধর থেকে ছুটে আসে এয়োতিবা—ময়না নিশি। দীহুর ঘুম ভেঙে যায়। কাশেমও উঠে বসে। চারদিকে শুরু হয় ছোটোছুটি। গজ থেকে আসেন নরেন কবরেজ। চোখ মুখেব দিকে তাকিয়েই মস্তব্য করেন, সন্ন্যাস রোগ। পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

শাঁখ সানাই-এ যে বাড়ি মেতে উঠেছিল সে বাড়িতে নামে গভীর শোকের ছায়া। দুর্গা কাটা পাঠার মতো দাপাতে থাকে। ময়না বেতঁশ। নিশি ভেবেই পায় না, ওকি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে।...সমস্ত চর শোক বিহ্বল। আর কেউ শুনবে না, নোঁকাবিলাস, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস মধুর মুখে। এমন মাহুঘেরও এমন হয়! বেচারী দুর্গা ময়না।...

সংবাদ পেয়ে পলান, করিম সেই রাতেই ছুটে আসে। ভোর হতে না হতেই আসে শ্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু, গোবিন্দ কীর্তনিয়া। উদগত অশ্রুধারার সঙ্গে পড়ে খোলে চাঁটি। আবেগ-বিগলিত-কণ্ঠে চলে নাম সংকীর্তন। পলান করিম আল্লাহর কাছে দোয়া মাগে ওদের অভিমুহুদয় বন্ধুর জন্ত। শোভা-ষাড্ডার বদলে শবযাত্রা বার হয় মণ্ডল বাড়ি থেকে। ধলেশ্বরীর বাকে চিতা সাজানো হয়। কালের নিয়মে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মধু।

ময়নাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল মধুর সংকল্প। কিন্তু ভগবান ওকে সকল সংকল্প থেকেই মুক্তি দিলেন। মধু মুক্ত হলো, পড়ে রইলো ময়না, দুর্গা আর অণ্ডছানো সংসার। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। জমি বাধা দিয়ে নাতনীর বিয়ের উৎসবে মেতেছিল মধু। ভেবেছিল, দীর্ঘব সংসারে সুখে থাকবে ময়না। ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ হবে। ময়নাব যদি সুখ হয় তাহলে আব ওদের ভাবনা কি? পারে ক্ষেতখামার থেকে টাকা তুলে জমি ছাড়াবে, না পারে দুচোখ যেদিকে যায় চলে যাবে। শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ, বন্দাবন যেদিকে গশি। দুর্গা মাও তো সারাদিন ভজনপূজন নিয়েই ব্যস্ত। ময়না সুখী হলে সংসার ছেড়ে যেতে তবে আর মায়া কি? মন্দিরে মন্দিবে ভজন গাইবে—যা জোটে মা-বেটায় প্রসাদ পাবে। হাযরে আশা হাযবে মানুষ...

ময়না না থাকলে দুর্গারও কোন ভাবনা ছিল না। যদি বিয়েটাও মিটে যেতো। কি 'মূল্য আছে এ প্রাণেব। ধলেশ্বরীব জল তো এখনো শুকিয়ে শয়নি। দড়ি কলসী নিশ্চয় জুটতো। রোগে স্বামী খস্তর মরেছে। কিন্তু দোষটা যেন ওবই। ও-ই যেন ওদের মাথা দুটো চিবিয়ে খেয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ওব কলঙ্ক—হতভাগী পোড়াকপালী। না না, আব্বঘাতী হতেই বা যাবে কেন? বন্দাবন বয়েছে—নবদ্বীপ, কাশী। গতর খাটালে কি দুমুঠো ভাত জুটবে না? কিন্তু কাল হয়েছে ময়না। কে জানে, ববাতে আরো কি আছে।...

ময়নাও দমে যায়। পাড়ার বুড়িগুলি যেন ওকে দেখে কি সব বলাবলি করে। কত যেন অপরাধ করে কেলেছে ও। জ্ঞান হবার বয়েস হয়নি। তবু কেন যেন চলায় কেরায় মদ্বরতা এসে যায়। নিশি আগের মতোই গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়। কিন্তু ময়না পারে না ওর পাশে ছুটে যেতে। বাণীর ডাকেও আর সাঁড়া দিতে পারে না। এ যেন বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।

ওদিন স্নান করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না। পাশাপাশি আসছিল ক্যান্ডমণি। হয়তো ময়নার ভিজে আঁচল থেকে জলের ছিটা গিয়ে থাকবে ওর গায়। বাস, আর কোন কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাজখাই গলায় গালাগাল শুরু করে ক্যান্ড, ছাই কপালী—বাপ থাকী—দাদারেও চাঝাইয়া খাইচ,। পথ

ঘাট দেইখা চল্ নালা হাবাতী? মাইনষের গায় যে জল আহে,
ছাছ না?...

ভিজ্জে কাপড়ে দুর্গাও পেছ পেছ আসছিল, ফ্যান্সর গালাগাল শুনে বুকের
ভেতরটা আছড়াতে থাকে। অবুঝ মেয়ে—একটু না হয় জলের ছিটাই গিয়েছে।
ও তো আর বাসি জামা কাপড়ে নেই কিম্বা কোন নোংরা ধাটেনি। স্নান
করেই না ঘাট থেকে যাচ্ছে। তবু এমন ইতরের মতো গালমন্দ করবে!...এই
না সেদিনও কত ইষ্টতা দেখিয়ে চলিয়েছে। তিন দিন ধরে সমানে খেয়েছে
নিয়েছে, একটু লজ্জাও কি থাকতে নেই!...ফ্যান্সব কথার কোন জবাব না দিয়ে
রাগে গোঁ গোঁ করতে করতেই বাড়ি চলে আসে। কাঁধের ওপর থেকে ভিজ্জা
কাপড়ের রাশ নামিয়ে ছুটে গিয়ে ময়নার চুলের মুঠি ধরে। হুম্ হুম্ করে
কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় পিঠের ওপর। ময়না ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। ঠাকুর
ঘরে এসে খিল দেয় দুর্গা। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। কত কথাই না মনে
হতে থাকে। কুন্ডম বেয়ান যদি ওদের মুখ থেকে এসব লাগামী ভাঙানী
শোনে তাহলে মন খিঁচড়ে যেতে কতক্ষণ? কে অলক্ষ্ণে মেয়ের সঙ্গে আতুরে
ছেলের বিয়ে দেয়? কাল-অর্শোচের জগ্গ পুরো এক বছরই তো অপেক্ষা
করতে হবে!...

ময়নার বিয়ের জগ্গ জমি বন্ধক রেখে দু'শ টাকা কর্জ করে গেছে মধু।
রামকান্তর মধ্যস্থতায় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ দিয়েছেন টাকাটা। মধুর ভরসা
ছিল, ঋষি শশ্ত্র বঁচে অর্ধেক শোধ করতে পারবে। বাকীটা পরের সন পাট
বেচে। হিসেব ভুল ছিল না মধুর। ফসল যেভাবে বাড়ছিল তাতে হয়তো
অর্ধেকের বেশীই শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রকৃতি। অসময়ে
বিরাম বিহীন বৃষ্টি শুরু হলো। শীতের সময় এরকম বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায়
না। শুঁটি দেখা দিয়েছে মুগ মটরের ডগায়। লকলক করে বেড়ে চলেছে।
মহাশুক পতনের বছর। শাস্ত্রে আছে, গুরুদশার বছরে 'ঘোরতর বিপদের
সম্ভাবনা' থাকে। সর্বদা আশঙ্কায় থেকেও দুর্গা বুকে বল পাচ্ছিল। শশ্ত্র ক'টা
ঘরে উঠলে আগে কুমার বাহাতুরের দেনা শোধ করবে। খায় না খায় এ পাপ
ও ঘাড়ে রাখবে না। কিন্তু মনের বাসনা মনেই চাপা পড়ে। অবিরত বৃষ্টিতে
মুগ, কলাই, মটর পচে সাফ। বৃষ্টির মধ্যেও অতুরা শুঁটি কুড়িয়ে এনে কিছু
আয়ের পথ করে নিয়েছে। যা আসে দু'দশ টাকা। কিন্তু ও সেদিক দিয়েও
স্ববিধে করতে পারেনি। মধুর মৃত্যুর পর থেকেই ছোট ভাই আনন্দ সংসারে

আছে। একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে একা একা থাকে কি করে? ক্ষেত খামারই বা দেখে কে। আনন্দের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব আনন্দ পালন করতে পারেনি। খেতে ঘুমোতে হাঁকো খেতেই ওব দিন কাবার। ক্ষেতে যাবার সময় কই? তাও আবার জল বৃষ্টি মাথায় করে। ও তো আর কাজ করতে আসেনি এ বাড়িতে। ময়নার বিয়েটা চুকে-গেলে দিদির কাছ থেকে যদি জমি-জায়গাটুকু লিখিয়ে নেওয়া যায়।...

চৈত্র মাস, গোলায় টান পড়ে। গত সনের মজুত শস্ত যা ছিল টেনেটেনে তা দিয়ে এপযন্ত কোনরকমে চলেছে। মুড়ি, মুড়কি, ছাত্তু খাবাব বলতে যা কিছু প্রায় সবই ফতুর। অথচ প্রতাহ সকালে ময়না আনন্দব জগ্ন কিছু না হলেও এক বাটি করে গুড়-মুড়ি চাই। নিদেন এক সানকী করে মুন-পাস্তা তো না হলেই নয়। কিন্তু দুর্গা এত খাবার পাবে কোথেকে? আনন্দকে ক্ষেত খামারে গিয়ে কাজ করবার কথা বলেও কোন লাভ নেই। ঠেলেঠেলে পাঠালেও ও দিনভর ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়েই কাটিয়ে দেয়। ওকে নিয়ে এক জ্বলাই হয়েছে। ছোট ভাই, মুখ ফুটে তাড়াতেও পারে না, সহিতেও পারে না। এতদিন যাও বা ছিল এখন তো ভাত দেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। চার বেলা চার খালা না হলে মুখ চোখে আঘাটের মেঘ খমখম করবে। একটুতেই রেগে যায়। শুধু কি খাওয়াই? পণ্টাখানেক বসে বসে গায়ে তেলই মাখবে ছটাকখানেক। অবশ্য চললে কিছু বলতো না ও। কিন্তু এখন যে উপোস দেওয়া শুরু হবে। আনন্দ পারবে কেন এত কষ্ট সহিতে?...বরের পাশেই বয়েছে নতুন কুটুমেরা। তাদের আব যা-ই হোক খাওয়া-পরার কোন কষ্ট নেই। লোকে গিয়ে যদি সাত পাঁচ কান ভাঙানী দেয় তবে কি আর ইজ্জৎ থাকবে?...ভাবনায় ভাবনায় আফ্রিক করতে বসে দুর্গাব দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

হাঁড়িতে চাল আজ সত্যি বাড়ন্ত। কিন্তু দুর্গা নিরুপায়। কোথায় পাবে টাকা? একি আর একদিন আধদিনের ব্যাপার? রোজ চাই, চার বেলা চাই। একা ময়না থাকলে কোন কথা ছিল না। যা জুটতো মা-মেয়েতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। কিছু না জুটতো জল খেয়েই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু আনন্দকে নিয়ে তা চলবে না। ওদের দু'জনের চেয়েও ওর একার খোরাক চের

বেশী। বলতে গেলে প্রতি বেলায় আধ সের চাল ওর একারই চাই। এখন করে কি ও ?...

বিয়ের সময় নতুন বউয়ের মুখ দেখে আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ দুটো একটা রূপোর টাকা ওর হাতে দিয়েছিল। এতকাল তা পেটরায়ই তোলা আছে। প্রতি বছর ভাদ্রমাসে কাপড় রোদে দেবাব সময়—পেটরা খুলে একটা একটা করে গুণে দেখে। কতই বা আর হয়? সব মিলিয়ে দশ টাকাও নয়। অন্তোপায় দুর্গা সেই টাকাই আজ কাপড়ের নীচে হাতে গলিয়ে বায় করে। দুটো টাকা আনন্দের হাতে গুঁজে দেয় গল্প থেকে চাল কিনে আনার জন্ত। হ্যাঁ, শুধু চাল, আর কিছুই নয়। ছুন যা আছে তাতে আরো দুটো দিন চলে যাবে।

সকালে বরাদ্দ মতো খাবাব পায়নি বলে মুখ তার করে বসেছিল আনন্দ। টাকা হাতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে! দিদির নিকট বায়না ধবে, চাইব পয়সার জিলাপি আনবার চাই, কি কও তুমি? ওদিন দেখেই আইলাম কান্দনী ঘোষের দোকানে বড় বড় কইরা জিলাপি ভাজবার নৈচে। তুমি গইনা পয়সা ছাও। স্নাহুম কোহান খনে? মইনীরে আইহা কইলাম, অর ত জিব্বা দিয়া জল পড়বার থাকে।

অতি দুঃখেও হাসি পায় দুর্গার। সম্মতি না দিয়ে পাবে না। বয়েস হলে কি হবে আনন্দটা সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে দুটো বেঁচে থাকলে তো এতদিন প্রায় ময়নার সমানই হতো। বউ বেচারীও মরে বেঁচেছে। নয়তো দুঃখের সীমা থাকতো না।

আনন্দ ক্ষেতের আল ধরে গঞ্জের পথে মিলাতে থাকে, দুর্গার বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। কি আর ওদের এমন বায়নাকা? সামান্য দুটো ছুন ভাত নয়তো মুড়ি চিঁড়ে। দিতে পারছে না এ ওর নিজের অক্ষমতা। আনন্দ না থেকে নিজের পেটের আর একটা থাকলেও তো তাকে খাওয়া-পরাতে হতো! ...ভাবতে ভাবতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতেও সংসারে অভাব ছিল। এমন কি নিবারণ বেঁচে থাকতেও। কিন্তু সে অভাব অল্প ধরনের। হয়তো হাল বলদের জন্ত টাকা চাই। পাটের নিড়ানী পড়বে তার জন্ত চাই টাকা। কোনরকম আকস্মিক বিপদের মুখে পড়েও দায় দেনার দরকার হতো। কিন্তু তাই বলে দুটো ভাতের ভাবনা কখনো এমন করে ভাবতে হয়নি। এ যেন দুর্ভিক্ষ রাক্ষুসী উড়ে এসে চেঁপে বসেছে।

ময়না বাসি ঘর-দোর নিকিয়ে একবারে ঘাট থেকে স্নান করেই ধেরে। ওকে দেখে দুর্গা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে সহজ হতে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বলে, হারে, এত সকালে ছান কল্লি সন্দি লাগে যদি ?

এত সকাল দেখলা কোন হানে ? রৈদ বলে পৈঠার উপুর আইহা পর! তুমিও যাও না ডুব দিয়া আহ গা ? মিচামিচি বেলা কইরা কি কাম ? সমতা রেখেই ময়না জবাব দেয়।

দুর্গা তাই যাবে। এ সময়ে মেয়েটার চোখের সামনে না থাকাই ভাল। এক-কোঁটা মেয়ে, এতটা বেলা হয়েছে কিছুই মুখে দিতে পারলে না। স্নান কবে এলে তো ক্ষিদে আরো জোর পায়। কিন্তু কি আছে ঘরে যে তাই দেবে ? জিলিপি ক'থানা আনলে আনন্দ ভালই করবে। চার পয়সায় আটখানা জিলিপি পাবে। কোন কোন দ্বিন ফাউও পাওয়া যায় এক-খানা। দু'জনে চারখানা করে মুখে দিয়ে একটু জল খেতে পারবে।... দুর্গা পেতলের কলসীটা কাঁখে করে ঘাটের পথেই পা বাড়ায়।

গঞ্জ থেকে আধ মণ মোটা সেদ চাল কিনে আনে আনন্দ এক টাকা চৌদ্দ আনা দিয়ে। এক আনার আনে জিলিপি। বাকী চার পয়সার দোকান পাতা ও চিটে গুড়। তামাক ফুরিয়ে গেছে। তামাক না হলে পুঙ্খ মাগুঘেরে চলে কি করে ? ইষ্ট কুটুম এলেই বা তাকে দেয় কি ?...

চার পয়সা অপব্যয় হয়েছে দেখে দুর্গা মনে মনে বিরক্তি বোধ করে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। ইচ্ছে করেই বলে না। সংসারে যখন আছে তখন ওকে ওর অভ্যাস মতো জিনিস দিতেই হবে। তা ছাড়া সত্যিই তো দীহু বৈরাগীও তো এক ফাঁকে এসে পড়তে পারেন। নতুন কুটুম, এক ছিলুম তামাক দিয়ে ভদ্রতা না করতে পারলে ভাববেন কি ?...খরচ যদি কমাতে হয় তাহলে তা আসল খাওয়া কমিয়েই কমাতে হবে। চার বেলায় পরিবর্তে দু'বেলা খেয়েই দুখোঁগের সঙ্গে লড়া উচিত। তবেই যদি আসে সন্দিন।—

ঘরে এক কোঁটা কেরোসিন নেই। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার। কুপি না জালিয়ে রাত্রে রান্না করা অসম্ভব। খাওয়ার পাট না হয় কোনরকমে দাওয়ায় বসে চুকানো-যাবে। কিন্তু...সবদিক ভেবে চিন্তে দু'বেলায় ভাত এক বেলাই রেঁধে রান্না দুর্গা। শুধু দু'বেলায় মতো। তাই পরের দিন আর সকালের জন্ত পাস্তা থাকে না। একদিন বেয়ে দশদিন উপোস দেওয়ার চেয়ে অল্প অল্প খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাত্র সামান্য ক'টা টাকা পুঁজি।

এ টাকা ফুরুলে গতাস্ত্বর নেই। বছর না ঘুরতেই যদি ঘর-দোর বাঁধা দিতে হয় তা হলে সমাজে বাস করা দুঃস্বপ্ন হবে। হয়তো কুসুম বেয়াইন বঁকে বসবেন ছেলের বিয়ে দিতে। বেচা কেনা ধরের সঙ্গে কে আর কাজ করতে চায়? লোকে তো এমনিতেই খাঁত ববতে ওস্তাদ। মইনীকে নিয়েই হয়েছে যত জালা।...ঐতস্ততঃ চিন্তায় অনেক বাত পর্যন্তও ঘুমোতে পারে না দুর্গা। আনন্দ নিজের ঘরে দিবিা নাক ডাকাচ্ছে। ময়নাও হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। না, মিছে আব ভেবে কি হবে? যা করেন শ্রীমধুসূদন।...হাতে মুখে জল দিয়ে ময়নাকে বৃকে জড়িয়ে দুর্গা শুয়ে পড়ে।* হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে।..

ভোরে উঠেই আবার সেই সমস্তা। আনন্দব আর যত দোষই থাক ঘুম থেকে ও খব ভোরেই ওঠে। হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। খালি পেটে ছাঁকোও টেনেছে ছ'বাব। পেট এখন কাঁকা গড়েব মাঠ। হু হু কবে জ্বলেছে। দেখতে দেখতে বোদ প্রায় পৈঠার ওপব এসে পড়লো। কিন্তু দিদি'যে খাবার কথা মুখেও আনছে না। লোকে কি না খেয়ে মববে নাকি? ..

পেছর কিরে ঠাকুর ঘব নিকোচ্ছিল দুর্গা, আনন্দ ফেটে পড়ে, অ দিদি, এত বেলা অইচে কিচু খাওয়ন লাগব ত?

আদ্যব শুনে দুর্গার বড়-বিরক্তি বোব হয়। এত বড় জোয়ান মবদ, ঘটে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে। একবত্তি মেয়ে, কই আমার ময়না তো কিছু খেতে চাচ্ছে না? ওর হলো কি।...রাগে ঝংকার দিয়েই উত্তব করে, খাইবার দিমু ধবে আচে কি? বান্দন হউক ভাত খাইচনে।

বারে, হাত দুপইবে খামু। এহন কি দিবা? দুইডা পাস্তাও রাধ নাই?

না, গলাব স্বর গস্তীর করেই উত্তব করে দুর্গা।

জানইত সকালে দুইডা পাস্তা খাই। রাইত্রের চাইল দুইডা বেশী কইরা নিবার পারলা না, অভিমানের স্বর আনন্দর কণ্ঠে।

বেশী কইরা নিমু চাইল আচে কোঠান খনে? ক্ষ্যাত খামার কি তুই কিচু গ্ৰাহচ?

হায় লেইগা তুমি খাইবাব দিবা না? দুইডা বাসি ভাত, তাও না!

না, দিমু না। ইহানে বইহা তর চাইর বেলা গিলনের কাম নাই!

আনন্দ বোধ হয় এবার সত্যি সত্যিই ব্যাধা পায়। মুখখানা কাঁচুমাচু করে দিদির দিকে ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যাধাটা আনন্দর চেয়ে দুর্গাই বেশী পায়। ছি ছি ছি সামান্ত দুটো

খাওয়া-থাকা নিয়ে এমন করে বলতে পারলে ও! ছোট ভাই, ঘরে মা বাবা ছেলে বউ কেউ নেই। এক রকম নিবোধ বললেই হয়। নয়তো এতটা বয়সে কেউ কখনো খাবার জ্ঞান এ রকম করতে পারে?...নারী হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে দুর্গার। বাকে করে দই, চিঁড়ে, গুড় নিয়ে বাড়ির উঠান দিয়েই হরিচরণ ঘোষ যাচ্ছিল। দুর্গা ওকে ডাকে। গঞ্জ থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালেই ফেরি করতে আসে হরিচরণ। দই, চিঁড়ে, গুড়, মন্দেশ, জিলাপি নিয়ে প্রায় মণ দুই হবে। অধিকাংশ দিনই চরফটনগরে কাবার হয়ে যায়। কোনদিন চরধল্লা পর্যন্তও যেতে হয় হরিচরণকে। চরধল্লায় অবশ্য অল্প ফেরিওয়ালা আছে। তবু হরিচরণ গেলে কেউ তাকে ফেরাতে পাবে না। যে এক সের নিয়েছে তাকে দু'সের গাচিয়ে আসে। দাম—তা দামের জ্ঞান ভাবনা কি? আজ না পারো কাল দিয়ে। কাল না পারো পবন্ত...

হরিচরণ কাঁধ থেকে বাক নামিয়ে জিরোতে থাকে। দুর্গা পেটরা খুলতে ধরে ঢোকে। আনন্দের সকল ভাবনা উঁবে যায়। মহাবুশী হরিচরণকে দেখে। আহা, কি স্বাদ ঘোষেব পো'ব 'মান্ধইনা দইয়েব।' বসনার স্নস চেপে এক কলকে তামাক সেজে এনে হরিচরণকে দেয়। হরিচরণ যেন হাতে স্বর্গ পায়—আনন্দও। আরো একখানি মুখ উজ্জর হয়ে ওঠে। সে মুখ ময়নার।

পেটরা খুলে একটা টাকা বার করে এনে আনন্দের হাতে দেয় দুর্গা। টাকা হাতে নিয়ে আনন্দ জিজ্ঞেস করে, এক টেকার দই চিড়াই রাকুম?

নারে, চাইর আনার রাক। তুই আর ময়না খাবি, দুর্গা উত্তর করে।

তুমি খাইবা না?

না, আমার সর্দি লাগচে। ভাত অইলে আমি ভাতই খামু।

আনন্দের মাথায় আর বেশী প্রশ্ন যোগায় না। হাটু গেড়ে বসে পড়ে বাকের সামনে। মাফ জোখ সব ভাল করে দেখে নিতে হবে।

হরিচরণ তাড়া দেয়, কওনা পুত্রা, কি দিমু?

আরে রাক, দই তোমার কেমন আগে চাইখা দেখি, নিজের ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে হরিচরণের প্রশ্নের জবাব দেয় আনন্দ।

হরিচরণ চামচে দিয়ে কিছুটা দই ওর হাতের ওপর দিতে দিতে মস্তব্য করে, একটু ফাউ খাইবার চাও খাও। হরিচরণের মান্ধইনা দই আবার চাইখা ছাহন লাগে নাকি?

আনন্দ সে প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে জ্ব কুঁচকিয়ে বলে, তা চলবার পারে কোনরকমে। এহন ভাও কি কও ?

তোমার আর ভাও জিগাইবার লাগব না। কত দিমু কও ?

না না, দর ভাও না কইলে আমি নিমু না। হেযে যে তুমি গলা কাটবা তা অইব ন।

দুই আনা শ্রাবইত (সেব) বেচবার নৈচি। তা তুমি যহন তামুক খাওয়াইলা তহন তোমাব খনে আব নাব না-ই কবলাম। ছও পয়সা শ্রারই দিয়।

ইস টানা দুদেব দই, তা আবাব ছও পয়সা শ্রার। কাইল বাজাবে দুদেব দব কি গেচে তা বুজি আমি জানি না ভাবচ ?

আরে রাকও তোমাব বাজার ভাওয়েব কতা। আদাব ব্যাপারিব আবাব জাহাজের খবব।

আনন্দ হয়তো আবে কিছুক্ষণ দব কষাকষি কবতো। কিন্তু দুর্গা এসে বাবা দেয়, *দর ভাও রাকত। বোষ মশয়, এক শ্রার দই, এক শ্রার চিড়া আব আধ শ্রার গুড় ছান।

হরিচরণ তাই মেপে দেয়।

• দাঁড়ি পাল্লার দিকে তীক্ষ্ণ নজব রাখে আনন্দ। মাপা হয়ে গেলে চীংকার করে ওঠে, কই, হর (সর) দিলা না ?

হবিচরণ চামচে দিয়ে দইয়েব সব কিছুটা তুলে দেয়।

আনন্দ আবার চীংকার করে ওঠে, ফাউ ছাও।

হরিচরণ উত্তব দেবাব আগে দুর্গা এবার ধমক দেয়, একবাব ত ফাউ খাইচস্। আবার কতবার ফাউ দিব তরে ?

দুর্গার কথার কোন জবাব না দিয়ে হরিচরণকেই পুনরায় বলতে থাকে আনন্দ, কি গ ঘোষের পো, কওত, দুদে হাত পড়ব নাকি ? জলের উপুড় দিয়্যাই যাইব না ?

হাসতে হাসতে হরিচরণ উত্তর দেয়, না, পুত্রার লগে আর পারন যাইব না। নেও—খর, বলে আর এক চামচ দই ফাউ দেয়।

দাম নিয়ে উঠে যায় হরিচরণ। আনন্দ টাকার ফেরত সাড়ে বারো আনা পয়সা হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরখ কল্পে দেখে। দুর্গা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, পয়সার ঝামেলায় নিজের না গিয়ে দিদির হাতেই ওটা তুলে দিতে

যায়। এক এক করে বারো আনা গুণে দিয়ে দু' পয়সা হাতে রেখে আবার বায়না ধবে আনন্দ, বিড়ি ফুরাইয়া গেচে, পয়সা দুইডা নিম্ ?

আগে হলে হয়তো দুর্গা বাঁজিয়ে উঠতো, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই কোমল প্রাণে কাঁটা ফটেছে। তাই আর না বলতে পারে না।

আনন্দের আজ পোয়া বাবো। একসঙ্গে দই, চিড়ে, বিড়ি। উল্লাসে ময়নাকে ডাকতে থাকে, এই মইনী, খাবিত শিগ্গীর আয়। ফুরাইয়া গেলে কষ্টলাম আমি জানি না।

ময়না আসে। মামা-ভাগনীতে মিলে খাওয়ায় মন দেয়। দুর্গা দেখে দেখে হাসে। ভা.ব, কত অল্পে এবা সন্দুট। ভগবান, তাই আমি জোটাতে পাবছিনে। তুমিই জানো কি আছে অদৃষ্টে।...ঘব দোব নিকিয়ে কলসী কাঁথ ঘা.টর দিকে বওনা হয় দুর্গা।

॥ ১৫ ॥

বিয়ের সামান্ত ক'টা মুখ-দেখা ঢাকা, ক'দিনেই উবে যায়। কিন্তু রাক্ষুসে অভাব মেটে না। মাত্র তিনটে প্রাণীর সংসার। তবু এই তিনজনকেই এক একটা খুদে রাক্ষুস বলে মনে হয়। গোলায় যখন খাবার মজুত থাকতো তখন মনে হতো ওবা যেন কেউ খেতেই পাবছে না। কম খেয়ে খেয়ে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। ময়নাকে তো সেদিনও ধরে বেঁধে ভাত খাওয়াতে হয়েছে। আর আজ ? আজ যেন থালা ভর্তি করে ভাত দিলেও ময়না না বলে না। যত দেবে ততোই যেন খাবে।

গোলার মজুত দিন কয়েকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। অসময়ে জল ঝড় হওয়ায় রবিশস্ত্রও ক্ষেতেই পচেছে। এখন সন্ধ্য মাত্র গোটাকয়েক খালা, ঘটি, বাটি আর চালের টিন ক'খানা। বেচে খেলে দু'দিনেই সাফ হয়ে যাবে।...দুর্গা মহা ভাবনায় পড়ে। চালই হোক আর থালা ঘটি বাটিই হোক—কিছুই আটকাতো না যদি ময়নার বিয়ে হয়ে যেতো। এখন কাল হয়েছে কাল-অর্শোচটা। এগুবারও উপায় নেই-পেছুবারও উপায় নেই। বৈরাগী-গিন্নী এপর্যন্ত আছেন ভালই। কিন্তু কখন যে কি দেখে কি হবেন তা বলা যায় না। মুখপুড়ী ক্ষেস্তী তো দিন-দিনই গজরাচ্ছে। একবার যদি ওর কথা কানে তোলেন উনি তা হলে তো সর্বনাশ। কোন্ ছেলের

মা তার ছেলের অমঙ্গলের সম্ভাবনা জেনেও বিয়ে দিতে রাজী হয়? হোক না পাকা কথা। চরের মোড়ল দীর্ঘ বৈরাগী। কার সাধ্য তার ওপর কথা বলে। না না, ঘরের কথা এখন কিছুতেই বৈরাগীব কাছে বলা যেতে পারে না। না খেয়ে মরলেও না...অনেক ভেবে চিন্তেই দুর্গা সংকল্পে দৃঢ় থাকে।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে মনকে বাঁধা গেলেও পেটকে বাঁধা যায় না। অপ্রতিহত গতিতে চলে তার তাড়না। দুটি অপগণ্ড নিয়ে সংসার। একটি মুখ বুজে থাকলেও আর একটি তা পারে না। তার চাই ঘুম থেকে উঠেই বাটি ভর্তি গুড়-মুড়ি—খালা ভর্তি ভাত। ধরতে গেলে নিজের কথাটাই বা কম কি? দিনান্তে সামান্য কিছু মুখে না দিলে বাঁচা যায় কি করে? আর আজ ওই যদি না বাঁচে তা হলে ময়নার কি গতি হবে? কিন্তু সামান্য যা চাই তাইবা আসবে কি করে? বামকান্ত বলছিলেন কোন ভয় নেই। দরকার হলেই যেন গুঁকে জানানো হয়। বেশ, সেই ভাল, গুঁকেই মনের কথা খুলে বলব। শুনেছি, কুমার বাহাতুরের কাছে গুঁর খাতির আছে। যদি আব কিছু টাকা নিয়ে দিতে পারেন উনি।...

সন্ধ্যার পর রামকান্ত আসে। আনন্দ গিয়ে ভেকে আনে। বড় ঘরের দাওয়ার ওপর একথানা জলচৌকি টেনে গুঁকে বসতে দেয় দুর্গা। গলবস্ত্র হয়ে ভক্তিবরে প্রণাম করে। আনন্দ আলসের আগ্রহে যত্ন করে এক ভিলুম তামাক সেজে দেয় তাড়াড়াড়ি। খশীতে ডগমগ বামকান্ত। ফুরুক্ ফুরুক্ শব্দে হুঁকো টানতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতে অনেকদিন ও মণ্ডল বাড়িতে এসেছে। কিন্তু সে শুধু মধুর সঙ্গেই বাক্যালাপ। দুর্গার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পায়নি। ঘোমটার আড়ালে যেটুকু দেখেছে তাতেই মনে হয়েছে—দুর্গা পরমাহন্দরী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওর আচার ব্যবহার। মধু মরেছে সেও প্রায় মাস কয়েকের কথা হলো। কিন্তু শ্রদ্ধ শাস্তিতেও ওর মুখখানা ভাল করে দেখা যায়নি। আজ সেই দূরের দুর্গা স্বেচ্ছায় কাছে এসেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। এখন আব ওর সেই আড়ষ্টতা নেই। মুখ ফুটেই বলতে হবে মনের কথা...ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে এক বলক তাকায় বামকান্ত। মনে হয়, একদা শহর জীবনে যাদের কৃত্রিম জলুস দেখে ও মুছাঁ গিয়েছে দুর্গা তাদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী হন্দরী। হ্যাঁ, দুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।.....

প্রণাম করে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গা। ঘরের বউ, কোনদিন বাইরের

কোন পুরুষের কাছে মুখ খোলেনি। আজো পারে ন্ত। কি করে কাঙালের মতো ভিক্ষা মাগবে?—দুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।।.....

কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখ তুলতেই রামকান্তর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে রামকান্ত, তোমার কি কোন কথা আছে বোঁমা? আমাকে আবার এক্সুনি হরিসভায় যেতে হবে।

দাম দিয়ে জর ছাড়ে দুর্গার। দোমটাটা আর একটু টেনে বলে, হা, আপনারে একটা কথা কইবার চাই।

বেশ বেশ, বলো। আমি তোমার ঘরের লোক—আমাকে আবার অতো সংকোচ কিসের? রামকান্ত আবার এক ঝলক চোখ তুলে তাকায়।

দুর্গা আপন মনেই হোঁচট খায়। গোসাই ঠাকুর বলে কি গা! এষে দেখছি খাঁটি কোলকাতার কথা। বড় মামার ছেলে গদাইদাও এমনি কথাবার্তা বলতেন। সাতবছর কোলকাতায় ছিলেন গদাইদা। বেশ মিষ্ট করে কথা বলতেন। কিন্তু বার বার অমন মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন উনি। ...দুর্গা রামকান্তর কথায় সাড়া দিতে পারে না।

রামকান্ত ওকে নিরুত্তর দেখে আবার তাড়া দেয়, কই, কি বলবে বলো।

দুর্গা এবার সংকোচের সঙ্গেই মুখ খোলে, আপনার লগে একটা পরামশ্ব আছে ঠাকুর মশয়।

বেশ তো বলো?

দুর্গা তবুও সহজ হতে পারছে না দেখে রামকান্ত বুঝে নেয়, নির্বোধ আনন্দটার সামনে হয়তো ও কিছু বলতে চায় না। তাই আনন্দকে তাড়াবার জগাই ফন্দী আঁটে, ওরে আনন্দ, একবার দেখে আয় তো কীর্তনের লোক সব জড় হয়েছে কি না? আমার তো দেখছি যেতে একটু দেরিই হবে।

কলকে প্রসাদের জগ্ন কাছে বসে আঁকুপাকু করছিল আনন্দ। কিন্তু রামকান্ত ওকে সৈদিক থেকে কোন স্ময়োগ না দিয়ে তাড়াতে চাচ্ছে দেখে মনে বড় কষ্ট পায়। বার বার ফ্যালফ্যাল করে হুকোটার দিকে তাকাতে থাকে।

চতুর রামকান্তর পক্ষে আনন্দের মনের কথা বুঝতে দেরি হয় না। হুকোর মাথা থেকে কলকেটা নামিয়ে দিয়ে বলে, নে, ছুটো টান দিয়ে যা।

আনন্দ তাড়াতাড়িতে দুটো টান দিয়েই ঠোঁট উন্টায়, কিছুই রাকেন নাই লেব্‌তা। কথাতেই আছে, “বাহুর চোবা নারকল আর বামন চোবা হুকা”, অর মন্তে আর কিছু পাইবা না।

হাঁসে হাঁস, আর এক কক্ষে সেজে খেয়ে যা, হাসতে হাসতেই রামকান্ত জবাব দেয়।

আনন্দ তাই হয়তো সাজতো। কিন্তু দুর্গার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতেই বলে, না দেবতা, আমি এহন যাই। খবরভা লইয়া আহি।

আনন্দ চলে যায়। রামকান্ত একটু নড়েচড়ে বসে। একটু ইতস্ততঃ করেই জিজ্ঞাস করে, ময়না কোথায়? আর এক কক্ষে তামাক হলে সতি বড় ভাল হতো। তামাক না হলে মাথায় বুদ্ধি খোলে না।

দুর্গা ঘোমটার ভেতর মথ রেখেই বলে, ময়না গেছে অর সইয়ের বাড়ি।

দুর্গা বলে, হার লেইগা কি? - আপনে একটু বহেন।

আনন্দের ঘরের দাওয়ার ওপরই রয়েছে সাজসরঞ্জাম।

দুর্গা বিনা দ্বিধায় গিয়ে সাজাত থাকে। রামকান্ত ভেবে পায় না, কি ওব গোপন পরামর্শ। যে মানুষ ভুলেও কোনদিন ঘোমটা খুলে মুখোমুখি হয়নি সেই মানুষ একা বাড়িতে ডাকছে, তাও আরার রাতের বেলায়, বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

ভাববার বেশীক্ষণ সময় পায় না রামকান্ত। দুর্গা কক্ষেতে হুঁ দিতে দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। আঃ, কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর ঢলঢলে মুখখানা। রামকান্ত সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে নিতে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না দুর্গা। দৃষ্টি দিয়ে রামকান্ত যেন ওকে আংটো কুরে দেখছে। বড় লজ্জা পায়। হুকোটা তাড়াতাড়ি রামকান্তের হাতে দিয়ে ঘোমটাটা আরো একটু বড় করে টেনে দেয়।

রামকান্তের হৃদয়ে কি একটা জ্বলন্ত আগুন জ্বলছে? সে কি একটা অজানা সত্যকে দেখেছে? কি একটা অজানা সত্যকে অনুভব করেছে? কি একটা অজানা সত্যকে জানতে চায়? কি একটা অজানা সত্যকে জানতে চায়? কি একটা অজানা সত্যকে জানতে চায়?

একটু থাকবেই না এমন নিরালস্য ডাকতে সাহস পেয়েছে।

হুকো টানতে টানতে বুকে বল পায় রামকান্ত। আবেগ নিয়েই বলে, কি বলবে বলো নাগো গিন্নী?

গিন্নী। বলে কি গোসাঁই ঠাকুর! না, এভাবে একা বাড়িতে ওঁকে ডেকে আনা ভাল হয়নি। আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। ময়নাটাও যে সেই কখন গিয়েছে ফিববাব নাম নেই। ভয় হতে থাকে দুর্গাব।

ওকে নিকন্তব দেখে বামকাস্তও ভাবনায় পড়ে। সষোদনটা হয়তো একটু বের্ফাসই হয়েছে। তাই তাডাতাডি শুধবে নিয়ে বলে, আমাব তো দেবি কবা পোষাবে না বউ-গিন্নী। যা বলবে শিগগীব বলো।

গিন্নী শব্দের বাম তটে আব একটা শব্দ যোগ হতেই দুর্গা নিজেকে অনেকটা নিবাপদ মনে কবে। একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তেই বলে, কইছিলাম কি— আমাব একটা উপুকাব কবণ লাগব আপনাব।

বিলক্ষণ, তা এতে এত সংকোচেব কি আছে? কি কবতে হব বলোই না?

ভবসা পেযে দুর্গা সোজাহুজ্জিই উত্তব দেয়, ধবের কতা আব আপনাবে কি কমু। হাতে একটাও পয়সা নাই। তাই কইছিলাম, দয়া কইবা যদি কুমাব বাহাতুবের কাচেব খেইকা কিছু কজ লইয়া ছান।

এ আব এমন কি শব্দ কাজ। তবে উনি কাছাবিতে নিজে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নাযেব গোমস্তাব কাছ থেকে কিছু হবে না। তা পাঞ্জিতে যা লিখেছে তাতে জল এবাব তাডাতাডিই এসে পড়বে। বোশেখব প্রথম দিকেই হয়তো গ্রীনবোট ঘাটে এসে লাগবে।

বৈশাক মাস। হাবত এহনো অনেক দেবি। দুর্গাব কণ্ঠে বিষ্ময়েব স্রব।

তা তোমাকে বেশী কিছু ভাবতে হবে না। এ ক'দিন আমি বা হোক করে চালিয়ে নিতে পাববো।

আপনে চালাইবেন! আপনাব ত খুব কষ্ট অইব।

আমাব আর তোমবা ছাড়া আছে কে। তোমাদের দিয়েই তোমাদের করবো। আচ্ছা এই আধুলিটা এখন বাখো। সঙ্গে তো আব বেশী কিছু নেই, কাল আবার দেখা যাবে।

না না, আইজ আমাব না অইলেও চলব। আপনে ছাহেন, দুই একদিনের মধ্যে আর কোন ব্যবস্থা অয় কিনা।

এখন আর অল্প কোন ব্যবস্থা হবে না বউ-গিন্নী, আধুলিটা তুমি রাখো। ছেলেপুলেরা এসে পড়লে আবার লঙ্কায় পড়বে, হুকো হাতে উঠে গিয়ে

দুর্গার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় রামকান্ত আধুলিটা। কোমল স্পর্শে সারা অঙ্গে
চলে বিদ্যুৎ শিহরণ।

দুর্গাও থ বনে যায়। ভাবতে পারেনি রামকান্ত এরকম করবে। আধুলিটা
হাতে করেই চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে রামকান্ত, তোমার কোন দ্বিধার কারণ নেই।
কর্জ পেলে তুমি না হয় এ পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আজ সেই কাজই দুর্গাকে করতে
হয়। তেজ দেখিয়ে রামকান্তকে পয়সা আট আনা ফিরিদে দেওয়া যায় বটে কিন্তু
তাতে ওর নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কারো কোন ক্ষতি হবে না। রামকান্ত
ছাড়া ধাবে কাছে এমন কেউ নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়।
রাত পোহালে তিনটে প্রাণীর মুখের গ্রাস ওকে যোগাতে হবে। হাতে একটা
পয়সা পর্যন্ত নেই। মেয়েমাছুষ এর চেয়ে আর কি করতে পারে? পয়সা
এমন চীজ যে চাইতে গেলে আত্মীয়ও পর হয়ে যায়। সেই ভাল, কজ
পেয়ে রামকান্তর এ ঋণ ও স্বদে-আসলে শোধ করে দেবে।...মনে মনে চিন্তা
করে খোলাখুলিই বলে দুর্গা, তাহলে খাতায় লেইখা রাখবেন। কুমার-বাহাহুরেব
টেকা পাইলে আপনারে দিয়া দিমু।

রামকান্তর মনে খুশীর বান্ ডাকে। নিজের মনের মতো করেই ভবিষ্যতের
ছবি আঁকতে থাকে। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠেই বলে, বেশ লিখে রাখবো। তবে
জানো কি বউ-গিল্লী, সংসারে শুধু পয়সাটাই বড় নয়। দেবার এরং নেবার
আরো অনেক কিছু আছে।

সহজ কথা সহজভাবে নিয়ে দুর্গা উত্তর করে, তাহিত কই ঠাকুর মশয়.
কোতায় আপনারে দিমু—তা না আপনার কাছেই হাত পাতলাম।

নারায়ণ জানেন, তোমার হাত যেন আমি ভরে দিতে পারি।

হেই আশীর্বাদই করেন ঠাকুর মশয়।

আশীর্বাদ, নিশ্চয় আশীর্বাদ করবো। তোমরা ছাড়া আর আমার আছে
কে সংসারে? আজ উঠি তাহলে। মোড়ল হয়তো আমার জগ্ন হাঁপিয়ে
উঠছে। কাল আবার আসবো।

উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

দুর্গা হাত বাড়িয়ে হুকুটা নিতে যায়। আর একবার চোখাচোখি হয়
রামকান্তর সঙ্গে।

চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নিঃসীম অন্ধকার। কেরোসিনের অভাবে কুপি জ্বালা হয়নি। আকাশে শুধু লক্ষ তারার বলমলানি। সেই ক্ষীণ আলোতেই সলজ্জ দুটি কালো হরিণ চোখ পঞ্চশর হানে রামকান্তর মনন-মর্মে। চলতে গিয়েও চলতে পারে না রামকান্ত। থমকে দাঁড়ায়।

দুর্গা হাঁকোটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবতার পায়ের ধুলোঁ মাথায় নিতে থাকে।

তীরবিদ্ধ রামকান্ত ধীবে ধীরে ওর পিঠের ওপর হাত ঝুলিয়ে যায়।

গঞ্জের পারে ভাঙন লেগেছে। সহসা বিরাট একটা চাপ ধসে পড়ে বংশীর জলে। শব্দ শুনে চমকে ওঠে রামকান্ত। আনন্দকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। রামকান্ত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় বৈবাগী বাড়ির দিকে।

॥ ১৬ ॥

প্রবাদ আছে, ‘রেস’ আর মদেব পয়সা ভূতে যোগায়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে হয়তো এই দাঁড়ায়, নেশামাত্রই তাই। মদের চেয়েও মাতাল করা মোঁতাতে উন্নত রামকান্ত। হিসেব করে দেখতে গেলে নিজের পেট চলাই ওর পক্ষে দুষ্কর। নিয়মিত ভাগবত পাঠ আর পূজা-পার্বন করে যে অর্থ হাতে আসে তা দিয়ে কোনরকমে পেট চলতে পারে—নেশা চলে না। তাই নেশার পয়সা বোধ হয় রামকান্তকেও ভুতেই যোগায়।

রামকান্তর চোখে বড় নেশা দুর্গা। সেদিন সেই যে সন্ধ্যাবেলা দুর্গাকে মুখোমুখি দেখে এসেছে এ পর্যন্ত আর ভুলতে পারেনি। গাঁজার নেশাও সময় সময় ফিকে হয়ে যায় দুর্গার চড়া নেশার কাছে। শয়নে স্বপনে ধ্যানে দুর্গাই ওকে অহোঁরাত্র পাগল করছে।

প্রেম-পাগল রামকান্ত ইতিপূর্বেও বার কয়েক হয়েছে। প্রথম পাগল করে চিত্রতারকারা—কৈশোর যৌবনের সে এক পরম সঙ্কীর্ণ। তারপর চা-বাগানের স্বাস্থ্যবতী খাসিয়া মেয়েরা। ছিটে ফোঁটা আরো অনেকেই করেছে। কিন্তু এই বিপদীক জীবনে দুর্গাই ওকে প্রাণে মারছে। তিল তিল করে তুঁবের আঙুনে পুড়িয়ে মারছে ওকে দুর্গা।

আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় রামকান্তর জীবন-ভর সমস্তা। বর্তমান আয়ে পেট পুরে ডাল ভাত তরি-তরকারি খাওয়া চলে, নেশা চলে না। কিন্তু রামকান্ত

কায়দাকাহ্ন করে সে নেশাও এপর্যন্ত বজায় রেখে চলেছে। নিদেন দৈনিক এক দু'আনি পরিমাণ গাঁজা ওর চাই-ই। দুপুরের আহায়ের পর একমাত্রা আর বিছানায় ষাবার আগে আর-এক মাত্রা। না খেলে পেট ফুলে ঢোল হবে। সারারাত ঘুমই হবে না। শিগ্গদের মাথায় হাত বুলিয়ে এখনো এ ঠাট বজায় আছে। অল্পপানের আধ সের টাক দুধও ঠিকমতোই বরাদ্দ আছে। প্রতিদিন ভাগবত পাঠে বসবার আগে কুসুম বেশ ঘন করে জ্বাল দেওয়া একবাটি গরম দুধ হাজির করে। সেটুকু চুমুক দিয়েই ও পাঠে বসে।

বেশ আছে রামকান্ত। রমেন্দ্র নারায়ণ উপস্থিত থাকলে দু' একপাত্র রঙিন পানিরও অভাব হয় না। সঙ্গে এটা-সেটা স্নস্বাহু ভোজ্য বস্তু। দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিন্তু কাল হয়েছে দুর্গা। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে দেখা হলো—এখন দিয়ে থুয়ে কুল নেই। ধার কর্ত্ত করে এ কদিনের ভেতর খুব কম করেও পাঁচ টাকার ওপব দিতে হয়েছে। পাড়া গাঁ, চাইলে এখানে এক সের চাল কর্ত্ত পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ফুটো পয়সা কারো কাছে পাওয়া যায় না। নগদ পয়সার বড় কাঙাল এখানকার মানুষ। তবু রামকান্ত যাহোক করে এ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। বরাদ্দ গাঁজার পয়সায় দিন দুই টান পাড়েছে।

অনেক দিনের নিয়মিত অভ্যাস ছেদ পড়ায় রাত্রে ঘুম হয়নি—পেট ফুলে উঠেছে। তবু দুর্গাকে চাহিদা মতো পয়সা না দিয়ে পারেনি। দুর্গাও সরল মনেই সে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে—। এক এক করে দিন গুণছে। ঘাটে জল আনতে গিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে কাছাবির দিকে। গ্রীনবোট ঘাটে লাগলেই ঋণ পাবে। একদিনে শোধ করে দেবে রামকান্তব সমস্ত ধার দেনা।...

স্বপ্ন রামকান্তও দেখছে। দুর্গাকে ঋণ নিয়ে দিতে পারুক আর না-ই পারুক, নিজের জগ্ন অন্ততঃ কিছু আদায় করতে পারবেই। আর তা যদি পারে তাহলে একদিন রাতের অন্ধকারে সরে পড়বে এখান থেকে দুর্গাকে নিয়ে।... কিন্তু একি হচ্ছে! চোত মাস যে শেষ হতে চললো, জ্বল এক বিন্দু বাড়ছে না। গ্রীনবোট ঘাটে না লাগলে যে আর একটা পয়সাও পাবার উপায় নেই। এখন তো ঘাটে পথে বার হওয়াই দায় হয়ে উঠলো! দু'চার আনার জগ্নই লোকগুলো অস্থির করে তুলছে। পাড়া গাঁয়ের ভূত না হলে এমন কখনো হয়! শহবের লোক তো দু'চার আনাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তাগাদা করা তো দূরের কথা সামান্য এ পয়সা ঋণের মধ্যেই ধরে না কেউ।

না, এ হতভাগা দেশ থেকে পালাতেই হবে! ভদ্রলোক কেউ কখনো এখানে থাকতে পারে?...রামকান্ত দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

দু' রাত্র ঘুম নেই রামকান্তর চোখে। মাথার শিরাগুলো সব ফুলে উঠে ন্দন্দ করছে। চোখ কান দিয়ে যেন আঙুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে হাতে পায়ে জল দিয়ে আসে রামকান্ত। না, তবু স্বস্তি নেই। শহর জীবন ছাড়ার পর দুধ কলার অভাবে বে কালনাগিনী ঝিমিয়ে পড়েছিল আজ আবার তার ফোস-ফোসানি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ফণা তুলেই জেগে উঠছে নাগিনী। রমেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ইয়ার্কি আড্ডায় মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙলেও এতদিন বহিঃপ্রকাশের পথ ছিল না! আজ দুর্গাই ওকে সে স্ফুট পথেব সন্ধান দিচ্ছে। কেন ও ওকে নিভূতে ডেকে পাঠালো? কেন হাত পেতে সাহায্য চাইলে ওর কাছে? ওকি জানে না, রামকান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ! অর্থের তাড়নায় চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে শহর ছেড়ে এই নরকে! অর্থ-ই যদি থাকবে তাহলে কি দরকার ছিল ওর আত্মাকে বঞ্চিত করে এই ভণ্ডামী কববার? স্বর করে ভাগবত পড়লেই যেন মাগ্বষের সব কামনা বাসনা ধুয়ে মুছে যায়! না না, মিথ্যে এই ভাববিলাস। কেউ আনন্দ পেলেও ওর এতে কোন আনন্দ নেই। ও কখনো চায় না ফোটা তিলক কেটে সং সাজতে। হাতে পরসা থাকলে রমেন্দ্র নারায়ণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ও।...

দুর্গার মোহে আচ্ছন্ন থাকলেও এতদিন ভাগবতের আসরে না গিয়ে পারেনি রামকান্ত। নয় তো চলবে কিসে? দু'চারটে পরসা তো ওখান থেকেই আসে। চোখ বুজলে ভেসে ওঠে দুর্গার প্রতিমূর্তি। রঙিন পাখা মেলে দুর্গাই ওর ধ্যান ভাঙে। ভাগবতের ঠাকুর বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তবু ওকে মিথ্যা ভাব-গদগদ-চিত্তে বসে থাকতে হয়। তবু কীর্তনের তালে তালে দু'বাহু তুলে নাচতে হয়। ও যেন এক কলের পুতুল।...না, রামকান্ত আর পারে না। সত্যি সত্যিই বোধ হয় অস্বস্থ হয়ে পড়ল ও। দিন দুই আর আসরে যেতে পারে না। রটিয়ে দেয়, কণ্ঠনালীতে ভীষণ যন্ত্রণা—ঠেঁচাতে পারবে না। সংবাদ পেয়ে শিয়েরা দলে দলে ছুটে আসে। যে যেভাবে পারে প্রভুর সেবায় মন দেয়। রামকান্ত এক জালা থেকে আর-এক জালায় পড়ে। তবু যদি নগদ দু'পাঁচটা টাকা কেউ হাতে দিতো! ওর কি দু'দণ্ড একা থাকারও অধিকার নেই?...আবার ভাবে, অস্বস্থ সকলে। ওদের সঙ্গে একদিন হয়তো দুর্গাও আসবে। হয়তো নিভূতেই

আসবে। এত করছি, সামান্য এটুকুও কি করবে না ও? ক্লান্ততা বলে কি কোন বস্তু নেই সংসারে?...বিছানায় শুয়ে নিশিদিন ছটকট করতে থাকে রামকান্ত। রুগ্ন না হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার যে কি জালা তা শুধু ও নিজেই জানে। কিন্তু কই তিন দিন হয়ে গেলো, দুর্গা তো একবারও এল না! তবে কি শুধু পয়সার সঙ্কেই ওর সম্বন্ধ? না না, দুর্গা কখনো এতটা স্বার্থপর হতে পারে না। হয়তো কোন অসুবিধা আছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই হবে। নয় তো চুপি চুপি রাত্রের অন্ধকারেই বা ডেকে পাঠাবে কেন? ক্ষেপ্তিটা তো কোটনামীর তালেই আছে। নিজের ছিদ্রের অভাব নেই তবু অষ্ট-প্রহর ব্যস্ত অস্ত্রের ছিদ্র খুঁজতে। নচ্ছারটা আস্ত ছেনাল। দুর্গার পেছনে লেগেই আছে।...শুয়ে শুয়ে শিরদাঁড়া ধরে যায় রামকান্তর। নিবিবিলিতে একটু উঠে বসে। এখন আর কেউ আসবে না। গৈয়ো ভ্রতগুলো কীর্তনে মেতেছে। রামকান্ত নিশ্চিন্ত মনেই উঠে বসে।

কৃষ্ণ-চতুর্দশী। রাত্রির হয়তো মধ্য-প্রহর। চারদিক জুড়ে থম্‌থম্‌ করছে ঘন অন্ধকার। সমস্ত চর নিরুন্ম নিস্তব্ধ। গঞ্জের দোকান পাটও সব বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে দোকানীরা। চব্বথল্লাকে চোখেই পড়ে না। অন্ধকার ভৈরবী গিলে ফেলেছে যেন। রামকান্তব বৃকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জীবনে পেলো কি ও। সবই যে অন্ধকার। সংসারে কে আছে ওর আপন জন? দু'দিন না হয় ভান করে শুয়ে আছে। আর ভানই বা কেন? দেহের না হলেও মনের অসুখ তো বটেই। কিন্তু কে দেখলে ওকে? দীঘু বৈরাগী আর ওর ঐ সান্নিপাক্ষরা? কি জানে ওরা? ওরা তো জানে শুধু চাষ-আবাদ করতে আর খেতে শুতে। হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি ওদের?... দু'দিন পেটে ভাত পড়েনি রামকান্তর। মাথাটা বোঁ করে পাক দেয়। উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ে।

বসন্তর বাতাস ধীরে বইছে। খানিক জিরিয়ে নিয়ে খিল খলে বেরিয়ে আসে রামকান্ত দাওয়ার ওপর। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আরো খানিকক্ষণ। দু'চোখ জলে ভরে আসে। পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন গিলে খেতে আসছে চারদিক থেকে। না না, ও মরবে না—মরতে পারবে না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মণ্ডল বাড়ি। পৃথিবীতে আর কেউ না থাক ওর দুর্গা আছে। দুর্গার কাছেই মাঝে ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো দুর্গা হাত ছানিতে ডাকছে। দুর্গা—দুর্গা—

একসঙ্গে মগজের পোকাকুলো কিলবিল করে ওঠে রামকান্তর। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় মগল বাড়ির দিকে। কিছুটা যেতেই গতি মন্থর হয়ে আসে। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছের আড়ালে? কেউ কি পেছু নিলে ওর? চুপি চুপি বসে পড়ে কাশ বনের অন্ধকারে। একটা কেউটেই না শেষে ছুবলে খায়। উকি দিয়ে দেখে রামকান্ত। না না, ও কিছু নয়। মরা কলাগাছ একটা। ঐ তো হাওয়ায় দুলছে শুকনো পাতা। আবার উঠে পা চালায়। এবার আর হনহনিয়ে নয়। পা টিপে টিপে মগল বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ে। ঐ তো দুর্গার ঘর! চেউ টিনের চাল, বেড়া। বাড়ির ভেতর এই একখানা ঘরই পাকা। মেয়ে নিয়ে এই ঘরেই শোয় দুর্গা। কলার ঝাড়কে আড়াল কবে উত্তরের জানালায় এসে দাঁড়ায় রামকান্ত। ঘুট-ঘট করছে অন্ধকাব। হায়, চাঁদও যদি উঠতো আকাশে! না, ভগবান সব দিক থেকেই বিরূপ। দুর্গা—দুর্গা, ডাকবে কি ওকে? মেয়েটা তো অঘোরেই ঘুমোচ্ছে পাশে। ডাকলে কি সাড়া দেবে না? যদি বলি, মুঠো ভর্তি টাকা এনেছি, তবুও কি না?...ওকি! ওদিকটায় অতো কুকুর ডাকছে কেন? শেয়াল লাড়া করছে বুকি। যদি এদিকটাতেই এসে পড়ে? এত চেষ্টামেচিত্তে কি আর কারো চোখে ঘুম থাকবে? আনন্দটা একটা আস্ত গোয়ার। চোর বলে ঠেসে ধবলেই গেছি।...বুকুর ধুকপুকানী বেড়ে যায় রামকান্তর। পা টিপে টিপে খড়ের গাদায় এসে গা ঢাকা দেয়! থাক, কেউটেই ছুবলে থাক। ছি ছি ছি, এমনও মানুষের হয়। যার জন্ম মরছি সে তো কিছুই জানলে না। সাহস থাকলে স্পষ্টই তো বলা যায় দুর্গাকে। নিভতে যে ডাকতে পেরেছে তার সম্বন্ধে এর চেয়ে আর বেশী কি ভাবা যায়? আমিই আহাম্মক তাই আঁকুপাঁকু করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল স্পষ্টই শুনিয়ে দেবো, টাকা যদি চাও তবে তার জন্ম বিনিময় দিতে হবে। তোমার জন্ম শুধু শুধু ভিথিরী সাজতে পারবো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করতে হয়। চাইলেই কারো কাছ থেকে অমনি পাওয়া যায় না।...না না, এত ভাবনার কিছু নেই। মেয়েমানুষ হয়ে দুর্গা অনেকটা এগিয়েছে। শুধু টাকাই ওর কাম্য নয়। টাকা ধার ও চরের অনেকের কাছেই পেতো। নিজের স্বজাতি কুটুমের মধ্যেও রয়েছে অনেক টাকাত্তে মানুষ। তবু তাদের কাছে না গিয়ে আমাকে ডাকলে কেন? কি আশ্চর্য! এই সহজ কথাটাই এতদিন মাথায় আসেনি!...খড়ের গাদায় মুখ গুঁজে আকাশ-কুহুম ভাবতে থাকে রামকান্ত। কিছুক্ষণ ষেউ-ষেউয়ানীর পর পাড়া আবার শান্ত হয়।

রামকান্ত নিঃশ্বাস কেলে মুখ বার করতে যাবে এমন সময় কানে আসে, এই মইনী, বাইরে যাবি নাকিল ? ওঠ না—এই মইনী ?...কুকুরের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গার। গা-টা কেন যেন ছম্ছম করতে থাকে। ঘুম জড়ানো চোখে কিসের যেন খস্খস্ শব্দ শুনেছে বাইরে। অতদিন তাই একা একা বেরুলেও আজ আর সাহস পায় না।

বিপদের উপর বিপদ রামকান্তর। মণ্ডল ঘাড়ির নিকাশের জায়গা খড়ের গাদার পাশেই। ওরা হয়তো এখানেই আসবে। ছায়ামূর্তি দেখে চীৎকার করে হয়তো গগন ফাটাবে। এদিকে আবার দেহের সবটা গাদার ভেতর সৈধোতে গেলেও প্রচুর শব্দ হবে। এখন করে কি ও ? না, এতদিনের পাপের ফল আজ হাতে হাতেই ফলবে। হাটুরে-কিলে পিঠের হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।...ভয়ে ভাবনায় ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে রামকান্ত। দুর্বল দেহ খরখর করে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ খিল খোলার শব্দ হয়। রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। টেনে এক দৌড়। দুর্গাও খুতমত খেয়ে যায়। এক পা মাত্র চৌকাঠে বাড়িয়েছে, চোখের ওপব দিয়ে দৌড়ে পালায় ছায়ামূর্তি। চীৎকার করতে গিয়েও কেন যেন পারে না ও। অন্ধকারের মধ্যেও ছায়ামূর্তির বাববি বাবরি লম্বা চুল ওর দৃষ্টি এড়ায় না। ছি ছি ছি, এমন মাছুষও এমন হয়! ভাগিাস ময়না আসেনি! বৃকের ভেতরটা তোলপাড় কবতে থাকে দুর্গার। সারা রাত আব দু'চোখ এক করতে পাবে না।

॥ ১৭ ॥

সাদা মনে বিষের আঁচড় পড়ে দুর্গার। ছি ছি ছি, সন্তানের মা আমি— গুরু পুরোহিত রামকান্ত। নিত্য নিয়মিত ভাগবত পড়েন। কীর্তনের সঙ্গে অঙ্গ ছলিয়ে নাচেন। তাঁর এমন দুর্ভটি! মাছুষ কি এমন পশুও হতে পারে! কি চান উনি? শুধু সাহায্য করতেই কি চোরের মতো চুপি চুপি এসেছিলেন দুপুর রাতে। তাই যদি হবে তবে পালালেন কেন? আজ বুঝতে পারছি, কি ইঙ্গিত করতেন উনি চোখে-মুখে। আমাকে কি এ রকমই ভাবলেন? কি দেখলেন উনি আমার মধ্যে? গুরু পুরোহিত ভেবে নিভুতে দুটো স্বধ-দুঃখের কথা বলাতে কি এতই অপবাধ হয়েছে?...ঠাকুর ঘরে

পূজা করতে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে দুর্গা। পেটের নাড়ীভূঁড়ি সব ঘেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ছি ছি ছি, এই মাহুঘের অন্ন আমি মুখে দিয়েছি—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি! নারায়ণ—দয়াময় আমাকে তুমি মার্জনা করো প্রভু। ময়না না থাকলে বংশীর জলে একুণি আমি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাম। আমাকে তুমি পথ দেখাও...পথ দেখাও... বার বার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে দুর্গা, বার বার ভুল হয়ে যায়। বিগ্রহের চরণে চন্দন দেয় তো তুলসী বাদ পড়ে।

সেই কোন সকালে মা পূজায় বসেছে তবু শেষ হচ্ছে না পূজা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ময়নার। নেই বলতে কিছু নেই ঘরে। আনন্দ তো অন্নেকক্ষণ ঘুরোঘুরি করে রাগের মাথায় চলে গেছে বাড়ি থেকে। না, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। উপোস দিয়েই যদি মরতে হয় তাহলে ভিটেয় গিয়েই মরবে। মিছিমিছি পরের বাড়ি থেকে দশজনের টিটকারি শুববে না।...

রোদ প্রায় মাথাব ওপর এসে পড়েছে—দুর্গা ঠাকুর ঘব থেকে বেরোয়। বেরিয়েই দেখে, খিদের জালায় দাওয়ার ওপব আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ময়না। হয়তো অবশ হয়ে পড়েছে শিথিল দেহ! দুর্গার বড় দুঃখ হয়। ময়নাকে কোলে করে বিধবা হয়েছে। সেই থেকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়েই চলে আসছে। একটি দিনের জগ্গ ও ব্যতিক্রম হয়নি। তবু পেলো কি ৬ সংসারের কাছে? একটা মাত্র মেয়ে—উপোস দিয়েই তো মরতে চলেছে। মাথার ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে শেয়াল শকুন! এত পূজা অর্চনা ব্রত উপবাস সবই কি তবে মিথ্যে? ঠাকুর কি শুধুই পাথর?... ভরা দুপুরেও আঁখির কোণে ঝড় ওঠে দুর্গার। না না, ও কোন মাহুঘের সাহায্য চায় না। যদি দাঁড়ায় তো নিজের পায়ের ওপর ভর করেই দাঁড়াবে। নয় তো ডুবে মরবে ঐ বংশীর জলে। ময়নাকেও গলা টিপে মেরে রেখে যাবে! শয়তানের লালসার টোপ ও হবে না—হতে দেবে না।...মা হচ্ছে যদি ছুটি ভাতই দিতে না পারলো তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?...আবার ভাবে, না, ময়নার ওপর ওর কোন অধিকার নেই। পরের ঘরের বউ ময়না। গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর আর বিয়ের কিছু বাকী থাকে না। কাল-অর্শোচ না থাকলে এখন ওকে পাঠাতে পারতো বৈরাগী বাড়িতে। চরে যত মন্দাই থাক দীহু বৈরাগীর বেটার বউ কখনো না খেয়ে মরতো না। মরতে পারে না।...কিন্তু সে তো গেলো পরের কথা, এখন উপায় কি? ঘরে যে

একটা দানাও নেই। আনন্দটাই বা গেলো কোথায়? একটু যদি আক্কেল থাকে? নিজের আর কি, এক পেট খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ খেলে কি না খেলে ক্রক্ষেপ নেই। আমারই হয়েছে যতো জালা।...

জালা আনন্দরও। এতদিন শুধু পেটের জালাতেই জলছিল এখন আবার মনের জালাও শুরু হয়েছে। দুর্গা ভেবে নিয়েছে, পেট ভর্তি খেয়েই রাস্তা-ঘাটে আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। কিন্তু খাবে কি? ঘরে কি কিছু ছিল? গত বাত্রের ঘটনায় ওর হয়তো মাথারই ঠিক নেই। আনন্দ গিয়েছে গঞ্জে—ধাবে যদি কারো কাছ থেকে কিছু আনতে পারে। বাড়ির সওদাপত্র তো দীর্ঘদিন ও-ই আনছে। দোকানীদের সঙ্গে চেনাশুনোও হয়েছে। চাইলে কি আর একদিনের জন্ত কেউ ধার দেবে না? কিন্তু আদুষ্টের বোধ হয় এইটেই চরম পরিহাস, প্রয়োজনের সময় মাছ কোথাও কিছু পায় না। আনন্দও পেলো না। কিন্তু ও যে সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খালি হাতে আজ কিছুতেই ফিরবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেই গঞ্জে এসেছে, দিদি যদি মেয়েমাছ হয়ে দশদিন চালাতে পারে—তাহলে পুরুষ মাছ হয়ে ও একটা দিন চালাতে পারবেই। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, তা সে যে-ভাবেই হোক। দোকানীরা একে একে ফেরাতে থাকে, আনন্দের জিন্দ বেড়ে যায়। সামনেই খালাস হচ্ছিল কেরোসিনের 'ফ্ল্যাট'। প্রায় পঁচিশজন মুটে কাজ করছে। টিন প্রতি মজুরি এক পয়সা। ফ্ল্যাট থেকে মাথায় কবে নামিয়ে মহাজনের গুদামে তুলে দিতে হবে। সর্দারকে বলে মাজার কাপড় শক্ত করে বেঁধে কাজে লেগে যায় আনন্দ। এক এক মোটে ও ছুটো করে টিন নামাতে থাকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উপায় হয়ে যায় নগদ একটা টাকা। আনন্দের মনে খুশীর বান ডাকে। রোজ ও এ কাজ করবে। সকলের আগে যে দোকানদার ওকে ফিরিয়েছিল বৃকে টাকা মেরে তার কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো জিনিসের জন্ত হুকুম করে! দোকানদারের স্বর পাণ্টে যায়। সদাই মাপার আগে একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয় আনন্দর দিকে। বলে, মোড়লের পো, বউনীর সময় ধার চাইলা তাই দিবার পারিনি। দরকার থাকে ত নিয়া যাও অহন।

না না, তোমাগ কাছে আর ধার চাই না। তোমরা চামার। ক্যামতা থাকে নগদ পয়সা দিয়াই জিনিস কিহুম, বিড়ি টানতে টানতে রুক্সরে জবাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার গালখেয়েও আর রা করে না। হাসতে হাসতেই সওদা মাপতে থাকে।

আনন্দ আবার ধমক দেয়, মাপ ঠিক দিয় কইলাম। চাউলে ঘ্যান্ কোন রকম গন্দ না থাকে।

এবার দোকানদার মুখ খোলে, আগে জিনিস খাইয়া তারপর কতা কইয়। হরি সা মাপে কাউরে কোনদিন ঠকায় না।

হ হ, অনেক সাউকারকেই ছাহা আচে। কত দাম অইল?—পাণ্টা জবাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার বলে, সাড়ে বার আনা। এই নেও চৌদ্দ পয়সা। জিনিস কিনবার অইলে এইহানেই আইহ। খাটি ওজন, এক নম্বর জিনিস।

আনন্দ পয়সা এবং সওদা গামছায় বেঁধে উঠতে উঠতে বলে, একটু ত্যাল দিবা নাকি? বেলা অইচে, একটা ডুব দিয়া যাইতাম।

দোকানী মুচকি হেসে বলে, ত্যাল তামুক দোকানীর সন্ন সময়েই গাহাকের লেইগা খরচ করে, এই নেও, বলতে বলতে এক পলা সন্নয়ের তেল আনন্দর হাতের তালুতে ঢেলে দেয় দোকানী।

আনন্দ তেলটুকু মাথায় ঠাসতে ঠাসতে বেরিয়ে আসে। ময়রার দোকান থেকে চার পয়সা দিয়ে আট খানা জিলিপি কিনে ফেলে। সঙ্গে একখানা কাউ। তারপর ঘাট থেকে পরিষ্কার করে হাত, পা, মাথা রগড়িয়ে একবারে স্নান সেরেই বাড়ি ফেরে! খুশীতে ময়নাকে ডাকতে যাবে, চেয়ে দেখে দাওয়ার ওপর ঘুমিয়ে আছে ময়না। দুর্গা জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেদনায় আনন্দর বৃকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। সকাল থেকেই দিদির যেন কি হয়েছে। কথা নেই—বার্তা নেই—চাঁপা ফুলের মতো মুখখানায় কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। থমকেই দাঁড়ায় আনন্দ কলার ঝাড়ের আড়ালে!

দুর্গা করুণভাবেই চেয়ে দেখছিল ময়নাকে। কি সুন্দর কচি মুখখানা। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি হরিণ চোখ। দেখলে মায়া হয়। কিন্তু কি বরাত নিয়েই না জয়েছে মেয়েটা। সামান্য দুটি ভাত তাও জুটছে না! ক্ষেস্তি সেদিন গাল দিলে, রাক্ষুসী—হাড়-হাবাতি। একে একে সব গিলছে। বাপ ঠাকুরদাকে খেয়েছ এবার মাকেও খাবে।...শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল সেদিন। কত আদরের ময়না, ও কিনা রাক্ষুসী! এমন করে কেউ কাউকে গাল দেয়!...

কিন্তু আজ কেন যেন ওর নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, ময়না কি তাহলে সত্যি অপয়া? জন্মে অবধিই তো কপালে স্থখ হলো না। তবে, কি...না না না, ও কেন অপয়া হতে যাবে? ঘাট বালাই। লক্ষ্মী মা মণি আমার! ক্ষেস্তি যদি আর কোনদিন এ-মুখো হয় তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।...ডাকবো কি ওকে? না থাক, ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে খেতে দেবো কি? তবুও তো ছুদগু শাস্তিতে আছে।...কিন্তু সারাদিন তো আর ঘুমিয়ে কাটবে না। জেগে এক সময় উঠবেই, তখন? ছুটে ঘরের ভেতর যায়। ভক্তির ভরে প্রণাম করে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে। তারপর খুলে ফেলে কাঁপি। সিঁদুর মাখানো পাঁচটা টাকা রয়েছে। শাস্ত্রী ঠাকুরগণ বলে গেছেন, মা লক্ষ্মীর কাঁপি যেন কখনো শূন্য করো না। এতদিন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ও। শত অভাবেও হাত ছোঁয়ানি। কিন্তু আজ যে ওর ময়না উপবাসী—ওর মাণিক—ওর নয়নের মণি। আজ ও কারো কথা রাখতে পারবে না! না-না-না।...ছুটে টাকা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার বাইরে ছুটে আসে দুর্গা। ভীষণ রাগ হয় আনন্দের ওপর। কাম কাজ তো কিছু করবেই না সময় মতো যে দুটে ফাই ফরমাশ শুনবে তাও নয়। ইস, বাছাব আমাব মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আস্থক আজ, দূর করে দেবো।...

আনন্দ ভেবেছিল খাবার নিয়ে মনের উল্লাসে বাড়ি ঢুকবে। ময়নার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গদগদ হয়ে প্রথম উপার্জনের পরসায়-কেনা খাবার খাবে। কিন্তু দুর্গার হাবভাবে মনের সাব মনেই চাপ পড়ে! শাস্ত্র-ভাবগম্ভীর ভাবেই দাঁওয়ার কাছ খেঁষে এসে দাঁড়ায় আনন্দ।

এতগুলো জিনিসসমেত ওকে দেখে বিস্ফারিত চোখেই প্রশ্ন করে দুর্গা, ই কিরে, এত জিনিস তুই কোনহানে পালি?

আনন্দ সরল মাথায়—সহজভাবেই উত্তর দেয়, কুথায় আবার পামু? পয়সা দিয়া কিনা আনচি?

কিনা আনচি? কারা দিচে তরে পয়সা?

কারা আবার দিব? উপায় কইরা আনচি!

ইস, উপায় কইরা আনচে! অরে আমার ক্ষ্যামতার মাথুঘরে! ঠিক কইরা ক, কারা দিচে তোরে পয়সা? দুর্গার ভয়, রামকাস্তাই ওকে পয়সা দিয়েছে। কাল ফিরে গিয়ে শয়তানটা আজ আবার খাবার দিয়ে ভূলাতে চাচ্ছে। গলার স্বরে তাই তীব্র ঝাঁজ!

আনন্দ আর কথা বাড়ায় না। সোজাস্বজিই বলে ফেলে উপার্জনের ইতিহাস।

দুর্গার দেহে এতক্ষণ জ্বালা ছিল এবার দুঃখে দ্রব হয়ে যায়। এও ওর কপালে ছিল! আপন মার পেটের ছোট ভাই। ওদের অভাবের জন্ত আজ মুটেগিরি করলে! আর সেই পয়সাতে কেনা চাল ডাল ওকে গিলতে হবে!...

দিদির চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখে আনন্দের দু'চোখ দিয়েও অজান্তে জল গড়াতে থাকে! কে জানে, কতক্ষণ কাঁটতো এভাবে? ভগবানকে ধন্যবাদ যে চাঁচামেচি শুনে ময়নার ঘুম ভেঙে যায়! হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে ময়না। একি! ওকি স্বপ্ন দেখছে নাকি? দু'দিন ভাল করে হুন ভাতও জোটেনি—আর আজ জিলিপি! চাল, ডাল, তেল হুন এক-গাদা!...ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ময়না জিলিপির ঠোঙার দিকে।

ময়না ভাল করে জেগে না উঠতেই আনন্দ চোখ পুঁছে নিয়েছে। স্বভাব সুলভ চপলতা নিয়েই বলে, তর চক্ষে রাইত দিন খালি ঘুম। কহন খেইকা ডাকবার নৈচি ঘুমই ভাঙে না। নে, জিলাপি খা, তিনখানা জিলিপি একসঙ্গে ময়নার হাতে গুঁজে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকে আনন্দ।

চোখের জল দুর্গাও পুঁছে নিয়েছে। ঝড় বইছে বৃকের ভেতরে। ধবা গলায় বলে, তুই খালি না?

দুর্গার সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আনন্দ পান্টা জিজ্ঞেস করে, তুমি?

আমার প্যাটটা বালো (ভাল) নাই, আমি কিছু খামু না।

তবে আমার প্যাটও বালো নাই, আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ? খাইয়া নে।

পাগলামী আমি করচি না তুমি করচ? গতর খাটাইয়া পয়সা উপায় করচি হ্যার আবার দোষ কি?

আনন্দের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দুর্গা ময়নাকে বলে, ষাত মা রান্দন, ধর খেইকা এক লোটা খাওয়নের জল নিয়া আয়!

ময়না ইঙ্গিত মাত্র উঠে যায়। দুর্গা আবার আরম্ভ করে, গতরই যদি খাটাবি তয় মৌটাগিরি করবার গেলি ক্যা? নিজেগ ক্ষ্যাতের কাম কল্পেই ত অয়। আটে বাজারে যদি মৌটাগিরি করচ তয় কি আর বৈরাগী মশয় তর বাগনীর লগে হ্যার পোলার বিয়া দিব? আমাগ বংশে কি কেউ কোনদিন মৌটাগিরি করচে?

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে আনন্দর। তাই আর বেশী কোন কথা না
বাড়িয়ে গম্ভীরভাবেই সম্মতি জানায়, তা তুমি যদি মানা কর তয় না কল্লাম।

হ, ও কাম আর করবি না। লোকে নিন্দা করব।

কাম করুম না তয় খাইবা কি ?

হ্যা ভাবন' আমার। তুই এহন খা।

তয় তুমিও খাও।

নাবে, আমি এহন কিচু মুখে দিবার পারুম না।

খব পারবা। নইলে আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ। খাইয়া নে না ?

হ, আমি পাগলই। তুমি এহন খাইবা নাকি খাও। কইলাম ত, এহন
থেইকা ক্ষ্যাতের কামই করুম।

তাই কর আনন্দ। তুই কাম করলে আমাগ আবার দুখ্য কি ?

করুম—করুম—করুম। তুমি এহন হাঁ করত, আনন্দ একটা জিলিপি তুলে
নিয়ে একরকম জোর করেই দুর্গার মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে।

দুর্গা দাঁত চেপে থেকে বাধা দেয়, তুই রাখ, আমি পরে খামুনে।

আনন্দর মেজাজ এবার সপ্তমে গিয়ে ওঠে, বালো অইব না কইলাম। না
খাও ত আমি সব কাউয়ারে (কাককে) দিয়া দিমু।

দুর্গা আর আপত্তি করতে পারে না। ধীরে ধীরে মুখ নাড়তে থাকে।
মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় ওর।

॥ ১৮ ॥

অসময়ের জল ঝড়ে রবিশস্ত্র নষ্ট হয়েছে। তারই জের চলেছে ভাণ্ডারে—
চাষ আবাদে। অভাব অনটন শুধু বিধবা দুর্গার সংসারেই নয়। ছোট বড়
চরফুটনগরের সব চাষীর অবস্থাই প্রায় সমান। শুধু চরফুটনগরই বা কেন ?
চরখল্লারও বিরাট ক্ষতি হয়েছে। অল্পপর দূরের কথা, পলানের মত চাষীও
মাখায় হাত দিয়ে বসেছে। ১৩৩২ সালে পাঁচ সাত টাকার পাট পঁচিশ জিংশ
টাকা দরে বেচে চরময় উঠেছে সারবন্দী ঢেউ টিনের ঘর। টাকায় দুটো দর
কজলী আম, দু' তিন টাকা জোড়া ইলিশ মাছ খেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি।
হাঁড়ি ভর্তি দই, সন্দেশ, রসগোল্লাও খেয়েছে। তিনগুণ চারগুণ দরে নতুন

আবাদী জমি কিনতেও কোন বেগ পেতে হয়নি! নগদ টাকা হাতে কারো থাকেই না। তা না থাক, কি হবে নগদ টাকা দিয়ে? ওরা তো আর হুদখোর নয় যে টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়াবে। টাকার খনি ওদের ক্ষেত-খামারে। মজার ফসল পাট। একটু গভীর খাটাবে কাঁড়ি কাঁড়ি করকরে নোট হাতে আসবে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকা। ভাবনার কি—চলমান টাঁকশাল ওদের হাতের মুঠোয়।...

ভাবনার সত্যি কিছু ছিল না। এক বছরের পাটে দশ বছরের বকেয়া ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এই তো সবে শুরু। পৃথিবীর মানুষের চাই পাট। পাট-ই টাকা পাট-ই সমস্ত সুখ-ঐশ্ব্যের উৎস। কি হবে ধান ফলিয়ে? এক মণ পাট বেচলে দশ মণ ধান উঠবে গোলায়। পাটের তুলনায় ধান তো বুনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ ওরা আর ধান বুনো জমি নষ্ট করবে না। পাট-ই বুনছে—পাট-ই বুনবে।...

প্রবাদ আছে, অতি আশায় চাষা নষ্ট। চরধল্লা-চরফুটনগর সত্যি সত্যি আজ নষ্ট হতেই বসেছে। চাল, ডাল, তেল, হুন সব কিছুই কিনে খেতে হচ্ছে এখন। তা কিনে খেতেও আটকাতো না যদি না রবিশস্ত্র সমূলে বিনষ্ট হয়ে যেতো। রবিশস্ত্র থেকে কম টাকা ঘরে আসে না। মন্দার ক'মাস ও থেকেই চলে। মায় পাটের নিড়ানি পর্যন্ত। কিন্তু জল-ঝড়ই সব পণ্ড করলে। কে জানে, না খেয়েই মরতে হবে হয়তো।...পাট চাষীর মনে সুখ নেই। দীর্ঘর বাড়িতে প্রাত্যহিক হরিসভাতেও আর তেমন লোক জড় হয় না। সকলের মুখেই হা হতাশ। করিম ফাঁকির বাড়িতে বিগত ধামাল উৎসবেও শিয়রা প্রাণখুলে যোগ দেয়নি। বেশ অনটন লক্ষ্য করা গেছে। পলানের গস্তি দু' থানাও মাসেকের ওপর ঘাটে বাঁধা রয়েছে। কিন্তু চলাচলের টাকা নেই। পুঁজির সম্পূর্ণ-ই বাজানকে দিয়ে দিতে হয়েছে ওসমানের। পলান তাতেও কুল পাচ্ছে না। বৃহৎ সংসার। চালের খরচাই এক কাঁড়ি। তাছাড়া আছে তেল, হুন, কাপড়-চোপড়। চাষের যোগানও দিতে হচ্ছে আবার। সবে তো বীজ ছিটানো হয়েছে। এরপর আছে নিড়ানি, কাটাই, জাগ, ধোয়া, শুকানো। দফায় দফায় খরচা। ঋণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গঞ্জের নিতাই সাহা বড় মহাজন। লক্ষাধিক টাকার লগ্নি কারবাব। ১৩৩২ সালের পর বছরখানেক রীতিমতো মন্দা গিয়েছে। ১৩৩৩ সালে তো কারবার একরকম বন্ধ বললেই হয়। গণেশ উর্দিয়ে চাষআবাদ

করবে ভাবছিলু নিতাই। সহসা চোখ খুলে তাকান মুখিক-বাহন। ১৩৩৩ এর রবিশস্ত্র স্কন্ধে পচেছে। চৌতিরিশের গোড়াগোড়িই আবার এসে ঋণের জগ্ন ধর্না দিতে থাকে চরের চাষী। নিতাইয়ের নাইবার খাইবার সময় নেই। ব্যবহারের অভাবে হুকোগুলো সব অকেজো হয়ে পড়েছিল। একদিকে খোল আর একদিকে নলচে। সবগুলোই আবার সচল হয়ে ওঠে। বামুনের হুকো, স্বজাতির হুকো, নমশূদ্রের হুকো, মুসলমানের হুকো। সব কয়টির জাত আলাদা আলাদা। ভুলে কেউ কাউকে ছুঁয়ে দিলেই সর্বনাশ। গদিব বিছানাও ঢ'রকমের। বাবু মশায়দের জগ্ন ফরাস বিছানো ঢালা বিছানা আব খাতকেব জগ্ন শুধু এক ফালি চট। স্থানাভাবে কেউ শানের উপর বসলেও নিতাইয়েব কিছু করার নেই। নিজের তাকিয়াটি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থাকলেই সে খুশী। টাকা ধার করতে এসেছে তার আবার কথা কি? আগে সেলাম বাজাও তারপর সোজা চটের ওপব বসো। ইচ্ছে হয় নিজের হাতে তামাক সেজে খাও। তা সে তুমি লাখ টাকার চাষীই হও আর চুনোপুঁটিই হও।

চটেই এসে বসে চরেব মানুষ। বাধাবমণ ভেঙার তমস্ক লিখে কুল পায় না। পাট নিড়ানির আগে চব্বিশ ঘণ্টাব আঠারো ঘণ্টাই চলে দলিল লেখাব কাজ। নিতাইছাড়া গঞ্জে ছোটবড় আবোজনকয়েক হুদখোর আছে। রসিক ঘোষের পুজি মাত্র শ পাঁচেক। টাকা প্রতি মাসিক হু' আনা দশ পয়সা হুদে প্রথম মরশুমেই হাতখালি করে লাগিয়ে ফেলেছে। এখন হুদের হার তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। কপাল চাপড়ায় রসিক। বউয়ের হাতেব জমানো দশ বিশ টাকা ও ছোট ছেলে মরণচাঁদেব একটা দুটো পয়সা কবে জমানো পাঁচ টাকাও লাগিয়ে ফেলে রসিক। সকলকেই বুঝিয়ে শাস্ত করে, যা দিলে তার দেড়া পাবে।...

দীমু করিম পোড় খাওয়া মানুষ। ভেবেছিল জীবনে আর ঋণ করবে না। মহাজন কি চিজ তা কাশীপুর থাকতেই টের পেয়েছে। কাশীপুর আর চরধল্লা তো ঘরের কাছে ঘর। হুনিয়ার সব জায়গাতেই হুদখোরদের এক বা। উপসী ছারপোকাই যেন এক একটি। কিন্তু তবু আসতে হয়। ঋণ করা বোধ হয় বিধাতা ওদের কপালে লিখে দিয়েছে। নিতাইয়ের চটের ওপর এসেই বসে দুজনে। প্রাপ্য সেলাম বাজাতেও কত্তর করে না। তামাক সেজে আর একজন চাষী হুকো করিমের হাতে তুলে দেয়। নেশার মাদকতায় ফুরক ফুরক শব্দে টানতে দেরি হয় না। তারপর খতে দস্তখত। দীমু করিম দুজনেই

তিনশ টাকা করে কর্ত্ত করে। স্বদ মাসিক টাকা প্রতি দু' আনা। মোড়ল বলেই কিছুটা খাতির করলে নিতাই। নয়তো এখন স্বদের হার ঢের বেশী।

পলানের দায় শ'তে মিটবে না। ক'ম করেও হাজার তিনেক টাকা ওর দবকার। বড় ছেলে ওসমান কর্ত্ত করতে রাজী নয়। পই পই করে নিষেধ করে সে বাজানকে। নিজেদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয় তাই হোক। ধার দেনা করে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে কাজ নেই!

পলান বলে, খাবড়াচ ক্যান্ বাজান? তর বাজানের কিছু অচিল্ না। মাহস কইরা কাম কাইজ করচিলাম বইলাই আইজ দুইডা পয়সা হৈচে। পাটের দর ইবারও গরম যাইব। যহন বালো যায় তহন (তখন) পব পর তিন চাইর মালই বালো যায়। মুগ কালাই গরে (ঘরে) উঠলে কি আর আমাগ দেনা করন লাগত ?

হেইত কই, বরাত যহন ইবার মোন্দ তহন দাঁতে কামড় দিয়া থাকনই বালো, বার্থা দেয় ওসমান।

পলান বলে, তর সাহস নাইরে বাজান। ব্যাটা ছাওয়ালের অত ভয়ডর করলে চলে? তিরিশ ক্যান কুড়ি টেকা দরে পাট বেচলেও কত টেকা গরে আইব ক ত ?

স্বদটাও একবার ইসাব (হিসেব) কইরা ছাহ, আবার বাধা দেয় ওসমান।

আরে ধুংতর, স্বদের মাথায় মারি লাথি। ও হালার (শালার) স্বদ খোরের টেকা আমি বাছ-পাট বেইচাই দিবার পারুম। আর বোচ্ না ক্যান, আল্লায় বৃজি অগও কিছু দিবার চায়। স্বদ খাওয়া ছাড়া ত ও হালাং আর কিছু করণের নাই। গুণায় মরব হালারা, বিরক্তি ফুটে ওঠে পলানের কর্ত্তে।

তা তুমি যা বোজ কর। ধার দেনা করণে আমার মত নাই, ওসমানও সমতা রেখেই জবাব দেয়।

আইচ্ছা—আইচ্ছা, তুই এক সন বইহা খাইকা গাখ আমি কি করি।

পরের হাটেই পলান আসে নিতাইয়ের গদি বাড়িতে। এতদিন বড় অস্বস্তিতেই কাটিয়েছে নিতাই। কে জানে, পলান ব্যাপারী আবার অচ্ কোথাও থেকে টাকা নিয়ে বসলে কিনা? পলানকে টাকা দেওয়া মানে তো নিজের সিঙ্কুককে ধার দেওয়ার সামিল। এ হাট দেখে একদিন নিজে গিয়েই খোঁজ নিয়ে আসবে ভাবছিল নিতাই। তাই পলানের উপস্থিতিতে আশাতীত

খুশী হয়। অগ্ন্যান্ন খাতকরা নিজের হাতে তামাক সেজে খেলেও পল্লানের জগ্ন নিজের চাকরকেই হুকুম করে নিতাই। হুকোর জলটাও পালটিয়ে দিতে বলে। আদাব জানিয়ে বসে খোলা মনেই তামাক টানতে থাকে পলান।

নিতাই গৌফের ফাঁকে হাসি টেনেই গদগদ কণ্ঠে কুশল সমাচার জিজ্ঞেস করে। যেন কত আত্মীয়কুটুম এসেছে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাই পাঁচবার জিজ্ঞেস করে।

পলান পরিহাস প্রিয়। সবই বোঝে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই জবাব দেয়, বালো খবর আর কৈখনে থাকব? বালো খবর থাকলে কি আর আপনার ঠাই আহি?

উত্তর শুনে নিতাই হয়তো খুব খুশী হতে পারে না। তবু হেসে হেসেই জবাব দেয়, আরে আমাদেব ভাগে তো অষ্ট-রশ্মা। বাঁধা গবর টাটা ঘাস। ভালতেও আপনাবা মন্দতেও আপনাবা...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান বলে, ওকতা ছাইড়া ছান। খোদায় যহন যারে যেমুন বাকে তাই বালো। এহন যাব লেইগা আইচি তাই কই।

নিতাই উৎকর্ণ হয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন। কাজ ছাড়া তো আর আপনার দেখা মিলবে না।

তোবা—তোবা, কি যান কন্! আমি কি আব আপনাগ পায়ের যুগি মাছুষ যে আমার ছাহা পাইবেন?

নিতাই বাধা দেয়, কে পায়ের যোগ্য আর কে মাথার যোগ্য তা এ তল্লাটের মাছুষ জানে। আপনি ঢাকতে চাইলে কি হবে? এখন বলুন কি কাজ?

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পলান বলে, আজারখানেক টেকার লেইগা আইচিলাম। দয়া কইরা যদি ছান?

উত্তরে নিতাই বলে, আপনাকে টাকা দেবে না গঞ্জে কে আছে? তবে আসল কাজ বোধ হয় অগ্নজাই সেরে এসেছেন। নেহাত চক্ষুলজ্জায়—

মুখের কথা শেষ হয় না নিতাইয়ের। পলান বাধা দেয়, না—না, খোদার কসম। একটা টেকাও কারুর খন নেই নাই। আপনার ঠাই-ই পেরথম আইলাম।

তাহলে মোটে হাজার টাকা দিয়ে কি কববেন? আপনার যে এককোণের চাষও হবে না, নিতাই উত্তর করে।

হ, কতভাড়া ঠিকই ধরছেন। হাজার তিনেকের কম কিছুতেই অইত না! কিন্তু কি করুম, ওসমান কিছুতেই কর্ত্ত করবার দিবার চায় না। বলে, পাট বইনা কাম নাই ইবার।

নিতাই লাফিয়ে ওঠে, কন কি ব্যাপারী সাহেব! এ সন পাট বুনবেন না! পাটের দর যে আগুন হবে। আমার বড় সম্বন্ধী রেলির আপিসে কাজ করে। সেই তো আমাকে কথাটা চুপে চুপে বললে।

ঠিক, ঠিক কইচেন, পাটের দর ইবার আগুন না অইয়া যায় না। তব্ব ছান তিন আজারই। সুদটা একডু কম কইরেন, পলান সোৎসাছেই সায় দেয়।

সুদেব ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না! আমি বলি পাঁচ হাজারই এক পতে নিয়ে যান। খরচা অনেক কমে হবে'খন। দফায় দফায় খতে শুধু সবকারের পেটই ভরবে।

না—না, আপনি ঐ তিন আজাবই ছান। কেউবে যান কইয়েন না। ওসমান ছনলে বাগ কবব।

কারো সাখা নেই নিতাইর পেটের কথা বার করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! তোমরা যেন আবার কোথাও বটিয়ো না হে, পার্শ্বস্থিত মুহুরী ড'জনকে লক্ষ্য করে বলে নিতাই।

মুহুরির মুখ বুজেই লিখছিল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে এক বলক তাকায় মাত্র।

পলান ঠাধা দেয়, না না, দেওয়ানজী মশায়ের কিছু কওয়ন লাগব না। উনার ছা বিবেচনা আছে। এহন সুদ কত কইরা লেখব কইয়া ছান।

নিতাই উদাসভাবেই বলে, কিছু বলতে হবে না। বাজার থেকে আপনার কমই পড়বে।

তব্ব কত কইরা ক্যালবে একবার ছনইয়া (শুনিয়ে) ছান।

নিতাই হাসতে হাসতেই বলে, বাজার তো এখন তিন আনা, আপনাকে দশ পয়সা করে ফেলছি।

হায় হায়—মইরা যামু। দুই আনা কইরা ক্যালেন, পলান ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বাধা দেয়।

ব্যাপারী সাহেবের শুধু আমাদের মারবার ভাল। আচ্ছা, দেওয়ানজী মশায়, ওনার কথাও থাক আমাদের কথাও থাক। ন' পয়সা করে লিখে নিন, নিতাই মাঝামাঝি পথ ধরে।

পলান আবার বাধা দেয়, না না, ই যাত্রা ওয়ার বেশী দিমু না। দুই আনাই লেইখা খোন দেওয়ানজী মশয়।

আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হলো। দেখবেন, পাটের দর উঠলে যেন কিছু পাই।

আশীর্বাদ করেন, আল্লায় দিলে মিঠাই খাইবার লেইগা কিছু নিচ্ছয় দিমু।

দলিল লেখা শেষ হয়ে যায়, পলান বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা টিপসই দেয়।

সিঙ্কু খুলে করকরে তিন হাজার টাকা গুণে দেয় নিতাই।

টাকা হাতে নিতেই, পলানের বুকের ভেতরটা কেন যেন ছ্যাং করে ওঠে। দীর্ঘকাল পর আজ আবার ওকে ঋণ করতে হচ্ছে। কে জানে, কি আছে বরাতে?...নোটগুলো এক এক করে গুণে খুতির ভেতরে রাখে। শক্ত কবে বাঁধে কোমরের সঙ্গে।

পুনরায় সেলাম জানিয়ে উঠতে যাচ্ছিল পলান। নিতাই বাধা দেয়, আর এক কলকে তামাক খান।

চাকরকে আর হুকুম করবার আবশ্যক হয় না। ঠিক জায়গায় ওরা ঠিকই থাকে। আলসের আঙুনে ঝাঁ করে আর এক কলকে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

পলান অগ্নমনস্কভাবেই হুকো টানতে থাকে। মাথায় বোধ হয় দুশ্চিন্তা পাক থাকে। এতগুলো টাকা না নিলেই ছিল ভাল। ওসমান, গণি শুনলে হয়তো রাগই করবে। সিকি জমিতেও তো পাট নেহাত কম হতো না। কি দরকার ছিল যেচে মাথা মুড়াবার?...

পলানকে অগ্নমনস্ক দেখে নিতাই বলে, আর কোথাও যাবেন নাকি? কি অতো ভাবছেন? এর চেয়ে কম সুদ কোথাও হবে না।...

তোবা—তোবা, আমার যা কারবার আপনার লগেই। কোনদিন ত আর কারোর ঠাই যাই নাই। এহন মারেন কাটেন হেডা আপনার দয়া।...হুকো অগ্নের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পলান।

অগ্ন কোথাও যে যাননি তা আমি জানি। তবে একবার ঘুরে দেখে এলে পারতেন, তারা কি চীজ, নিতাই জোর দিয়েই পুনরায় নিজের পক্ষ সমর্থন করে।

পলান সেলাম জানাতে জানাতেই উওর করে, ও কতা কইয়েন না। আশীর্বাদ করেন য্যান আর কারোর ঠাই যাওয়ান না লাগে।

নিশ্চয়, আপনাদের সঙ্গে তিন পুরুষের কারবার। আপনাদের কুশল কামনা করবো না তো কার করবো। মাঝে মাঝে আসবেন। চরের যদি আর কারো টাকার দরকার হয় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পলান ষাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিতাই মনের খুশীতেই হুকো টানতে থাকে। আজ ও কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছে? দিনটা বেশ ভালই গেলো।

চরফুটনগর আর চরধল্লা মেতে ওঠে। নাইবার খাবার সময় নেই কোন পাট চাষীরা। চৈত্রের ঝাঁঝ পোড়া রোদে টোকা মাথায় যে যার কাজ করে চলে! সকালের 'নাস্তা' বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে। দুপুরের ভাত ঝি-বউরা মাটির সানকিতে করে ক্ষেতেই এনে দেয়। ছোট ছেলেগুলো থাকলে তাদের হাত দিয়েও কেউ কেউ পাঠিয়ে দেয়। যার সময় হয় সে নিজের হাতেই খেয়ে নেয়। যার হয় না তাকে খাইয়ে দিতে হয়। মুখে খায় হাতে কাজ করে। এতে কারো কোন অস্ববিধে নেই। এখন খাওয়া তো শুধু পেট ভরানো। তবে হুকো কলকের বেলায় সেটি হবার উপায় নেই। যারা খাইয়ে দিলে তারা হাত ধুয়ে সাজে তামাক। হুকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গনগনে করে তোলে ধুঁটের আগুন। এখন টানলেই ভুরভুর করে ধোঁয়া বেরাবে। চাষী মাত্রই কাজ খামিয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়। আমেজে রসিয়ে রসিয়ে টানতে থাকে। পেট ভরেছে, এবার একটু আরাম ও চাঙ্গা হয়ে ওঠা। হুকো কলকে নয়তো যেন এক সাজোয়া বহর। ক্ষেতেব কাজে সকলেই যেন মার্চ করে চলেছে। আগুনের আলসে আর হুকো কলকে যোগাচ্ছে ওদের কাজের রসদ। তামাক নেই তো কাজও নেই। ঝিমুনীতে চলে পড়বে—কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। ইংরেজ সরকার বোধ হয় এই কলাকৌশলটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শোষণের হাতিয়ার রূপে দেশীয়দের ওপর হাজার রকম ট্যাক্স বসিয়ে থাকলেও বিড়ি তামাকের ওপর কোন ট্যাক্স বসাননি। চাষী মনের আনন্দে খেয়েছে তামাক—সোৎসাহে কাজ করেছে। যে যত বড় চাষী তার তামাকের ব্যবস্থা ততো ব্যাপক। ধান, পাট, মুগ কলাইয়ের সঙ্গে জমির এক কোণে কিছুটা তামাকের চাষও তাই প্রত্যেকেরই আছে। প্রয়োজন মতো পাতা সেখান থেকে পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে এ পাতায় ঝাঁজ কম। রংপুরের কড়া মতিহারি পাতা মিশাল না দিলে নেশা জমে না। অনেক দায়

মতিহারি পাতার। শুধু মতিহারি দিয়ে তামাক মাখলে আবার গলায় লাগে। চাঘীর স্ফিডেই হয়। অল্প মাত্রায় মতিহারি কিনে নিজেদের বাড়ির পাতার সঙ্গে মিশাল দিয়ে বেশ সস্তাতেই মনোমত তামাক পাওয়া যায়। সারা বছর এখন মৌজ করে খাও। অগ্ন্যায় খরচার সঙ্গে তামাকের খরচাও চাঘীর একটা মোটা খরচা। তামাকের ভালমন্দর ওপরই নির্ভর করে চাঘাবাদ। ঢিলে তামাক দিলে কাজও ঢিলে হয়ে যাবে। একদিনের কাজ উঠবে তিনদিনে। আবার বেশী কড়া দিলেও কেশে কেশে নাস্তানাবুদ। বেশ মেজাজসই হওয়া চাই। ভাল চাঘীর কায়দাকাছুন জানা আছে। বছরের তামাক সময় মতোই সংগ্রহ করে রাখে তারা।

রবিশস্ত ক্ষেতে নষ্ট হয়েছে। সময় মতো পাট বুনতে না পারলে সারা বছর উপোস দিয়ে মরতে হবে। কিন্তু পাট চাষে যে চাই এক কাঁড়ি টাকা। স্বামকাস্তব ওপব ভরসা করে অনেকটা নিশ্চিত ছিল দুর্গা। গঞ্জের কাছারিতে গ্রীনবোট লাগলেই হাতে টাকা আসবে। নিড়ানির সময় থেকেই প্রচুর টাকার দরকার। বীজ ঘরেই আছে। জমি তৈয়ারীর কাজও আনন্দকে দিয়ে একরকম করে হয়ে যেতো। খুব বেশী হলে দু'পাঁচ দিনেব জিঞ্জ দু'চাবজন ক্ষেত মজুরের আবশ্যক হতো। রামকাস্ত তো বলেছিল চালিয়ে নেবে! লম্পট-শয়তান, ধর্মান্বিতার সেজে চরের সর্বনাশই ওর মতলব। আগে জানলে কে খাল কেটে কুমীর আনতো? সোজা মোড়ল বৈরাগীকে বললেই সব মিটে যেতো। চরের অনেকেই তো তাঁকে জামিনদার খাড়া করে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছে। তবে ওর কেন এ দুর্মতি হলো?...কুকথা তো বাতাসের আগে ধায়। শয়তান হয়তো নিজেই রটাবে কত কথা। না না, বাঁচতে ওকে হবেই। ময়নার জঞ্জই বাঁচতে হবে। আর তা যদি হয় মেড়লের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। স্বজাতি—ফুটুম, সকলের আগে তো তাঁর কাছে যাওয়াই উচিত ছিল। দেবি হলেও তাই যেতে হবে। মোড়ল তো ইসারা ইঙ্গিতে অনেক দিনই বলে পাঠিয়েছেন। কোন কিছু দরকার হলেই যেন তাঁকে বলি। তবে এ ভুল কেন হলো?...দুর্গা দাওয়ার ওপর বসে ইতস্ততঃ ভাবছিব, আনন্দ হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে তাড়া দেয়, অ দিদি, ক্যাতের আগাছা ত সব সাক কল্লাম, এহন কতভা জমিনে পাট বুনবা কও ?

দুর্গা অবাক হয়। আনন্দ—যে আনন্দ পেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বুঝতো না সে একা একা ক্ষেত পরিষ্কার করে কেলেছে! একাই চায় পাট

বুনতে। তা বেশ। যা পারে একাই করুক। আর কারো কাছে ধার-কর্জের কথা বলে কাজ নেই। কিন্তু খাবে কি বেচারা? চাষেব কাজে যে বেজায় খাটুনী। হুন ভাতের ব্যবস্থাও যে নেই। আনন্দ কি ক্ষেপে গেলো। তামাক নেই, ভাত নেই, পাট চাষ করবে।

দুর্গাকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোমার কি অইল কওত। কয়দিন যে তোমার কোন দিশাবিশাই পাই না?

আনন্দের তাড়ায় দুর্গার সংবিৎ ফিরে আসে। কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। নিজেই কি জানে, কতটা জমিতে চাষ করলে কত ফসল উঠবে? আগে দেখতো বাপ-বেটায়। তারপর বাবা একাই। এখন কে বলে দেবে ওকে কত খরচা লাগবে আর কি দিয়ে কি হবে? আচমকাই উত্তর দেয় দুর্গা, কি আবার অইব? আমিও তো হেইডাই ভাববার নৈচি, কতডা জমিনে পাট বুম্ম!

আর ভাববা কবে—বুনবাইবা কবে? হগলের কাম না পরায় (প্রায়) অইয়া আইল। জল ত ছনচি ইবাব আঁগের (প্রথম দিকে) আসব, আনন্দ আবার তাড়া দেয়।

জল—এই জলের কথা বলেই শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছে। জল প্রথম দিকেই আসবে—কুমার বাহাদুরের ডিক্সিও এসে ঘাটে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ভর্তি টাকা। শয়তান—সব ধাপ্লাবাজী।...আনন্দব মুখে জল বাড়বার কথা শুনে আবার মনেব কোণে হেঁচট খায় দুর্গা। বুঝিবা খেই-ই হাবিয়ে ফেলে।

আনন্দ রেগে যায়, না, তোমাবে আইজকাই ফকির সাবেব কাছে লইয়া যাওয়ন লাগব। ভূতেই ধবচে তোমারে। কি ককম কইবা ত?

ফকিরের নাম শুনে দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। আনন্দকে বিশ্বাস নেই। মোটা বুদ্ধি। সত্যি সত্যিই হয়তো ফকিরের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। আর তা যদি হয়, ভাববেন কি গুরা। কীর্তনিয়ার বেটার বউ হয়তো পাগলই হয়ে গেছে। পাগলীর বেটির সঙ্গে আবার কে পোলার বিয়ে দেয়? মোড়ল বৈরাগী হয়তো বেঁকে বসবেন। ময়নার আর বিয়েই হবে না।...গলার স্বর কক্ষ করেই বাধা দেয়, কি তুই যা তা কচ আনন্দ! চাষের কাম বিয়ার কাম সমান। ভাইবা ছাহন লাগব না? আগা-পাছা না ভাইবা কাম কল্পেই অইল?

তম্ব ডুমি ভাব, আমার আর কিছু কইরা কাম নাই, আনন্দ গজগজ করতে করতেই শ্রান করতে ঘাটের পথে পা বাড়ায়।

গঞ্জে মোট বয়ে সামান্ত যা চাল, তেল, হুন এনেছিল আনন্দ তা দিয়েই

এ কদিন চলছে। টেনেটুনে বড় জোর আর দিন দুই চলবে। তারপর? আনন্দ তো কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। মোট বইতেও এখন আর ওর কোন আপত্তি নেই। পরের খামারে দিন মজুর খাটতে বললেও ও রাজী। কিন্তু কুটুমের সঙ্গে একত্র বাস করে তা কি করে সম্ভব। মানই যদি গেলো তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? কুটুমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নিজেদের বংশেও কেউ কোনদিন যে কাজ করেনি, দুটি ভাতের দুঃখে তাই করবে? মানুষ তো আছে শুধু তামাসা দেখতে। নিশির বাপের কি উচিত ছিল না একবার খোঁজ খবর নেওয়া? শুধু ওপর ওপর ছুতো ভাঙালেই হলো। সম্পর্কের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চরের মোড়লও তো বৈবাগী। কার কি স্ববিধে অস্ববিধে সেটা দেখাও কি মোড়লের কাজ নয়? কই, নিজেদের কাজ তো কিছুই ঠেকে নেই।... কথায় কথায় দীহুব ওপব বিরক্তি আসে দুর্গাব। আবার ভাবে, না দোষ কারো নয়—নিজের বরাতেরই দোষ। কপালে যদি স্থখ থাকবে তাহলে অসময়ে ময়নাব বাবাই বা যাবেন কেন আর লোকেই বা এত হেনস্তা করবে কেন। কপাল মন্দ বলেই না ময়নাব বিয়েটা পর্যন্ত শেষ হতে পারলো না।..

ময়নাই আজ ঠাকুরঘবে সন্ধ্যা দিচ্ছে। দাওয়াব ওপব একক বসে অকুল পাথারে হাবুডুবু খেতে থাকে দুর্গা। ভাবতে ভাবতে ছ' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু পথের কোন হৃদিস মেলে না।

ময়নাব ডাকে ঠাকুর প্রণাম করতেই উঠে যাম্বিল দুর্গা, দোব গোড়ায় দীহুর হাঁক শোনা যায়, বিয়াই মশয় আচেন নাকি—বিয়াই মশয়...

দুর্গা খতমত খেয়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই সশরীরে মোড়ল এসে হাজির। আনন্দটা সত্যি সত্যি গিয়ে কিছু বললে নাকি। অনেকক্ষণ তো বাড়ি নেই—ওর যা বুদ্ধি।

দীহু ততক্ষণে প্রায় উঠোনে এসে পা দেয়। গলার স্বর আরো একটু উচ্চগ্রামে চড়িয়েই হাঁকে, বিয়াই মশয়—

দুর্গা ঝঙ্কাই পায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে আলো জ্বালা উচিত ছিল। কিন্তু' ঘরে তো এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই। অন্ধকারে বসেই ভাত খেতে হয়। কি আর করবে। তাড়াতাড়ি 'বোমটাটা একটু টেনে সাড়া দেয়, আনন্দ ত বাড়ি নাই। আহেন, বহেন আইহা। আমি কুপা জ্বালাইয়া আনি।

দীক্ষ বাধা দেয়, না খাউক, কুপা জ্বলাইবার কাম নাই। আলো আমার চক্ষে লাগে। আপনার ঠাই দুইডা কথা জিগাইবার আইলাম।

আইচ্ছা আপনে বহেন, আমি তামুক লইয়া আহি, দীক্ষকে একটা জ্বল চৌকি এগিয়ে দিয়ে দুর্গা তামাক সাজতে যায়।

না না, আপনারে আর কষ্ট করন লাগব না। আমি এহনি তামুক খাইয়া আইচি। দুইডা কতা বইলা উঠি। কীন্তনের সময় অইল। আবার ইদিগে আমাগ ভটচাইষ মশয় কয়দিন খেইকা বিছানা নিচেন। তেনারেও একবার দেইখা যাওয়ন লাগব, দুর্গাকে পেছন ফেরাতে চেষ্টা করে দীক্ষ।

কিন্তু দুর্গা সে কথায় কান দেয় না। নতুন কুটুম, তাতে আবার চরের মাথা। যত্ন-আত্তি না করলে মান থাকবে না। কিন্তু সারা দিনে তো আনন্দকে একবারও তামাক খেতে দেখা যায়নি—যদি এক ছিলুমও না থাকে। লজ্জায় যে মাথা কাটা যাবে। ময়নাও তো সক্ষ্যা দিচ্ছে—এখনো ঠাকুর শয়ান দেওয়া হয়নি। ওকে পাঠিয়েও ওর সইয়ের বাড়ি থেকে ছিলুম দুই চেয়ে আনা যেতো। এখন উপায় কি হবে? তাছাড়া শব্বরের স্মৃথ দিয়ে ভর সক্ষ্যা বেলা বাড়ির বারই বা হবে কি করে ও? এর চেয়ে যে আদর না দেখালেই ছিল ভাল।...ভাবতে ভাবতে আনন্দের ঘবে এসে ঢোকে দুর্গা। না, ভগবান নৃশ রক্ষা করেছেন। বাঁশের চোঙ হাতড়িয়ে বেশ খানিকটা তামাক পাওয়া যায়। মনের খুশীতে নিশ্চিন্ত হয়েই তামাক সাজতে থাকে। কিন্তু এক চিন্তা মাথা থেকে না নামতেই আর এক চিন্তা মগজে খোট পাকাতে থাকে। তবে কি আনন্দই মোড়লকে পাঠালে? সেই জগুই কি নিজে না খেয়ে তামাকটুকু বেখে দিয়েছে? কি আশ্চর্য! এমন বোকাও হতে আছে! ঘরের কথা কেউ কখনো কুটুমের কাছে বলে?...ভাবতে ভাবতেই হাঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আবার এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়ায় দুর্গা।

দীক্ষ তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে হাঁকোটা টেনে নিয়ে নিজেই ফুঁ দিতে থাকে। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠেই বলে, ছি ছি ছি, মিচামিচি আপনারে আবার কষ্ট দিলাম। আমার ময়না মা কুথায়? তারে ত দেখচি না।

ও ঠাকুর শয়ন দিবার নৈচে, এহনি আইব, দুর্গা উত্তর করে।

বালো বালো, এহন খেইকাই ঠাকুর দেবতার কাম করন বালো, হাঁকো টানতে টানতে দীক্ষ মস্তব্য করে।

ই, ওত জনমের খেইকাই ঠাকুর ঘরে আছে। আপনার তালহইত অরে

মুকে মুকেই ঠাকুরের শতনাম শিকাইচে। সোবার বলবার পারে, দুর্গা ময়নার হয়ে ওকালতি করে।

তা কি আমি জানি না। তালইরত আমাব এক শ ঠাকুব। রাদাকিষ্ট, গোপাল, জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা কত কি। স্নকে থাকুক—স্নকে থাকুক, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে দীন্ন সায় দেয়।

দুর্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, স্নক আব বরাতে আইল কই? এহন আপনাব ঘরে গিয়া যদি স্নক পায়।

দীন্ন বলে, আইব আইব, ঘাবরান ক্যান? ভাগবতে আছে, কিষ্ট প্রেম যাব অয় তাব মতন স্নকা কে? মাব আমার লক্খন বালো।

জানেন ঠাকুব, দু'হাত কপালে তুলে ইষ্ট দেবতাব উদ্দেশ্য প্রণাম কবে দুর্গা।

দীন্ন কথাব মোড় ঘুবিয়ে বলে, যাউক, যে কথা কইবার লেইগা আইলাম। চাষ আবাদের কি কবলেন? ইয়াব পব পাট বুনলেত আব মাখা তুলবাব পারব না। জলে ডুইবা যাইব।

দুর্গা ভাবনায় পড়ে। কি উত্তব দেবে ভেবে পায় না। 'আমতা আমতা করেই বলে, হ, তাইত ভাববার নৈচি। আমাব কি কিচু জানা আছে।

মুখ থেকে কথা নুকে নিয়ে দীন্ন বলে, আমিত বিয়াই মশয়বে কয়দিন কইলাম, কি কববা কও। ঠেকা বেঠেকা থাকে ত হা কতাও কও। গঞ্জব নিতাই সাজি টেকা দিবার চাইচে।

দুর্গাব সংকোচ হয়। পুলকও হয় কিছুটা। এত সহজে টাকা পাওয়া যায় অখচ এই টাকার জগ ও শয়তানটাব খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। তবু মনেব কথা খোলসা করে বলতে পারে না। গায়ের মাহুষের এ এক অদ্ভুত আচরণ। ইষ্ট কুটুম নয়তো যেন এক লজ্জার পাহাড়। ঘরের কোন গোপন কথা কিছুতেই তার কাছে বলা যাবে না। না খেয়ে মরলেও না। এমনিতে আন্তবিকতার অভাব নেই। পরম্পর পরম্পরের বিপদে এসে বুক দিয়ে দাঁড়াবে—সাধ্যমতো সাহায্য করবে। কিন্তু অভাব অভিযোগের কথা কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না। দুর্গাও পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেয়াই মশায়ের কাছে মুখ বুজে থাকলেও আর চলছে না। লম্পটের হাত থেকে ওকে বাঁচতেই হবে। পাট বুনতে না পারলে তার কোন উপায়ই নেই। আনন্দ বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ওকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে। তাই

দীহুর প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে দুর্গা, অপেনেত সবই জানেন, কতভা জমিনে চাষ কল্পে বালো অয় ?

তা পাখী আট দশের কম জমিনে বুনলে খরচ খরচায় কুলাইব না। চক্ষেও কিছু দেখবেন না।

খরচ কত পড়ব ?

শ' আড়াই টেকাইত আগে পড়ত। তবে এহন কামলার রোজ দেড়া, তিন শ'র কমে কুলাইবার পারবেন না।

তিন শ'।

হ, তাত চাই-ই।

আইচ্ছা, কাইল আপনারে খবর দিমুনে। আনন্দ আছক।

বেশ, তাই-ই দিয়েন। ঠেকা বেঠেকা কিছু থাকলে হ্যা কতাও কইয়া দিয়েন। উঠি তাইলে, দীহু ছ'কোটা নামিয়ে রেখে উঠতে যায়।

দুর্গা বাধা দেয়, আর এক ছিলুম তামুক খান। আপনাগ বউমা আইল বইলা ?

না, পূজায় বইচে, অরে আর বিরক্ত কইরা কাম নাই। আর একদিন আহম।

দীহু উঠে এক পা বাড়াতে যায় ময়না ঠাকুরঘর থেকে বেরোয়।

দুর্গা বলে, ঐ ছাহেন, 'আপনে আর ফাঁকি দিবার পাল্লেন না।

দীহু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উল্লাস জানায়, আয় মা আয়, তরে একডু দেইখা যাই।

ময়না মাথা নীচু করেই কাছে এসে প্রণাম করে। কে স্বপ্নর, কে ভাস্বর, কার সঙ্গে কি আচরণ করণীয়, তা ওর বুঝবার কথা নয়। বোঝেও না ঠিক ঠিক। তবু যান্ত্রিক পুতুলের মতো সব ওকে করে যেতে হয়। ও যেন একটি কলেরই পুতুল। মাথা নীচু করে কথা বলছে কারো সঙ্গে—কাউকে দেখে দিচ্ছে বোমটা—আবার কারো সঙ্গে পাকা গিল্পিপনা করতেও আটকাচ্ছে না।...

দীহু সম্মেহে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।

ময়না মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দুর্গা তাড়া দেয়, যা, এক কইল্কা তামুক সাইজা লইয়া আয়।

ময়না ছ'কো কক্ষে হাতে করে মামার ঘরের দিকেই পা বাড়াতে যায়।

দীহু বাধা দেয়, আর তামুকের কাম নাই বিয়াইন, উঠি এহন।

দুর্গার মুখে হাসি খেলে। বলে, হাঙ্গা নক্ষী পায়ে ঠেলবেন ?

হ, তা যা কইচেন। মাগ, একডু তরাতরি আন। কীজননের লোক আবার সব বৈহা (বসে) থাকবনে। দুর্গার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ময়নাকে তাড়া দেয় দীমু।

যথাসময়ে তামাক আসে। ঠাকুরের ভোগের জল বাতাসাও এনে হাজির করে ময়না। দীমু সব কিছুই সদ্যাবহার করে সেদিনের মতো উঠে পড়ে। দুর্গা আবার নতুন করে ভাবতে বসে।

সন্ধ্যা বেলাই ঘুম পায় ময়নার। না খেয়ে শুলে জেগে উঠে খেতে আর সেই রাত দশটার আগে নয়। হাঁড়িতে দুপুরের রান্না ভাত রয়েছে। গরমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুর্গা ওকে একবারে খেয়ে শুতেই তাড়া দেয়। আনন্দটা এলেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু কোথায় যে গেছে হতভাগা— ফেরার নাম নেই। ভাত নষ্ট হয়ে গেলে খাবেখনে কোন ছাই?...

একা একাই দাওয়ার ওপর বসে একথা সেকথা ভাবছিল দুর্গা। ময়না হয়তো ততক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছে। হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসে আনন্দ। দুর্গার গা ঘেঁষে এসে বসে বলে, দিদি, আর ভাববাব কিচু নাই। কাম গুচাইয়া আইচি।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। জিজ্ঞাস করে, কি আবার কইরা আইলি! কোনহানে গেচিলি ?

আরে যামু আবার কোতায়—আর গেরামে (গ্রামে) আচেইবা ক্যারা ? ইষ্ট কুটুমের কাছে ত কিচু কওয়ন যাইব না। তাই ভটচায় মশাইর ওহানে গেচিলাম।

দুর্গার বৃকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেউটের ছোবল পড়ে। ফুঁসে ওঠে, করচচ্ কি তুই ? ক্যান গেলি হেহানে ? ক্যারা যাইবার কইচিল তরে?...

ক্যারা আবার যাইবার কইব ? নিজের খেইকাই গেচিলাম—আনন্দ সমতা রেখেই জবাব দেয়।

ক্যান গেলি আমারে না জিগাইয়া ? তর কি আর একটা দিনও সবুর সইল না ?

তোমারে আবার জিগামু কি ? জিগাইলে কি তুমি কোন উত্তর ছাও ?

বেশ, আমি যখন কিচু না তহন যা খুশি কর। আমি কাইলই ইহান থনে চইলা যামু।—দুর্গা প্রায় কেঁদেই ফেলে।

আনন্দ ভাবাচেকায় পড়ে। বুঝে উঠতে পারে না কি ও এমন অত্যাচার করে ফেলেছে। সবিস্ময়েই বলতে থাকে, কি জানি, তোমাগ ভাব-সাব কিচু আমি বুজবার পারি না। এই না কয়দিন ভট্‌চাইয় মশাইর লগে সন্না কল্লা। এহন আবার হায় তিতা অইয়া গেল।

দুর্গার কাল্লা এবার ক্রোধে ওঠে, কি সন্না করলামরে হার লগে? কি দেখচচ্‌ তুই?

আনন্দ অধিকতর অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, মিচামিচি রাগ কর ক্যান। না কর আর কোনদিন যামু না হার কাচে।

অপ্রস্তুত দুর্গাও হয়। ভাবে, তাই তো, ওর আর এমন কি দোষ। আমি ডেকে এনেছিলাম বলেই না ও যেতে সাহস পেয়েছে। ও কি করে জানবে ভণ্ডটার মনের কথা?...নিজকে সংযত করে দুর্গা বলে, হ্যা, আর যাইচ না পর লোকের কাচে। নিশির বাপ আইছিল, যা পরামশু হার লগেই কব। হাগ—

মুখের কথা শেষ না হতে আনন্দ বাধা দেয়, হারা না কুটুম! ঘরের কতা হার কাচে কইবা?

আত্মীয় কুটুমের কাচে কমু না তয় কি পর মাইষের কাচে কমু? তর বুদ্ধি অইব কবে?

ভট্‌চাই মশয় আইলে হারে তবে কি কমু?

ভট্‌চাই মশয় আইব! তুই হারে আইবার কইচচ্‌ নাকি?

না, ঠিক আইবার কই নাই। হা ত পাঁচ ছয় দিন বিছানায় পৈড়া আছে। আইজই নাকি কীজনে যাইব। আমার মুখের খন সব ছইনা নিজের খনেই কইল, ফিরবার পথে তোমার লগে দেহা কইরা যাইব।

দুর্গার সর্বাঙ্গ আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। কর্কশ স্বরেই বলে, না না, হার লগে আমার কোন পরামশু নাই। তুই হারে এহনি গিয়া বারণ কইরা আয়।

এহন গিয়া কি হারে পামু? হা না এতক্ষণে পার্ঠে বইহা গেচে।

কথাটা দুর্গার মনেও ধরে। তা ঠিক, ভণ্ডটা এতক্ষণে নিশ্চয় আসনের ওপর গিয়ে জেঁকে বসেছে। এখন আনন্দকে ওখানে পার্ঠালে আরো কেলেকারীই হবে। নিবোধটা কি বলতে কি বলে ফেলবে। তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে চূপচাপ শুয়ে পড়াই ভাল। ডাকলে সাজা না দিলেই হলো। আনন্দর

তো বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে। তাই প্রকাশে আনন্দকে সমর্থন করেই বলে, তয় আর দেরি করিচ না, হেই কোন দুপৈরের ভাত—নষ্ট অইয়া গেল বৃজি। খাইয়া লইয়া হইয়া পড়।

খিদে আনন্দেরও জোর পেয়েছে। দুর্গা এতক্ষণ ওকে না খাটালে কখন খেয়ে নিত। সোৎসাহেই বলে, কও কি, ভাত নষ্ট অইয়া গেল। তরাতরি ছাও তাইলে, খামুনে কি ?

তুই হাত মুখ দুইয়া আয়, আমি বাইড়াই রাখচি।

অন্ধকার দাওয়ার ওপর বসেই দু ভাইবোনে খেতে থাকে। সামান্য দুটি ভাত ও একটুখানি মিষ্টি কুমড়োর তরকারি। যেন পরমান্নই খাচ্ছে আনন্দ। একটা ভাত ছিটকে মাটিতে পড়লে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে দোরে হাঁক শোনা যায়, বড় কুটুম আচ—বড় কুটুম, গায়েব সম্পর্কে আনন্দকে বড় কুটুম বলে ডাকে বংশী।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। একি, শয়তানটা এত শিগ্গীর ফিরলে! কিন্তু...

দুর্গা কোন কিছু জিজ্ঞেস কবার আগে আনন্দ সাড়া দেয়, খাড়ও (দাঁড়াও) বংশীদা, আমার অইয়া গেচে।

দুর্গা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ও শয়তান নয়, বিশ্বাস বাড়ির বংশী!...এত রাইতে আবাব বংশী ডাকে ক্যানবে?—আনন্দকেই জিজ্ঞেস করে।

ঐ যা, তোমাবে কইতেই ভুলিলা গেচি। বৈবাগীব খালে আমরা মাচ ধরবার যামু! বড় বড় মাচ উজায় ওহানে বাইতে।

না না, আমাগ মাছ মোছ ধরনের কাম নাই, হইয়া থাক।

বারে, আমি বলে কত কইবা বইলা হাবে মত করাইচি! আমাগ কি হারিকল (হারিকেন) আচে নাকি যে একা একা যামু ?

মাচ না খাইলে কি অয় ?

হ, তুমি নিজে খাওয়া না ত তাই আর কারেও খাইবাব দিবার চাও না। মাচ ছাড়ি কি ভাত খাওয়ন যায় ? ছাহ না মইনী দিন দিন কেমন বোগা অইয়া বাইবার নৈচে। ..

আনন্দের কথার জবাব দেবার আগে বংশী এসে উঠানে দাঁড়ায়। বড় ভাল ছেলে বংশী। দুর্গার খুব পছন্দ ওকে। কখনো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। বংশীই বলে, বোঁঠান, দেইখনে, কেমন বড় বড় মাচ ধইরা আনি। বংশী দেরি অইব না। কই গ কুটুম, তোমার হইল ?

আনন্দ ইত্যবসরে কোমরে গামছা বেঁধে প্রস্তুত। দুর্গা ওকে আর বাধা দিতে পারে না। রাত দশটার কাছাকাছি দু'জনে বেরিয়ে যায়।

আনন্দ বংশী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ভাবে, দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়বে। পাড়া নিশ্চয়, ময়নাও ঘুমিয়ে পড়েছে। শয়তানটা যদি সত্যি সত্যি এসেই পড়ে! আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। গাটা কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। আবার ভাবে, না, রাত বেশ হয়েছে। কীর্তনের আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে! মুখে যাই বলুক, প্রাণে ভয়ভর আছে নিশ্চয়। সেদিন যেভাবে পালিয়েছে কিছুতেই আর আসছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ঘরে যাবারই উপক্রম করে দুর্গা।

জলের বালতিটা ঘরে নিলেই দরজায় খিল দিতে পারে এমন সময় কে যেন আনন্দের নাম ধরে ডাকতে থাকে। চিনেও চিনতে পারে না দুর্গা। এ যেন কেমন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। রামকান্ত নিশ্চয় নয়। তার তো মাজা গলা, তবে! কান খাড়া করেই খানিক দাঁড়িয়ে থাকে।

আগন্তুক আরো এগিয়ে এসেই ডাকে, আনন্দ আছে—আনন্দ। ঘুমোলে নাকি হে, ও ও আনন্দ?

এবার আর দুর্গার বুঝতে বাকী থাকে না। এমন জোরালো গলায় এ চরে ঐ একটি জীবই কথা বলে। সে হচ্ছে—সেই লম্পটটা। দোর বন্ধ করতেই যাচ্ছিল দুর্গা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। মনে করে, এই স্বেযোগ। এই স্বেযোগেই ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভয় কি অতো? বাঘও নয়, ভালুকও নয়। গায়ের জোরে কখনো ভগুটা পেয়ে উঠবে না। সটান বেরিয়ে এসে উত্তর করে, আনন্দ বাড়িতে নাই।

এই দেখ, আমাকে আসতে বলে আবার কোথায় গেলো! তা যাক গে, তুমিই তো রয়েছ, যা বলবার সে তো তুমিই বলবে, বলতে বলতে দাওয়ার কাছে এগিয়ে আসে রামকান্ত।

দুর্গা রুখে দাঁড়িয়েই জবাব দেয়, আমার কিছু কইবার বলবার নাই। আপনে যাইবার পারেন।

আহা-হা, তুমি দেখছি চটে আছো বউগিন্নী! কদিন বিছানায় ছিলেম তাই খোঁজ নিতে পারিনি। একবার তো দেখতেও গেলে না।

বিছানায় ছিলেন! বিছানায় ছিলেন তয় দুপইর রাইতে আইছিলেন কেমন কইরা?—হুঁসে ওঠে দুর্গা।

রামকান্ত কণ্ঠের স্বর স্বাভাবিক রেখেই আকাশ থেকে পড়ে, তুমি কও কি বউগিন্নী! আমি এসেছিলাম ছুপুর রাতে। কবে!

কবে হেডা নিজের মনরে জিগাইয়া চাহেন। আমার চক্ষুরে ফাঁকি দিবার পারবেন না।

রামকান্ত এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায়। তারপর ঘাড় বেঁকেই বলতে থাকে, তবে তো ছিদামের কথা ঠিক। সেও দেখেছে! আচ্ছা, তুমি কি গত মঙ্গলবারের কথা বলছো?

হ হ, মঙ্গলবারের কতাই। ছুপইর রাইতে কুস্তায় ঘেউঘেউ করল, আপনে জানেন না নাকি?

আমি জানবো কেমন করে বাছা। আমি তো তখন বিছানায় শুয়ে—সর্বান্ধে ভীষণ বেদনা। নড়া-চড়ারও শক্তি ছিল না।

হুর্গার কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে।

রামকান্ত বলেই চলে, পরদিন সকালে ছিদাম আমাকে দেখতে এসে বললে, ঠাকুরদা, তাঙ্কব ব্যাপার। মাথায় ঠিক আপনার মতোই বাবরি, দোঁড়ে এসে জলে নামলো। তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেলো হদিসই পেলাম না। ...ক্ষ্যান্তও আমাকে কতদিন বলেছে, চরে একজন আছে দাঠাকুর, রাত বিরাতে সাবধানে চলবেন। না বউগিন্নী, তুমি ঠিকই দেখেছ, এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হবে। করিম ফকিরকে দিয়ে হবে না। গঞ্জের চম্পকেই লাগাতে হবে। দেও দস্তির কারবার, কখন কার ঘাড় মটকায় বলা যায় না।

রামকান্তকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল হুর্গা এখন পারে তো ওকে মাথায় করে রাখে। ভাগ্যিস ওদিন ও উঠানে একা একা বার হয়নি...বুকের ভেতর খর খর করে কাঁপতে থাকে। কোনরকমে জল চোঁকিটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে রামকান্তকে।

ওঝুধে কাজ হয়েছে দেখে রামকান্ত মনে মনে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। জল চোঁকির ওপর বসতে বসতে আশ্বাস দেয়, সর্বদা মনে মনে নাম জপ করো। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। সামনের অমাবস্তাতেই আমি চম্পকে দিয়ে ক্রিয়া করাচ্ছি। ও সব দেও দস্তি চম্পর কাছে কেঁচো।

হ, তাই যা অর একটা কিছু করান। রাই বিরাইত মাইনবে মরব না কি?

অতো ভয়ের কি আছে? মনে ভক্তি থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।

জানে ভগবান, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে দু'হাত কপালে তুলে প্রণাম করে দুর্গা। তারপর উঁপুড় হয়ে ডান হাত দিয়ে রামকান্তর চরণযুগল ধরে কাকুতি জানায়, আমারে আপনে ক্ষেমা করেন ঠাকুর মশয়। না জাইনা আমি আপনার মনে ছুখ্যু দিচি।

আরে করো কি করো কি! তোমরা হচ্ছ আমার 'আপনার জন। তোমাদের কোন কথা কি আমি মনে রাখি? বাধা দিতে গিয়ে দুর্গার হাত চেপে ধরে রামকান্ত। মাথার ওপর দিয়ে একটা নিশাচর বাজ উড়ে যায়। বিকট তার পাখার শব্দ।

দুর্গা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে হাত ঠেকিয়েই প্রণাম করে।

শুষ্ক গলায় রামকান্ত বলে, এ কদিন একটু সাবধানেই থেকো। আনন্দর সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে—শুয়ে পড়েছে নাকি?

আর কন ক্যান, অরে নইয়াই অইচে আমার জালা। বংশীর লগে মাচ ধরবার গেচে।

না না না, কাজটা ভাল হয়নি! ওদের দৃষ্টি থাকে সদা-সর্বদা মাছ মাংসের দিকে। বাড়ি ফিরলে একটু মুন জল খাইয়ে দিও, দুর্গার ভয় পাওয়া মনে অধিকতর ভয় ধরিয়ে দেয় রামকান্ত।

খাউক—অরে দেও দস্তিতেই খাউক। নইলে অর এত বাড়াবাড়ি অইব ক্যান, অভিমানে ফুঁসে ওঠে দুর্গা।

ছি, ও কথা বলতে নেই। ছোট ভাই, ফেলতে তো আর পারবে না। বলে কয়ে যদি ওকে একবার কাজে লাগাতে পারো তাহলে দেখবে খুব কাজের হবে ও। গায়ে বেশ শক্তি আছে ছোকরার।

আশীর্বাদ করেন, আপনাগ দশজনের আশীর্বাদেই যদি কপাল ফিরে।

ফিরবে—নিশ্চয় ফিরবে! সদা-সর্বদা ভগবানকে ডেকো। হ্যাঁ, ভালকথা, চিঠি পেয়েছি, কুমার বাহাদুর শিগগিরই আসছেন। ওদিককার খাল বিল সব ছুটেছে। দিন কয়েকের ভেতরেই তুমি টাকা পেয়ে যাবে। এখনকার মতো সামান্য এই টাকা ছুঁটো রাখো, রোগ শয্যায় দশজনের কাছ থেকে পাওয়া অতিকষ্টের জমানো ছুঁটো টাকা দুর্গার হাতে গুঁজে দেয় রামকান্ত। একরকম না খেয়েই জমিয়েছে টাকা ছুঁটো। মনই যদি অস্থস্থ থাকে তাহলে খেয়ে আর কি হবে! প্রবাদ আছে, টাকায় টাকা আনে। কিন্তু ও তা চায় না। ও চায় দুর্গার একটু অস্থগ্রহ। না না, মিথ্যাচার এ নয়। সারা

জীবন ও দুর্গাকে নিয়ে থাকবে। চর ওদের ঠাই না দেয় ছুনিয়ায় স্থানাভাব হবে না।...টাকা দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে ইতস্ততঃ ভাবতে থাকে রামকান্ত।

হাত শূন্য। রাত পোহালেই টাকার প্রয়োজন। তবু টাকা দুটো কিরিয়ে দিতেই চায় দুর্গা। বলে, অস্থকে আপনারে কিছুই দিবার পারলাম না, উন্ট আপনায় খনেই নিমু! না, তা আমি কিছুতেই নিমু না। আপনে ফেরত নিয়া যান, দুদ খাইয়েন।

দুধের আমার অভাব হবে না বউগিন্নী। নগদ পয়সা-কড়ি বেশী না পেলেও চরে আমার খাওয়া খাকার কষ্ট নেই। তুমি ও দুটো রাখো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দুর্গা বলে, খায়নের চিন্তার খনে চাষের চিন্তাই এহন বড়। আনন্দ ফেইপা গেচে। একা একা ক্ষ্যাতের আগাছা সব সাক কইরা ফালাইচে। এহন জমিনে লাঙ্গল দেওন লাগব। হার লেইগা চাই জনকতক কামলা আর তাগ রোজের টেকা।

টাকা তো পাচ্ছই। তবে ক'টা দিন সবুর করতে হবে এই যা।

ঐ হানেইত গোলমাল। নিশির বাপ আইজ সন্ধার সময় আইছিল। কি করম না করম কাইল বিহানে হারে কওয়ন লাগব। টেকার দরকার অইলে তাও ছায় মহাজনের খন লইয়া দিবার পারব কইল।

ছি ছি ছি, তুমি ঘরের কথা সব তার কাছে বলে দিয়েছ নাকি? উৎকর্ঠা বরে পড়ে রামকান্তর কঠম্বরে।

না, তা কিছু কই নাই। তবে না কইয়া আর উপায় কি। হগলের কাম কাইজত অইয়া গেল আর কবে চাষ করামু। কি করম, আমার কপালই মোন্দ। নইলে কুমার বাহাদুরই বা ই-সন গুত দেবি করব ক্যান?...

না না না, ইষ্ট কুটুমের কাছে তোমাকে ইজ্জৎ খোয়াতে হবে না। যে কোরেই হোক, কালই আমি তোমাকে টাকা দেবো। আনন্দকে তুমি কাজ চালিয়ে যেতে বলো।

আপনি এত টেকা কোনহানে পাইবেন? পরথম কিস্তিতেই যে নগদ পঞ্চাশ টেকার মতন চাই। রোগা শরীলে খালি খালি ঘোরাঘুরি কইরা শরীল ধারাপ করবেন।

সে ভাবনা আমার। অস্তত এটা রেখেও তো কিছু পাবো, ছাতের সোনার আংটিটা দেখিয়ে জবাব দেয় রামকান্ত। চা বাগানের প্রে ওকে উপহার দিয়েছিল আংটিটা। সন্তান প্রসব করাতে গিয়ে মারা যায় প্রে। সেই থেকে

শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও আংটিটা রামকান্তের হাতে আছে। কৃপণের মতোই রক্ষা করে আসছে ও এটা।

কন কি। সোনাই রাইখা টেকা লইবেন আর হেই টেকা আমি নিমু! মইরা গেলেও ত না, দুর্গা বলিষ্ঠ কঠেই বাধা দেয়।

আরে না না, আংটি বাঁধা আমাকে দিতে হবে না। নায়েব মশায়কে বললে ও টাকা আমি দিন কয়েকের জঞ্জ হাওলাত নিতে পারবো।

কিন্তু—

মুখের কথা শেষ হয় না দুর্গার, রামকান্ত বাধা দেয়, তাতে কি হয়েছে? সব টাকা তো তুমি আমাকে শোধ করেই দেবে। দেখলে না, মধুদা কেমন বিচক্ষণ ছিলেন। পাছে রটে যায় সেই ভয়ে কোন মহাজনের কাছ থেকে কর্জ করেন নি। কুমার বাহাদুর কখনো তাগাদায় আসবেন না। এমন কি কাউকে কিছু বলবেনও না। দীল্লুকাবাকে যেন ঘরের কথা কিছু বলো না। ওতে সম্মানী বাড়ির সম্মানই শুধু নষ্ট হবে।

দুর্গা আর ভাবতে পারে না। রামকান্তের কথাই ওর মনে ধরে। সেই ভাল, কাল সকালে নিশির বাপকে খবর পাঠাবে, টাকার দরকার ওর নেই। শুধু যেন একটু দেখে শুনে দেন উনি।

দুর্গাকে নিরন্তর দেখে রামকান্ত আবার বলে, ভাবছ কি? আমি তোমার ভালর জঞ্জই বলছি। রাত হয়েছে শুয়ে পড়গে। আমাকেও আবার একা একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

হ, রাইত অইলই। একা একা যাওয়ান লাগে একটা লণ্ঠন নিয়া বাইরইবার পারেন না।

ভয় নেই, আমার গলায় যজ্ঞ উপবীত আছে, দেও দস্তি আমাকে কিছু করতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়ো, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

হ, কি আর করুম। কপাল মোন্দ তাই আপনারে এক ছিলুম তামুকও দিবার পাল্লাম না।

দরকার নেই, আমার কাছে বিড়ি আছে। এখন আসি।

দুর্গা গড় হয়ে প্রণাম করে। রামকান্ত ওর পিঠের ওপর হাত রাখতে গিয়েও কেন যেন পারে না। মুখেই শুধু ‘কল্যাণ’ হোক বলে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আসে।

চৈত্রের টানে বৈরাগীখাল প্রায় শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তলানি কিছু কিছু জমে থাকলেও সে শুধু কাদা গোলা। বাইরের কাজ কোন রকমে চলে তা দিয়ে। বান্না পাওয়ার জল ধলেশ্বরী থেকে আনতে হয়। চাষী বৌদের এ সময়ে কাজ করে কুল নেই। ঘরের মরদরা ক্ষেতের কাজেই ব্যস্ত। তাদের দিয়ে এদিকের কুটোগাছও সরাবার উপায় নেই। উণ্টো ক্ষেতেই তাদের দুপুরের ভাত পৌঁছে দিতে হয়। গোয়ালে গরু থাকলে এ সময়ে তার যাবতীয় কাজও নিজেদেবই সারতে হয়। কিন্তু সকল কাজের সেরা কাজ জল তোলা। কারো বাড়িতেই জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ঘর গৃহস্থলি যাবতীয় কাজ করতে হয় নদীর জলে। দুর্গার সংসাব ছোট হলেও জলের ঝিল্লি অনেকের চেয়ে বেশী। কেন না, ওবা কেউ খালের জল মুখে দিতে পারে না। একে বিশ্রী গন্ধ তাব ওপব কোন বাছবিচার নেই। যার যেমন খুশি ময়লা কাঁছে। না না, ও জলে কোন কাজ হবে না। ঘবে ঠাকুর সেবা রয়েছে, নদীর জল ছাড়া উপায় নেই। মা মেয়ের দু'জনের একজন জল টানতেই হিমসিম। আনন্দকে দিয়ে এখন আর এদিকের কিছু হবাব নয়। খামারের কাজেই ও ভীষণ ব্যস্ত। রামকান্ত নগদ এককালীন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। আরো দিয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিনের যৎসামান্য যা। নেশায় মানুষ বুঝি সব কিছুই করতে পারে। দিন টাকা প্রতি দু'পয়সা সূদে নায়েব রাখালের কাছ থেকে কর্ত্ত করেছ পঞ্চাশ টাকা। বুক ছুরছুর করে কাঁপে রামকান্তর। কুমার বাহাদুর এসে ব্যবস্থা না করলে নির্ঘাত চব ছেড়ে পালাতে হবে। ভগবান বোধ হয় কোথাও ওকে থাকতে দেবেন না। ভাগবত পাঠে বসে এলোমেলো চিন্তায় ডুবে যায় রামকান্ত।...

স্নানের সময় বড় ঘড়ার এক ঘড়া জল দুর্গা আনলেও সংসারের বেশীর ভাগ জল ময়নাকেই টানতে হয়। ঝাঁ ঝাঁ পোড়া দুপুরের সময় খানিক বিরতি থাকলেও সকাল বিকল কামাই নেই। বেশ মামায় ময়নাকে ছোট পেতলের ঘড়াটায়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পিঠভর্তি কালো এলো চুল। বাবুর হাটের রঙিন একখানা ডুরে শাড়ী পরনে। 'ডল' পুতুলই যেন একটি। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার জন্ম ছটফট করে। কিন্তু এখন তো আর তেমন দৌড়ঝাঁপের স্থযোগ নেই। বৈরাগী

বাড়ির বউ ও। রয়ে সয়েই চলতে হবে। ময়নার সময় সময় বড় অতির্ঘটনা মনে হয়। সময় সময় আবার ভালও লাগে। স্ক্রোল হুঁবাহতে ঝলমল করছে কপোর চূড়ি ক'গাছা। পায়ের 'বল-তোড়াও' নতুন তৈরী হয়েছে। মনের মতো বেশ ক'খানা রঙিন শাড়ীও পরতে পারছে। বিয়ের কনে বলেই না এসব পেয়েছে। নয়তো কবে আর এমন বাহারের জিনিস পেয়েছে ও।...মনের উৎসাহেই ছবেলা কলসী নিয়ে খাটে যায় ময়না। আকুল আবেগে মায়াবী দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে চরধল্লাব বুড়ী বটগাছটার দিকে। চঞ্চল হরিণীর মতো মনে মনেই চরময় ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে এক ঝলক নিশির দিকেও তাকাতে চেষ্টা করে। গুরুজনরা কেউ কাছে থাকলে মাথা নীচু করে দেয়। সই, খেলার সাখা, ঠাকুরমা, দিদিমারা ঠাট্টা-তামাসা করে। কলসীর জলের সঙ্গে কানায় কানায় ভরে ওঠে মনের আনাচে-কানাচে। দৈব ওদের আনুষ্ঠানিক মিলনে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিশি তো ওর জীবন-মরণের সাথী ছাড়া আর কেউ নয়। পুতুল-মেয়ে—স্বভাবের চাপে যেন এক পাকা গিন্ধী। প্রেম প্রীতি ভালবাসার ও যেন এক মৃত প্রতীক।...

চৈতালী প্রভাত। ঝিরঝির কবে বইছে মাতাল বাতাস। পূব আকাশে সূর্য ঠাকুর ধলেশ্বরীতে নেয়ে উঠলেন। কামারশালার টুকটুকে তাওয়াই একখানা যেন। নিশি একপাল গরু নিয়ে মাঠে চলেছে। বিয়েটা এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন ভড়কে গেছে ও। দোষ যেন ওরই। ওরই কপাল দোষে যেন মধুর এ দশা। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। পোড়া-কপালে লোককে কে আর স্ননজরে দেখে।...মনমরা হয়েই চলে নিশি। এর চেয়ে বিয়ের দিনটা ঠিক না হলেই ছিল ভাল। দিব্যি ময়নার সঙ্গে হেসে খেলে কাটাতে পারতো। এখন তো শুধু লুকোচুরি খেলা। ঘাটে পথে ময়নার সঙ্গে ওর যেন ভাঙুর-ভাদ্রবউ-সম্পর্ক।...দন্ধে মরাই সার হয়েছে এখন। যাকে নিভুতে একক পাবার কথা—সে হয়ে আছে নাগালের বাইরে। কিন্তু—মন যে মানেন না। বাঁশীতে ফুঁ দিলেই যে বেজে ওঠে, "রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি।"...আগে হলে দূরের বাধা ছুটে কাছে আসতো। আকুল হয়ে শুনতো একটার পর একটা গৎ। নয়তো হাত থেকে বাঁশী কেড়ে নিয়ে ফিক করে-হেসে ফেলতো—মুখোমুখি বসে গুড় মুড়ি খেতো। আর এখন? এখন তো রাধার পথেও সহস্র বাধা। বিয়ের কনে, দৌড়ঝাঁপ আর

চলবে না। কাছে ধেঁষতেও মানা। শহর নয় যে মন্ত্র যখন খুশি পড়লেও—
 অবাধ মেলামেশায় দোষ নেই। এ পাড়া গাঁ। এখানে আছে কঠোর
 সামাজিক শাসন। মন্ত্র পড়ে সাত পাক না দিলে নরনারীর মিলন এখানে
 অবৈধ। সে তুমি মোড়লের ছেলেমেয়ে হলেও ঠিক তাই! ছোটবেলায় এক
 সঙ্গে খেলেছ—খেলেছ। এখন যখন বিয়ের বরকনে তখন শাসন মেনেই চলতে
 হবে। ..কিন্তু শাসনের প্রলম্ব এঁখনো ওঠেনি। মনই নিশির ভেঙে গেছে। মধুর
 জন্ম সময় সময় ভেতরটা বড় পোড়ায়। অমন ধর্মপ্রাণ মানুষ—কি করতে কি
 হয়ে গেলো। কে জানে, অদৃষ্টে আরো কি আছে। ঠাকুর বোধহয় ওদের
 মিলন চান না। ময়না কি তাহলে পরই হয়ে গেলো? অপরিণত মনে অনন্ড
 জিজ্ঞাসা নিশির ...

প্রলম্ব ময়নাব মনেও উঠেছিল। কিন্তু এখন আব ওর কোন সংশয় নেই।
 ঠাকুরদার কাল অশোচটা মিটে গেলেই আবার মিলন হবে ওদের। এ দিবা
 রাজির মতোই সত্য। বিধাতা ওদের দু'জনকে মিল করেই পাঠিয়েছেন!
 ধরতে গেলে বিয়ে ওদের হয়েই গেছে। শুধু মন্ত্র পড়াটাই যা বাকী। সে আব
 এমন কি ব্যাপার। একদিন তা হবেই। অশোচ মিটে গেলেই হবে।...
 ময়না নিশিকে স্বামী জ্ঞানেই ভক্তি করে। খেলাব সাথী ছিল নিশি, এখন
 দেবতার আসনে বসেছে। হ্যাঁ, স্বামী তো দেবতাই। মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা
 তো তাই-ই শিখিয়েছে ওকে। স্বামীর অণু যে কপই থাক না কেন—দেবত
 ছাড়া সে আর কিছুই নয়। অন্ততঃ ময়নার কাছে তো নয়ই। কিন্তু দেবত
 তো আর দানব নয়। তবে ওকে ভয় করার কি আছে? কলসীতে জল ভরে
 ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না, নিশিকে দেখে ফিক করে হেসে ফেলে।
 কচকচে বালুর ওপর ভোরের স্বচ্ছ জল। প্রভাতী রোদের কনক আভায়
 দীপ্ত। ওর চলচলে মুখখানা খুবই উজ্জ্বল দেখায়। দেখে নিশিও হেসে
 ফেলে। শিশু দিতে দিতেই গরুর পাল নিয়ে এগিয়ে যায়। কলসী কাঁখে করে
 ময়নাও হাসতে হাসতেই জল থেকে উঠে আসে।

ঘাটে আর আর ঘারা ছিল প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ময়না
 নিশির চোখাচোখিতে কেউ কোন সাড়া দেয় না। হয়তো দেখতেই পায় নি
 কেউ। যদি দেখেও থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। ছোট ছোট দুটি
 প্রেমিক প্রেমিকার পুতুল খেলা ভালই লাগে ওদের। কি সুন্দর দুটিকে
 দেখতে!...কিন্তু ক্যান্ডর কথা আলাদা। রিক্তা নারী। আজীবন লাঙ্ঘনার

মধ্যেই কেটেছে। কারো এতটুকু স্বথ, স্বাচ্ছন্দ্য, রং-তামাসা আদৌ সহ হয় না ওর। কি পেয়েছে ও জীবনে? রূপ যৌবনের জৌলুস কি সংসারের কারো চয়ে কিছু কম ছিল ওর? এই রূপ দেখেই না বিশ্বাস বাড়ির বড় ছেলে ওকে বিয়ে করেছিল। সোনার চাঁদ বর—খাসা চেহারা। কিন্তু নির্মম বিধাতা। মাত্র ন'দশ বছর বয়েস। হয়তো ঐ ময়নার সমবয়সীই হবে তখন। বরের বয়েসও নিশির মতোই। গা ভর্তি গয়না—ভাল শাড়ী—ভাল খাওয়া থাকা। পরীর মতো বউ পেয়ে বিশ্বাস বাড়িতে খুশীর বান ডেকেছে। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেখে বজ্রাঘাত। এসিয়াটিক কলেরায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গাপদ খতম। কমল-কলির চোখ আর ফুটলো না। যখন ফুটলো তখন অনাহৃত ভ্রমরের দংশনে সর্বাঙ্গ জর্জর। স্বস্তরকূলে ঠাই নেই ক্ষ্যান্তর। মা বাবাও দগ্ধে দগ্ধে বছর কয়েকের মধ্যেই স্বর্গে গেলেন। দীঘির কমল পানা পুকুরের পাকেই ভেসে গেলো। সর্বশেষ ঘুরতে ঘুরতে এসে উঠেছে এই চরে। এখন তো বিগত যৌবনা এক বৃড়ী মাগী। সামনের চারটে দাঁতই নেই। দগড়া দগড়া মেচেতা গড়ায় কনক বরণ পোড়া কার্শে রূপান্তরিত। কপাল আর গালের বলিরেখা-গলোও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আদরিণী আজ হুঁমুঠো ভাতের কাঙালিনী। ঠা, এ সব বেহায়াপনা ও সহ করবে না। ঘাটে পথে নাগর নিয়ে কিসের এত লাটলি? লঘু গুরু জ্ঞান নেই!...পাশেই হুঁকোর গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাজ ছিল গৌরদাসী। ওকে লক্ষ্য করেই ঝংকার তোলে ক্ষ্যান্ত, দেখলিত রি, ছাই কপালীর তামসাদা? ছ্যামড়া গরু লইয়া যাইবার নৈচিল, কেমন থু মারল?

তুমি চুপ কর দাদী। বয়সকালে অমুন একটু-আধটু কইরাই থাকে। তামরা কর নাই? গৌরদাসী গলার স্বর স্বাভাবিক রেখেই বাধা দেয়।

আল নাল ছেঁড়ী, না। আমাগ কালানে ইসব ছিনালী আচিল না, সমর্থন না গয়ে ক্ষ্যান্ত রাগে ক্ষেটে পড়ে।

তুমি যে কি কও দাদী, এহন কি আর হ্যা কাল আচে? এহনকার গোলা গায়রা আগে ভাব করে—পরে বিয়া বয়। ও সব ছাইড়া জাও, পাশ কাটাতেই ঠা করে গৌরদাসী।

কিন্তু ক্ষ্যান্ত ছাড়ে না। বলে, এত বাড়াবাড়ি বালো নয় ল বালো নয়। তাঁতির আগায় সিন্দুর উঠবার আগেইত দাদারে খাইচে, এহন ভাতারও কপালে কে কিনা জাখ। ছ্যামড়ারে যেভাবে মজাইচে, গিলা খাইতে কতক্ষণ?

গৌরদাসী এবার আর শাস্ত থাকতে পারে না।, তীব্রভাবেই বাধা দেয়
কি তুমি যা তা কইবার নৈচ ! তোমার মুখে কি কিচু আটকায় না ? মাতবরের
কত সাদের কোলের পোলা, হারে তুমি এই সব কও ! যাইট বালাই, বাইচ
ধাউক।...

আল আমিওত হেই কতাই কই। ঐ ডাইনী মাগীর নজরের খন ছুটবার
না পায়ে কি ছ্যামড়া ঝাচব ? তুই না দিনের মদে সাতবার যাচ মাতবর বোয়ের
কাচে, কতাডা কানে দিবার পারচ্ না ?—ক্ষ্যাস্ত গলার স্বর খাদে নামিয়েই
জবাব দেয়।

কিন্তু গৌরদাসী এবার সপ্তমে ওঠে, সাতবার আবার যাইবার দেখলা তুমি
কোনহানে ? দিনে রাইতে তুমিওত কমবার যাওয়া আসা কর না, তুমি কইলেই
পার। আমি ইসব মোন্দ কতা কইয়া মোন্দ অইবার যামু কোন ছুখে ?

আল মোন্দ অবি নাল মোন্দ অবি না। বাড়িতে আবার পাকা ফলার অইলে
তর ডাক পরব, জ্র কঁচকিয়েই জবাব দেয় ক্ষ্যাস্ত।

পাকা ফলারের লোবে তোমার মতন ল্যাং-ল্যাং কন্তে কন্তে আমার
মাইনষের বাড়িতে যাই না। অমুন সাত হাত নোলা আমাগ না। মাইনষে
আমাগ আপনার খেইকাই ডাকে।...

গৌরদাসী কথা শেষ করতে পারে না। ক্ষ্যাস্ত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে
কেটে পড়ে, কি কলি, তুই আমারে খাওয়ার খোটা দিলি। তর মতন কবে ল
আমি মাইনষের লগে ঢলাইবার যাই ? বাড়িতে আইসা নিমন্তন্ না কলে
ক্ষেস্তি কারুর বাড়ি হাগতে মূততেও যায় না।

আহা-হা, ছিনালরে আবার মাইনসে পায়ে ধইরা সাদবার আহে। মাইনষের
বইয়া গেচে ! নিশার মার লগে তর কাইজা আচিল নাল হারামজাদী। পাকা
ফলারের গন্দ পাইয়া তার পায়ে তুই ত্যাল দিবার যাচ নাই ?

সাপের মুখে ধুলো-পড়া পড়ে যেন। রাগের মধ্যেও কিছুটা লজ্জা পায় ক্ষ্যাস্ত।
ঘাটের পথে একা পেয়েই কুসুমের সঙ্গে যেচে দুটো কথা বলেছিল। হয়তো
একটু দীনতাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কিন্তু সে কথা যে মাতবর বউ তামাম
লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে একথা ও ভাবতেও পারেনি। কপাল মন্দ তাই
সকলেই হেলাফেলা করে। রাগে দু'চোখ কেটে জল বেরোতে চায় ক্ষ্যাস্তর।
তবু দম রেখেই গৌরদাসীকে পান্টা জবাব দেয়, ঢলাইবার গেচিলাম বেইশ
করচিলাম। অরা আমাগ আত্মীয়। তর কি ল কইড়া খানকী ?

আল আমার আত্মীয় আলি ল ! দীহু বৈরাগী কি তর বাপ না ?—ভেংচি কেটে জবাব দেয় গৌরদাসী ।

ভেংচি ক্ষ্যান্তও কাটে । বলে, আমার বাপ অইবার যাইব ক্যান, তর বাপ । তগ চৈন্দ পুরুষের বাপ ভাতার । খানকী, ছাই কপালী, হাবামজাদী...এক নিশ্বাসে উন্মাদিনীর গায় বকতে থাকে ক্ষ্যান্ত ।

গৌরদাসী মুখে আর কিছু না বলে তেড়ে এসে গলা চেপে ধরে ।

ঘাটময় সোরগোল পড়ে যায় । আশপাশের আর সকলে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারাও হকচকিয়ে ওঠে । পদুর মা ভারিক্কী মানুষ । নিকটেই বালি দিয়ে কলসী মাজছিল । তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাড়িয়ে দেয় । টানতে টানতে গৌরদাসীকে নিয়ে পাড়ে উঠিয়ে দেয় ।

যাচ্ছেতাই করে গালি দিতে দিতে বাড়ির দিকেই বওনা হয় গৌরদাসী । যাবার সময় সব কথা কুসুমকে বলবে বলেও শাসিয়ে যায় ।

ভয়ে ঠকঠক কবে কাঁপতে থাকে ক্ষ্যান্ত । আর হয়তো ওব পাকা ফলাবের আশা নেই । তাব চেয়েও ভাবনাব কথা, প্রায়ই যে চেয়ে-চিন্তে হুঁমুর্গো আনে মাতব্ব বোয়েব কাছ থেকে তাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে । না, কপালই ওব মন্দ । নইলে অগ্রদিন যে কত রসিয়ে রসিয়ে সায় দেয় সে আজ এ রকম চটেবে কেন ? এত দুঃখও কপাল আছে বাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলে ক্ষ্যান্ত । ইস, ছিনালটা এমন করে ধরেছিল যে গাল গলা এখন টাটাচ্ছে । গলায় হাত ব্লাতে ব্লাতে এবং গৌরদাসীকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে ক্ষ্যান্তও ঘাট থেকে উঠে যায় ।

॥ ২০ ॥

চরধল্লা আর চরফুটনগরের চাষীদের পাট বোনা নির্বিঘ্নে শেষ হয় । এখন সময়মতো পরিমিত বৃষ্টি আর জল হলে ফসল ভাল হবারই আশা । এখনকার কাজ শুধু তীক্ষ্ণ নজর রাখা । গরু বাছুরের ভয়ই সব চেয়ে বেশী । চারা ফনফনিয়ে উঠবার মুখেই যদি ওদের দাঁত লাগে তাহলে ভাল ফল লাভের আশা নেই । কুচুটে মানুষের দৃষ্টির ভয়ও কম নয় । এক একজনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাখানো থাকে । অঙ্কুরেই জলে-পুড়ে যায় সব । হাতে বিশেষ কোন কাজ করতে না হলেও ক্ষেতে প্রত্যেককেই নিয়মিত বেরতে হয় । ঘুরে কিরে

দেখতে হয় কোথাও কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। সামনের মাসথানেক তো প্রত্যেকেরই একরকম ছুটি। তারপর আবার একটু খাটা-খাটুনি করতে হবে। চারা হাতথানেক বড় হলেই নিড়িয়ে দিতে হবে। বেশ কিছু খরচাও ওতে আছে। আগাছা আর অপুষ্ট চারা হিসেব করে বেছে ফেলতে হবে। উপযুক্ত নিড়ানির উপরেই নির্ভর করে ভাল ফসল। একটা চারার সঙ্গে আর একটা চারার দূরত্ব বেশ হিসেব কবে রাখতে হবে। বাড়বার মুখে মাথায় মাথায় জড়িয়ে গেলেই সর্বনাশ। ফসল তো ভাল হবেই না—পোকা ধরারও সম্ভাবনা থাকে। পাকা চাষীকে অবশ্য তা নিয়ে বেশী ভাবতে হয় না। জাঁরপ-বিড়ুর চেয়েও তীক্ষ্ণ ওদের দৃষ্টি। এক নজর দেখেই কান্ডে চালাতে পারে। এমন কি গান গেয়ে গেয়েও পারে। এ সময় যাদের ঘরে ছুঁমুঠো চাল-ডাল আছে তাদের পরম সুখ। আত্মীয় কুটুমের বাড়ি যাও, প্রাণ খুলে দয়াল চানবে ডাকো, গভীর রাত পর্যন্ত খোল বাজিয়ে কীর্তন করো। মনের আনন্দে কলকেব পর কলকে তামাক খাওয়া তো আছেই। অভাব থাকলে ঘরে বসে কুলো কাঠা বুনো, গরু দুইয়ে দুধ নিয়ে গঞ্জে যাও, নয়তো বেচ ঘাস। গঞ্জের হাতে তাঁর-তরকারি বেচারও সুযোগ আছে। উৎসব করার মতো প্রাচুর্য না থাকলেও দিন কারো মন্দ কাটে না। সব চেয়ে আশার কথা, মা লক্ষ্মীর চরণ রাখার জগ্ন আসন পাতা হয়েছে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে। একবার উনি পা রাখলে আর কথা কি। মুঠো ভর্তি আসবে করকরে টাকা—সারা বছরের বাড়তি খরচা। আশায় আনন্দে দিন একরকম ভালই কাটছে।

বৈশাখের শেষাংশে নিড়ানি আরম্ভ হয়। কালবৈশাখী বড় জলে বীজ ধুয়ে মুছে যায়নি। চারাগুলি বেশ ফনফনিয়েই উঠেছে। শত শত কান্ডের চলে অবিরাম কাজ। প্রচণ্ড রোদ মাথার ওপর। কিন্তু সবুজ চারাগুলি ওদের দৃষ্টিতে এনেছে আশার স্বপ্ন। সোনার খনিই যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওরা। ক্লাস্তি নেই, বিক্রাম নেই, এমন কি ঘুম পর্যন্ত নেই ছুঁচোখে। ক্ষেতে জল ঢোকান আগেই চারাগুলিকে মাথা বাড়ান দিয়ে দাঁড়ানোর মতো শক্তি যোগাতে হবে। ওদের হাতের কান্ডেই হলো সে শক্তির উৎস। ভাল নিড়ানি হলেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে ওরা। নয়তো সমূলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বর্ষার বংশী ধলেশ্বরী। বালি চাপা দিয়ে গিলে ফেলতেও পারে নাগ-নাগিনী। চাষীদের নাইবার খাইবার সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

কান্তে হাঁতে অনন্দও ক্ষেতে নামে। কিন্তু এতো ওর একার কাজ নয়। সন্ধে চাই আরো জন পাঁচ সাত। সকলে মিলে একযোগে কাজ করলেই নির্দিষ্ট সময়ে নিড়ানি শেষ হতে পারে। কিন্তু দিদি যে লোকের কথা মুখেও আনছে না। দম বন্ধ হয়ে মরবে নাকি ও ? এক তো সকলের শেষে চাষ হয়েছে। নিড়ানিও যদি সময়মতো না পড়ে তাহলে চারা বাড়বে কি করে ?... অপেক্ষা করে করে তেলে-বেগুনেই জলে ওঠে একদিন। দুর্গা ঘর নিকোচ্ছিল, আনন্দ তাড়া দেয়, অ দিদি, বলি তোমার মতলবখানা কি কও ত ? কয়দিন ধইরা কইবার নৈচি নোক নেই, তা তুমি হু হা-ই করচ না। চারাগুলির কি সৰ্বনাশ করবা নাকি ? জল যে দিন দিন বাড়বার নৈচি হ্যাঁদিগে দেখচ ত ?

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে তবে কুমার বাহাদুর আসছেন না কেন ? হ্যাঁ, জল প্রথম দিকে দিনকয়েক বেড়েছিল বটে। বৈশাখী হাওয়ায় বেশ বড় বড় ঢেউ জাগছিল বংশী ধলেশ্বরীর বুকে। হয়তো আর কিছুটা বাড়লেই চারদিকের খাল বিল ছুটতো। কুমার বাহাদুরের বোট আসতেও বিলম্ব হতো না। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই যে আবার কমে গেলো। ঘাটলার দুটো সিঁড়ি ডুবেছিল তিনটে আবার জেগে উঠেছে। কপালই মন্দ। এখন আবার একটু-আধটু বাড়ছে বটে। কিন্তু এ বাড়ায় তো কাজ হবে না। কুমার বাহাদুরের 'বোট' ভাসলেই কথা। টাকা কোথায় যে লোক নেবে। পাঁচটি লোক নিলে খোরাকীর চালই চাই কম করেও দৈনিক পাঁচ সাত সের। তারপর আছে মজুরীর টাকা। নিজেদের না হয় যা জুটছে আধ-পেটা খেয়ে কাটছে। পর লোক না খেয়ে কাজ করবে কেন ? ঠাকুরমশায় তো রোজই গঞ্জের কাছারিতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মালিক না এলে উনিইবা আর কি করতে পারেন। নিজেইবা চাই কি করে। একটা মানুষকে কতবার অভাবের কথা বলা যায়... আনন্দের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আকাশকুসুম ভাবতে থাকে দুর্গা।

ওকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ আরও চটে যায়। বলে, চূপ কইরা রইলা যে, কি করবা কইবা ত ?

কি আবার করুম, যা পারচ নিজে কর, বিরক্তির সন্ধেই এবার জবাব দেয় দুর্গা।

নিজে করুম ! ইডা কি একলার কাম ? আনন্দের কণ্ঠে বিস্ময়ের স্বর।

তবে চূপ কইরা বইসা থাক,—উদাসীন থেকেই বলে দুর্গা।

না, তোমার মাথাই ধারাপ অইচে। আমবা বইসা থাকলে কি জল আমাগ লেইগা বইসা থাকব ? সব না তলাইয়া লইয়া যাইব।

গেলে আমি কি করুম ?—দুর্গা পাশ কাটাতেই যায়।

তুমি করবা না তয় কি আমি করুম ? তহন ত কইলা, আনন্দ কাম কর। চাষে মোন দে। এহন চোক উল্টাইয়া থাকলে চলব ক্যান ?

যা তা কইচ না আনন্দ। কইলাম ত, পারচ নিজে কর না পারচ চুপ কইরা বইসা থাক।

হ, বইসা থাকলেই খাওয়ন আইব আর কি ? আমি যাই, বিয়াই মশইর লগে পরামশ্য করিগা, আনন্দ সকালের পান্তা না খেয়েই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

দুর্গা ধমক দেয়, বালো অইব না আনন্দ। পানরা গিলা (খাবার খেয়ে) ক্ষ্যাতে যাবি নাকি যা। তর আর মোড়লাগরি করন লাগব না।

আনন্দ মনের রাগে ফিবে দাঁড়ায়। বলে, বেইশ, আমি কিচুব মন্দে থাকবার চাই না। তবে পরে যান আমারে আর কইয় না, আনন্দ ইডা কর ওডা কর।

আইচ্ছা, তাই অইব। এহন খাবি নাকি খা।

আনন্দব আজ আর খেতে মন চায় না। এত পরিশ্রম কুরেছে, সব ভেসে যাবে ! দিদির মাথায় যে কি মান-সন্ত্রমের বাই চুকেছে তা ভগবানই জানেন। আপনজন দীলু বৈরাগী—কত স্নেহ করেন—ভালবাসেন। ঘরের কথা তাঁকে বললে ওনার মানের হানি হবে। যাক, যা পারে করুক। আমি আর কিছুতে থাকছিনে !...ভাবতে ভাবতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরের দিকে যায় আনন্দ। পোঁয়াজ পান্তা অতি প্রিয় হলেও আজ আর তেমন রোচে না।

খেয়ে-দেয়ে আনন্দ বোধ হয় ক্ষেতেই চলে যায়। দুর্গার ভাবনা উথাল দিয়ে ওঠে। জোর করে আনন্দের মুখ বন্ধ করে দিলেই সমস্তা মিটেবে না। কিন্তু কি করতে পারে ও ? ভাগ্য যদি পদে পদে প্রতারণা করে তাহলে ওর দোষ কি ? রামকান্ত তো রোজই এসে আশ্বাস দিচ্ছেন। নদীর বৃকেও ছোট ছোট চেউ জাগছে—জল বাড়ছে। গ্রহ-দোষ কাটলে হয়তো কুমার বাহাদুর শীগ্গীরই এসে পড়বেন। ঠাকুরমশায়ের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আসা মাত্রই টাকা হাতে আসছে। দিনকতক ধৈর্য ধরে থাকাই সমীচীন। পার ছাড়িয়ে ক্ষেতে জল উঠতে এখনো ঢের বাকী। কিন্তু তার আগেই দ্বিতীয় বাঁর নিড়ানি দিতে হবে। চাষ যখন সকলের পরে হয়েছে নিড়ানিও না হয় তাই

হবে ।...এলোমেলো চিন্তায় হাতের কাজ আর এগোয় না দুর্গার। দু'এক পোছ দিতে না দিতেই আবার ভাবে, চাইলে হয়তো ঠাকুরমশায় আরো কিছু দিতে পারেন। খালি হাতে যে একযোগে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে পারে সে কি আর গোটা পচিশেক টাকা দিতে পারবে না? টাকা পচিশেক হলেই তো এ যাত্রা চুকে যায়। সেই ভাল, আজ বিকেলে এলে মুখ ফুটে চাইব।... ঝিমিয়ে পড়া মনে একটু বল পায় দুর্গা। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ঘাটে যায়। যেতে যেতে ভাবে, আনন্দটাকে ওভাবে দাঁতখিঁচুনি না দিলেও চলতো। বেচারি, কাজ কাজ করে ফেপে উঠেছে। এরকম উৎসাহ থাকলে ক'দিন আর লাগবে ঋণশোধ করতে। দু'জনের সংসার, বেশ কেটে যাবে। না না, দু'জনইবা হবে কেন? মায়নাব বিয়েটা হয়ে গেলে ঋণ যদি শোধ হয়ে যায় তাহলে আনন্দকেও আবার বিয়ে দিতে হবে। এই বয়সে ও কেন নেংটা শিব হয়ে থাকবে? নিজের নিদানই বা দেখবে কে? হাজার হোক, মেয়ে মেয়ে। বিয়ে দিলেই সে পর হয়ে যায়। আনন্দের যদি ছেলে-পুলে হয় তাহলে ওদের নিয়ে বেশ ভুলে থাকা যাবে। হ্যা, প্রথম সুরযোগেই ওব একটা বিয়েব ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধিই না হয় একটু কম। কিন্তু ওর মতো এমন স্বাস্থ্য ক'জন অবিয়েত ছেলের আছে?...ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘাট থেকে ডুব দিয়ে ফেবে দুর্গা।

রামকান্ত প্রায় প্রতিদিনই দুর্গার খোঁজপবর নেয়। কোনদিন বা ভাগবত পাঠে যাবাব পথে কোনদিন বা ফেবাব সময়। পথে ভাবতে ভাবতে আসে, আজ মনের কথা মুখ ফুটে বলবোই। এত করছি, একটু অল্পকম্পা কি করবে না ও? ওকি কিছু বোঝে না? নিশ্চয় বোঝে, নয়তো মেয়ের মা হয়েছে কি করে।...রামকান্তর তৎপরতা বেড়ে যায়। মুখে মধু ঢেলেই উঠোনে পা দেয়। দুর্গা যেখানেই থাক ছুটে এসে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিতে কসুর করে না। আনন্দ বাড়ি থাকলে তাড়াতাড়ি হুকো এনে হাজির করে। আদর আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ক্রটি নেই। কিন্তু ঐটুকুই। দুর্গা যেমন রাশভারি তেমন রাশভারিই থেকে যায়। প্রয়োজনের সব কথাই বলে কিন্তু চোখ মুখ গুরুগম্ভীর। বলি বলি করেও এ পর্যন্ত মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি রামকান্ত। কিন্তু তবু আসে। একরকম রোজই আসে। না এসে উপায় নেই তাই আসে। কোন কোন রাত বিছানায় শুয়ে ভাবে রামকান্ত, ওকি মনোহিনীর মায়াম

পড়েছে ? পুরাণে তো আছে, মহামায়া নানা বেশে অসুরকে ভুলিয়ে বধ করেছেন। দুর্গা কি সেই মায়ার ফাঁদই পেতেছে ওর সর্কে ? পঞ্চাশ টাকা কর্ত্ত হয়েছো নায়ের রাখালের কাছে। দৈনিক টাকা প্রতি দু'পয়সা স্বদ। দশ পাঁচ দিনের ভেতর কুমার বাহাদুর আসবেন—তাঁর নিকট থেকে দুর্গাকে কর্ত্ত নিয়ে দেবো—সমস্ত ঝগ্গাট চুকে যাবে। কিন্তু দশ পাঁচের জায়গায় যে মাসেক হতে চললো। এখনো কবে উনি আসছেন বলা যায় না। তাছাড়া এসেই যে টাকা দেবেন তারই বা স্থিরতা কি ? মধু মণ্ডলের সম্পত্তির ওপর তো কোন আকর্ষণই নেই ওঁর। সকল আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ দুর্গা। মনে হয় সেখানেই ওঁর দৃষ্টি। কিন্তু পাশার ছুকে যদি দুর্গাকেই হারাতে হয় তাহলে আর লাভ কি হলো ?...ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলেই চলে রামকান্ত। বাত গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে তবু ঘুম নেই ছু'চোখে। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—মায়াবিনী রাক্ষুসী। আবার পঁচিশ টাকা দিতে হবে ওকে। কিন্তু কেন ? কি দিয়েছে ও বিনিময়ে ? যে নিজে কিছু দিতে জানে না, সে এত চায় কোন লজ্জায় ?...কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে রামকান্তর। উঠে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আসে। মায়াবিনী রাক্ষুসী মূহূর্ত্তে আবার প্রেমময়ী—কপময়ী হয়ে ওঠে। না না, যেভাবেই হোক পঁচিশটা টাকা ওকে দিতেই হবে। এতে এত ভাববারই বা কি আছে ? প্রের দেওয়া আংটিটা তো এখনো সম্বল আছে। অবশ্য দিব্য দিয়ে দিয়েছিল খাসিয়া সুন্দরী। কোনদিনই যেন হাতছাড়া না করি। কিন্তু তা কি করা যাবে। মাথুঘ কি সকল অবস্থায় সকল দিব্য রাখতে পারে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আংটিটা বেচেই দুর্গাকে টাকাটা দিয়ে দেবো। হয়তো ছু'চার টাকা হাতেও থাকবে। হ্যাঁ, তাই দেবো। হয়তো এই আংটিটাই অপয়া। প্রের প্রেতাত্মাই হয়তো দুর্গার পথ রোধ কবে আছে। যত শিগগীর সম্ভব এটাকে দূর করাই সমীচীন। সম্ভব হলে কালই গঞ্জে যাবো।...ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে তন্দ্রায় চলে পড়ে রামকান্ত।

আরো পঁচিশ টাকা দুর্গা একরকম বিনা আয়াসেই পায়। শুধু নিরি-বিলিতে এক কন্কে তামাক সেজে খাওয়ানো আর মুখছুটে বলা। রামকান্ত তাতেই গলে জল হয়ে যায়। রামকান্ত তো তুচ্ছ, কুমার বাহাদুরও হয়তো গলে জল হয়ে যেতেন ওর কাম-কটাক্ষে। অবশ্য দুর্গাকে এক্ষেত্রে কোন কটাক্ষপাত করতে হয়নি। ওর মৌন ভাবগম্ভীর মুখাবয়বই রামকান্তকে পাগল করেছে। অমৃত সাগরে রামকান্ত বোধ হয় হাবুডুবু খেয়েই মরবে।...

টাকা পেয়ে দুর্গা সময় বিশেষের জগ্ন অনেকটা নিশ্চিত হয়। নিড়ানির কাজ একরকম করে হয়ে গেলো। আনন্দ খুব খেটেছে। তিনজনের কাজ একাই করেছে ও। কাজ না পেলেই মানুষ অকেজো হয়ে পড়ে। কই এখন তো ওর মধ্যে কোনরকম গাফিলতি দেখা যায় না। তামাক ও এখনো-প্রচুর পরিমাণে খায়। কিন্তু আগের মতো এখন আর ওকে তামাকে খেতে পারে না। এক ছিলুম তামাকের লোভ দেখিয়ে এখন আর কেউ ওকে বশও করতে পারবে না। আনন্দ তো এখন রীতিমতো কাজের লোক হয়ে উঠেছে। কাজই ওকে রীতিমতো কর্মী করে তুলেছে; কাজ না থাকলে মানুষ অলস হবে না তো কি হবে?...

দুর্গার আশু প্রয়োজন মিটেছে। ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় থাকলেও বর্তমান ও নিশ্চিত। কমলী যখন বিয়িয়েছে তখন শাকান্ন জুটবেই। দু সের দুধ তো বাঁধা। বর্ষার মুখে দরও থাকবে ভাল। কম করেও সের প্রতি দু-আনা পাওয়া যাবেই। দুঃখ, ময়নার ঠাকুরদা একটা ফোঁটাও মুখে দিয়ে যেতে পারলেন না। অতটুকু বাছুর এনেছিলেন কমলীকে। সংসারে নিজস্ব অভাব চলেছে। তবু তারই মধ্যে বড় হয়েছে ও। আজ তো অমৃতদায়িনী মা। ওর মাতৃধারাই আজ তিনটে প্রাণীর বড় সহায়। নিড়ানির কাজ শেষ করে দুর্গা আজ সত্যি সত্যি নিশ্চিত। এরপর আরো প্রচুর টাকার প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু তার জগ্ন বিচলিত হবার কিছু নেই। দয়াল রামকান্তই রয়েছেন। নিঃস্বাধভাবে কি না করছেন বেচার। কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে টাকা পেলে সর্বপ্রথম ওর টাকাদাই শোধ করে দিতে হবে! বলা যায় না মানুষের কখন কি প্রয়োজন হয়। লজ্জায় হয়তো কিছু বলতেই পারবেন না। আশ্চর্য মানুষের মন। এই মানুষ সম্বন্ধেই একদিন আমি কি জঘন্যতম ভাবনা ভেবেছি। একান্ত অনুকম্পা বশেই না যখনকার যা করে যাচ্ছেন উনি! নয়তো আমার কি গুণ আছে।...দুর্গা মনে মনে প্রণাম করে রামকান্তকে।

বহু ভাবনা-বিচলিত দুর্গা নিশ্চিত হয়। কিন্তু খাওয়া-পরায় নিশ্চিত রামকান্ত দিন দিন তলিয়ে যেতে থাকে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াই হয়তো খেলে চলেছে ও। দান তো এখন হারের দিকেই। প্রের স্মৃতি বিজড়িত আংটিটাও শেষ পর্ষন্ত বিকিয়ে দিতে হলো। বেচার। প্রে। স্বগঠিত দেহ—বুকভরা আশা। যে বয়সে মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কাঁটায় কাঁটায় সেই বয়সেই হয়তো হবে ওর।

চা বাগানের দস্যুরা নিয়ত ওকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওর বুড়ী মাও ওকে
 অবলম্বন করেই খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রে তা
 পারলো না। শরতের শুভ্র শিউলীর মতোই নিভূতে এসে আত্মসমর্পণ করলো।
 সঙ্গে বাবার গচ্ছিত একরাশ টাকা ও কিছু সোনাদানা। বললে, ভট্‌চায়,
 আমাকে তোমার বউ করো—চলো আমরা এখান থেকে পালাই।...ভট্টাচার্য
 উচ্চারণ করতে পারতো না প্রে। ভট্‌চায় বলেই সম্বোধন করতো। কিন্তু
 উচ্চারণে কি এসে যায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারী সাপের ফণাও হাতের
 মুঠোয় চেপে ধরতে পারে। নিশ্চিন্ত বুঝা গেলো, তাড়া খেয়ে আশ্রয় চাচ্ছে প্রে।
 অম্লবাধা তখন স্মৃতিকায় ধুকছে। যমদূতের কাঁধে চড়ে বসে আছে বললেই
 হয়। ভাগ্যই বোধ হয় হাত ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। অর্ধেক
 রাজত্ব আব রাজকণা। জানি না, কি দেখেছিল ও এই দীন ব্রাহ্মণের মধ্যে।
 তবে ওর মুখে শুনেছি, ওর ধাবণা, বাঙালীবা সত্যিকারে ভালবাসতে জানে।
 ঘরের বৌয়ের মর্যাদা একমাত্র তারাই দিতে পারে। প্রেব কথায় হাসি
 পেয়েছিল। অম্লবাধা তখন গত হয়েছে। ও হয়তো তার কোন খবরই রাখতো
 না। রাখলে কি আর কখনো পারতো এমন করে আত্মসমর্পণ করতে?...
 ধন আর মান একসঙ্গে উজাড় করে তুলে দিলে উন্মাদিনী। এ কোন
 অম্লকম্পার কথা নয়। নৈবেদ্য সাজিয়ে সত্যা সত্যা দেব পূজোতেই মেতে
 উঠলো অনাত্মতা নারী। কি সে নিষ্ঠা—কি সে আকুলতা। সময় সময় বড় ভয়
 হতো। মুখের দুধ সরে গিয়ে বিয়ের হাঁড়ি বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ। নারী
 তো শুধু আর প্রেমময়ীই নয় রুদ্রাণীও সে। যে হাতে স্বধা পরিবেশন কবে
 সেই হাতেই খড়া ধরে।...কিন্তু ভাগ্য সেদিন স্প্রসন্নই ছিল। প্রে তখন
 জোয়ারের জলে সাতার কাটছে। খোঁজখবর নেবার সময় 'নেই ওর। প্রে ছাড়া
 শাবকের অকল্যাণ চিন্তায় হিংস্র বাধিনীর মতো যে গর্জে উঠতো সেও আর
 বেঁচে রইলো না। প্রের বুড়ী মা মাঝ পথেই স্বর্গে গেলো। আমি স্বস্তির হাঁক
 ছেড়ে বাঁচলাম। না না, প্রতারণা আমি করতে চাইনি। মাছুষ যা চায় তার
 সব কিছুই ছিল প্রের মধ্যে। হোক বিধর্মী—ভিন্ন সমাজ দুহিতা, প্রে আমার
 জীবন সঙ্গিনীই।...প্রেও খুশীতে ডগমগ। খুশীর বাধ ভেঙেই ওর কোলে
 আগস্তক আসছে। কত রঙিন কল্পনা মনের মণিকোঠায়। দারুণ শীত
 আসামে। ছুঁজোড়া মোজা, টুপি, সোয়েটার—রাম না জন্মাতাই রামায়ণ
 রচনা শেষ হয়ে যায় প্রের। কিন্তু হায়রে নিয়তি। বর্ষার ঢল নেমেছে

পাহাড়ের গা বেয়ে। সাত দিন অবিরত বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলায় কার্টের ছোট্ট একখানি ঘর। সিঁড়িও কার্টের। প্রে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তর্গাৎ একদিন জলের বালতি নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায়। প্রায় দোতলার কাছ থেকে গড়াতে গড়াতে এসে এক তলায়। আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য। চক্ষিণ ঘণ্টা পর হাসপাতালে চৈতন্য ফিরলো। কিন্তু প্রে আর উঠে দাঁড়ালো না। তিনদিন পর মরা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে জন্মের মতো চোখ বুললো। মরণের ঘণ্টাধ্বনি বোধ হয় প্রে আগেই স্তনতে পেয়েছিল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অনামিকা থেকে খলে আংটিটা আমার কড়ে আঙুলে পরিয়ে দিলে। বললে, ভট্‌চাষ, আমাকে মনে বেখো। সন্তান হলে তাকে মানুষ করো। আমি আর বাঁচাবো না।...

প্রেয় অনুরোধ দীর্ঘকাল রক্ষা করেছি। এমন অনেক দিন গিয়েছে উপোস দিতে হয়েছে। তবু প্রেয় দেওয়া আংটিটা হাত থেকে খুলিনি। আজ দুর্গা পণ ভঙ্গ করালো। তা আমি কি করবো? দুবার নিয়তি।...আংটি বেচে দুর্গাকে টাকা দিয়ে এসে রাত ভোর ভাবতে থাকে রামকান্ত। প্রে স্বেচ্ছায় নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল। আর দুর্গা? না না না, এ পাপাচার—এ অন্ডায়। ভাগবতের ঠাকুর, তুমি আমাকে বাঁচাও। ভুল করেও দীর্ঘকাল আমি তোমাকে স্মরণ করেছি। তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাকে রক্ষা করো! আমি পালিয়ে যাবো এ চর থেকে। রক্ষা করো, রক্ষা করো দয়াময়...।

নিরুম নিস্তরু চর। রামকান্ত ছাড়া বোধ হয় কেউ আর জেগে নেই। ঘন ঘন বিবেকের ছোবল পড়তে থাকে রামকান্তর মগজে। অন্ধকারে ভেসে ওঠে প্রেয় দুটি সজল সক্রুণ আয়ত আঁধি।...

সাক্ষ্য জল ভরতে প্রতিদিন ময়নাই ঘাটে আসে। কিন্তু ময়না আজ বেলাবেলি সহইয়ের বাড়ি গেছে। সূর্য ডোবে ডোবে পেতলের বড় কলসীটা কাঁখে করে দুর্গাই আজ জল ভরতে আসে। বালি দিয়ে কলসীটা মাজতে মাজতে চোখ তুলে তাকায় পাট ক্ষেতের দিকে। বেশ পুষ্টি হয়েই বাড়ছে চারাগুলো। এরপর আছে দ্বিতীয় দফা নিড়ানি। তাতেও একগালা টাকার দরকার। ঠিকমতো যত্ন করতে পারলেই স্বফলের আশা করা যায়।...

ভাবতে ভাবতে গঞ্জের দিকে চোখ ফেরায় দুর্গা। ওকি। কাছারির ঘাটে ও তো গ্রীনবোটই! গোধুলির আবীর রঙের সঙ্গে বোটের তলার সিঁদুরে রং একাকার হয়ে জল্ জল্ করছে। ও তো কুমার বাহাদুরেরই বোট। ঐ তো তাঁর নিশান উড়ছে প্রতীক চিহ্ন নিয়ে। ঠাকুর তাহলে এতদিনে দয়া করলেন। দ্বিতীয় দফা নিড়ানির ভাবনা তাহলে আর ভাবতে হবে না। জল যেভাবে বাড়ছে এভাবে বাড়লে আর পনেরো বিশ দিনের ভেতরেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তা হোক, নিড়ানি কেন, একেবারে কাটা, বাছাই, ধোলাইয়ের খরচা পর্যন্ত ঋণ নেবো। মায় ভট্‌চাঁষ মশায়ের টাকা।...মনের উল্লাসে জল ভরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে দুর্গা। উনি যদি ভাগবত পাঠে যাবার পথে দেখা করে যান তাহলে তখনি ওকে খবরটা বলবো। আবার এমনও হতে পারে আমার বলবার আগে উনিই আসবেন খবর বলতে।

দুর্গার ভাবনা ঠিকই হয়। ওর অনেক আগেই রামকান্ত ঘাটে বোট ভিড়তে দেখেছে। ওর গরজের চেয়ে রামকান্তর গরজ ঢের বেশী। প্রের আংটি গিয়েছে যাক কিন্তু রাখালের লেলিহান চোখ নিয়ত তেড়ে আসছে ওকে। টাকা প্রতি দিনে দু'পয়সা হুদ। কাবুলিওয়ালাও যে হার মানবে।...ছুটে কাছারিতে যায়। কিন্তু কথা বেশী কিছু হয় না। শুধু কুশলবার্তাই আদানপ্রদান হয়। ভক্তি গদগদ চিত্তে পদরজ মস্তকে ঠেকাতেও কহুর করে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ ভীষণ ব্যস্ত কুমার বাহাদুর। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু রয়েছেন জনকয়েক। আজ আর রামকান্তর মতো চাটুকোরের প্রয়োজন নেই।...

রামকান্ত নিজ থেকেই “কাল অসবো হুজুর” বলে চলে আসে। অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওতে বিরক্তির কারণই বাড়বে। না না, ভয়ের কিছু নেই। এইতো সবে এলেন। পথের ক্লান্তি বলেও তো একটা কথা আছে। তা'ছাড়া সঙ্গে বন্ধুজন রয়েছেন। এর চেয়ে কি আর খাতির করতে পারেন? প্রসন্নভাবেই তো কুশল জিজ্ঞেস করলেন। নিজের মনেই একথা সেরে কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর দুর্গার কাছে হাজির হয় রামকান্ত।

বদার আগে নিজেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে থাকে, তোমার কপাল খুলল বউ-গিন্নী। লক্ষ্য করেছে বোধ হয় কাছারির ঘাটে বোট লেগেছে?

দুর্গা ঘাড় কাত করেই সমর্থন জানায়। ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি।

রামকান্ত গদগদ হয়েই বলতে থাকে, বলেছিলাম না, দুঃখ কারো চিরদিন থাকে না। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকলে উদ্ধার তিনিই করবেন।

ভগবান তো আছেই। কিন্তু আপনেই তার উপলক্ষ। আপনে না দেখলে
ক্যারা আমারে বাঁচাইত, দুর্গা উত্তর করে।

না না, আমি কে? তোমার বরাতেই সব হচ্ছে। কাল কুমার বাহাহুর
যেতে বলেছেন। আশা করি কালই সব ঠিক করে ফেলতে পারবো।

হ্যা ভাবনা আপনার। একটু বহন, আমি তামুক ভইরা আনি।

না থাক, বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন উঠি।

তা কি হয়? বালো একটা খবর আনলেন মিঠাই খাওয়াইবার না অয় না
পাল্লাম, তামুক ছিলুমও কি খাওয়ামু না।

কিন্তু ওরা যে আবাব সব খোল করতাল নিয়ে বসে আছে, রামকান্তর কেন
যেন আজ একটু আদর খেতে ইচ্ছে হয়।

এক ছিলুম তামাক খাইতে আব কত দেরি অইব! আনন্দ নতুন তামুক
মাথচে, খাইয়া ছাহেন, বলতে বলতে উঠে যায় দুর্গা।

রামকান্ত খানিক একা একাই আকাশকুম্ভ ভাবতে থাকে।

ভঁকোর মাথায় কন্কে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে খানিক পরেই ফিবে আসে
দুর্গা।

রামকান্ত বোধহয় আকাশে সহসা পূর্ণিয়ার চাঁদ দেখে। তাড়াতাড়ি হাত
বাড়িয়ে ছ কোটা নিয়ে বলে, বউ-গিন্নী, ময়নাব বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলো।

দুর্গার পুরোনো ক্ষতটা হঠাৎ কেউ যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘশ্বাস
ছেড়েই উত্তর করে, তাইত দিবার গেচিলাম ঠাকুরমশায়। কিন্তু কপালে সইল
কই?

প্রভু মঙ্গলময়! তাঁর লীলা-খেলা সব সময় আমবা বুঝে উঠতে পারিনে।
যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর দেরি করো না, কথকঠাকুরের কণ্ঠ মুখর
হয়ে ওঠে।

দুর্গা বলে, এহন ত কিছু করনই যাইব না! কাল অশুচ (অর্শোচ) না
গেলে—

মেয়ের বিয়ে কাল অর্শোচের মধ্যেও হতে পারে, মুখ থেকে কথা কেড়ে
নিয়ে বাধা দেয় রামকান্ত।

না ঠাকুরমশায়, হ্যা আমি করুম না। এমনেই ত বালো নাই তাতে
আবার চৈন্দ পুরুষের মন্নি কুড়ামু কোন ভায়ায় (ভরসায়)।

রামকান্ত যতখানি এগিয়েছিল ঠিক ততোখানিই পেছবার চেষ্টা করে, না—

তা এই বলছিলাম কি তোমার যখন মত নেই তখন অশৌচ মিটে গেলেই করে। কিন্তু তারও আর বেশী দেরি কোথায়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আশীর্বাদ করেন তাই যান যায়। এহন ত কোন দিক দিয়াই সম্ভব না। পাট উঠলেই না কতা।

রামকান্ত আবার একটু উৎসাহিত হয়। জোরে একটা স্থখটান দিয়ে উত্তর করে, তা তুমি যদি মত করে তা হলে টাকার জঞ্জ কিছু আটকাবে না। ও দু'শই বলো আর পাঁচশই বলো কুমার বাহাদুরকে যা বলবো তাই হবে!

টেকা ছাড়াও মঙ্গিল আছে। নিশির বাপেরে ত জানেন, অশুচ না গেলে হয়-ই কি রাজী অইব?

রামকান্ত বলে, বল তো একবার বলে দেখতে পারি।

না না, গুবন্দশার বছরে আমি আর শুব কাম করবার চাই না। আশীর্বাদ করেন, বছরডা বালোভাবে ঘুরক।

তবে থাক। এখন উঠি তাহলে। গলার স্বরটা বেশ একটু শুষ্ক মনে হয় রামকান্তর।

দুর্গা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হাঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে বাখে। আঁচল গলায় জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে রামকান্তকে।

স্বযোগের অবহেলা কবে না রামকান্ত। পিঠের ওপর হাত বেখেই আশীর্বাদ করে। দুরাশার ঝড় বইতে থাকে বৃকের ভেতরে।

॥ ২১ ॥

চরফুটনগরের সমৃদ্ধি যেন দিন দিন ফেঁপে উঠছে। মাত্র দিন কয়েকেব কথা—এরই মধ্যে নতুনের ছোপ পড়েছে চরে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকলক করছে সবুজ পাটের চারাগুলি। এক এক গাছা-স্বর্ণ-ছিলকারই প্রতীক ওরা। চরের চাষীর তো পেঁয়াবারো। খড়ের চালার পরিবর্তে চেউ-টিনের ঘর উঠছে সার সার। আর দিনকতক পরে হয়তো ওরাই হবে আসল জমিদার। গাড়লগুলি আছে শুধু নিজের কোলে ঝোল টানতে। একটু যদি বুদ্ধি থাকে। সামান্য হয়তো দু'পাঁচ টাকা পকেটে পুরে গোটা চরটাকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর ওদেরই বা দোষ কি। সিদ্ধক খোলা পেলে কে না চুরি করে। এদিক-টায় যে নজরই দেওয়া হয়নি। আরো বছর ধানেক না এলে তো সবই উজাড়

কর দিতো দীপ্ত বৈরাগী আর করিম ফকিরের কাছে। পশ্চিম অঞ্চলের মতো যদি গোটা চরটা বিলি থাকতো তাহলে এক চর থেকেই লাট-কিস্তির অর্ধেক উঠে আসতো। হতভাগারা যার খায় যার পরে তারই সর্বনাশ করলে।... বাখাল আর বিকাশের ওপর ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু মুশকিল, প্রকাশ্যে কাকেও কিছু বলাব উপায় নেই। সেরেস্তায়, অলি-গণি ওদের হাতের মূঠোয়। এখন কিছু করতে হলে দুটোকে হাতে রেখেই করতে হবে।...গড়গড়া টানতে টানতে ইতস্ততঃ ভাবছিলেন রমেন্দ্রনারায়ণ, রামকান্ত প্রবেশ করে। প্রভুকে চিন্তান্তিত দেখে প্রণাম ঠুকে নীরবেই অপেক্ষা করতে থাকে। রমেন্দ্রনারায়ণ প্রথমটা ঝাঁজিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ রামকান্তের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার বীজ আবিষ্কার করে ফেলেন। চরকে পাকে পাকে বাঁধতে হলে রামকান্তের সহায়তা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এরকম চাটুকার হাতে থাকলে সবকিছুই গুছিয়ে ওঠা সম্ভব। তাই গড়গড়ার নলটা হাতের মূঠোয় রেখে উদাত্ত কণ্ঠেই সম্ভাষণ জানান, আরে এসো— এসো ভট্‌চায়। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

শংকায় হাঁপিয়ে উঠেছিল রামকান্ত—সম্ভাষণে খাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। দুর্গাকে নিশ্চিন্ত থাকতেই আশ্বাস দিয়ে এসেছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্নই। কুমার বাহাদুর বেশ খোশ মেজাজেই আছেন। সব চেয়ে নিরাপদ, উনি নিজেব পরটিতে একলা আছেন। সেরেস্তায় থাকলে কান ভাঙানি দেবার লোকের অভাব ছিল না। তাছাড়া অপমান করলেও লোক জানাজানি হয়ে যেতো। সব দিক থেকেই নিরাপদ কাছারির এই স্বকীয় ঘরটি। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা কারো হুকুম না নিয়ে প্রবেশ করার উপায় নেই। বেটা মুসা সিং দোরো ছিল না বলেই ঢুকতে পেরেছি। অর্ধচন্দ্র না দিলেও খেঁকিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বরাত জোরে আজ-অভ্যর্থনাই পাচ্ছি। তা করতেই হবে বাবা, বেরোবার মুখে যে শেয়াল বাঁ-হাত করে বেরিয়েছি। খুশীতে গদগদ হয়েই মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে রামকান্ত। চেয়ার ছাড়া এ ঘরে ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা নেই। এখানে যারা আসে তারা পদমর্ষাদা নিয়েই আসে। অগ্রদ্বিন ভয় ভয় করলেও আজ আর ভয় হয় না রামকান্তের। উল্লসিতভাবেই জিজ্ঞেস করে, দেশ গাঁয়ের খবর সব ভাল তো শ্রার ?

রমেন্দ্রনারায়ণ হাসতে হাসতেই উত্তর দেন, আমাদের আর ভালো কোথায় হে ভট্‌চায়, পোয়াদারো তো এখন তোমাদেরই।

কি যে বলেন স্মার !

কেন, খারাপ কিছু বলছি নাকি ? খাসা এক একটি শিষ্য তোমার । নৈবেদ্যে চিনিব মতো ওদের মাথার ওপর নিশ্চিন্তে বসে আছি । তোমার মতো সুখী আবার কে হে ?...কথা শেষ করে হাসতে হাসতেই নলটা আবার মুখে পোরেন বমেন্দ্রনারায়ণ ।

ক্ষিকে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘবময়-ছড়াতে থাকে । মনোহারী গন্ধে জ্বিত জল আসে রামকান্তর । এমন আমেজী নেশা কতকাল ভাগ্যে জোটেনি । কোলকাতার জীবনে নিজস্ব একটা মোরদাবাদী গড়গড়া ছিল ওব । অগ্ন সময় ফুরসত না হলেও শোবার আগে বেশ খানিকটা মোতাত হতো । গয়া, বিষুপুুর, আনারপুর যেদিন যে জায়গার জিনিসে অভিলিচি । এখন তো অতীতের জাবর কাটা ছাড়া আর কিছুই নেই ।...অতিকষ্টে বসনাব বাশ টেনে জবাব দেয় রামকান্ত, স্বথ তো কত ! খেইখেই করে নাচো আর হবি-মটব খাও ।

বল কি হে, শুধু হরি-মটব ! আর কিছুই না ? শুনেছি তো—না থাক । হরে, ভট্টচাষকে তামাক দে । বমেন্দ্রনারায়ণ কি যেন একটা ইঙ্গিত করতে গিয়েও চেপে যান । প্রকাশে শুধু রামকান্তব তামাক ললুপতারই কয়সালা করেন ।

তামাক দানের আদেশ হওয়ায় মনে মনে উৎফুল্ল হয় রামকান্ত । কুমার বাহাদুর তাহলে মনের কথা বুঝতে পেরেছেন । কিন্তু ওটা কি বলতে চাইলেন ! দুর্গার সম্বন্ধেই কি কিছু ইঙ্গিত করলেন । তবে তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন ।...না না, তা কি করে হতে পারে ! যে কথা চরের কেউ জানে না সে কথা কুমার বাহাদুর কি করে জানবেন ? ওটা গুর স্বাভাবিক হাসি ঠাট্টা । ক্ষণেকের দুশ্চিন্তা বৃদ্বদের মতোই মিলিয়ে যায় । তামাকেব প্রত্যাশায় বেশ চাকা হয়ে ওঠে রামকান্ত ।

যথাসময়ে হরি এসে বেশ বড় কন্ধের এক কন্ধে তামাক দিয়ে যায় । হুকোটা অবশ্য গড়গড়া নয়—নারকেলের । তা হোক, রামকান্তর ওতে কিছু এসে যায় না । আসল মাল তো ঠিক আছে । খাঁটি বিষুপুুরীই হবে—খাসা গন্ধ । মনের আনন্দে হুকো টানতে থাকে রামকান্ত ।

রমেন্দ্রনারায়ণ কথার মোড় ঘোরান, কিছু বলবে নাকি হে ভট্টচাষ ?

রামকান্তর উত্তরের আগেই হরি এসে জানায়, দু'জন আমিন কাছারি ঘরে অপেক্ষা করছে হজুর ।*

রামেন্দ্রনারায়ণ ওদের এঘরে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন। হরি ফিরেই
যাচ্ছিল। আবার বাধা দেন, না থাক, ওদের বসতে বল, আমিই যাচ্ছি।

রামকান্তর মনের আনন্দ উবে যায়। বিষ্ণুপুরীতেও যেন আর আমেজ
নই। দিব্যি নিরিবিলিতে পাওয়া গিয়েছিল কুমার বাহাদুরকে। আর কিছুটা
সময় পেলেই আসল কাজ হাসিল হয়ে যেতো। যা সুন্দর পরিবেশ ছিল
কিছুতেই না বলতে পাবতেন না। এখন আবার কে এসে মেজাজ বিগড়িয়ে
দেয় তার ঠিক কি? বেশ জ্বরে জ্বরে হাঁকো টানছিল, গতি ক্রমশঃ টিলে
গয়ে আসে।

রামেন্দ্রনারায়ণ নলটা মুখ থেকে নামিয়ে উঠে দাড়ান। বলেন, চলো হে
ভট্টচাঁষ, কাছারিতে বসেই তোমার কথা শোনা যাবে'খন।

অগত্যা রামকান্তকেও উঠতে হয়। দুশ্চিন্তাব গুরুভার ললাটের বলিরেখায়
কুটে ওঠে।

রামকান্ত চূপচাপই কাছারির এক কোণে এসে বসে। রামেন্দ্রনারায়ণ
আমিনদের সঙ্গে যথারীতি নিজের কাজ করে চলেন। রাখাল বিকাশও নিজ
নিজ দায়িত্ব মতোই সাহায্য করে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমিনদের কাজ
শেষ হয়। পাওনা-গণ্ডার যোল আনা বুঝে পেয়ে মনের খুশীতেই উঠে
পড়ে দু'জনে। তা খাতির মন্দ হলো না। চা, বিস্কুট, মিষ্টি-মুখ যা হলো তাতে
এবেলার মতো নিশ্চিন্ত! রামেন্দ্রনারায়ণও মহাখুশী। এত সহজে কাজ মিটবে
আশা করেননি উনি। রামকান্ত বসে বসে ঝড়িকাঠ গুণছিল। ওকে চাক্ষা
করতেই হাঁক ছাড়েন, তুমি যেন কি বলছিলে ভট্টচাঁষ?

রামকান্ত বিব্রত বোধ করে। দশজনের সামনে যে কুমার বাহাদুর
পূর্বকথার জের টানবেন তা ও ধারণা করতে পারেনি। তাই আমতা আমতা
করেই জবাব দিতে চেষ্টা করে, না—কথা আর কি—মানে—

একান্ত গোপনীয় কি?—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রামেন্দ্রনারায়ণ
শুধোন!

শুক হাসি হেসেই রামকান্ত বলে, কি যে বলেন স্ত্রার! নায়েবমশায় আর
বিকাশবাবুর সামনে বলবো তাতে আবার গোপনীয়তার কি থাকতে পারে।

না, চলো ও ঘরেই যাই। আমার আবার 'কাইলটা' দেখা হয়নি; অবস্থা
বুঝে পরিবেশটা হাক্সা করে দেন রামেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। উঠতে গিয়ে রাখালের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়।

নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তির্ঘণ দৃষ্টি হানছিল রাখাল। চোখোচোখি হতেই জ্র কুঁচকিয়ে সেরেস্তার খাতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অপমানে মগজের পোকাগুলি কিলবিল করে ওঠে। অবশ্ব এসব ছোটখাটো মান অপমান চেপে যাওয়াই ওদের পদ-রীতি। পোকাগুলি এক লহমায় যেমন ঝংকার দিয়ে উঠেছিল এক লহমাতেই আবার তেমন শান্ত হয়। ঈষৎ হাসিই খেলে নিয় ওঠে। ও জানে, কুমার বাহাদুর যত ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ই করুন না, চরের কোন খবর ওর কাছে চাপা থাকবে না। চামা-ভুষা মাত্রেই জানে, এ শর্মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু হবার নয়! উনি তো তুচ্ছ, স্বয়ং বৃটিশ সরকারেরও ক্ষমতা নেই ওদের অধিকারে হাত ছোঁয়ায়। এ বাবা তাকেয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানা আর মদ মেয়েমানুষ নিয়ে ফটিনটি কবা নয়। রীতিমতো মগজের ব্যাপার। রাখালের মনে মনে হাসিই পায়।

বাখাল আর বিকাশ কি ভাবলে সে তোয়াক্কা বমেন্দ্রনাথায়ণ করেন না। পুলিশ আর লাঠি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। প্রজাই হও আর নাঃ্যব গোমস্তাই হও গুঁতোব চোটে সব ঠিক। এতদিন দেখিনি—সিঁপ কেটেছো। এখন আর চালাকিটি চলছে না। রাখাল বিকাশকে পবোয়া না করে রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় এসে নিজেব ধবে বসেন বমেন্দ্রনাথায়ণ। রামকান্তকেই বাজিয়ে দেখবেন, কতদূর এগোনে' যায়। সম্ভব হলে চুপি চুপি নিজেই এর্গয়ে যাবেন। গাড়লদের যতদূর এড়িয়ে চলা যায় ততোই মঙ্গল। ওদের দৃষ্টি তো শকুনের দৃষ্টি। কেবল পকেট ভারী কববাব তাল।...

মনিবের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অন্তরে ঘা লাগলেও বাহ্যিক সামলে নেয় রাখাল। কিন্তু মনব আগুন বেড়েই চলে। স্টেটের কি এমন ক্ষতি করেছে ওরা। চর তো এতদিন কাছিমের পিঠের মতো সামান্য একটা বালির টিপি ছিল। নীতে জাগতো বর্ষায় তলিয়ে যেতো। বুদ্ধ করে দীঘ্র আব করিমকে বিলি-ব্যব'গা দিয়েছিল বলেই না আজ শস্ত্রাামলা এক উবর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কই, কতবার তো ঘাটে পান্‌সী ভিড়িয়ে হৈ ছল্লোড় করেছেন। কিন্তু কোনদিন তো কিছু করতে দেখিনি। বাড়ী ভাতে কাটি দিতে সবাই পারে। ছুটো পয়সাই না হয় খেয়েছি, কিন্তু ও চর গড়লে কে? মাথুষ তো আর দৈবজ্ঞ নয় যে ভূত ভবিষ্যৎ সব জানবে। আর পয়সার কথাই যদি ওঠে

তাই বা এমন কি। একজন পদস্থ নায়েব যদি বছরে তিন শ টাকা বেতন পায় তবে সে চুরি করবে না তো বসে বসে আঙুল চুষবে নাকি। তাছাড়া চুরিই বা একে বলবো কেন? এতো মগজ খাটিয়ে নেওয়া রীতিমতো পারশ্রামিক। নজরানা, সেলামী, প্রণামী নিয়ে ওরা কোন ধর্ম পুস্তকের কাঙ্ক্ষ করেন?...রামেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্ত উঠে গেলে আপন মনেই গজরাতে থাকে রাখাল।

সহকর্মী বিকাশ পাশে বসেই খাতা লিখছিল। সেও নিজেকে অপমানিত বোধ করে। আসর ফাঁকা পেয়ে রাখালের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, তামাসাটা দেখলেন তো দাদা?

হঁ, ব্যাপার বেশী সুবিধের ঠেকছে না। ভট্টচাষ দেখছি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছাড়ি খোঁরাতে ব্যস্ত। একটু কড়া নজর রেখো, হিসেবের খাতায় নজর রেখেই জবাব দেয় রাখাল।

অতো ভাবছেন কি। একটু সবুর করুন না, ও বোয়ালের ডিম বোয়ালেই ভাঙবে। কথায় বলে না, 'উই পোকাক পাখা হয় মরিবার তরে!' মুচকি মুচকি হাসতে থাকে বিকাশ।

মারণ অস্ত্র আমার হাতেই আছে হে। তবে কি জানো—না ন', যা ভাবছে ব্যাপার অতো সোজা নয়। দেখছো না, দুদিনেই কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ভট্টচাষটা? আমার তো মনে হয়, নিগুচ কোন রহস্য আছে এর ভেতরে।...

ও যতো রহস্যই থাক, দাদার চোখে ধুলো দেবার সাধ্য কারো নেই।

হে হে হে, কি যে বলো, আমরা হলেন মুখ্য-স্বখ্য মাহুদ, তেনাগো সঙ্গে কি আমরা পারি।

চুপ করুন দাদা, হরে বেটা আসছে।

হঁ, ও শালা তো আবার পিয়ারের চাকর। সব কথা ওর বাপের কাছে গিয়ে একুনি লাগাবে।

রাখাল বিকাশ মুখ বুজেই কাজে মন দেয়। হরি এসে আমিনদের এঁটো কাপ ডিস নিয়ে চলে যায়।

রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় আপিস ঘরে এসে বসাই ঠিক ছিল। কিন্তু সামান্য এই পথটুকু আসতেই মত বদলে ফেলেন রামেন্দ্রনারায়ণ।

আপিস ঘরে না বসে সোজা এসে শয়ন ঘরেই ঢোকেন। সমস্ত অন্তঃপুর খাঁ খাঁ করছে। একা হরি ছাড়া আর কেউ নেই। খাওয়া, থাকা, শোয়া, সবই তো গ্রীনবোর্টে। বাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো এলেই এ ঘর-দোরে পা পড়ে। খেয়াল-খুশি হলে এককণ্ঠে কোন কোন সময় রাত কাটান। আসবাব পত্রের বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই! খানকয়েক যা' আছে সবই আভিজাত্য পূর্ণ। ঘরে এসে একটা ডেক-চেয়ারেই গা এলিয়ে দেন রমেন্দ্রনারায়ণ। রামকান্ত থ বনে যায়। কি করতে চান কুমার বাহাদুর ওকে নিয়ে! শেষ পর্যন্ত কি অর্ধচন্দ্রই আছে নাকি অদৃষ্টে!...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল রামকান্ত। রমেন্দ্রনাথবায়ণ সম্ভাষণ জানান, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে, বসো?

রামকান্ত না বলতে পারে না। জড়সড় হয়ে একটা মোড়ার ওপর কোন রকমে বসে পড়ে।

রামেন্দ্রনারায়ণ হবার চাড়েন হরির উদ্দেশ্যে।

ডাক কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হরি ছুটে আসে। ইঙ্গিত মাত্র আলমারি খুলে পুরো একটা বোতলই বাব করে। বিলেতী মদ। সূদৃশ লেবেল আঁটা...তকতক করছে রং। না, রামকান্ত হয়তো দম বন্ধ হয়েই মরবে আজ। পূর্বস্মৃতিই মনে পড়ে ওব। শহর জীবনে কতদিন আশ্বাদন করেছে এ চীজ। কি অমৃতই না সাগরপারের মানুষ তৈরী করতে জানে। জিভে ঠেকাতেই দেহ মনে নেমে আসে সজীবতা। এই তো আসল দেব-ভোগ্য জিনিস। এ ক'বছর চবে তো শুধু হরি-মটর চিবিয়েই কাটছে। ভাগ্য—ভাগ্য, মাহুঘ ভাগ্যের দাস।...জিভেব জল সম্বরণ করা দায় হয়ে ওঠে রামকান্তব পক্ষে।

হিসেব মতো হরি দুটো গ্লাসই বার করে। স্বচ্ছ জাপানী কাঁচের গ্লাস। এই গ্লাসেই এ রকম স্বধা মানায়। সোডার বোতলটা খুলতেই রামেন্দ্রনারায়ণ ইঙ্গিত করেন। হরি বেরিয়ে যায়। একটু সোডা মিশিয়ে প্রথম পাত্র টেনে নেন উনি। দিলটা চাঙা হয়ে ওঠে। রামকান্তর ইচ্ছে হয় ছুটে পালায় এখান থেকে। রমেন্দ্রনারায়ণ সবই বোঝেন! বুঝেই স্বাগত জানান, কি হে ভট্টচাষ, ফে:য় চেয়ে দেখেছো কি? চলবে নাকি ছ'চার পাত্র?

ছ'চার পাত্র—ছ'চাব পাত্র কেন গোটা বোতলটাই ওর দরকার। কিন্তু চরের বৈরাগীগুলোই যে মাঝ পথে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকালে খালি পেটে টানলে ধকল সামলানো দায় হয়ে উঠবে! তা'ছাড়া রাখাল গোসাঁইয়ের হাবভাবও স্ববিধের ঠেকছে না। প্যাচ কষা মাথা, আড়ে-ঠারে কথাটা দীর্ঘ

বৈরাগীর কানে দিলেই সর্বনাশ। একদিন ফুঁতি করতে এসে দশ দিনের ভাত বন্ধ। চরে হয়তো আর থাকতেই দেবে না।...অস্ত্রধারী মন লাফাতে থাকলেও বাহ্যিক তেমন উৎসাহ দেখাতে পারে না রামকান্ত।

ওকে নিরস্তুর দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ পূর্ব কথার জের টানেন, কি হে, সাড়া শব্দই দিচ্ছ না যে? নাও, টেনে নাও এক পাত্র, দ্বিতীয়বার নিজের শ্বাস পূর্ণ করতে গিয়ে দুটো শ্বাসই পূর্ণ করেন।

রামকান্ত দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, না, আমি ভাবছিলাম—সকাল বেলা—স্নান আফ্রিক কিছই হয়নি—

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেন, তুমি আশায় হাসালে হে ভট্টচাঁয়। এ তো হলো মা কালী'ব নিত্য ভোগের সামগ্রী। ইচ্ছে হয় নিবেদন করে নাও।

না শ্রার, এখন থাক।

বুকেছি, বৈরাগীদের ভয়। তা কিছু ভেবো না। বাগান থেকে তুলে এনে গোটাকয়েক নেবুপাতা চিবিয়ে নিয়ো, কেউ টের পাবে না। নাও, আরস্ত করো, রমেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয় পাত্র টানতে থাকেন।

রামকান্তও আর ভাবতে পারে না। মায়ের নাম স্মরণ করে পুরো শ্বাসটাই এক দমে টেনে নেয়।

সাবাস, তুমি তো দেখছি পাকা খেলোয়াড় হে ভট্টচাঁয়। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হয় আবার দু'জনে নিঃশেষ করে।

নেশায় দু'চোখ ঝিমিয়ে আসে রমেন্দ্রনারায়ণের। টেনে টেনেই বলতে থাকেন, এবার বলহে ভট্টচাঁয়, কি তোমার বক্তব্য।

রামকান্ত এত সহজে কাবু হবার নয়। তাছাড়া ওর অভ্যাস, নেশা হলে ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসে থাকা। একটা উদ্গার তুলে সবিনয়েই জবাব দেয়, বক্তব্য আর কি শ্রার, মধু মণ্ডলের বেটার বউ আপনার কাছে আরো কিছু ঋণ চায়।

আরে ছো ছো, তোমার তো হে রসবোধ নেই ভট্টচাঁয়। আর একটু হলে গোলাপী নেশাটাই মাটি করেছিলে। ও সব চাষাভূষার মুখে ঝাঁটা মারো, ভাল কোন মালের সন্ধান থাকে তো বলো—রমেন্দ্রনারায়ণ ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

উত্তর শুনে রামকান্ত নেশার মুখেও আঁৎকে ওঠে? রক্ষা দুর্গাকে নিয়ে

টানটানি করছেন না। তা হলেই তো হয়েছিল আর কি। কাজ নেই বেশী খাটিয়ে। দুর্গাকে সোজা গিয়ে বলা যাবে, এত কম টাকা দিতে কুমার বাহাদুর রাজী নন। বেশী নাও তো ব্যবস্থা হতে পারে। টাকা ধার পেতে ওর কোন অসুবিধা হবে না। দাঁতকে বললেই সে নিতাই সা'র কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারবে। হয়তো এতে ও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। তা হোক, কুমার বাহাদুরের পাল্লায় পড়লে তো ঠিকেই তুল হয়ে যাবে। না না, দুর্গকে কিছুতেই কুমার বাহাদুরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো যায় না। আমারই আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি সম্ভব হয় নিজেই চেষ্টা করবো। মাত্র তো শ'তিনেক টাকা। যেভাবে খাতির করছেন দিলে দিতেও পারেন... পর পর পাত্র টানতে টানতে ভাবতে থাকে রামকান্ত।

পাত্রের পর পাত্রে দু'জনেই বৃন্দ। রামকান্তের শক্তি নেই উঠে বাড়ি যায়। রমেন্দ্রনারায়ণও নাওয়া খাওয়া ভুলে যান। চাট হিসেবে সামান্য যা ভাজা-ভুজিই পেটে পড়েছে। বিকেলে চারটে নাগাদ ঘোর কাটে। সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে থাকে। এখন দরকার স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে গ্রীনবোটে হাওয়া খাওয়া। হরি বাড়ির ভেতরেই স্নানের জল দেয়। একে একে দু'জনেই বালতির পর বালতি জল ঢেলে কিছুটা সস্ত হয়।

গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত আকাশ। সূর্য ডুবুডুবু। আবীর মাখামাখি দিগ্‌ বলয়। মিষ্টি আমেজ বাতাসে। নতুন জলে একটু একটু কবে ফেঁপে উঠছে বংশী ধলেশ্বরী। শ্রোতের বেগে সাড়া জাগছে। রামকান্তকে সঙ্গ করে গ্রীনবোটে এসে ওঠেন রমেন্দ্রনারায়ণ। চিরাচরিত অভ্যাগ মতো ছাদের ওপর এসেই বসেন ডেক চেয়ারে। লেজুড়টির মতো রামকান্তও একটি মোড়ার ওপর। মাঝিরা দাঁড় টেনে খানিক উজাতে থাকে। তারপর পাড়ি দিয়ে এসে নোঙর ফেলে বৈরাগীর-খালের মুখে। রামকান্তই ইচ্ছে নয় এভাবে এখানে অপেক্ষা করে। বেশ তো চলছিল মাঝ দরিদ্রা দিয়ে। ঘুরে ফিরে হাওয়া খাওয়াতেই তো আনন্দ কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণের ঐ এক বৌক, বেড়াতে বেরোলেই খালের মুখে এসে দাঁড়াবেন। এ সময়ে চরের ঝি বউরা সান্ধ্য জল নিতে ঘাটে আসে। কে জানে, ময়না না এসে দুর্গাও আসতে পারে। কিন্তু করবে কি ও। কুমার বাহাদুরকে তো আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই। এখন ভালয় ভালয় সন্ধ্যাটা উত্তরোলেই ভাল। ভাগবত পাঠে যাওয়া আজ তো হতেই পারে না। সারা দিন ভাত খাওয়া হয়নি। অবসাদে ঢুল আসছে। এখন

চান্দা হতে হলে চাই কিছু ভাল খাবার ও সঙ্গে আবার ছ'চার পাত্র। তা বোটের হেঁশেল থেকে তো বেশ মিষ্টি গন্ধই ভেসে আসছে। অল্পপানের ক্রটি হবে না নিশ্চয়। খানদানী মানুষ, এটুকু জানবেন বই কি।...পাশে বসে রামকান্ত আপন মনেই ইতস্ততঃ ভাবছিল। হঠাৎ ঘাটের দিকে চোখ পড়ে। ও কে! দুর্গা না! এ সময়ে ও কেন জল নিতে এসেছে। সারাদিন এত জল দিয়ে কি হয় ওদের? শুধু তো তিনটে প্রাণীর সংসার। এ সময়ে ঘাটে না এলেই কি নয়! না না, আজ তো সোমবার, বাবার উপোস। অথের জলে ব্রত হবে না। কিন্তু ঘাট যে একেবারে ফাঁকা। আব একটু বেলাবেলি এলে কি দোষ ছিল, রামকান্ত বড় অস্বস্তিতে পড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ নীরবেই বসে বসে গড়গড়া টানছিলেন, সহসা মুখ খোলেন। রামকান্তকে লক্ষ্য কবেই শুধোন, মালটি কে হে ভট্‌চাষ?

দুর্গা পেতলের কলসীটা চকচকে করে মেজে বুক-জলে এসে নামে। খালের মুখ কিছুটা দূরে হলে ও ঘাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জায় তাই বোটের দিকে পেতন ফিরেই গলা পয়স্তু ডুবে কাপড় কাচতে থাকে। গোধূলির আবীর রাগে ওর গৌরবণ বাহু যুগল দেখে মনে হয় ছুটো রাজসংসীই যেন অনিরত ডুবছে আর উঠছে। কাপড় কাচা হয়ে যায়। এরপব মাত্র একটা ডুব। ভিলে কাপড় সর্বান্দে জড়িয়ে কলসী কাঁখে নাট থেকে উঠতে যায়। রামকান্তর মস্তর এড়ায় না। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। মনোহিনীই যেন রূপ-সায়র থেকে নেয়ে উঠলো। রমেন্দ্রনারায়ণেব প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারে না। কাছে থেকেও যেন শুনতে পায় নি কি উনি জিজ্ঞেস করেছেন।

রামকান্তকে নিরস্তর দেখে পাশ ফিবে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন রামেন্দ্রনাবায়ণ, মুছাঁ গেলে নাকি হে ভট্‌চাষ?

আজ্ঞে না, আমি স্হাস্ত দেখছিলেম। কি অপূর্ব রং বৈচিত্র্য, হকচকিয়ে উঠে উত্ত্ব করে রামকান্ত।

স্হাস্ত দেখছিলে না স্হ্যমুখীকে?—পাশটা প্রশ্ন করেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

কি যে বলেন শ্রার!—রামকান্তর মুখে শুক হাসি।

না, আপাতত বিশেষ কিছু বলছিনে। শুধু জানতে চাই—স্নান করে যাচ্ছে ও মালটি কে?

রামকান্তর বৃকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। দ্বী জাতির সম্বন্ধ রেখে কথা বলতে

জ্ঞানে না লম্পট !... কিন্তু উপায় নেই। রাখাল গোসাঁই-ই হাত পা বেঁধে
ফেলেছে। টাকার জন্ত এখন তো বেশ কড়া তাগাদাই শুরু করেছে গোসাঁই।
কুমার বাহাদুর ছাড়া আর আশা কোথায়। যত অপমানেরই হোক গুর মন
যুগয়েই চলতে হবে।...অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবিনয়েই উত্তর দেয় রামকান্ত, ওর
কথাই তো বলছিলেম শ্রাব। মধু মণ্ডলের বেটার বউ ? কিছু কর্জ চায়।

তাই নাকি হে ! তোমার তো দেখেছি পোয়াবারো, মুচকি মুচকি হাসতে
থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে যেন জল বিচুটিব চাবুক পড়ে ! তবু শুধু হাসি হেসেই
সমতা বক্ষা করে, কি সে বলেন শ্রাব। খব ভালো মেয়ে ও।

খব ভাল না হলে কি আর তুমি ওর ভালব জন্ত এত আঁকুপাক কবছা !
যা'হোক, কত টাকা চাই ওব, আমি দেবো।

টাকা তো চাই তিন শ' এখন আপনি যা দেন।

তিন শ' বড্‌ডা বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি ?

কিন্তু ওব কমে যে পাট চাষ উঠবে না শ্রাব।

বেশ, দেবো টাকা। কাল ওকে বোটে আসতে ব'লো।

বোটে আসা কি ওব পক্ষে উচিত হবে শ্রাব ?

তোমার তো দেখছি গভীর নীতিজ্ঞান হে ভট্টচাষ। বেশ, তাহলে না
আসবে।

যদি বিশ্বাস কবেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই শ্রাব।

বেশ ব'লো।

টাকাটা আমার হাতে দেবেন, আমি ওকে দিয়ে আসবো।

কৌশলে কাজ সারতে চাও তো ?

আপনার চোখে ধুলো দেবার স্পর্ধা আমার নেই শ্রাব। তমসুক্রে আমি
ঠিকই সই করিয়ে আনবো।

শুধু মই, আব কিছুই না ? ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসতে থাকেন
রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে আবার জ্বালা ধরে। মনে মনেই ভাবতে থাকে, তুমি
যা ভাবছো শয়তান ও সে ধরনের মেয়ে নয়। দুর্গার রূপ দেখছো, কিন্তু হাতের
গাঁড়া দেখোনি ! মরবে—ছটফট করেই মরবে।...প্রকাশে বলে, দুখিনী নারী,
আপনাকে আর কি দিতে পারে ?—বুঝেও যেন বুঝে না রামকান্ত।

তুমি দেখছি এখানেও ভাগবত আউড়াতে শুরু করলে হে। যাক, টাকা যখন দিচ্ছি...তখন স্নান উত্থলের ভার আমার ওপরেই থাক। কাল সকালে কাছারিতে এসো—ব্যবস্থা করে দেবো।

কাছারিতে—

ভয় নেই, আপিস ঘরে বসেই সব ঠিক কবে দেবো! কেউ টের পাবে না।

জানি ছজুরের দয়ার শরীর। বেচারা বেঁচে যাবে স্মার। বড্ডো ঠেকায় পড়েছে। এখন তাহলে উঠি ?

বলো কি হে, খাবে না? ভাল খাবাব আছে কিন্তু।

না স্মার, শরীরটা বড্ডো খারাপ লাগছে। তাছাড়া জানেনই তো ভাগবতের আসরে একবার না গেলে নয়!

ভাগবতের আসরে না ভগবতীর আসরে হে ?

আপনি বড্ডো লজ্জা দিতে পাবেন স্মার।

বলো কি হে, এখনো দেহে লজ্জা আছে। তা বেশ, এসো তাহলে।

রামকান্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মদের আব এখন ওব কোন প্রয়োজন নেই। মদের চেয়ে সেরা নেশা এইমাত্র কুমার বাহাদুর ওকে দিলেন। দুর্গাকে আজই গিয়ে খবরটা দিতে হবে। কাল সকালেই তো হাতে টাকা আসছে। কসাই নায়েবটার হাত থেকেও কালই মুক্তি মিলবে। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করা। ময়নাব বিয়েটা চুকে গেলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। কুমার বাহাদুরকে এ কটা দিন চাটুপাক্যে ভুলিয়ে রাখতে হবে। তারপর দুর্গা যদি সায় দেয় ছেড়ে চলে যাবো এ চর।...ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত। হাত বাড়িয়ে চরণ ধুলো মাথায় নেয় রমেন্দ্রনারায়ণের! তারপর খশীতে পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে।

রমেন্দ্রনারায়ণের মনেও খশীর বান ডাকে। একাকীই চরের দিকে চেয়ে চেয়ে শিশু দিতে থাকেন।

॥ ২২ ॥

পাঁচই আঘাট রথযাত্রা। বাছ পাট চরফুটনগর ও চরখল্লার চাষীরা মন্দ পায়নি। রথযাত্রায় শুভ সাইন হবে। প্রত্যেকেই অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত কেউ একগাছা পাটও বেচেনি। মাসের প্রথম দিকেই যখন শুভক্ষণ মিলছে..

তখন আর অদিনে-অক্ষণে বেচে ববাত খাবাপ কববে কেন। পাটের সেবা শুভক্ষণ বাখবে সাইদ। এ সময় কেউ কাউকে ঠকায না। ফড়েবাও মাপ-জোখ ঠিক রাখে। শুভক্ষণে ধাবের কথা তো কেউ মুখেই আনবে না। অনেক দায় দায়িত্ব গেছে তবু বখযাত্রার আগে কেউ পাটে হাত দেয়নি। বেশ ভাল ফলন হয়েছে এয়ার। বাছ পাটই বং, পদ, লম্বায় প্রায় গাছ পাটের সমান দেখাচ্ছে। চাহিদা থাকলে গত সনের তুলনায় এ সন অনেক বেশী দব পাওয়া যাবে। গত পাঁচ বছরের মতো এত ভাল ফসল এ অঞ্চলে ফলেনি। ঈশ্বর কবলে বক্রচোষাবা আব সুর্যোগ পাবে না। এই ওদেব শেষ কামড। টাকা প্রতি মাসে দু'আনা তিন আনা সূদ। কসাই ছাড়া ওদেব আব কি বলা যায়। নিক, ওদেব ধাটের কড়ি এই শেষবাবের মতো উপায় কবে নিক। চবের মাহুয আব সামনের সন থেকে ওদেব দোবে হাত পাততে যাবে না। ওদেব টাকা ওদেব গবেই ছাতা বববে। আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে চবের চানী। পলানের গস্তি দুটো আনকদিন থেকে একেজো হয়ে ঘাটে পচছে। বখে পাট বযে নেবাব ও ঢাটাই হলো সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। একটাতে যাবে পাট আব একটাতে চবের সব মাহুয। হাতাহাতি ধুয়ে পুঁছে গাব দিযে সকল মিলে আবাব সচল কবে তোলে গস্তি দুটোকে। কে বত মণ পাট নেবে তাব ফদ হয়। হাজাব মনী গস্তি। বাছ পাট আব এত কোথেকে হবে। বড জোব দু'শ আড়াইশ মণ। প্রযোজন হলে পাটের নৌকাযও জনকযেকাক য়েত হবে। সকল মিলে একত্রে যাবে। একসঙ্গে আনন্দ উৎসব কববে। চবময নতন কবে সাড়া জাগে।

বাছ পাট দুর্গাও মন্দ পায়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রমেন্দ্র-নাবায়ণের কাছ থেকে দু'শব পবিবর্তে মাত্র দেড়শ টাকা কর্জ কবেছে ও। বামকাস্তব কাছে সত্যি ওব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সূদ খবই কম। টাকা প্রতি মাসে মাত্র এক আনা। বাছ পাট বেচে নিঃসন্দেহে চাষের অগ্গান্ত খরচা মেটাতে পাববে। তাবপব আসল পাট বেচে এককালীন সমস্ত ঋণ শোধ করা যাবে ঠাকুব কবলে তা খুব পাববে।

এখন আব আশংকাব কিছু নেই। বামকাস্তব আলাপ-আচবণও দিন দিন বেশ ভদ্র হয়ে উঠছে। এক দিন ঠুঁকে ভুল বোঝাই হয়েছিল। নিয়মিত ভাগবত পড়া মাহুয—ঠুর কেন মতিভ্রম হবে। তবে মুশকিল হয়েছে কুমাব বাহাদুরকে নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে এসে খালের মুখে বোট বাধেন। ছাদের ওপর

ডক চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চেয়ে থাকেন। বউ-ঝিরা সকলেই এ নিয়ে কানাকানি করছে। মোড়লদের মধ্যেও কথাটা উঠেছে। কে জানে, কি থেকে কি হয়। চরে তো একমাত্র আমিই ওর টাকা নিয়েছি। কিছু হলে আমারই পোষ পড়বে। বেশ ছিল, এতদিন ময়নাই বিকেলের জল ভরতে আসতো। কিন্তু মেয়েটারও যেন কি হয়েছে, এখন আর কিছুতেই বিকেলে ঘাটে আসতে চায় না। ক্ষেস্তিই নানা কথা উঠিয়ে লজ্জায় ফেলেছে ওকে। এ নিশিকে দেখে একটু হাসলে কিংবা দুটো কথা বললে কি এসে যায়। কই আর তো কেউ কিছু বলে না। ঐ নচ্ছারটাই যত গোলমালের মাঝকাটি... ভাবতে ভাবতে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে উঠতে যায় দুর্গা। মুখ তুলতেই বসন্তনারায়ণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। বড় অস্বস্তি বোধ হয় ওর।

চৌঠা আঘাট সন্ধ্যায় পাট বোঝাই শেষ হয়। যে যাব মাল নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। একখানা গস্তি ব অর্ধেকটাই ভরে না। ঠিক হয়, পাটের গস্তি পেছনেই দয়াল চানের আসর বসবে। মাদুর, একতারা, পান, তামাক ঠিক মতোই ওঠে। করিম, পলান, দীন্তু এরাই যাবে গস্তিতে। কারো কোন চ্যাংড়াব ঠাই হবে না এখানে। ওরা সকলে যাবে আর একখানা গস্তিতে। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রথমে লোক যা যাবার কথা ছিল এখন তার চেয়ে দেড়া লোক যাবার জন্তু বায়না ধরেছে। চরধল্লার ঘাটেই দ্বিতীয় গস্তি-খানা বোঝাই হয়ে যায়। ছেলেপুলে আর মেয়েদের তো জায়গা একটু বেশী চাই-ই! তাছাড়া এতো আর মালামাল নয় যে একটার ওপর আর একটা চাপবে। রুটি না থাকলে অবশু ছৈয়ের ওপরও জনকয়েক যেতে পারবে। কিন্তু সে তো শুধু পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। ছেলেপুলে মেয়েদের জন্তু আর একখানা নৌকো না হলেই নয়। খাওয়া-দাওয়ার জিনিসও বড় একটা কম যাবে না। আজ মাঝ রাত্রে নৌকো ছাড়বে, পরের দিন সমস্ত দিন-রাতই নৌকোতে থাকতে হবে। এই সুদীর্ঘ সময় এতগুলো লোক শুধু মুড়ি, চিড়ে খেয়ে থাকতে পারে না। রান্না খাওয়ার যোগাড়ও রাখতে হবে। রথ দেখা আর কলা বেচাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আনন্দ উৎসবটাও বড় কম হবে না। এতদিন সকলে প্রাণপণে ক্ষেতে খেটেছে। কিছুদিন পর আবার খাটুনী আসছে। মাঝখানের এই কয়েকটা দিন একটু জিরিয়ে নেওয়া। পাট কাটা, জাগ দেয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো এ সব কিছুতেই হাড়ভাঙা খাটুনী। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ

ভাল করেই করতে হবে। ঠিক হয় বিপিন মণ্ডলের বড় ঘাষী নৌকোখানাও সঞ্চে যাবে। একশো-হাতি ঘাষী-রথের কেবায়্যা মোটাই পেতো বিপিন। কিন্তু টাকার চেয়ে চরের মানুষের স্ব্থ স্থবিধার দিকে আগে নজর রাখতে হবে। দু'চার জন গিয়ে বিপিনকে ধরতেই সে রাজী হয়ে যায়। সারা বছরই তো নাও বাওয়া আছে। হোক মোটা কেয়ায়া, ও ছুটিই নেবে। সকলেব সঞ্চে রথের পার্বেই মাতে বিপিন। ওব নৌকোয় খোল, করতাল ওঠে। কীর্তনেব আসব বসবে। সমবয়সী জোয়ান জোয়ান ছেলেবাই থাকবে এ নৌকোয়। এ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হলো। বুড়োবা পাটের গস্তিতে, ছেলেপুলে মেয়েবা আর একখানা গস্তিতে। রান্না খাওয়ার যোগান ওবাই দেবে। ভাঁড়বও থাকবে ওদেরই জিন্মায়। ঘাষীতে চলবে শুধু কীর্তন আর ছেয়ের ওপর ইয়ার-বন্ধুদেব সখ আহ্লাদ।

বাত আনুমানিক একটা। জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ধামবাইর রথ ভারত বিখ্যাত। চব থেকে জলপথে মাইল সাতেকেব পথ মাত্র। কিন্তু বংশীর শ্রোত এত তীর যে বাতাসেব জোব না থাকলে ভোব ভোব পৌঁছানো মুশকিলই হবে। দু' ঘন্টি বাদাম উড়ছে গস্তিতে তবু যেন শ্রোতের মুখে উজাতে পারছে না। এ ভাবে গেলে বেশ বেলা হয়ে যাবে। পাটের শুভক্ষণ সকালের বাজাবেই ভাল। কিন্তু কবাব কিছু নেই। এত শ্রোতে দাঁড় টেনেও কোন লাভ নেই। বাতাস চড়লেই একমাত্র ভরসা। ঘন ঘন জয়ধ্বনি পড়ে, জয় দয়াল চান-জয় মাধবজী। মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়।

বর্ষায় বংশীর বিবাট বক্ষ ফেঁপে উঠেছে। দুপুব রাতে মাদল বাজনাব মতোই শোনাচ্ছে শ্রোতেব গর্জন। রথের পণ্য নিয়ে শত শত নৌকো উজাতে চেষ্টা করছে। আবার যাত্রীবাহী নৌকোও চলেছে কিছু কিছু। সারারাত নৌকোয় কাটিয়ে বেশ ভোবে গিয়েই মেলায় জমবে। যত বেলা বাড়বে ততোই ভিড় বাড়বে। ঘাটে হয়তো নৌকা রাখারই ঠাই মিলবে না। ভোরে ভোরে পৌঁছতে না পারলে অনেক অস্থবিধা। হয়তো ক্রোশ খানেক পথ হেঁটেই যেতে হবে। বংশী ধলেশ্বরীর বিবাট বক্ষ দিন দশেক আগে থেকেই নৌকোয় নৌকোয় সরগরম।

পুরীর রথের ভিড় শুধু তীর্থ যাত্রীদের নিয়ে। কিন্তু ধামবাইর রথ ঠিক তা নয়। এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আসে। বিবাট এক শিল্প

বাণিজ্যের মেলাই বসে ধামরাইর রথে। হাজার হাজার মণ পাট, চন্দনী, ধনে বেচা-কেনা হয়। আবার সার্কাস, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, বাধা-চক্কর এমন কি প্রকাশ জুয়ার ছকেরও অভাব নেই। শিল্প-বাণিজ্যের ধারাবাহী শ কয়েক রূপজীবিনী এসেও আঁচল বিছায়। নদীর চড়ায় ছোট ছোট হোগলার চালা ওঠে। এক-একটি ঘর এক-একটি বিলাসিনীর। রূপ হয়তো ওদের কোন কালেই কারো ছিল না। তবে প্রচুব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী দু'চার জনকে দেখা যায়। হয়তো স্বাস্থ্যেব চেয়ে মেকী জেলাটাই প্রধান। দু' আনা চার আনায় লোক ঘব ঢুকছে। প্রকাশ দিবালোকেই ঢুকছে। একজন ঢোকে তো আর দশজন তাকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে। হয়তো মিনিট আট দশ পবে যেমে নেয়ে দেবোয় বেচারী—সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ঢোকে। সে বেরুতে না বেরুতে আবার একজন। এ যেন বাগিনী ফাঁদ পেতে বসে আছে ছাগল ছানার মতো তাব মুখের ভেতরে গিয়ে লাফিয়ে পড়া। সমাজ আছে, থানা পুলিশ আছে, তাব চেয়েও বড় কথা জেলা-শাসক স্বয়ং উপস্থিত আছেন সদস্যবলে কিন্তু তাবু কারো কিছু করার নেই। বেশ মজার খেলাই চলে।

জুয়াড়িরা ছকে ছকে দু' আনা চাব আনা এমনকি আপুলি টাকা পর্যন্ত হারছে। আবার দিশী ধাত্তেশ্বরীর নেশায় পচা নর্দমায়ও গড়াগড়ি যাচ্ছে অনেকে। ঠাকুব মাধবজীউর অনন্ত লীলা। ভক্তদের লীলা খেলারও অস্থ নেই। প্রথম রথ থেকে ফিরতি রথ পর্যন্ত ধামরাই গ্রাম জমজমাট। মাদক বর্জন আর জুয়া বন্ধের জ্ঞা একদল প্রচারেও নামেন। হয়তো গান্ধীজীর মন্ত্র শিষ্টাই হবেন। প্রাণপণেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে চান। কিন্তু পারেন না। প্রথম হামলা হয় জমিদারের তরফ থেকে। তারপব পুলিশ স্থপারের কাছে নালিশ জানায় আবগারী ভেঙাররা। ব্যবসা তাদের মাটি হচ্ছে। গান্ধী-বাদীর পথরোধ করায় মানুষ স্বাভাবিক ফুর্তি করতে পারছে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন... দু'দণ্ড পাড়িয়ে পাড়িয়ে মজা দেখছিলেন ইংরেজ কমচারী। অবশেষে অবরোধ কারীদের ওপর বেঠন চার্জ আরম্ভ হয়। এইতো চাচ্ছিল সে, মাদক বর্জন হবে মানে? মদ জুয়া মেয়েমানুষই যদি না রইলো তাহলে হাট বাজার জমবে কি দিয়ে? আর হাট বাজারই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণ্য আমদানী রপ্তানী হবে কোথায়? না না, ওসব চালাকি চলবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইংরেজ এদেশে কলা চুষতে আসেনি।...সমানে দিন দুই ধরপাকড় চলে। দু'চার জায়গায় বেঠন

চার্জও করতে হয়। প্রয়োজন হলে রাইকেলও চলতো। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন। প্রথম কিস্তিতেই ঠাঁও হয়ে যায়। রথের মানুষ আবার চাক্ষু হয়ে ওঠে। গৌকে রেখা দেয়নি এমন ছেলেকেও দিনে দুপুরে হোগলার ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। মাথা পিছু দু'আনা দশ-পয়সা রেট। মিনিট কয়েকের ছায়াবাজী আর যান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড। একজন ঘাম মুছতে মুছতে বেরোয় তো আর একজন ঢোকে। তারপর আবার একজন। দিবা রাত্রির ঘূর্ণচক্র। জগন্নাথের হাতে যে যার মতে। ব্যস্ত। কারো কাঁউকে দেখবার অবকাশ নেই। গ্রামের জোয়ান মানুষগুলো অজ্ঞতা বশত কুৎসিত রোগ বাজ নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। শাস্তির নীড় এদেরই অঙ্গস্পর্শে অশান্ত হয়ে উঠবে—সস্তান সন্ততিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে রোগ বাজ। কারো সস্তান অঙ্গুরেই বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ট হবে। করো বা দৃষ্টি ক্ষমতাই পাবে লোপ। আবার কারো বা নিষাপ স্বাস্থ্যবতী গৃহলক্ষী রোগ জ্বালায় আত্মহত্যা করবে—উম্মাদিনী সেজে পথে পথে ফিরবে। আজ যে মানুষ পাপ করলে আগামীকাল সেই মানুষই ছুটবে পেঁচোয়-পাওয়া সস্তানের জগ্ন ওঝা ডাকতে—ব্রহ্ম স্ত্রী জগ্ন দেও-দস্ত্রি জিনের পূজা দিতে। তাতে যখন ফল হবে না এবং ভাগ্যগুণে যদি কোন সংপরামশ জ্যোটে—তাহলে ছুটবে ডাক্তার বৈষ্ণের কাছে। শোষকের করাত দু'দিকেই ধার।

দিনী হকিম বাদ্যর সাধ্য নেই এ রোগ সারায়। অদ্ভুত রোগ অদ্ভুত তার দাওয়াই। যারা প্রেমদাতা তারাই মুক্তিদাতারূপে দেখা দেন। তাদেরই ছক কাটা পথে কোটি কোটি টাকার ওষুধ আসে সাগর পার থেকে। গরল আসে বিনিময়ে জাহাজ ভর্তি অমৃত পাচার হয়ে যায়। জাতি দিন দিন পঙ্গু হতে থাকে। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। দাঁত বার করে হাসতে থাকে শোষক।

পলানের গস্তি দু'খানা ও বিপিনের ঘাষীখানা ঠিক সময়ে এসেই ধামরাইর ঘাটে লাগ। আর কিছুটা বেলা হলে আর ঘাটে ঠাঁই পাওয়া যেতো না। হাজার হাজার নৌকো—লক্ষ লক্ষ যাত্রী। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ছোট ছোট ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। ওদের বাড়ি থেকে দুর্গা, আনন্দ, ময়না তিনজনেই এসেছে। পাঁচ মণ বাছ পাট দিয়ে রথের সাইদ করবে ওরা। মোট দশ মণ উঠেছে। বাকী পাঁচ মণ দেখে শুনে গঞ্জের হাতে বেচবে।

দেব সমস্ত পাট মিলিয়ে শ'দেড়েক মণ হবে। একা পলানেরই পঞ্চাশ মণ।
 দ্রুত করিমবও হবে মণ পঁচিশেক। বাকীটা আর আর সকলের। গস্তি ঘাটে
 সন্ধ্যা সন্ধ্য সন্ধ্য ফড়েরা এসে ছেকে ধরে। পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই
 সন্দ করে চাষীর হাতে দেয়। খারা কাজ গুছাতে জানে তারা জনে জনে
 শাখামোদ না করে মাতব্বরকে হাত কবতেই চেষ্টা করে। প্রথম কিস্তিতে
 সর্বাি বেচা-কেনার কথা না বলে বং-তামাসাতেই মন দেয়। মাতব্বরের
 লপুল কাছে থাকলে ঝাঁকব হয়তো তার হাতে চারটে পয়সাই গুঁজে
 ন। কাউকে বা কোলে নিয়ে চুমুই খেল ছ'গালে ছটো। একটা শেস
 আবার একটা বিড়ি দিলে মাতব্বরকে। নিজেও ধবালে একটা। তারপর
 আসল কথায়। সওদা তলে অবশ্য এসব খরচাই হিসেব ধরা হবে। ওজন
 সস্তাবনাই বেশী। তাতে যদি একাস্তই অস্তবিধে হয় তাহলে তো হিসেব
 কববার কৌশল আছেই। আট টাকা মণ সোয়া সেরের দাম হয় তিন আনা,
 পঞ্চাশ আনাক তেরা পয়সাই বের দিলাম ব্যাপারী সাব...নিজেরও সব দিক
 মন দেয়। ব্যাপারী সাংবেও খুশীতে আটখানা। বসিক ফড়ের কাছে জয়নাল
 মাতব্বরের খাতিবই আলাদা। নিজের পাটতো বসিককে দেবেই জয়নাল উপরস্থ
 মণ মৌজার সমস্ত পাটই পাল বসিক। কাছে অল্প ফড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও
 কান অঘটন ঘটবে না। বসিক কি দব দিলে টেরই পাবে না অল্প কেউ।
 শশ্য দর উঠতে উঠতে হয়তো এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যে আর কেউ
 এক পয়সাও উঠতে সাহস করে না। এমন কি রসিকও না। ছ'পাঁচ মিনিট
 দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রসিক। মাতব্বরকে চোখ টেপে। তারপর তার
 ডান হাতখানা নিজেব হাতে টেন নিয়ে চেটোর ওপর সাক্ষতিক ভাষায় লিখে
 জানায় আসল দর। কড়া ক্রান্তির হিসেব জুড়ুতে না পারলেও দর কত উঠছে
 তা সহজেই বুঝতে পারে জয়নাল। রসিক হয়তো লিখলে, দশ টাকা এক আনা।
 জয়নাল জানায় ছ'আনা। অনেকক্ষণ ঝকঝকির পর শেষ পর্যন্ত জয়নালের
 জিদই বজায় থাকে। দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করতে রসিকের আকসোস আর ধরে
 না, নিচ্ছি মাতব্বরের পো, কিন্তু বরাতে আজ লোকসানই আছে। ছ'চারটে
 পয়সাও আপনি আর আমাদের খেতে দেবেন না। উত্তরে জয়নাল বলে, হ হ,
 বিনা লাবেই আপনারা কারবার করেন। হেই বান্দাই আপনারা।...

প্রত্যুত্তরে রসিক বলে, দশজনের কাছে লাভ করলেও আপনার কাছে এক
 পয়সাও লাভ হয় না। তবে আপনার হাতের সাইদ ভাল তাই ষা...

কথায় কথায় হয়তো অগ্নমনস্ক হয়ে পড়ে জয়নাল। রসিকের দাঁড়ির মিটার একবারের পরিবর্তে দু'বারই পাঁচ থেকে যায়। এক এক দাঁড়িতে পাঁচ সের করে মাপ চলেছে। এক দাঁড়ি সটকাতে পারলেই লাভের লাভ তম্ব লাভ এসে রসিকের তহবিলে জমা হবে! দরের চেয়ে দু'আনা কম দরে বেচলেও ক্ষতি নেই। ফড়ের কাছে শত-করা নিরানব্বই জন চাবীরই এই হাল। তা সে ওজনে হোক কিংবা হিসেব জুড়তে হোক।

দীমু করিম পলানও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। ফড়ের বিড়িই টানছে। রসিক কম করেও বার তিনেক হাত টেনেছে! তবে তিন মোড়ল একসঙ্গে থাকায় তেমন কায়দা করতে পারছে না। রথের সাইদে ঠকাতে গিয়ে ধরা পড়লে কিল গুঁতো খাবাব ভয় আছে। সর্বশেষ সোজাস্বজি দর দিয়েই অপেক্ষায় থাকে রসিক। মাধবের দিবি ব্যাপারী সাবরা, এ দরে বেচলে যেন আমি পাই।...

এক ফাঁকে ডাঙায় নেমে বাজার দেখে আসে ওরা তিনজন। সেখানেও চেনাশুনো ফড়ের অভাব নেই। তাদের কাছ থেকেও মোহিনী বিড়ি খেতে হয়। মাথা ঠিক করতে পারে না। দর তো দেখছি রসিকেরই সব চাইতে ভাল। কি হবে টানে পাট নামিয়ে? ফড়ের সংখ্যা যতোই থাক অনেক বড় বড় কোম্পানীই খরিদে নামেনি। অগ্ন পর দূরের কথা—আসল ক্রেতা রেলি ব্রাদার্সেরই পাতা নেই।...লক্ষণ ভাল নয়, তিন মোড়ল বটতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সল্লা কবে। না, রসিককে মাল বেচাই ভাল। অবশ্য সম্পূর্ণ টাকা যদি সে নগদ দিতে পারে। আজকের দিনে ধার কর্ত্ত হবে না। টাকা হাতে নিয়ে নিশ্চিত মনেই ফুঁটি করবে। নয়তো আজকের দিনে কে যাবে ওদের সঙ্গে বামেলায়। মুখে তো কিছু আটকায় না ওদের। শেষ-বাজার যদি টান যায় তা হলে অবশ্য টাকা পেতে তেমন বেগ পেতে হবে না। কিন্তু টিলে গেলে ধার দিয়েছ কি সর্বনাশ। হাজারো রকম বায়না ধরবে। কাঁটায় ওজন করতে গিয়ে অনেক খেঁটেছে, ভেতরে বেশ ভিজা ছিল, হেড-অপিস থেকে এখনো টাকা এসে পৌঁছায়নি ইত্যাদি...না না, আজকের দিনে ওসব চলবে না। নসদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূণ্য থাক।

নগদের জ্ঞান জেদ ধরতে গস্তির সমস্ত পাট কেনা রসিকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ভাবনারও কিছু আছে। হঠাৎ রেলি-ব্রাদার্সের লঞ্চ কেন এল না? পূর্ণ পারসেজার আসরে নেমেও কেন হাত গুটিয়ে রইলেন?...রসিক

আধাআধি খরিদ করেই ক্ষান্ত হয়। তিন মোড়ল যেভাবে শ্রেন দৃষ্টিতে দাড়িয়ে আছে তাতে ওজন বৃদ্ধি হবাব আদৌ সম্ভাবনা নেই। দীর্ঘর উপস্থিতিতে হিসেব জুড়তেও কিছুমাত্র ফাউ বোজগাব হলো না। এখন তো স্পাল ঠোকা ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ালো।

বসিকের দেখাদেখি ছোটগাটো ফড়েরাও ধাবড়ে যায়। তাবাও ছু'পাঁচ .৭ কবে কিনে ক্ষান্তি দেয়। গস্তিতে এখনো প্রায় পঞ্চাশ মণ রয়ে গেলো। গাজকের দিনে প্রত্যেককেই হাব বজায় বেখে বেচতে হচ্ছে। কেউ হাসবে বউ কাঁদবে তা হবে না। চব্বের সমস্ত পাট একসঙ্গে মিলিয়ে দু'তিনটি লট মণ হয়েছে। এখন যে লটেব যা দাম ওঠে সেই হাবেই পাবে যাব যা টাকা।

বেলা দশটাব মধ্যই প্রত্যেকের হাতে নতুন কবকরে নোট এসে যায়। ৩৭ বিচাবে দবেব কিছু কিছু তাবতমা হলেও দশ টাকা দবেব নিচে কেউ পায় না। দুর্গা আটত্রিশ টাকা বাবো আনা পেলো। আনন্দ নগদ আটত্রিশটা টাকা দিদিব হাতে দিয়ে বাকীটা টেকে গোজে। দুর্গা আপত্তি করে না। না চাইলেও গাজ বেখের পার্বণী পেতো আনন্দ। গাধাব মতো খেটেছে বেচার্য, একটু আমোদ আহ্লাদ কববে বইকি। তাছাড়া ওকে নিয়ে কোন ভয় নেই। কোন বকম বাজে খবচায় যাবে না ও। ওব যতো চিন্তা নিজেব পেট নিয়ে। চোখে দেখাব মতো কোন নেশা ওব নেই। খুব বেশী সখ চাপে তো নাগব দোলায় গ'চাব পাক দিতে পাবে। বাস, ঐ পর্যন্তই।

নগদ বাবো আনা পয়সা হাতে পড়ায় আনন্দব আনন্দ আব ধবে না। গামবাইব অলি-গলি ওব নখদর্পণে। উল্লাসে ছুটে যায় মেলার মাঝখানে। বৌ বৌ কবে ঘুরছে রাধা-চক্রব। শিঙা ফুকছে সার্কাসেব দল। তালে তালে ব্যাণ্ড বাজছে। তারেব ওপর দিয়ে এক পায়ে হেটে নড়িব মাথায় সানকী ঘোরাচ্ছে একদল। গাব একদলে সখি নাচছে। বাঘ ডাকছে ওদিক থেকে। হই হই ব্যাপার। পাশের ঘরে নাকি দু'মুখো জীবিত মানুষ। ওধারে লটারি হচ্ছে। দু' আনার টিকিটে ঘড়ি, গ্রামোফোন, সাইকেল। না না, এসব এখন ও কিছু দেখবে না। আগে পেট' তারপর অন্য কথা। কিন্তু ওধারের চরায় ছোট ছোট হোগলার ঘরে ওগুলো কি বসেছে? মানুষ যে হেকে ধরেছে সবগুলো ঘরকে। ও আবার কি তামাসা, দু' পা এগিয়ে যায় আনন্দ। আগে বাপ ঠাকুরদার সঙ্গে রখে বারকয়েক এসেছে। কিন্তু ওদিকটায় কোনদিন যায়নি। তাজ্জব ব্যাপার তো। মানুষ তো সব চেয়ে বেশী খুঁকছে ওদিকটায়। আরো একটু এগিয়ে যায় আনন্দ।

ঘামে নেয়ে আধা-বয়সী একটি লোক রুমালে মুখ পুঁছতে পুঁছতে ফিরছিল। চিকন করে চুল ছাঁটা। গায়ে মম করছে আন্তরের গন্ধ। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে তাকেই শুধোয় ও, ওহানে কি খেলা বসচে দাদা ?

আগস্তুক বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে জবাব দেয়, বড় বাগের (বাঘের) খেলা।
বড় বাগের খেলা।

হ দাদা, বড় বাগের খেলা। দেখবা নাকি ? চাইর আনা লাগবো।

থাবা থোবা দিব না ত ?

থাবা দিব কিগ! বুকের উপুর উঠাইয়া নাচাইব। কি যে স্বথ দাদা, ঢল ঢুলু চোখে অতীতে ফিরে যায় আগস্তুক।

অনন্দ সোৎসাহেই এগিয়ে যায়। ভিড় ঠেলে একটা ঘরের কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে, স্কলাঙ্গী মধ্য-বয়সী একটি স্ত্রীলোক মধ্য-বয়সী আর-একটি পুরুষের কাছা ধরে টানছে। ঘামে নেয়ে গেছে বেচারী। বুটিদার ভয়েলেব পাঞ্জাবী ভিজ্জে জপ্ জপ্ করছে। হাব মতো নগদ একটা রূপোর সিঁকি সে স্ত্রীলোকটিকে দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তবু ছাড়া পাচ্ছে না। পান দোস্ত' থাবার জগ্ন আরো চারটে পয়সা চাই স্ত্রীলোকটিব। চারদিকের লোক হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে—বক দেখাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি নাছোড়বান্দা। তাব মতে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ঘরে অনেকক্ষণ বেশী থেকেছে পুরুষটি। অতএব আক্কেল সেলামী দিতে হবে। পুরুষটির গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। যে কোন মুহূর্তে সে এক ঘুষিতে স্ত্রীলোকটির নাক মুখ খেঁতো করে দিতে পারে। কন্ত পারছে না শুধু লজ্জায়। চেনাশুনো মানুষই হয়তো অনেকে দেখে ফেলছে। ভাঙানো চারটে পয়সা থাকলে না হয় ছুঁড়ে দিয়ে পালাতো। কিন্তু একটা ফুটো পয়সাও যে নেই পকেটে। রূপোর টাকা একটা কৌচার খুঁটে বাঁধা আছে বটে। কিন্তু ওটা বার করলে রাস্কুসী গোটাটাই কেড়ে নেবে। না, নাক মুখ কাটাই যাবে আজ। লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে উঠেছে বেচারার। স্ত্রীলোকটি কাছা ধরে যতো টানছে ও ততোই মাথা হেঁট করছে। মাঝে মাঝে জোব দেখাতেও চাচ্ছে। কিন্তু চারদিকের ফক্কুড়িতে মাথা তুলতে পারছে না। অবশেষে টেক হাতড়ে কিছু না পেয়ে স্ত্রীলোকটি জামা ছেড়ে বুক পকেটের রুমালটাই ছুবলে নেয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ছাড়া পেয়ে বেচারী কাছা সামলাতে সামলাতে উর্ধ্ব্বাসে ছুটে পালায়। চারদিকে: মানুষ—হই হই করে ওঠে।

দৃশ্য দেখে আনন্দ হতবাক। শহর বন্দরে অনেক বেশী আছে বলে ও শুনেছে। কিন্তু তাই বলে মেয়েছেলে যে এতোটা বেহায়া হতে পারে তা ও কল্পনায়ও আনতে পারে না। থু থু ফেলেতে ফেলতেই আনন্দ ছুটে পালায় সেখান থেকে। একটু ফাঁকায় এসে খানিক জিরাতে থাকে। ঘেম্মায় পোটের নাড়ী-ভুঁড়ী সব পাক দিতে শুরু করেছে। ছি ছি ছি, দেব-দেবতার পূজা পার্বণে এসে এসব কি অনাচার। না, দোষ ওরই, কেন ও মরতে এল এদিকে।...

বটের ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে জিরোবার পর খানিক স্থির হয় আনন্দ। কিন্তু অবিরত থু থু ফেলে ফেলে গলা শুকিয়ে উঠেছে। এখন কিছু মুখে না দিলে এক পাও এগোনো যাবে না। সামনেই বড় বড় আক বিক্রী হচ্ছে। বেশ পুষ্ট, তক্তক্ত করছে হলদে রং। এক আনা দিয়ে বাছাই একটা আকই কিনে ফেলে আনন্দ। হাটে বাজারে অল্পদিন এর দাম হু' পয়সার বেশী নয়। আজ বথের মওকা পেয়ে দাম চড়িয়ে দিয়েছে হাটুরেরা। তা দিক-প্রাণ তো এখন বাচলো।... আনন্দ খুশী মনেই আনিটা ব্যাপারীর হাতে দেয়। ওর নির্দেশ মতো কাটারি দিয়ে সমান তিন টুকরো করে কেটে দেয় আকের ব্যাপারী। গোড়ার দিকটা বেশী মিষ্টি হলেও অপেক্ষাকৃত শক্ত। দিদি আর ময়নার চিবাতে বেশ কষ্ট হবে! ও নিজেই তাই চিবাতে থাকে গোড়ার দিকটা। মিষ্টি রসে আবার মনের মিষ্টি ফিরে আসে। এবার সোজা-সুজি চলে আসে খাবারের দোকানের কাছে। ময়নার দোকান, তেলে-ভাজার দোকান, খেলনার দোকানের ছড়াছড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কোনটা রেখে কোনটা কেনে। কম পয়সায় পেট ভর্তি খাবার পেতে হলে তেলে-ভাজার দোকানই শ্রেয়। খাবারের রাজা, গরম গরম বেগুনি, ফুলুরি, ছোলা সিদ্ধ আর মুড়ি। হু'পয়সা দিয়ে বড় দেখে একটা মাটির হাঁড়ি কিনে নিয়ে তার ভেতর চার আনার তেলে-ভাজা আর মুড়িই সর্বপ্রথম কিনে ফেলে আনন্দ। জিলিপী তো গল্পে প্রায়ই থাকে হয়। স্ততরাং সাবেক দর পয়সায় হু'খানা করে জিলিপী হলেও আজ আর জিলিপী নয়। রথ উপলক্ষে তৈরী বিশিষ্ট রস-বড়াই আজকের দিনের সেরা খাবার। বেশ বড় বড় লাল লাল বড়া। পেতলের গামলার রসে সাতার কাটছে যেন। গাওয়া ঘিমে তৈরী। মুখে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে গলে জল। হু' আনায় আট খানা বড়াও কিনে নেয় আনন্দ। তা খরচা নেহাত কম হলো না। সাড়ে সাত আনা তো এরই মধ্যে কাবার। বাকী মাত্র সাড়ে চার আনা। সার্কাস এর

আগে আরো দু'বার দেখা হয়েছে। স্ততরাং সার্কাস না দেখলেও চলাবে। কিন্তু দু'মুখো মানুষ কেমন তা তো দেখতেই হবে। এক আনা যাবে ওতে। তারপর খেয়েদেয়ে রথটানের আগেই আবার এসে লটারির টিকেট ধরা চাই। দু' আনায় যদি একটা কলের গান পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। সারা চরফুটনগর ছুটে আসবে মণ্ডল বাড়িতে। না, আগে কাকেও কিছু বলা হবে না। বরাত খুললে, সামগ্রী হাতে করেই সকলকে বলা যাবে। কিন্তু না পেলে পয়সা দু'আনা মিছিমিছিই নষ্ট হবে।...তা হোক, পুরুষ মানুষকে অতো ভাবলে চলে না। কথায় বলে, সাহসে লক্ষ্মী নয়তো মাথায় বাঁশ। সেই ভাল, এখন আর এক পয়সাও খরচ করা যাবে না। সর্বশেষ দু' পয়সার বিড়ি কিনে বাকী পয়সা কোঁচার খুঁটে বেঁধে ফেলে আনন্দ। তারপর খাবারের হাঁড়িটা হাতে নিয়ে হন-হনিয়ে ঘাটের দিকেই পা চালিয়ে দেয়। পেছনের গলিটা এখনো বেশ ফাঁকা আছে। তবে বেলা বারোটা'ব পরে আর হাঁটা যাবে না।

বিকেল চারটেয় রথ টান। বিরাট লম্বা দুই কাছি। বাসুকী নাগের মতোই বিস্তৃত স্থান জুড়ে পড়ে আছে। কম করেও পাঁচ শো গজ হবে এক একটা। ওজনেও দশ বারো মণ হবে। রথের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস হওয়া আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্ততরাং এখন আর কোন ভক্তকে বাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। প্রাণের আবেগ এখন শুধু নেচে-কুঁড়েই শেষ করতে হয়। রথের পেছনের চত্বরে বসেছে সার্কাস, হোগলার ঘর, দোকান পসার। সামনের চত্বর উন্মুক্ত। স্থায়ী কোন দোকান পাট নেই এখানে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত দলে দলে এসে গান গাইছে, নাচছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে। রথটানের আগ পর্যন্ত ফেরিওয়ালারা পুরোদমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁশের বাঁশী আর কলা-চিনিই প্রধান পণ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত ছোঁয়াবে। ধীরে ধীরে চলবে মাধব জীউর রথ। জগন্নাথ যেন জগৎ জনের আকুল আহ্বানে বিশ্ব-ত্রাণেই চলেছেন। শোক তাপ জ্বালা সব দূর হবে আজ। কাছিতে হাত লাগাও—একুলে কুল পাবে—অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। প্রতি বছর মানুষ এই বিশ্বাসেই ছুটে আসে। “রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন ভবতু।” রথের ওপর প্রভুকে দর্শন করলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। শোক তাপ জ্বালা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে। শাস্ত্রের এই অভয় মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রথে আসে। গাছের নতুন ফল নতুন ফুল ভবকাণ্ডারীর জন্ম নিয়ে আসে। শুদ্ধ-ভক্তি-ভরে নিবেদন করে রথের

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। জীবনের অচল রথকে সচল করবার জগ্ৰাই প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত লাগায়। আবার হুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের আশায় কাছি থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ আঁশ ছিঁড়ে নিয়ে মাদুলি করে গলায় পরে। হোগলার থরের ভিড় অপেক্ষা এখানকার ভিড় ঢের বেশী। এখানকার মানুষের মধ্যে কোনরূপ লুকোচুরি নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের আশ্রয় চেষ্টায়ও যদি ঠাকুরের বখ না নড়ে তবে প্রকাশ্যেই আকুল হয়ে কেঁদে বুক ভাষায় এরা। এ ভিড় আছে বলেই হরতো সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে কিনা তা পরলোক-স্বামীই জানেন। কিন্তু ইহলোকে কিছু না পেয়েও মানুষ মন থেকে এ বিশ্বাস একেবারে মুছে ফেলতে পারছে না। বস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতা মানুষকে অনেক দিয়েছে, হয়তো আরো অনেক দেবে। কিন্তু তবু কি মানুষ পারবে এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি নিতে?—জগন্নাথের রথ চলেছে হয়তো ঠিকই চলবে।...

চারদিক থেকে দলে দলে অম্ববাগীরা এসেছে। গস্তি নৌকো, ঘাষী নৌকো, ডিঙ্গি নৌকোর ছড়াছড়ি। নদীর মাঝ ববাবর নোঙর ফেলে দাড়িয়ে আছে পুলিশ সাহেবের ঝকঝকে লঞ্চখানা। ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে পতপত করে আগে পিছে। ঢাকা, মহেরা, বালিয়াটি থেকেও খানকয়েক গ্রীনবোট পাশাপাশি এসে নোঙর ফেলেছে। কোনটায় চলেছে ইয়ার বন্ধু-বান্ধবদের হইচই, কোনটায় গান্ন বাজনা বাইজী নাচ। আবার কোনটায় সপরিবারে এসেছেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা। জগন্নাথের হাটে কারো আসতে বাবণ নেই। যার যেভাবে মন চায়।

চরের ঘাষী এবং গস্তি দু'খানা সরাসরি এসে ঘাটে ভিড়তে পারেনি। ভোর ভোর পৌঁছেও কিছুটা দূরেই বাঁধতে হয়। আর খানকটা দেরি হলে ঘাট ছেড়ে অথাটেই বাঁধতে হতো। ঢাকার একখানি গ্রীনবোট পাশাপাশিই রয়েছে। বখটান না দেখে বয়স্কদের কেউ জলও স্পর্শ করবে না। এক এক খানা নৌকো এসে ভিড়ছে সন্ধে সন্ধে জয়ধ্বনি উঠছে। কুলনারীরা দিচ্ছে উলুধ্বনি। ভিন্ন ধর্মী যারা মেলায় এসেছে তারাও এবেলা কেউ রান্না-বান্না করছে না। বাজারের খাবার খেয়েই দিন কাটাচ্ছে। বেচা-কেনা সখ-আহ্লাদ মিটলে ওবেলা ইলিশ মাছের ঝোল ভাত খাবে। চরের মানুষদের তো কথাই নেই। ওরা সম্প্রদায় গত আলাদা হলেও এক আত্মা এক প্রাণ। রথের বাজার ভাল গেলে পুরো ভোজই আজ খাবে সকলে মিলে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে শুধু ঢাকার

বোটখানায়। সকাল বেলাতেই ওদের রহুইখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রকমারী রান্নাই হচ্ছে হয়তো। অহুকুল বাতাসে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে খশবু। ছ'চারটি ফিনফিনে ছোকরা থেকে থেকেই ছাদের ওপর উঠে কি সব কাড়াকাড়ি করে থাকে। কারো পরনে গোলাপী সিন্ধের লুঙ্গি, শ্রাণ্ডো গেল্লি। কারো বাম মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, ন্যুকের ডগায় চশমা। শুধু আঙুর ওয়ার পরেও কেউ কেউ হৈ ছল্লোড় করছে। মুহুমুহুঃ সিগারেট ফুঁকছে কেউ কেউ। হাসছে, শিস দিচ্ছে আবার হুড় হুড় কবে নীচে নেমে যাচ্ছে। চবেব ঝি-বউবা দেখে দেখে অবাক। বথে এসেছে তা অমন ফকুড়ী করছে কেন ?...হঠাৎ তবলায় চাটি পড়ে। প্যা পৌ করে বেজে ওঠে হারমোনিয়ম। সঙ্গে বেশ সুরেলা গলায় সুর ধরে একটি চাপাব কুঁড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ চাপা ফলেব মতোই ওব গতরের রং—ছিপছিপে চেহাৰা। ঝলমল করছে বাশিকৃত গহনা। বুড়িদার বেনারসীখানা তো বেশ দামীই হবে। ইস্, একটু যদি লজ্জা থাকে। একপাল পুকষেব সামনে কেমন সেজেগুজে গাইতে বসেছে।... গালে হাত দিয়েই ভাবতে থাকে চাবদিকের তীথযাত্রীবা। হবি বাঈ সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে আপন চঙেই গাইতে থাকে—

কে বিদেশী মন উদাসী

বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।

গান সোমের মাথায় এসে জিয়ট বাঁধে। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি কাবো। পাশে বসে আছে আরো দুটি স্ত্রী মেয়ে। বয়েস হরির চেয়ে কমই হবে। বড় জোর আঠারো উনিশ। সহসা ঘুঙুব পায়ে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ায়। গানের তালে তালে ঝমঝম শব্দে শুরু হয় নাচ। বিলোল লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী। চোখের ইসারায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। সোমের সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ছে ছোকরাবা। শিস দিচ্ছে, গোলাপ ছুঁড়ছে, 'মরে যাই, মরে যাই, প্রাণ' বলে লুটিয়ে পড়ছে। গ্লাসের পর গ্লাস পরিবেশিত হচ্ছে রঙিন সুধা।...দেখে দেখে গা পাক দিয়ে ওঠে কুসুমের। মাগো, কি যেমন! ধুম্মা ধুম্মা মাগীরা একপাল ছোকরার মাঝখানে কেমন কোমর চোলাচ্ছে। একটুও কি লজ্জা নেই মুখপুড়ীদের!... পুরুষদের একজনও যে নৌকোয় নেই। একে একে সকলেই তো ডাঙায় গিয়েছে। একুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ঠাকুর দর্শন করতে এসে একি দেখতে ও ছাই-ভস্ম।...নিশি গ্রীনবোটের দিকে চেয়ে মিটমিট করে

হাসছিল। কুসুম চীৎকার করে ওঠে, ছেয়ের ভিতরে আয়, নিজেও উঠে আসে পেছন ফিরে। ছি ছি ছি কি খেপা!... ১

রথ টান সময়মতোই হয়ে যায়। বেশ ভালভাবেই দর্শন হয়েছে ওদের। সকালে যে সব অযাত্রা দেখেছিল, তাতে ভয়ই ছিল, মাধবজীউ দর্শন দেবেন কি না, প্রভু ওদের মুখ রক্ষা করেছেন।

পুরুষ মানুষরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। খুব রক্ষা যে প্রথম চোটে বেশীর ভাগ পাট বেচে দিয়েছে। বিকেলের দিকে তো বাজার এক টাকা নরম। তাছাড়া খন্দেরই নেই। বসিক ফড়ে তো এরই মধ্যে সাতবার এসে মাথা চাপড়িয়ে গেছে। তা যা হোক। ব্যবসা—ব্যবসা। ঠকা জেতা আছেই। তাই বলে তো আর সাইদের পয়সা ফেরত দেওয়া যাবে না। আর দেবেই বা কেন? এই তো মাত্র একবার এ বকম হলো। নয়তো বছর ভরেই তো ওরা কলা দেখায়। এখন মুশকিল হলো বাকী পাট ক'গাছা আর বেচা যাবে না। কে জানে, কি হবে এবাব পাটের বাজাব? নমুনা তো বড় ভাল ঠেকছে না। যাকগে, সে পবের ভাবনা পবে ভাবা যাবে। এখন চাই খাবার। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ছোটরা অবিবত মুখ চালালেও বড়দের পেটে জলবিন্দুও পড়েনি। এখন বেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরি হবে। শুধু মুখে অতক্ষণ থাকা যাবে না। তাছাড়া সোজামুজি ডাল-ভাতও আজ আর হবে না। আজ একটু রকমফের বাগ্নাই হবে। আর কিছু না হোক ইলিশ মাছের ঝোল ভাত ভাজা তো হবেই। সঙ্গে ফজলী আম আর দই। ইলিশ মাছ সকলকে যাচাই করেই পরিবেশন করা হবে। তা হয়ে যাবে'খন। মাধব জীউর দয়ায় কারবার একরকম মন্দ হয়নি। বাছ পাট যখন গড়পড়তা এগারো বারোয় বিকোলো তখন গাছ পাটের দর উঠবেই। বঁকিশ সাপেও তো তাই হয়েছিল। দশ বারো থেকে চড়তে চড়তে একবারে ত্রিশ বঁকিশ। কিছু পাট অবশ্য ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে তা হোক, এ সব ব্যবসাদারদের চালাকি। চানীর মনের বল ভেঙে দেওয়ার মতলব। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন চাঁদা উঠানো দরকার। এর আগ পর্যন্ত যা খরচা হয়েছে সে যার যার তার তার। এখনকার বারোয়ারি ভোজ চাঁদা তুলেই হবে। গস্তির ছেয়ের ওপর বসে হুকো টানতে টানতে সন্না চলে মোড়লদের। অন্তেরাও খুশী মনেই এসে যোগ দেয়। হাতে সকলেরই করকরে

নোট রয়েছে। ফর্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাঁদা উঠে যায়। দীলু, করিম, পলান চাঁদা ছাড়াও প্রত্যেকে এক হাঁড়ি করে দই দিতে প্রতিশ্রুতি বেয়। মদনই প্রস্তাবটা তুলেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও সব সময়েই অগ্রণী। গস্তি আর ঘাষীতে হই হই পড়ে। সব চেয়ে খুশী হয় ছোটরা। মনের আনন্দে তালপাতার বাঁশি জোরে জোরে ফুঁকতে থাকে। কিন্তু এতো সবই গেলা পনের কথা। এখন যে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী মোচড়াতে শুরু করেছে। এখনকাব মতো কিছু চাই যে।...হুকো টানতে টানতে দীলুর নজরে পড়ে, ঘাটেব পারে বড় বড় কাঁসার বগী খালায় করে মালাই নিয়ে উপস্থিত হয়েছে স্থানীয় গোয়ালারা। যেমন পুরু তেমন তকৃতক করছে রং। ও আর স্থির থাকতে পারে না। হুকোটা করিমের হাতে দিয়ে নোকোর ওপর দিয়ে ডিঙাতে ডিঙাতে ঘাটের পারে গিয়ে নামে। এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বাছাই বাছাই চারখানা মালাই কিনে ফেলে দেড় টাকা দিয়ে। ওজন সের দেড়েক হবে। দরটা একটু চড়াই হলো। তা হোক পালপাবণের দিনে হবেই। সময়মতো যে এমন জিনিস পাওয়া গেছে এটাই ভাগ্য।...কলার পাতায় জড়িয়ে দেয় গোয়ালার যত্ন করে। তিনবার কপালে ছুঁইয়ে সাইদের টাকা টেকে গোঁজে। দীলু খুশী মনে এগিয়ে যায় আরও একটু ভেতরের দিকে। বড় রাস্তার ধারে বিল্লী (এক রকমের মিহি খই, স্নগন্ধিমুক্ত) আব চিনিব ছাঁচ নিয়ে বসেছে দোকানীরা। আড়াই সের ছাঁচ ও পাঁচ পো বিল্লী একটা মাটির হাঁড়িতে করে কিনে ফেলে। মাধর জীউর কুপায় জলযোগটা বেশ জমবে। আজকের এত লোকের ভিড়ের মধ্যেও যে এ রকম মালাই পাবে তা ও ধারণাই করতে পারে নি। মুড়ি তো নোকোয় আছেই, এখন গণাকয়েক কচি শসা হলেই মিটে যায়। কিন্তু একা একা আর এত জিনিস বয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলো রেখে এসেই আবার নিতে হবে।...দীলু দু'হাত জোড়া সওলা নিয়ে তাড়াতাড়ি নোকোয় ফিরছিল। কিন্তু পেছন ফিরতেই পলান আর করিমকে আসতে দেখে। করিমের হাতে বড় বড় বারো চৌদ্দটা ফজলী আম পলানের কাঁধের ওপর বিরাত একটা কাঁঠাল। ওজন কম করেও সাত আট সের হবে। দাম পাঁচ সিকে। ফজলী কয়টা ছুঁটাকায় কিনেছে করিম। দীলুকে হঠাৎ ছেয়ের ওপর থেকে কিছু না বলে না কয়ে ছুটতে দেখে ওরা দু'জনও অনুসরণ করেছিল। যার যা মন চেয়েছে সওলা করেছে। কেউ কাকেও বাধা দেয়নি। এ সওলা ওদের নিজেদের পয়সায় কেনা। হুতরাং কারো কিছু বলবার নেই।...

ছোটরা দিনভর মুড়ি চিড়ে আর তেল-ভাজা খেয়ে খেয়ে খিত্তিয়ে পড়েছিল। শুধু ও-জাতীয় খাবার হলে ওরা আর ধারে কাছেও খেঁষতো না। কিন্তু মালাই, আম আর কাঁঠাল দেখে আবার সকলে পাতা নিয়ে ঘুরঘুর শুরু করে। খাবার সবই গিন্নীদের জিম্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারাই যাকে যা দেবার দেবে খুবে। মদন আনন্দ মেলায় পা দিয়েই হুঁচোখে যা দেখেছে গিলেছে। বড়োদের মতো ওরা কেউ উপোস দিয়ে নেই। তবু মালাইয়ের লোভে পাছ ছাড়ছে না। করিম, পলানও রীতিমতোই ছাত্ত মুড়ি চিড়ে খেয়েছে। সাবাদিনের বোবাঘুরিতে সে খাওয়া জল হয়ে গেলেও যারা উপোস দিয়ে আছে তোড়জোড় করে সর্বপ্রথম তাদেরই বসিয়ে দিতে যায়। কিন্তু দীহু ওদের বেখে কিছুতেই বসে না। আনন্দ, মদনের ইচ্ছে ওদের সঙ্গেই একত্র বসে। কিন্তু দীহু বেছে বেছে ওদের ওপরেই পবিবেশনের ভার দেয়। পরস্পর হতাশায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেও শেষ পর্যন্ত কাছে লাগতে বাধ্য হয়। মেয়েরা সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছে ওরা এনে পরিবেশন করছে। ছোটদের কাউকে পাত পেতে বসতে দেওয়া হয় না। এক একটা তো খুদে রান্ধস। সারাদিন যা পাচ্ছে গিলেছে আর হাগছে। পেট নয়তো যেন জয়ঢাক। যার যার চেলেমেয়ে সে সে সামলায়। যৎসামান্য যা দেবার হাতে হাতে দিয়েই শাস্ত কবতে চেষ্টা করে। কেউ চুপ করে—কেউ ট্যা ট্যা করতে থাকে। মায়েদের সঙ্গেও কেউ কেউ বসে আবার।

সকলের জলযোগের পর জয়ধ্বনি দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। এবার আর কোন আয়াস নেই। স্রোতের মুখে শুধু হাল ধরে বসে থাকা। বংশীর জল নেচে নেচে চলেছে। সাত আট মাইল পথ ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। দুপুরের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি দিয়েই গা ঢাকা দিলে। ঝিরঝির করে বইছে জলো হাওয়া। পুরন্বরা সকলেই এসে ছেয়ের ওপর বসে। দল আগের মতোই ঠিক আছে। গিন্নী-বান্নিরা এবার রান্নার কাজে মন দেয়। মদন ধামরাইর বাজার থেকেই ইলিশ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু পলান রাজী হয়নি। বাজারে দর বেশী হবে। আবার বাসি পচা হবারও সম্ভাবনা আছে। সামনেই ঘুঘুদিয়া। জেলেদের আড়ত। ওখান থেকে দেখেগুনে কিনলে সব দিক থেকেই সুবিধা হবে। সকলেই পলানকে সমর্থন করে।

ভাটির টানে গস্তি হুঁখানা বেশ গা ছেড়ে দিয়ে চলেছে। এদিক থেকে

ঘাবীখানার গতিই বেশী। একক ছেড়ে দিলে নাগালের মধ্যেই থাকবে না। কিন্তু তাতো আর হতে পারে না। সকলে একসঙ্গে এসেছে একসঙ্গেই ফিরবে। মেয়েদের গস্তিখানার সঙ্গেই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় ওটাকে। গতি প্রতিহত হয়।

ফেরার পথে আর ফকিরের আসর বসে না। কীর্তনও না। সকলেই এবার খোশ গল্পে ব্যস্ত। সকলের মনেই বইছে খুশীর হাওয়া। ঘাবীখানায় চলেছে চ্যাংড়ার দল। এর ভেতরে আবার একটু যাবা বয়স্ক তাবা বসেছে ছৈয়ের ওপর। কেউবা পেছনের গলুইতে। আনন্দ, অশ্বিনী, ওসমান, মদন এদেব দলে। সামনের গলুইব দিকে আছে, কাশেম, নিশি, ফজলুল প্রভৃতি। পাশাপাশি গস্তির সামনে বসেছে ময়না, পার্বতী, মেহেরা, আমিনা, আনোয়ারা। ছৈয়ের মাঝামাঝি বাচ্চা-কাচ্চারা। গিল্লী-বাল্লিরা পেছনের দিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ময়না নিশির মধ্যে তেমন কোন জড়তা নেই। আজ অনেক দিন পব ওরা এত কাছাকাছি বসতে পেরেছে। কিন্তু মেহেবার যেন লজ্জাই কাটে না। কাশেমকে দেখে স্তূদীর্ঘ ঘোমটা টেনেই ও জবুথবু হয়ে বসে আছে। পার্বতী সামনে বসে কুটনো কুটে দিচ্ছে। মেহেরাব উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতেই বলে, কিগ বেগমসাহেবা, ঘরের নোকের কাছে আবার এত সবম কিসেব? ঘুমটা খইলাই বহ (বসো) না।

মেহেরার তবু লজ্জা কাটে না। ঘোমটার নীচেই ফিকফিক করে হাসতে থাকে।

ওকে নিরুত্তর দেখে পুনরায় কাশেমের সঙ্গেই বসিকতা শুরু করে পার্বতী, মিত্রা সাবও যে চূপচাপ কইরা বইহা রইলেন। বিবিজানরে কোলে লইয়া বহেন না।

মেহেরা নিরুত্তর থাকলেও কাশেম নিরুত্তর থাকে না। সমতা রেখেই জবাব দেয়, কোলে উঠবার লেইগা যদি আপনার সক অইয়া থাকে তাইলে কন্ অশ্বিনী দাদারে ডাইকা দেই। মনের মাছুষরে কোলে লইয়া বইহা খাউক।

হেসে পার্বতী বলে, আমরা পুরান অইয়া গেচি, আমাগ আর পোচে ক্যারা। মনের নাছুষ দেখবার চান ত তবে এই ছাহেন, এক ঝটকায় মেহেরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে দেয় পার্বতী।

বেচারা মেহেরা তাড়াতাড়ি ছু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অবিরত হাসতে থাকে।

কাশেম বলে, অত হাসবার কি আছে। দিদির যখন সখ অইচে তখন কোলে না বইলা ঘুমটাডা খুইলাই বহ না।

হ, তাই কনচে। চাঁদ মুখ কি আমরা গিলা খাইয়া কালামু?

এর পর আর মেহেরা ঘোমটা দিয়ে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকতে পারে না। শুধু চাঁদ পর্যন্তই ওঠে। মুখখানা সম্পূর্ণই দেখা যায়।

পার্বতীর দৃষ্টি পড়ে এবার নিশির ওপর। সবসতা নিয়েই বলে, নিশি-ভাইয়েরও কি মইনীরে দেইখা নতুন কইরা লজ্জা অইল নাকি? প্যাট খেইকা হইড়াই না দুইজনে গলাগলি ধইরা আচ।

কথাটা সত্যি হলেও নিশির মধ্যে কেমন যেন জড়তা এসেছে এখন। আগের মতো কিছুতেই আর ও ঝাঁ করে ময়নার চুলের মুঠি ধরতে পারবে না। ময়নাও হয়তো পারবে না কথায় কথায় ওর গলা জড়িয়ে ধরতে। কেমন যেন পবিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। সর্বদা গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে। এ যেন এক অভিনব রহস্য। জানা ময়নাকে নতুন করে জানতে ইচ্ছে করে।...পার্বতীর কথায় কোন জবাবই দিতে পারে না। শুধু একটু হাসি খেলে ঠোঁটের কোণে।

কিন্তু পার্বতী ছাড়বার পাত্রী নয়। কাশেমও ছাড়ে না। পার্বতীকে সমর্থন করেই কাশেম বলে, কিগো ময়না পাখী, আর কিচু কইবার না পার নিশি হইরে একটা গং বাজাইবার কও না।

হ নিশিদাদা, ইসব ফাইজলামির কাম নাই। তুমি আমাগ একটা গং বাজাইয়াই ছনাও, এতক্ষণ পব মেহেরা মুখ খোলে।

পার্বতী সায় দেয়, বেশ, তাই বাজাও নিশিভাই। মেহের সোনা নাগরের গলা ধুইরা ঝুলুক।

আমরা ঝুললে আপনাগও ঝোলন লাগব দিদি। অশ্বিনীদাদা ত পাছার গলইতেই আছে, ডাইকা দিমু নাকি, কাশেম পাণ্টা রসিকতা করে।

নিশি আর কাকেও কোন স্বেযোগ না দিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ভাটিয়ালির স্বর অহুরণিত হতে থাকে বংশীর মেঘ-ঘন বক্ষে। মিছিল করে চলেছে নৌকোর বহর। পাশাপাশি ষাচ্ছিল আর একটি সৌখীন দল। স্বরের মুছর্নায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলে বুড়ো সকলের প্রাণেই সাড়া জাগায় নিশির বাঁশের বাঁশী। বেজে বেজে থেমে যায় এক সময়। কিন্তু প্রোতাদের রেশ কাটে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে পার্বতী আবার আবার করে, ঐ গংটা বাজাও নিশিভাই।

কোনটা...নিশি জিজ্ঞেস করে।

হেসে পার্বতী বলে, ঐ যে সেই—“রাধে তোর তরে কদমতলে বসে থাকি”...

নিশি কিছু বলার আগে কাশেম টিপ্তনী কাটে, হ হ নিশিভাই, তাই বাজাও।
দিদির লেইগা যে দাদায় এহনো পছাঁর গলইতে বইহা আছে।

পার্বতীও ছাড়ে না, বলে, দিদির কতা পরে ভাইবেন। বিবিজান যে
আপনার লেইগা সামনেই বইহা আছে।

কি খালি খালি বাজে কথা। নিশিভাই, বাজাও গংখানা, মেহেরা
অমুরোধ করে।

নিশি আবার কাউকে কিছু বলবার স্মযোগ না দিয়ে স্বর ধরে। আবার
উচ্ছ্বাস জাগে আবার বৃদ্ধ বনিতার বৃকে। সামনের গস্তিব ছৈয়ের ওপব বসে
বুড়ারা জটলা করছিল। বাঁশির স্বর তাদেবও উন্ননা করে তোলে। কেউ আর
কোন কথা বলতে পারে না। কান পেতে নীরবেই শুনতে থাকে। বাঁশী
থামলে দীমুকে লক্ষ্য করে পলান বলে, বৈরাগীর পো, পোলাব সাদী তাড়াতাডি
দিয়া ছান। কদমতলায় আব কতদিন বইহা থাকব ?

দীমু মুখ টিপে টিপে হাসে।

উত্তরটা করিমই দেয়, বেশীদিন না থাকলেও এক বছর ত থাকনই লাগব।
ইনাগ শাস্ত্রে যে আবার এক বছর অশৌচ পালন লাগে।

হ, তা কাটল ত কন্ন মাস। বাকীডা কাটলেই অইয়া যায়।...

হিসেব মতো ওরা হয়তো প্রথম রাত্রেই চরে পৌছতে পাবতো। কিন্তু
ভোজ থাকায় ঘৃষুদিয়ার বাকৈ হিজল গাছেব সঙ্গে নৌকো বেঁধেই রাত কাটাতে
হয়। প্রাণপ্রাচুর্যে চলে খাওয়া-দাওয়া রং-তামাসা। ভোর ভোর সকলে
এসে চরে পৌছায়।

॥ ২৩ ॥

প্রথম রথের পর ফিরতি রথও কেটে যায়। কিন্তু পাটের দর আর ওঠে
না। কেমন যেন থম থম করছে বাজার। অগ্নাগ্রবার মাসখানেক আগেই
গঞ্জে রেলি ব্রাদার্সের আকিস খোলা হয়। কিন্তু এবার সবই ভেঁা-ভাঁ। পূর্ণ
পাসেজার বার কয়েক নারায়ণ গঞ্জে শুধুই দৌড়বাঁপ করলেন। এ পর্যন্ত এক
ছটাকের ধরিতও আনতে পারেননি। ধামরাইর রথে গড়পড়তা এগারো বারো

ঢাকায় সাইদ হয়েছিল। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এখন সে পাট আট নয় টাকার বেশ নয়। তাই বা খদ্দের কোথায়? শুধু ফাঁকা কথার ছড়াছড়ি। দিন যত যাচ্ছে চরের মাহুশের বুক কেঁপে উঠছে। মাসখানেক পরেই তো আসল গাছ পাট লাগবে। তার আগে আছে কাটাই, জাগ, বাছাই, ধোলাই ও শুকোবার খরচা। প্রথম দফার খরচা বাবদ মোটা হুদে অধিকাংশেরই কর্জ নেওয়া আছে। ভেবেছিল, দ্বিতীয় দফার খরচা বাছ পাট বেচেই হবে। কিন্তু তা আব হচ্ছে কই। রথে যা বেচেছে, বেচেছে। তারপর তো এ পর্যন্ত একটা ছিনকাও বেচতে পাচ্ছে না কেউ।...

দশিস্তায় দুশিস্তায় দিন কাটতে থাকে। হাতে এখন আব তেমন কোন কাজ নেই। ধলেশ্বরী বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। চেউয়েব ফোস-ফোসানী না থাকলেও স্রোতের টান তয়ংকর। চাবদিকের নালা-ডোবা থেকে দলে দলে ভেসে আসছে কচুরিপানা। পাট গাছ এখন যথেষ্টই বড়ো হয়েছে। এখন আব চাপায় পড়ে মারা যাবাব সম্ভাবনা নেই। তবু যদি ক্ষেতের ভেতবে কচুরিপানা ঢোকে তাহলে ক্ষতিব সম্ভাবনা আছে। গাছের গায়ে পোকাও লাগতে পারে। চরের মাহুশেব এখন প্রধান কাজ চারদিকে স্তুতীক্ষ নজর রাখা। কিছুতেই যেন কচুরিপানা ক্ষেতে না ঢোকে।

দামান্ত কাজ, সকলেই মন দিয়ে কবে। সাবাদিন তো শুয়ে বসে তামাক গেয়েই কাটাতে হয়। নোকো ছাড়া এক পা বাড়ির বা'র হবার জো নেই। দ্ব-বাড়িগুলো সবই যেন জলের ওপব ভাসছে। বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক একটি জীবন-বয়া যেন। মাঝে মাঝে ছ'পাঁচ জনকে নিয়ে দয়াল চানের আসর মেয়েও ভাগবতের আসব আর তেমন জমে না। চরের সকলের নোকো ডিকি নেই। দীহুর ডিকিতে সময়মতো যাবা আসতে পারে কেবল মাত্র তারাই আসে। সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে রামকান্তকে নিয়ে। এক তো উত্তর কোণের শেষ প্রান্তে তার বাড়ি—ডিকি নিয়ে অনেকটা পথ যেতে হয়, তার উপর আবার প্রায়ই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। দৈতসেতে ঘর ছেড়ে গঞ্জের কাছারিতেই অধিকাংশ সময় কাটায় রামকান্ত। বেচারার দোষ নেই। বন্দী অবস্থায় একা এক ঘরে কতক্ষণ লোকের মন টেকে। চরে ওর দোসর কেউ নেই। নাম-কীর্তন আর ভাগবত পাঠ ব্যবসা হিসেবেই করতে হয় ওকে। মনের শান্তি কিছুমাত্র ওতে হয় না। তাই রমেশনারায়ণের সঙ্গে গ্রীনবোর্টে মাতোয়ারা হয়ে পড়লে কোন কোনদিন ছেদও পড়ে যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও খেছায়ই ঘটাতো। পারে না

শুধু রমেশ্বরনারায়ণের সামান্যতম অল্পকম্পার অভাবে। নিদেন যদি একটা তসিলদারের কাজও ওকে উনি দিতেন।...

ধরতে গেলে তামাক খেয়ে আর আলসেমী করেই দিন কাটছে চরের মানুষের। তবু এরই মধ্যে আর একটা ফাউ কাজ জুটে যায়। ভরা বর্ষায় গঞ্জের মানুষ মাছ একবকম খেতে পারে না বললেই হয়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নদনদী উথলে পড়েছে। পাড় কূল কিছুই নেই। জেলেরা এখন আর বেডাজাল দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। জালের পরিধি খই পায় না। শ্রোতের মুখে বড় বড় মাছ কে কোথায় লুকিয়েছে পাত্তা পাওয়াই ভার। বর্ষাব মাছ একমাত্র ইলিশ আর চিংড়ী। ইলিশ মাছ আবার সবদিন সমান ধরা পড়ে না। তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে ওদের চলাচলের যোগ। যখন ধরা পড়বে তো ঝাঁকের ঝাঁক। আর যখন না পড়বে তখন সারাদিন পরিশ্রম করেও ছ'চারটে ধরা শক্ত। তবে চিংড়ীর ব্যাপাব অবশ্য আলাদা। চিংড়ী সব সময়েই ধরা পড়ে। মাঝ গাঙে নৌকোর ওপর থেকে টানা-জাল ফেলেই ধরতে হয় বর্ষার চিংড়ীকে। যেমন ব্যয়সাধ্য তেমন পরিশ্রমেব একশেষ ? গঞ্জের বাজারে তাই দামও তাব তেমনি চড়া। গবীর-গরবার সাধ্য নেই মাছ মুখে দেয়।

গঞ্জের মানুষের অবস্থা যা-ই হোক চরের মানুষের কিন্তু পোষাবারো। প্রত্যেকের বাড়িব বাকে সামান্য দুটো একটা পারন (মাছ ধববাব খাঁচা) পেতে রাখলেই সংসারের মাছ অফুরন্ত। পেট পূরে খেয়েও দিতে থুতে আটকায় না। এক এক বাত্রে গালা গাদা চিংড়ী আর বেলে ধরা পড়ে। গবীবদের অনেকে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বেশ চড়া দামেই বেশীটা বেচে আসে। পারন ছাড়া ছিপ দিয়েও অনেকে বড় বড় বেলে মাছ ধরে। শুধু শুয়ে বসে না থেকে অনেকেই তাই মাছ ধরে সময় কাটায়।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতে গঞ্জের মানুষ ওস্তাদ। চরের ঘরে ঘরে তাদের পাতানো ইষ্টতা। মামু, নানী, চাচা, মিতা, দোস্ত যার সঙ্গে যে যেভাবে পেরেছে। স্ত্রুতাং মিত্রদের অভাবের সময় পারনের মাছ চরের মানুষ একা খেতে পারে না। ছ' পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ভেট না দিয়ে উপায় নেই। হিসেবের খাতা খতাতে গেলে শুধু বাঁ-দিকের অঙ্কই বেড়ে চলেছে দেখা যায়। জমার ঘরে হয়তো শুধুই শূন্য। তবু চরের মানুষ চোখ কান বুজতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা ওদের যেন শুধু দেবার জগ্নেই সৃষ্টি করেছেন। ওদের কেউ দিলে কি না সে হিসেব ষতিনে দেখতে ওরা জানে না। মহাজনরা তো আরো এক

কটি সরেস। স্বদের বেলায় কানা কড়িটিও মাপ হবে না কিন্তু নেবার বেলায় ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। স্বদ দিতে এসে রসিদ হয়তো বললে, কর্তা কিছু মাপ চাই।

কর্তার মুখে না নেই। বিড়বিড় করে তিনবার আঙড়ালেন স্বদের অঙ্ক। টাকা প্রতি মাসিক ছ'আনা স্বদ। তিন মাস দশ দিনে পনেরো টাকার স্বদ হলো ধর সাত টাকা চার আনা—আচ্ছা দে তুই এক টাকা কম।

এক টাকা মকুব পেয়ে নিবন্ধর বসিদের আনন্দের সীমা নেই! দাঁত বার কবেই হাসতে থাকে। সারা বর্ষা হয়তো পাবনের চিংড়ী আব বেলে কর্তাকে দপটোকন দেবে—দশ জায়গায় কর্তার গুণগান করবে।

কর্তার ঠোঁটেও খশীব হাসি। যাতুব খেলাই যেন। হিসেবের মধ্যে অগ্রিম এক টাকা বেশী ধরে পবে সেই টাকাই বাদ দিয়ে দয়াল সাজা।

এ শুধু একক একটি স্বদখোরের কথা নয়। ওদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই এটা। হাটের দিনে হাটে এসেছে দেদার বক্স। সঙ্গে গোটাকয়েক কুমড়ো খাব শসা। বেচে হয়তো সপ্তাহেব ছুন তেলের পয়সা হবে। আব এক কর্তা খাতে আস্তে এসে হাজির হলেন দেদাবেব কাছে। শ্চেন পক্ষীর দৃষ্টি—লুকোবার উপায় নেই। নেড়েচেড়ে কচি শসা জোড়া ও বড় কুমড়োটাই গামছায় বেধে গাটা দিলেন। আসার সময় দশজনকে শুনিয়েই বলে এলেন, গদী থেকে দাম নিয়ে আসিস দেদার।

দাম যা পাবে তা দেদারও জানে আর দশজনেও জানে। তবু মুখ খুলবার উপায় নেই দেদারের। একের ঝাল অণ্ডের ওপর ঝাড়তে উত্তত হয় সে। যাবা নগদ পয়সায় জিনিস কিনতে এসেছে তাদের ওপরেই লোকসানের অঙ্ক গপাতে চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে দেদার হয়তো দামেব জন্ত গদীতে এল। এসে দেখে, কর্তা হরিনামের ঝোলা নিয়ে বসেছেন। বাহ্যিক চেতনাই নেই যেন তার। দেদার ডাকাতে সাহস পায় না। প্রয়োজন থাকলেও কিরে যেতেই মনস্থ করে। উঠে হয়তো বেরিয়েই আসবে, কর্তা চোখ খোলেন। হরিনামের মালা তিনবার ফপালে ছুঁইয়ে পেছু ডাকেন, কে রে, দেদার নাকি ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আদাব জানায় দেদার। বলে, আইজ্ঞা হ।

কর্তা বলেন, বোস, তামাক খা। একেবারে যে সন্ধ্যা করে ফেলেছিস।

আইজ্ঞা হ, কাম সারতে সারতে বেলা অইয়া গেল।

তা তোর জ্বিনিসের দাম কতো দেবোরে ?

জ্ঞান কত্তা আপনার যা মোন চায় ।

না না, বল , কত দেবো ?

আমি আবার কি কমু । আপনেই জ্ঞান ছাম কইরা ।

কর্তা আর সময় ক্ষেপ করেন না । স্বযোগ বুঝে বলেন, শশা জোড়া কচি হলেও বড় ছোটরে । কুমড়োটা বোধ হয় তেমন মিষ্টি হবে না । বড্ডে কাঁচা । আচ্ছা নে, তোকে আব ঠকিয়ে কি হবে, টেক হাতড়িয়ে একটা দু'আনি দেদারের দিকে ছুঁড়ে দেন ।

সারাদিনের ক্লাস্তির পর বেশ আরাম করেই তামাক ছিলুম খাবে ভেবেছিল দেদার । কিন্তু কর্তার বেহিসেবী কাণ্ড দেখে মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে । বাজারে বেচলে কম করেও কুমড়োটাই চাব অনায় বেচতে পারতো । শশা জোড়াও চার ছয় পয়সার কমে বিকোতো না । এমন আক্কেল-নাশা মানুষ !...ইচ্ছে কবে দু'আনিটা ছুঁড়ে মাবে কর্তার নাকের ডগায় । কিন্তু পারে না ।

কর্তা ভাব বুকেই পুনরায় কীর্তনে মাতে, পাট এবার কেমন হ'লরে দেদার ?

গলার স্বর শুক করেই দেদার উত্তর করে, অইচে একবকম । আইচ্ছা, উঠি এখন কত্তা, উঠে দাঁড়াতে যায় দেদার ।

কর্তা বাধা দেন, আরে বোস বোস , আর-এক ছিলুম তামাক খা । ছেলেপুলে সব ভালো আছে তো ?

রাগ হয়েছিল দেদারের, কর্তার আন্তরিকায় মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায় । হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ আশীর্বাদে আল্লায় রাকচে একরকম, বসে পড়ে আবার এক ছিলুম তামাক সাজতে থাকে ।

দেদারকে খুশী করতে পেরে কর্তা নিজেও খুব খুশী হন । জপের মালায় বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে আসল কথায় আসেন, পারনে মাছ-টাছ কেমন পড়ছে ?

কল্পেতে ফুঁ দিতে দিতে দেদার বলে, তা মোন্দ পড়চে না কত্তা । কাইল বিহানে চাইরডা দিয়া যামুনে । বড় বড় ডিমওলা ইচা (চিংড়ী) আর বাইলা (বেলে মাছ) । বাইলার প্যাটেও ঠাসা ডিম ।

কর্তার জিভ দিয়ে টসটস করে জ্বল গড়াতে থাকে । সমানে ডাল ভাত খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়বার উপক্রম হয়েছে । কে খাবে দু'আনা দশ

পয়সা কুড়ি চিংড়ী মাছ কিনে? জ্বদের টাকা অতো লপচপিয়ে খরচ করে ফেললে চলে না।...রসনার রস সজোবে চেপেই কর্তা বাধা দেন, না না, দেবার জ্ঞান বলিনি। এমনই জিজ্ঞেস কবলাম, আমাদের এপার্ব তো মাছ নেই বললেই হয়।

কি যে কন কত্তা। কিনা দিমু নাকি যে তাই না করেন। পারনের মাছ দিমু তায় আবাব কি অইব। কাইল বিহানেই আইনা দিমু, পোলাপানে পাইব। গ্রান, সেবা কবেন, দু' দিতে দিতে কঙ্কেটা কর্তাব দিকেই এগিয়ে দেয় দেদার।

না, আমার হাতে এখন মালা রয়েছে, তুই খা।

দেদাব মনের খুশীতেই হুকো টানতে থাকে। বেশ মৌজ হয়েছো এমাক ছিলুমে। হবিনামেন মালা আর একবাব কপালে ঠেকিয়ে কর্তা ঠাক চাডেন, কই রে, কে আছিস। দেদাবকে গোটাকয়েক মোয়া দিতে বলে।

শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কতাব বাড়িতে মোয়া মুড়কী পাক হয়েছে। মোয়ায় খাসা ভাজা তিলের সোদা গন্ধ। গোটাকয়েক মুখে দিলে দেদার নিশ্চয় গলে যাবে। তাবপর-

হাক শুনে দেদার লজ্জা পায়। হুকো থেকে মুখ উঠিয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না কত্তা মশয়, এখন কিচু খাইবার পারুম না। নামাজেব সময় আইয়া আইল, উঠি এখন।

আরে বোস বোস। না খাস ছেলেপুলেদের জ্ঞান নিয়ে যা। ও তো ছেলেপুলেরই জিনিস।

দেদার আর আপত্তি কবতে পারে না! মনে মনে খুশীই হয় আদর আপ্যায়নে। তা মন্দ নয়, মোয়া কয়টা নিয়ে গেলে ছাওয়াল-পাওয়ালরা বেশ খুশীই হবে'খন। নাড়ু, মোয়া, মুড়কী বড় ভাল পাক হয় কর্তা মশায়দের বাড়ি। সেই ভাল, গামছায় জড়িয়ে নিয়েই যাবো মোয়া কয়টা।...

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বেতের কাঠায় করে আন্দাজ গোটা বারো মোয়া, কিছুটা তিলের ছাতু ও মুড়কা এনে হাজির করে কর্তার আট দশ বছরের এক ছেলে।

দেদার খুদে কর্তার হাত থেকে কাঠাটা নিয়ে গামছার মধ্যে ষত্ব করে বেঁধে নেয় জিনিসগুলো। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে, কর্তা আর খুদে কর্তাকে সেলাম জানিয়ে উঠে পড়ে।

দেদার উঠে গেলে কর্তার দিল চাক্ষু হয়ে ওঠে। যাক বাবা, আর খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড় খেতে হবে না। কাল থেকেই একটু মুখ বদলানো যাচ্ছে। আহু-হা, বর্ষার ডিমওয়লা চিংড়ী আর বেলে তো বাদশাহী খাবার। ঝোল খাও, ঝাল খাও, অহল খাও কোন কিছুতে আটকায় না। মালার ঝোল দেয়ালের ছকে ঝুলিয়ে রেখে কর্তা গদগদ হয়ে বাড়ির ভেতরে যান।

সত্যি, গতকাল যা লগ্নি করেছিলেন কর্তা আজ থেকেই তার হৃদ আদায় শুরু হয়েছে। বড় একটা খালুইতে করে শ' খানেক বেশ বাছাই চিংড়ী ও বিশ পঁচিশটে ডিমওয়লা বেলে নিয়ে উপস্থিত হয় দেদার। সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা কাঁচা-পাকা কুমড়ো। কর্তা তো খুশীতে আটখানা! খুদে কর্তা ছুটে এসে জ্যাস্ত চিংড়ীর গৌফ ধরে নাচাতে থাকে। বাবা:, আজ কতদিন পরে মাছ খেতে পারবে।...

খুদে কর্তার উল্লাস দেখে দেদার অন্তরে সহসা বেদনা বোধ করে। মাছ নিয়ে আসার সময় ছোট ছেলেটা মাত্র দু'টো বেলে আর গোটা দশ-বাবো চিংড়ী রেখে যাবার জগ্ন বায়না ধরেছিল। কিন্তু ও তা রেখে আসতে পারে নি। সামান্য এ কটা মাছ না দিলে কতার কাছে ওর মান থাকে কি করে?...দু'টো দশটা তো দূরের কথা—নামমাত্র একটা মাছও রেখে আসে না দেদার। খুদে কর্তার বয়সীই হবে ইলাহি। মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বেচারার আজ হয়তো খাওয়াই হবে না।...তা ও আর কি করতে পারে। মুখ ফুটে চাইলেন কর্তা। ও তো আর না বলতে পারে না। আবার দিতে গেলে এ কটা মাছ না দিলেই বা কেমন দেখায়। মনের দুঃখ মনেই চাপতে চেষ্টা করে দেদার। মাছ কটা টেলে দিয়ে শুধু খালুই নিয়ে বাড়ির দিকেই রওনা হয়।

॥ ২৪ ॥

ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়ে, বড়শি পারনে মাছ ধরে, খোল বাজিয়ে কীর্তন আর দয়াল চানরে ডেকেও দিন কাটছিল না চরের মাহুঘের। একে তো হাতে তেমন কোন কাজ নেই তার ওপর আবার পাটের বাজার থমথম করছে। ধামরাইর রখে যে পাট এগারো বারোয় বেচে এসেছে তারই অবশিষ্টাংশ ঠেকান

পড়ে নয় দশে বেচতে হচ্ছে। চাষীর মনে স্থখ নেই—দিনও কাটে না। নামী চাষ হয়েছে, ভাদ্রের মাঝামাঝি না হলে গাছ পাট কাটা যাবে না। হিসেব করে দেখতে গেলে আরো পনেরো কুড়ি দিন চুপচাপই বসে থাকতে হবে। না, এভাবে বসে থাকা বিরক্তির একশেষ। নতুন একটা কিছু জোড়া দিয়ে নিতে পারলে হতো ...

ওদের মুখ চেয়েই বোধ হয় দয়াল চান দয়া করেন। গঞ্জে ফি বছর মনসা পূজোয় ধুম হয়। প্রতি ঘরে ঘরে পূজো। কুল-নারীরাই এ পূজোয় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। শ্রাবণ সংক্রান্তির পাঁচ-সাত দিন আগে কার্টের পিড়ের ওপর, “আলা” পাতে (পিড়ের ওপর কাঁদা মাটি করে তার মধ্যে মুগ ও কলাই ক্ষেত করা)। পাঁচ-সাত দিনে লকলকিয়ে ওঠে কলাই ও মুগের চারা। সংক্রান্তির আগের দিন হয় ‘আলার’ অধিবাস। রং তুলি দিয়ে চিত্রানো হয় প্রত্যেকটি পিড়েকে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সন্ধ্যা রাত্রে হয় অধিবাস উদ্‌যাপন। কারো পাঁচখানা, কারো সাতখানা, আবার কারো বা ন’খানা পিড়ে। মনসা দেবীর বেদীর ছ’পাশে থবে থরে কচি সবুজের সমাবেশ। দেবী আসবেন সংক্রান্তির দিন ভোরে। কারো রীতি অষ্টনাগের পূজো, কারো বেয়াল্লিশ নাগের। আবাব ছাপ্পান্ন নাগের পূজোও করে কেউ কেউ। নাগ দিয়েই চালচিত্র—মাঝখানে দেবীর ভবন-ভুলানো মূর্তি। মর্ত্যে দেবী পূজোর প্রবর্তন করেন চাঁদ সওদাগর। ভক্ত আর ভগবানের সে এক অলৌকিক কাহিনী। চাঁদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সওদাগর। তাই পূর্ববঙ্গেই দেবী পূজোর ঘটা। দেবীর প্রধান ভোগ দুধ আর কলা। কলার দাম আর দুধের দাম তাই এ ছ’দিন পঞ্চমে ওঠে। তিন আনা চার আনা সের থেকে চৌদ্দ আনা এক টাকা পর্যন্ত ওঠে দুধের দর। অধিবাসের দিন কোন ভোগ-রাগ নেই। শুধু ফুল, আলপনা আর ‘আলা’ দিয়ে সাজানো হয় বেদীমূল। পরের দিন সংক্রান্তিতে হয় ছ’বেলা পূজো—ভোগরাগ। তার পরের দিন এক বেলা পূজোর পর হয় ভাসান। এই ভাসানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর গঞ্জে বেহলার হাট বসে। এ কোন পণ্যের হাট নয়—দেবীর হাট। এ হাটে দেবীর মাহাশ্বাই কীর্তিত হয়। নমশূত্রের মেয়ে শ্রামদাসী। বয়েস পঞ্চাশ পঞ্চান্ন—বিধবা। কালো গায়ের রং। সামনের তিনটে দাঁত নেই। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। প্রবাদ, বংশীতে নাইতে গিয়ে মা মনসার ঘট পেয়েছে শ্রামদাসী। ‘জিরন’ ঘট। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঘটের জল নতুন করে মন্ত্রপুত করেন

হাটের ঠাকরুন। মা মনসার গুণগান করেন। ঘুঙুর পায়ে নাচেন। আশ্রপল্লব দিয়ে পূতবারি ঘন ঘন সিঞ্চন করেন ভক্তগণের শির-পরে। কুললক্ষ্মীরা দলে দলে আসেন বেহুলার হাটে। সিধা জলপান দেন হাটের ঠাকরুনকে। নতজন্ম হয়ে শিবে ধারণ করেন 'জিয়ন' ঘাটের সিঁদুব— পূতবারি। একবছর আর সাপের ভয় নেই। কেউ কেউ আবার তাগা, তাবিজ, ঔষধি-শিকড়ও নেন আমদাসীর কাছ থেকে।...

প্রতিবারই বেহুলার হাটের মধ্যে হয় উৎসবের সমাপ্তি। তার আগে ভাসান উপলক্ষে চলে নোকো বাইচ। স্থানীয় প্রতিযোগিতাই কেবল যোগ দেয় এতে। বিশেষ কোন পুরস্কার বিতরণের রীতি নেই। শুধু বাহবা আর করতালি। তাতেই গ্রামের মানুষ মুখর হয়ে ওঠে। শ্রাবণের প্রথম দিকেই মেরামতের পর ছিপে গাব দেওয়া আরম্ভ হয়। একশ হাত দেড়শ হাত লঙ্গা ছিপ। কোনটার গলুই ময়ূর-মুখে। কোনটায় বা গরুড়, মকর, জলপরী। আবার সাধাসিধে চঁচলো মুখও কোন কোনটার। তাতে আবার সারবন্দী পেতলের কলসী বাধা। বড় থেকে ক্রমাগত ছোট হয়ে গেছে কলসীর বহর। প্রত্যেকটির পেছনের গলুইতে স্ব স্ব প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা। নিচে পঞ্চাশ বাট, উর্ধ্বে একশ দেড়শ জন জোয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী সারবন্দী হয়ে বসে দু'দিক থেকে বৈঠা চালায়। ছোট ছোট কাঠের হাত বৈঠা। সর্দারের হুকাবেব তালে তালে অবিবত জলেব ওপর পড়তে থাকে। ছিপ যায় তরতর করে এগিয়ে। যেন মনপবনের নাওই চলে জলের ওপর দাগ কেটে।

চরেব মানুষ ফি বছরেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে করে একত্রে ফুর্তি—জারি, সারি, গোষ্ঠ গায়। গতানুগতিকতায় কেউ কেউ আবার কিমিয়েও পড়ে। অজ্ঞান বারের কথা যাই হোক, এবার আর কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। শ্রাবণের প্রথম হাট থেকেই শুরু হয়েছে "ছাণ্ডবিল" বিলোনে। গঞ্জের বাবু ভূইঞরা এবার বিশেষ ব্যবস্থা করছেন। এবার আর শুধু বাহবা আর করতালির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সীমাবদ্ধ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় স্বয়ং দিচ্ছেন একখানি সোনার মেডেল ও তিনটি বড় রূপোর কাপ। তার বন্ধু ইন্দ্র পোদ্দার দিচ্ছেন ছোট বড় দশখানা মেডেল। বন্ধকী কারবার ইন্দ্র মোহনের। বহু ভরি খাদ মিশানো রূপো অচল হয়ে পড়ে আছে সিঙ্ককের তলায়। গোটাকয়েক মজুরীর ছাঁকা ছাড়া টেকের একটি কানাকড়িও ধসবে না। এ তো খুবই সামান্য

ব্যাপার। স্বদের ওপর দিয়েই যাবে—আসলে হাত পড়বে না। এতে যদি ভবিষ্যতে ভাগ্য খোলে সে তো আনন্দেবই কথা। না না, ও খুশী হয়েই দিচ্ছে মেডেল ক'খানা। মা লক্ষ্মীব রূপায় পয়সার কিছুমাত্র অভাব নেই। এখন চাই যশ ও প্রতিপত্তি। আব তা পেতে হলে সর্বাগ্রে জনচিত্তে প্রবেশ কবতে হবে। তাদেরই প্রতিনিধিকপে যেতে হবে ইউনিয়ন বোর্ডেব সদস্য পদে। আব-এক ধাপ উঠে ডিসট্রিক্ট বোর্ডেব চেযাবম্যান, তাবপব এম, এল, এ। তাব পবেব ধাপ কেন্দ্রেব সদস্য হওয়া। মাহুয তে এমনি কবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। মাহুযই মাহুযকে অমব কবতে পাবে। টাকা কিছু নয়।... ইন্ড মোহনেব বকে ঢাবাকজ্জাব ঝড় ওঠে। শুধু মেডেল দশখানাই নয়। 'স্বাংবিল' বিলি ও ঢোল শহবৎতব যাবতীয় খবচা এ পর্যন্ত সেই যুগিয়ে আসছে। প্রয়োজন হলে আবো যোগাবে।..

ইন্ড মোহনেব পবে উৎসাহদাতা হলো বহিমুদ্দীন খলিফা। প্রেসিডেন্ট আব ইন্ড মোহনেব সঙ্গে বহিমুদ্দীনেব গলায় গলায় ভাব। সে দেবে ভলেষ্টিযাবদেব ব্যাজ, পবিচালক মণ্ডলীব প্রতীক পতাকা ও পাচখানা কপোব মেডেল। আবো শ'খানেক মেডেলেব প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় বিভিন্ন বাবসায়ী ও গণ্যমান্য লোকেব কাছ থেকে। স্বয়ং বমেন্দ্রনাবায়ণও উৎসবে মাতেন। তাব কাছাবি বাড়িই হবে পবিচালক মণ্ডলীব আপিস ঘব। চাঁদা ও মেডেল উনিও দেবেন।...

ঢোল শহবৎ যোগে জানানো হয়, প্রতিযোগী প্রত্যেকটি দলকে পান স্তম্ভবি বিড়ি মুফত দেওয়া হবে। আব দেওয়া হবে একবেলার খোবাকী বাবদ—জন পেছ এক পো কবে চিঁড়ে, আধ সেব দই ও আধ পো গুড়। প্রবেশ কি এক পয়সাও লাগবে না কাবো। ২৫শে শ্রাবণ ভর্তি হবাব শেষ তাবিখ।...

দূব দূরাস্ত থেকে আসে হাটুবেবা। বাতা বটে যায় দিকে দিকে—গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তবে। দলে দলে এসে ভর্তি হতে থাকে প্রতিযোগিরা। লোক সংখ্যা জানিয়ে যায়। নিজেদেব মধ্যে চলে সংগঠনেব কাজ। পুবোনো ছিপ বাতিল কবে কোন কোন দল চাঁদা তুলে নতুন ছিপ গডতে আরম্ভ করে। সাবি, জাবি, গোষ্ঠেব সঙ্গে গজ্জেব বাবুদেব গুণপনার উল্লেখ করে গানও বাঁধতে থাকে কেউ কেউ। প্রতিদিন প্রতি রাত্রে চলে মহড়া। চরেব মাহুযেব মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওদের দু'খানি ছিপ প্রতিযোগিতা করবে। একটি চরধল্লার আর একটি ফুটনগরেব। ভাগবত আর দয়াল চানেব আসর

একরকম বন্ধ বললেই হয়। জনকয়েক বুড়া-বুড়ীর পাল্লায় পড়ে রামকান্তকে নিয়মিত যেতে হয় বটে কিন্তু আসর মোটেই জমে না। সবাই ব্যস্ত বাইচের তোড়জোড় নিয়ে। তা সংগঠন নেহাত মন্দ হয়নি। সোনার মেডেল ও কাপ না পেলেও ছ'চারটে রূপোর মেডেল কেউ আটকাতে পারবে না।...

বাইচ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ হাতি নৌকোর এক ভাগ। চল্লিশের ওপর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আর এক ভাগ। এবং পঁচাত্তরের ওপর থেকে মতো উর্ধ্বই হোক তার আর এক ভাগ। দিন যতো ঘনিয়ে আসছে প্রতিযোগীর সংখ্যা ততোই বাড়ছে। হিসেব মতো ধরতে গেলে লকাধিক লোক আসছে গজে। স্কুল কমিটির নিকট দরখাস্ত করে বাইচের দিন স্কুল ছুটি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রই হবে ভলেন্টিয়ার। এ ছাড়া অগাধ সাধারণ লোকের মধ্য হতেও শ' পাঁচেক কর্মী পাওয়া যাবে। শাস্তিরক্ষার জগ্ন পুলিশ সাহেবের নিকটেও সদরে দরখাস্ত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের আবেদনে স্বয়ং এন্স পি-ই আসছেন সদলবলে বাইচ দেখতে। এছাড়া আছে স্থানীয় থানার রক্ষীবাহিনী। আয়োজন যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবেই এগিয়ে চলে। তন্নট জুড়ে হই হই রৈ রৈ কাণ্ড।...

পয়লা ভাদ্র বুধবার। গজে আজ বহু বিঘোষিত বাইচের দিন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নহবত বাজতে শুরু হয়েছে। একদল বসেছে যেখান থেকে বাইচ আরম্ভ হবে সেখানে। আর একদল যেখানে শেষ হবে। উঁচু শালের খুঁটির ওপর স্থল্লর ছ'খানি সাজানো-গুছানো ঘর। বহুং দুই পতাকা উড়ছে শীর্ষদেশে। এছাড়া একদল ব্যাণ্ড অবিরত বেজে চলেছে ভ্রাম্যমাণ নৌকোয়। ভলেন্টিয়াররাও সময়মতো এসেই দলে দলে যোগ দিচ্ছে। পুলিশ সাহেবের লঞ্চও শেষরাত্রেই থানার ঘাটে এসে পৌঁচেছে। ভোরের দিকেই কর্ম পরিষদের জনকয়েক সভাকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসন। প্রেসিডেন্টের অল্পরোধে তিনিই আজ পুরস্কার বিতরণ করছেন। আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বেলা একটা থেকে শুরু হবে বাইচ। গজের মাহুষ আজ সকাল সকালই রান্না খাওয়া সেরে যে যেখানে পারে জড় হতে থাকে। খাটে যে জায়গা না পায় সে টিনের চালার ওপর— দালানের ছাদে এমন কি বড় বড় গাছের ওপর উঠে প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ আবার নৌকো ভাড়া করে সপরিবারেই বাইচ দেখতে বা'র হয়।

সকাল না গড়াতেই দলে দলে আসতে থাকে ছোট বড় ছিপ। কোন দল গাইছে সারি, কোন দল জারি, কোন দল আবার বহুরূপী সেজে রং-তামাসা কবছে।

সীমারেখা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। প্রবেশপত্রের রসিদ দেখে দই চিড়ে ও পান বিড়ির টিকিট দিচ্ছে। টিকিট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিচ্ছে আগস্তুকরা। গজের গুণগান কবছে উল্লাসে। কিন্তু মুর্শাকল হচ্ছে পঞ্জীয়নকৃত ছিপ ছাড়া বাড়তি ছিপ নিয়ে। তাদের আবদাব, গঞ্জব নাম-ডাক শুনে বহুদূর দেশ থেকে আসছে তারা। সময়মতো খবব পৌঁছোয়নি বলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশপত্র পেশ করতে পারেনি। দয়া করে তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা দেওয়া হোক।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বিপদে পড়ে। নিজেরা ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। কর্মপরিষদের মূলকেন্দ্রে খবব পাঠানো হয়। পরিষদ সামগ্র্যতম দলের কথা বিবেচনা করে প্রথম দফায় অনুমতি দেন। রবাহুতরা সন্তুষ্ট হয়। তারাও পায় নিয়মিত দলের মতোই খাণ্ড আর বিডিবি টিকিট।

ঝাঁকব ঝাঁক ছিপ এসে বংশীর জল কাঁপিয়ে তোলে। কাড়া-নাকড়া বাজছে কোন কোনটায়। কোন কোনটায় ঢোল কাঁসর। সিঙাও ফুঁকছে কেউ কেউ। বেলা যতো বাড়ছে অগুনতি ছিপ এসে ভিড় কবছে। পঞ্জীয়নকৃত ছিপ অপেক্ষা অপঞ্জীয়নকৃত ছিপেব সংখ্যাই বেশী। এ যেন রক্তবীজের ঝড়। বীর বিক্রমে স্বর্গরাজ্য গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। ণাল শালুর ফালি দিয়ে বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধা। কাবো বা চাড়ানো গৌফ। কেউ পরেছে লুঙ্গি, কেউ কাপড়ই মালকাছা করে। খালি গায়েই আছে বেশীর ভাগ। আবার জাপানী সিল্কের গেঞ্জী অথবা রঙবেরঙের হাক সাটও পরেছে কেউ কেউ। হাতে প্রত্যেকেরই ছোট ছোট বৈঠা।...না না আর একথানা বাড়তি ছিপকেও টিকিট দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ওরকম কাউকে। প্রথম দফার আদেশ নাকচ করে পরিষদ থেকে দ্বিতীয়বার আদেশ যায়। স্বেচ্ছাসেবকরা সেই মতোই ঝাটি আগলাতে থাকে। মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই উত্তর দক্ষিণ সীমানায় শ'খানেক ছিপ আটকে পড়ে। কোন দলের সদীর এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট হাত জোড় করে : ছান কস্তারা আমাগ একখান টিকিট, অনেক দূর ছাশের ধনে আইচি। আল্লায় আপনাগ বালো করব।...

স্বচ্ছাসেবকরা নিরুপায়। এরকম হারে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাইচ দেবার জায়গাই থাকবে না। দই চিড়ের ব্যবস্থা করাও আর সম্ভবপন নয়। উত্তরে ওবাও হাত জোড় করেই অক্ষমতা জানায়।

উত্তর শুনে পাশের আব-এক দলের সদীর মাথার বাবরিতে ঝাঁকুনী দিয়ে রুখে দাঁড়ায়, ক্যা মশয়রা, আমাগ ঢুকবার দিবা না তয় আগেব দলগ দিচ ক্যান? হারা কি তোমাগ বাপঠাকুবদা না?...

তাব কথা শুনে ছোকরা এক স্বচ্ছাসেবক রুখে দাঁড়ায়, এই মিশ্রা, মুখ সামলিয়ে কথা বলে।

কি কতা তোমাগ লগে কইব মাইনযে? খাইবাব দিবাব পাববা না তয় ঢোল দিচিলা ক্যান? ..দূর থেকে আব-এক দলের সদীর নৌ.কাব ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ফেটে পড়ে।

অবস্থা বিপদজনক বুঝে স্বচ্ছাসেবক দলেব অধিকতা ঠাত জোড় কবেই সামলাতে চেষ্টা কবে। অত্যন্ত বিনীতভাবেই বলতে থাকে : ভাইসব আপনারা মাথা ঠাণ্ডা কফন। আপনাদের জন্তু সাধামতো ব্যবস্থা আমবা করবো। আপনাদের জন্তু আগামীকাল দিন স্থির হচ্ছে...

আরে রাইখা ছাও তোমার ঢলাইনা কতা। কাইল হনা (শব্দ) গান্ধে বাইচ দিমু কি তোমাগ পুট্কা (পাছা) চুষবার জন্তু না?

অধিকর্তা বিপদে পড়ে। ছোকরা স্বচ্ছাসেবকদের সামাল দেওয়াও দায় হয়ে ওঠে। ওরাও যে যার মতো জামার আন্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। এ বকম অসংলগ্ন কথাবার্তা কিছুতেই বরদাস্ত কবা হবে না। ..

অধিকর্তা তবু হাতজোড় করেই সকলকে শাস্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ছিপের দানবরা ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে ওদের। নুহুর্তের মধ্যে হুকার ওঠে, মার শালাগ বৈঠার বারি, মার...

প্রথম বৈঠার আঘাত অধিকর্তার কাঁধের ওপর পড়ে। অল্পের জন্তু মাথা রক্ষা হয়। জলে লাফিয়ে পড়ে বেচার। উন্নত জনতার সম্মুখে সেচ্ছাসেবকরা ফুৎকারে উড়ে যায়। যে বেভাবে পারে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কারো মাথা ফাটে, হাত ভাঙে। আবেষ্টন-বেষ্টনী চোখের পলকে ভেঙে যায়। দলে দলে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে বে-আইনী ছিপ। রণতরীই যেন এক একখানা। বাতাসে ফরফর কবে বাবরি উড়ছে এক একজনর। হাতের বৈঠা কাঁধের ওপর। যার যা মন চাইছে খিন্তি করছে—কাড়া-নাড়ুড়া শিঙা ফুঁকছে।

ব্যাণ্ড পার্টির নৌকো পা দিয়ে ডুবিয়েই দেয় একদল। খরশ্রোতে ভেসে যায় ঢাক, জয়ঢাক, ব্যাকপাইপ। দর্শকদের নৌকোও চড়াও করে কেউ কেউ। ভয়াবহ শব্দ শিক্ত চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। যে পারে পুলিশ সাহেবের লঞ্চার কাছে নৌকো নিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুহূর্তে শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। যারা লাইন দিয়ে বরাদ্দমতো দই, চিঁড়ে, পান, বিড়ি নিচ্ছিল তারা পেটের খিদেয় এতক্ষণ ধুকছিল, এবার জলে ওঠে। চারদিক জুড়ে শুধু মার মার কাট কাট শব্দ। দেখতে দেখতে লুটপাট আরম্ভ হয়ে যায়। রহিমুদ্দীন পলিফার দোকানই লুট হয়ে যায় সবার আগে। ভাগ্যিস সময় মতো গা ঢাকা দিয়েছে রহিমুদ্দীন নয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় তার দোতলা গদি-বাড়ির চিলে কোঠায় আত্মগোপন করে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন। দরওয়ানও বাব থেকে সদরে তালা চাবি দিয়ে সরে পড়ে। ভাবখানা গদীতে কেউ নেই। ইন্দ্র পোদ্দাব তো কাছা ঝাড়তে ঝাড়তে সমানে দৌড়। হাণ্ডবিলে ওদের তিনজনের স্বাক্ষর ছিল। তাই সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বৃন্দ তিনজনের ওপর। পায় তো কাঁচাই চিবিয়ে খায়।...

বেলা একটা থেকে বাইচ শুরু হবার কথা। এখন বেলা মাত্র এগারোটা। পুলিশ সাহেব একটু সকাল সকালই “লাঞ্চ” সারছিলেন। কথা ছিল, রমেন্দ্র নারায়ণের কাছারিতে বসে বাইচ দেখবেন ও পুরস্কার বিতরণ করবেন। কিন্তু চারিদিকেব হইচইএ তক্ষণি টেবিল ছেড়ে ডেকের ওপর উঠে আসেন। দৃশ্যবীণ দিয়ে দেখতে থাকেন অগণিত জনতার তাণ্ডব। এ রকম পরিস্থিতির জগা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না উনি। খানায় মাত্র জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ। গুলি চালিয়েও আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তাতে হয়তো উত্তেজনাই বাড়বে কেবল। এক মিনিট ভেবে সারেঙকে লঞ্চ ছাড়তে হুকুম করেন। ঘন ঘন টইল দিতে থাকেন এ-মাথা ও-মাথা।

হামলাকারীরা এখন লুটপাটে মাতোয়ারা। যারা লুট করতে নারাজ তারা খেউর গেয়েই মনের ঝাল ঝাড়ছে। একদল সমস্বরেই গাইছে—

দৈ চিড়া দে শালারা—

দৈ চিড়া দে।

দৈ চিড়া না দিবার পারলে

মাইগ (বউ) ভাড়া দে শালারা

মাইগ ভাড়া দে ॥...

হঠাৎ পুলিশ সাহেবের লঞ্চ একটি দলের পাশে এসে ভেঁা ভেঁা শব্দে সিটি মারে। দলের কর্তা গান খামিয়ে সকলকে বৈঠা চালাতে হুকুম করে। তীরবেগে ছুটে পালায় ছিপ ভাটির পথে। কিছুটা ফল হয়েছে দেখে উৎসাহিতই হন পুলিশ সাহেব। ঘন ঘনই সিটি পড়তে থাকে লঞ্চ থেকে। তীরের লুটেরা ছিপে এসে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। লাল মুখকে বড় ভয়। ডেকের ওপরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেব। এক গুলিতেই তামাম শোধ। ...ষে যেদিকে পাবে ছুটতে থাকে। একদল আবার রুখেও দাঁড়ায়। তাদের দাবী, গ্রাফা প্রবেশপত্র নিয়ে বাইচ খেলতে এসেছে তারা। মেডেল, কাপ না নিয়ে যাবে না। বাইচ খেলা আরম্ভ হোক। ...যারা ছুটে পালাচ্ছিল দাবীর জিগিবে তাবাও আবার ফিরে দাঁড়ায়। নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

পুলিশ সাহেবও নতুন করেই ফন্দী খোঁজেন। কাছারির ঘাটে এসে লাগে লঞ্চ। রমেন্দ্রনারায়ণ নিজের রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ বুঝলেই গুলি চালাবেন। সাহেব এখানে বসে বাইচ দেখবেন বলে খানাব দু'জন রাইফেলধারী সিপাই সকাল থেকেই মোতায়েন আছে। স্তত্রাং আত্মরক্ষার কিছুমাত্র অহুবিধা হবে না। কিন্তু হামলাকারীদের এভাবে বেশা-ক্ষণ সময় দিলে গঞ্জ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। পুলিশ সাহেব আব বমেন্দ্র নারায়ণের মবে কিছুক্ষণ সন্না চলে। বামকাস্ত পাশেই ছিল। সে-ই জোর দিয়ে বলে, চবে খবর পাঠালে সহজেই এ হামলা দূর হতে পারে স্তত্র। হাজার দুই লাঠিয়াল দীমু, করিম আর পলান ব্যাপারীর মুঠোর মধ্যে...

উত্তম প্রস্তাব। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যাক। লঞ্চ পূব থেকে সটান পশ্চিম পাড়ে এসে লাগে। রামকাস্ত গিয়ে খবর দেয় মোড়লদেব। ছিপ প্রস্তুতই ছিল। এতক্ষণের এই হলুতুল কাণ্ডের কথা বিন্দুমাত্রও টের পায়নি চরের মাহুষ। গঞ্জ লুট করবে বাইরের গুণ্ডারা। কখনো হতে পারে না। ...দু'খানি ছিপে বোঝাই হয়ে আসতে থাকে চরের জোয়ান জোয়ান মাহুষ। দমাক্ষম পড়তে থাকে বৈঠার বাড়ি। এরার আর কেউ রুখে দাঁড়াতে সাহস প*ধ না। ছিপ নিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। ...

বাইচ উপলক্ষে যে মেডেল কাপ পুরস্কার হিসেবে দেবার কথা হয়েছিল তা দেওয়া হয় চরের বীরদের। তাদের প্রচেষ্টাতেই গঞ্জ আজ সর্বনাশের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। পুলিশ সাহেব নিজের হাতে পরিণে দেন পুরস্কার। সোনার মেডেল আনন্দই পায়। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি আনন্দর লাঠির শক্তি

এমন দুর্বীর। পেট-পাগল মানুষ অষ্টপ্রহর খাওয়ার খান্দাতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে মানুষের বাহুতে যে এত বল একথা চিন্তারও অতীত। সাড়ে তিন হাত লাঠি—কেউ রুখে দাঁড়িয়েছে কি স্বাপিয়ে পড়ে আনন্দ তার ওপর। বৌ বৌ করে ঘোরে লাঠি—চিল ছুঁড়েও কোন ফায়দা নেই। দলবদ্ধ হয়ে যারা থামলা শুরু করেছিল দলবদ্ধ হয়েই তারা পালাবার পথ খোঁজে। দু'চারজন কখে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম প্রহার খায়। যেন ষাঁড়ের পিঠেই পড়ছে লাঠি। আব এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, লেজ তুলে দৌড়।

সোনার মেডেল পেয়েছে আনন্দ—চরফুটনগরের মাথা আজ উঁচু হয়েছে। দুর্গার বুকখানাও গর্বে ভরপুর। আজ আর ও নিজকে তেমন অসহায় ভাবে না। আনন্দ যেন সকলকেই চিন্তায় ফেলেছে। পুলিশ সাহেব প্রশংসায় গদগদ হয়েই মেডেল পরিয়ে দিলেন। বাঁরেব সম্মান দিতে ইংবেজ জানে। তবু চবেব এই সজ্জবদ্ধ শক্তি দেখে মনে মনে একটু ভাবিতই হন উনি। রমেন্দ্র নারায়ণের ললাটেও চিন্তার বেখা ফুটে ওঠে। বামকান্তর মনেও নূতন করে ভাবনার উদয় হয়। সাপের গর্তে পা দিয়েই তাহলে ও এতদিন খেলেছে, আনন্দ তাহলে হাবা নয়। শক্তিহীনও নয়। অভাবেই তাহলে এ রকম পঙ্গু হয়ে আছে।...

যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। গঞ্জের মানুষ আজ চরের মানুষের কাছে ঋণী। তাদের বীরত্বেই আজ সকলের মান সম্মান রক্ষা হয়েছে। যে দুই চিঁড়ে প্রতিযোগীদের খাওয়ার কথা ছিল তা দিয়ে চরের সকল মানুষকে পেট ভরে খাওয়াতে থাকে। শুধু দুই চিঁড়েই নয়—রসগোল্লা, অমৃতি, লালমোহনও। গঞ্জের বাজারে সেদিন যা যা তৈরী ছিল তার সবকিছু দিয়েই চরের মানুষকে আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করে ওরা। ক্ষতি রহিমুদ্দীন খলিফারই বেশী হয়েছে। কাপড়ের খান বলতে একটাও নেই। সেলাইয়ের কল দুটিও বৈঠায় আঘাতে ভেঙে চুরমার করে রেখে গেছে। তবু আনন্দ লাঠি ঘুরিয়ে পুরো দু'খান কাপড় উদ্ধার করেছে। লাঠির বাড়িতে হাতও ভেঙে দিয়েছে তিন চারটে লুটেরার।

আলস্ত্রে আলস্ত্রে দিন কাটছিল না চরের মানুষের। এখন প্রবল একটা উত্তেজনার মুখে দিন বেশ অনায়াসেই গড়াতে থাকে। গঞ্জের মানুষের কাছে চরের মানুষের খাতিরই এখন আলাদা। যে দোকানী কোনদিন এক পয়সার হুন ধার দিতে রাজী হয়নি সে এখন অনায়াসেই দু'এক টাকার সওদা ধারে দিয়ে ফের। আনন্দ বাজারে এলে তো পান বিড়ি তামাক খেয়ে কুলই পায় না।

ঐ তো সামান্য একটা মানুষ কিন্তু কি অহুরের শক্তি বাহুতে! ছোটদের অনেকে এসে অনন্দর বাহুর পেণীতে হাত বুলাতে থাকে। অনন্দর হাসিই পায়। দু'চারটি শিষ্যও জুটে যায় ওর। না না, ওরা শুনবে না। লাঠিখেলা ওদের শেখাতেই হবে। অনন্দ.বারকয়েক আমতা আমতা করেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে শ্রীতির সম্পর্ক।...

॥ ২৫ ॥

বথ দেখে আর গঞ্জ রক্ষা করে চরের মানুষের আলম্বেব দিনগুলো কেটে যায়। আসে পাট কাটাব মরশুম। ভাদ্রের মাঝামাঝি আবাব ওরা কাস্তে হাতে মাঠে নামে। চরময় কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল। কিন্তু জলের ভয়ে ওরা কেউ ভীত নয়। ওদের ভয় পাটের দর নিয়ে। বথের মেলায় বাছ পাট যে দবে বেচে এসেছে গঞ্জের বাজারে অগ্রাণ্ড অঞ্চলের গাছ পাটের দরই সে পর্ষায়ে ওঠেনি। পাটের বাজার একেবারেই ভোঁভো। রেলি ব্রাদাস এবার আপিসই খুললে না গঞ্জে। পূর্ণ পার্সেজার নাবায়ণগঞ্জে শুধু শুধুই দৌড়ঝাঁপ করলেন।...মাঠে পাট কাটতে নেমে চরের মানুষের মনে স্বস্তি নেই। অনিশ্চিত্যতায় বুক দুক্করু করে কাঁপতে থাকে। দশ বারো টাকায় যদি গাছ পাট বেচতে হয় তা হলে তো ভরাডুবি নিশ্চিত। মহাজনের ঋণ শোধ তো দূরের কথা বছরের খাবার যোগানোই দায় হবে। নিতাই সা'র কি, গোঁফে তা দিয়ে দিব্যি বলে যাচ্ছে, পাটের দব নিশ্চিত বাড়বে। চাষীদের উচিত কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকা...কিন্তু সে তো আর নিজে এক ছটাকও পাট কিনছে না। কিংবা দর না উঠলে স্বদের কড়িরও মাপ দিচ্ছে না। তবে আব তার কথার মূল্য কি? কি দিলে ডাক্তাররাও তো নাভিখাসের রোগীকে ওরকম আশ্বাস দিয়ে থাকে। এ তো সবই ওদের নিজ নিজ ব্যবসার কথা। চাষীর দুঃখ বুঝবে কে? চটকলের মালিক তো সবই বিদেশী। রাজ্যের শাসন ভারও ওদেরই। নিতাইয়ের সাধ্য কি মাথা তোলে। সে তার নিজের টাকা চাপ দিয়ে স্বদে-আসলে আদায় করে নিতে পারবেই। মরতে মরবে শুধু চাষী।... কাজে হাত ওঠে না চরের মানুষের। তবু সময়মতো পাট না কেটে উপায় নেই। খালি মাথায় এক বুক জলের ওপর দাঁড়িয়ে হতাশা আর আশংকার মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে পাট। চরের চাষ নামী হয়েছে তাই। নয়তো অগ্রাণ্ড

অঞ্চলের পাট এরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হতে শুরু হয়েছে। চারদিকের ফসলও খুব ভাল হয়েছে এবার। চাহিদা থাকলে ব্রিটিশ সালের চেয়েও বেশী দর ওঠার সম্ভাবনা আছে। কে জানে, হয়তো নিতাইয়ের কথাই সত্য হবে। কলওয়ালারাই সব এককাট্টা হয়ে বাজার উঠতে দিচ্ছে না। মতলব হয়তো ঐ রকমই একটা কিছু হবে। পাটের সঙ্গে চাষীকেও কলে পেষাই করে ফেলতে চাচ্ছে ওরা। কিন্তু দম ধরে বসে থাকা আর চাষীর কর্ম নয়। শতকরা নিরানব্বুই জনই তো হাঁড়ি চাড়িয়ে বসে আছে।

চাগী অনেক কিছুই বোঝে—ভাবে কিন্তু দম ধরতে পারে না। এক এক করে কাটা, জাগ দেওয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো শেষ কবে ফেলে। নগদা-নগদি বেচে মাঠের কড়ি হাতেও নেয় কেউ কেউ। যে পারে কিছুদিনের জন্ম গোলাজাত করে রাখে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকাই এক এক গাছ। এ রকম সরেস পাট গত পাচ-সাত বছরের মধ্যে গল্পে ওঠেনি। চরেও এব আগে কোনদিন এত ভাল পাট জন্মায়নি। না না, কিছুতেই ওবা এ রকম মাটির দরে সোনার ছিলকা হাতছাড়া করবে না! দর নিশ্চয় বাড়বে। সব কলওয়ালাদের বজ্জাতি। প্রয়োজন হয় উপোস দিয়ে মরবে তবু মা লক্ষ্মীকে ছু'পায়ে ঠেলে বার করবে না। না না, কিছুতেই না।...মোড়লরা সকলে একত্র বসে সল্লা করে। ফড়েরা উস্কাতে এলে গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।...গোটা ভাদ্র মাস পার হয়ে যায়, কেউ এক চটাক পাটও বেচে না। লাভ তো দূরের কথা এ দরে বেচলে খরচাই উঠবে না। কি ভুলই না করেছে সকলে ধানের জমিতে পাট বুন। এতগুলো মাথা, একজনও যদি পরিণাম ভাবতে পারতো।...রবিশস্ত ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে। পাট বুন আশায় আশায় হাতের সর্বস্বও বেচে ধেয়েচে এ ক'মাসে। এখন হয়তো হাঁড়িই চড়বে না। ওদিকে আবার নিতাইয়ের দলও সমানে আনাগোনা শুরু করেছে। আসল না হলেও স্ত্রদের কড়ি ওদের চাই-ই। না, পাট চাষীর এবার নিশ্চিত মরণ।...

ভাদ্র পার হয়ে আশ্বিন এসে পড়ে। পূজা আর ঈদের পরব এবার পাশা-পাশি পড়েছে। খাবার ঘরে থাক আর না-ই থাক পাল-পার্বনের বাড়তি খরচা ষোণাতেই হবে। আর না হোক উৎসব দিনে ছেলপুলের পোষাক-আধাক চাই-ই। বাংলার জাতীয় উৎসব এ দুটি। সারা বছর এ দুটি দিনকে কেন্দ্র করেই বাংলার মানুষ দিন গুণতে থাকে। দীহু আর পলানের ব্যাপার তো আরো সঙ্গীন। ঈদের পার্বণে পলানকে অনেকেই দিতে-থুতে হয়।

গাঁয়ের গরীব-গরবারা ওর মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। দীর্ঘ অবশ্র দান-খ্যানের তেমন বরাদ্দ নেই। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর ভাবনা বড় একটা কম নয়। হুঁবছব থেকে তো আবার কবি গান শুরু হয়েছে। নিমন্ত্রণে ঘটাও বেড়েছে। এছাড়া কাল অর্শোচ কেটে গেলেই বিয়ের ধুম লাগবে। পাকা ফলারেব প্রতিশ্রুতি বয়েছে গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে। সব কিছুতেই চাই এক কাঁড়ি টাকা।...চিন্তায় চিন্তায় দয়াল চানের আসরও আর তেমন জমছে না। লোভে পড়ে পাট বুনেই সর্বনাশ হলো।...

ভাদ্রের ভবা বর্ষ। বংশী ধলেখবী কানায়-কানায় ফুলে উঠেছে। করিমের দাওয়ার ওপর বসে তিন মোড়ল হুকো খাচ্ছিল আর দুর্দিনের কথা ভাবছিল। সহসা দেখা যায় একখানি ঘাষী নৌকা এসে লাগছে।

কে ও নিতাই সাজি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো চৈয়ের ভেতব থেকে বেবিযে আসছেন সাজি মশায়, পলান তাড়াতাড়ি হুকোটা বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে বেখে অভ্যর্থনা করতে ওঠে। দীলু করিমও সঙ্গে যায়।

নিতাই ততক্ষণে নৌকোর ওপর থেকে পাড়ে নেমেছে। ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে ওবা। সকলে মিলে ফিরে আসে আবাব দাওয়ার ওপর। করিম একটা জলচৌকি এনে নিতাইকে বসতে দেয়। দীলু এক কন্ধে তামাক সেজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরে। জল ছড়া হুকো। জল-ভরা হুকোয় তামাক খেতে গঞ্জের বাবুদের আপত্তি আছে। ওতে নাকি তাদের জাত যায়।

হুকো হাতে নিতাইকে প্রসন্নই মনে হয়। সামনেই রয়েছে মাচার ওপর গান্দা-করা পাট। গোধূলির আবীর রাগে জলজল করেছে সোনার ছিলকা। নিতাই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই শুধোয়, পাট বেচলেন না আপনারা ?

প্রশ্ন শুনে পলানের ইচ্ছে করে হুদ-খোরটার মাথায় বাঁশ মারে। পাট বেচবো কেন, তুমি না বলেছিলে দর উঠবে। এখন উঠছে না কেন দর ? খুব তো মালুঘকে লোশিয়ে দিয়েছিলে পাট বুনেতে। এখন হুদের কড়ি না নিলে তো বুঝি বাপের বেটা...

যাগ যতোই হোক মনে মনেই তা চাপতে হয়। টাকা লাগাবার জল একদিন নিতাই ওদের গদীর ওপরে বসিয়ে খাতির করেছে—ঘন ঘন তামাক খাইয়েছে। সেদিন যেন নিতাই-ই ছিল ওদের রুপার পাত্র। ওরা দয়া করে টাকা নিলে ওর ব্যবসা চলবে—সিন্দুক ফাঁপবে। কিন্তু অবস্থা এখন উন্টে গেছে। এখন ওর দয়ার ওপরেই নির্ভর করেছে ওদের মান-সম্মত—মরা-বাঁচা। পলান

মেজাজ খাদি নামিয়েই উত্তর করে, না, বেচবার আর পারলাম কই। ই দরে বেচলে ত মইরা যামু।

আপনাদের না হয় না বেচলেও চলছে কিন্তু ছোটদের চলবে কি করে, নিতাই আবার প্রশ্ন করে।

ছোট বড় হগলের অবস্থাই এক। পাট বেচবার না পারলে আর মান থাকব না, পলান খেদের সঙ্গেই উত্তর দেয়।

নিতাই বলে, হ্যাঁ, রকম-সকম যা দেখছি তাতে আধা-আধি পাট আপনাদেরও বেচে ফেলা উচিত। শেষ বাজারে যদি দর বাড়ে তাহলে বাকী অর্ধেকই পুষিয়ে যাবে।

উত্তরে দীপ্ত বলে, দর বাড়েনব কতা ত আপনে কবে খেইকাই কইয়া আসচেন। আমাগই কপাল মোন্দ, দর আর বাড়ব কবে।

এই দেখুন, আজো 'ঢাকা পঞ্চায়তে' কি লিখেছে। জাপান তো পাট কিনবাব জন্ত ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজ তাদের বাজারে নামতেই দিচ্ছে না। নিজেদের বেলায় শুক নেই, ওদের বেলায় মোটা শুক দিতে হবে। এ রকম একচোখো ব্যাপার হলে আব বাইরেব ক্রেতারা আসবে কি করে, হাতের কাগজখানা উন্টে পান্টে সংবাদটা বার করতে ব্যস্ত হয় নিতাই।

ক্যা, ও হালারা নিজেরাও কিনব না আবার বাইরের মাইষেবেও কিনবার দিব না ক্যা!—সংবাদ শুনে ফুঁসে ওঠে পলান।

হাসতে হাসতেই নিতাই মন্তব্য করে, সেখানেই তো মজার ব্যাপার। জাপানের সঙ্গে সমানে কল চালিয়ে ওরা পাল্লা দিতে পারবে না। উৎপন্ন মাল জাপান যে দরে বেচবে ইংরেজ তার ধারে কাছেও খেঁষতে পারবে না।

তয় ত দেখচি ও হালারা ডাকাইত। ইচ্ছামতো আমাগ কান ধইরা উঠাইব নামাইব। আগে জানলে কোন সম্বুদ্ধি পাট বুনত, পলানের মেজাজ সপ্তমে ওঠে।

আর বলেন কেন। দেখছেন না, এখানকার যত পাটকল সব ইংরেজের। রাজস্ব পেয়ে ছুনিয়ার বাজার ওরা একলাই লুটতে চায়। তবে ভরসার কথা, লীগ অফ নেশনে কথাটা উঠেছে। হয়তো একটা কিছু গতি হবে।

আর হালার গতি। আমরা মরলে যদি কোন গতি অয়। আগে জানলে বাইচের দিন ও হালার ইংরাজ পুলিশ সাবরে আমরা গাঙ্গের মধ্যেই চুবাইয়া মারতাম, কিন্তু হয়ে ওঠে পলান।

যা বলেছেন—বলেছেন! ওরকম কথা মুখেও আনিবেন না। পুলিশের কানে গেলে বুড়ো বয়সে টানা-হেঁচড়ায় পড়বেন, কথাটা চাপা দিতেই চেষ্টা করে নিতাই।

হ, ও হালারা আমাগ ভাত্তেও মারব আবাব জানেও মারব, শিরে করাঘাত করে পলান।

কি করবেন, সবই অদৃষ্ট। খোদার কাছে নালিশ জানান, তিনাই এর বিচার করবেন।

নিতাইয়ের সান্নানায় পলানের চোখ মুখ দিয়ে ঠিকরে আগুন বেরুতে চায়। মুখে কোন উত্তর করতে পারে না। করিম অবস্থার মোড় ঘোরায়, নায়ে আর কে আছে, সিঙ্গা-প্ত্রের ব্যবস্থা করি।

নিতাই বাধা দেয়, না না, ও সবে কখন দরকার হবে না। আমি কোথাও তাগাদায় বেরুই নি। ‘পঞ্চায়ৎ’ খানা পড়ে ব্যাপার বেশী স্তবধের মনে হলো না বলে বেড়াতে বেড়াতে একবার/খবর দিতে এলাম। আমার বিবেচনায় পাট প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বেচে ফেলা উচিত।

এতক্ষণ দম ধরে থেকে দীর্ঘ এবার ফেটে পড়ে, হ, আপনে ত সব সমস্ত আমাগ বালো পরামশুই ছান। এহম ই দরে পাট বেচলে নিজেরাই ধামু কি আর আপনারেই বা দিমু কি?

আমার জগ্ন আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। পূজা-পার্বণ এসেছে, কিছু বেচে কিনে নিজের ঘর সামলান। আমাকে যখন পারেন দেবেন। নিতাইয়ের কথার মধ্যে যেন অমৃত ঝরে পড়ে।

বাড়ি বয়ে এসে পাওনাদার কখনো এ বকম বলে। নিতাই সাজি সতি সতিই মহাজন। অতটুকু মান-অহংকার নেই। বিশ্বয়ে কেউ আর মুখ খুলতে পারে না।

স্বযোগ বুঝে নিতাই নিজের কথার জের টানে আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করুন। আমার ঘরেও ছেলেপুলে আছে—আমি সব বুঝি। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

করিম এবার আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সবিনয়ে বাধা দেয়, না না, খালি-মুখে ঘাইবার পারবেন না। একটা কিছু মুখে দেওয়ান লাগব।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। স্তদিন আনুক পেট ভরে খেয়ে যাবো। সন্ধ্যা-আফ্রিক না করে বেরিয়েছি এখন কিছু মুখে দিতে পারবো না।

উত্তর শুনে করিম আর জোর করতে সাহস পায় না। তাছাড়া ঘরে আছে কি যে তাই দিয়ে নিতাইয়ের মতো লোককে অভ্যর্থনা করবে। রাজী হলে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। বড় জোর গাই দুইয়ে খানিকটা টাকটা হুধ। সেই ভালো, আর একদিন না হয় যোগাড়-যন্ত্র করেই খাওয়ানো যাবে। এখন সঙ্গে গোটাকয়েক আক দিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বাড়িতে ছেলেপুলেরা পেতে পারবে। হাত জোড় করে প্রকাশে নিতাইয়ের কথার জবাব দেয় করিম, তাইলে ত আব জোর দেখাইবার পারি না। আইচ্ছা, আর-এক কইলকা তামুক খান, আমি একড় আতি। দীহু তামাক সাজতে আরম্ভ করলে করিম ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়। পেছনের উঠোন থেকে রটপট আট দশখানা বাছাই করা আক কেটে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।

নিতাই দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে, এগুলো আবার কেন!

ঈশৎ হেসে করিম বলে, সামান্য গোটাকতক কুশইর পোলাপানের খাইবার লেইগা বুনচিলাম। লইয়া যান, বাড়ির ছাওয়াল পাওয়ালরা খশী অইব।

আচ্ছা, দিন তাহলে, হুকোটা দীহুর হাতে এগিয়ে দিয়ে নিতাই উঠে দাড়ায়। নিজেই আক ক'থানা হাতে করে তুলে নিতে যায়।

করিম জিভ কেটে বাধা দেয়, ছি ছি ছি, আপনে ক্যান বইয়া নিবেন। চলেন নায়ে দিয়া আহি।

নিতাই মনে মনে তাই চেয়েছিল। খাতকের বাড়ি থেকে সামান্য ক'থানা আক হাতে করে বেরুতে ওর সম্বমে বাধছিল। স্ততরাং আর কথা বাড়ায় না।

পলান, করিম, দীহু এক সঙ্গেই উঠে গিয়ে নিতাইকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসে। যেতে যেতে কথা হয়—কিছু পাট ওরা সামনের হাতেই বেচে দিচ্ছে। এখাত্রা আর কিছু দিতে পারবে না। পারে তো বাকী পাট বেচে হুদের টাকা সম্পূর্ণই দিয়ে দেবে। আর যদি তা না পারে তাহলে হুদে আসলে তমহুক পালটে দেবে।

আকের সঙ্গে অযাচিতভাবে আসল কথা শুনে নিতাই আশাতীত খশী হয়। গদগদ হয়েই নৌকোয় গিয়ে ওঠে।

নিতাইয়ের পরামর্শ মতো পাট বেচে ঈদের নিয়ম রক্ষা করে পলান। যাকে যা দেবার রীতি আছে তা দিয়েছে। এক কথায় সবই হয়েছে। শুধু হয়নি অনাবিল আনন্দ লাভ। শংকায় বুক দুঃদুর করে কেঁপেছে। এখনো জের চলেছে তার। না, পাটের দর আর এ বছর বাড়বে না। ঘরের পাট ঘরেই থেকে যাবে। নিতাই সাজিকে তমসুক বদলে দেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। ওসমান বলে, আংশিক জমি বেচে দেনা শোধ করে দাও। বেটা একটা আস্ত পাগল। জমি বেচলে খাবি কিরে মুখ্য। সংসারে ধার দেনা কার না আছে। তাই বলে কথায় কথায় অন্নদাত্রী মাকে বাজারে বিকিয়ে দিতে হবে!... না না, তা হতে পারে না। নসিবের ফের যদি কাটে তা হলে মুগ কলাই বেচেই ও স্ত্রের কড়ি শোধ করা যাবে। বাকীটা সামনের সন পাট বেচে। স্ত্রের অবশ্য অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তা আব কি কবা যাবে। বিনা স্ত্রের তো আর কোথাও কর্ত্ত পাওয়া যায় না। নিতাই সাজি তো বেশ ভাল ব্যবহারই করছে।...

দীক্ষুও পলানের মতোই লক্ষ্মীপূজা সারে। আসল তো দুবের কথা স্ত্রের কাশ-কড়িও শোধ করতে পারেনি। কবি গান দেবার ইচ্ছা এবছর একেবারেই ছিল না। কিন্তু পাকে চক্রে শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়া গেলো না। কালী কবিরাল আঁটালিব মতোই লেগে রইল। মা লক্ষ্মীব আসরে গান না গাইলে নাকি ওর গোটা বছরটাই মাটি হবে। তা অবশ্য নগদ পয়সা একটিও দিতে হয়নি। শুধু তিনদিনের ধোরাকি আর নৌকো ভাড়া। যাক গে, সবস্বক বড় জোর কুড়ি-পচিশটে টাকা গেছে। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে ওতে আটকাবে না। ঘরের কোণে নতুন কুটুম রয়েছে, গান বন্ধ করলে ওরাই বা ভাবতো কি। চরের মাহুঘেরও বছরের আনন্দ উৎসবটা মাটি হতো।...কিন্তু ধরচার তো আর এখানেই শেষ নয়। লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শুরু হবে ভাগবত পাঠ। পুণ্যাহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন—মহোৎসব। চরণ দাসজী আবার তীর্থে যাচ্ছেন। বাকী জীবন বন্দাবন আর নয়তো মথুরায়ই কাটাবেন। স্ত্রেরাৎ এই শেষবার ঠেকে নিয়ে মহোৎসব করা। আর কিছু বাদ গেলেও এ উৎসবকে

বন্দ দেওয়া যাবে না। এর পর আছে, সকল দায়ের সেরা দায় নিশির বিয়ে।
ম' লক্ষী মুখ তুলে চাইলেই বক্ষা নয়তো অনিবার্ণ মৃত্যু!...

একে একে কোন রকমে সবই মিটে যায়। দীর্ঘকে সবটা পাটই বেচতে
চাচ্ছে। পার্বণ শেষ কবেও পলান আর কবিমেব হাতে আধা-আধি পাট থেকে
ধায়। একদিক দিয়ে বিচাব করলে ভালই কবেছে দীর্ঘ। পাটের দর এখন আরো
এক টাকা কম। কিন্তু হলে কি হবে হাত একেবারেই শূন্য। নতুন বউ হয়ে ময়না
ধব এসেছে। খাওয়া-পবায় কষ্ট দেখলে কুটুমের কাছে মান ইচ্ছত থাকবে না।
নতাইয়ের কাছে না হয় তমসুক পাণ্টে দিয়েই রেহাই পাওয়া গেছে। তিন শ
টাকার জন্ম স্কন্দে-আসলে মূল দাঁলিল গিয়ে সাড়ে পাঁচ শ'তে দাঁড়িয়েছে।
যুবো আরো কয়েক টাকা হয়েছিল কিন্তু নিতাই খাতিব কবে তা নয়নি।
স্কন্দেব তাব সমানই থেকে গেলো। থোক দু'পাচ টাকা খাতির করতে রাজী
নতাই কিন্তু স্কন্দেব হাব কমাতে পারবে না। তা না পারলে আর করার কি
যাচ্ছে। একটা পয়সাও ফিরে না পেয়ে যে শুধু কাগজ লিখিয়ে নিয়ে শাস্ত আছে
এটাও ভাগ্যা। টেচামেচি শুরু কবলে তো চরে মুখ দেখানোই ভার হতো।
চাব বিয়েতে পাকা ফলার খাইয়ে যে দেনার জন্ম তাগাদা শোনে তাকে আবার
পাচ্ছে কে। এখন মুগ কলাই ঘরে উঠলেই জাত বাঁচবে, নয়তো বরাতে কি
পাচ্ছে বলা যায় না। একদিক দিয়ে রক্ষা, চাল ডাল ঘরে আছে। টেনেটুনে
যি কাস্তান পর্যন্ত চলে যাবে। নগদ টাকা একেবারেই হাতে নেই। তা কোন
পদ-আপদ না ঘটলে ওতেও আটকাবে না। ঘরে গরুর দুধ আছে। সাক-
স্তিও ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাবে। মাছের তো ভাবনাই নেই। শুধু তেল,
ন, আর মসলাপাতি। তাতেও আটকাবে না, চলে যাবে একরকম করে।
কলে গঞ্জের বুধাই মুল্লীর দোকানে ধার পাওয়া যাবে।...নিশ্চিন্ত না হলেও
ন একরকম করে কাটতে থাকে দীর্ঘর।

কিছুদিন পর পলান করিমও অবশিষ্ট হাতের পাট বেচে দেয়। না দিয়ে
পায় নেই। বৃহৎ সংসার—ধান চাল সব কিনে খেতে হচ্ছে। কম হোক বেশী
টাক একমাত্র পাটই তো সম্বল। আশায় আশায় দেরি করে মিছিমিছি শুধু
চাই সার হলো। কি আহাম্মকীই না হয়েছে ধানের জমিতে পাট বুন।
ধান স্কন্দেব একটা কানা কড়িও শোধ করতে পারে না। দীর্ঘর মতোই স্কন্দে
সলে তমসুকটা পাণ্টে দিতে বাধ্য হয়। তিন হাজার টাকা সাড়ে পাঁচ

হাজ্বারে দাঁড়ায়। চরের সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। একমাত্র করিমই বা ব্যতিক্রম। বাড়তি খরচা বিশেষ না থাকায় স্বদের টাকাটা সম্পূর্ণই দিতে পেরেছে করিম। প্রথম মরশুমে পাট বেচলে আসল টাকাও কিছু দিতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে। বরাত মন্দ, তাই স্বদখোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না।

প্রতিবারই জলে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনবোট নিয়ে কাছারি ছেড়ে চলে যান বমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু এবার কার্তিকের বদলে অশ্রাম পার হতে চললো কাছারি ছাড়ার নাম নেই। পিয়ারের চাকর হরিকে জিজ্ঞেস কবলে বলে, কুমার বাহাদুর এবার আর সদরে ফিরবেন না। কে জানে, হবেও হয়তো। অন্তর দূরের কথা স্বয়ং রাখালই যখন কিছু জানে না তখন আর কথা কি। আগে হলে রামকান্ত খুশীই হতো। দিব্যি পরের পয়সায় আড্ডা ইয়ার্কি খাওয়া বেড়ানো। কিন্তু এবার ও এসব চায় না। মধুর রয়েছে দু'শ টাকা ঋণ। তার ওপর দুর্গাও নিয়েছে দেড় শ টাকা। স্বদের হাব কম হলেও কবে দেখলে মোটা অঙ্কই হবে। একে জলের দরে পাট বেচতে হয়েছে। তার ওপর আবার ময়নার বিয়েতে দ্বিগুণ খরচা হয়েছে, দুর্গার হাত একেবারেই খালি। আসল তো দূরের কথা স্বদ বাবদও একটা ফুটো পয়সা দিতে পারেনি ও। কখন যে কি লুকুম হবে কে জানে। দিন-রাতই তো জপের মালা হয়েছে দুগা। সেদিন স্নানের ঘাটে দেখে অবধি পাগল হয়েছেন। মিথ্যা বলে বলে না ঠেকালে এদিন হয়তো জুলুমবাজী আরম্ভ হয়ে যেতো। তা আর কুমার বাহাদুরেরই বা দোষ কি। ও আশুনের শিখা দেখলে কে না পাগল হবে। ভুল নিজেই করেছি। মাথা ষাটাতে পারলে টাকা কড়ির প্যাচে না জড়িয়েও দুর্গাকে হাত করা যেতো। টাকা ধার পেতে ওর অতটুকু আটকাতো না। দীর্ঘই ব্যবস্থা করে দিতো। বমেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে ভয় ভাবনা রাখাল বিকাশেরও আছে। কিন্তু রামকান্তর যতো এমন বিপদ বোধ হয় ওদের কারো নয়। জালে মাছ আটকিয়ে যদি তা লিলেকেই খাওয়ানো হয় তবে আর সে মাছ ধরে লাভ কি।—চিন্তায় চিন্তায় রামকান্ত বুকি বা পাগল হয়ে যায়।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে এবাব। চরের মাছমের সম্বল মাত্র চাঁড়া কাঁথা কম্বল। পাটের বাজাব ভাল গেলে হয়তো নতুন কিছু কিছু কিনতে পাবতো। এখন তো দোকান-মুখে হবাবও উপায় নেই। জামা-কাপড় অপেক্ষা পেটই ওদের দিন দিন কাবু কবে ফেলছে। জীবনে বহু শীত ওরা আশুনেব আলসে সম্বল কবে কাটিয়ে দিয়েছে। পেট যদি ভবা থাকে তাহলে একটুও আটিকায় না। কিন্তু সেই পেটেই যে খিল পড়ছে। মাঘ তামাকটুকু পর্যন্ত জুটছে না। তবে আব শীত সৈকাবে কি দিয়ে। এখন একমাত্র ভবসা রবি-শস্ত্র। চবব জমিতে মা লক্ষ্মীব পদ-রেণু বয়েছে বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাবা ফনফনিযে বাড়ছে। মুগ, কলাই, যবের বাড়তিই বেশী। এরই মধ্যে কোন কোনটায় গুটি দেখা দিয়েছে। গরু ছাগল তাড়িয়ে বাথতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ধাব শোধ না হোক খেয়ে পরে পাট চানের কড়ি হাতে থাকবেই!... মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে ডাকে চবব মাছম। প্রাণ খুলে নামকীর্তন কবে—দয়াল চানের আসরে জমায়েত হয়। অসময়ের জল ঝড়ে গত সন সমস্ত নষ্ট হয়েছে। ঠাকুর যদি এবার রক্ষা করেন।

দাঁহু শুধু মুগ কলাই আব মটরের মধ্যেই ক্ষেতের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেনি। কয়েক বিঘা জমিতে খিবাইও (এক প্রকার শসা) বুনেছে। কুমড়ো, তবমুজ, বাঁঙ (এক প্রকারের খবমুজ) ক্ষেতও করেছে কয়েক বিঘা জুড়ে। মোড়লের দেখাদেখি চরের প্রত্যেকেই এবাব কিছু না কিছু জমিতে ফলমুলের চাষ করেছে। রাঙা আলু আর গোল আলুর চাষও করেছে অনেকে। পলানের কাছে তো এসব সাবেকী ব্যাপাব। শুবু চাষের আয়তন একটু বেড়েছে এই যা। আবহাওয়া অহুকুল থাকায় ফলন বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দয়াল চানের দয়া হলে দুঃখ হয়তো ঘুচবে।...

আনন্দ আর এখন সে আনন্দ নেই। এখন আর ওকে কেউ কুঁড়ে কিংবা নিকর্মা বলতে পারবে না। সারাদিন ক্ষেতের কাজে খাটে। যদি কোন কাজ হাতে না থাকে তা হলে বসে বসে জাল বোনে। তবু বসে থাকে না। তবে

পেটের ব্যাপারে অতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং খোরাকি আগের চেয়ে বেড়েছে। তা বাডুক, দিদি ভাইয়ের সংসার—ওতে আটকাবে না। তাছাড়া খাওয়ার মধ্যে আছেই বা কি। শুধু তো দুটো চাল আর একটু হুন। পোষাকী খাওয়ার মধ্যে জোটে খাটি একটু গরুর দুধ ও কিছু কিছু ক্ষেতের ফল-ফলাদি। ওতেই সন্তুষ্ট ওরা। ধার দেনা না থাকলে কেউ ওদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারতো না। কি সর্বনাশই না করেছে ধানের জমিতে পাট বুন। রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে রাতারাতি গরীব বনে গেলো। এখন তো পর পর জুয়া খেলে যাওয়া। পাট চাষের দেনা একমাত্র পাট বুনই শোধ হতে পারে। অবশ্য যদি দর ওঠে। এ ছাড়া এককালীন এত টাকা হাতে আসা আর কোন কিছু থেকেই সম্ভব নয়। সুদখোরের হাঁড়িকাঠ থেকে যতদিন না মাথা টেনে আনতে পারে ততদিন নিষ্কৃতি নেই। আনন্দর মতো সহজ সরল মানুষের পক্ষেও এ সত্য বুঝে উঠতে দেরি হয় না। ভাবনায় দুর্গার দু'চোখে ঘুম নেই।...

ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। ফল মূল তরি-তরকারি থেকে অতি সহজেই চরের মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো হুন ভাত খেতে পারছে। পলান দীঘু করিমও বড় বাঁচা বেঁচে যায়। মুগ কলাই ঘরে উঠতে এখনো ঢের বাকী। এগুলো ছিল বলেই রক্ষা। গঞ্জের বাজারও এবার বেশ টান যাচ্ছে। পাট বুন যদি জমি নষ্ট না করতো তাহলে এগুলো বুনো দায় মুক্ত হতে পারতো। কিন্তু করার কিছু নেই, সবই কপালের গেরো।

চৈত্রে মুগ মটর কলাই ঘরে ওঠে। খাসা তক্তক করছে রং। আর কোন ভয় নেই। দয়াল হরি বিপদে ফেলেছিলেন দয়াল হরিই আবার রক্ষা করছেন। অগ্না অঞ্চলের আগে চরের ফসলই এবার গঞ্জের বাজারে যাবে। চরের ফসল দিয়েই হবে প্রথম সাইদ। পরম নির্ধার সন্ধে সকলে বেড়ে পুঁছে গোলায় তোলে মা লক্ষ্মী ব আশীষ কণা। গৃহলক্ষ্মীরাও আলাদা করে উঠিয়ে রাখে ভোগ-রাগের স্তম্ভ। এরই মধ্যে ফড়িদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। না, এখন সব বেচে বরাত খরাপ করবে না। পাটের বাজার যখন মন্দা গেছে তখন এসব জিনিসের দাম চড়া যাবেই। চারদিক জুড়েই তো পাটের চাষ হয়েছে। বেশীর ভাগ জমি পাটেই গিলে খেয়েছে। এসব বুনবার মতো জমি কোথায়? তার প্রমাণ তো ধান চালের দর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তরি তরকারির বাজারও বেশ টান গেলো। না, দেখে শুনে ধীরে-সুস্থে বেচতে

হবে। পাটের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে হবে মুগ কলাই যবে...আশায় আশায় স্বপ্নজাল বোনে চরের মাছুষ।

রমেন্দ্রনারায়ণ সমস্ত ঋতুই গঞ্জে থেকে গেলেন। কেন রইলেন সে খবর কেউ রাখে না। কাছারির কাজে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাখালকে এ নিয়ে প্রায়ই ড্রা কুঁচকাত্তে দেখা যায়। ফুরসত পেলেই বিকাশের সঙ্গে টীকা-টিপ্পনী কাটে।

ওদিন বিকেলে হিসেবের খাতা খুলে আপন মনেই কাজ করছিল বিকাশ। কাছারিতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। রাখাল নাকের ডগা থেকে নিকেলের চশমাটা কপালে তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে, দিনরাত অতো নাক ডুবিয়ে কি লিখছ হে বিকাশ, ওতে হজুরের মন পাবে না।

তা কি আর জানিনে দাদা, কিন্তু কি করবো, বরাতই যে মন্দ, হাতের কাজ বন্ধ করে বিকাশ উত্তর করে।

বাখাল মাত্রা চড়িয়ে পুনরায় বলে, আচ্ছা, দিনরাত ঐ ভট্টাচাষটার সঙ্গে ঘরে বসে কি করেন বলতো ?

কি আবাব কববেন। বোতল বোতল মদ গিলছেন আর ফুসুর-ফাসুর করছেন।

শুধু নেশা-ভাঙই নয় হে, আরো কিছু বহুশ আছে এর ভেতরে। দেখছো না, ক্ষেস্তি ছিনালটা দিন দিন কেমন ঘুরঘুর শুরু করেছে। শুনলাম, চম্পি জেলেনীর ওখানেও বাবু তিন চার দিন গিয়েছেন।

তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, বাতাস কোনদিকে বইছে।

বইতে দাও হে বইতে দাও। সময় মতো সবই টের পাবে।

সে স্নযোগ কি আর আসবে দাদা ?

জানেন নারায়ণ। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করছি। দিনরাত কাছারিতে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকতে হয়। বিনিময়ে কি পাও তাতো জানাই। বাবুর গোসা হলো চর বিলি করেছি বলে। কিন্তু এখন নিজে কি করছো যাদু। আমরা না হয় টাকাটা-সিকিটা নিয়েছি। কিন্তু আসলে চরটা গড়লে কে ? কই, সে তারিফ তো একবারও করতে শুনিনে ? উশ্টে ঝাল ঝাড়তে শুরু করেছেন। তোমাকে আমি বলে রাখছি বিকাশ, আমার নামও রাখাল গোসাই। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাঁড়াবে যে কোথায় সে কথা কি বুঝতে পারছেন না দাদা।

বুঝতে খুবই পারছি। কম হুদে টাকা লগ্নি হচ্ছে। এক কিস্তি আদায় না হতে আবার আর এক কিস্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমি ভেবেছো এ সবের মানে আমি বুঝিনে ?

বুঝতে আর পাবছেন কই দাদা ? হুদ যে দেবে, হে হে হে—

হেসে বাখালও ফেটে পড়ে, ধরেছ ঠিকই। তবে সেটি আব হচ্ছে না। ঐ যে বেটা ভট্টচাষকে দেখছো আসলে ও বেটা হচ্ছে একটি আস্ত খেঁকশিয়াল।

বলেন কি !

বলি ঠিকই। বাঘে মোষে লাগিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে .৩ বেটা ফল খেতে চায়।

তা হলে উপায় ?

উপায় আবার কি। যেমন চলছে চলতে দাও। সময় মতো এমন হেঁচকা টান দেবো বেটা পালাবাব পথ পাবে না।

সহসা ভেতব বাড়িতে জ্বতোর শব্দ শোনা যায়। বিকাশ বাস্তসমস্তভাবে বলে, চূপ কফন দাদা, ওরা বোধ হয় আসছে। ...তু'জনে চোখেব পলক না পড়তে মুখ বন্ধ করে।

রমেন্দ্রনারায়ণ খানিক পবেই বামকান্তকে সঙ্গে কবে কাছাবিব ওপর দিয়ে সান্দ্যভ্রমণে বেরিয়ে যান।

শীতের বংশী শুকিয়ে এতটুকু। বিরাট চর পড়েছে গল্লেব এ পাবে। জলে না ডোবা পর্যন্ত বেশীর ভাগ লোক হাটে-বাজারে চরের ওপব দিয়েই যাতায়াত করে। ঢাকা শহর থেকে মোটর চলাচলও শুরু করেছে চরের ওপব দিয়েই। উত্তরে শ্মশান থেকে দক্ষিণে ডাক-বাংলো পর্যন্ত সটান প্রশস্ত রাস্তা। স্বাস্থ্য-কামীরা সকাল সন্ধ্যা এ ক'মাস এ পথেই ভ্রমণ করবে! এ ছাড়া জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে আরো একটি পায়ে হাঁটা সরু পথ। বড় বড় নোকোব মাঝিরা গুণ টেনে যায় ও পথে।

বসন্তে বংশীব কোল হিমশীতল। শ্রোতের তর্জন-গর্জন এখন আর নেই। শীতলপাটাই যেন পড়ে আছে একথানা। পশ্চিম দিগন্ত আবীর মাখামাখি। দিনের শেষ। দিনমণি পাটে বসেছেন। ঝির ঝির করে বইছে মলয় বাতাস। ভ্রমণকারীর সংখ্যা আজ একটু বেশীই। এতো হইচই রমেন্দ্রনারায়ণের ভাল লাগে না। ওপারের শান্ত পরিবেশ সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। ধু ধু করছে

চর দিগন্তে! মাঝে মাঝে কলার ঝাড়ের ভেতরে চেউটিনের ঘরগুলো ছবির মতোই জ্বলছে। আবার ঝড়ের ঘরের বৈচিত্র্যও কম নয়। যবের ক্ষেতে সোনালী মায়ার সঙ্কেত। কোন কোন ক্ষেতের শশু কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত পরিপূর্ণ। মৃদু বাতাসে হেলে ঢুলে নাচছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৈচিত্র্যের সমারোহ। খেয়া পার হয়ে ওপারেই যান রমেন্দ্র-নারায়ণ। সঙ্গে রামকান্ত। বৈরাগীর খাল ধরেই সোজা এগিয়ে যাবেন পশ্চিমে। মেঠো পথ সুন্দর নিরিবিলা। ভ্রমণে আমেজ আছে। তা ছাড়া... কিন্তু রামকান্তকে তেমন উৎসাহী মনে হয় না। আসতে হয়েছে তাই ও এসেছে। নয়তো গঞ্জের সদর রাস্তাই ছিল বেড়াবাব পক্ষে সুন্দর জায়গা।

বৈরাগী খালের উত্তর পার নিস্তরু। গোধূলির আবছায়ায় মাঝে মাঝে শুধু রাখালগণকেই গোধন নিয়ে ছুটতে দেখা যাচ্ছে। চরের মানুষ এ সময় কেউ বড় একটা ঘাটে পথে থাকে না। মাঠের কাজ, ঘাটের কাজ শেষ করে এ ওদের বিশ্রাম নেবার সময়। তারপব কিছুক্ষণ জিরোবার পরে কিছু মুখে দিয়ে ছুটবে দয়াল চানের আসবে আর নয়তো নামগান করতে। যে না যাবে সে দাওয়ার ওপর বসে হুকো খাবে নয়তো ছেলেপুলের সঙ্গে গল্প গুজব করবে। বউ-ঝিরাও ঘাটের কাজ বেলাবেলিই সেরে নেয়। বেরতে একটু দেরি হয়ে গেছে ভেবে রমেন্দ্রনারায়ণ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুতই পা চালাতে থাকেন। তাছাড়া কিছুক্ষণ জোরে না হাঁটলে ভাল খিদে হয় না—খাবার নষ্ট হয়। ভ্রমণের প্রথম পর্বে তাই স্বাস্থ্য রক্ষার্থেই মন দেন। ভাল লাগে তো ফেরবার সময় গল্পে গল্পে ফেরা যাবে।...

রমেন্দ্রনারায়ণ দ্রুত ছুটলেও রামকান্ত তা পারে না। নিয়ামত ভাল ভাত খেয়ে অতো শক্তি কোথায় পাবে ও। বৈরাগীদের পাল্লায় পড়ে মাছ মাংস তো লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়া। বেটারা নিজেরা দিব্যি কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ গিলবে। শুধু ভাগবত পাঠকের বেলাই যা দোষ। আর ওদেরই বা দোষ কি। বেটা চরণ দাসটাই মাথা গরম করে দিচ্ছে সকলের। স্বয়ং চৈতন্যই যেন এসেছেন গঞ্জের আখড়ায়। কিন্তু কি আর করা যাবে, বরাত মন্দ। নিয়ম ভঙ্গ করলে চরে থাকা যাবে না। সব দিকেই হয়েছে জালা। এত তোষামদ করে কি মানুষ কখনো বেঁচে থাকতে পারে? কোনদিকে যায় ও? দুর্গা—দুর্গা, দুর্গাই ওকে সকলের কাছে হেয় করেছে। কিন্তু পাষাণী ক্ষিরেও তাকাচ্ছে না একবার।...চলতে চলতে দম আটকে আসে রামকান্তর।

পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে হাঁটা খামান কুমার বাহাদুর। ছড়িতে ভর করেই ধলেশ্বরীর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। বিরাট চর। আলো আঁধারিতে ক্লিমিক করছে শুভ্র বালুকণা। ধলেশ্বরী যেন নীল শাড়ীর পাড়ে লক্ষ কোটি চুম্বকীয় সাজ পরেছে। বেশ লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। মনের খুশীতে রূপোর

—

যা আশংকা করেছিল তা হয়নি। চরের কারো সঙ্গেই দেখা হয়নি। বের্টারী কেউ পছন্দই করে না কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মেলামেশা। এখন অনেকটা নিশ্চিত...

* চরে সন্ধ্যা নামে। ধরে ধরে দীপ জ্বলা শুরু হয়েছে। কোন কোন বাড়িতে মঙ্গল-শাঁখ বাজছে। ধলেশ্বরীর বৃকের ওপর দিয়ে ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গি। বড় ভাল লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। নীরবেই বালুর ওপর বসে পড়েন। রামকান্তও পাশে বসে। স্ববের মুছনা অল্পরপিত হতে থাকে চরময়—

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি —

নিগুণ কথা কইয়া যাও শুনি।

গান দূর হতে দূরান্তে মিলিয়ে যায়। ক্লমণ একাদশীর ঘন অঙ্ককার থমথম করতে থাকে চারদিকে। রমেন্দ্রনারায়ণ জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন কিনা বোঝা যায় না। রামকান্তর পক্ষে আব অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়। ভাগবতের আসরে হয়তো এরই মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে

—

রামকান্ত আবকতর ভয় নাম। ভবেই হয়েছে, মোজ মোজ অবল বেবে
এখানে বেড়াতে এলেই তো গেছি আর কি !...তবু সাহসে বুক বেঁধেই বলে,
বেশ তো আর একটু না হয় বহন।

না, চলো। তোমার আবার কীর্তনের সময় হয়ে এল, উঠে দাঁড়ান
রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। এবার আর ক্রত নয়। হেলে দুলেই
পথ চলতে থাকে। গল্পে গল্পে বৈরাগী খালের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় দুজনে।

খালের মুখ থেকে বংশীর চর অনেকটা নীচু। স্নানের জন্তু কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঘাট তৈরী করে দিয়েছে চরের মানুষ। ওকি! কলসী কাঁখে একটি স্বীলোক উঠে আসছে না ঘাট থেকে! কে ও? চেনা চেনা বোধ হচ্ছে, রামকান্তর উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়।

দুর্গা সন্ধ্যার জল ভরতে বংশীর ঘাটে এসেছিল। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই এখন ওকে ছুটতে হয়। অল্প দিন বেলাবেলিই সব হয়ে যায়। আজ অসময়ে স্নান এসে গ্যাট হয়ে বসায় দেরি হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে। নিজের বিবেচনায় উঠে না গেলে মানুষ মুখ ফুটে বলে কি করে। তাছাড়া যে রকম ঝগড়াটে। এই তো দু'দিন আগেও ঝগড়া গেছে, এখন আবার চলাতে শুরু করেছে। দুর্গাও অপ্রস্তুত হয়। দূর থেকেই উভয়কে চিনতে পারে। চাঁদির ওপরের ঘোমটা নাকের ডগা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে রাস্তা দেয়। কাঁথের ওপরে মাজা পেতলের কলসীটা অন্ধকারেও ঝকঝক করতে থাকে।

রামকান্তর চিনতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

রমেন্দ্রনারায়ণের চোখের ওপর সহসা যেন একটি রঙিন প্রজাপতি পাখা মেলে এসে দাঁড়ালে। মনের কোণে বিদ্বাং চমকাতে থাকে। একি সত্যি না স্বপ্ন। দুর্গা কি তাহলে ওকে দেখেই এই নিঝুম ঘাটে জল ভরতে এসেছে... কি করবেন ভেবে পান না রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত বোবা হয়ে গেছে। একটি কথাও মুখ দিয়ে সরে না। সত্যিই কি ও দুর্গা! কই, এর আগে তো কখনো ওকে এ সময়ে জল ভরতে দেখা যায়নি। তবে কি...না না, হয়তো কোন কাজে আটকে গিয়েছিল। বেচারী কতক্ষণ ভরা কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মুক্তি দেওয়া উচিত।... রামকান্ত আর ভাবতে পারে না। সটান পার হয়ে আসে রাস্তা। ওর দেখা দেখি রমেন্দ্রনারায়ণও পার হয়ে আসেন। দুর্গা দম কেলে তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে ছুটতে থাকে। ভরা কলসীর জল ছলকে পড়তে থাকে চলার ছন্দে। স্বর্গের উর্বশীই যেন মর্ত্যের নদীতে জল ভরতে এসেছিল। রমেন্দ্রনারায়ণ পথটুকু পার হয়ে এসেও চাতকের মতোই পেছন ঘুরে দাঁড়ান। দু'চোখে লোভাতুর দৃষ্টি।

দুর্গা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখ ঝোলেন, তোমার সেই তিনি না ভট্টাচার্য?

রামকান্ত নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। তবু উত্তর না দিয়ে পারে না।
কৃত্রিম রসান দিয়েই বলে, হজুরের অনুমান সত্য।

খাসা মালটি পাকড়েছ হে ভট্‌চায়। মধুতে যেন টে-টুথুর।

হলের কথাটাও ভেবে দেখবেন হজুর, মিটমিট করে হাসতে থাকে
রামকান্ত।

বমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, আনন্দটা গৌয়ার না? কিন্তু হল আছে বলে কি মধু
খাবে না রসিকজন?

রামকান্তব ইচ্ছে করে ঠাস কবে একটা বিবানী সিঁকাব চড় বসিয়ে দেয়
বেহায়াটার গালে। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয় না। অবস্থা আয়ত্তে রেখেই পাশ
কাটাতে চেষ্টা করে, দেখা যাক না, চারে মাছ পড়ে কিনা।

ও দেখাদেখির মন্যে আমি নেই হে ভট্‌চায়। যা করবে তাড়াতাড়ি করো।

হজুর কি তাহলে পাইক-পেয়দা লাগাতে চান?

প্রয়োজন হলে তা আমি লাগাবো। তবে তুমি কতদূর এগিয়েছ আগে
সেইটেই জানতে চাই।

শটন শটন এগিয়ে যাওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় হজুর।

দেখো, বেশী ঋণটাবে না বলছি। কতদিন আর তুমি আমাকে লেজ
খেলাতে চাও বল তো?—রমেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

রামকান্তও নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করে। ঢোক গিলে খিতিয়ে
খিতিয়েই জবাব দেয়, হজুর কি তা হলে আমাকে অবিশ্বাস করেন?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এটা নয়। এককঁড়ি টাকা তুমি আমাকে দিয়ে
দেওয়ালে। আসল তো দূবের কথা হুদটা পর্যন্ত আদায় হলো না। বছর
ঘুরতে চললো। আমলা, মুহুরি, নায়েব সকলের মুখে চোখেই বিক্রপের কটাক্ষ।
অথচ তোমার মধ্যে কোন সাড়া-শব্দই নেই। আরো কত কাল আমাকে তুমি
ঝুলিয়ে রাখতে চাও?

রামকান্ত থ বনে যায়। রাগে হুখে নিজের গাল নিজেরই চড়াতে ইচ্ছে
করে। কি কুক্ষেই না চরে পা দিয়েছে ও। দুর্গা দুর্গা, দুর্গার জগুই আজ
লোকের কাছে ওকে অপমান সহ করতে হচ্ছে। টাকটাই যদি না নেওয়া
থাকতো তাহলে ও দেখিয়ে দিতে পারতো, কাশিমপুরের কুমার বাহাদুরের চেয়ে
ওর ক্ষমতা কম নয়। হাজার লাঠিয়াল ওর কথায় ওঠে বসে। কুল লননার
অপমান চরের মানুষ কিছুতেই সহ করতো না। কিন্তু দুর্গার কাছে নিজেরই ও

পরাজিত। কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানানো ওর পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। চব ছেড়েই ওকে পালাতে হবে...ভাবতে ভাবতে মাথাটা বৌ বৌ করে ঘুরতে থাকে রামকান্তর। মুখে কোন কথাই বলতে পারে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন। রাগের মাথায় কথাগুলো বলে যেন ভাল করেননি। পাইক পেয়লা পাঠানোর কথা মুখে বলা যতো সহজ কিন্তু কাজে ততো সহজ নয়। চরই একমাত্র জায়গা যাব আয়ে লাট কিস্তি চলে। সেই চরের মানুষ যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করা গেলেও আয় নিশ্চিত কমে যাবে। না না, এ তুল কিছুতেই করা যায় না। পুনরায় বামকান্তকেই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। হান্ধাভাবেই শুধান, বাবু সাহেবেব বুঝি রাগ হলো ?

কিন্তু বামকান্ত তবুও সহজ হতে পারে না। বড় লেগেছে আজ ওর। মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার কবে বলেন, নাও হয়েছ, আর রাগ দেখাতে হবে না। হাসতে হাসতে নিজে একটা ধরিয়ে আর একটা রামকান্তর দিকে এগিয়ে দেন।

রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে সজ্বরে টানতে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় নিজের কথায় ফিরে আসেন, দেখ হে ভট্‌চায়, তুমি রাগই করো আর যাই বলো, ও মাগী কিন্তু সাচ্চা নয়। চণ্ড দেখলে না, কেমন পাছা ছলিছে হনহন করে চলে গেলো! কথায় আছে :

জল কেলে জল ভবতে আসে

সে যে কেমন সতী—

কদমতলায় চিকন-কাল

আয়ান মিছে পতি।...

বলি সন্ধ্যা বেলা—নির্জন ঘাটে—একা একা জল ভরতে আসা, মানে কিছু বুঝতে পারলে কি ?

রমেন্দ্রনারায়ণের কথায় আপন মনেই ধ্রাক্ষা খায় রামকান্ত। তা ঠিক বটে। আমি কতদিন চেষ্টা করেছি, নিরিবিলিতে ঘাটে পঁখে ছটো প্রাণের কথা বলতে। কিন্তু মাগী কোন সাড়াশব্দই করেনি। ভাবখানা, যেন কিছুই বুঝতে

পারছে না। কই, এর আগে তো কোনদিন রাত্রিবেলা জল নিতে আসতে দেখিনি। কুমার বাহাদুর ঠিকই বলছেন। চঙ দেখাতেই এসেছিল ছিনাল। রূপ আর রূপটানের মোহে স্থির থাকতে পারিনি। কুমার বাহাদুরকে মুখোমুখি দেখবার ছুতনোতেই জল ভরতে আসা হয়েছিল। ভেবেছিল, আমি ভাগবতের আসরে সরে পড়বো। দিব্যি একা একা নিরালস্য প্রাণের কথা বলবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি পড়েছে। তাই আবার চঙ করে ঘোমটা টেনে হনহনিয়ে চলে যাওয়া হলো। বেশ, তাই হবে। তোর মনোবাহাই পূর্ণ করবো। তখন দেখে নিস, কে তোর সত্যিকারের ভাল করতে চেয়েছিল। হতভাগ্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ না বারো ঘাটের এই মড়াটা।...এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রামকান্তও সক্রোধে জলে ওঠে। বমেজ্ঞনারায়ণের হান্ধা কথার জবাব হান্ধাভাবেই দেয়, দয়া করে আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন হজুর। চঙ দেখানো আমি বার করছি।

সাবাস, এইতো চাই। জানলে হে ভট্‌চাষ, জীবন দুদিনের, ভোগ স্বখ যা কিছু সময় থাকতেই করে নাও।

অধম কি হজুরের প্রসাদ পাবার আশা করতে পারে ?

ভোগ আরতির আগে প্রসাদের কথা মুখে এনো না হে ভট্‌চাষ, পাপ হবে।

সাদ্যমতো দেব-সেবার ক্রটি হবে না হজুর।

তাহলে প্রসাদ তো নিশ্চয় পাবে।

হজুরের জয় হোক।

না না, আগেভাগে জয়গান করো না। চলো, একটু চান্দা হওয়া যাক।

আজ থাক হজুর। শুনছেন না, ধোলে কেমন চাটি পড়ছে? দেরি হলেই ধোঁজাখুঁজি শুরু হবে। রসবোধ বলতে যদি কোন বস্তু থাকতো বেটাদের।...

তা আর কি করবে, দুটো দিন সবুজ করো। নায়েব শালা আবার দলবল নিয়ে পঁগচে কষতে শুরু করেছে। আগে শালাকে টিট করে নিই তারপব সোজা বসিয়ে দোবা গদিতে, হে হে হে...

মুখের কথা আর শেষ করেন না বমেজ্ঞনারায়ণ। রামকান্ত স্বপ্ন দেখতে থাকে। বলছেন কি কুমার বাহাদুর। গঞ্জের কাছারির নায়েব করবেন আমাকে। এ-ও-কি সম্ভব। তাহলে তো কোন কথাই নেই। দুদিনেই চরের জারিজুরি শুভে কেলা যাবে। হাজার হোক আর লাখ হোক, বিজ্ঞানের

নগ লাঠি-মোটার কাজ নয়। মাত্র দুটো বোড়ের কিস্তি—সব শালা
 নায়েস্তা হয়ে যাবে। কথায় কথায় শালারা, মেজাজ খারাপ করতে শুরু
 কবেছে। ঐ ছিনাল মাগীকেও এক হাত দেখে নেবো। পায়ে ধরে সাধাবো
 তবে আমাব নাম রামকান্ত ভট্টাচার্য।...আকাশকুহুম ভাবতে ভাবতে খেয়াঘাট
 পর্যন্ত এসে পড়ে রামকান্ত।

বমেস্ত্রনারায়ণ একাকী ডিক্রির ওপর গিয়ে ওঠেন।

বামকান্ত তীরে দাঁড়িয়েই হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

দেখতে দেখতে ডিক্রি এপার থেকে ওপারে গিয়ে পৌঁছোয়। রামকান্তও
 বেবানী বাড়ির দিকে চলতে থাকে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবে, নায়েবিতা
 একবার হাতে এলে হয়। ও শালার জমিদারী চালও দুদিনে ঘুচিয়ে দেবো।
 শালার বড্ডো বাড় বেড়েছে। টাকার বিনিময়ে ধরাকে সর! জ্ঞান করছে।
 বেশ, দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল।...ভাবনায় ভাবনায় দুর্গার বাড়ির
 কাছেই এসে পড়ে রামকান্ত। ভাবে, দেখে যাবো নাকি একবার মাগীকে।
 না, থাক। ভাল বৃষ্টি তো ক্ষেঁরবার পথেই নাড়াচাড়া করে দেখে যাবো
 ...কোন দিকে না তাকিয়ে সোজাসুজিই পা চালাতে থাকে রামকান্ত।

॥ ২৮ ॥

দোল পূর্ণিমা। দূর গগনে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সমারোহ। চন্দন
 মাখামাখিই যেন নীল গগনের প্রশস্ত ললাটখানি—চন্দ্র সুষমায় উজ্জ্বল। সঙ্গীত
 মন্ত্রিত ভুবন গগন। এ সঙ্গীত বিরহের সঙ্গীত। আবার মিলনের মহা
 সঙ্গীতও এ।

কান্ত কুঞ্জে আসবেন। ঝরা পাতায় বাজছে তার পায়ের নুপুর। রঙীন
 পাখা মেলে প্রজাপতি গুঞ্জরণ তুলছে। চামর ছলছে কাশের বনে। বন-বিতান
 পুষ্পিত। শ্রীমতী প্রতীক্ষারতা বাসরঘরে। মধুধামিনী ভোর হয়ে আসে।
 না, কান্ত আর এলেন-না। বিরহী আত্মা গুমরে ওঠে। সে বিরহ অহুরণিত
 হয় কোকিলের কুঞ্জে, ঝরা পাতার মর্মরে—নীরব নিশীথে। বসন্ত এখানে
 রোদন-ভরা। আর কান্ত যার কুঞ্জে আসেন তার কাছে এ সঙ্গীত-মুখর—
 মিলন প্রতীক।...

মিলনেই মেতেছিলেন বৃন্দাবনের সখীরা সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। কুহুমিত
 নিধুবন। বাতাসে মিষ্টিগন্ধ। রাগ-রঞ্জিত দেহ। কণ্ঠ সঙ্গীত-মুখর। গোপিনীরা

উৎসবে মাতোয়ারা। মাতোয়ারা আবীর কুমকুম আর চূয়া-চন্দনে। নূপুরের রোল উঠছে, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে—প্রাণ যাচ্ছে প্রাণে মিশে। এ উৎসব যৌবন উৎসব—মদন উৎসব—বসন্ত উৎসব। শ্রীবন্দাবনে দোল উৎসব এ...

ময়না নিশির বিয়ের পর এই প্রথম দোল উৎসব। গঞ্জের বাজারে ধুম লেগেছে। বিহারী মজুর আর দোররক্ষীরা প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই লীলা গানে মত্ত। প্রতি রাত্রে ঢোলক বাজে—খঞ্জনী। সমস্বরে চলে গান-বাজনা—অনাবিল আনন্দ উচ্চ্বাস। সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পরেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ওরা। পূর্ণিমার দিন দুই আগে থেকে গতি আরো বেড়ে যায়। দলের কেউ একজন নায়িকা সাজে। সকলে রসবতীকে ঘিরে সারারাত্‌ চালায় সা-রা-রা আর খিস্তি খেউর। এ কোন লীলাগান নয়। ভরা যৌবন আর বসন্তের উৎসব সঙ্গীত। আদিম যুগের কোন এক আদিম পুরুষ কবে যে এদেব হয়ে এ সঙ্গীত ফেঁদে গেছেন তা কেউ না জানলেও আজো তার ধারা বদলায়নি। সেই আদি ও অকৃত্রিম সুরেই আজো এরা যৌবনের বন্দনা গায়—উৎসব করে।

হরির আখড়ায় দোল উৎসব চলেছে। মোহন্ত চরণ দাস তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুত্র সনাতন দাসের ওপব আখড়ার ভাব। পিতাব সমস্ত শিষ্ট সামস্তকে নিমন্ত্রণ করেন সনাতন। যে যা পারে গোপীনাথের ভোগ বাগেব ব্যবস্থা করে। দু'দিন দু'রাত্রি চলে বিরামবিহীন পালাগান। চরের দল গাইছে পূর্ণিমার দিন। “নৌকা বিলাস” গাইছে তারা। মধুর মৃত্যুর পব সুরে সুরেই এখন চরের সেরা গাইয়ে। মধুর মতো রাগ-রাগিণীতে ওস্তাদ না হলেও সুরেন্দ্রের কঠিন স্বমিষ্ট। আসরের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ ওর গানে।

মাঝ রাত্রে শেষ হয়ে যায় পালা। চলে নুমুর আর জয়ধ্বনি। আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি। ভক্তগণ আজ শুধু বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে উৎসব।

আগামীকাল হোলি উৎসব। প্রিয়জন দেবে প্রিয়জনের গায়ে রং আর আবীর। হোলি গান বেরোবে পাড়ায় পাড়ায়। গঞ্জে বাঙালীদের দু'দল। উত্তর থেকে আসবে উত্তর পাড়ার দল আর দক্ষিণ থেকে যাবে দক্ষিণ পাড়ার দল। মারামারি জায়গায় চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে এসে মিলবে উভয় দল। প্রত্যেক দলেই থাকবেন একজন করে রাজা। রাজার সাজ-পোষাক আবার অদ্ভুত ধরনের হওয়া চাই। গাধার পিঠে উল্টো-মুখো হয়ে বসবেন তিনি। মাথার থাকবে ভাঙা ধালুই-এর মুকুট। গলায় হেঁড়া জুতোর মালা, পরনে চট নয়তো।

হেঁড়া কাঁথা। রাজার পাত্র-মিত্ররাও কেউ কম যাবে না। কারো হাতে কাঁটা, গাছের ডাল, বাডুন। হইহই করে শোভাযাত্রার আগে আগে রাজাকে তাড়া করে নিয়ে চলবে একদল। আর তার ঠিক পেছনেই ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে আর একদল যাবে গান গাইতে গাইতে। উৎসব কেন্দ্র থেকে শোভাযাত্রা বার করবার সময় এ গান বৃন্দাবনজীর লীলামাহাত্ম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শেষে এসে দাঁড়াবে খিস্তি-খেউরে। দক্ষিণ-পাড়ার রাজার মুকুটে লেখা থাকে “উত্তর পাড়ার রাজা চলেছেন, সাবধান।” আবার উত্তর পাড়ার মুকুটে লেখা থাকে, “দক্ষিণ পাড়ার রাজা চলেছেন, সেলাম দাও।” সেলাম ঠিকই দিচ্ছে। রাজার পিঠে সমানে পড়তে থাকে কাঁটা আর বাডুনের বাড়ি।

চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে উভয় দলের আড়াআড়ি আরো বেড়ে যায়। রং-তামাসা খিস্তি-খেউর সমানে চলে। যে দল এঁটে উপতে পারে না তাদের কেউ একজন চুপিচুপি এসে ভিন্ন দলের ঢোলক দেয় ফাঁসিয়ে। খিস্তি-খেউর থেকে অবস্থা হাতাহাতি মারামারিতে গিয়ে পৌঁছোয়। খবর পেয়ে দু’ দলের দলপতিরা ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মামলা মিটে যায়। আবার লীলামাহাত্ম্য গাইতে গাইতে যে যার পাড়ায় ফিরে আসে।

দুপুর তখন গাড়িয়ে যায়। বংশীর স্বচ্ছ জলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। চড়া রোদে সমস্ত শবীর তেতে গেছে। গাল, গলা থেকে আলকাতরা, বাঁহুরে রং আর অ্যালুমিনিয়ম পাউডার ঘষে ওঠাতে গিয়ে ছাল-চামড়াই উঠে যায় অনেকের।

সন্ধ্যায় আবার ঠাকুর গন্তের পালা। এবার আর কোন রং-তামাসা কিংবা বহুরূপী সাজসজ্জা নয়। ভদ্র জামা-জুতো পরে সন্তান্তরাই বেরুবেন এবার। শোভাযাত্রার আগে থাকবে পঞ্চ বাজনা। ঢোল, কাঁসর, সানাই, কাড়া-নাকাড়া। তারপর বাহকের মাথায় দোল-চৌকির ওপর বিগ্রহ। বিগ্রহের পরেই থাকবেন বাবুমশাইরা। হারমোনিয়ম, ঢোলক, করতাল-যোগে চলবে লীলা-গান। নূল গায়ের আগে গেয়ে যাবে এক-একটি পদ, অগ্নেরা সমবেত কর্তে করবে তার পুনরাবৃত্তি। এ বেলা আর এক ফোঁটাও জলো রং নয়। শুধু আবীর আর কুমকুম। রাস্তার দু’দিকের বাড়ি থেকে পুরনারীরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আবীর ছিটাবেন—উলু দেবেন—সঙ্গে লুটের বাতাস। বেশ শাস্ত পরিবেশের মধ্যেই উত্তর দলের শোভাযাত্রা আবার এসে মিলবে চণ্ডীমণ্ডপে। প্রাণ খুলে একের পর এক যে যার দলের রচিত গান গেয়ে শোনাবে উপস্থিত

জনতাকে। মণ্ডপের বিরাট চত্বর লোকে লোকারণ্য। বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মিজদের মধ্যেও চলবে আবীর খেলা। শুভ কামনা জানাবে পরস্পর পরস্পরকে। গভীর রাত পর্যন্ত চলবে গান! সর্বশেষ ফিরে আসবে যে যার পাড়ায়। এবার প্রসাদ পাবার পালা। মোহস্তরা হাতে হাতে বেঁটে দেবেন খিচুড়ি, মিষ্টান্ন আর লাবড়া। উৎসবের হবে পরিসমাপ্তি।

দোল উৎসবে চরণ দাসের শিখরা গঞ্জে গেলেও চরে আমোদ-প্রমোদ কম হয় না। আবীর রং খেলার ধুম চরেও জমে ওঠে। হোলির দিন ছোটরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই রং পিচকারি নিয়ে মাতোয়ারা। বড়দের মধ্যেও আবীর বিনিময় চলে। পরস্পর করে পরস্পরের মঙ্গল কামনা।

দীহুর বাড়ির ধুম এবার একটু বেশী। বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছে ময়না। পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে নড়ছেই না। সকালেই রং-এ নেয়ে ওঠে ময়না। নিশিও বাদ যায় না। পার্বতী আচ্ছা করে ওদের ছ'জনকে রং মাখিয়ে দেয়। নিশিও পার্বতীকে ছাড়ে না। বড় ঘরখানায় ওরা সকলে মিলে হৈ-হল্লা শুরু করে। কুহুমের ভালই লাগে এ আনন্দ-উৎসব। এবেলা আর রান্না বাস্তু নেই। মুড়ি চিড়ে খেয়েই সকলকে পেট ভরাতে হবে। দীহু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে হরির আখড়ায় ছুটেছে। অশ্বিনীকে দিয়ে গঞ্জের বাজার থেকে এক টাকার জিলিপি আনায় কুহুম। রং খেলে কেউ খালি মুখে যাবে না। আর কিছু না হোক একটু মিষ্টিমুখ সকলকে করাতেরই হবে।

নিশির হাতে রং খেয়ে পার্বতী বলে, আমাকে আর রং দিয়া কি করবা-নিশিভাই। গলার মালারে রং ছাও গা।

উত্তরে নিশি বলে, হ, আপনারা যা করচেন কইয়া ছান, তাই করি।

পার্বতী বলে, আমাগ হা কালের (সেকালের) কতা ছাইড়া ছাও। তোমাগ রাদা যে বাশী ছইনা ঘরে আইচে। হারে বিন্দাবন নীলা ছাহাও। কি কচ'ল তরা?—সরলা কালী প্রতুতি অগ্নাগ সকলের দিকে চেয়ে হেসে কেটে পড়ে পার্বতী।

সকলেই পার্বতীকে সমর্থন করে সমস্বরে চেপে ধরে নিশিকে, হ হ নিশি ভাই, ময়নারে কোলের উপর বহাইয়া রং মাখাইয়া ছাও।

নিশি বলে, তবে তোমরা হগলে মিলা ধইরা আন অরে।

লজ্জায় মুখ ঢেকে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল ময়না। নিশির মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে সকলে মিলে টানতে টানতে ওকে নিশির কাছে নিয়ে আসে।

কোলে বসানো আর হয় না। দু'হাতে ঘন করে গোলাপী রং গুলে ময়নার মুখে মাখিয়ে দেয় নিশি।

পার্বতী এবার ময়নার হয়ে ওকালতী করে, এই মইনী, তুইও ছাড়চ ক্যান দে না আইচ্ছা কইরা মাখাইয়া।...

কিন্তু ময়না তা পারে না। কিছুদিন আগেও যে মেয়েটি বংশীর চরময় একসঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করেছে সে আজ লজ্জাবতী লতা। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নীরবেই খিলখিল করে হাসতে থাকে শুধু!

বাড়ির সখ মিটিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভিন্ন পাড়ায় রং খেলতে যায় নিশি। একরকম সারাদিনই চলে আবীর আর রং খেলা। হৈ হুল্লুড়ে শরীর কিমিয়ে আসে। গঞ্জের লোক হোলিগানে গভীর রাত পর্যন্ত ডুবে থাকলেও চরের মাহুষ বেশীক্ষণ বেশ রাখতে পারে না। দীন্ত গঞ্জ থেকে ফিরে আসার আগেই নিশি শুতে যায়। একবার ভেবেছিল, গঞ্জে গিয়ে গান শুনে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। ও তো সেই মামুলী ব্যাপার। অনেক বারই তো দেখেছে, এখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাত দশটা না বাজতেই শোবার-ঘরে ঢোকে নিশি। একে একে সমস্ত চরই এক রকম নিস্তর হয়ে পড়ে। রামকান্তও বেশী পেড়াপীড়ি করেনি। হৈ হুল্লুড় ওর ভাল লাগে না। চেপে ধরলে চরেও কীর্তনাদিব ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু তাতে সনাতন দাসের চেয়ে ওর নিজের ক্ষতিই হতো বেশী। নিজেকেও আটকে থাকতে হতো কীর্তনের সঙ্গে। এই বেশ ভাল হয়েছে, ওরা গেছে ওদের মোহস্তের আখড়ায়, ও পেয়েছ ছুটি। ষত খুশি বেটারা নাচানাচি করক ওর কিছু আসে যায় না। ও কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কাছারিতে বেশ আছে। হ্যাঁ, একেই তো বলে বসন্ত উৎসব। সুরা শাকীই যদি না রইলো তবে আবার উৎসব কিসের? নেশার বোঁকে কুমার বাহাদুর অবশ্য দুর্গার জন্ত হাঁপিয়ে উঠছেন। খিন্তি খেউরও বাদ দিচ্ছেন না। তা একটু দিন, নেশা বেশ ভালই জমেছে। এখন নায়েবিটা হাতে এলেই কেলা কতে। আর ও তো এল বলে। মাগী যখন ঘাটের পথে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবো। গোসাঁই শালাকেও তখন দেখে নেবো। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে শালা যেন মাথা কিনে কেলেছে। একবার বসে নিই গলিতে সব শালাকে বোঁটিয়ে বিদেয় করবো।...নেশার বোঁকে এলোমেলো ভাবে থাকে রামকান্ত।

সারা চরই একরকম নিস্তর। নিশি অস্থিনীও যে যার ঘরে গেছে। শুধু চক্ষুলাঙ্কায় ময়না পার্বতী যেতে পারছে না। শান্তুড়ীকে একা বাইরে রেখে নিজেরা ঘরে যায় কি করে। অবশু খাওয়া-দাওয়ার কোন ঝামেলা নেই আজ। বাড়ির সকলের ব্যাপারই চুকে গেছে। শুধু স্বশুরঠাকুরই যা একা বাকী। কিন্তু উনি তো গঞ্জের আখড়াতেই প্রসাদ পাবেন। তবু ঠাকুরন যখন মুখ ফুটে ওদের কিছু বলছেন না তখন আর যায় কি করে। কিন্তু হুঁচোখ যে ঘুমে বুকে আসছে। সারাদিনের খাটুনির পর কতক্ষণ আর চূপচাপ বসে থাকি যায়। হাই তুলতে তুলতে পার্বতী উঠে দাঁড়ায়। কুসুমের শরীরেও আর বইছে না। খাওয়া দাওয়ার পর পান চিবুচ্ছিল, পার্বতীর ওপর নজর পড়ে। ঢোক গিলে নিয়ে ওকেই বলে, তোমরা শোও গা বোমা, রাইত অইচে।

পার্বতী এই অল্পমতিটুকুর জগুই অপেক্ষা করছিল। স্ততরাং আর কোন রকম দ্বিধা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, আপনে হইবেন না ?

হ, আমিও গিয়া গৈড় (শোয়া) দেই গা। কতক্ষণ আর বাইরে বইয়া থাকুম। ওনার ফিরতে অনেক রাইত অইব। তোমরা ঘরে যাও।

পার্বতী ময়না উঠে দাঁড়ায়। কুসুমও আর দেরি করে না।

দক্ষিণ ভিটির ঘরখানায় নিশি শোয়। চারদিক জুড়ে ঢেউটির বেড়া—ঢেউ টিনের চাল। পূর্বদিকের জানালা খুললে ঘর থেকে বংশীর জল দেখা যায়। ময়না আস্তে আস্তে এসে ঘর ঢোকে। নিশি জেগে আছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যায় না। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নেই। টিপটিপ করে মাটির প্রদীপ জ্বলছে এক কোণে। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা লম্বা গোটা তিনেক শিকে। মাটির পাতিল ও পেতলের গামলায় হয়তো কোন খাণ্ড রয়েছে। গোটাকয়েক বড় বড় মাটির জালাও রয়েছে আর-এক কোণে। এছাড়া আছে বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করানো ছোটবড় এক ঝাঁক কাঁটাল কাঠের পিঁড়ি। বেড়ার সঙ্গেই বড় একটা কাঠের তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে আয়না চিরুনি প্রভৃতি ময়নার প্রসাদন সামগ্রী। উত্তর-দক্ষিণের বাতার সঙ্গে টাঙানো দড়ির ওপর গালা-করা শ্যামা-কাপড় ঝুলছে। দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে রয়েছে শোবার বড় চোকিখানা। ময়না ঘরে ঢুকেই প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। পূর্বের বড় বড় জানালা দুটো দিয়ে পূর্ণিমার শুভ জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। বংশীর কোল বলমল করছে উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে। গঞ্জের হুঁচারটে দোকান পাটে এখনো বাতি জ্বলছে।

নিস্তরতা ভেদ করে ভেসে আসছে ক্ষীণ গানের রেশ। গঞ্জের মানুষ হয়তো সারা রাতই উৎসব করবে আজ।...কিন্তু ও কি ঘুমিয়ে পড়লো এরই মধ্যে! খুব মানুষ যা হোক। অতো লোকের মধ্যে পায়ের আবীর দিতে আমার বুঝি লজ্জা করে না!...এক ফাঁকে একগালা পেতলের রেকাবিতে করে তাকের ওপর খানিকটা আবীর এনে রেখেছে ময়না। ইচ্ছে, নিরিবিলিতে নিশির পায়ের দ্বিগুণ প্রণাম করবে। গুরুজনের পায়ের তে আবীর দিতে হয়। কিন্তু ও যে ঘুমিয়েই পড়লো। শোয়া অবস্থায় তো আবার কাউকে প্রণাম করতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়।...ভাবতে ভাবতে ময়না জানালা থেকে চৌকির কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন যেন বাধবাধ ঠেকে ওর। কিছুতেই গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে পারে না। ফিসফিস করেই ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে, এই—ঘুমাইলা নাকি। বারে, ওঠ না, এই।...

না, কোন সাড়া শব্দ নেই নিশির। বিরক্ত হয়ে ময়না আবার এসে জানালায় দাঁড়ায়। দু'চোখের ঘুম কোথায় যেন উবে গেছে। ঐ তো বংশীর বিরাট চর ঝিকমিক করছে, ঐ দেখা যাচ্ছে চরধল্লার বুড়ো বটগাছটা। কত নিভৃত সন্ধ্যায়—কত দুপুবে দু'জনে ওখানে গলাগলি ধরে খেলেছে। লোকচক্ষুর সামনেই মাবামারি হাতাহাতি কবেছে, লজ্জার লেশমাত্রও কোনদিন টের পায়নি। কিন্তু আজ এই নিভৃত ঘরে একি ওর লজ্জা!...না না, লজ্জা আবার কিসের! বেচাবা সারাদিনের ক্রান্তিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'দণ্ড থাক না, পরেই জাগানো যাবে। এমন কি রাত হয়েছে! এই তো বেশ লাগছে... ময়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের শোভা দেখতে থাকে।

ঘুম নিশির চোখেও নেই। চূপচাপ শুয়ে মজাই দেখছিল ও। কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়। ময়না যে চাঁদের শোভায় ডুবে গেলো!...জল খারার ছুঁনো করে বিছনার ওপর উঠে বসে নিশি।

ময়না শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকায়। সবিস্ময়ে বলতে থাকে, অ, তুমি তাইলে জাইগা জাইগা ঘুমাইচিলা!

কৃত্রিমভাবে চোখ বগড়িয়ে নিশি উত্তর করে, বইয়া গেচে আমার জাইগা থাকবার। তিষ্ঠায় বলে আমার গলা শুকাইয়া গেচে! জল আছে নাকি?

জল খাইব না হাতি। এই ঝাও, ময়না কলসী থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিশির হাতে দেয়।

রেশ রাখবার জন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশিকে খানিকটা জল পান করতে হয়।

ময়না হাত বাড়িয়ে পুনরায় গ্লাসটা নিতে যায়।

নিশি গ্লাসটা হাতে দিয়ে ছুঁহাত দিয়ে চেপে ধরতে যায় ওকে।

ময়না ধরা না দিয়ে মুচকি হেসে চলে যায় জানালায়।

নিশিও আর বিছানায় থাকতে পারে না। উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

আবার চেপে ধরতে যায় ওকে বৃকের সঙ্গে।

ময়না বাধা দেয়, দাঁড়াও তোমারে একটা পেগাম করি।

নিশি খতমত খেয়ে চূপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

ময়না তাঁক থেকে আবীরের রেকাবিখানা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এক মুঠো আবীর নিশির পায়ের ওপর দিতে যায়।

নিশি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বাধা দেয়, কর কি—কর কি! গোবিন্দের আবীর কি মাইনষের পায়ের দিতে আছে!

ময়না ওতে কিছুমাত্র দমে না। হেসে উত্তর দেয়, গোবিন্দের আবীর গোবিন্দের পায়েরই ত দেই। তুমিই ত আমার সাইক্কাইত (সাক্ষাৎ) গোবিন্দ।

নিশি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ময়না ততক্ষণে ওর ছুঁপায় ছুঁমুঠো আবীর দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ওকে। সকালে দশজনের সামনে রং দিতে পারেনি।- এবার ও সাধ মিটিয়েই ওর গোবিন্দের পায়ের আবীর দিতে পারলো। নারী জন্ম সার্থক ওর। স্বামী তো সাক্ষাৎ দেবতাই। মা, দিদিমা তো বরাবর এই কথাই ওকে বলে আসছে। পূর্ণিমায় দেবতার পায়ের আবীর-অর্ঘ্য এ তো ভাগ্যের কথা...ময়না অন্তরে অন্তরে গর্ব অনুভব করে।

নিশির বয়োঃসন্ধির উন্মাদনাও মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। সোহাগে প্রাণের রাখাকে ছুঁহাতে টেনে তুলে বৃকের সঙ্গে চেপে ধরে। হিয়ায় মিশে যায় হিয়া।

বসন্ত হিল্লোলে কেঁপে ওঠে ধংশীর কোল। অদূরে মৃদু মৃদু হুলছে পাশাপাশি দু'টি কাশ ফুলের গুচ্ছ। জানালা থেকে ফিরে আসে ওরা বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়ে মনের স্নেহে।

চরের মাহুঘের বরাতই মন্দ। গোলা ভর্তি প্রত্যেকেরই ঘি-কলাই, ঘব, সোনা-মুগ। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এগুলোর যেন কোন দামই নেই। প্রথম মরশুমে তরি-তরকারির দাম দেখে মনে হয়েছিল, ররিশস্ত্রের দামও চড়া যাবে। কিন্তু চড়া তো দূরের কথা এখন যে কোন খরিদারই নেই গঞ্জে। লোকে এখন গরু খাওয়ানোর জন্তু কলাই কিনছে। এক টাকা, উর্ধ্ব পাঁচ সিকের বেশী নয় কলাইয়ের মণ। যবেব অবস্থাও তথৈবচ। সোনা মুগের দর কিছু বেশী আছে বটে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা মুগ আর ক'জনের গোলায় আছে। কাঁড়ি কাঁড়ি কলাই-ই তো রয়েছে এক একজনের হাতে। অগ্র পর দূরের কথা পলানের মতো চাষীও বাজার গতিকে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দীর্ঘ করিমের বুক শুকিয়ে কাঠ। না, কসাইয়ের হাত থেকে আর বাঁচার কোন আশা নেই। হৃদযোর মহাজন ওদের ললাটের লিখন। বিধাতা ওদের হাড়ের রস টেনে বার করার জন্তুই শয়তানের সৃষ্টি করেছেন। এরপর পাট চাষ আর হবে কি দিয়ে। ভগবানই রুষ্ট হয়েছেন চরের ওপর। বানের জল ঘরে ঢুকে আসল জল টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। টিনের ঘর-দোর তো যাবেই—ভিটেমাটিও থাকবে কিমা সন্দেহ।...

রামকান্ত এখন আর নিয়মিত ভাগবতের আসরে আসে না। কেউ তার জন্তু কোন কথাও তোলে না। আসর কই যে তা নিয়ে মাথা গরম করবে। সন্ধ্যার পর দু'পাঁচজন আসে, কোনরকমে খোলে চাটি দিয়ে ধ্বনি দেয়। বাজ ও পড়ে কোন কোন দিন। চিন্তায় চিন্তায় মাহুঘ সব ভুলতে বসেছে। দম্বাল চানের আসরও ফাঁকিই যায় একরকম। সকলে মিলে জড় হলেও গান বাজনা অপেক্ষা দুর্দিনের আলোচনাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিন্তা ভাবনাকে ঠেলে ফেলবার জন্তু কোন কোন দিন করিম জোর করে একতারা নিয়ে বসে। গলা ঝেড়ে স্বরও ধরে। কিন্তু সে তো গান হয় না। মরা কান্নাই যেন কাঁদে সকলে মিলে।

দুর্গাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। পাট চাষ এখন শুরু না করলেই নয়। পাজিতে লিখেছে, জল এবার গোড়াগোড়িই আসছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হবে। মুগ কলাই হাতে যা আছে তা বেচে আধা-আধি জমির চাষও হবে না।

ক্ষেত মজুররা খোঁট পাকিয়েছে, পেট ভরে ওদের প্রত্যেককেই খেতে দিতে হবে। তা না হলে কেউ কাজ করবে না। কিন্তু ওদের পেট ভরাবার মতো চাল ডাল পাবে কোথায় চাষী! ধান চাল বলতে তো চরের কারো হাতে কিছু নেই। গোলা ভর্তি আছে শুধু গরুর খাণ্ড—মাষ-কলাই। অনেক সালিসী দরবরের পর সকালের নাস্তার সময় পাস্তা ভাতের বদলে ছাতু গুড় খেতে রাজী হয়েছে বটে ক্ষেত মজুরেরা। কিন্তু দুপুরের ভাতের বুঁকিও কম নয়। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কাঁড়ি কাঁড়ি ভাতই গিলবে এক একজন। লোক রেখে চাষ করাতে হলে এ দাবি মানতেই হবে। বেকারের সংখ্যা অনেক হলেও কেউ ভাত না খেয়ে কাজ কবতে রাজী নয়। রোজের পয়সা আট আনার বদলে সাত আনা দিলে চলবে। কিন্তু পেট ভর্তি ভাত না হলে চলবে না।

দুর্গা একবার ভাবে, এ সাল আবার পাট বুনবে না। কিন্তু আনন্দ তা কিছুতেই হতে দেবে না! কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে বেচারার। একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। তা ছাড়া পাট না বুনলে মহাজনের ঋণই বা শোধ হবে কি দিয়ে। চরের মানুষ তো সকলেই বলছে, পাট চাষ কববে না। জমি দু'সাল পতিত থাকবে তা হলেই পাটের বদলে ধান বোনা খাবে। ধান ঘরে থাকলে আর যা হোক খাবার ভাবনা থাকবে না।...কিন্তু ভাবা পর্যন্তই সাব। মহাজনের তাড়াতেই হুড়হুড় করে সকলকে ক্ষেতে নামতে হবে। নাচতে নামলে ঘোমটা টানা চলে না।

চৈত্রের শেষ শেষ নিতাই আবার একদিন চরে আসে। ওসমান, গণিকে ওর বড় ভয়। কেমন যেন চাঁচা ছোলা কথা বলে ছোকরা দু'টো। তাই চর-ধল্লায় না গিয়ে সোজা করিমের বাড়িতে ওঠাই স্থির করে নিতাই। সুর্যোগ হয় পেটের কথা খুলে বলবে নয়তো ফকিরের দু'টো গান শুনে উঠে পড়বে। সন্ধ্যার পর খেয়া পার হয়ে হাঁটা পথেই রওনা হয়। বেশ তাল মতোই এসে পৌঁছোয়। পলান, করিম, দীলু সবেরা একত্র হয়েছে। বার বাড়ির উঠানে পা পড়ে ওর। তিন মোড়ল হকচকিয়ে ওঠে। যে যেভাবে পারে অভ্যর্থনা জানায়। পলান বিশ্বয়ের সঙ্গে শুধায়, খবর কি সাজী মশায়? হঠাৎ সাইনজা বেলা আইলেন?

নিতাই পেটের কথা পেটে রেখেই উত্তর দেয়, আর বলেন কেন। গিয়ে চিলাম ছোট মেয়ের বাড়ি জয়মন্টপ। বেয়াই মশায় এ কথা সে-কথায় দেয় করে

কেললেন। চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেন ঘেন মনে হলো ককির সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই আর কি...

তোবা তোবা ইত আমগ সৌভাগ্য। বহেন, তামুক খান, জল চৌকিখান এগিয়ে দিয়ে করিম উত্তর করে।

নিতাই বলে, সৌভাগ্য আমারই। আপনাগ মতো গুণীজনের সঙ্গ লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ?

কি যান কন, সব খোদা তাল্লার মর্জি। আমি হার গুণগান কতটুকুন জানি। একটু ঠাণ্ডা হন, আমি হাত মুখ ধোয়ার পানি লইয়া আহি, উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে যায় করিম !

নিতাই বাধা দেয়, বলেন কি ! আপনার হাতের জল দিয়া হাত পা ধোবো। মহা পাতক হবে না আমার ! আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি উঠবো।

করিম হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ শাস্ত্রে ত আছে, অতিথি নারায়ণ। তবে আর হার সেবা শুশ্রূষা করলে গুণা অইব ক্যান ! একটু বহেন, আমি যামু আর আমু।

না না, শরীর আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে। পানির আর দরকার হবে না। দয়া করে আপনি আমাকে একটা গান শোনান।

হেই বালো, কাম নাই পানি দিয়া। সাজী মশায় কিছুতেই আপনার আনা পানি দিয়া হাত পাও ধুইব না, পলান সায় দেয়।

তা যদি কন তয় রহিম আইনা দেউক পানি !

না না, পানির কোন দরকার হবে না। আপনি গান ধরুন। আপনার মুখের গান শুনলেই প্রাণ জুড়াবে।

করিম আর কথা বাড়ায় না। দীলু তাড়াতাড়ি এক কল্লে তামাক সেজে নিতাইয়ের হাতে দেয়।

বেড়ার গা থেকে একতারাটা টেনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। মুহু ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচোখ বুজে আসে। পলান দীলুও তৈরী হয় দোহারের জন্ত। আবেগে সারা চর অম্লরগিত হতে থাকে—

(অ মন, দিন চারি পাঁচ কালাকালি (লাফা লাফি)

করিচ না তর ভাঙা নয়

আগার খেইকা, পাছায় যেইতে (যেতে)

কখন তরি ডুইবা যায় ॥

হরের মুর্ছনায় নিতাই কেমন যেন খিত্তিয়ে পড়ে। ফকির কি তা হলে
ওর মনোভাব জানলে! ওদের তর্রি ভোবাতে গিয়ে শেষটায় না নিজেরই ভরা
ডুবি হয়।...তিন' মোড়ল তন্নয় হয়ে গাইতে থাকে। নিতাইয়ের হৃদ-তন্ত্রী
কঁপে কঁপে ওঠে। এব চেয়ে না আসাই বোধ হয় ছিল ভাল।...

গান থেমে যায়। নিতাই আসনের উদ্দেশ্বে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। না,
আজ আর কোন কথা হতে পারে না। মনটা কেমন যেন বিবাগী হয়ে উঠছে।
করিম হয়তো যাদুই জানে। বলা যায় না, পেটেব কথাও বলে দিতে পারে।
গানের ভাষাতেই পারে। মানে মানে এখন উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
নিতাই বেবিয়ে আসতেই চায়।

কবিমের তখনো মোহ কাটেনি। এ বাজ্যেই যেন' নেই ও। হঠাৎ
নিতাইকে উঠতে দেখে প্রশ্ন করে, গান কি মনে ধবল না সাজী মশয়?

অপ্রস্তুত হয়ে নিতাই বলে, কি যে বলেন। এমন প্রাণ মাতানো গান
কার মনে না ধববে। ইচ্ছে তো কবে, দিনরাত আপনাব কাছে পড়ে
থাকি। কিন্তু কি কববো। ভগবান যে কেবল জোয়াল টানতেই সংসাবে
আমাদের পাঠিয়েছেন।

হেসে কবিম বলে, কাজ সংসাবে কার না আছে সাজী মশায়। তবু
দিন গেলে একবার দীন দয়ালেরে ডাইকেন।

আশীর্বাদ কবেন, তা যেন পারি।

তোবা তোবা, আমি কেরা আশীর্বাদ করবার, তাঁর কাছে দোয়া মাগেন।

চোক গিলে নিতাই বলে, জানেন দয়াল। তাঁব রূপাতেই যদি অধমেব
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

অইব অইব, উঠলেন ক্যান? আব এক কইলকা তামুক খান, খোলাখুলি
উচ্ছ্বাস জানায় পলান।

দীন্হু আবার তামাক সাজে। এক সঙ্গে দু'কন্ডে। একটা জল ছাড়া
হুকোর মাথায় বসিয়ে নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। আর একটা করিমের
দিকে।

নিতাই নির্বিবাদে টানতে থাকে।

করিম বাধা দেয়, আগে তুমিই ধুমা বাইর কর।

দীন্হু হুকোটা পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ব্যাপারী সাব চোপার
জোর আপনারই বেশী। আপনেই টান ছান।

এ-কথায় সে-কথায় আসরের গাঙ্গীর্ষ শিথিল হয়ে আসে। স্বেযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নিতাই। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রাণ করে, চাষ আবাদের এরার কি করলেন সকলে ?

পলান সোজাহজি জানায়, না, পাট আর ইবার বুম্ম না ঠিক করচি। ও হালা (শালা) ইংরাজের হাতে যখন কলকাটি তখন বেগার খাইটা কাম নাই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিতাই বলে, এবার কিন্তু অবস্থা একটু অগ্ররকম। যত শুক্কই ধার্য হোক, জাপান এবার পাট কিনবেই।

হ, হাবারও ত আপনে কইছিলেন জাপান পাট কিনব। তা হালারা পানিতে ডুব দিছিল ক্যান ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। পানিতে ডুবিয়েই মারছিল বেচারাদের। তবে “লিগ অব নেশন” নজর দেওয়ায় এবার কিছু স্বেবিধা পাচ্ছে ওরা। পাটের দর এবার ভাল যাবে বলেই আমার মনে হয়।

মনে ত আমারও অয়। ও সন যখন মোন্দা গেচে ইসন চড়া যাইবই। কিন্তু ও হালা বোম্বাইটাগ যে আগা পাছা কিছু বৃজন যায় না। তাছাড়া পাট বুম্ম কি দিয়া ? টেক ত গডের মাঠ, আক্ষেপের সন্ধেই পুনরায় মস্তব্য করে পলান।

এতক্ষণের চেষ্টায় আসল জায়গায় পৌঁছতে পেরে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে নিতাই। কৃত্রিম দরদ দিয়েই বলে, টেকের ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। আসলে চাষ করবেন কি না সেইটেই স্থির করুন।

তা যদি কন তয় আমরা এক পায় খাড়া। পাটে ডুবচি—পাটেই উঠুম, উল্লাসে ফেটে পড়ে পলান।

তাই-ই তো উচিত। জেনে রাখুন, নিতাই সা সব সময়েই আপনাদের পেছনে আছে।

খোদা রহুল, আপনার বালো করব, পলান উচ্ছ্বাস জানায়।

নিতাই বলে, তা’হলে আর দেরি করবেন না। কাজ আরম্ভ করুন।

আপনে আমাগ-বাঁচাইলেন সাজী মশায়। একটা পয়সাও দিবার পারি নাই বইলা আপনার ধারে কাচে যাই নাই। দয়াল চানই আইজ আপনারে টাইনা আনচে ইদিগে, করিম উদাসীন থেকেই মস্তব্য করে।

নিতাই হুকোটা বেড়ার গায়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আসি তাহলে আজ। টাকার দরকার হলেই জানাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে নিতাইকে।
ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আবার জোয়ার আসে। আবার চরের ক্ষেত ভরে
উঠবে সোনার ফসলে।...

মাত্র পঞ্চাশ টাকা সম্বল করেই পাট চাষ আরম্ভ করে দেদার। বোনা এক
রকম করে হয়ে যায়। কমলী আছে তাই রক্ষা। তিন সের সাড়ে তিন সের
দুধ দেয় কমলী। ও থেকেই আসে তেল হুন মসলা-পাতির পয়সা। ঠেকেলে
দু'পাঁচ সের চা'লও কেনা চলে। কান্দনী ঘোষের লোক রোজ ডিক্রি বেয়ে
এসে দুধ, দুইয়ে নিয়ে যায়। নিঃশেষেই নিয়ে যায়। বাড়ির ছেলেপুলেগুলোর
আঙুল চোষাই সার হয়। তা আর কি করা যায়, দুধ খেয়ে তো আর পেট
ভরবে না। পেট ভবাতে চাই হুন-ভাত—গুড়-মুড়ি।

বৈশাখের শেষ-শেষ ক্ষেতে নিড়ানি পড়বে। আবার চাই মুঠো ভর্তি টাকা।
সময়মতো নিড়িয়ে দিতে না পারলে আগাছাই বাড়বে, পাট যাবে তলিয়ে।
কিন্তু টাকা কোথায়? হাতে যে একটা পয়সাও নেই। মুগ, মটর, কলাই
যা হাতে ছিল তাতে এ পর্যন্ত হুন-ভাত কোনরকমে জুটেছে। কমলীই সব রাস
টেনে চলছে। নিড়ানির পয়সা কোথেকে পাওয়া যাবে? রবিশঙ্খের দর
ভাল থাকলেও না হয় কথা ছিল। কলাই তো গঞ্জের মানুষ গরুকে খাওয়ানোর
জন্তু কিনছে। মাটির দর বললেই হয়। তিন মণ কলাই বেচলে এক মণ
ধান পাওয়া যায়। বাছ-পাট উঠতে এখনো মাস দুই দেরি। এ দু'মাস হাঁড়ি
চড়বে কী ভাবে তাই-ই এক ভীষণ সমস্যা। মোড়লরা তো পাট বুনবে না
বুনবে না করেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত জমিতেই পাট বুনছে। তাদের বোনা-নিড়ানো
নির্বিঘ্নেই চলছে। গঞ্জের বড় মহাজন নিতাই সাহা তাদের সহায়। হাঁ করতে
থলে ভর্তি টাকা বাড়ি বয়ে এনে দিয়ে যায় নিতাই। মরতে মরবে ছোটরাই।
দশবার গদ্বিতে গিয়ে ধর্না দিলেও দু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায় না। কি আহাশুকিই
না হ'য়েছে সমস্ত জমি পাটের করে! আধা-আধি যদি ধনের থাকতো তাহলে
আর খাবার ভাবনা থাকতো না।...অনেক ভেবে চিন্তে ছোটরা ঋণের জন্তুই ধর্না
দেয় মহাজন রসিক ঘোষের কাছে। স্ত্রদের হার একটু চড়া হলেও একমাত্র
তার কাছেই আমল পায় তারা। দেদারও রসিকের শরণাপন্ন হতেই মন
স্থির করে।

শনিবারের হাটবার। চরের চাষী মাত্রই পণ্য নিয়ে গঞ্জে যায়। সকলে

মিলে নৌকা ঠিক করেছে। গোটা বর্ষা ওতে করেই যাতায়াত চলবে। বার যেমন পণ্য তাকে সেই পরিমাণে পয়সা দিতে হবে। নৌকো ছাড়া এক পা-ও কোথাও যাবার উপায় নেই। নৌকোই চলাফেরার একমাত্র সম্বল। দেদার সকালেই একটা ডুব দিয়ে হুন-পাস্তা নিয়ে বসে। বউ তাহেরা একটা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে গরম ভাত রেঁধে দিতেও পারতো তাহেরা। কিন্তু দেদার মত দেয়নি। এত সকালে গরম ভাত খেয়ে পোষাবে না। হাটে বাজারের কাজে পাস্তা খেয়ে শাস্ত হওয়াই ভাল। মেজাজও ঠিক থাকে, ক্ষিদেও মরে।...

পেঁয়াজ আর লক্ষা দিয়ে তিন খাবায় খেয়ে ওঠে দেদার। তাহেরা এক খিলি পান আর ছাঁকোটা এগিয়ে দেয়। দাঁওয়ার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বেশ আমেজের সঙ্গেই ছাঁকো টানতে থাকে ও। মেজাজটা আজ সবদিক থেকেই খুলী—নিড়ানির জগ্ন আর ভাবনা নেই। গত হাটেই রসিক সম্মত হয়েছে। এখন টাকা ক'টা এনে কাজে লাগাতে পারলেই হয়। লোকে তো বলছে, পাটের দর এবার চড়া যাবে। এক সাল মন্দা গেলে তার পরের সাল ভাল না হয়ে যায় না। তা যদি হয় তাহলে আর ভাবনা নেই। সব ক'টা টাকা দিয়ে ধানের জমি করতে হবে আগে। তা হলেই নিশ্চিন্ত। পাট থেকে আসবে বাড়তি খরচার পয়সা—ধানে চলবে সংসার।...

দেদারকে প্রসন্ন দেখে তাহেরা হাটের সওদার জগ্ন ফর্দ পেশ করে। হুন আর লক্ষা এই হাটেই আনতে হবে। চাল যা আছে তাতে সামনের হাট পর্যন্ত চলে যাবে।

ফর্দ পেয়ে দেদার আজ আর বিরক্ত হয় না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আইচ্ছা, আনন যাইব নে। আর কিচু ত লাগব না? যা কইবার একবারে কও। শ্রাঘটায় য্যান আবার পিছনে ডাইকো না, শুব কামে যাইবার নৈচি।...

হেসে তাহেরা বলে, আনলে তো কত জিনিসই আনন লাগে। তবে হার আর কাম নাই। হুন নক্ষা অইলেই চলব।

গিন্নীর উত্তরে খুলীই হয় দেদার। নবীর মা হিসেবী বলেই এখনো সংসার চলছে। নয়তো কবে যেতো তাসের ঘর ঝড়ে উড়ে...।

নবীর বড় আদর দেদারের কাছে। কোলের ছেলে, ছোটবেলায় বেশ দেখাতো ওকে। খোদাই করা নাক মুখ—ফুটপুট। বড় হয়ে দিন দিন কেমন

যেন মেদা মেরে যাচ্ছে। কে দেখে বলবে পাঁচ বছরের ছেলে। ঠিক যেন বছর তিনেকের বাচ্চা। পেট মাথা ফুলে ঢোল, বুক যাচ্ছে শুকিয়ে। আর হবে না-ই বা কেন? জন্মে অবধি তো দুধ কাকে বলে চোখে দেখিনি। বড় দুঃখ হয় দেদারের নবীর দিকে চেয়ে। এতটা বয়েস হলো ভাল একটা জামাও দিতে পারলো না।...হাঁকো খেতে খেতে নবীকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে দেদার।

নবী ওকে খুশী দেখে বায়না ধরে, আমি তোমার লগে যামু বাজান।

ওর দু'গালে দুটো টোকা দিয়ে দেদার বলে, কিয়ের লেইগা শাবি বাজান? আমি যে আটে (হাটে) ঘাই।

আমিও আটে যামু।

বুচ্চি, জিলাবী খাইবার মতলব। তা তব যাওয়ন লাগব না। আমি দুইখান জিলাবী অলুম নে তর লেইগা।

না, আমি তোমার লগে যামু।

তাহেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল। নবীর আবদারে ধমক দেয়, কিয়ের লেইগা শাবিরে তুই রৈজে রৈজে? কইলই না জিলাবী আনব।

'মার কাছে ধমক খেয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে দাঁড়ায় নবী। আর কিছু বললে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। দেদার ওকে সাস্বনা দেয়, ন রে বাজান ন। নায়ের মন্তেই শাবি তার আবার রৈজে কি করব! খারইরা রইলা ক্যান, ছাও না ছ্যাম্বারো জাইকাজ পরাইয়া?

হ, আল্লাদ দিয়া দিয়া তুমিই ত পোলাভার মাতা খাইলা, দেদারের উদ্দেশে মুখ ঝামটা দিয়ে প্যান্ট আনবার জন্ত বরের ভেতরে যায় তাহেরা।

বেলা দশটা নাগাদ পণ্য বোঝাই চরের নোকো গঞ্জের ঘাটে এসে লাগে। হাট মাত্র জমতে শুরু হয়েছে। দেদারের তেমন কিছু মালামাল নেই। ছোটবড় গোটা দশেক ঝিষ্টি কুমড়ো মাত্র সঞ্চল। ঘণ্টা ধানেকের ভেতরেই খুচরো বেচে কেলে। পাইকাররা অনেক রকাকি করেছিল। কিন্তু দেদার ওদের কাউকে বেচে নি। একে ত পয়সা কম তাতে আবার দাম দেবে শেষ বেলায়। না না, ওসব বাজে ঝামেলায় আজ আর ও ঘাবে না। যা পায় নগদাই বেচবে।...দর বেশ ভালই পাওয়া গেলো। ন'টা কুমড়োতে মোট দশ আনা হলো। সবচেয়ে বড়টা আর বেচলে না। ওটা হাতে করেই রসিকের বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হুন আর লক্ষা নৌকোয় উঠবার আগে কিনলেই হবে' শুন। কিন্তু নবীর মুখখানা যে এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। বেচারি, মিষ্টি খাবার লোভেই এতটা পথ এসেছে।...পথে কান্দনী ঘোষের দোকানে বসিয়ে এক আনা দিয়ে দুটো বড় রসগোল্লাই কিনে দেয় ওকে দেদার। পয়সায় দু'খানা করে জ্বিলিপি তো অনেক দিনই খেয়েছে। আজ যখন এসেছে ও তখন রসগোল্লাই থাক। বেঞ্চের ওপর বসে কলার পাতায় করে একদমে রসগোল্লা দুটো খেতে থাকে নবী। দেদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানে। নবীর খাওয়া হয়ে গেলে ওকে সঙ্গে করে টানবাজার থেকে একখানা তমসুক কাগজ কিনে ক্রুত পা চালিয়ে দেয় রসিকের বাড়ির দিকে।

দুপুরের আহাৰ শেষ করে গদির ওপর বসে তামাক টানছিল রসিক। মনে মনে হয়তো স্নদের অঙ্কই আঁড়াচ্ছিল। দেদার এসে উপস্থিত হয়। কুমড়োটা মেঝেয় নামিয়ে কপালে হাত ঠেঁকিয়ে আদাব জানায়। বড় ভাল সময়ে এসেছে ও। গদি একদম ফাঁকা। ভিড় হবে আবার সেই বিকেলের দিকে। হাটুরেরা সব হাটের বেচা-কেনা শেষ করে আসবে টাকা কর্ত্ত কবতে।

কুমড়োটার আকৃতি দেখে রসিক প্রশ্ন করে, কতো দিয়ে আনলিবে দেদার? বেশ পুরুষ্টু তো!

দেদার বলে, কি যান্ কন্ কত্তা! কুমড়া আবার আমরা কিনা খামু মাকি। আমাগ বাড়ির ঠালে ঐচে। আপনার সেবার লেইগা লইয়া আইলাম। না না না, এ তোর ভারী অগ্নায়। রোজ রোজ এটা-সেটা দিবি ক্যান্। নিয়ে যা তুই, কুমড়োর কোন দরকার নেই আমাদের, রসিকের কণ্ঠে বিরক্তির স্বব।

দেদার হাত জোড় করে মিনতি জানায়, বাড়ির জিনিস হাউস (সখ করে) কইরা আনচি। গরীব বইলা যদি কিরাইয়া ছান তাইলে আর কি করুম।

ঐতো তোদের এক কথা, গরীব। বেশ, এনেছিস আজ নিচ্ছি। তবে আর কোনদিন কিন্তু কিছু আনবি নে। দেদারের মিনতিতে মনে মনে খুশী হলেও কৃত্রিম আভিজাত্য বজায় রাখে রসিক। কুমড়োটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নবীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে, এটি আবার কে রে?

দেদারের ঠোটে হাসি খেলে। লক্ষা জড়িত কণ্ঠেই জবাব দেয়, আমার ছোট ছাওয়াল, নবী। বাড়ির খেইকা বাইরনের সময় কিছুতেই পাছ ছাড়ল না।

তা বেশ—বেশ। ছেলে তো তোর খাসা হয়েছে দেখছি। কিন্তু এত রোগা করে ফেললি কি করে ?

আর কন্ ক্যান্ কত্তা। দিন রাইত খালি খাইব আর হাগব। আমাগো চাষার গরের (ঘরের) পোলাপানের কথা ত জানেনই।

তা কিছু ভাবিস নে। ও খেতে-নিতেই ভাল হয়ে যাবে। এক সময় সকলের ঘরের ছেলেপুলেরাই ওরকম করে। ওরে কালী, দেদারের ছেলে এসেছে। তাদের গিন্নীমাকে কিছু খেতে দিতে বল। দেদারের কথার জবাব দিয়ে ভৃত্য কালীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে রসিক।

দেদার অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, না কত্তা, অরে আইজ আর কিছু খাইবার দিবেন না। বাজারের খেইকা আইবার সময় কান্দনী ঘোষের দোকানে জল খাওয়াইয়া আনচি। একদিনে বেশী খাইলে প্যাট ছাড়ব।

আরে না না। বাড়ির জিনিস খেলে কিছু হবে না। তা ছেলের কি যেন নাম বললি ?

আর কত্তা, আমাগ আবার নাম ধাম ! নবী বইলাই হগলে ডাক অরে।

কেন রে, নবী তো বেশ খাসা নাম। বোস রে বাপ, দেদারকে তারিফ করে নবীকে বসতে ইঙ্গিত করে রসিক।

নবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ চারদিকের দেয়ালের শোভা দেখছিল। কত বিচিত্র রকমের পট। পেট মোটা গণেশ ঠাকুরকে দেখে ওর তো গা ছমছম করতে থাকে। কে জানে, শুঁড় দিয়ে যদি গলায় একটা হেঁচকা টান মারে ! লকলক করছে মা কালীর টুকটুকে জিত। ভয়ে কেমন যেন থ' মেরে গেছে বেচারী। মুখ দিয়ে একটা কথাও সরে না। দেদারের গা ঘেঁষে কোনরকমে চূপচাপ বসে থাকে।

কালী ইতিমধ্যে একটা বেতের কাঠার মধ্যে মোয়া, মুড়ি, মুড়কি নিয়ে হাজির হয়। পরিমাণ যা হবে তাতে শুধু নবীর একার নয়, দেদারেরও পেট ভরবে।

গিন্নীর কাণ্ড দেখে রাগে সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে রসিকের। ছোট্ট একটা বাচ্চা থাকবে, শুধু ছ'টো মোয়া পাঠালেই হয়ে যেতো। তা না, বাটি ভর্তি মুড়কি দেওয়া হয়েছে। ওদের আর কি নিজেরা তো উপার্জন করে ধায় না। পরের ধনে পোন্ধরি সকলেই করতে পারে।...কিন্তু করা যাবে কি ? দিয়ে বখন ফেলেছেই তখন আদর আপ্যায়ন করাই ভাল। ধোলাখুলিই বলে রসিক,

নে রে দেদার, ছেলে নিয়ে খেয়ে নে। দলিলের কাগজ এনে থাকিস তো দে, লেখাপড়াটা এই ফাঁকে সেরে নিই।

দেদার লুঙ্গির গোঁজা থেকে তমস্ককথানা বার করে। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, রোজ রোজ খাওয়ান কিসের কত্তা ! অরে একটা মোয়া ছান খালি। আমি এহন কিছু খাইবার পারুম না।

রোজ আবার তোর ছেলে এল কই রে ! টাটকা তিলের মোয়া, খেয়ে দেখ, ভাল হয়েছে।

হ, গিল্লীমার হাতের জিনিস তুখার অয়। গেলো বার দিচিলেন, মনে নাই ? গতবারের চেয়েও এবার ভাল হয়েছে। আর দেরি করিসনে, খেয়ে নে। আমি এদিকের কাজ সারি।

তা যদি কন তয় বাড়িই লইয়া যাই। হগলেই চাইখা দেখবনে। বেশ, তবে তাই নিয়ে যা।

দেদার কাঠান্নদ্ধ, মোয়া মুড়কি-গামছায় বাঁধতে যায়। নবীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে রসিক বাধা দেয়, ও কিরে ! তুই যে সবগুলোই বেধে ফেলেছিল। ওর হাতে দুটো মোয়া দে !

দেদার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা মোয়া নাবীর হাতে দিয়ে বলে, না কত্তা এহন দুইভা দিলে আবার বাড়ি গিয়াও ছাড়ব না। এহন একটাই খাউক।

খব সন্তুষ্ট না হলেও নবী কোন রকম গোলমাল করে না। ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কচকচ শব্দে কামড়িয়ে খেতে থাকে হাতের মোয়া।

রসিক দলিল লেখায় মন দেয়। কুড়ি টাকার ঋণ পত্র। দৈনিক টাকা প্রতি দশ পয়সা সুদ।

মোয়াটা সম্পূর্ণ খেয়ে জলের জল বায়না ধরে নবী। নিজেকে বড় অগ্রস্কৃত মনে হয় দেদাদের। এখন আবার জল পায় কোথায় ? বাবুদের ঘটি গেলাসে তো আর জল খাওয়া চলবে না !...কিঞ্চিৎ বিরক্তির সত্ত্বেই ধমক দেয়, চূপ কর। নায়ে গিয়া খাইচনে।

নাক ডুবিয়ে দলিল লেখা শুরু করলেও কথাটা কানে যায় রসিকের। নবীকে কিছু না বলে উণ্টো দেদারের ওপরেই দাঁত খিঁচোয়, ওকে ধমকাচ্ছিল কেন ? ছলেমান্নব, মিষ্টি খেয়েছে জল খাবে না ?

দেদার কাঁচুমাচু হস্বেই জবাব দেয়, নায়ে গিয়াই খাইবনে কত্তা। দয়া কইরা তাড়াতাড়ি একটু ছাইড়া ছান আমাগ।

খুব বুদ্ধি তো তোরা ! তেষ্ঠা পেয়েছে এখন আর জল খাবে দু'ঘণ্টা পরে
ঐ বদনাতে ভাল জল আছে, ছেলেকে খাইয়ে দে, তাকের ওপরের পিতলঃ
বদনাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রসিক ।

স্নানের সময় তেঁতুল আর বাগি দিয়ে নিজের হাতে বদনাটা মেজেছে রসিক
ঝকঝক করছে । একটাতেই দু'কাজ চলে যায় । নিজের শৌচের কাজ আর
খাতকদের জল খাওয়া ।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলে ঢালা ছকুম পেয়েও স্ত্রেন উৎসাহ বোধ করে ন
দেদার । ওরা তো জল খায় মাটির সানকিতে আর না হয় কলাইয়ের গ্লাসে ।
কর্তা হয়তো দায়ে পড়েই বদনাটার জাত মারতে দিচ্ছেন । ইতস্ততঃই করতে
থাকে দেদার ।

নবীর ঘান-ঘানানি বেড়েই চলে । দেদার তবু উঠে গিয়ে বদনাট
ছুঁতে সাহস পায় না ।

রসিক আবার ধমক দেয়, কই রে, ছেলেকে জল দিলিনে ?

দেদার আর বসে থাকতে পারে না । সংকোচের সঙ্গেই উঠে গিয়ে বদনাট
নামিয়ে নিয়ে আসে ।

রসিক পুনরায় দলিল লেখায় মন দেয় ।

জল খেতে খেতে নবী তো অবাক—এ আবার কি জিনিস ! বাড়িতে
তো জল খায় কলাইয়ের গ্লাসে । এ রকম ঝকঝকে জিনিস তো কোনদিন
দেখিনি ! মোয়ার চেয়েও অল্পত ঠেকে বদনাটা নবীর কাছে । এ জিনিসট,
ওর চাই-ই । হ্যাঁ, এইটেই নেবে ও...বাপের কাছে ঘুন্ঘুন্ শুরু করে, বাজান,
ইডা আমি নিমু ।

ছেলের আদার শুনে দেদারের চক্ষুস্থির । বলে কি বেটা ! কর্তা যে
জল খেতে দিয়েছেন এই তো ওর বাপের ভাগিয়া ! উনি শুনলে ভাববেন
কি । .চোখ টিপেই ছেলেকে শাস্ত করতে চেষ্টা করে ।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয় । নবীর বায়না বেড়েই চলে । এতক্ষণ ঘুন্ঘুন্
করছিল এবার কান্নার স্বরেই ধ্বনি তোলে, অ বাজান, আমি এইডা নিমু ।
অ বাজান...

দেদার ফাঁপরে পড়ে । বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চূপ কর হারামজাদা !
ইডা কি করবি রে ?

রসিক দলিল লেখায় ব্যস্ত থাকলেও নবীর আদার কানে পৌঁছতে বিলম্ব

হয় না। এতক্ষণ দম ধরে থেকে বদনাটার পরকাল সব্বন্ধেই শুধু ভাবছিল। না, হতাশ হবার কিছু নেই। সামান্য একটা পেতলের বদনা। বড় জোর পাঁচ সিকে দেড় টাকা দাম। ওটা ও দিয়েই দেবে নবীকে। হ্যাঁ স্ব স্ব ভ্যাগ করেই দিয়ে দেবে। মনের জোর নিয়েই দেদারকে প্রতিরোধ করে, কিরে, ওকে অতো ধমকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

না কত্তা, কিছু অন্ন নাই। একটু হকাল কইরা ছাইড়া ছান আমাগ, বেলা গেল।

কিছু ঠয়নি মানে! আমি বুঝি শুনিনি! তুই আচ্ছা লোক তো! ছেলে-মামুষ, সামান্য একটা বদনার বায়না ধরেছে তার জন্মই গালাগাল করছিস! নেরে বাপ, তুই ওটা নিয়ে যা, দাতা কর্ণের মতোই কথাগুলো বলে পড়ে রসিকের তরফ থেকে।

নবীর মুখে হাসি খেলে। দেদার তো ভেবেই গায় না, স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি সত্যি কর্তার মুখ থেকেই কথাগুলো শুনছে ও। যে মামুষ স্বপ্নের একটা কানাকাড়ি ছাড়ে না সে মামুষ দামী বদনাটা দিয়ে দিচ্ছেন নবীকে।...

রসিক হয়তো দেদারের মনোভাব বুঝতে পেরেই বলে, ওরে বাবসা করি বলে কি আমি মামুষ নই! মায়ামমতা বলতে কি আমার কিছু নেই তুই বলতে চাস? আমার ঘরেও বাচ্চা-কাচ্চা আছে। ওটা ওকে আমি প্রাণ খুলেই দিলাম।

দেদার আর ভাবতে পারে না। নতুন করে ঘেন বেহস্তের দ্বার খুলে যায় ওর চোখের ওপর। আবেগের সন্ধেই উত্তর কবে, আপনাগ দম্বাতেই বাইচা আচি কত্তা। ই পোলাপানও আপনাগই।

আবেগের উত্তর আবেগের সন্ধেই দেয় রসিক, সবই তাঁর ইচ্ছা রে—সবই তাঁর মর্জি। তুই কোন দ্বিধা করিস নে, হাতে করে নিয়ে যা। ছেলেপুলে সঙ্কট হলে ভগবান সঙ্কট হন। আর এই নে টাকা কুড়িতে। এখানে একটা টিপসই দে।

দেদার বশীভূতের মতই সব করে যায়। টাকাগুলো চেঁকে গুঁজে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই রসিককে হাত তুলে আদব জানায়।

বাজানের দেখাদেখি নবীও হাত তোলে। বদনাটা নিজেই বয়ে নিয়ে চলে ও। ওটা আর কারো হাতে দেবে না। কিছুতেই না। এতো বদনা নয়, সাত রাজার ধন—গুপ্ত মাণিক। নবীর মুখে চোখ খুলীতে ডগমগ।

রসিক উঠে এসে হাত দিয়ে ওর গাল টিপে দেয়। হাসতে হাসতেই বাপ বেটা বেরিয়ে আসে গদিঘর থেকে।

চরে কিরে এসে বদনাটা সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতে থাকে নবী। বদনার জল ছাড়া এখন আর জল মুখে দেয় না ও। শিয়রে বদনাটা না থাকলে ঘুমোয় না। কাউকে হাত দিয়ে ছুঁতে পর্যন্ত দেয় না।

বৈশাখের পর দেখতে দেখতে আষাঢ় আসে। পাটের ফলন মন্দ হয় নি। আশাহ্নরুগই প্রত্যেকে বাছ-পাট পায়। এখন দর উঠলেই সব জ্বালার অবসান। সামনেই রথযাত্রা। পাট ব্যবসায়ীদের প্রশস্ত দিন। সকলেই তৈরী হতে থাকে। মহাজনরাও ওতপেতে আছে। চাষীর ঘরে টাকা উঠলেই নিজেদের ভাগ বসাবে! গত সন শেষ মরশুম খারাপ যাওয়ায় আদায় উত্তুল কিছুই হয়নি। এবার প্রথম পর্বেই সম্ভবমত টানতে হবে। তাছাড়া বাজারের কথা বলা যায় না। গাছ-পাটের দর যদি এবারও মন্দা যায় তা হলে চাষী তো মরবেই—মহাজনও অনেকে ঝুলবে। স্বদের লোভে অনেকেই কম স্বদে নিজেদের সোনাদানা বন্ধক রেখে বেশী স্বদে লগ্নি করেছে। স্বদখোরদের ধরণ ধারণই আলাদা।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক তাই হ'লো। রথের মেলায় পাটের খরিদারই নেই। রেলি ব্রাদার্স এবারও খরিদে নামলে না। কাঁড়ি কাঁড়ি পাট নিয়ে কিরে আসে চরের মানুষ। মহাজনকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা নিজেদের কি দিয়ে কি হবে তাই এক সমস্যা। মাসখানেক পরেই গাছ-পাট লাগছে। কাটাই, বাছাই, ধোলাইএ খরচা কম নয়। চরের মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাগাদার ভয়ে কেউ আর ইদানীং হাটে বেরুচ্ছে না। দেদারও দিন কয়েক পালিয়ে চলে। কি বলবে গিয়ে ও রসিককে। বিপদে শুধু টাকাই ধার দেয়নি রসিক। স্নেহবশত নবীকে বদনাটা পর্যন্ত দিয়েছে। ও যে বরাবর বলে আসছে, বাছ-পাট বেচে কিছু দেবে তাকে। এখন কি উপায় হবে—ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না দেদারের।

দেদার পালিয়ে চললেও রসিক বুক ফুলিয়েই একদিন এসে চরে হাজির হয়। বেশ স্বযোগই মিলেছে। দেদার গদিতে এসে দেখা করলে চরে আসতে সংকোচই হতো ওর। কিন্তু ভগবানই ওকে সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েচেন। কোলের ছেলে শিবুকে সঙ্গে করেই একদিন তোরে এসে

উপস্থিত হয় রসিক দেদারের বাড়িতে। মাত্র বছর পাঁচেক বয়েস শিবুর। বাপের সঙ্গে চরে যেতে কোন আকর্ষণই নেই ওর। কিছুতেই ও যাবে না। কিন্তু রসিক নাছোড়বান্দা, যেতেই হবে ওকে ওর সঙ্গে। বড়ের কিস্তি বড়ে দিয়েই দিতে হবে। বেটা, টাকা বদনা গিলে দিব্যি ডুব দিয়ে আছে। দেখা যাক, নরুনের বদলে নাক আদায় হয় কি না।...প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর নগদ এক আনা খরচ করে দুটো রসগোল্লা কিনে হাতে দিতেই অবাধ্য শিবু বশ মানে। দিব্যি গটগট করতে করতেই বাপের হাত ধরে গিয়ে নৌকোয় ওঠে। বর্ষায় বংলী কানায় বানায় ফুলে উঠেছে। ভীষণ শ্রোতের টান। খানিকটা উজিয়ে গিয়ে পাড়ি দিতে হবে। সময় সাপেক্ষ। রসগোল্লা দুটো খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যায় শিবু। আবার নেমে যেতে বায়না ধরে। বিচক্ষণ রসিকের এ পাট জানা ছিল। বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকেই সে তাই তৈরী হয়ে আছে। রব তুলে কাম্মার আগেই পকেট থেকে লজ্জের ঠোঙাটা বার করে রসিক। শিবুর আজ পোয়াবারো। একটা না শেষ হতেই আবার একটা খাবার জুটছে। কই, বাবাকে তো এর আগে কখনো এমনটি দেখেনি ও। আজ তাহলে অনেক মজা আছে। ঠোঙাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার চাক্ষা হয়ে ওঠে শিবু।

বৈরাগী খালের বাঁকটা ঘুরতেই দেদারের বাড়িটা সোজাছজি নজরে পড়ে। চার পাঁচখানা খড়ের ঘর নিয়ে বাড়িটা। চারদিক জুড়ে কলাবাগান। বংশীর বৃকের ওপর যেন ভাসছে। ঘাট থেকে ভিটির ওপর উঠতেই একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কমলী। খানিক আগেই কান্দনীর লোক এসে সবটুকু দুধ নিংড়ে নিয়ে গেছে। বাছুরটা দুধের তেষ্টায় বার বার বাঁটে মুখ লাগাচ্ছে। কিন্তু দুধ না পেয়ে থেকে থেকে মাথা দিয়ে গুঁতোচ্ছে। বিরক্তিতে কমলীও মাঝে মাঝে লেজের বাড়ি মারছে—পা ঝাটকা দিচ্ছে। কালো হাড় জিরজিরে বাছুর—কপালে সাদা চাঁদের টিপ। তাড়া খেয়ে ছুট দেয়।

রসিক দূর থেকেই আঙুল দিয়ে দেখায় শিবুকে। বাছুরটা দেখে শিবুরও খুব ভাল লাগে। অবাক হয়েই চেয়ে থাকে দেদারের বাড়ির দিকে। রসিক মনের ভাব বুঝতে পেরে জিজ্ঞাস করে, ওটা তুই নিবি শিবু ?

হঁ, ষাড় নেড়ে সম্মতি জানায় শিবু।

খুলী হয়ে রসিক বলে, তাহলে চল, আগে ওটা নিয়ে আসি।

চলো, শিবুর উৎসাহ বেড়ে যায়।

রসিক আবার জিজ্ঞেস করে, বাছুর তো নিবি, ওর মাকে নিবি নে ?

না ।

না কি রে ! ওর মাকে সঙ্গে না নিলে যে বাছুর তোর সঙ্গে যাবেই না ।

তা হলে ওর মাকেও নেব ।

বেশ বেশ । কি বলবি বল তো ?

শিবু কোন উত্তর দিতে পারে না । ক্যালক্যাল করে রসিকেব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ।

বসিক বলে, বলবি, বাবা আমি গরু নেবো—বাছুর নেবো । কেমন, বলতে পাববি তো ?

হঁ, শিবু আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ।

বসিক খুশীতে গদগদ হয়ে মাঝিকে দেদারের ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলে

উঠোনে বাস কমলীব জগু নতুন দড়ি পাকাচ্ছিল দেদার—নৌকা ঘাটে লাগতেই আঁংকে ওঠে । রোজ এই আশংকাই কবছিল ও । কিন্তু কি করবে । এখন তো আর পালাবার পথ নেই । তাতে পায়ের ধরে যদি রেহাই পাওয়া যায় । তাতাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় দেদার । থেজুব পাতার পাটি বিছিয়ে দাওয়ার ওপর বসতে দেয় । বাড়িব ভেতবে ছোট্টে জলছাড়া বড় হঁকোটীর খোজে ।

রসিক পেছন থেকে বাধা দেয়, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না রে দেদার । আমরা একুনি উঠবো । ও নৌকায় বেড়াবে বলে বায়না ধরেছিল, তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম ।

দেদারের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে । যাক, কর্তা তাহলে তাগাদায় আসেনি । কিন্তু কি দিয়ে খাতির করে খুদে কর্তাকে । ঘরে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু নেই ! একটু আগে এলেও না হয় কান্দনী ঘোষের লোকের কাছ থেকে পেয়াটাক দুধ রাখা যেত । কিন্তু এখন কি করা যায়...তবু সবিনয়েই বলে, বেড়াইতে আইচেন তয় এত তড়াতড়ি কিসের ? সিদা দেই রান্না-বাগ্না করেন ।

আরে না না, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না । পারিস তো এক ছিলুম তামাক দে ।

দেদার তাড়াতড়ি তামাক সেজে দেয় ।

হকো টানতে টানতে রসিক জিজ্ঞেস করে, রথের বাজার এবার কি রকম গেলো রে দেদার ?

• আর কত্তা কন ক্যান্। বাজার আর কই। হগলেই ত পাট কেবরত লইয়া আইচে।

তবে তো দেখছি কিছুই দিতে পারবিনে।

তাই কন কত্তা, আপনাগই কি দিমু আর আমরাই কি থামু ?

কথা তো ঠিকই বলছিল, তবে তোদের সঙ্গে আমাদেরও যে মরতে হবে দেখছি।

হগলেই ইবার মরব কত্তা। চরের কেউ আর বাঁচব না।

দেখ, গাছ পাটেব দর ওঠে কি না।

আর উঠচে, আমরা মরলে যদি ওঠে।

ঈশ্বরকে ডাক, তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে। আজ উঠি রে তাহলে।

কন কি কত্তা। ছোটকত্তায় আইল, হুদা মুখে যাইব।

তোর মন যা চায় দে ওকে খেতে।

কি আর দিমু কত্তা, ধরে ত গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই নাই।

কেন রে, গুড় মুড়ি কি খারাপ জিনিস হলো নাকি! বাড়িতে আবার কি খাই আমরা ? ও খায় তো তাই দে ওকে।

দেদারের হুশিস্তা অনেকটা হান্কা হয়ে যায়। না, কত্তার দেখছি আমাদের ওপর টান আছে। গুড় মুড়িতেও কোন রকম আপত্তি নেই, হস্তদস্ত হয়েই বাড়ির ভেতরে ছুটে যায়।

শিবুকে একা পেয়ে উস্কাকে চেষ্টা করে রসিক, কি রে, তুই বলে গরু বাছুর নিবি, কিছু বলছিস নে যে ?

শিবুর এখন আর কমলীর ওপর কোন ঝোঁক নেই। লাল ঝুঁটিওলা গোটা কয়েক মোরগ ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠানের ওপর দিয়ে। পাখনার রংয়ের কি বাহার। ভারি আশ্চর্য ঠেকে ওর। জীবনে কখনো এতো সুন্দর পাখি দেখেনি। পাটি থেকে উঠে মোরগের পেছ পেছই ছুটে থাকে। রসিকের প্রশ্নের কোন উত্তরই দেয় না।

বড় বিরক্তি বোধ হয় রসিকের। এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত সব গোজায় যাবে নাকি ? ব্যস্তসমস্তভাবে পুনরায় শিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, শোন, দেদার এলে আমাকে বলবি, বাবা, আমি হান্কা নেবো, কেমন ?

না, আমি হান্সা নেব না। ঐটে নেব, আঙুল দিয়ে বড় মোরগটাব দিকে ইঙ্গিত করে শিবু!

রসিক বেকায়দায় পড়ে দাঁত খিঁচোয়, উঃ, ঐটে নেব! ওটা দিয়ে কি হবে রে হতভাগা? হান্সা নে দুধ খেতে পারবি।

না, আমি হান্সা নেব না, জেদ বেড়ে যায় শিবুর।

রসিক আব বৈবধ বাখতে পারে না। চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর বাঁ গালে।

শিবু ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

কি অইল, কি অইল, বলতে বলতে দেদার হস্তদস্ত হয়ে ফিরে আসে।

মোরগগুলো তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়। শিবুও কাঁদতে কাঁদতে পেছ নেয়।

হাসতে হাসতে দেদার মস্তব্য করে : ওয়া ত আরনারা ছুইবেন না কত্তা। নইলে ত এহনি একটা ছাড়াইয়া দিবার পারি!

রসিক স্বেযোগ বুঝে নাক সিঁটকায়, বামচন্দ্র রামচন্দ্র! এটা কি একটা কথা হলোরে! নে, আর দেরি করিস নে। কি আনবি আন।

না কত্তা, আর দেরি অইব না। বাড়া অইয়া গেচে। আমি যামু আব আমু, দেদার আবার ছুটে বাড়ির ভেতবে যায়।

ফাঁক বুঝে রসিক শিবুকে পুনরায় ধমকাতে থাকে, কি রে হাবামজাদা, হান্সার কথা বললি নে যে?

না, আমি হান্সা নেব না, শিবু অচল অটল।

ফের বজ্জাতি হতভাগা! আবার একটা চড় বসিয়ে দেয় রসিক শিবুর গালে।

শিবু আবার ডুকরে ওঠে।

দেদার নতুন একা এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে করে কিছু গুড় মুড়ি নিয়ে দৌড়ে আসে। ভাগিাস্ রথের মেলা থেকে বাটিটা এনেছিল তাহেরা! তা না হলে কিসের মধ্যে খেতে দিতো ছোট কর্তাকে! দেদার এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেও শিবুকে কাঁদতে দেখে ফাঁপরে পড়ে। বিশ্বয়ের সঙ্গেই রসিককে শুধোয়, আবার উনি কান্দে ক্যান কত্তা।

ওর কথা ছেড়ে দে। কত করে বারণ করলাম নৌকোয় বেড়িয়ে কাজ নেই। তা কে শোনে। এখন আবার এটা চাই, ওটা চাই, যত সব-ঝামেলা।

কি চান উনি?

সে তোকে বলা যাবে না। এখন কি এনেছিস দে, গিলুক।

দোহাই কত্তা, অন্নার কিরা লাগে। কন, উনি কি চায়?

তুইও কি ক্ষেপে গেলি নাকি। ছেলপুলের কথায় কখনো কান দিতে আছে?

তা হউক। আপনে কন, কি উনি চান?

আরে চাবে আবার কি! তোর ঐ গরুটা নাকি নেবে বজ্জাতটা।

দেদারের মাথায় যেন সহসা আকাশ ভেঙে পড়ে। হায় হায়, কি সর্বনাশের কথা! কমলীই তো সংসারের একমাত্র লক্ষ্মী। ও আছে তাই এখনো উপোস দিতে হচ্ছে না। ষড়যন্ত্র...সব ষড়যন্ত্র। বাপ বেটায় ষড়যন্ত্র করেই কমলীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।...বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে দেদারের। সহসা চোখ পড়ে সামনের ঘরের দাওয়ার ওপর। সূর্য কিরণে ঝকঝক করছে বদনাটা। নবীর আঁধার মতো আজো তেঁতুল আর বাগি দিয়ে যত্ন করে মেজেছে তাহেরা। দেদারের দু'চোখ বোধ হয় অন্ধ হয়ে যায়।

রসিক ওর মনের কথা বুঝে কৃত্রিমভাবে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে—কই রে, হাঁ করে যে দাঁড়িয়ে রইলি। কি দিবি দে, বেলা হয়ে যাচ্ছে না!

দেদার মুড়ির বাটিটা শিবুর হাতে দেয়। শিবু বাটি হাতে করেই মোরগের পেছু পেছু ছুটেতে থাকে। নিজে এক মুঠো মুখে দিলে তিন মুঠো ছিটিয়ে দেয় মোরগের দিকে, কমলীর দিকে ভ্রক্ষেপও নেই। মোরগ নিয়েই মেতে ওঠে।

সাদাসিধে বুদ্ধি হলেও সবই বুঝতে পারে দেদার। এ চাল রসিকের নিজেরই। বদনা দানের কথানি হাড়ে হাড়ে বার করছে। কিন্তু—কি আর করা যাবে। শকুনির দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন দিতেই হবে। গত সনের টাকা স্নদে-আসলে জমেছে। এবারও কম হবে না। টান দিলে যে কোনদিন সব কেড়ে নিতে পারে। কমলী তো দূরের কথা চাল-চুলো পর্যন্ত থাকবে না। তবু যদি ক্ষুধিত দানবকে কিছু দিয়ে-থুয়ে সময় পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে বলে, কত্তা, আপনাগ দিবার পারি এমুন কি আছে আমাগ। তাই বইলা পেরথম দিন বাড়ি আইহা ছোট কত্তা সামান্য এক জোড়া গরু বাছুরের বায়না ধরচে পরাণ খুইলা তাই দিবার পারুম না। দোহাই কত্তা, কমলীরে আপনার নেওয়নই লাগব...

তুই কি সত্যি ক্ষেপে গেলি দেদার?—রসিকের কঠে বিশ্বয়ের স্বর।

দেদারের ইচ্ছে হয় শরতানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।'

কিন্তু পারে না। অতিথির সম্মান রেখেই অহুরোধ করে, কস্তা, গরু আপনাগ কাছে সাক্ষাইত ভগবতী। আপনাগ কাছে অর অযত্ন অইব না। আমি বালো কইরা খাওয়াইবার পারচিলাম না অরে। দয়া কইরা লইয়া যান।

কি যা তা বলছিস তুই। আমি চললেম, উঠে দাঁড়ায় রসিক।

একটু খারন কস্তা, আমি অরে লইয়া আহি, দেদার আর উত্তরের অপেক্ষা না করে কমলীর দিকে ছোটে।

কিন্তু সফল হওয়ায় রসিক রসিয়ে রসিয়েই হঁকো টানতে থাকে।

বাছুরটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কলা-বাগানে ঢুকেছে। দেদার—‘হাঙ্গা আয়...হাঙ্গা আয়,’ ডাকতে ডাকতে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেলে। নতুন একগাছা পাটের দড়ি পরিয়ে দেয় গলায়।

উদগত অশ্রু অররুদ্ধ রেখেই কমলীকে নৌকোয় তুলে দিতে যায় দেদার। নবী তাহেরা দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বদনাটা স্থব্ধ কিরণে তেমনিই জ্বলছে। পথে বেতে যেতে হাঙ্গা লাফঝাঁপ শুরু করে। কমলী ঘাড় বাঁকা করে গৌজ হয়ে থাকে। দেদার জোর করেই টানতে টানতে এগিয়ে যায়। পাজরার হাড়গুলো এক এক করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন ওর। শিবু মোরগের জ্ঞান আছড়া-আছড়ি করতে থাকে। রসিক টানতে টানতেই ওকে নিয়ে নৌকোয় তোলে। হতভাগা নাক কাটালে আজ।

নৌকোয় ওঠার আগে লাফঝাঁপ দিতে শুরু করেছিল কমলী। কিন্তু নৌকোয় উঠে কেমন যেন খিতিয়ে পড়ে! বড় বড় চোখ তুলে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দেদারের দিকে। স্কোভে দুঃখে দেদারও মুষড়ে পড়ে। হালে চাড় দিলে নৌকো ছেড়ে দেয় মাঝি। শ্রোতের টানে দেখতে দেখতে বাঁকের মোড়ে মিলিয়ে যায়। উদগত অশ্রু অঝোরে ঝরতে থাকে দেদারের হুঁচোখ বেয়ে। বংশীর অতো জলেও বোধ হয় তার পরিমাপ হয় না।

॥ ৩০ ॥

চরের মাগুঘের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পলান, দীঘু, করিমের ভাবনার অন্ত নেই। হুঁহাতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাটের দর গত সালের চেয়েও এবার মন্দ। শেষ পর্যন্ত কোন বিদেশী ক্রেতাকেই বাজারে দেখা যায়নি। জাপান বোধ হয় পানিতেই ডুব মরেছে। নিতাইয়ের কাছে সকলে মিলে

গিয়েছিল একদিন। সর্বনাশের জ্ঞান মুহূর্তে অসুযোগ জানাতে ছাড়েনি। কিন্তু হলে কি হবে, এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে নিতাই। তার কি দ্বন্দ্ব। কাগজে যা দেখেছিল তাই সে জানিয়েছিল মাত্র। বাজার তো আর তার হাতের মুঠোর মধ্যে নয়। কাজ কারবারের কথায় কে আবার নিশ্চয়তা দিতে পারে। সম্ভাবনা ছিল তাই জানিয়েছে।...

সকলে মিলে নিতাইকে দু'কথা শোনাতে গিয়েছিল উন্টো নিতাই-ই দলকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে! শুধু নিজের পক্ষে সওয়ালই করেনি। ঠাকার তাগিদও দিয়েছে। বছরের পর বছর কৈফিয়ত শুনে তার পেট ভরবে না। স্বদে-আসলে সমস্ত টাকাই তাকে শোধ করে দিতে হবে।

সহানুভূতি লাভের আশায় দুটো স্বধ-দুঃখের-কথাই ওকে বলতে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সহানুভূতিব পরিবর্তে পেয়েছে তিরস্কার। ক্ষুধার রুটি চেয়েছিল জুটেছে প্রস্তর-খণ্ড! বরাত খারাপ, কিছু বলার নেই। টাকা ধার দেবার জ্ঞান যে মানুষ চিরকাল চেষ্টা স্বপ্ন করে এসেছে সেই মানুষই আজ বেপরোয়া। তাগাদা মুহূর্তে তার ভেতরেই ওর হিংস্ররূপটি ফুটে উঠেছে। পলান নিজেকে বড় অপমানিত বোধ করে। গোলায় যা পাট আছে তা বেচে আসল না হোক স্বদের টাকা টেনেটুনে হয়ে যায়। নিতাই মুখে যাই কেন বলুক না স্বদ পেলে আবার সব ভুলে যাবে। ওরা তো ছারপোকার জাত। অস্থিচর্ম চায় না। শুধু প্রাণের রসটুকুই ওদের কাম্য। অস্থিচর্ম নিয়ে যে যেভাবে পার বেঁচে থাক— শুধু রসটুকু যুগিয়ে যেয়ো। আসলে প্রয়োজন নেই, স্বদ পেলেই যথেষ্ট। পলান ভাবে, এখনকার মতো তাই দিয়ে দেবে। তারপর খেয়ে না খেয়ে আর এক কিস্তিতে আসলও। যদি কসল থেকে না পারা যায় তাহলে পরিমাণ মতো জমি বেচেই ঋণ মুক্ত হবে। ওসমান বয়সে ছোট হলে হবে কি, ঠিকই বলেছিল। দশ জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া কিছুটা কালির আঁচড়ও পেটে আছে। ছারপোকাদের চিনতে ও ঠিকই পেরেছে। কি থেকে কিসে এসে ঠাড়িয়েছে। সামান্য হাজার চারেক টাকা স্বদে-আসলে এখন নাকি দশ হাজারের ওপর দিতে হবে। ব্যাঙের ছাতাই যেন ফনফনিয়ে বাড়ছে দিনকে দিন। মনের বাসনা ওসমানকে খুলে বলে পলান। কিন্তু না, ওসমান কিছুতেই রাজী নয়। সমস্ত টাকা দিয়ে দিলে নিজেকে চলবে কি করে। ধান তো ধরে কিছুমাত্র বেই। সমস্ত কিনে খেতে হবে। তাছাড়া এত মোটা স্বদ কেন দেবে নিতাইকে? আইনে এত চড়া স্বদ আদায়ের রীতি নেই। সদরের রোহিনী মুক্তার আইন

খেটেই পরামর্শ দিয়েছেন।...ওসমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দেয়, সাজী মশয়রে কও গা, টেকা যদি ঘরে নিবার চায় তাইলে সূদ ছাইড়া ণাওয়ন লাগব। নইলে একটা ফুটা পয়সাও ঘরে যাইব না। হাগ মতন মাইনঘেরে কেমন কইরা টিট্ কবন লাগে তা আমি শিকা আইচি (শিখে এসেছি)।

পলান সাদাসিদে মাছুষ। ওসব ঘোরপ্যাচ বোঝে না। টাকা ধার করেছে টাকা শোধ দেবে। এতে আবার শেখা-শেখিব কি আছে!...একটু বিরক্ত হয়েই ওসমানকে শুধায়, কি আবার শিকা আলিরে ?

ওসমান মনের উল্লাসেই মস্তব্য করে, শিকচি—শিকচি। ও হালা সূদ-ধোররা যদি কতা না হোনে তাইলে একটা পয়সাও হালারা চরের খেইকা পাইব না।

আগে শিকচ্ কি তাই ক না, বিরক্তিতে খেঁকিয়ে ওঠে পলান।

ওসমান বলে, এমুন কিচু না। বুজাইয়া কইলে তুমিও বুজবার পারবা। হালারা যদি সূদ না ছাড়ে তাইলে সমস্ত ক্যাত খামার আম্মাজানের নামে বেনামী কইরা কালাও। দেখি কি করবার পারে।

তুই কচ্ কি ওসমান! তিনকাল গেচে এককাল আচে এই বয়সে বেইমানী করুম! করাল কইরা টেকা আনচি, না দিলে কি ধম্মে সইব? ও কথা আব মুখে আনিচ না। নোকে (লোকে) হনলে মুখে থুথু দিব।...

ওসমান তবু নিজের গৌ ছাড়ে না। জোর দিয়েই বলে, নোকের (লোকের) মুখের কতায় কি যাইব আইব আমাগ। টেকা থাকলে হগলের মুখই বন্দ করন যাইব। আর তা না অইলে....

মুখের কথা শেষ হয় না ওসমানের পলান গর্জে ওঠে, চূপ থাক হারামজাদা। অমুন বেইমানীর কতা আমার সামনে কইচ না। আমি কারুর মাখায় বাড়ি দিবার পারুম না।

না পার না পারবা। বেইচা কিনা সব দিয়া থুইয়া মাইনঘের দুয়ারে দুয়ারে মালসা লইয়া মাগগা, সমতা রেখেই জবাব দেয় ওসমান।

মালসা লইয়া মাশুম ক্যারে। খোদায় আমারে হাত-পাও দেয় নাই? দরকার অয় খাইটা থামু।

হ, ষাটলেই এত বড় সংসার চলব। ক্যান, তখন যে কইচিলাম, দেনা কইরা রাজা উজীর অইবার কাম নাই। হা কতা হনুচিলা?

রাগের মাখায় ওসমানের গালে একটা চড় বসিয়ে দিভেই যাচ্ছিল পলান।

কিন্তু কি জানি কেন, শেষ পর্যন্ত তা পারে না। গলার স্বর কতকটা খাদে নামিয়েই বলে, আমি ভগ্ন বালোর লেইগাই সব করচিলামরে; খোদায় আমার মুক রাখল না।

হের লেইগাই ত কই, ও হালারা যেম্ন কুকুর অগ লেইগা তেম্ন ম্গুরের ব্যবস্থা কর! কও ত আমি রুহিনী মুক্তারের লগে কতা কই।

না না না, অম্ন কতা মুকে আনিচ না। ছল-চাতুরী কইরা কি খোদার কাছে ঠেকুম, পলান দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়।

অভিমান ভরে ওসমান বলে, তবে মর, আমি আর কি করুম!

সত্যি, করার বোধ হয় আর কিছু নেই। সোনার সংসারে অলক্ষীর বাতাস লেগেছে। সবই হয়তো উবে যাবে। পলান চোখে মুখে অন্ধকার দেখে।

দীহুর অবস্থা আরো শোচনীয়। সংসারের আবিলতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। টাকা-কড়ি জিনিসপত্রে কল নেই। তাছাড়া আধা-আধি পাট আঙুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় মড়ার ওপর খাড়াব ঘা পড়েছে। দর মন্দা বলে সমস্ত পাট মাচার ওপরে মজুত করা ছিল। কি করে যে আঙুন লাগলো ভাবাই যায় না। আর একটু হলে পাট তো সম্পূর্ণই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো সন্ধে ঘর-দোর পর্যন্ত। শনির কোপই পড়েছে। নয়তো এমন হবে কেন। বাকি পাট বেচে এখন আর একটা পয়সাও মহাজনকে দেওয়া যাবে না। না খেয়ে থেকে মানুষ কি করে ঋণ শোধ করতে পারে।...ভাবনায় ভাবনায় কাঁচাপাকা চুলের সব ক'গাছাই দিন দিন সাদা হয়ে উঠছে দীহুর। কুসুমের মনেও শাস্তি নেই। তা হলে কি ক্ষান্তর কথাই সত্যি! ময়না অপয়া। বাড়িতে ওর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে।...সারাদিন মুখভার করেই থাকে কুসুম।

আহ্লাদে আহ্লাদে মানুষ ময়না। শান্তুড়ীর মুখ চোখের দিকে চাইতেও কেমন যেন ভয় করে ওর। আভাষে ইঙ্গিতে হলেও সব কথা বুঝতে ওর বাকি থাকে না। ওকে বিয়ে করেছে বলে নিশির আদর-ষড়ুও যেন দিন দিন কমছে। পার্বতী তো পারলে পাশ কাটিয়েই চলে। ওর ছেলেকে ছুঁতেও দিতে চায় না ওদের স্বামী স্ত্রীকে। একমাত্র বাড়ির কর্তা ঠিক আছে বলে মুখ ফুটে এখনো কেউ কিছু বলতে পারছে না। শান্তুড়ীর তাড়নায় এর ভেতরেই তো হাতে গলায় গণ্ডা কয়েক মাহুলি উঠেছে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ান কে জানে?

দুর্গার মনেও স্থখ নেই। ঋণের জ্বালা তো আছেই তার ওপর ঘরের কোণের কুটুমও কম জ্বালাতে শুরু করছে না। মাঝে মাঝেই মেয়ের জন্ম খোঁটা স্নতে হয় ওকে। ক্ষেস্তি তো এক কথাকে দশখানা করে এসে লাগাচ্ছে। কি আর করা যাবে। কপাল যখন পুড়েছে তখন সবই সহ্য করতে হবে। বাম-কাস্তুর মনে কি আছে তাও বোঝা যায় না। এত সাহস ভরসা দিয়েছিলেন এখন রীতিমতোই ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। দিন দিন বড় উদাসীন মনে হচ্ছে ভট্টাচার্যকে। সাধলে এখন আর তামাক পর্যন্ত খান না। কুমাৰ বাহাদুরকে কোন কিছু বলতে বললেও সোজা কাছারি আর গ্রানবোট দেখিয়ে দেন। একটুও বুঝতে চান না, চুপি চুপি কর্ত্ত নেওয়া হয়েছে। কথাটা কানে গেলে বৈরাগীর কাছে মুখ দেখানো যাবে না।...সংসারে সকলেই মবে বেঁচেছে, একা যত দায় হয়েছে ওরই বেঁচে থেকে।...ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ভাল কবে ঘুমোতে পারে না দুর্গা।

নিতাই বসে সেই। তলায় তলায় মাকড়সাব জাল বুনেই চলেছে। কানামুঘায় ওসমানের মতলবটা কানে আসতেই তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। এতদূর স্পর্ধা! হেলে চাষা আমাকে চায় বক দেখাতে! আচ্ছাবে আচ্ছা, টের পাবি। আব দুটো দিন সবুর কর। তাহলেই বুঝতে পারবি, চাষার বুদ্ধিই বুদ্ধি না এই শর্মার বুদ্ধিই বুদ্ধি। যেমন বুড়ো আঙুল দেখাবার মতলব আঁটছিল তেমন ভিটেমাটি থেকে ঘাড় ধরে নামাবো তবে আমার নাম নিতাই সা। না, আর তায়-তাগাদা নয়। চবেও আর নয়। নিতাই কাগজপত্র সোজা পাঠিয়ে দেয় অবনী উকিলের কাছে। তিলমাত্র ফাঁক রাখা হবে না। সমন নোটিশ চেপে এক তরফা ডিক্রি করতে হবে। তারপর সোজা ঢোল শহরং। না না, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো চলবে না। যেভাবেই হোক, ছরধল্লার ঐ শস্তভাণ্ডার পেতেই হবে। মা লক্ষী তো একরকম হাতের মুঠোয় তুলেই দিয়েছেন ওকে। এখন সামান্য একটু কৌশল মাত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, শান্নেই আছে, বীর-ভোগ্যা বহুধরা। ষোগ্যা বক্তির জন্মই ধন-দৌলভ—সংসার। মুর্খ কিংবা দুর্বলের ঠাই নেই এখানে।... নিতাই মনে মনেই গর্জে ওঠে। মহাভারতের শকুনিই এসে ভর করে মগজে।

অজ্ঞানের সকাল। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। চরধল্লার গাছে গাছে শিশির বিন্দুর বলক। সাকিনা বাসি হাত-মুখ ধুয়ে কাঠের উত্থন জ্বলে কেনাভাত

চাপিয়েছে। ছেলেরা কেউ ঘুম থেকে উঠেছে, কেউ ঘুমুচ্ছে। পলানের শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। রোজ বিকেলের দিকে জ্বর হচ্ছে। খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসে, ভোর রাত্রে ছেড়ে যায়। এতদিন ভাতই খাচ্ছিল, আজ দুদিন কিছুই মুখে দিতে পারছে না! খেতে বসলে ঠেলে বমি আসে। দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে শরীরটা। সারা রাত ঘুম হয় না। ঋণ আর রোগ অবিরত ছল ফোটাতে থাকে। বুঝি বা পাগল হয়ে যাবে ও। রাত পোহালে হাড়ি ভর্তি ভাত চাই। একবার নয় দিনে চারবার। পাট বেচে একটা পয়সাও নিতাইকে দেওয়া যায় নি। খেতে পরতেই সব উবে যাচ্ছে। নেই বলতে একটা পয়সাও রুজি-রোজগার নেই। ওসমান গণি টাকার অভাবে ঠায় বসে আছে। ধান চালের কিস্তি বন্ধ। গস্তি দুটো ঘাটে পড়েই পচছে।...

উল্লে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ ক্ষেতের দিকে চোখ পড়ে সাকিনার। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ—কুয়াশাচ্ছন্ন। এখনো মৃগ কলাইয়ের ডগা সবুজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অতোগুলো লোক ওখানে কি করছে! ঢোল, বাজছে কেন? বিস্ফারিত চোখেই চেয়ে থাকে সাকিনা সোনামুখী ক্ষেতের দিকে। লোকগুলো যে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাইক পেয়াদা পুলিশও রয়েছে সঙ্গে। তবে কি সর্বনাশই শুরু হলো! কাঁপা গলায় চেঁচাতে থাকে সাকিনা, ওরে, তরা ওঠ'রে। অ ওসমান, অ গণি, তড়াতড়ি ওঠ'। জাখ, কারা ঘান সব আইবার নৈচে। ওঠ'।

চেঁচামেচি শুনে ওসমান, গণি, কেবামৎ লাক দিয়ে বাইরে আসে। ফজলুল কাশেম ঘাটে গিয়েছিল ওরাও ছুটে আসে। সারা রাত ছটফট করে ভোরের দিকে পলানের দু'চোখ বুজে এসেছিল। পলানও লাক দিয়ে উঠতে যায় কিন্তু পারে না। মাথা ঘুরে বিছানার ওপরেই পড়ে যায়। সাকিনা ছুটে গিয়ে দু'হাতে ওকে আগলে ধরে।

ঢোলে কাঠি দিতে দিতে আদালতের লোক ততক্ষণে বাড়ির ওপর এসে পড়ে। নিতাই নিজে আসে নি। তার বদলে এসেছে গোমস্তা ননীমাধব। মূলের চেয়ে শিকড়ের কড়কড়ানি বেশী। ননীমাধবের যেন আজ চৈত্রোৎসব। একবার ছুটে এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে। দেখে দেখে ওসমানের মাথার পোকাকগুলো কিলবিল করে ওঠে। একবার ভাবে, ছুটে গিয়ে বল্লমটা নিয়ে আসে। এতবড় স্পর্ধা নইনা চোরার! শালাকে না হাতে বাজারে সকলেই

চোরা বলে ডাকে। দুদিন নিতাই সার গদিতে তামাক সাজার কাজ পেয়েছে না, শালার ভবের ভাত উঠিয়েই দিতে হবে।—তিড়িং করে লাফ দিয়ে শোবাঃ ঘরে ঢোকে ওসমান।

গণি একটু স্থির বুদ্ধির মানুষ। ব্যাপারটা বুঝতে আদৌ দেরি হয় না লজ্জায় অপমানে ওর কান মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতার কথা বুঝে দাঁতে দাঁত চেপেই সব সহ্য করে যায়।

নিতাই সূচতুর। জীবন নাশের ভয়ে কিংবা চক্ষু লজ্জায় নিজে সঙ্গে আসেনি কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্তার কিছুই ক্রটি রাখেনি। বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে সারাসরি পুলিশের সাহায্য নিয়েছে। টাকায় সবই হয়। এখন বাবা দিতে যাওয়া মানে তোপের মুখে এগিয়ে যাওয়া। গণিও ওসমানের সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরের ভেতরে যায়।

এক হাতে বল্লম ও আর-এক হাতে ঢাল নিয়ে বেবিয়ে আসছিল ওসমান, গণি শক্ত করে কোমব জড়িয়ে ধরে ওর।

ওসমানের রাগ চরমে উঠেছে। বল্লমের একটা খোঁচা শেষটায় না গণিব তল পেটেই পড়ে। কিন্তু গণিকে ঢিল দিলে চলবে না। ওসমানের বউও এসে সাহায্য করে। দু'জনে ধস্তাধস্তি করে হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন ঢাল আব বল্লম। রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে ওসমান। দশ হাজার তিনশ' টাকার ডিক্রি। কিছু দিয়েই কিছু করার নেই। ঘোষণা না করবেই যুদ্ধে দুর্ধ্ব কোঁজ পাঠিয়েছে নিতাই। আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যস্তব নেই। মাথা নীচু করেই ইঁপাতে থাকে ওসমান।

ওদিকে পলান চোঁচাতে থাকে, কইরে, তরা সব গেলি কোনহানে? আমাবে সাজী মশর কাছে নিয়া যা না। দুইজা দিন সময় দেউক আমারে। আমি ছাব টাকা সূদে-আসলে সব দিয়া দিমু! অ গণি, অ ওসমান, ইদিগে আয় না?

গণি ওসমানের আসার আগেই ননীমাধব তেড়ে আসে, আর কারো এসে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বেরুবে তো বেরায় মিঞা।

ননীর আচরণে পলানের বুকের রক্ত টগবড়িয়ে ফুটতে থাকে। হাতের কাছে একটা জলের মাস ছিল, ইচ্ছে করে ছুঁড়ে মারে চোরার মুখের ওপর। তবু নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে করুণভাবেই জিজ্ঞেস করে, সাজী মশয় আহে নাই পাল মশয়?

ননী স্বভাবস্বলভভাবেই দাঁত খিঁচায়, কেন, সাজী মশয় কি তোমার

কেনা গোলাম যে ডাকলেই হাজির হবেন? মিজা, তাড়াতাড়ি বেরুবে তো
বেবোও নয়তো ঘাড় ধরে বার করাবার ব্যবস্থা করবো।

কি কলি বেইমান... অসমাপ্ত কথা আব সমাপ্ত করতে পারে না পলান।
উত্তরজনায় মূছা যায়।

সাকিনা ডুকরে ওঠে!

ওসমান, গণি, কেলামং দৌড়ে আসে ও ঘর থেকে। বউরাওঁসব আসে।
কাশেম ফজলুলকে আগেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে পুলিশ। ওরা গাট
বাটি নিয়ে টানাটানি করছিল। ওরা আর আসতে পারে না।

পলানের অবস্থা দেখে সকলেব চোখ দিয়েই জল গড়াতে থাকে। সাকিনা
আঁচলে মুখ ঢেকে বিলাপ করেই কাঁদতে থাকে। মাকে সাস্বনা দেবার মতো
কাবো মুখে কোন ভাষা নেই। ঘুষখোর হলেও নাজিবের প্রাণেই কিঞ্চিং
অল্পকম্পা জাগে। ননীমাধবের বাড়িবাড়ি দেখে কমেই এক চোট ধমকে দেয়।
বেগতিক দেখে চোবা কিছুক্ষণ মুখ বুজেই থাকে।

নাজির গণিকে লক্ষ্য করে সহানুভূতির স্বরেই বলে, আমি বেশীক্ষণ সময়
দিতে পারব না ভাই। তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বার ব্যবস্থা কর।

ভরসা পেয়ে গণি হাত জড়িয়ে ধরে নাজিবের, বাবু মশয়, দয়া কইরা একটা
দিন সময় ছান। টাকার যোগার আমরা করবার পারুম।...

উত্তরে নাজির বলে, আইনের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা ভাই। আমি
তোমাদের জগ্ন কিছুই কবতে পারব না।

আপনার পায়ে পড়ি বাবু মশয়। বাজান ফিট অইয়া পড়চে। দয়া কইরা
একটা দিনের সময় আমাগ ছান, গণি আবার হাতজোড় করে।

ধরা গলায় নাজির বলে, তোমাদের বিপদ আমি বুঝতে পারছি ভাই।
কিন্তু কিছুই করতে পারব না। সঙ্গে যে খেঁকী কুকরটা রয়েছে, ননীমাধবের
দিকে ইঞ্জিত করে নাজির।

না না, ননীর মতো ইতরের কাছে কোন অহুরোধ উপরোধ চলে
না। বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে ওরা। ওসমান দীর্ঘশ্বাসে ক্ষেটে পড়ে, বাবু
মশয়, তাইলে গাছতলাই বাইর কইরা দিলেন আমাগ?

রুদ্ধ আবেগে নাজির উত্তর করে, কি করব ভাই, আমি আদালতের
গকর।

একে একে সকলেই বেবিয়ে যেতে থাকে বাড়ি ছেড়ে। বৃড়ী বটের

ছায়াই এখন একমাত্র সঙ্গল। তারপর যদি চরের কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। একটা খাটিয়ার ওপর শোয়ানো অবস্থাতেই পলানকে ধরাধরি করে বার করা হয়। বেচারা, চেতনা থাকলে হয়তো কিছুতেই বার হতে চাইতো না। সাকিনা হাঁপাতে হাঁপাতেই পেছন নেয়। ভাতের হাঁড়িটা উত্থনের ওপর ফুটছিল। কে যেন একটা বাঁশ মেরে ভেঙে দিয়েছে। চার-দিক থেকে কাক, চিল, কুকুর, বেড়াল হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। পলানের সোনার সংসার মুহূর্তে শ্মশানে পরিণত হয়। ননীমাধবের ইচ্ছিতে ঢোলে কাঠি পড়ে—ডুম্ ডুম্ ডুম্...

॥ ৩১ ॥

পলান ব্যাপারীকে আশ্রয় দিতে চরের অনেকই এগিয়ে আসে। চরফুট নগর থেকে দীঘু করিমও পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পলানের কারো আশ্রয়ই আবশ্যক হয় না। মুছা ভাঙলেও ভাল করে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। জ্বরেব বিকারে থেকে থেকেই চিংকার করতে থাকে, আমার বল্লম, আমার বল্লম কোথায়? বেইমান, সব বেইমান...

চব্বিশ ঘণ্টা বড়ী বটের ছায়ায় কাটিয়ে পরের দিন ভোরে দেহ ত্যাগ করে পলান। সাকিনা আর গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে না। পলান বোধ হয় ওকেও সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দাঁত লাগছে হতভাগিনীর। সোনার সংসার, প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তছনছ হয়ে গেলো। ওসমান গণি ভেবে পায় না, কি করবে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এতকাল পলান ছিল বট গাছের মতোই ওদের মাথার ওপর। যত বড়-ঝাপটা ওর ওপর দিয়েই গেছে। ওরা সকলে ছিল নিশ্চিন্ত। হুকুম মতো কাজ করেছে, বাকী সময় ফুর্তি আঁপলাদ করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো তাসের ঘরের মতোই সে বটবৃক্ষ ঝড়ে ভেঙে পড়লো। এখন আর কে দেবে আশ্রয়—আশা ভরসা। পাশার ছকে হেরে পঞ্চপাণ্ডবের মতো বনবাসে ধেতে হবে ওদের। এখন সব চেয়ে মুশকিল হলো মৃত পলানকে নিয়ে। কোথায় ওকে ওরা গোর দেয়। নেই বলতে যে নিজস্ব এক ছটাক জমিও নেই। নর-রাক্ষস এক খাবায় সব গিলে খেয়েছে। চরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূঁইয়ার আজ সামান্য সাড়ে তিনহাত পরিমিত জমিও জুটছে না। হয়তো এত বড় একজন মানী লোকের দেহ খলেশ্বরী

জলেই ভাসিয়ে দিতে হবে। সামান্য সংকারটুকু পর্যন্ত হবে না।... দু'চোখ চলছিলিয়ে ওঠে পাঁচটি জোয়ান ছেলের। শোকের চেয়ে লজ্জাই বেশী। পলানের খন রয়েছে ওদের শিরা-উপশিরায়। হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে ওরা পারবে না। দীহু করিম হাজারবার বলেও রাজী করতে পারে না। বলে কি মোড়লরা, চরধল্লার বাদশা যাব চরফুটনগবের মাটি নিতে! না না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না। ওসমান জমির খোঁজেই বার হয়। চরধল্লার মানুষ যদি দয়া করতে চায় ওদের তবে এই দয়া করুক, যাতে ওরা উচিত মূল্যে একফালি জমি পায়। বউদের গহনা বেচেই জমির দাম শোধ করবে। তবু পারবে না কারো কাছে হাত পাততে কিংবা দলেখরীর জলে আকাজানকে ভাসিয়ে দিতে।...

অনেকে অনেক পরামর্শই দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতিভাট রহমানের কথাটাই মনে ধরে ওদের। বড়ী বটের ছায়া-শীতল পীরতলাতেই গোর দেওয়া হোক মোড়লকে। ও গাছ তো মোড়লই একদিন নিজের হাতে লাগিয়েছিল। কম করেও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। ছোট্ট চারা শাখা-প্রশাখায় বিশাল এক মহীরুহ এখন। ঘুরতে ঘুরতে কোথেকে এক পীর এসে আশ্রয় নেন ছায়া-শীতল তরুমূলে! বড় নির্ভাময় জীবনযাপন করতেন পীরসাহেব। পলানের হৃদয় গলে যায়। বিধা দুই জমি লিখে দেয় ও পীরের নামে। চরের মানুষ আপদে-বিপদে পীরের শরণ নেয়। জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুঁকে জমে ওঠে আসর। বটতলা—পীরতলায় পরিণত হয়। পীরসাহেব আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর আসনের কাছে আজো মানুষ প্রতি সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বলে দেয়। বিপদে-আপদে স্মরণ করে তাঁকে। পলানকে তাঁর পাশেই গোর দেওয়া সাব্যস্ত হয়। চরের আবালবৃদ্ধ এসে জড় হয়। করিম নতজান্ন হয়ে প্রার্থনা করে সুহৃদের জন্য। দীহুও চোখের জল দিয়েই তর্পণ করে। সকল তাপ জ্বালা থেকে মুক্তি পায় পলান।

পলান চির শাস্তির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও চরের মানুষ গর্জে ওঠে। সাকিনাকেও দিনকয়েক আগে গোর দিতে হয়েছে পলানের পাশে। ওসমান গণিরা পাঁচ ভাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চরের শত শত জোয়ান মানুষও ওদের দলে। নিতাই একবার জমি চাষ করতে চলে এলে ওরা দেখে নেবে কত শক্তি ধরে সে। ওরা তো কেউ চাষ করবেই না, অল্প কাকেও তা করতে দেবে না।...

নিতাইয়ের ভাবনার অন্ত নেই। আইনের প্যাঁচে জমি দখলে পেয়েও ভোগে আনতে পারছে না। এ পর্যন্ত নিজে একটি দিনের জগাও চরে আসতে সাহস পায়নি। চরের মাছসম্মে যেভাবে ক্ষেপে আছে তাতে কোনদিন বা বেঘোরেই প্রাণটা যায়। এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় না করাই ছিল ভাল। আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন তো আর খামবার উপায় নেই! সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো মাথার ওপরে ছোঁবল পড়বে। পলানের উচ্ছেদে কেবল চরের লেজটিই খসে পড়েছে। এখনো পেট মাথা বাকি। মোড়ল সব ক'টাকে ঘাসেল না করা পর্যন্ত শাস্তি নেই। কিন্তু উপায় কি। ননী মাধবটাকে তো মুঠোভর্তি টাকা দিয়েও রাখা গেলো না। বেটা ভয় পেয়ে পালালো। আব ভয় না পেয়েই বা করে কি। পলানের ছেলে পাঁচটা তো স্তনছি আস্ত ডাকাত। শালারা নাকি দিনরাত আমাকেই খুঁজে বেড়ায়। করিম ককিরটা একটু শাস্ত-মেজাজেই আছে। কিন্তু আর-একটা গোঁয়ার হচ্ছে বৈরাগীটা। হিন্দু হয়েছে গলায় গলায় শালার নেড়েদের সঙ্গে ভাব। আচ্ছারে শালা, তোর বিষ দাঁতটাই আগে ভাঙটি।...ননীমাধব প্রাণের ভয়ে কাজে ইস্তফা দিলে নিতাই নিজেই তদ্বির তদারক শুরু করেছে। দীহুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। সেই একই ভানুমতীর খেলা। সমন চেপে একতরফা ডিক্রিলাভ। নোকো পথেই সদরে যাতায়াত করতে হয় নিতাইকে। তবে খুব সতর্ক ও। কখনো একা একা চলার কথা করে না। সদা-সর্বদা কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সতর্ক থেকেও কেমন করে যেন ফাঁদে পড়ে যায় নিতাই। দীহুর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সদস্তুে বাড়ি ফিরছিল। কাজের তাড়ায় সঙ্গীরা সব মাঝ পথে নেমে গিয়েছে। নিতাইয়ের মনটা খুঁতখুঁত করলেও তেমন কোন ভয় ভাবনা হয় না। কে আর দেখছে ওকে। তাছাড়া মাঝি হুঁজন তো রয়েছেই।... ছেয়ের ভেতরে বসে বেশ আমেজের সঙ্গেই তামাক টানতে থাকে নিতাই। ধোঁয়ার সুগন্ধী সঙ্গে মগজের ঘিলুর মধ্যও কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো। তিন হাজার টাকার ডিক্রিটা নগদ তিন হাজারেই কুমার বাহাদুর কিনে নিলেন। এবার ঈড়ালের পো টের পাবে, কত ধানে কত চাল। বড্ডো বেড়েছে শালা। কত করে তোষামদ করলুম, চর দখল করতে আমাকে সাহায্য কর, আমি তোর সমস্ত স্তম্ভ মাপ করে দিচ্ছি। আসলও না হয় আরো

দু'বছর পরে দিস্। আমি লিখে পড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শালা কথাটা কানেই তুললে না। ফুটনি ঝাড়লে, নেমকহারামী করতে পারবে না। বলি শালা পলান সেক কি তোর বাপদ্দাদা চৌদ্দ পুরুষ—না সেই শালাই তোকে ধার কর্জ দিয়েছে?...এখন দেখি কোন বান্ধব তোকে রক্ষা করে। এ আর নিতাই নয় যে চোখ রাঙাবি। শক্ত মরদ বমেত্রনারায়ণ। বৃকে বাঁশ ডলবে আর টেনে ঘর থেকে বার করবে।...ভাবতে ভাবতে মাথার পোকাগুলো কিলবিল করতে থাকে নিতাইয়ের। দীহুকে যদি কুমার বাহাদুর শায়েষ্টা করতে পারেন তাহলে পলানের ছেলেগুলোকে বাগে আনা যাবেই। তারপর যদি চরখল্লার জমি দখলে আসে তাহলে আর স্তদের কারবার না করলেও চলবে। আইন তো অধিকার দিয়েছেই। এখন ঠ্যাঙারেগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই হয়। দেখা যাক, কুমার বাহাদুর কি করেন।...হুকো বেখে একটু কাত হয় নিতাই। জলো হাওয়ায় দু'চোখ বুজে আসে।

হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে নিতাই। রুষ্টির গতি বেড়ে যায়। হাওয়াও জ্বোরে বইতে থাকে। মাঝিরা টোকা মাথায় দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টেনে চলেছে। রুষ্টির ধকলে আশেপাশের কোন কিছু নজরে পড়ছে না। নৌকোর ভেতবের লণ্ঠনটাও দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে। চারদিক জুড়ে থমথম করছে ঘন অন্ধকার। কোনরকমে বাঁক ঘুরতে পারলে অহুকুল হাওয়া পাওয়া যাবে। এ পথটুকু যেতে শক্তির কসরতই কবতে হবে। তাই করে চলেছে বাপ-বেটায়। আর শ'থানেক হাত এগুতে পারলেই বাঁকের মোড়। ছেলেকে তাড়া দিয়ে পেছনের হালে ঘন ঘন চাড় দিতে থাকে বড় মাঝি। ছেলেও প্রাণ-পণ শক্তিতে যুঝতে থাকে। টেউএ যেন এক-একবার তলিয়েই যাচ্ছে সামনের গলুই। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। ভয় নেই, মোড়টা ঘুরতে পারলেই নিশ্চিন্ত। একজন হালধরে বসে থাকবে। আর একজন সানকি দিয়ে সৈঁচে ফেলবে জল। মোড়ে তো একরকম এসেই পড়েছে। এখন হালটা ঘুরিয়ে ধরলেই নৌকো ঘুরে বাবে। বড় মাঝি সেই চেষ্টাই করতে যায়। হঠাৎ পাশ কেটে এসে একখানা বড় ডিঙি পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডিঙিতে পাঁচটি লোক। বড় দু'জনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বাতাসে ফরফর করে উড়ছে। মালকোঁচা করে লুঙ্গি পরনে। কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা। বাকী তিনজনও বেশ আঁটসাঁট। বড়জন হাঁকে, এই মিঞা, নাও ভিড়াও।

বড় মাঝি প্রতিবাদ করে, ক্যা, নাও ভিড়ামু ক্যা। কি কইবার চাও তোমরা।

কইবার চাই তোমার মাথা শালা। নাও ভিড়াইবা নাকি ভিড়াও।
নইলে...রূপ করে একটা বল্লম তুলে উচিয়ে ধরে গণি।

বৃষ্টির ধকল কমে এখন টিপটিপানী শুরু হয়েছে! বাতাস নেই বললেই
হয়। বড় মাঝি তবু ভাল করে চোখ খুলতে সাহস পায় না। পাঁচটি জন্মদ
যেন ক্ষেপে উঠেছে। নিতাইকে আস্তে আস্তে গোটা দুই ডাক দিয়ে হাল
ধরে চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওসমান গণি ডিক্রি থেকে লাফ দিয়ে এসে নিতাইয়ের নোকোয় ওঠে।
ওসমানের হাতে একটা শানিত রামদা। গণির হাতে বল্লম।

মাঝির ছেলে ছোট মাঝি ভয়ে চোঁচাতে থাকে।

ওসমান খেকিয়ে ওঠে, এই শালা, চোঁচাবি ত দুই টুকবা কইরা কালামু।
বালো চাচ্ ত চূপ কইরা বইহা থাক।

ছোট মাঝি দু'চোখ বুজে ভয়ে কাঁপতে থাকে। বড় মাঝিও থ বনে যায়।
টোক গিলে জড়িত কণ্ঠেই অল্পবোধ জানায়, আমাগ ছাইড়া জ্ঞান সাবরা।
নায়ে কিছু নাই। আমাগ...

মুখের কথা শেষ করতে পাবে না বড় মাঝি—ওসমান আবার গর্জে ওঠে, চূপ
কর বেটা। ছাইড়া দিব। নায়ে তগ কিচু নাই, না? চামাব শালা কুথায়?

উত্তর আর মাঝিকে দিতে হয় না। চোঁচামেচি শুনে নিতাই আচমকা জেগে
ওঠে। ভয় জড়িত কণ্ঠেই শুধায়, নোকোয় কে? কাব সঙ্গে কথা বলছিস,
এই খলিল?—

তোমার বাবার লগে কতা বলছে শালা। বাইরইয়া আহ চামারের পো,
খলিল উত্তর দেবার আগে ওসমান ভেংচি কাটে।

ওসমানের কণ্ঠস্বরে নিতাই চমকে ওঠে। এক বলক চোখ চাইতেই দেধে,
সাক্ষাৎ যম শিয়রে দাঁড়িয়ে। কাঁপা গলায় অবস্থা লঘু কবতে চেষ্টা করে, কে,
বাবা ওসমান! কি চাই বাবা তোমাদের?

চাই তোমার মাথা শালা, ওসমানের কণ্ঠে খানখান হয়ে বরে পড়ে
প্রতিহিংসার কর্কশ কণ্ঠস্বব।

নিতাইয়ের মুখে আর বাক্য সরে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

গণি দৈহনের ভেতরে মাথা গলিয়ে তামাসা জোড়ে, কি সাজী মশয়, চরে
একবার নাম। এত জমিজমা পাইলা একবার দেইধা যাও।

নিতাইয়ের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। হাত জোড় করেই অল্পবোধ:

জানায়, আমাকে তোরা ক্ষমা কর বাবা। আমি তোদের সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেবো। আমাকে—

ইস, শালা আমাব বম্বপুতুব যুধিষ্ঠিব রে। সব জমি আমাগ দান কববে!

ও শালাব লগে কতা কওয়নের কি কাম? শালারে টাইনা বাইরে আন না। অব জমি হব গোয়া (পাছা) দিয়া ভইরা দেই, নিতাইয়েব মুখের মতো জ্বাব দিয়ে গণিকে আদেশ করে ওসমান।

গণি শ্লেষেব সঙ্গেই আবাব টিপ্তনী কাটে. আহেন সাজি মশায়, একডু বাইরে আহেন। ক্ষাত খামাবেব দিকে একবাব চাইয়া ছাহেন, বলতে বলতে হাত ধবে টানাটানি শুরু কবে গণি।

নিতাই মান্বলেব বাশটা শক্ত কবে চেপে ধবে কাতরাতে থাকে, দোহাই তোদেব আল্লাব, আমাকে ছেড়ে দে। মা লক্ষ্মীব নামে শপথ কবাচি, তোদের সমস্ত জমি আমি ফিবিয়ে দেবো। আমাকে ছেড়ে—

শা-লা, জমি ফিবাইয়া দিবি। বাজানবে আমরা কুথায় ফিবা পামুবে শালা। তব নোকবে কত কইবা কইচিলাম, দুইডা দিন আমাগ সময় ছাও—সব টেকা আমবা দিয়া দিমু। ছনচিল শালা?—ক্রোবে গজরাতে থাকে গণি।

নিতাই আবাব কাতরাতে থাকে, আমি আসিনি বাবা। আমি এলে নিশ্চয় তোমাদেব কথা রাখতাম। ..

ইস, শালায় ঘ্যান এহন কিচু জানে না। মার শালা চামাররে, বলতে বলতে এক হেচকায় বাইবে টেনে এনে লা দিয়ে কাঁথের ওপব কোপ বসিয়ে দেয় ওসমান।

বড় মাঝি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধবতে যাচ্ছিল ওসমানকে। কেলামৎ এক বল্লমের খোঁচায় ছায়ল কবে ফেলে ওকে। বাবারে-মারে বলে চীৎকার করতে কবতে লাফ দিয়ে জলের ওপব গিয়ে পড়ে মাঝি। ছোট মাঝিও বাজানরে মাইরা কালাইল, বাজানরে মাইরা কালাইল বলে, চীৎকার করতে থাকে।

গণি ওকেও বল্লমের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে জলের ওপর ফেলে দেয়।

বাপ-বেটায় ভেসে চলে পাড়ের দিকে।

ওসমান একাই নিতাইকে কোপাতে থাকে। বাব দুই চিংকার করেই গলা নিস্তরু হয়ে আসে নিতাইয়ের। যন্ত্রণায় ছটকট করতে করতে লাফ দিয়ে জলের ওপর পড়ে।

তীরে উঠে মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চোঁচোঁতে থাকে। বুট্টে নেই, খমখম করছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিহ্বাৎ চমকাচ্ছে! পাড়ে কোলাহল শোনায়। আর্তনাদ শুনে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। নিতাই জীবিত কি মৃত দেখবার আর ফুরসত নেই। ডিডি নিয়ে দ্রুত গা ঢাকা দেয় পাঁচ ভাই। দুঃশাসনের রক্তে পিতৃতর্পণ আজ সার্থক হলো ওদের। বেহস্তে নিশ্চয় তৃপ্ত হয়েছেন আকাজান। আর কোন ভয় নেই। ফাঁসি, কালাপানি, কারাবাস হাসিমুখেই বরণ করবে ওরা।...

ক্ষণিকের জন্তুও কারো মনের কোণে ঘানি উপস্থিত হয় না। নিতাইকে মৃত দেখে এলে আর কোন ভাবনাই থাকতো না। এখন ভাবনা শুধু ঐটুকুই। না না, নিতাই মরবেই। নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে যাবে। অধর্ম কখনো টিকে থাকতে পারে না... মনের জোরেই বৈঠায় খোঁচ দেয় পাঁচ ভাই। কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবই যেন এগিয়ে চলে।

নিতাই মরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, বেঁচে থেকেও যেমন অনেককে জালিয়েছে মরেও তেমনি জ্বালাচ্ছে। মাঝিদের সোরগোল শুনে জল পুলিশেব নৌকো এসে উদ্ধার করে আহত নিতাইকে। যন্ত্রণায় জলের ওপর দাপাদাপি করছিল। উত্থান শক্তি রহিত হলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি। অঝোরে খুন ঝরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। উদ্ধার করে সাব ইন্সপেক্টর বমণীমোহন তাড়াতাড়ি ওর জ্বানবন্দী নিতে উগ্ঠাগী হন। চারদিক থেকে আরও অনেকে এসে জড় হয়েছে। ভিডি নিয়ে জলপথেও আসে কেউ কেউ। কারো হাতে লণ্ঠন, লাঠি, বল্লম। কারো বা খালি হাত। এঁটো হাতেও এসেছে অনেকে। বিপদে মানুষের পাশে ছুটে আসাই গ্রামের মানুষের ধর্ম। পরের জন্তু জান কবুল করতেও ওরা ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করতেও জানে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতাইয়ের বীভৎস মুখের দিকে চেয়ে অনেকেই শিউরে ওঠে। আহ-হা, কি সর্বনাশ করে গেছে বেচারার। একেবারে জানে খতম করে দিয়ে গেছে।...কিন্তু খুনেরা গেল কোথায়? এত তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। খুঁজলে এখনো ধরা যাবে।...যে যেদিকে পারে এগিয়ে যায়। ভিডি নিয়েও এমাথা ওমাথা খোঁজাখুঁজি করে একদল। কিন্তু কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। মাঝিরাও সঠিক কিছু বলতে পারে না। বড় মাঝি তো বেশ ষম্ম হয়েছেন। ছোটর অবস্থাও সঙ্গীন। ভয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে বেচারার। কাকেও চিনতে পারেনি। বড় মাঝিও না। ভিন্দ দেশী

মানুষ ওরা। হালে এসেছে এ অঞ্চলে নোকো নিয়ে। রমণীমোহনের উপর্যুপরি জেরার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে পারছে, ডাকাতরা দলে পাঁচজন ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহাৰা। সহসা বাঁকের মোড়ে ডিক্কি নিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়!...

ডিক্কির কথা শুনে আবার হুঁদল হুঁদিকে ছুটে যায়। কিন্তু এবারও কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। ধলেশ্বরীর কোল খাঁ খাঁ করছে। আকাশ মন ক্লম্ব মেঘে আচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার ভোর নেই। কেমন যেন খমখমে ভাব। সকলে মিলে ফিবে আসে নিতাইয়ের পাশে। রমণীমোহন ডাইরী লিখে চলেন। এক ঢোক জল গিলে কাতবাতে কাতরাতে শেষ জবানবন্দী দেয় নিতাই, পলান ব্যাপারী পাঁচ ছেলে আমাদের খুন করেছে দারোগা সাহেব। ওসমান, ...আর কিছু বলতে পাবে না নিতাই। মুছায় চলে পড়ে। হয়তো বা নিভেই যায় জীবন দীপ। কলম বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপে ধবেন রমণীমোহন। না, এখনো থিকথিক্ কবে চলছে ধমনী বক্রিয়া। সময় মতো সদবে পৌঁছানো দরকাৰ। চেষ্টা কবলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। রমণীমোহন মিছিমিছি দেরি না করে তাড়াতাড়ি আব একখানি নোকো যোগাড় করে গঞ্জের খানায় পাঠিয়ে দেন নিতাইকে। সঙ্গে যায় হুঁজন কনেষ্টবল আব উপস্থিত জনতার মধ্য হতে জনকয়েক বলিষ্ঠ মানুষ। আসামাদের গ্রেপ্তার না করে নিজে ফিরবেন না। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে সবাসবি পলানের বাড়ির দিকেই রওনা হন।

ওসমান, গণি, কেরামৎ সকলেই ওরা সবাসবি বাড়িতে এসে উঠেছে। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই ওদের মধ্যে। ছুটেও পালাবে না কেউ কোথাও। পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায়ই ধরা দেবে ওরা। আদালতে গিয়ে বুক ফুলিয়েই বলবে, ওরা কোন দোষ করেনি। নিতাইয়ের মতো পিশাচকে মারায় কোন দোষই হতে পারে না। খুনের শাস্তি খুন। নিতাই একা ওদের অনেককে খুন করেছে—ভাতে মেরেছে। এই ওর উপযুক্ত শাস্তি। কোন গায়বান বিচারক কখনো ওদের শাস্তি দিতে পারেন না। বরং পুরস্কার পাওয়াই ওদের উচিত। নিজেরা মরেও একটা কৌশলী ডাকাতের হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে ওরা।...কাশেম, কজলুল, কেরামৎ কিছুটা ভেঙ্গে পড়লেও গণি ওসমান ঠিকই থাকে।

রাতের নাস্তা খেয়ে শুতে যাবে সকলে, রমণীমোহন সদলবলে এসে বাড়ি বের দেন। ভয় না পেলেও এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পুলিশ আসবে একথা

কল্পনাও করতে পারেনি ওরা। বরং ভেবেছিল, কোন খোঁজই হবে না। নিতাইয়ের জ্বানবন্দী না পেলে হয়তো হতোও না কিছু। কিন্তু ভাগ্য দোষে অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। তা হলে কি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শয়তান! সকল চেষ্টাই তাহলে বিফলে গেলো! আব্বাজানের আত্ম তাহলে আর ভুপ্ত হলো না! অনন্তকাল তৃষ্ণার্তই থেকে যাবে! ভাগ্য ভাগ্য, সবই ভাগ্যের ফের।...বেঁচে থেকে আর লাভ কি? ওসমান স্বেচ্ছায়ই ধরা দেয়। গণি, কাশেম, ফজলুল, কেরামৎও কোনরকম গোলমাল করে না। এত সহজে সকলকে গ্রেপ্তার করা যাবে রমণীমোহন কল্পনাও করতে পারেননি। মনে মনে তাই খুশী হয়েই সকলকে নিয়ে রাতারাতি থানায় ফেরেন।

নিতাইয়ের অবস্থা শোচনীয়। এ পর্যন্ত আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নাড়ীর অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। শত চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি। খবর পেয়ে ছেলে, বউ, মেয়েরা থানায় এসে দাপাদাপি শুরু করেছে। সকালে নৌকায় উঠবার সময় চলতি এক জেলে নৌকো থেকে ইলিশ মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিল নিতাই। ফিরে এসে ঝোল ভাত খাবে। নিতাইয়ের বৌয়েব বিলাপে পাষাণের বুক কেটেও বোধ হয় কান্না বেরাবে। এক গান্দা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করছে বেচাৰা। টাকা-কড়ি সবই চরে রয়েছে। কপাল পুড়লে খাবে কি তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ধণে প্রাণেই ওদের মেরে রেখে যাচ্ছে নিতাই। দুটো মুখের কথাও বলে যেতে পারছে না।

রাত বারোট। অচেতন নিতাইকে নিয়ে রমণীমোহন স্বয়ং সদরে রওনা হন। জলপথে প্রায় ঘোল সতেরো মাইল পথ। যদি আর কোন নূতন উপসর্গ দেখা না দেয় তাহলে হয়তো কোনরকমে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে। আর দুটো কথা বলে যেতে পারলেই আসামীর ফাঁসী কেউ রুখতে পারবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওসমান খুন করেছে। তবু আইনের রায় বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়! বিধিমতো সোজাহুজিই আসামীকে সনাক্ত করতে হবে। এত বড় খুনের মামলায় শাস্তি হলে নিশ্চয় পদোন্নতি আশা করা যায়। নিতাইয়ের স্ত্রী, পুত্র, কঙ্কার সঙ্গে রমণীমোহনের চোখেও ঘুম নেই। অষ্টগ্রহর হাঁ করে মুখের কাছে বসে আছেন। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মার পথেই নিতাইয়ের ভবলীলা শেষ হয়ে যায়।

বিচারে ওসমানের বাবজীবন দ্বীপান্তর ও গণি কেরামতের দশবছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ফজলুল আর কাশেমের তিন বছর করে।

পলানের সোনার সংসার শ্মশানে পবিণত হয়। মেহেরার হৃৎখে করিমও কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আর দয়াল চানের আসর বসে না। একতারার তার ছিঁড়ে গেছে।

দীন্তব মনেও স্বস্তি নেই। অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই দিন কাটছে। ডিক্রি-খানা রমেন্দ্রনারায়ণ কিনে নিয়েছেন। কে জানে কি আছে তার মনে। নিতাইকে তবুও না হয় অল্পরোধ উপরোধ করা যেতো। কিন্তু কুমার বাহাদুরের কাছে তো ষেষবারও উপায় নেই। রামকান্ত ইচ্ছে করলে খোঁজ খবর দিতে পাবেন। খব গলায় গলায় ভাব হ'জনের। উনি অল্পরোধ করলে সবকিছু চেপে যাওয়াও অসম্ভব নয়। মানী লোক হয়ে মানী লোকের সম্মান বাধাটাই স্বাভাবিক। নিতাই ছিল হুদখোর—চামার। কুমার বাহাদুর তা নন। বনেদী বংশ, প্রশস্ত দিল।... কিন্তু মর্শাকিল হয়েছে ভট্টচায় মশায়কে নিয়ে। চরের প্রতি দিন দিন কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠছেন। সমস্ত চর তো এষাবৎ মাথার মুকুট করেই বেখেছে ওঁকে। বিনিময়ে এটুকু দয়াও কি উনি করতে পারেন না!...দাওয়ার উপর বসে হঁকো টানতে টানতে এলোমেলো ভাবতে থাকে দীন্ত।

নিভূতে রামকান্তকে কথাটা বলবে বলে ক'দিন ধরে ভাবছিল দীন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না! রামকান্ত এখন আর সে রামকান্তই নেই। আগে ওর সামনে হাঁকো খেতে পর্যন্ত সমীহ করতো। কিন্তু এখন যেন দিন দিন কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠছেন। নিজে প্রকাশে গ্লাস না ধরলেও খোলাখুলিই এখন উনি রমেন্দ্রনারায়ণের দোসর। মদ, গাঁজা, আড্ডা, ইয়ার্কিতে একরকম প্রকাশেই ওঁর তোয়াজ করেন। গঞ্জের মানুষ তো বলে, ইদানীং ভট্টচায়ই কুমার বাহাদুরকে উস্কাচ্ছে! নয়তো মাঝখানে বেশ সংযতই ছিলেন উনি।...ছি ছি ছি, গুরু পুরোহিত জ্ঞানেই চরের আবালবৃদ্ধ ওঁকে ভক্তি করে আসছে। শোক তাপে সকলে জর্জরিত। তবু কি ওঁর লজ্জা সরম নেই!...

প্রতি বছর বর্ষাতেই কুমার বাহাদুরের 'বোট' খালের মুখে এসে নোঙর স্কেলে। মেয়েদের স্নানের ঘাট সেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকায় অল্পবিধা হলেও কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত তা নিয়ে প্রকাশে কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি। শান্তি বজায় রেখেই চলেছে। কিন্তু এবারের অবস্থা শোচনীয়। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই একরকম ঘাটের কাছ বেঁয়েই 'বোট'

বাঁধা হচ্ছে। মেরেরা কেউ আর এখন খুলে-মেলে স্নান করতে পারে না। অনেকে ঘাটে আসা ছেড়েই দিয়েছে। হুঁজোড়া লোলুপ চোখ যেন অবিরত ওদের গিলে খেতে বাস্তু। যেন তির্যগ দৃষ্টিতে উলঙ্গ করেই ওরা ওদেব দেখতে থাকে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রতিবাদ তো ছরের কথা অল্পবোধ উপরোধ জানাবার মতো সাহসও কারো নেই। আড়ালে আব-ডালেই চলে বিক্ষোভেব গুঞ্জরণ। কেউ কেউ মোড়ল হিসেবে দীর্ঘ করিমের কাছোও নাশিশ করে। কিন্তু কি করবে ওরা। পলানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথাই গুঁড়িয়ে গেছে। চরণলা তো এখন নিস্প্রাণ নির্জীব। যাবা প্রাণে বেঁচে আছে তাদেরও মাথা তুলবার উপায় নেই। নিতাই তাদের জুঁপিণ্ডে ভীতির ছায়া রেখে গেছে। রমেন্দ্রনারায়ণ হয়তো এই স্মরণেই চাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের মতো শুধু স্মদেব কারবার ওর নয়। সাতপুরুষেব জমিদারি। শিরায় শিরায় রয়েছে কুটবুদ্ধির বীজ। নিতাই ভুল কবেছিল। কাল সাপকে কখনো লেজ কেটে ছেড়ে দিতে নেই। আহাম্মক—পাকা কলার কাঁদি দেখে কালনাগিনীর গতে হাত গলিয়ে দিলে। ছোবলের ভাবনা ভাবলে না। না না, নিতাইয়ের মতো ওব কখনো ভুল হবে না। মোড়ল দীর্ঘকে শুধু ভিটে ছাড়া করলেই চলবে না। লোক চক্ষু আবডালেও পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হয়...না, তার আব প্রয়োজন হবে না। খুন গুমের চেয়েও ভাল রাস্তা আছে। কোনরকমের বুঁকি নেই অথচ নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। ষাঁড়ের শত্রু বাধে থাকে।—ভাবতে ভাবতে কপালেব বলি রেখাগুলো ফুলে ওঠে রমেন্দ্রনারায়ণের।

সেদিন সূর্য গ্রহণ। বিকেল পাঁচটায় রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবেন দিনমণি। চরের নরনারী মাঝেই মুক্তি স্নানের পূণ্যার্জনে বাস্তু। অনেক দিন পর রাম-কান্ত আবার এসে কীর্তনের মাঝে যোগ দেয়। হয়তো গ্রহণ-দানের মধ্যেই রয়েছে ওর যোগদানের উৎস। চাল, ডাল, টাকা, পয়সায় মিলিয়ে পাওয়া মন্দ হবে না। স্নানযাত্রী মাঝেই কিছু না কিছু দান করবে। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও চরের মানুষ আজ আবার প্রাণপ্রাচুর্যে মেতে উঠেছে। দুঃখ তো ওদের নিতাই লেগে আছে? পাপ থেকেই দুঃখের উৎপত্তি। আজকের এই পূণ্য দিনে নাম-গানে যদি সে পাপ কিছুটা দূর হয়। দীর্ঘর বাড়িতে এসেই সকলে জড় হয়। সেখান থেকে নগরকীর্তন বেরবে। সকলে মিলে একত্রে গ্রহণ-স্নান করবে।...

বেলা চারটে নাগাদ খোলে চাটি পড়ে। রামকান্তই আজ মূল গায়ন, দীঘু খোল ধরে। উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনির পর শুরু হয় নাম-গান। ভাবাবেগে নাচতে থাকে কেউ কেউ। সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্নানের ঘাটে এসে দাঁড়ায় কীর্তনের দল। ঝুমুরের তালে তালে চলে উচ্চকণ্ঠের নাম-গান। জয়ধ্বনি দিয়ে গান শেষ করে জলে নামতে যাবে সকলে, মেয়েদের ঘাট থেকে লোক ছুটে আসে। বউ-ঝিরা কেউ জলে নামতে পারছে না। 'গ্রীনবোট' প্রায় ঘাটের সংলগ্ন কবে বাঁধা হয়েছে। কীর্তনের মধ্যে ডুবে থাকায় এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। এবার ঘোরতর অসন্তোষ দেখা দেয়। চ্যাংড়াদের ভেতব কেউ কেউ ডিল ছুঁড়েই উপযুক্ত জবাব দিতে চায়। কিন্তু দীঘু বাধা দেয়। ও জানে ফল তাতে ভাল হবে না। সকলে রামকান্তকেই অতুরোধ করে, কুমার বাহাদুরকে 'বোট' অগুত্র সরিয়ে নিতে।

রামকান্ত মহা ফাঁপরে পড়ে। কুমার বাহাদুর তো দিব্যি বোটের ছাদের ওপর বসে ডেক-চেয়ারে দুলছেন। ইচ্ছে করেই তো মজা লুটছেন। বাধা দিয়ে ও কেন বিষ নজরে পড়তে যাবে! ওর কি দায় পড়েছে! ওর তো আর ঝি-বউ কেউ নেই!...মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে রামকান্ত, আমার তো মনে হয় নাম-গান শুনতেই এসেছেন উনি। কীর্তন ওঁর খুব প্রিয়। অনর্থক বাজে কথা বলে মেজাজ খাবাপ করে দেওয়া হবে। তার চেয়ে মেয়েরা গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে স্নান করে নিক।

উত্তর শুনে রাগে দীঘুর গা মাথা জলে উঠে। কোথায় কীর্তন আর কোথায় উনি! হাঁ করে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে শয়তান। ঢলে ঢলে সিগারেট ফুঁকছে। ভক্তি তো কত' একবার নেমে পর্যন্ত এল না। কীর্তন শুনছে না, ছাই। ভট্‌চাষ মিছেই ওর হয়ে ওকালতি করছেন। ভাগবত পাঠ করে এমন বেহেটটার সঙ্গে মেলামেশা করেন কি করে! আজকাল ওঁর নিজের চালচলনও ভাল ঠেকেছে না।—রামকান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে দীঘু নিজেই যায় ঘাটের দিকে। কীর্তনের দলের আরো জনকয়েক ওর সঙ্গ নেয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'বোটের' মাঝিদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি শুরু করে।

রমেশ্বরেরা যখন সবই লক্ষ্য করছিলেন। এ রকম একটা কিছুই জগতই অপেক্ষায় ছিলেন উনি। দাহু সর্দার গোড়াগোড়িই প্রস্তুত আছে। ডেক-চেয়ারে দুলতে দুলতেই দীঘুকে শুনিয়ে হালের মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি বলছে রে বিপিন?

বিপিন মনিবের মেজাজ বুকেই জোরালোভাবে সায় দেয়, পানসী ঘাটের খন সড়াইয়া নিবার কয় হজুর।

—কে বলছে এ কথা? রমেন্দ্রনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

হাত জোড় করে দীহু উত্তর করে, আইজ্ঞা, আমরাই কইছিলাম। ম্যায়া ছাইলারা ছান করবার পারচে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন, কেন, জলে কি কুমার আছে নাকি যে মেয়েরা স্নান করতে পারছে না! বোট ত্রো অনেকটা ফাঁকেই রয়েছে।

আইজ্ঞা হজুর, তাইলেও ম্যায়া ছাইলারা লজ্জা পাইবার নৈচে। দয়া কইরা একটু ফাঁকায় লইয়া যাইবার হুকুম ছান।

না না, এখন নোঙর তুলবার মতো লোক নেই। মাঝিরা ফিরলে দেখা যাবে'খন।

দীহু দেখছে, চার-পাঁচজন মাঝি গলুইর সামনে বসে হাতের কাজ করছে। নোঙর তুলতে বড় জোর ছ'জনের দরকার। কুমার বাহাদুর তাহলে ইচ্ছে করেই বদমাইসি করছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। কিন্তু ওর কিছু বলাব আগেই মদন লাফ দিয়ে জলের ওপর পড়ে একাই নোঙরের দড়ি ধবে টানতে থাকে।

মদনের সাহস দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ থ বনে যান। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে হুকুর ছাড়ে, ও শালা কেরে দাস্ত, বোটের কাছিতে হাত ছোঁয়ায়? মাঝি শালার মাথায় লাঠির বাড়ি।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু লাঠির বাড়ি মেরেই ক্ষান্ত থাকে না। চুলের মুঠি ধরে মদনকে বোটের ওপর তুলে এনে একটার পর একটা কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে।

গায়ের জোর মদনেরও কম নয় কিন্তু হকচকিয়ে গেছে বেচারী। ভাল বুকে নিজের হাতে নোঙর তুলতে গিয়ে যে অপরাধ করে ফেলেছে একথা ও ভাবতেই পারে না। দাস্ত যত না ওকে নাকে খত দেবার জন্তু চেঁচাচ্ছে ও ততোই রাগে ফুলছে। তন্নতো কুরুক্ষেত্র কাণ্ডই বাঁধবে।

দীহু ফাঁপরে পড়ে। পাড়ে মদনের মা দাপাদাপি করছে, পোলারে মাইরা ফালাইল। তোমরা যাও না গ, অরে ছাড়াইয়া আন...

দলের জোয়ান ছোকরারাও আবার ক্ষেপে ওঠে। মোড়ল হুকুম

করলেই একহাত দেখিয়ে দেবে। ও সর্দার-টর্দারের ভয় ওরা করে না। দীহুর বৃকের রক্তও টগবগিয়ে ওঠে। বেশ ভাল কথা, আজ শক্তির পবীক্ষাই হোক। রোজ রোজ এত জ্বালাতন ভাল লাগে না। যা'হোক একটা হেস্টনেস্ত হয়ে যাক।...কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার গরম রক্ত তিম শীতল হয়ে আসে। বণে আশু জয়লাভের সম্ভাবনা থাকলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কুমার বাহাদুরের এক তুড়িতে দলে দলে আসবে পুলিশ। প্রয়োজন হলে সৈন্য সাত্তীরও অভাব হবে না। দানবেব পদতাড়নায় চর ধ্বংস হয়ে যাবে—ধন প্রাণ হবে নিশ্চিহ্ন...সকলকে মাথা ঠাণ্ডা বাখাব উপদেশ দিয়ে দীহু একাই জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, বলে কয়ে মদনকে ছাড়িয়ে আনা।

কিন্তু উপস্থিত জোয়ানরা সে কথায় কান দেয় না। দীহুর সঙ্গে ওরাও জন কয়েক জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সাতাব কেটে তীব্র বেগে এগিয়ে যায় বোটের কাছে।

দীহু অল্প কাকেও কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই কুমার বাহাদুরের উদ্দেশ্যে কাকুতি জানায়, অরে ছাইড়া গান হজুর। আমি আপনার কাছে মাফ চাইচি। ছাইড়া গান...

দাহুর যতো হিম্মতই থাক চরের একগাছা লাঠির কাছেও সে দাঁড়াতে পারবে না! গত বাইচের সময়েই সে পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্ততরাং ফাঁপরে বামেন্দনারায়ণও পড়েন। ভেবেছিলেন, চোখ রাঙিয়েই ইজ্জত বজায় রাখবেন। কিন্তু দাহুর বাড়াবাড়িতে অবস্থা এখন সন্দীন হয়ে উঠেছে। গোয়ারগুলো হয়তো বোটখানাই পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবে। কে জানে, লাঠির ঘায়ে মাথাটাও চৌচির হয়ে যেতে পারে!...মানে মানে মদনকে ছেড়ে দেবার হুকুমই দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দাহু সে স্বযোগ দিলে না। দীহুর কাকুতির জবাবে ভেংচি কাটে, ছাইড়া দিমু কি তোমার ভয়ে নাকি বৈরাগী?

কতাবাত্তা হিসাব কইরা কও সর্দার। বালো অইব না, দীহুর কুঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

কি বালো অইব না! কি করবি তুই চাড়ালের পো?

লজ্জায় অপমানে দীহুর মাথার রক্ত বহ্নার দিয়ে ওঠে। মুখে আর কোন কথা না বলে কহুইতে ভর দিয়ে জলের ওপর থেকে এক লহমায় বোটের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন। দাহুর লাঠি উচিয়ে ধরাই সায় হয়।

কে যেন খাঁকা মেয়ে জলের ওপর ফেলে দেয় ওকে! অত্যাচারিণী পুতুলের মতোই চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতেও থাকে কেউ কেউ। রমেশ্বরনারায়ণ পেছনের গলুই দিয়ে নেমে গিয়ে পায়খানার মধ্যে আত্ম-গোপন করেও স্বস্তি পান না। জলের মধ্যেই হয়তো ডুবে মরতে হবে আজ। দাস্ত্র তো বেশ কয়েকবার নাকানি-চোবানি খেলে। দীক্ষু বাধা না দিলে মরেই যেতো বেচারী। চরের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে আজ। লাঠির বাড়িতে টুকরো করে ফেলবে বোট। আর নয়তো মাঝ গাঙে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে ওরা! আর নয়। শয়তান ওদের ঘরেব বউ-ঝিন্দেব ওপব নজব দিয়েছে। না, আজ আর কারো কথা শুনবে না ওরা! কোথায় পালালো শালা জানোয়ার!...পাড় থেকে আরো দলে দলে মানুষ সাঁতাব কেটে এসে বোট ঘেরাও করে। কেউ কেউ টিল ছুঁড়তেও শুরু করেছে। রামকান্ত প্রথম বার কয়েক খামাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনকয়েক ওর ওপরেও হামলা করবার উপক্রম করলে চূপচাপই গা ঢাকা দেয়। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। না, মানসন্ত্রম সবই গেলো। কুমার বাহাদুরেব কাছেও আর মুখ দেখানো যাবে না। চর ছেড়ে পালানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তাই যাবে ও। আর নয়, চের শিক্ষা হয়েছে।

দীক্ষু রামকান্তকেই খুঁজছিল। ওরা দু'জনেই যদি সমবেত চেষ্টায় ক্রুদ্ধ জনতাকে খামাতে পাবে। কিন্তু কোথায় গেলেন উনি!...জনতা ইতিমধ্যে অত্যাচারিণীদের ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। বোটের ওপরও হুমদাম করে লাঠি মারছে কেউ কেউ। জনকয়েক ঠেলে বোটটাকে মাঝ নদীতে নেবারই মতলব আঁটছে। একা দীক্ষু একজনকে আটকায় তো আর একজন এসে ফেটে পড়ে। ভাগ্যি ভাল যে আনন্দ এর মধ্যে নেই। সর্দি জরে দু'দিন বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে হাতে ভীষণ বেদনা। দীক্ষুকে একাকী বেসামাল দেখে বুড়োদের মধ্যে কে যেন ছুটে গিয়ে করিমকে খবর দেয়। করিম নামাজ পড়ছিল। খবর পেয়ে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসে। অনেক কষ্টে দুই মিতায় রমেশ্বরনারায়ণের সজ্জম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বোটখানারও এমন কিছু ক্ষতি হয়নি। সামান্ত দু'চার টাকা খরচ করলেই মেরামত হয়ে যাবে। মদনকে ছাড়িয়ে নিয়ে সকলে মিলে চলে আসে বোট ছেড়ে।

রমেশ্বরনারায়ণ ভয়ে এতক্ষণ কাঁপছিলেন। মুক্তি পেয়ে কূটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জানোয়ারদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারা শক্ত। বুদ্ধির

জোরেরেই ওদের মাথায় ডাঙা মারতে হবে। বোট যেমন আছে তেমনই থাকে। দাস্ত সর্দারকেও ভিজ্জে কাপড়-জামা ছাড়তে দেন না। বোটের জিনিসপত্র নিজেরাই উলচাল করে রাখেন। কিছু কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। তারপর নিজেই ডিঙ্গি নিয়ে যান থানায়।

চবের মানুষ ভেতরের ব্যাপার কিছুই টের পায় না। খানিকক্ষণ হৈ-ছল্লোড় করে যে যাব মতো স্নান করে বাড়ি ফেরে। কেউ কেউ দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাবুডুবু খায়। কিন্তু দীহুর উদ্বেগ বেড়ে যায়। অপমানিত হয়ে চূপ করে থাকার লোক বমেজ্ঞনারায়ণ নন। শীগগীরই এর সমুচিত জবাব আসছে। হয়তো ভিটেমাটি ছাড়াই কববেন। বাগে পেলে জান নিতেও কসুর করবেন না। কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই গ্রহের ফের। নিখাতা বোধ হয় ওদেব কপালে স্মৃথ লেখেন নি।...ভাবতে ভাবতে দীহুও একটা ডুব দিয়ে ঘাট থেকে উঠে যায়।

সন্ধ্যা সাতটা। গ্রহণের পব মাজা হাঁড়ি হেঁশেলে সবে রান্না চেপেছে। খেতে আজ একটু র্নাতই হবে। দীহু সামান্য একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খায়। করিমের বাড়ির দিকেই পা বাড়াতে যাবে এমন সময় চারদিক থেকে লাল পাগড়ি এসে হেঁকে ধরে। বমেজ্ঞনারায়ণের এজাহারে স্ববং রমণীমোহন এসেছেন সদলবলে। প্রকাশ্য দিবালোকে লুটপাট খন-জখম করার মজা এবার দেখিয়ে ছাড়বেন।...

রমণীমোহনের মুখের ওপর কোন কথা বলার স্বেযোগ পায় না দীহু। চবের সকল মানুষই থ বনে যায়। বলছেন কি দারোগাবাবু! খাজনা আদায় কবতে এসেছিলেন কুমার বাহাদুর, মোড়ল চরেব মানুষকে উসকিয়ে তাঁর দলিল দস্তাবেজ আশুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে—টাকা-কড়ি লুট করছে! মাথার ওপর কি ধর্ম নেই! নিজে বেহায়াপনা করলেন উণ্টো ওদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন! মা বোনদের ইজ্জৎ বাঁচাতে চরের মানুষ না হয় একটু মরিয়া হয়েই উঠেছিল। কিন্তু মোড়ল তো ওঁর মানসম্মত নষ্ট করতে দেয়নি। যেখানে লজ্জা পাওয়া উচিত উণ্টো নিজেই সেখানে গায়ে পড়ে থানা পুলিশ করছেন!...দীহুর মাথা বিমবিম করতে থাকে। হাত জোর করে ষতবার রমণীমোহনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলকে যায় রমণীমোহন ততোবারই ওর কথায় গর্জে ওঠেন। খন ডাকাতির অভিযোগে কোমরে দড়ি বেঁধেই টানতে টানতে থানায় নিয়ে চলেন। করিম, রহমৎ, মদন কেউ বাদ যায় না। একা আনন্দ ছাড়া চরে জোয়ান মানুষ আর কেউ থাকে না। হয়তো ওদের মনের ভুল।

কিংবা অল্প কোন কারণও হতে পারে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। সামনেই পাট কাটার মরশুম। হাত সকলেরই শূন্য। গোলায়ও কিছু বলতে কিছু নেই। না খেয়েই মরতে হবে সকলকে। ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই পচবে।

রমণীমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা ও রমেন্দ্রনারায়ণের পাকা মাথার চালে কেউ নিস্তার পায় না। রামকান্ত স্বয়ং সাক্ষী দেয়। ও স্বচক্ষে দেখেছে, করিম আর দীলু লোককে উসকিয়ে ‘বোট’ লুট করিয়েছে। কুমার বাহাদুরকে খুন করতেও চেষ্টা করেছিল। শুধু ভাগ্যগুণে উনি জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। দীলু সর্দারের আগ্রাণ চেষ্টাতেই তা সম্ভবপর হয়েছে। সে নিজের জীবন পণ করে মনিবকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই ওরা ষড়যন্ত্র করছিল। খাজনা দেবার নাম করে ডেকে এনে কাজ হাসিল করবে।...

রামকান্তর সাক্ষী গাফীতে দীলু করিমের ওপর পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অগ্নাগ্রদের কারো তিন বছর, এক বছর, ছ’মাস।

সাক্ষী দিয়ে বহাল তবিয়েতেই ফেরে রামকান্ত। তবে চরে আর নয়। সোজা রমেন্দ্রনারায়ণের কাছারিতে। নায়েবী না জুটলেও মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে খোদ মালিকের একান্ত সচিবের পদ জুটে যায়। এককালীন বকশিশ হিসেবেও মন্দ লাভ হয় না। আগেকার সমস্ত দায় দেনাই মাফ করে দেন কুমার বাহাদুর। ভিখারী রামকান্তর মনোবাক্স এতদিনে পূর্ণ হয়। আর ওকে অসভ্যের মতো ধেইধেই করে নাচতে হবে না। চাল চিঁড়েও আর চিবোতে হবে না। এবার প্রকাশ্যেই মাহ মাংস খেতে পারবে। হরির আখড়ার বাবাজী এখন যত খুশি শিষ্য করতে পারেন। ও আর চরে যাবে না। যদি যায়ও সে অগ্নভাবে। মনিবের আদায় ওয়াশিলের জগ্নই যাবে। গুরুগিরি, পুরুতগিরি আর জীবনে করবে না। না-না-না।

রায় দানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে যায় দীলু। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। হাকিমও বিচলিত হয়ে পড়েন। ধর্মান্তার ঠিকই বোঝেন, সব ষড়যন্ত্র। কিন্তু করার কিছু নেই। সাক্ষী প্রমাণে হাত-পা তাঁর বাঁধা। তবু সম্ভব মতো সুযোগ সুবিধা দিতে তিনি কল্পন করেন না। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে দীলুর ওপর। কয়েদী জীবনে হয়তো কঠোর শ্রমই করতে হবে ওকে। যে কাজ জানে না হয়তো সে কাজও করতে হবে।

না পারলে দাণ্ডাবেড়ী পড়বে। মেয়াদ আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।...হাকিম বাহাদুরের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়! সাধারণ জেলখানায় না পাঠিয়ে দীহুকে সোজাস্বজি উনি হসাপাতালেই পাঠিয়ে দেন। বড়ো মাহুষ, অপমানের ধকলটা সহিতে পারছে না। কে জানে, প্রাণে বাঁচবে কি না বেচারী...বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড়াতে থাকে ধর্মান্তারের।

দীহু অপमानে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও করিম অতো সহজে কাবু হয় না। মনের কোণে ঝড় বইতে থাকে। এই বিচারশালা! এরই নাম গ্রায় বিচার! বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে যারা উন্নত জনতার গতি রোধ করলো উর্টে তাদেরই শাস্তির ব্যবস্থা! না না, সংসারে ধর্ম বলে কোন বস্তু নেই। সব ভোজবাজী—খাপ্লা। বুদ্ধিই গ্রায় অগ্রায়ের মানদণ্ড। সে বুদ্ধি শুভ অশুভ খাই কেন হোক না। বুদ্ধির দৌলতেই মাহুষ, বাজা, প্রজা, উজীর, নাজির। ওরা বোকা। বুদ্ধির দাপটে নিতাইরা তাই ওদের বারে বারে ঠকায়— জেলে পাঠায়—জানে মারে। হাকিমও ওদের কথায় সায় দেন। কে আর সত্যাসত্যের বিচার করছেন! আল্লাহ্ থাকলে তিনিই বা এসব সহিবেন কেন! না, ওরকম কেউ কোথাও নেই। বুদ্ধিমান মাহুষই বোকা মাহুষকে ঠকাবার জন্য আল্লাহ্ ঈশ্বরের দোহাই পাড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুদ্ধিই সব। ঈশ্বর থাকলে তিনিও ওদের কাছে পরাজিত।—করিম চোখে মুখে অঙ্ককার দেখে। এতকাল যে হাতে একতারা বাজিয়ে প্রাণ খুলে গান করেছে ইচ্ছে করে, একতারা ছুঁড়ে ফেলে সে হাতে শয়তানগুলোর গলা টিপে ধরে। কিন্তু উপায় নেই। বুদ্ধিমানরা তার আগেই শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে ওকে। এখন তো ওদের হাতের ক্রীড়নক ও। ইচ্ছেমতো ধানি ঘুরাবে, ঘাস কাটাবে। ক্ষীণ করিম অসহায় অবস্থায় মনে মনেই দাপাতে থাকে। ছেলে, বউ, শিশু, সামস্ত আদালতে অনেকেই উপস্থিত আছে। কিন্তু কারো চোখেই চোখ রাখতে পারে না। জীবনে কারো কোনদিন এতটুকু অমঙ্গল চিন্তা করেনি। ভক্তিরত্নের দয়াল চানরে ডেকেছে, তারই পুরস্কার কি এই তস্কর-গভ্য লাঞ্ছনা! দম বন্ধ হয়ে আসে করিমের। মাথা নীচু করেই গিয়ে কয়েদী গাড়িতে ওঠে।

রমেশ্রনারায়ণ ওদের জেলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীহু চিরজনমের মতোই ওকে নিশ্চিন্ত করে যায়। আর কোনদিন ওকে

লাঠিয়াল দীহু বৈরাগীর কথা ভাবতে হবে না। চর নিয়েও আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কচকচে বালির টিপি এখন উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। সেলামী, নজরানা, খাজনা নির্বিঘ্নে আদায় হবে। এক একজনের নাকে দড়ি ধরে টান দেবে আর হুড়হুড় করে সব দখলে এসে যাবে। তারপর আবার বিলি-ব্যবস্থা আবার সেলামী, নজরানা। ঘৃণিচক্র। দেবে নেবে আবার দেবে।...

হাসপাতালে পৌঁছেই জ্ঞান ফিরে পায় দীহু। সমস্ত শরীর অবশ। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। ডাক্তারের নির্দেশে নাস' এক পেয়লা গরম দুধ নিয়ে আসে। কিন্তু দীহু এ পাপপূরীতে কিছু মুখে দেবে না। কি দরকার ওর চাক্সা হয়ে! জীবনের আর মূল্য কি। সাত পুরুষের নজিরে যা নেই ওর বরাতে শেষে তাই হলো! জেল—কাটক—কারাবাস! লোকে কথায় কথায় খোঁটা দেবে, খুনে, ডাকাতে, দাগী! না না, তা ও সহিতে পারবে না। কখনো না... হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে দীহু। দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলে। উঁচু মাথা নীচু হয়েছে—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সম্বন্ধই যদি গেলো তবে আর রইলো কি! না না, ও কিছু থাকে না। একজনের ছাড়া পৃথিবীতে আর ও কারো কোন অলুকাপা চায় না। সে হচ্ছে চিরশাস্তির অগ্রদূত মৃত্যু-দেবতার। একমাত্র মৃত্যুই ওকে সমস্ত জালা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পেয়লা হাতে সেধে সেধে নাসের হাত ধরে যায়। ধমক দিতেও কহুর করে না সে। কিন্তু দীহুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। দুধ থাকে ও কেমন করে? পেলো বরং বিষ খায়। কিন্তু কারাগারে কে দেবে ওকে সে মহামৃত! প্রাণের আবেগে নাসের হু'হাত চেপে ধরে, হৃদ আমি খামু না দিদি। দয়া কইরা আমারে একটু বিষ ছান। মইরা বাঁচি।...

নাস' আর ধমক দিতে পারে না। ওর বাপের বয়সী দীহু। চোখে মুখে সরলতার ছোপ। বেচারি নিশ্চয়ই মিথ্যে জালে জড়িয়ে পড়েছে। ব্যর্থ হয়ে দুধের কাণ চটেবিলেও ওপর রেখে ওয়ার্ড ইন্সপেক্টরকে খবর দিতে যায়। একে একে অনেকেই আসেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনরকম ভয় দেখিয়েও দীহুকে বসে আনা যায় না। দু'দিনে জলবিন্দু পৰ্বন্ত মুখে দেয়নি ও। শরীর ভেঙে পড়েছে। তিন দিনের দিন স্থির হয়, জোর করে ওকে ঠুঁরা ঝাওয়াবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর ঠুঁদের ও দিলে না। তিন দিনের দিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জন্মের মতো ও ফাঁকি দিলে।

সকাল ন'টা। বাবার অবস্থা আশংকাজনক সংবাদ পেয়ে অশ্বিনী মাকে সঙ্গে কবে জেলেই দীহুকে দেখতে আসে। বরাত ভাল যে গোলমালের সময় ও চরে ছিল না। পার্বতীকে সঙ্গে করে দিন কয়েকের জন্ত স্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। নয়তো ওকেও হাঙ্কামায় জড়িয়ে ফেলতো। এখন তো সব দিক থেকেই ওর ওপর দায়িত্ব এসে পড়ছে। বাড়ি-ঘর, ক্ষেতখামার সবই এর ভেতরে রমেন্দ্রনারায়ণ দখল করে নিয়েছে। মোড়লদের জেলে পাঠিয়ে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ করেনি শয়তান। সদস্তে হিটলারি অভিযান চালিয়েছে। একদিকে কয়েদী গাড়ি জেলের দিকে ছুটেছে আর দিকে আদালতের পাইক পেয়ালা চরের দিকে। বিনা বাধায় ডিক্রি জারি।

চর ছেড়ে চলেই যেতে হতো অশ্বিনীদেব। দীহুব নামে যা কিছু ছিল একে একে সবই নিলামে তোলেন রমেন্দ্রনারায়ণ। শুধু পারে না সামান্য একফালি জমি গ্রাস করতে। ও-টুকুন কুসুমের নামে আছে। আইনের বেড়াজালে সুরক্ষিত। বছর দুই আগে হরিহর তার ভিটেটুকু কুসুমকে লিখে দিয়ে গেছে। বংশীর মুখে মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি—খান দুই খড়ের ঘর। শেষ জীবন বড় কষ্টে গেছে হরিহরের। উপযুক্ত ছেলে, ওলাওঠায় চকিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ। সংসারে দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই। নিজের বাতের রুগী। শোক-তাপ আর পেট নিয়ে হিমশিম। দু'পাঁচ টাকা করে করে প্রায় শ'খানেক টাকা কর্ত্ত করে ফেলে কুসুমের কাছে। মা লক্ষ্মীর রূপায় কুসুমের সংসার তখন জমজমাট। প্রতিবেশী হরিহরকে ও টাকা ও দান হিসেবেই দেয়। দুঃখী মানুষ—ঘরের কোণে না খেয়ে থাকবে! না না, তা হতে পারে না। কি সুন্দর নামগান গায় হরিহর কীর্তনীয়া। এমন মানুষকে এক হাতে দিলে দশ হাতে ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীরই নির্দেশ এ। কুসুম কোন রকম দাবী-দাওয়া না রেখেই যখন যা পেরেছে দিয়েছে। কিন্তু হরিহর ঋণ মাথায় করে পারে যাবে না। অস্তিম মুহূর্তের আগেই ও ভিটেটুকু কুসুমের নামে লিখে দেয়। এ শুধু ঋণ শোধ নয়। কুসুম যদি ওর ভিটের দীপ জ্বালে তা হলে পরলোকে থেকেও ও সুখ পাবে। কে আর আছে ওর সংসারে। কুসুম তো ওর মেয়েও হতে পারতো।

আপত্তি জানাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে কুসুম। হরিহর স্বর্গে গেছে—পাঁচ বছর। কিন্তু ভিটের দীপ জ্বালা একটি দিনের জন্তও বাদ পড়েনি। পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে কুসুম। দীহুর গরু-বাছুর

হরিহরের বাড়িতেই থাকে। একজন রাখালও থাকে সেই সুবাদে। তাই শুধু দীপই জ্বলে না, হরিধ্বনিও পড়ে। কুসুম মাঝে মাঝে গিয়ে হরিহরের তুলসীমঞ্চ লেপে পুঁছে দিয়ে আসে। পালপার্বনে নিজে গিয়েই দীপ জ্বলে সন্ধ্যা দেখে—কীর্তিনিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

বড় বিচিত্র এ সংসার। বিধাতা যেন সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেন—হরিহর দেখে আশ্রয়। হ্যাঁ, একে আশ্রয়ই বলতে হবে! হরিহরের হাত দিয়ে বিধাতাই ওদের এ আশ্রয় লিখে দিয়েছিলেন। এ যেন রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা। তাড়া খেয়ে তাই আর বেশী ভাবতে হয় না। হোক সাজানো সংসার ছেড়ে কুটীরে বাস। তবু তো মাথা গুঁজবার ঠাই মিললো! এক হাতে চোখের জ্বল পুঁছে আর এক হাতে নতুন সংসার গুছোতে থাকে কুসুম। বজ্রাতরা লাগি মেবে অনেক জিনিস তছনচ করে দিয়েছে। তা দিক, দয়াল হরির দয়া থাকলে আবার সব হবে। অধিনী নিশি এখন বেশ বড় হয়েছে। ওরা দু'ভাইয়ে খাটলে ক'দিন আর লাগবে সব গোছগাছ করতে! সেবার তো ওদের বাপ একাই সব বুঁকি সামলালেন। কিন্তু উনি অতো ক্ষেপে পড়লেন কেন! এ ধরনের বিবাদ তো জীবনে কতবাবই গিয়েছে। এই ভাগ্য নিয়েই তো জন্মেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তো লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে। এ ওদের সকলের ভাগ্যের লিখন। এতে আবার মান-অপমানের কি আছে! চুবি-ডাকাতি তো আর করেন নি। ঋণ করেছেন তা শোধ দিতে পারেন নি। তাতে হয়েছে কি! না না, নিশির বাপের এ রকম জেদ অহেতুক। তাছাড়া জেল তো আর তাঁর একার হয়নি। চরের কোন ঘর আর বাদ গেছে? সকলে তো বেশ বুক ফুলিয়েই গব করছে। শয়তানের সঙ্গে সমানে যুঝে চরের ইচ্ছা বাঁচিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কেউ কোনদিন ওদের অপমান করতে সাহস পাবে না। আইনের বিচারে জেল হয়েছে—দু'দিন খেটে আসবে। কিন্তু ওরা তো জানে, কোন অন্ডায়ই ওরা করেনি।...ঠিকই তো। এতো গর্ব করবার মতোই ব্যাপার। তবে উনি এত ভেঙে পড়লেন কেন? স্বামীর অনাহারের খবর পেয়ে কুসুম মনে মনে বিরক্তই হয়। এ আবার একটা জেল নাকি। এতো গৌরবের জয়টিকা!...

কুসুম নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছিল, স্বামীকে দু'কথাতেই চাক্ষু করে তুলতে পারবে! কিন্তু জেলের দরজায় পা দিয়েই দমে যায়! শক্ত-সমর্থ মানুষটা

তিন-চারদিনে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দৈহিক জালা যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক উত্তেজনাটাই এর মূল কারণ। চিকিৎসকরা তাই বললেন। কিন্তু এদিকে যে মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। ওই সামান্য সময়ে পারবে কি ও মোড়লকে চাক্ষু করে তুলতে? যদি একটা দিনও ওকে এখানে থাকবার অহুমতি দিতেন কর্তৃপক্ষ। না, তা আর কোনরকমেই হবার নয়। অন্ততঃ এ যাত্রা তো নয়ই! আবার দরখাস্ত করলে যদি ওপরওয়ালারা মঞ্জুর করেন। এরা তো সকলেই তাঁর হুকুমের চাকর। ঘড়ি ধরে কাজ করবে।...ইতস্ততঃ করতে করতেই দীল্লুর বিছানার কাছে এগিয়ে যায় কুসুম। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কোন-দিনই বড় একটা ঘবের বার হয়নি, চারদিকের পরিবেশ দেখে শুনে সঙ্কোচ হতে থাকে। মাথার ঘোমটাটা আরো খানিকটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর গিয়ে বসে। অশ্বিনী চূপচাপই শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের দু'জনকে দেখে দীল্লু হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

কুসুম আঁচল দিয়ে চোখ মুঁছিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি কান্দ ক্যান? না পাইলে কি বাঁচবা?

কান্না থামিয়ে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে দীল্লু, না না, ই পাপ-পূরীতে আমি কিছু খামু না। তোমরা আমারে একটু বিষ আইনা ছাও...

পোলাপানের সামনে কি যা তা কও? অবুজ আইলা নাকি?—দৃঢ়তাব সঙ্গেই বাধা দেয় কুসুম।

হ হ, কামি অবুজই আইচি। ই পরান আর রাকুম না...বলতে বলতে বুকের ওপর জোরে জোরে কিল মারতে থাকে দীল্লু।

কুসুম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সান্ধ্বনা দেয়, অমুম কইর না। পোলার মুখের দিগে চাইবা না? তুমি মরলে অগ দেখব ক্যারা? দেখতে দেখতে না পাঁচটা বছর কাইটা যাইব।

কাইটা গেলেই কি! ই মুক আমি চরের মাইনষেরে ছাহামু কেমুন কইরা? হগলে আমার মুকে থুথু দিব না?

ক্যারা তোমার মুকে থুথু দিব! হগলে না তোমার স্খ্যাতিই করবার নৈচে। তুমিই না হগলের মান বাঁচাইচ।...

হ, চোর ডাকাইতের আবার স্খ্যাতি করবে নে মাইনষে! তোমবা আমারে পাগল পাইচ! ভোগা কথা বইলা বোকা বনাইবার চাও!...

অশ্বিনী এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। এবার মুখ খোলে, ভোগা কথা আমরা

কমু ক্যান, আদালতে ছাহ নাই চরের মাছুষ দল বাইল্লা তোমারে দেখবার আইছিল ? তারা না হগলেই হয় হয় করবার নৈচে ।

তারা তামাসা দেখবার আইছিল রে বাপ, তুই তাগ চিনচ নাই ।

তামসা দেখবার আইছিল ! তুমি কও কি । না খাইয়া খাইয়া তোমার মাখার ঠিক নাই ! তারা না অনেকেই তোমার লগে লগে জেলে আইচে ।

দীহু এবার আর কোন উত্তর করতে পারে না । খানিক চূপ করে থাকে ।

নাস এক পেয়ালা নেবুর রস নিয়ে আসে ।

অশ্বিনী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে অস্তরোধ করে, আর মন খারাপ কইর না । মাখার উপরে ভগবান আচে, ইয়ার বিচার করবই । খাইয়া লও । না খাইলে বাঁচবা কেমনে ?

দম ধরে ছিল দীহু, আবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে, না রে বাপ না, আমি আর বাঁচবার চাই না । আমারে আর খায়নের কতা কইচ না । বংশের কলঙ্ক আমি ।

তুমি না বাঁচলে আমরা দাড়ামু কুখায় ?

ঘরে যা বাপ—ঘরে যা । চেষ্টা কইরা ছাখ, ভিটা খামার রাখবার পারচ কিনা ।

অশ্বিনী জবাব দেবার আগে কুহুম ফেটে পড়ে, ঘরে যাইবার কও ঘর কি আর আচে । হাও না তারা কাইড়া নিচে ।

কি কইলা ! আমাকে ফাটকে পাঠাইয়াও তাগ শাস্তি অইল না ! দুইডা দিনও তোমাগ সময় দিল না ! বুচ্চি, ই সবই ঐ বজ্জাত ঠাকুরের কাম । খাল কাইটা আমিই কুমইর (কুমীর) আনচিলাম চরে । হগলেই মারব শয়তান । একবার যদি ছাড়া পাইতাম—চরে যদি একবার যাইবার পারতাম—চোধ মুখ রক্তবর্ণ করে গজরাতে থাকে দীহু ।

চৈচামেচি শুনে ওয়ার্ড ইনচার্জ দৌড়ে আসেন । ধমক দেবার আগেই দেখেন, মুখ বন্ধ হমে গেছে রুগীর । কুহুম অশ্বিনী ডুকরে ওঠে । ওয়ার্ড ইনচার্জ নাড়ী পরীক্ষা করে বোঝেন, দীহু আবার মুছাঁ গেছে । তাড়াতাড়ি ওষুধের ব্যবস্থায় ছুটে যান । সংবাদ পেয়ে স্পারিনটেনডেন্ট সাহেবও হাজির হন । কিন্তু জ্ঞান কিরে আসার আগেই কুহুম অশ্বিনীকে চলে আসতে হয় । কুহুম কান্নাকাটি করেও টিকতে পারে না । চোধের জল মুছতে মুছতেই বেরিয়ে আসে ।

পরদিন সকালে অশ্বিনী খোঁজ নিতে গিয়ে জানে, শেষ রাত্রে মারা গেছে

দীর্ঘ। সমস্ত দিনই অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। জ্ঞান যতক্ষণ থেকেছে, খুন করুম—খুন করুম, চীৎকারে গগন কাটিয়েছে। জোর করে পথ্য দেবার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা সম্ভবপর হয়নি। নিজের জেদ বজায় রেখেই চোখ বুজেছে মোড়ল।

এত শীগ্গীর বাবা ওদের ছেড়ে যাবে এ কথা ভাবতেও পারে নি অস্থিনী। সহসা মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কুসুমের কথা ভেবেই চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। বাবাকে তো হারালোই, মাকেও আর বাঁচাতে পারবে না। সন্দেহ আসার জগু ছটফট করছিলেন। এখন গিয়ে কি সাঙ্ঘনা দেবো। কিন্তু এ তো আর চাপবার কথা নয়। নির্মম কর্তব্য রয়েছে সম্মুখে। পিতার শেষ কাজ করতেই হবে। ...অস্থিনী দাঁতে দাঁত চেপেই যথাকর্তব্য করে যায়। কুসুমকে নিয়ে ওর যা আশংকা ছিল, ঠিক তা হয় না। কেমন যেন থ মেরে যায় বেচারী। কাঁদতে গিয়ে কাঁদতে পারে না। অস্থিনী একবার ভাবে, মার হলো কি! আবার ভেবে নিশ্চিত হয়, না না, কর্তব্য-কর্ম করতেই মা এখন বাস্তু। কান্নাকাটি করার তো যথেষ্টই সময় পাবে।...

সদর হাসপাতাল থেকে নৌকায় করে চরে নিয়ে আসে ওরা মোড়লকে। চরের এত বড় সুহৃদকে অল্প কোনখানে দাহ করা চলে না। সাবেকী বাড়ি ঘর দোর না থাকলেও চরে সামান্য একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই ওদের আছে। তা ছাড়া ধরতে গেলে গোটা চরই তো মোড়লের কর্মভূমি। ভিনদেশের পাকা শ্মশানের চেয়ে দেশের পলিমাটি ঢের ভাল। বড় দাগা পেয়েছে মোড়ল। স্নিগ্ধ-শীতল তটভূমিতে মর্মজালা জুড়াবে।...

পরের দিন ভোরে শব বোঝাই নৌকো চরে এসে লাগে। কুসুম এবার কান্নায় ফেটে পড়ে। অস্থিনীও ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। নিশি, পার্বতী, ময়না একে একে সকলেই এসে জড়ো হয়। বলতে গেলে চরের সকলেই মোড়লের আপনার জন। কান্নায় কান্নায় সমস্ত চর মুষড়ে পড়ে। চরের প্রকৃত জনককেই আজ হারালো ওরা। এবার তো দিনে দুপুরেই শেয়াল শকুনীর উৎপাত শুরু হবে। বৈরাগী ষালের মুখেই চিতা সাজানো হয়। আবাড়ের বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। খালও নতুন জলে টেট-টবুর। আকাশ খমখমে। অস্থিনী নিশির হাতের আঙুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোড়ল।

চরের সবল সুস্থ হেন জন নেই যে মোড়লের চিতার পাশে এসে দাঁড়ায়নি—

কিংবা অশ্রু বিসর্জন করেনি। সদল স্তম্ভ তো দূরের কথা অনেক রুগ্ন জনও কাতরাতে কাতরাতে এসে মোড়লের উদ্দেশ্যে দু' ফোটা অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়ে গেছে। আসেনি শুধু একজন। সে রামকান্ত। কেউ ওর কথা মুখেও আনে না। শয়তানকে সকলেই চিনেছে। বুড়ো-বুড়ীর মধ্যে জনকয়েক থুথুই ফেলে নচ্ছারের উদ্দেশ্যে। এমন বেইমানও মানুষ হতে পারে। বাপের বয়সী মোড়ল, বাপের মতো স্নেহ মমতা দিয়ে বিপদে আলগে রেখেছিল। শুধু স্নেহ-মমতাই নয়, হাজার ক্রটি থাকা সঙ্গেও গুরুজ্ঞানেই ওকে ভক্তি করেছে—সম্মান দিয়েছে। কিন্তু নিমকহারাম এত বড় কৃতঘ্ন যে, এমন মানুষের শেষ সময়ও একবার পাশে এসে দাঁড়ালো না। ছি ছি ছি, ওই আন্ত পশুটাকেই ওরা এতকাল ভক্তি করেছে, ভাগবতের আসরে বসিয়েছে! যাক, ভালই হয়েছে। মোড়লের শেষ কৃত্যের সময় যে পাষাণটা ধারে কাছে আসেনি এটা মঙ্গলেরই চিহ্ন। অস্তিম সময়ে মোড়ল ওর কুৎসিত রূপটা ঠিকই ধরে ফেলেছিলেন। শুনেছি, খুন করবার জগ্রে ক্ষেপেও উঠেছিলেন। সে উত্তেজনাতাই নাকি মোড়লের প্রাণ নাশ হয়েছে। পাষাণের মুখ দর্শনে পাপই হয়। ও না এসেছে ভালই হয়েছে।।...

অন্যপর সকলে ছি ছি করে শাস্ত হলেও অশ্বিনী অতো সহজে হাক্ক হতে পারে না। এর প্রতিশোধ ওর চাই। এ মৃত্যু নয়—রীতিমতো হত্যা। ষড়যন্ত্র করে রমেশন্দনারায়ণ আর রামকান্তই মোড়লকে মেরে ফেলেছে। ওরা দু'জনেই ঘাতক। ঘাতকের শাস্তি—প্রাণদণ্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোড়লের প্রাণের বিনিময়ে ওদের দু'জনকেও প্রাণ বলি দিতে হবে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—তা যেখানেই থাক পাষাণদের নিস্তার নেই। নিতাই সা-ও নিস্তার পায়নি, ওরাও পাবে না। এখন ঠিক বুঝতে পারছি, কেন ওসমানরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নিতাইকে খুন না করে কেন ওরা শাস্ত হতে পারছিল না? সে কি করে সম্ভব! পিতার প্রতি পুত্রের যে এ এক বিরাট কর্তব্য। এ কর্তব্য না করলে পিতৃতর্পণ কখনো সার্থক হবে না। স্বর্গেও তাঁর শাস্তি হবে না।...ভাবতে ভাবতে দু'চোখ রাঙা হয়ে ওঠে অশ্বিনীর। পারে তো এক্ষুণি হত্যাকারীর মুণ্ডু দু'টো কেটে এনে মোড়লের চিতায় আহুতি দেয়। কিন্তু না, এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। গুরু দশার সময় শরীরে হিংসা ছেঁদ রাখতে নেই। শ্রদ্ধা শাস্তি হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কত শক্তি ধরে নায়েব আর তার খোদ মনিব।...অশ্বিনী অনেক কষ্টে নিজকে সংযত রাখে।

দীর্ঘ মরে বাঁচে। কিন্তু করিমের সে-দিক থেকেও নিস্তার নেই। দীর্ঘর মতো ও-ও কোন খাণ্ডবস্ত্র মুখে দিতে পারছে না। লজ্জায়, অপমানে, হুংখে হুঁচোখ বেয়ে অবিবত জল ঝরছে। এমন বজ্জাতও মাহুষ হয়! একবার যদি ছাড়া পাই, শয়তান 'তু'টোর গলা টিপে মেরে ফেলবো না!... কোন হানে পলাইবা মশয়রা? যম তোমাগ লগেই আচে। এইত, এই—এই ধইরা ফালাইছি। ক্যা, এহন টেচাও ক্যা শালারা? বজ্জাতি করবার সময়ে মোনে আছিল না? মব—মর শালারা...ক্ষিপ্ত করিম নিজের গলা নিজেই টিপে ধরে। চোখ মুখ কেমন যেন বীভৎস হয়ে ওঠে। দু' চোয়াল বেয়ে অবিরত গেঁজলা বেবতে থাকে। জেল-প্রহরী থ বনে যায়। আরে, মিঞায় কি ক্ষেইপা গেলো নাকি। অমুন করচে ক্যান!...তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে দরজা খুলে গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে দিতে যায়। করিম ঝাঁকের নাথায় নিজের গলা চেড়ে দু'হাত দিয়ে সজোবে প্রহরীর গলা টিপে ধরে। হাঁ করে কামড়াতে যায় ওর নাকে মুখে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি পর বেচারী কোন রকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে দরজা বন্ধ কবে দেয়। তিল মাত্র দেরি না করে ঘন ঘন হইসল্ বাজাতে থাকে। সঙ্কেত শুনে আশপাশ থেকে আরো জনকয়েক প্রহরী এসে জড় হয়। সংবাদ পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবও আসেন। করিম ভূতলামি কবছে বলেই সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন উনি। জেলখানার নিয়নমাকিক দিনকয়েক কঠোরতা অবলম্বন করতেও কাঁপণ্য করেন না। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হয় না। করিম এখন ঘোর উন্মাদ। অনাহার অযত্নে দিন দিন কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠছে ও। কেউ কাছে গেলেই তেড়ে আসে। খেতে দিলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জেল ডাক্তার সর্বশেষ ওকে পাগলা গারদে পাঠাতেই মনস্থির করেন। আশ্চর্য, পাগলের ওবা নিজেই আজ পাগল। আর দয়াল চানের আসর বসবে না। তেল পড়া, জল পড়া নিতেও চরে আর কেউ কোনদিন আসবে না। চরের গুণীরা একে একে সকলেই ডুবছে।

॥ ৩২ ॥

আনন্দকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। রোজ বিকেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। গঞ্জের সরকারী ডাক্তারখানা থেকে দিনকয়েক ওষুধ এনে খেয়েছিল, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। লোকে বলে, কুইনাইনের বদলে অল্প তেতো থাকে মিকসচারে। শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে আনন্দর। নিয়ম করে দিন

কতক খাওয়া-দাওয়া করেও কল কিছু হচ্ছে না দেখে এখন আর কোন বাহ্যবিচার করে না। আর খাবেই বা কি? নিয়মিত দুটি মুন ভাতই তো জুটছে না। রুগীর খাওয়া কোথা থেকে আসবে! না না, আনন্দর আর ভাল লাগে না। মরে মরবে, এ নিয়ে আর কিছু ভাববে না ও। চর তো বীরশূর্যই হয়ে পড়েছে। ওরই বা বেঁচে থেকে লাভ কি? ভগবানের ইচ্ছে নয় চরের মানুষ খেয়ে-পরে সুখী হয়! এত পরিশ্রম করেও যখন দু'বেলা খাওয়া জুটছে না, তখন খেটে কোন লাভ নেই। রোগে ভাবনায় আনন্দ কাবু হয়ে পড়ে। ভাবনায় ভাবনায় দুর্গাও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। মোড়লের ঘরে মেয়ে দিয়ে ভেবেছিল, না জানি কত সুখ হবে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পবিহাস যে সুখ তো দূরের কথা এখন দিন চলাই ভার। বরাত যত মন্দই হোক, কুসুম বেয়ান ভাগাবতী। কোন যন্ত্রণাই ভোগ করলেন না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গে গেলেন সতীলক্ষ্মী। আমি হতভাগী—মহাপাপী। যমও আমাকে চোখে দেখছে না। জানি না, বিধাতার মনে আরো কি আছে। রামকান্ত তো দম ধরে আছে। শয়তান, চরকে জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। কি কুক্ষণেই না হতচ্ছাড়ার কাছে হাত পেতেছি। এখন তো আর ওর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করার কোন তাৎপর্যই নেই। চরসুন্দর মানুষ ওর বজ্জাতি ধরে ফেলেছে। আমাকে নিয়ে হয়তো ভীষণতরই একটা মতলব আঁটছে। কিন্তু উপায় কি? মেয়েটাকে একা ফেলে যাই-ই বা কোথায়?... ঠাকুর শয়ান দিয়ে দাওয়ার ওপর বসে একাকী ভাবছিল দুর্গা। দিগন্ত জুড়ে খাঁ খাঁ করছে খন অঙ্ককার। জন-মহুশ্বের সাড়াশব্দ নেই। দিন দুপুরেও এখন আর চরে কোনরকম হইচই শোনা যায় না। প্রাণচঞ্চল মানুষগুলো যেন প্রাণ হারিয়ে মরে আছে। কার্তিক মাস, পাল-পার্বণ নাম-গানে যে চর সন্না-সর্বদা মুখরিত থাকতো সে চর আজ নিপ্রাণ, নিপ্রভ। ককির সাহেবের মতো গুণী মানুষ কিনা শেষটায় পাগল হয়ে গেলেন! আর তা না হয়েই বা উপায় কি। শয়তানরা তো মিছিমিছিই জ্বালাতন শুরু করলে। মানুষ কত আর সহ করতে পারে। তা বেশ আছেন ককির সাহেব। সব ভুলে আছেন। আমাকে যদি পাগলও করতেন তগবান!.....না না, পাগল হয়ে আমার চলবে না। শয়তানরা আমার ময়না নিশির পেছু নেবে। ওদেরও হয়তো গলা টিপে মারবে। পাগল হবার আগে ওদের দুটিকে নিশ্চিন্ত করতে হবে। আনন্দ তো বলছে, খুন করবে রামকান্তকে। সেই ভাল, খুনই করুক শয়তানকে

ঘরের শত্রু বিভীষণ। ও-ই সব কিছু জ্বালাবে। ওকে শেষ করতে পারলেই চর নিশ্চিন্ত। আমার ময়না নিশিও স্থখে ঘর করতে পারবে।...উত্তেজনার দুর্গার সমস্ত শরীর রোমাঙ্কিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ একা আছে। যদি এসেই পড়ে শয়তানদের কেউ? রামকান্তকে তো আর চিনতে বাকী নেই। বল্লমটা হাতের কাছে থাকাই ভাল। মরতে হলে, মেরেই মরবো।...গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল দুর্গা, সদরে ক্যান্সার গলা শোনা যায়, বউ আচচ নাকিল, অ বউ.....

ক্যান্সার গলা শুনে কতকটা নিশ্চিন্ত হয় দুর্গা। যাক, দু'দণ্ড বসে কথাবার্তা বলা যাবে। চর তো এখন শাশান। ক্যান্সারটা আর যাই হোক মিশুক আছে। আচার-ব্যবহারও আজকাল মন্দ করছে না। আগেকার আচরণের জন্ত নিজেই গায়ে পড়ে খেদ করেছে। আব যাই হোক ওকে দেখে বুকে বল পাওয়া যায়। ডাক-হাঁক করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। রামকান্তর আদিখ্যেতা তো ও-ই বেশী করে করছে।...দুর্গা খোলা মনেই উত্তর করে, আচি দিদি, আহ। একা একা বালো লাগছিল না। ঘরে যাইবার নৈচিলাম।

অভ্যর্থনা পেয়ে ক্যান্সারও গদগদ হয়ে ওঠে, আর কচ্ ক্যান বইন। চবে এহন দিনে দুপইরে চলতে বয় (ভয়) করে।

হ দিদি, যা কইচ, গাটে (ঘাটে) পথে বাইরইতেও বুক কাঁপে এহন।

কইলাম ত তরে চম্পর ওহানে একবার ন (চল)। তুই ত আমার কতা কানেই ছাচ্ না। ই মুল্লকে হার মত গুণী কেউ নাই। এই যে এই গাচের শিকর টুকুন পইড়া দিচে, ইয়ার জোরেই না রাইত বিরাইত চইলা খাই। নইলে কি আর রক্ষা আছিল! কবে না ঘাড় মটকাইত! চম্প কয়, বড় জব্বর একজন আচে ই চরে, বলতে বলতে লাল স্নতো দিয়ে বাঁধা বাঁ হাতের মাহুলিটা দুর্গাকে দেখায় ক্যান্সার।

ক্যান্সার যুক্তিতে দুর্গা আগে কোনদিন সাড়া দিতে না পারলেও আজ আর কেন যেন প্রতিবাদ করতে পারে না।

ওকে নিরুত্তর দেখে ক্যান্সার পুনরায় আরম্ভ করে, তরা ত এতকাল করিম ফকিররে লইয়াই নাচানাচি করলি, কিন্তু কি অইল এহন? হার ঘাড়ও ত মটকাইল। বলি, দেও দস্তির দিটি, ও সব গান-বাজনার কুলাইব না। বৈরাগী মোড়লও হার পাচায় পাচায় খাইকাই মরল। একবার যদি

চম্পরে দিয়া একটা কিরা করাইত তবে কি আর ই দশা অহিত ? কোতায় পলাইত কুমার বাহাডর আর কোতায় পলাইত নিতাই সা। কপাল—কপাল, সবই কপালে করায়, কথা শেষ করে ক্ষ্যাস্ত নিজের কপালে করাঘাত করে।

দুর্গা এবার আর চূপ করে থাকতে পারে না। খোলাখুলিই উত্তর করে, হ দিদি, তোমার কতাই ঠিক। কপাল না অহিলে কি আর পলান ব্যাপারীর মতন মাইনষের ওরকম অয় ! পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান পোলা, একটাও চরে রইল না।

তবেই বোঝ, তামসাজা কি ! তবে কই বউ, এহনও সময় আছে, ম্যায়া জামাইয়ের মোঙ্গল যদি চাচ্ তয় চম্পর কাচে একবার ন। আনন্দর হালডাও ত দেখবার নৈচচ্, অহুক কল্পে কি আর অধৈদে কাম অহিত না ! অর উপুরেও তেনার নজর পড়চে। মোঙ্গল চাচ্ ত……

ক্ষ্যাস্ত মুখের কথা শেষ করতে পারে না। দুর্গা কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেয়, হ দিদি, তাই যামু। এহন কবে যাইবা তাই কও।

আর দেরি কইরা কাম কি ? সামনের অমাবস্তাতেই ন না ? ঐ দিনেই চম্পর লগে তেনার মোকাবিলা অয়।

তবে তাই নও। কিন্তু আনন্দ জানবার পারলে ত যাইবার দিবার চাইব না। ও ওসব ভূত-পেতনী বিশ্বাস করে না।

অরে তর কইয়া কাম কি ? চম্প দুপুর রাইতে পুজায় বহে। আমরা হার কিচুড়া আগে বাইরমু।

অত রাইতে একা একা যামু !

একা যামু ক্যান ! মোল্লার চরের জলধর মাজিও হার ম্যায়া বউ লইয়া যাইব। হারে কমুনে, আমাগ যান লইয়া যায়।

তয় ত (তা'হলে) কোন কতাই নাই। খালের মুকে (মুখে) নাও (নোন্সে) রাখলেই ইটুকুন পথ আমরা হাঁইটা যাইবার পারুম। আনন্দ ত বিচানায় পড়ে কি মরে।

তয় ত আর বাবনার (ভাবনার) কিচু নাই। এই কতাই রইল, আমি এহন উঠি। একা একা আর বাইরে থাকিচা না। পাড়া ত ইয়ার মদেই নিজরুম অইয়া পড়ল।

হেই কতাডাই আমারে কও। ঐ শব্দুরে লইয়াই অইচে আমার

লা। অর পরানে বয় (ভয়) ডর বইলা কিছু নাই।—আনন্দর উদ্দেশ্যে
ববক্তি প্রকাশ করে দুর্গা।

ক্ষ্যাস্ত সাস্তনা দেয়, কি আর করবি, তেনার নজর পড়চে বইলাই অরে
অমুন বাড়াবাড়িতে ধরচে। পূজা দিলেই মতিগতি বালো আইব। ওঠ
এহন, আর বাইরে থাকিচ না, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় ক্ষ্যাস্ত।

দুর্গার গাটা সত্যি আজ কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। চরে আছে
অনেক দিন। কিন্তু এরকম ভয় ওর কোনদিন করেনি। ক্ষ্যাস্ত উঠোনের
ওপব থাকতে থাকতেই ঘবেব দরজা বন্ধ কবে দেয়।

॥ ৩৩ ॥

কার্তিক মাস। জলে টান ধবেছে। বাতাসে শেওলা পচা দুর্গন্ধ। হাঁটা
পথে খালের মুখে যেতে হলে কাদা জল ভেঙেই তা যেতে হবে। ক্ষ্যাস্ত দুর্গা
তাই যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষ্যাস্ত খড়ের গাদার পেছনে এসে অপেক্ষা করবে।
আনন্দ ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি উঠে যাবে দুর্গা। তারপর দু'জনে মিলে
একসঙ্গে যাবে খালের 'মুখে। সেখান থেকে চম্পর ওখানে। সমস্ত ব্যবস্থাই
পাকাপাকি আছে।

সারাদিন উপোস দিয়ে আছে দুর্গা! এতে ওর কোন ক্লাস্তি নেই। একদিন
কেন, সংসারের আপদ তাড়াতে যদি আমরণও ওকে উপোস দিতে হয় তাহলেও
ও তা নিয়ে ভাববে না। ওর ভাবনা শুধু, ময়না নিশির কল্যাণ হবে কিনা—
আনন্দর জ্বর ছাড়বে কিনা। চম্পব দয়ায় পোড়া সংসারের শ্রী কিরে আসবে
কিনা...

অধিকাংশ দিনই আনন্দ সন্ধ্যা রাতে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জ্বর গায়ে
কোথাও বেরায় না। কিন্তু যেদিন জ্বর না আসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মাছ
ধবতে আর নয়তো তাস-পাশার আড্ডা দিতে যাবেই। একবার বেরুলে,
কিরবে আবার সেই ছপুর রাতে। দুর্গা এ নিয়ে অনেক বকেবকে দেখেছে,
কিন্তু কল কিছু হয় নি। দিন দিন কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছে আনন্দ।
তাছাড়া পুরুষ মাছধ, দিনরাত ঘরেই বা আবদ্ধ থাকে কি করে। ইদানীং
অনেকটা ঢিলই দিয়েছে দুর্গা। কিন্তু আজকের ভাবনা যে বড় ভাবনা।
আজ আনন্দ ঘরে না গেলে ও বেরবে কেমন করে? যাক, ভগবান ওর মুখ
রেখেছেন। আনন্দ খেয়ে-দেয়ে অল্পদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই ঘরে

গিয়েছে আজ। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে অসাড়ে। দুর্গা অন্তরে বল পায়।
লক্ষণ তো সব দিক দিয়ে শুভই মনে হচ্ছে। এখন জানেন মা কালাী।

রাত আত্মমানিক এগারোটা। গগন জুড়ে বিষাদ-ঘন অমাবস্তার গাঢ়
অন্ধকার। চর নিস্তর। হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। কোন জন-মানুষের সাদা
শব্দ নেই। ব্যাঙ-পোকা-মাকড়ের একটানা কলকণ্ঠে প্রহরে প্রহরে ভয়াল হয়ে
উঠছে অমাবস্তার রজনী। দুর্গা অন্ধকার ঘরে একা জেগে বসে আছে। সারাদিন
এলোমেলো ভাবনার মধ্যে কেটেছে। সত্যিই কি চম্পর ঝাড়ফুঁকে সমস্ত
বিপদ কাটবে? ভাগ্যের লিখন মানুষ খণ্ডাবে কি দিয়ে? বিধাতা তো
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কপালে ভাগ্যফল লিখে দেন। জীবনব্যাপী মানুষ জে
সেই পাশার ছকেই ঘোরে। তবে?...না না না, আর সংশয় নয়। ক্ষ্যাস্ত
বলেছে, চম্পর দয়ালু অনেকে অনেক ফল পেয়েছে। ভাগ্যই ওকে পথ
দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। আর ভাবনার কিছু নেই। চম্পর কাছেই
যাবে ও। দশজনের যদি শাস্তি হয়ে থাকে তবে ওর-ও হবে। কিন্তু ক্ষ্যাস্ত
এখনো আসছে না কেন? রাত তো গভীরই হলো। এই বেলা বেরিয়ে
পড়লে নিশ্চিন্তে ফেরা যেতো। আনন্দর ঘুম ভাঙবে আর সেই ভোর রাত্রে।
ভাবনায় ভাবনায় অস্বস্তি বোধ করে দুর্গা।

ক্ষ্যাস্ত নির্দিষ্ট সময়েই খড়ের গাদার পাশে এসে হাজির হয়েছে। অনেকক্ষণ
অপেক্ষাও করেছে। কিন্তু দুর্গার কোন সাদা শব্দ পায় নি। আন্তে আন্তে পা
টিপে টিপে তাই পূব দিকের জানালায় এসে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকে,
বউ, ওঠ, সময় অইচে। অ-বউ...

হঠাৎ জানালায় শব্দ হতে বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে দুর্গার। মই...
চোখ মেলে তাকাতে পারে না।

ক্ষ্যাস্ত পুনরায় তাড়া দেয়, কইল, উইঠা আয়! নাও যে অনেকক্ষণ
ধইরা ভিড়া রইচে।

এবার আর দুর্গার কোনরকম সংশয় থাকে না। চোখ মেলে তাকিয়ে
কিসকিস করে বাধা দেয়, চূপ, আন্তে কতা কও, আনন্দ জাইগা যাইব।

আইচ্ছা, তুই তড়াডাডি আয়। আর দেরি করিচ না।

দুর্গা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘরে তালাচাবি দিয়ে তাড়াডাডি বেরিয়ে পড়ে
আনন্দ এতক্ষণ সত্যি সত্যি ঘুমিয়েই ছিল, কিন্তু খানিক আগে জেগেছে
বড় অস্বস্তি বোধ করছে। বাম দিয়ে অর ছাড়তে শুরু হয়েছে। গা

মাথায় অসম্ভব জ্বালা। কিছুতেই বিছানায় থাকি যাচ্ছে না। গা থেকে কাঁথা কবল কলে দিয়ে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। হিমেল হাওয়ায় বেশ লাগে। বেশ স্নহই বোধ করছে এখন ও। কিন্তু হু'চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। পর পর তিন ছিলুম তামাক টেনে চূপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু না, ঘুম আর আসছেই না। বায়ু চড়ে গিয়েছে। গরমই বোধ হয়। উঠে গিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়। ওকি, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে এত রাতে দিদি যাচ্ছে কোথায়! হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদিই তো! তবে না একা একা বাড়ির ভেতরে থাকতেও রাতে ওর ভয় করে। আর এখন? এখন যে দিবিয় মুকু একা বাড়ির বার হয়ে চলেছেন! তবে কি...না না, একি ভাবছি আমি। দিদিকে অবিশ্বাস! জীবনে যাকে এতটুকু নিষ্ঠা হারাতে দেখিনি তার সম্বন্ধে পাপ চিন্তা করছি। ওকি, সঙ্গে ওটা আবার কে জুটল। ক্ষেস্তি ছিনালটা না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো ক্ষেস্তিই। ঐ তো সেই বাঁকা বাঁকা করে পা ফেলে চলেছে। তবে কি দিদি পাঁকেই ডুবছে!...আনন্দ আর স্থির থাকতে পারে না। মাথার রক্ত ঝংকার দিয়ে ওঠে। চূপি চূপি নিজেও খিল খলে বেরিয়ে পড়ে। বিপদের সঙ্গী লাঠিগাছা হাতে নিতে ভুল করে না। ভাবে, দিদি যদি সত্যি সত্যি পাপের পথেই পা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে সকলের আগে ওর মাথাটাই চোঁচির করে দেবে। বংশের কলঙ্কে আর জীবিত রাখবে না। দুরত্ব বজায় রেখে পেছ পেছই চলতে থাকে আনন্দ।

এক হাঁটু কাঁদা জল ভেঙে প্রায় খালের মুখে এসে পড়ে দুর্গা ক্ষ্যাস্ত। ঠাক ঘুরেই নৌকোয় গিয়ে উঠবে। না, ভাগ্য আজ সবদিক দিয়েই স্তম্ভসম। এতটা পথ এল কোন চেনাশুনো লোকের মুখোমুখি হতে হয়নি। মা হয়তো দতি আজ মুখ তুলে চাইছেন। এখন ভালয় ভালয় পূজা দিয়ে ফিরতে পারলেই নিশ্চিন্ত।...দুর্গা বৃকের বল নিয়েই পায়ের পর পা কলে এগুতে থাকে। ক্ষ্যাস্তও এগোয়। তবে পাশাপাশি নয়—পেছ পেছ। বুড়ো ঠাণ্ডা হয়তো তাল রাখতে পারছে না।...দুর্গার মনে কোন সংশয় নেই। আর কতটুকুই বা পথ। ঐ তো নৌকোর মাঙ্গল দেখা যাচ্ছে। যাক, সব ব্যবস্থাই তাহলে করে রেখেছে ক্ষ্যাস্তদি। পড়শীর ওপর সত্যি সত্যি তাহলে দরদ যাচ্ছে বেচারার।...তরতর করে খালের মুখে এসে বাঁক ঘোরে দুর্গা। কিন্তু মুকি! ঘাসী নৌকো কোথায়! এযে দেখছি গ্রীনবোট। তবে কি সবই জ্ঞাতি! ছিনালটা গেলো কোথায়?...পেছন কিরে চাইতেই শিউরে ওঠে

দুর্গা। ওকি, কাদের সঙ্গে কথা বলছে ও! ওরা তো সকলেই পুরুষ মানুষ। হাতে লাঠি, বল্লম, গ্যাট্রা-গোঁট্রা চেহারা! কুমার বাহাদুরেরই চাঁই হবে... সারাদিন উপোস গিয়েছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে চায় দুর্গা। মানুষ এমনও হতে পারে। ঠাকুর দেবতার নামেও বজ্জাতি!...নিশ্চিত বিপদ বুঝে দুর্বল শরীরেও প্রাণপণে ছুটতে যায়। ভরসা, কোনরকমে যদি চরার খাদে পড়ে চোঁচাতে পারে। চরের মানুষ যদি জড় হয়ে রক্ষা করে।...ক্রতই ছুটতে যায় দুর্গা। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারে না। পেছনের খাদে জনকয়েক দুর্বল লুকিয়েছিল, তেড়ে এসে হৃদিক থেকে দু'জন হাত চেপে ধরে। আ-ন-আনন্দ—শুধু একবারটি চোঁচাবার অবকাশ পায় ও। দুর্বত্তরা জোর করে মুখে কাপড় গুঁজে দক্ষ-অগত্যা শুধু হাত-পা ছোঁড়া ছুঁড়িই সার হয়।...

আনন্দ দূরে ছিল, চীৎকার শুনে লাফাতে লাফাতে এসে হুক্কার ছাড়ে। ক্ষ্যান্ত বেগতিক দেখে পালাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পারে না। আনন্দের শক্ত হাতের লাঠি সর্বপ্রথম ওর মাথার ওপরেই পড়ে। ফাঁপা পেঁপের ডালের মতো এক লহমায় মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্ষ্যান্ত। মাথা কেটে চৌচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাকশক্তি রহিত। কাটা পাঠার মতো শুধুই দাঁপাতে থাকে। ক্ষ্যান্তকে ছেড়ে দ্বিতীয় লাঠি উঁচিয়ে ধরে আনন্দ আর একজন দুর্বলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। তীরবেগে একটা বল্লম এসে ওর তলপেট ভেদ করে। একবারে এপিঠ ওপিঠ। অগ্ন কেউ হলে হয়তো এতেই কাবু হয়ে পড়তো, কিন্তু আনন্দ দমে না। ওর আপন দিদির ইজ্জৎ নষ্ট করছে শয়তানরা। জীবিত থাকতে কখনো ও এ অপমান সহ্য করবে না। বাঁ-হাত দিয়ে তল পেট চেপে ধরে ডান হাতে আবার লাঠি চালাতে উগ্গত হয়। আর্তস্বরে চোঁচাতে থাকে, বয় নাই দিদি, বয় নাই, আমি আইলাম, বয় নাই...

নিষ্ফল চেষ্টা, আবার আর একটা বল্লম এসে পাজরা ভেদ করে আনন্দের। চরফুটনগরের সেরা লাঠিয়াল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। কাতরাতে কাতরাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। দুর্গা পেছন কিরে দেখবারও সুযোগ পায় না।

কালরাত্রির শেষ প্রহর। দুর্গা ছাড়া পেয়েছে। দেহ ওর ক্ষতবিক্ষত। দেবার্চনার পুস্পে কুকুরে মূখ দিয়েছে। এ পুস্প দিয়ে আর দেব-পূজা হবে না। সারা গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। শয়তানগুলো যদি গলা টিপে মেরে ফেলতো ওকে। আরো কি চায় ওরা?...গ্রীনবোট থেকে কখন যে নেশে

এসেছে জানতেও পারেনি। জ্ঞান ফিরলে দেখে, বংশীর চরে একা পড়ে আছে। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে অমাবস্রাব ভয়াবহ অন্ধকার। তমিষ্রা রাক্ষুসী যেন গিলে খেতে আসছে ওকে। বেশ তাই থাক। বেঁচে থেকে আর লাভ কি? দেহ ওর অপবিত্র হয়ে গেছে। আর কারো কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ময়না নিশির কাছে তো নয়ই। একমাত্র মৃত্যুই ওকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু কেমন করে পাবে ও সে শাস্তির কোল?...টলতে টলতে খালের মুখে এসে দাঁড়ায় দুর্গা। ওকি, মাঝ গাঙে ও বিশ্বাস-বউ না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো বিশ্বাস বউই। দাঁড়াও—দাঁড়াও বিশ্বাস-বউ, যেয়ো না তুমি, আমি আসছি। লোকে তোমাকে কলঙ্কিনী বলে বলুক, আমি জানি, কেন তুমি ডুব দিয়েছিলে। তুমি দাঁড়াও—দাঁড়াও...টলতে টলতে সহসা পথ খুঁজে পায় দুর্গা। খালের মুখে দিন দুই আগে নন্দ মণ্ডলকে পোড়ানো হয়েছে। নন্দর শিয়রের মাটির কলসীটা আজো অথও আছে। দুর্গা ছুটে গিয়ে কলসীটা হাতে নেয়। জল ফেলে দিয়ে নিজের ঝাঁচল ছিঁড়ে গলার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। তারপর ধীবে বীরে গিয়ে নামে খালের মাঝে। বিশ্বাস-বউ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

॥ ৩৪ ॥

চরফুটনগর দিন দিন শ্মশান হয়ে উঠছে। একদিন চরের সমৃদ্ধি দেখে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল চরে ঘর বাঁধতে। আজ আবার ভয়ে অনেকেই পালাতে শুরু করেছে। মানইজ্জৎ রেখে চরে বাস করা এখন আর সম্ভবপর নয়। মোড়লরা একে একে সকলেই তলিয়ে গেলো। এবার চুনো-পুঁটিদের পালা। চরের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি জমি-জায়গাই রমেশ্রনারায়ণ আর নিতাইয়ের দল কেড়ে নিয়েছে। মধুর ভিটে মাটিতে ঘুঘু চরছে। ধনেপ্রাণে মারলে শয়তানরা। এখন আবার নতুন বিলি ব্যবস্থার তোড়জোড় চলেছে। ভিন গাঁয়ের লোকই আনাগোনা করছে এখন। চরের মানুষ ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে কাঠ। অশ্বিনী নিশি কোনরকমে নতুন ভিটটুকু আগলে আছে। চাষ আবাদ নেই, করবে কি? খাবে, পরবেই বা কি? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোন কিছুতেই আর থৈ পাওয়া যায় না। নিশি তো ঠায় বসে আছে। পেটে ভাতে সামান্য একটা রাখালের কাজও জুটছে না চরে। আর রাখবেই বা কে? সকলের অবস্থাই তো সমান। হালে কেউ পানি পাচ্ছে না। অশ্বিনী গঞ্জের

মহাজন হরিনাথ সাহার ইটের ভাঁটার কাজ নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে দৈনিক আট আনা মজুরী। নিশিও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হরিনাথ রাজী হয়নি। এত কম বয়সী ছোকরা খাটতে পারবে না।

মাত্র আট আনা পয়সা রোজগার। এ দিয়ে আর ছ'টা প্রাণীর পেট চলে কি করে? দৈনিক তিন চার সের চাল কিনতেই তো চার পাঁচ আনা ফুরিয়ে যায়! নিজেদের জ্ঞান কোনরকমে দুটি চাল ফুটিয়ে নিলেও কচি বাচ্চা দুটোর জন্মে ছিটে ফোঁটা দুধ না হলে নয়। একটা দুধেল গরুও যদি এ সময়ে সংসারে থাকতো! দ্বিতীয় ছেলে হবার পর পার্বতীর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ...চিন্তায় চিন্তায় দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখে অস্থিনী। একবার ভাবে, সব বেচে দিয়ে অন্ন কোথাও চলে যায়। এখানে এখন মানুষকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। আবার ভাবে, যাবেই বা কোথায়? পয়সা ছাড়া হুনিয়ায় কোথাও ঠাই নেই। তাছাড়া, মা বাবার স্মৃতি বিজড়িত এই চর। এখনও খালটা বাবার স্মৃতি বহন করছে। অল্পপর যে পালায় পালাক, বৈরাগী আর ফকির বংশের কেউ এ চর ছেড়ে যেতে পারে না। পারা উচিত নয়। যাদের উত্তর পুরুষ খালি হাতে সংগ্রাম করে চর গড়ে তুলেছে, তাদের বংশধররা ভয় পেয়ে চর ছেড়ে যাবে! লোকে তা হলে ভাববে কি? গায়ে মুখে খুঁখু দেবে না! বাবা ছিলেন একা। তবু তো আমার পেছনে নিশি রয়েছে। তবে কেন পালাবো। কেন শয়তানদের ভয় করবো?...উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে অস্থিনী। পিতৃ-তর্পণ এখনো বাকী। রামকান্ত হয়তো ভয় পেয়েই চর আর গঞ্জ ছেড়ে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রমেন্দ্র-নারায়ণের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারেনি লম্পট। কোথায় গিয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণ? সে শয়তান তো বহাল তবিয়েতেই চর আর কাছারি করছে। চরের বউ-ঝিরা হয়েছে এখন ওর লালসার টোপ। একবার যদি গুছিয়ে উঠতে পারি—নিশিটা যদি একটু কাজেকর্মে লাগতে পারে তাহলে একবার দেখে নেবো কত বড় বীর শয়তান। ...অনাহার অনিদ্রায়ও অস্থিনীর বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রই বাবাকে স্বপ্ন দেখছে। চরের জ্ঞান দিনরাত ভাবছে মোড়ল, স্বর্গে গিয়েও শাস্তি পাচ্ছে না। না না, চর ছেড়ে কোথাও যাবে না ওরা। না—না—না।

অস্থিনী দীর্ঘর মতোই সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। যা পাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে তা দিয়েই কোনরকমে কাটিয়ে দিচ্ছে। ধার দেনার ধারে কাছেও আর যাচ্ছে না। অবশ্য বেশী কিছু পাবার মতো ভরসাও নেই। হৃদধোররা ওর মুখের

দিকে চেয়ে একটা কানাকড়িও হাতছাড়া করবে না। সম্বল তো শুধু মাত্র ভিটেটুকু। এর বিনিময়ে কতই বা আর পাবে? না না, ও পাপ চিন্তা মনের কোণে ঠাঁই দেবে না ও। হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও বাবা একমাত্র এই ভুল করেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন। রাতারাতি বড় লোক হয়ে কাজ নেই ওর। হুন ভাত যা জোটে তাই খাবে। না জোটে না খেয়ে মরবে, তবু আর স্বন্দ্বখোরের দোর গোড়ায় যাবে না।...

চিত্তের যত দৃঢ়তাই থাক—ঋণ করা বোধ হয় ওদের ভাগ্যের লিখন। এতদিন যাহোক করে চলেছিল কিন্তু কাল হলো রোগ বালাই। পার্বতী স্মৃতিকায় কাবু হয়ে পড়েছে। নগদ পয়সা ভিন্ন ভোলা কবরেজের ধারে কাছেও যাবার উপায় নেই। মাসখানেক হলো ভাঁটার কাজও বন্ধ হয়ে আছে। জল কাদা না শুকোলে নতুন ইট আর পোড়াবে না হরিনাথ। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। অস্থিনী বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। সারা রাত হুঁচোথের পাতা এক করতে পারে না। ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলে গঞ্জের রসিক ঘোষের কাছে গিয়েই হাজির হয়। বড় ভয় ছিল প্রাণে, কে জানে, সময় বুঝে রসিকও বেকে বসবে কিনা? কিন্তু না, বেশী গরজ না দেখালেও একরকম বিনা তোষামোদেই রসিক রাজী হয়ে যায়। লোক ইদানীং আর কর্জ করতে আসছে না। স্বদের হারটা তাই একটু কম। টাকা প্রতি মাসিক মাত্র এক আনা। ডুখের মধ্যেও অস্থিনী মনে মনে কিছুটা সান্ত্বনাই পায়। কোনরকম জামিনদার কিংবা বাড়ি ঘর দোর রেহানের কথাও মুখে আনে না রসিক। শুধুমাত্র তমসুক কাগজে সহই করিয়ে নিয়েই নগদ পঁচিশটে টাকা দিয়ে দেয়। টাকা হাতে নিয়ে সকাল সকালই বাড়ি ফিরে আসে অস্থিনী। নিশিকে বলা তো দূরের কথা—পার্বতীকে পর্যন্ত কোন কিছু বলে না। থাক না থাক ঋণকে ওরা সকলেই বড় ভয় করে। অস্থিনীর নিজেরও বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। কিন্তু উপায় কি?...

অত্যন্ত হিসেব করেই টাকা খরচ করে অস্থিনী। যেটুকু না হলে নয় কেবলমাত্র সেটুকুই কেনা-কাটা করে। কিন্তু তাতেই বা পার-কুল কোথায়? মোটে তো পঁচিশটে টাকা। ওধু পথ্যে ক'দিনেই কতুর হয় যায়। ভাঁটার কাজ কবে শুরু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া সামান্য ঐ আয়ে খাবে পরবে, না ঋণ শোধ করবে?—কোন দিকেই পথ নেই। এক হতে পারে যদি মামার কথায় রাজী হয়। নিশিকে অনেক দিন থেকেই তার

কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্তু তাগিদ দিচ্ছে হরিহর মামা। সোনাকান্দা চরের সেও ছিল একদিন শক্তিশালী লাঠিয়াল। আনন্দর চেয়ে নাম-ডাক কম ছিল না। চাষ-আবাদও ছিল কিছু। কিন্তু কি হলো? অর্ধেক গিললো রান্ধুসী পদ্মা বাকী অর্ধেক হৃদখোররা। তারপরের দিন কতক তো উজ্জ্বলিত ছাড়া আর কিছুই জ্বোটেনি। আজো সে কথা মনে পড়লে গা ঘিন ঘিন করে হরিহরের। হারু চৌধুরীর বেটা চন্দ্র চৌধুরী কাজে নিয়েছিল ওকে। আপ খোরাকী ত্রিশ টাকা মাইনেতে সর্দারীর কাজ। দিনকতক যেতে না যেতেই বেটা বলে কি রোজ রাতে একজন করে পরের ঝি-বউ ধরে এনে দিতে হবে ওকে! শালায় বলে প্রজাপালক—জমিদার! লাখি মারো শালায় মুখে! সর্দারী করি বলে কি রে সামান্য ক'টা টাকার জন্তু ইহকাল পরকাল খোয়াবো! পরশ্বী মায়ের জাত নয়রে শালা? মববি শালা চৌত্রিশ কোটি নরকে পচে...রাগের মাথায় বাঁ করে একদিন কাজে ইস্তকা দিয়ে বসে হরিহর। খাবে কি, পারবে কি কিছুই ভাবে না। দিন গেলে অন্ততঃ পাঁচ সের চাল চাই সংসারে। কম করেও সব মিলিয়ে দশ বাবো গণ্ডা পয়সার দরকার। হরিহর ফ্যাসাদেই পড়ে।

না ভেবে-চিন্তে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল হরিহর—না ভেবে-চিন্তেই আবার চাকরি পায়। সেন বাড়ির বড়বাবু রাখাল সেন ফি বছর পূজোয় বাড়ি আসেন। সারা বছর একরকম বন্ধই থাকে সেন বাড়ি। একমাত্র পূজোর সময়েই যা সরগরম হয়ে ওঠে। মস্ত বড় পরিবার। ভাইদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় সরকারী চাকরে। জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারও কেউ কেউ। তবে সকলের চেয়ে রাখাল সেনের অবস্থাই ভাল। কোন চাকরি করে না রাখাল। গোটা দুই কোলিয়ারী আর চা-বাগানের মালিক। মস্ত বড় আপিস কোলকাতায়। গ্রামের অনেকেই তার আপিসে কাজ করে। খুব নাম-ডাক। ফি বছর এই একটি মাত্র উপলক্ষেই সেন বাড়ির সকলের সঙ্গে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যে যেখানেই থাক, পূজোর সময় সকলেই বাড়ি আসবে। খুব ঘটা করে পূজো হয়, নিজেদের পরিবারের মধ্যে থিয়েটার গান বাজনা চলে।

গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের কথা কানে যায় রাখালের। শুনে বড় কষ্ট পায় অন্তরে। জ্ঞানান মানুষ—আপদে বিপদে গ্রামের রক্ষক—হুটি ভাত পাচ্ছে না! পরদিন সকালেই হরিহরকে ডেকে পাঠাবে ভাবে, কিন্তু তার আর দরকার হয় না। হরিহর রাতেই ছুটে আসে বড়বাবুর চরণধূলি নিতে। এসেই আটকে পড়ে। পূজোর খাটাখাটুনী দেখাশুনো সবই ওকে করতে হবে।...

পূজো মিটে যায় কিন্তু হরিহর আজো ছাড়া পায়নি। কোলকাতার সদর আপিসের দারওয়ান সে। মাস মাইনে ষাট টাকা। বিনা ভাড়ায় থাকারও সুবন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে স্ত্রীপুত্র নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু হরিহর তা থাকে না। একাই থাকে। ইচ্ছে হলে তিন চার বছর পর স্ত্রী সারদা এক-আধ মাসের জন্ম বেড়িয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে ধুঁকছিল হরিহর আবার প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে পায়।

হরিহরের আপন মায়ের পেটের বোন কুসুম। সোভাগ্য নিয়েই বৈরাগী বাড়ির বউ হয়ে সংসারে ঢুকেছিল। কিন্তু বরাত মন্দ তাই কপালে বেশীদিন সুখ সহিলো না। যা হোক, একদিক দিয়ে ভাগ্যবতীই বলতে হবে কুসুমকে। বেশীদিন আর বৈধব্য ভোগ করলে না। কিন্তু পেটের দুটোর আজ একি হাল। করে-কন্মে দুটি ভাতও যে আজ খেতে পাচ্ছে না। নিশি, অশ্বিনীর কথা জানতে পেরে মনে বড় দাগা পায় হরিহর। বড় ভাগ্নে অশ্বিনীকে অনেকদিন থেকেই তাদা দিচ্ছে নিশিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অশ্বিনী আমার কথায় এতদিন কোন গা করেনি। ঐ তো একরত্তি নিশা, কখনো বাড়ির বাইরে যায়নি, ওকি কখনো একা একা বিদেশে বিড়ুঁইয়ে থাকতে পারবে? এতদিন তো নেহাত-ই ছেলে ছোকরা ছিল, দোঁড়কাঁপ করেই কেটেছে। এই তো সবে মাত্র বয়সে গা দিয়েছে। মনের সুখে ঘর-সংসার করবার কথা। তা যদি এই বয়সেই বিদেশে বিড়ুঁইয়ে থাকতে হয় তাহলে আর সুখ পাবে কবে? লোকেই বা বলবে কি? মা-বাবা নেই, ছোট ভাইটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বৈরাগীর বড় বেটা! না না, যা জোটে তাই খাবে, তবু ওকে বিদেশে পাঠানো চলবে না। মনের পোড়ানীতে ও তো মরবেই ময়নাও প্রাণে বাঁচবে না। কাজ নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে, অশ্বিনী সাত-পাঁচ ভেবে এ যাবৎ উড়িয়ে দিয়েই এসেছে আমার প্রস্তাব। কিন্তু আজ? আজ তো আর শুধু ভাবরাজ্যে বিরাজ করলে চলছে না! কর্জের টাকা একটি একটি করে সবই উজাড় হয়ে গেলো। ভাঁটার কাজ কবে চালু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে থাকলে যে উপোস দিয়েই মরবে ও! বিদেশে গিয়ে তবু ষদি প্রাণে বাঁচতে পারে। ময়নাকে নিয়ে গিয়ে যদি একটু সুখের মুখ দেখতে পারে...মনের সঙ্গে অনেক টানা-পোড়েনের পর মামাকে চিঠি দিতেই মনস্থির করে অশ্বিনী।

শীতের সকাল। দাওয়ার ওপর বসে রোদে পিঠ দিয়ে হুকো টানছিল অশ্বিনী। নিশিও পাশে বসেই রোদ পোয়াজে। রহসা নাম ধরে ডাকতে

ডাকতে এসে অশ্বিনীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায় ডাকপিয়ন। সপ্তাহে মাত্র দুদিন ডাক বিলি হয় চরে। নয়তো আরো দিন দুই আগেই চিঠিখানা পেতো অশ্বিনী। আহুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে হরিহরই উত্তর দিয়েছে। তার আপিসেই বেয়ারার কাজ করবে নিশি। মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। বিনা খরচায় থাকার জায়গাও পাবে। খেতে পরতে আর ক'টাকা লাগবে, বড় জোর আট-দশ টাকা। নিঃসন্দেহে প্রতি মাসে বিশ বাইশ টাকা বাড়ি পাঠাতে পারবে।...খিত্তিয়ে খিত্তিয়ে চিঠিখানা পড়ে অশ্বিনী ভাবতে পারে না, হাসবে কি কাঁদবে। পরের গোলামী করতে যাবে নিশা! তাও আবার বিদেশে বিড়্ইয়ে! বড় ভাই হয়ে একটা ছোট ভাই আর তার একবত্তি একটা বউকে দু'দিনও বসিয়ে খাওয়াতে পারলো না ও।...বেশ স্বাভাবিকভাবে বসেই হুকো টানছিল অশ্বিনী, সহসা হুঁচোথ চলছিলিয়ে ওঠে। বৃকের ভেতরে বসে কে যেন পাথর ভাঙতে থাকে।...

দাদার ভাবান্তর নিশিও লক্ষ্য করে। উতলা হয়েই শুধায়, কার চিঠি আইল দাদা? মামায় দিচে না?

অশ্বিনী মুখে কোন জবাব দিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানায়।

নিশি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিতে নিতে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, কি লেকচে হয়?

অশ্বিনী এবারও কোন জবাব দিতে পারে না। চিঠিখানা নিশির হাতে দিয়ে হুকোটা মাটিতে নামিয়ে রাখে।

চিঠি পড়তে পড়তে নিশির বৃকের ভিতরটা ছ্যাং করে ওঠে। তবে কি সত্যি সত্যিই ওকে বিদেশে যেতে হবে! মইনী বাঁচবে কি করে তাহলে!...হাসি হাসি মুখ এক নিমেষে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী আন সহ্য করতে পারে না। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যায়।

নিশি পদ্রমুহূর্তেই নিজকে সামলে নেয়। ক'দিন ধরে ও দেখে আসছে, দাদা বারমুখো হতে পারছে না। রসিক না করলেও গঞ্জের দোকানীরা তাগাদায় পর তাগাদা শুরু করেছে। হয়তো সামান্যই পাবে ওরা কিন্তু ঐ সামান্যই বা আসবে কোথেকে? রুজি-রোজগার যে কিছুই নেই। যত ছেলেমানুষই হোক—এটুকু বৃবে ওঠবার বয়স এখন ওর হয়েছে। অশ্বিনী উঠে দাঁড়াতেই নিশি গম্ভীরভাবে বলে, আমি কাঁইলই কলকাতায় যামু দাদা।

পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না অশ্বিনী। শাস্তভাবেই উত্তর দেয়-
কাইল যাবি কি রে। দিন খ্যান ছাহন লাগব না ?

দিন খ্যানের আবার কি আছে, জাহাজ ত গঞ্জের খনে রোজই ছাড়ে।
আমি কাইলই যামু।

অত উতালা আইচ না। আমি ত গঞ্জই যাইবার নৈচি, একবার যামুনে
কুঞ্জ গণকের কাছে। নতুন কামে যাবি, দিন খ্যান না দেখলে অয় !

তবে আইজই যাইয়, মামায় ত লেকচে দেরি করন যাইব না। হ্যবে
(শেষে) না আবার কাম খান চইলা যায়।

যাইব না রে যাইব না। তুই এহন খা গা, আমি আইজই যামুনে কুঞ্জের
কাচে, ধরা গলায় জবাব দিতে দিতে অশ্বিনী বেরিয়ে যায়। নিশি পাথরের
মতোই চূপচাপ বসে থাকে।

॥ ৩৫ ॥

“মঙ্গলের উষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।”

খনার বচনকেই সার করে কুঞ্জ গণক। কেন না, খুঁটিয়ে দিন দেখতে গেলে
আট দশ দিনের আগে কোন ভাল দিন নেই। কিন্তু অতো দেরি সইবে না
অশ্বিনীর। একে মামার তাড়া রয়েছে দ্বিতীয়তঃ ভাল সঙ্গী না পেলে কার সঙ্গে
পাঠাবে নিশিকে। একা একা ও কোলকাতা যেতে পারবে না। আসছে
বুধবারেই গঞ্জের পচু পোদ্দার মাল গস্ত করতে কোলকাতা যাচ্ছে। এই সবচেয়ে
ভাল সঙ্গী। সবদিক ভেবে-চিন্তে বুধবার ভোরেই যাত্রার দিন ধার্য হয়।

নিশি ওকে ছেড়ে কোলকাতা যাচ্ছে শুনে ময়না আর ময়নার মধ্যে নেই।
তিন দিন ভাল করে খায়নি, ঘুমোয়নি। রাতে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলেনি
নিশির সঙ্গে। বলে কি এরা! ছুটো ভাতের জন্ম মাহুষ বিদেশে বিভূঁইয়ে
যাবে! সেশ্রানে যদি কোন অস্থখ-বিস্থক করে! কে দেখবে তখন!...

এ ক’দিন দম ধরেই ছিল ময়না। আঘাটের মেঘের মতো থমথম করছিল
কচি মুখখানা। প্রকাশে তো দূরের কথা নিভৃত অরেও কান্নাকাটি করেনি। নিশি
কিছু বলতে গেলে মুখ ঝামটা দিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। অভিমানে ফুলে উঠেছে-
পাপড়ি পাপড়ি ঠোঁট ছুটি। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে

অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরতে থাকে ময়নার ছুঁচোখ দিয়ে। সারা রাতই প্রায় ফোঁপাতে থাকে। নিশির নিজের বুকখানাও বেদনায় টনটন করে ওঠে। সাস্কনা দেবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পায় না। ওরই কি ভাল লাগছে বিদেশে যেতে? বলতে গেলে তো এ নির্বাসনই। মেঘদূতের যক্ষের মতোই গোটা বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কিন্তু উপায় কি? যেতে যে ওকে হবেই। ময়নাকে দাদা বৌদিকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্তই যেতে হবে।...রাত ভোব হয়ে আসে, ধরা গলায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে নিশি, পাগলি কোন হানকার, কান্দ ক্যান? আমি তো রোজগার করবার লেইগাই যাইবার নৈচি। দেখবা, তোমাগ লেইগা কত সোন্দর সোন্দর জামা কাপড় পাঠামু। কাইন্দ না, নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে ময়নার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যায় নিশি।

ময়না এতক্ষণ আপন মনেই ফোঁপাচ্ছিল। ইন্ধন পেয়ে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে, চাই না আমি তোমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড়। তুমি ইহান খনে যাও যদি আমি গাচের মদেই ডুইবা মরুম।

পাগলি কোন হানকার, ওকতা মুকে আনতে নাই! আত্মহত্যা মহাপাতক, জিভ কেটে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে নিশি।

হউক মহাপাতক, তুমি একলা একলা গেলে আমি ডুইবাই মরুম।

তবে আর কি করুম, তুমি যখন বারণ কর তখন না-ই গেলাম। এইহানে খাইকাই হগলে মিলা না খাইয়া মরি, পাণ্টা অভিমানের সঙ্গেই জবাব দেয় নিশি।

ময়না দমে না। সমতা রেখেই পুনরায় যুক্তি দেখায়, মরবা ক্যানে? যেমুন খাইবার নৈচ তেমনই খাও পর না। কি কাম আমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড় পইরা?

গলার স্বর খাদে নামিয়ে নিশি বলে, যা খাই পরি, তা যদি জুঁত তবে কি আর ইহান খনে তোমাগ ছাইড়া যাইবার চাইতাম? দাদার মুকের দিকে চাইয়া ছাহ না, দিন দিন মুকখান কেমন শুকাইয়া যাইবার নৈচে। চেলা মাছের মতন রাইত দিনই ত পাওনাদাররা মাহুঘটারে ঠোকরাইবার নৈচে, বালো থাকব কেমন কইরা?

নিশির কথার জবাব দেবার মতো কোন যুক্তি ময়না খুঁজে পায় না। আবার নিজের মনকেও প্রবোধ দিতে পারে না। ঝরঝর করে শুধু জলই গড়াতে থাকে ছুঁচোখ দিয়ে।

নিশির চোখেও শ্রাবণের ধারা নামে। খানিকক্ষণ চূপ করেই অপেক্ষা করে। অবশেষে ধরা গলায় নৈর্ব্যক্তিভাবেই আরম্ভ করে নিশি, একটা বছর দেকতে দেকতে কাইটা যাইব। হার পরেই ত একমাস ছুটি পামু, তুমি অমুন কইর না। ছাহ নাই বছর শ্রাষে মামায় কত জিনিসপত্তর লইয়া বাড়ি আহে ?

আপন মনেই কাঁদছিল ময়না, নিশিব কথায় ঝাঁজিয়ে ওঠে, তুমি বারে বারে আমারে জিনিসপত্তরের নোব (লোভ) ছাহাইও না। আমি চাই না তোমাগ জিনিস।

আইছা আইছা, কোন জিনিসপত্তর না নিলা, পূজার পর মামীর লগে কলকাতায় যাইয়, অনেক তামসা দেইখা আইবাব পারবা। তোমার মনে নাই, হাবার মামী ঘুইরা আইহা কত গল্প কল্প ? আজব শহর কলকাতা। বুতাম টিপলে বাতি জলে, মাথার উপুর বন্বন্ কইবা পাখা ঘোরে, টেলিফুনে দুরের মাছুষ কানে কানে কতা কয়—তাজ্জব ব্যাপার, একটু হান্কাভাবেই কথা শেষ করে নিশি।

কাঁদছিল ময়না। নিশির হান্কা কথায় অনেকটা হান্কা হয়ে যায়। ঝাঁ করে উত্তর করে, পূজার ত এহনো অনেক দেরি।

দূর বোকা কোন হানকার! তুমি একেবারেই কিছু বুঝবার পার না। আগে আমি গিয়া বাসা ঠিক কল্পে ত যাইবা।

ময়না বুঝেও যেন বুঝে না। কথায় কথায় ভোর হয়ে আসে। কান্নার বেগ বেড়েই যায় ওর।

নিশি কোঁচার খুঁট দিয়ে ওর দুঁচোখ মুছিয়ে দিয়ে কাঁপের কাটি খুলে বেরুতে যায়।

ময়না তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। একটু পরেই তো যাত্রা করবে নিশি। দশজনের সামনে আর সুর্যোগ পাবে না।

বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে নিশির বৃকের ভেতরটা। জলভরা চোখেই দুঁহাত দিয়ে ময়নাকে বৃকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। আন্তে আন্তে মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

কাক ডাকার আগেই বাড়ি ছেড়ে ডিক্কিতে গিয়ে ওঠে নিশি।

প্রায় এক বছর রাখালের অধীনে কাজ করে চলেছে নিশি। ও ছাড়

আরো কয়েকজন আরদালি, চাপরাশি আপিসে কাজ করে। কিন্তু বয়সে ও-ই সকলের ছোট। রাখাল খুবই স্নেহ করে ওকে! খাসা গোল-গাল ছেলেটি, ভারি সুন্দর টানা টানা চোখ জোড়া।...রাখালের নির্দেশ, কোন শক্ত কাজে কিংবা বাইরের কোন ট্রাম-বাসের ঝামেলায় যেন ওকে কখনো পাঠানো না হয়। টেবিল পৌছা, দোয়াতে কালি দেওয়া, ফাই-করমাজ শোনাই শুধু নিশির কাজ। প্রথম দিনকতক বাড়ির জন্ম মনটা ভীষণ পোড়াতো নিশির। কাজকর্ম তো দূরের কথা রহস্যময়ী কোলকাতার কোন কিছুই ভাল লাগতো না ওর। রোজ একখানা করে চিঠি দিয়েছে ময়নাকে। বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি। এক কথা লিখতে বসলে সহস্র কথা মনে আসে। সব কথা হয়তো গুছিয়ে লেখাই হয় না। তবু প্রতি পত্রের জবাব ময়নার নিকট থেকে না এলে বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। অভিমানে জীবনে আর কখনো পত্র লিখবে না বলেও প্রতিজ্ঞা করে ফেলে! কিন্তু দম রাখতে পারে না। শহরে থেকে ওর পক্ষে রোজ পত্র লেখা সম্ভবপর হলেও ময়নার পক্ষে তা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। পাড়াগায়ে রোজ ডাকপিয়ন আসে না। তাছাড়া রোজ রোজ অতো পয়সাই বা কোথায় পাবে বেচারী?

...রাগ হয়েছিল নিশির আবার গলে জল হয়ে যায়। আবার একটার পর একটা পত্র লিখে যায়।

...ইদানীং অবশ্য নিশি জোড়া পোষ্টকার্ডই লিখতে শুরু করেছে। খামে লিখলেও ভেতরে আর একখানা খাম দিয়ে দেয়। একবার তো পাঁচ টাকার একখানা নোটই খামের ভিতরে দিয়ে দেয়। রোজ সকলের খবরাখবর না পেলে বিদেশ বিভূঁইয়ে ও একা একা থাকে কি করে?...

হালে আর অতোটা উতলা হচ্ছে না। ময়নার জন্ম, দাদা বোদির জন্ম মনটা সময় সময় পোড়ালেও অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। এখন শুধু চেষ্টা করছে, কি করে দুটো পয়সা বেশী উপায় করতে পারে। খেটে খেটে দাদার যে হাড়-মাস কালি হরে যাচ্ছে। দুটো পয়সা বেশী পাঠাতে পারলেই বেচারী একটু দম নিতে পারবে!...বড়বাবুকে খুশী করতে দোঁড়ের আগে কাজ করে নিশি। আশা, বছর ঘুরলে যদি ভাল বেতন বৃদ্ধি হয়!...

হরিহরের আড্ডায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই খোল বাজিয়ে কীর্তন হয়। আপিসের ছাড়ের ওপরেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। বেশ আরামেই আছে ওরা

মামা ভাগনেতে। কীর্তনে অগ্ন্যান্ত আপিসের চাপরাশি, আরদালিরাও অনেকে এসে যোগ দেয়। বিদেশে মনের আনন্দ উছলে পড়ে রসিকদের। নিশিও সকলের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়। ট্রাম, রিক্সা, দোতলা বাসে চড়েও দেখে পর পর। গেলো রোববার গন্ধার ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছে দেশবিদেশের সমুদ্রের জাহাজ। কত সব কলকল্লা। যেন ভাসমান দুর্গই এক একটা। ধর্মতলার এক সিনেমা হাউসে একদিন ছবি দেখিয়েও এনেছে হরিহর। তাঙ্কব ব্যাপার। ছবিব মধ্যে মাহুশ কথা কয়—হাসে, নাচে, গান গায়...শহর দেখে দেখে গায়ের ছোট্ট মাহুশটি হতবাকই হয়। মায়াবিনীর মায়ায় দেশের কথা অনেকটা ভুলেও যায়। সময় সময় ময়নার জন্ত মনটা পোড়ালেও এখন আর প্রতিদিন ওর চিঠি না পেলে তেমন ভাবে না। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ছু'খান রঙীন শাড়ী পাঠিয়ে দেয়, একখানা ময়নার আর একখানা পার্বতীর। অশ্বিনীর জন্তও মোটা ধুতি একজোড়া দিয়েছে। প্রতিমাসে নিয়মিত মনি-অর্ডারও করে আসছে। কিন্তু সংসার তবু অচল। ইটেব ভাটা উঠে গিয়েছে। অশ্বিনীর কাজ নেই। ওর এই সামান্য টাকা ক'টাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাতে কি আর চার পাঁচটা লোকের পেট ভরে? ছোট বাচ্চা দুটোর জন্ত কিছুটা দুধও চাই আবার। বৌদির শরীরটাও নাকি তেমন ভাল যাচ্ছে না। দাদা এই সব সাত পাঁচ চিন্তা করেই মামাকে নিজের চাকরির জন্ত লিখেছেন। বেচারার আর সুখ হলো না। তা মন্দ হয় না, মামা যদি ওকেও একটা চাকরি নিয়ে দিতে পারেন তাহলে সকলে মিলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। বৌদির সঙ্গে ময়নাও নিশ্চয় আসতে পারবে। কি হবে ছাই মিছিমিছি ভিটে আঁকড়ে থেকে? জমি-জমা সবই তো গিয়েছে, এখন শুধু ভিটেটুকু। তা পাড়া-প্রতিবেশীদের বললে তারা একটু লেপে-পুঁছে রাখবেই। দিনকতক এখানে এসে বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকলে শরীর সকলেরই ভাল হবে। মামাকে একবার বলেই দেখা যাক। বড়বাবুকে নিজেও বললে পারি। এতবড় আপিস, আর একটা লোকের জায়গা হবেই। তার আগে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। শেষ পর্যন্ত দাদা দেশ ছাড়তে রাজী হবেন কিনা সেটাও ভাল করে জানা দরকার...

আর এক মাস কাজ করলেই পুরো এক বছর কাজ হবে নিশির। তারপর নিয়ম-মাসিক এক মাস ছুটি পাবে। ছ'মাস আগে থেকেই দিন গুণতে থাকে

নিশি। মাস মাস নিয়মিত কুড়ি টাকা করে বাড়িতে পাঠিয়েও বকশিশ ইত্যাদিতে মিলিয়ে হাতে পঞ্চাশ টাকা জমেছে। বাড়ি যাবার সময় সকলের জ্ঞান জামা কাপড়, জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে শহরের আজব খাবারও কিছু কিছু মুগের পাপর, শন-পাপড়ি আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের কেক-বিস্কুট তো নিতেই হবে। বড়বাবু সেদিন একখানা কেক দিয়েছিলেন, কি চমৎকার খাবার! ময়না ধরতেই পারবে না, কি দিয়ে তৈরী। স্বন্দর খোশবু আর স্বাস্থ্য। ওর খানকয়েক নিতেই হবে। এক বছর শহরে কাজ হলো, খালি পায়েই বা যাবো কেন? আপিসের চাপরাশটী একদিন পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো না, কত বড়ো আপিসে কাজ করছি! আমাদের গায়ের কে পরেছে এমন জমকালো পোষাক! জুতো এক জোড়া নতুনই কিনতে হবে। বড়বাবু তো বলেছিলেন দেবেন, হয়তো ভুলে গেছেন। তাক বুঝে মনে করিয়ে দিলেই হলো। না, জুতো আর গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না। মুফতই পাওয়া যাবে।...নতুন একটা পেটরা কিনে ছ'মাস আগে থেকেই এক এক করে সব কিছু গুছিয়ে চলে নিশি। ময়নার জ্ঞান কাঁচের চুড়ি, স্ববাসিনী তরল আলতা, সিঁদুর, হিমালী কিছুই বাদ যায়নি। পার্বতীর জ্ঞানও এসবের আর এক প্রস্ত। শুধু হিমালী কিনেছে এক কোঁটো। ওটা আর খোলাখুলি বার করা যাবে না। বৌদি তো মাখবেনই না, উণ্টো লোক হাসাবেন। তার চেয়ে চুপি চুপি ময়নার গালে মাখিয়ে দেবো, সেই ভাল। হিমালী পেয়ে নিশ্চয় খুব খশী হবে ময়না। সাজ-গোজে তো ওর খুবই সখ।...

গত পরশু একবছর পূর্ণ হয়েছে। বড়বাবুর কাছে মৌখিক ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ক্যাশিয়ারবাবুকে ডেকে ছুটির মাসের মাইনে আগাম দেবার জ্ঞানও নির্দেশ দিয়েছেন উনি। জুতো এক জোড়াও না চাইতেই পাওয়া গেছে। নিশির আনন্দ ধরে না। পায়ে দিয়ে দু'দিন ছাড়ের ওপর হেঁটে দেখেছে। কাজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া চপ্পল দিয়েছিলেন বড়বাবু। কিন্তু সে তেমন পছন্দসই নয়। পায়ে দিতে ইচ্ছেই হতো না। কেমন যেন বুদ্ধটে ধরনের। এবার বেশ রুচি-মাফিক জুতো পাওয়া গেছে। কি স্বন্দর কাবুলি স্নাণ্ডাল জোড়া! রঙের জোলুসই বা কি! ভাল করে তাকালে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়।...অতি সাবধানে জুতো জোড়া পায়ে দেখে নিশি। একটু ধুলোবাগি লাগলে মাখা থেকে তেল নিয়ে ঘষে ফেলে। কেউ না দেখলে সরাসরি মাখার

ওপরেই ঘষে নেয়। দোষের মধ্যে পায় একটু লাগে। ও কিছু নয়, কু'দিন পরলেই সেরে যাবে। লোকানী তো কিনবার সময়েই বলে দিয়েছে। এ রকম জুতো চরফুটনগরের কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি। টুকিটাকি নিস অনেকই হয়েছে। কিন্তু জুতো জোড়াই নিশির সবচেয়ে পছন্দ। না, রাস্তাঘাটের জলকাদায় পায় দিয়ে নষ্ট করা চলবে না। যেমন জোলুস আছে ঠিক তেমনটিই থাকে চাই। চাপরাশ আর জুতো একসঙ্গে পরে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এখন যাবার দিন অল্পম ফোর্শালা থেকে চুলটা কাটিয়ে নিলেই হলো। কাউকে আর দেখতে হবে না। অল্প পর দুরের কথা, ময়নাই দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে।...ছুটির দরখাস্তখানা দস্তবাবুকে দিয়ে লেখিয়ে টুলের ওপর বসে স্বপ্ন জাল বুনতে থাকে নিশি। এখন বেলা দুটো, বড়বাবু ব্যস্ত আছেন। আর একটু পরে ভিড় কমলেই দরখাস্তখানা পেশ করবে। ছুটি তো হয়েই আছে, শুধু নিয়মরক্ষা। কাল আর আপিস করা হবে না। যাবার আগে একবার মা কালীর ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে। কাল ভোরে উঠে প্রথমেই যেতে হবে সেলুনে। তারপর স্নান করে সোজা মায়ের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে এক ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাঁধা-ছাদা করে সন্ধ্যা লাগতেই আবার রাত্রে খাওয়া খেয়ে রওনা হওয়া। বাবুদের সকলের সঙ্গে আজই দেখা-সাক্ষাৎ সেরে রাখতে হবে। কাল আর সময় হবে না। কেনাকাটার আর কিছু বাকী থাকলো কিনা মনে মনে সে হিসেবই করছিল নিশি, এমন সময় ওর নামে জরুরী এক 'তার' আসে। 'তার'! শুনে তো বুক শুকিয়ে ওঠে নিশির। কি সংবাদ আছে! তাড়াতাড়ি সই করে নিয়ে দস্তবাবুর হাতে দেয়। দস্তবাবু পড়তে থাকেন:

“অয়ার রুপিস্ ফিফটি, লেটার ফলোস্”.....

অধিনী।

স্বপ্ন দেখছিল নিশি...মুন্ডে পড়ে।

সংবাদটা হরিহরের কানেও পৌঁছায়। এক মাসের টাকা অগ্রিম নিয়ে বেতন বাবদ ষাট টাকা পেয়েছে নিশি! মামার পরামর্শ মতো টেলিগ্রাম মনি-অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকাই পাঠিয়ে দেয়। টেলিগ্রাম আর মনি-অর্ডার খরচা বাবদ আরো চার টাকা খরচ হয়ে যায়। হাতে থাকে মাত্র ছ'টাকা। দীর্ঘ দিনের জমানো পঞ্চাশ টাকা টুকিটাকি জিনিসের পেছনে অনেক আগেই খরচ হয়ে গেছে। ছ'টাকায় যে গাড়ি ভাড়ার খরচাও কুলোবে না। তা ছাড়া

দাদার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত রওনাই বা হবে কেমন করে!...হুশিস্তা দুর্ভাবনায় মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে নিশির। বাবুরা জল চাইলে কালির বোতল নিয়ে হাজির হয়। বড়বাবু কলিং বেল টিপে টিপে ক্ষেপে ওঠেন! সময়মতো হাজির না হওয়ায় এক টাকা জরিমানা করেন উনি। চাকরি জীবনে এই ওর প্রথম অপরাধ।

আপিস কখন ছুটি হয়ে গেছে জ্রক্ষেপ নেই। হরিহরের তাড়ায় কোন রকমে হাতের কাজ শেষ করে ওপরে উঠে আসে। চাপরাশ খুলে রেখে হাতে মুখে জল দিয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে লালদীঘির সবুজ ঘাসের ওপরে এসে বসে। সমস্ত দীঘিটাই যেন পাইপাই কবে ঘুরছে ওর চোখের ওপর। দাদা “তার” করেছেন, নিশ্চয় খুব বিপদ! ময়নার কোন অস্থখ করেনি তো? বোঁদিও তো অনেক দিন থেকে ভুগছেন! কে জানে, কি ঘটেছে! আর কিছু খরচ করে যদি টেলিগ্রামেই মোটামুটি খবরটা জানিয়ে দিতেন দাদা।...মনের উত্তাপে কোথাও ভাল লাগে না নিশির। হুশিস্তা মাথায় করে আবার বাসায়ই ফিরে আসে। হরিহর কিষেনচাঁদ বাবুর দারোয়ান চোবেজীর মজলিসে গেছে! ফাণ্ডা শুরু হয়েছে, এ কদিন ওখানেই আসর বসবে। ঘরে আলো না জ্বলে বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকে নিশি। দু’দিন দু’রাত্রি চোখে ঘুম নেই। তৃতীয় দিনের দিন বিকেলের ডাকে আসে অস্থিনীর চিঠি। বেশ বড় বড় হরপে লেখা!

চরফুটনগর

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

কল্যাণবরেষু

ভাই নিশি, সংসারের ঠেকায় দুই তিন কিস্তিতে রসিক ঘোষের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করিয়াছিলাম। সুদে আসলে উহা নাকি মোট একশত টাকা হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয় মুখে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া তলায় তলায় এক তরফা ডিগ্রি করিয়া বাড়ি ঘর ক্রোক করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক খোসামোদের পর হাতে পায়ে ধরিয়া খরচ বাবদ নগদ পনের টাকা দেওয়ায় এক মাসের সময় পাইয়াছি। পঞ্চাশ টাকা সাত দিনের মধ্যেই দিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। হাতে একটুও পয়সা নাই। সামনের হাটে চাউল কিনিতে হইবে। বিশেষ আর

কি। ভগবৎ রূপায় সকলেই আমরা শারীরিক কুশলে আছি। মামাকে প্রণাম জানাইও ও তুমি আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল বৈরাগী।

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে নিশির। পঞ্চাশ টাকা পাঠাতেই তো এক মাসের বেতন আগাম নেওয়া হয়ে গেছে। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোথেকে আসবে? তা ছাড়া এক্সুনি আরো দশ পাঁচ টাকা না পাঠালে সকলে মিলে উপোস করে মরবে। হায় কপাল, ঋণের পাপ কি আর জন্মেও ঘাড় থেকে নামবে না!...ছুটি নেবার আর গরজ থাকে না নিশির। দত্ত বাবুকে দিয়ে যে দরখাস্তপানা লেখিয়ে রেখেছিল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে চলে কুচিগুলো। দেখে দেখে হুঁচোখ জলে ভরে ওঠে নিশির। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আপিস আজ ছুটি। নয়তো এক্সুনি ও ছুটতো বড়বাবুর হাত-পা জড়িয়ে ধরতে। ছুটির মাস কাজ করলে আর এক মাসের মাইনে যদি বেশী দেন ওকে উনি।...মনের স্বপ্ন দিয়ে ছ'মাস ধরে যে জিনিসগুলো কিনেছিল, এক এক করে তার সবগুলোই পেটরা খুলে বার করতে থাকে। এগুলো বেচেও যদি নগদ কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কে আর কিনছে গুচ্ছের টুকটাকি জিনিস। খুব চেষ্টা করলে হয়তো হুঁপাঁচ টাকা পাওয়া যায়। দোকানীরা তো শাঁকের করাত। যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে। তাতে আবার বেশীর ভাগ জিনিসই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা। হয়তো মাটির দরেও কেউ নিতে চাইবে না।...হতাশায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে নিশির।

হরিহর আজো চোবেজীর মজলিসে গিয়েই জমেছে। হয়তো রাত্রে আর কিরবেই না। হোলি উৎসব—সারা রাতই গান-বাজনা চলার কথা। খানা-পিনাও ওখানেই করবে। নিশি একা বাসায়। ছোট ছোট ছুটি কুঠরি! একটাতে রান্না খাওয়া হয় আর একটাতে মামা ভাগনে শোয়। জল-কলও ওপরেই আছে। ছাদের আলসেতে দাঁড়ালে স্বন্দর গন্ধ দেখা যায়। ঘরের ভেতরে আর ভাল লাগে না নিশির। মনের আবেগে বাইরে এসে দাঁড়ায়। আলসেতে ভর করে সোজা গন্ধার দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় বলমল করছে হিল্লোলিত গন্ধ। হুঁধারের কল-কারখানাগুলো সবই আজ বন্ধ। হোলির ছুটি

ପ୍ରାଣଗଙ୍ଗା

ଶ୍ରୀଅବିନାଶ ମାହା

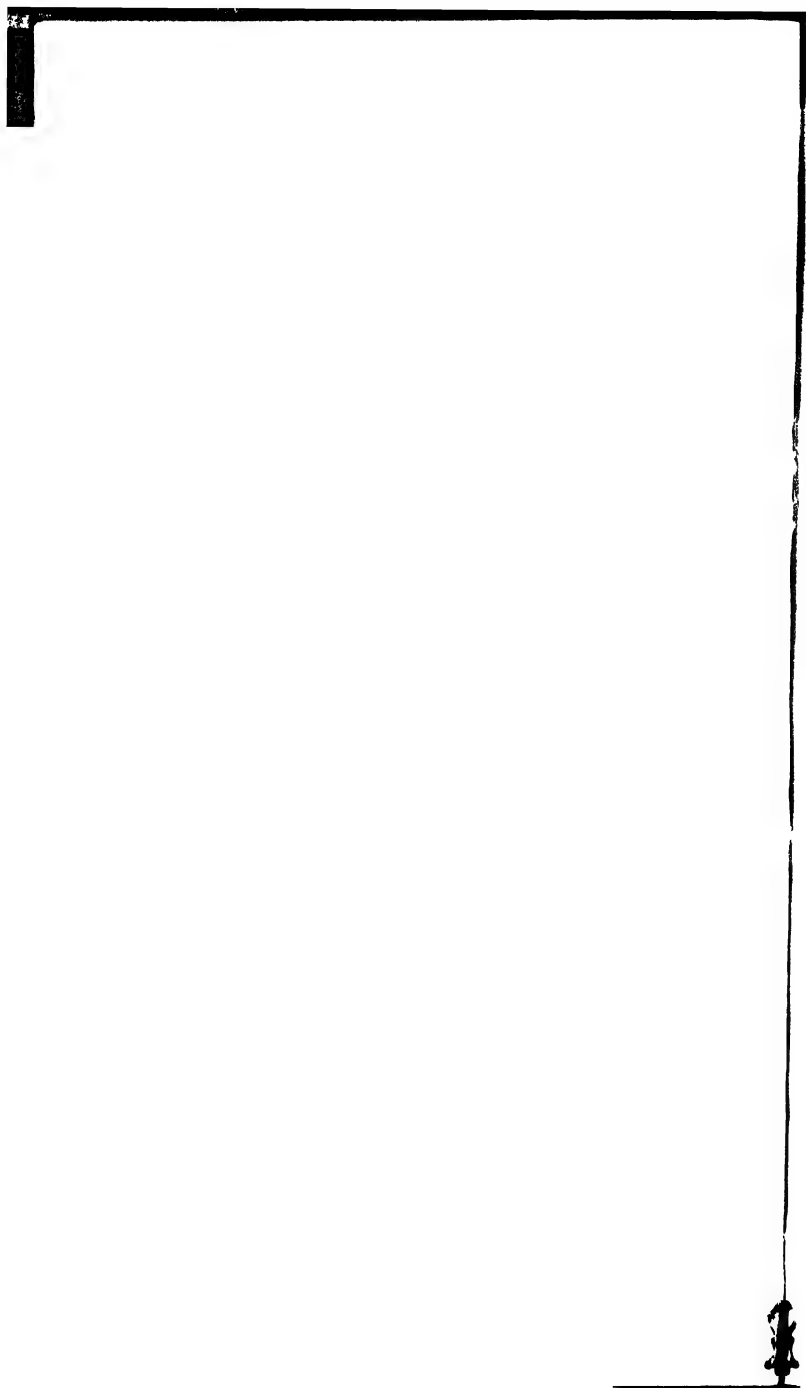
ଅ

ନବର ଶ୍ରୀକାମନ । କଳିକାତା-୬

প্রথম সংস্করণ : জন্মোষ্টমী, ১৩৬৩

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২৬১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে
গৌর মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩বিনোদবিহারী সাহা
স্মরণে



জনা দেয় নি বিধাতা—
তোমাব গান দিয়েছে আমাব স্বপ্নে
ঝড়ো আকাশে উড়ো প্রাণেব পাগলামি

॥ লেখকের অন্ত্যস্ত বই ॥
॥ নির্ধাচিত গল্প ॥
॥ নবজন্ম ॥
॥ ঢাকাই গল্প, জীবন দেবতা, অন্তরাল ॥
॥ খুম মঞ্জিল, রক্ত গোলাপ, তরঙ্গ ॥
॥ ছোটদের গল্পগুচ্ছ, বসন্ত রাগ ॥
॥ বসন্ত বিদায়, পূবের আকাশ ॥
॥ নবীন যাত্রী ॥
॥ জয়া ॥

জ্যেষ্ঠের মাঝামাঝি। দিন দিন ভয়াল হয়ে উঠছে পদ্মা। এক পারে
দাঁড়ালে আব-এক পার দেখা যায় না। যেন আকাশ গঙ্গাই স্বর্গেব সিঁড়ি বেয়ে
দিগন্তে নেমে আসছে।

দীপ্ত অন্তরে কেঁপে ওঠে। মাসে ভক্তি দান পাট। গোটা বছরের মুখের গ্রাস
ঐ শস্ত্র ভাণ্ডার। বৃকের রক্ত আব হাতের শেষ সম্বল পণ কবে সমস্ত ঋতু চাষ
আবাদ কবেছে। মহাজনের কাছে ঋণও হয়েছে কিছু। চড়া হুদ। একমাত্র
তবসা ঐ দান আর পাট। মা লক্ষ্মীব রূপায় ফলন বেশ ভালই হয়েছে।
সামনের আর দুটো মাস ওত্বালেই ভক্তি হবে লক্ষ্মী-গোলা, হাঁড়ি—কলসী—
ছালা। লক্ষ্মী-গোলাব ধানে পূজা হবে লক্ষ্মীদেবীর। আত্মীয়স্বজন আসবে।
যাত্রাগান, কবিগানে মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ি। শুরু হবে বছরের আনন্দ
উৎসব। তারপর ধর্মমাস কাতিক মাসে আবার অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, মণ
মণ চালের মহোৎসব। নিমন্ত্রণ যাবে আশ পাশের সমস্ত গায়ে। দলে দলে
আসবেন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা। প্রহরে প্রহরে গান করবেন, হুঁবাহ
বল নাচবেন, পাতঙ্কড়ে পরিবেশিত হবে সুগন্ধি অন্নের মহাপ্রসাদ।...মোড়ল
দীপ্ত অন্নাগ্ন বছরের মতো এবারও স্বপ্ন দেখে। বেশ একটু রং চড়িয়েই দেখে।
অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপ্পান্ন প্রহর নাম-যজ্ঞ হবে এবার। ওর ঠাকুরদার আমলে
একবার হয়েছিল। দশ গায়ের লোক এখনো তার স্মৃতি করে। ভাগ্য
সুপ্রসন্ন হলে এবারও তাই হবে...

আমাতে পদ্মা আরও ফুলে ওঠে। নাগিনীর জিভের মতোই লক লক
করছে অনন্ত জলরাশি। দিন রাত ফোস-ফোসানীর বিরাম নেই। বছর
কয়েক ওপারের চরই ভাঙছিল। কিন্তু এবারের দৃষ্টি যেন কাশীপুরের দিকেই।
জল যতো বাড়ছে চাপ চাপ জমি হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তীর থেকে। যেন হাঁ
করে ব্যাঙ গিলছে নাগিনী।

নদীর উচ্ছলতায় ভাবনা বেড়ে যায় দীহর। পদ্মার পারের চাষী মাত্রই
জানে, রানুসীর ভাঙন কি সর্বনেশে। রাতারাতি গ্রামকে গ্রাম সাক। ছোট-
বেলায় একবার ভীষণ কাঁড়া গেছে ওর। সেও ছিল আবার মাস। বুট্‌বুটে

অমাবস্তার অন্ধকার। পদ্মা ওদের বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে। ঘরে গবম বলে সকলেই ওরা নৌকোর ওপর শুয়েছে। শ্রোতের তোড়ে মাদল বাজছে পদ্মার বুকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে যে যার মতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হবতো স্বপ্নের স্বপ্নই দেখতে থাকে। হঠাৎ বিকট শব্দে দুপুর রাতে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। গরু, বাছুর, চাগল, ভেড়া, মাল্লুস সব একসঙ্গে আর্তনাদে কেটে পড়ছে। গম্ গম্ শব্দ উঠছে মাটির ভেতর থেকে। ভূমিকম্পই যেন হচ্ছে পাতালে। ঘরদোর, গাছপালা, বন বন মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে। মাটি ফেটে চৌচিব। মাইল খানেক জুড়ে বিবাট এক চাপ তলিয়ে যাচ্ছে, রূপকথার গল্পই যেন। মর্তের সকল মাল্লুস একযোগে দল বেঁধে যেন পাতালে প্রবেশ করছে...

জীবনের মায়ায় সপ ফেলে যে যে দিকে পারছে পালাচ্ছে। হাস, মুবগী, গরু, বাছুর উর্ধ্বাঙ্গে দৌড়াচ্ছে। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে ওরা নৌকোর ওপর। দীঘুর বাবা বিপিন লাক দিয়ে মাটিতে পড়তে যায়। দান রজনীনাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, খপ করে চেপে ধরে জোয়ান ছেলের হাত। ওতো মাটি নয়, ফুটো বলসী—একুনি তলিয়ে যাবে। জমি-জিরাত, গরু বাছুর, তৈজস সব ষাক। জীবনে বাঁচলে সব হবে আবার। তাই বলে জেনেগুন ধনের সঙ্গে প্রাণ দেবে নাকি মাল্লুস! বজনীনাথ নিজেই উত্তোগী হয়ে নৌকোর কাছি খোলে। একুনি গিয়ে মাঝ নদীতে পৌঁছোনো চাই। নয়তো আবারের টানে নৌকো-স্বপ্ন গিলে ফেলবে রাফুসী। বাপ-বেটায় তাড়াতাড়ি হালে চাড় দিয়ে এগুতে থাকে।

বিপিন স্বর্গে গিয়েছে। মহাজনের ঋণ ছাড়া উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি দীঘুর। চাষীর বরাতে এ তো বিধির লিখন। তবু উদয়াস্ত খেটেই চলে দীঘু। পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়। ঋণ শোধ হয়েও কিছুদিনের মধ্যেই আবার মা লক্ষীর আসন পাকা হয়। চাষের জাম, টিনের দর, গরু, বাছুর—নিয়ে সোনার সংসার।...সেই সংসারে আবার ইদানীং কাটল দেখা দিয়েছে। পদ্মার বুকে আবার সেই তুলক্ষণ ধনিয়ে আসছে। রাফুসী মার-মুখো হয়ে উঠছে দিন দিন। গেরয়া রঙের জলের ওপর এবারও কালচে ছোপ পড়ছে। f ক সেই একই-রকম তর্জন গর্জন। ধানের ক্ষেতে শীঘ্র দেখা দিয়েছে। কচি সবুজ শীঘ্র। টিপলে সাদা দুধ বেরোয়। মাস খানেক পরে পাটও ঘরে উঠবে। কিন্তু পদ্মা যে এরই ভেতর কণা তুলে খেয়ে আসছে।

মোড়ল দীঘুর বাড়িতে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়। সকলে মিলে টাঙ্গা তুলে গন্ধাদেবীর পূজা আরম্ভ করে। জোড়া পাঠা, কচি ডাব, দুধ, বি, চিনি ষার বেনম

সাধা গলবস্ত্র হ'য় মানত কবে জুঙ্গ দেবতার উদ্দেশ্যে। পুবোহিতরা অহোরাত্র মা গঙ্গার স্তোত্র পাঠে তন্ময়। প্রতি সন্ধ্যায় ঘাটে ঘাটে বীপ জেলে আরতি শুরু কবে পুরনারীবা। সূর্যাস্তি ধূপেব ধোঁয়ায় মেঘ-খন আকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মন্দিবে মসৃজিঙ্গ চলে সমবেত প্রার্থনা। না, কিছুতেই যেন প্রসন্না নন বিরিকি 'তনয়া। ফণা তুলে তুলে দিন দিনই গর্জে উঠছে ভয়ংকরী।

অমাবস্ত্যাব গাঢ় অন্ধকাব। সাবাদিন ইলশেগুড়ি চলেছে। সন্ধ্যা থেকে পদ্মাব বক থমথমে গেকরা বাস ছেড়ে নীলাধরী পবে নাগিনী। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে নীলাঙ্কল। কাশীপূবব আবালবুদ্ধ ভয়ে তটস্থ। সকলে মিলে বহুদূব পর্যাস্ত ঘূবে ফিবে দেখতে থাকে, কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা। না, সে বকম কোথাও কিছু লক্ষ্য হয় না। তবু যথা সাবা সতর্ক পাকে সবলে। বাসন কোসন যে যেমন পাবে সরিয়ে রাখে। যাব নৌকো আছে সে নৌকোব ওপবেই ঘুমোয়। ডপুব বাত পর্যাস্ত সকলে খোল বাজিয়ে কীতন কবে কবিমেব বাড়ি 'দয়াল চানেব' আসবেও আবাব কেউ কেউ জমায়েত হয়।

আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই। থম থম কবছে চাবদিকেব অন্ধকাব। অল্প অল্প রষ্টিব মধ্যে থেকে থেকে বিচাং চমকাছে। বাজ পড়ছে কোথাও কোথাও। বাত একটা, হঠাং গাছেব চূড়া নড়ে ওঠে। শোঁ শোঁ মাই মাই শব্দে প্রবল বেগে শুরু হয় তুফান রষ্টি। ঘুমিয়ে ছিল মাহুয়, অতর্কিতে নাফিয়ে ওঠে। শিশুবা মায়েব বৃকে মুখ খুবড়ে চেঁচাতে থাকে। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, মাহুয় একযোগে আর্তনাদে ফেটে পড়ে। কড়াং কড়াং—রন বন—কড়্ কড়্ কড়্ শব্দে চেউ টিনেব চালগুলা উদ্ধাব মতো ছুটতে থাকে। ভয়ে হাত পা সিটিয়ে গেছে দীহুব। স্ত্রী কুহুম মেবেব ওপব দাড়িয়ে ঠক্ ঠক্ কবে কাঁপছে। ঘরে চাল নেই। সূচবে মতোই এসে বিঁধছে রষ্টিব ফলক। সহসা কবিমেব-চীংকাব শোনা যায়, ভাইজান, সাবধান। পোলাপানগ বৃকেব মঃগে চাইপা ধব। ছাও ছুটছে।

গলা পঞ্চমে চড়িয়ে দীহু উত্তব দেয়, আব বঙ্গ। নাই ভাইসাব। সব গেল, সব গেল...

ভয় নাই, আমরা আইলাম। ভয় নাই...স্ত্রী, পুত্রকণ্ঠাসহ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে থাকে করিম। ওর বাড়ি ঘরদোর সব সাফ। প্রতিবেশী সকলেব অবস্বাই তাই। সকলেই ছুটতে থাকে দীহুর বাড়ির দিকে। একমাত্র বৈরাগী

বাড়িই যা টিনকাঠ দিয়ে পাকাপাকিভাবে তৈরী। আর তো সব খড়ের চাল ঝাঁপের বেড়া। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতোই উড়ে গেছে। আশ্রয়হীন মানুষ আশ্রয়ের আশায় দলে দলে ছুটতে থাকে। কিন্তু একি! খড়ের ঘরের চেয়ে যে টিনের ঘর আরো ভয়াল হয়ে উঠেছে। টিন ছুটছে না তো যেন এক একটা বর্শা ফলকই ছুটে চলেছে। কোনগতিকে এক-আপটা উড়ে এসে গায়ে গড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছু' আধখানা। এখন তাহলে যায় কোথায় ওরা? এত জলই বা আসছে কোথেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো ওদেরই ডিঙ্গি। খাটে বাঁধা ছিল। তবে কি...

‘বান ডাকচে, বান ডাকচে,’ নদীর পারের ভয়াবর্ত মানুষের চিংকার একটানা ভেসে আসতে থাকে।

সকলে মিলে একযোগে আর্তনাদ করে ওঠে। বুড়োদের মধ্যে একদল ফাদতে কাঁদতে এসে করিমের পা চেপে ধরে, ফকির শাব, আমাগ বাঁচান। আপনার সিদ্ধাইভা একবার ছাড়েন। আমাগ বাঁচান...

করিম নিরুপায়। ভূত প্রেত খেলাবার মন্ত্র জানা থাকলেও উত্তাল পদ্মার সঙ্গে যুদ্ধবার মতো ফুসমন্ত্র ওর জানা নেই। কিন্তু কে শুনছে আর সে-কথা। কবিম দমে না। গুরুগস্তীরভাবেই সকলকে সাঙ্ঘনা দেয়, ভয় নাই। দয়াল চানরে ডাক হগলে। দীন-দয়ালই রক্ষা করব।

হতবুদ্ধি মানুষ কিছুটা বল পায় করিমের সাঙ্ঘনায়। করিমের সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গিগুলোকে শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে থাকে। পা দিয়ে ফলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, নারী, শিশু এক এক করে সকলকেই মাচার ওপর তুলতে থাকে। পাকা শালকাঠের খুটির ওপর বিরাট মাচা দীঘুর। ভিটি থেকে পাঁচ ছ' হাত টুচু। অসময়ে ধান, পাট, মুগ-মটর তোলা থাকে। বিপদে পড়ে মানুষ আজ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। কোমরে গামছা বেঁধে দীঘুও কাজে যোগ দেয়। মরবে তো নিশ্চয়ই তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। মাখার ওপরের চাল নেই। তীরের মতোই এসে বিঁধছে খুটির ফলস। হাত, পা ভিজে জবজবে। মায়েরা পারে তো পেটের ভেতরে সৈথিয়ে রাখে বাচ্চা-কাচ্চাদের। কাতর কণ্ঠে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে থাকে কেউ কেউ। জয় হরি, জয় মধুসূদন, বোদা, দীন দয়াল...

ঘণ্টা খানেক ধকল ঘাবার পর ঝড়ের বেগ কমে আসে। বৃষ্টি এখন এক রকম নেই বললেই হয়। সামান্য গুড়ি গুড়ি পড়ছে। কিন্তু কাশীগুরের মানুষ নিশ্চিন্ত

হতে পারে না। এখনো হাঁটু তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। করিমের নির্দেশেই আমগাছের উঁচু ডালে নতুন করে মাচা বাঁধা শুরু হয়। কেউ কেউ নিজ নিজ দর দোরের খোঁজেও বার হয়। বাচ্চা-কাচ্চাদের চিংকার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সকলে মায়ের স্তনে মুখ গুজে নির্ভয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে। ডিক্সি গুলোও গাছের গুড়ির সঙ্গে ঠিকই বাঁধা আছে। অপূরণীয় ক্ষতি হলেও প্রাণে বোধ হয় সকলেই বেঁচে গেলো এ যাত্রা। নিশ্চিত না হলেও কতকটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে গায়ের মানুষ।...

মুখের কথা মুখেই থাকে। মাচা বেঁধে নেমে আসারও ফুরসত হয় না অনেকের। আবার তোড়ে আরম্ভ হয় ঝড় বৃষ্টি। শাখায় শাখায় ঠোঁকাঠুকি চলে। মূল থেকে খসে পড়ে বোধ হয় কোনটা। দেখতে দেখতে পদ্মা হ্রদাব ছেড়ে এসে বাড়িব উঠোনে পড়ে। হাঁটু জল, কোমর জল, না না, গোটা মানুষই তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। ভিটে মাটি জলে টেটুখুর। মাচার ওপরের জীব-জন্তু মানুষ আবার অতনাদ করে ওঠে। জোয়ান মানুষবা হাতের কাছে যাকে পায় সেলে তুলে দেয় গাছের ওপব। ছাগল, ভেড়া, গরু, বাছুরের দড়ি খুলে দিয়ে যে যেভাবে পারে গাছে এসে ওঠে। জল গাছের গুড়ি ছাপিয়ে মূল শাখা ছোঁয় ছোঁয়। বৃকের ধুক-পুকানী বেড়ে যায় দীঘল। করিমকে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে দেখা যায়। কুসুম চোখ মেলে চাইতে পারে না। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ওপরের ডাল থেকে কে যেন ছিটকে পড়ে গেলো জলেব ওপব। যে যার আপনজনের নাম ধরে চিংকাব করতে থাকে। কেউ সাড়া পায়, কেউ পায় না। আশঙ্কায় ডুকরে ওঠে কেউ কেউ। পাষাণী পদ্মা সমুদ্রের চেয়েও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

ঝড় একটানা বয়ে চলেছে। খুব কাছেই একটা বাজ পড়ে। মুহুমুহঃ বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। সহসা চোখ মেলে চাইতেই আলোর ঝলসানীতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দীঘল, মগ্ন গাঙ্গে ওটা কি ভাইসা যায় গ নিশার মা। ধান পাট বৃজি আর একটাও ক্ষাতে রইল না। ঐ ছাহ, ধবলী, আমাগ ধবলী ভ্যা ভ্যা করতে করতে আমাগ ছাইড়া চলল। পাঁচ সের ছুধ দিত ধবলী। হায় হায়, কি ধাইয়া গোলাপানে বাঁচব! তোমরা আমারে ছাইড়া ছাও—ছাইড়া ছাও—, আমিও ধবলীর লগে যাই, ছাইড়া ছাও...বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জলের ওপর লাফিয়ে পড়তে যায় দীঘল।

একা কুসুম, ছেলে সামলাবে না জোয়ান মরলকে। এক হাতে নিশিকে

বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আর-এক হাতে দীহুর কোমর জড়িয়ে ধরে! আকুল হয়ে ইষ্টদেবকে ডাকতে থাকে, জয় হরি, জয় ছিমছন্দন, রক্ষা কর—রক্ষা কর আমাগ। সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দিমু ঠাকুর, বক্ষা কর...

কুসুমের পক্ষে একা আর সম্ভবপব হয় না দীহুকে ধরে রাখা। চেঁচামেঁচি শুনে করিম চোখ মেলে তাকায়। তাড়াতাড়ি পেছনের ডাল থেকে লাফিয়ে এসে থপ করে চেপে ধরে দীহুর হাত। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, কর কি বৈরাগীর পো! ক্ষেপলা নাকি? পোলাপানের দিগে চাও...

দীহু শাস্ত হয়। করিম আবার চোখ বোজে।

সমস্ত রাত ধকল যাবার পর শ্রান্ত পদ্মা শাস্ত হয়। সর্বনাশী এবার যেন স্নেহতুরা অভয়ীর রূপ ধরে কুলকুল-নাদে বয়ে চলেছে। সম্ভানের দুঃখে ডুকবে ডুকবে কাঁদছে যেন। সূখ কিরণে দেখা যায়, বাড়ি, ঘরদোর সব সাক। ক্ষেতখামারের চিহ্ন পথস্তু নেই কোথাও। প্রাণনাশও হয়েছে অগণিত। দীহুর বুকের ভেতবটা আছড়াতে থাকে। সমস্ত স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে যায়। আকুল হয়েই ডাকতে থাকে, কাঙালের ঠাকুর, বড় সাদ আঁচিল পবাণ ভইরা তোমারে ডাকুম, নামগান করুম। চরণে কি অপবাধ অইচে দেবতা যে সব কাইড়া নিলা। .. গাছের ডালে মাথা ঠুঁকে ঠুঁকে শিশু ব মতো কাঁদতে থাকে। কুসুম স্বামীকে সাঙ্ঘনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না।

বন্ধার জল তীব বেগে নেমে চলেছে। ভেসে চলেছে অগুনতি মবা জীব-জন্তু গাছপালা। আজ পাঁচদিন পব আবার পরিষ্কার হয়ে বোদ উঠেছে আকাশে। রাতভোর প্রাণপণ যুঝে অধিকাংশ মানুষই জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন খিদের জালাতেই সকলকে মবতে হলে। পেটে তো হতাশনই জ্বলছে। ঘুম থেকে উঠে কাবো বরাদ্দ ছিল একবাটি পাস্তা, কারো বা এক কাঠা গুড় মুড়ি। আজ ভাণ্ডাব-স্বন্ধ অবলুপ্ত। ভিথিরা, অতিথি এসে যে বাড়ি থেকে কখনো ফেরেনি বাতারাতি সে বাড়ির মালিকও ফকির বনে গেলো। বাস্কুদী পদ্মা সব গিলে খেয়েছে। অধিনী এরই মধ্যে 'মুড়ি ছাও, মুড়ি ছাও' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। নিশি কুসুমের কাঁধের ওপবেই স্নানান্তে নেতিয়ে পড়েছে। ধবলী নেই যে গরম গরম দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বেচারি কুসুমের শরীরও আর বইছে না। এখনো মাছুষ তলিয়ে যাবে জল উঠানে। গাছ থেকে নেমেও কোন ফায়লা নেই।

ছোট ডিক্সিথানা শিকল দিয়ে গাছেব সঙ্গে বাঁধা আছে। হয়তো রক্ষা হয়ে থাকবে। বিপদে একমাত্র ভবসা। দীলু দড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করে। কুসুম সঙ্গে সঙ্গে আবার হাত চেপে ধবে স্বামীব। লাবা পেয়ে দীলুও দমে যায়। এখ.না ভীষণ কাটাল। নামতে গেলে হয়তো ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। তাছাড়া রক্ষা যদি হয়েছে থাকে তবু এত জলেব ভেতব থেকে কখনো একা একা টেনে তোলা সম্ভবপব নয়। দীলুব ভাবনা বেড়ে যায়, লক্ষ্মী চাবাব মাস উজাড়। পাঁচশ টাকা ঋণ মহাজন মধু পালেব কাছে। হাতে একটা কানা কড়িও নেই।

ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে বৃকে শেল বেবে দীলু কবি:মব কিন্তু তবু না গি:সে উপায় নেই। সমস্ত ক্ষেতময় পড়েছে কচকচে বালি মধু পালেব কাছে উজয় গিয়েছিল। যদি নতুন কবে কিছু কর'পায় তা হ'ল চেষ্টা কবে দেখবে আবার বালিব ওপব সোনা ফলানো যায় কি না। কিন্তু মধু পাল বাজি হয়নি। আগব টাকাব জুইসে নিজেব বুক চাপড়িয়েছে, মোড়লেব পো, তোমবা তো মবলশই, আম'বেও মাইবা গেলা। আবার টেকা দিমু কোহান খ:ন

দীলু হাত পা জড়িয়ে ধবে। কবিম আন্নাব কসম থায়। কিন্তু মধুব এক কথা, "আগেব টেকা ছাও, পবে কথা কও।"

কথা আব নতুন কবে বলাব উপায় নেই, চোখেব জল মুছতে মুছতেই গিলেব আ:স দুই মিতাম। ধবদোব নেই। বজাব সময় মাচাব ওপব যা ওঠাতে পেবেছিল তাই-ই একমাত্র সম্বল। ঠাকুবেব দয়ায যে উভয়েব ডিক্সি দু'খানা বক্ষা পেয়েছে, সেই চেব ভাগ্য। খেজুব পাতব পাটিতে চুই দিয়ে ডিক্সিব ওপবেই আবার নতুন কবে ধব বাঁবে চ'জনে। ভোব লয়ে ছেড়ে যাবে কাশীপুব।

ছেলে কোলে কবে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিল ফতিমা। মালপত্র বোঝাই শেষ। এখন ছেলেপুলে নিয়ে ফতিমা আব কুসুম ডিক্সিত উঠলেই ছেড়ে যাওয়া যায়। ফতিমার উদ্দেশ্যে কবিম তাড়া দেয়, কৈগ বহিমাব মা, বলি পোলা কোলে কইবা খাড়ইয়া খাড়ইয়া খালি কানবা, না নায়ে উঠবা ?

তাড়া খেয়েও কোন সাড়া দিতে পাবে না ফতিমা। বলে কি রহিমের বাপ ! ছেলেপুলে নিয়ে ভবা গাং পাড়ি দেবে। ধবদোর তো সবই গেছে, এবার পে:টের কাটাকেও জলে দিতে চায় নাকি !...ডাক ছেড়েই কাঁসতে ইচ্ছা করে ফতিমার।

পেছনের গলুইতে বসে হকো টানছিল করিম। ফতিমার কান্না দেখে নিজের বৃকের ভেতরটাও আছড়াতে থাকে। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটে

মাটি। ছ'দিন আগেও সব ছিল। ভিটে, ধরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গরু-বাছুর নিয়ে স্থখের সংসার। আজ পথের ভিখিরী। নেই বলতে কিছু নেই। কোমর থেকে গামছাখানা খুলে ছ' চোথ পুছে ফেলে।

কতিমা দাঁড়িয়েছিল, এবাব বসে পড়ে বিলাপ শুরু করে। কোথায় যাবে ও কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে। দব-দোবই যখন বাখলো না বাস্কুসী তখন তো ছ'খান ডিক্কি এক খাবায় গিলে খাবে।...

কবিম নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ধবা গলায় সাশ্বনা দেয়, পোলাপানেব সামনে অমুন কইবা কাইন্দ না। আল্লার দোয়া যে তল গচায় পড় নাই। ছ্বাবাবেব ভান্ননেব কতা মোনে নাই তোমাব। রাতারাতি গেবামকে গেরাম তলাইয়া লইয়া গেল। তল দিয়া কাইটা দেয় কেউ টারই পায় না। কামা খুইয়া গলৈতে জল দিয়া নায়ে ওঠ। পবাণে যখন বাচ্চ, তহন আল্লার দোহ অইলে সব আবাব পাইবা।...

কতিমার তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। ছ'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুঁপিয়ে ছুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে।

নিকুপায় কবিম কতিমাকে ছেড়ে কুসুমকে তাড়া দেয়, কৈগ মা লক্ষ্মী, তুমিও অবুজ অইলা নাকি। নায়ে ওঠ। বেলাবেলি পন্ন্য পারি দেওয়ন চাই। বিকালে ঝড় তুকানের কতা কওয়ন যায় না।

কুসুম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডিক্কির কাছে আসে। কোলে নিশি, পায়ে পায়ে আঁচল জড়িয়ে অশ্বিনী। কাম্মায় ছ'চোথ ফুলে উঠেছে। অথৈ জলে ভেসেই-যেতে হবে।

কুসুমের দেখাদেখি কতিমাও আঁচলে চোথ মুছে রহিম, মৈমুদ্দিন আব মেহেরকে সঙ্গে কবে ডিক্কির কাছে আসে। ছুই পবিবারের ছুই গিমি গলুইতে জল দিয়ে ইষ্টদেবতা নাম করতে কবতে ডিক্কির ওপরে ওঠে।

দীর্ঘ করিম হালে চাড় দিয়ে ডিক্কি ভাসিয়ে দেয়। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি। বৈঠায় খোচ দিতে দিতে বার বার ফিরে তাকায় উভয়ে সজল চোখে। দেখতে দেখতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। এক এক কবে মিলিয়ে যেতে থাকে চারিদিকের ঘর দোর গাছপালা। ঐ তো এখানে দেশ যাচ্ছে বাড়ির বড় আম গাছটা। ধবলী বাঁধা থাকতো ওখানে—শক্তি প্রদায়িনী। ঐ গাছটাই তো ভ্রাবন রক্ষা করেছে, ঐ চর আর ঐ ধূলিকণার সঙ্গে রয়েছে স্থখ দুঃখ বিজড়িত জীবনস্মৃতি। আর কি কখনো ফিরে আসতে পারবে ওনা ওখানে, আর কি কখনো...ভাবতে ভাবতে অগ্নমনস্ক হয়ে পড়ে দীর্ঘ।

পাশাপাশি করিম হাল ধরে চলেছে। দীহুকে অগমনরূ দেখে ছ শিয়র করে দেয়, ভাইজান, শক্ত কইরা হাইল ধর। সামনা দিয়া কোম্পানীর জাহাজ যাইবার নৈচে, ঢেউ আসব।

করিমের ডাকে দীহু আচমকা উত্তর দেয়, আমাগ একবারে মরণ নাই ভাইসাব। ভগবান রুষ্ট অইচেন। তিলে তিলে মারব। এত বড় ঢেউয়েই যখন তলাই নাই তখন আর জাহাজের ঢেউয়ে কি করব।...

করিম পান্টা ধমক দেয়, তুমি পোলাপানের সামনে অমুন কথা কইও না। অরা মোনে কষ্ট পাইব। আল্লার দোয়া অইলে সব ফিরা পামু। শক্ত কইরা হাইল ধর।

দীহু আর কথা বাড়ায় না। সংযত হয়েই হাল ধরে। ঢেউয়ে ডিকি ঢলতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরে ফতিমা কুসুমের চেঁচামেছি শোনা যায়।

করিম বৈঠায় খোঁচ দিয়ে সাহস দেয়, ভয় নাই। পোলাপানগ বুকের মস্তে চাইপা ধর।

ঢেউ একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরের চেঁচামেচিও বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতের টানে দৌড়ে চলে দুজনের ছোট্ট দু'খানি ডিকি।

॥ ২ ॥

বর্ষার ভরা পদ্মা। অনন্ত জলরাশি থে থে করছে দিগন্তে। এক পারে দাড়ালে অল্প পার নজরে পড়ে না। কালনাগিনী যেন ফণা তুলেই আছে। বাগে পেলেই ছোবল মারবে। কিন্তু উপায় কি? সাপের মাথার মণি আহরণ করতে গেলে ছোবলের ভয় করলে চলে না। দীহু হুকোটার সজোরে একটা টান দিয়ে গলুইয়ের পাশে নামিয়ে রাখে। শক্ত করে দু'হাতে হাল চেপে ধরে করিমের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, ভাইসাব, জমিন না অইলে বাঁচন যাইব না। আর ইপারে আমাগ কেউ জমিন দিবও না। চল, পারি দিয়া ওপারে যাই।

হ হ, ঠিক কইচ ভাইজান। তবে পদ্মার পারে আর নয়। সর্বনাশী আমাগ আর থাকবার দিবার চায় না। খেদাইয়া দিবারই চায়। চল, যমুনার পারে যাই। হনচি ওহানে ইরকম ভাঙন নাই। মিলবারও পারে ছটাক মটাক, করিমও হুকো টানতে টানতে মনের আবেগে সায় দেয়।

যমুনায় পদ্মার মতো ভাঙন না থাকলেও শ্রোতের বেগ ভয়ংকর। একবার ভরা বর্ষায় আক বোঝাই ডিঙ্গি নিয়ে জনকয়েক উজ্জাতে চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি বইঠা ঠেঙ্গিয়েও সফল হতে পারেনি। আজ উভয়েই একক মাঝি। ডিঙ্গি দু'খানাও অপেক্ষাকৃত ছোট। দীঘু দমে যায়। করিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাতে সাহস পায় না।

দীঘুকে নিরন্তর দেখে করিম পুনরায় জের টানে, কি, ভয় পাইলা নাকি মোড়লের পো? আরে আমাংগ মতন পোড়া কপাইলা মাইনষের মরণ নাই। বাদাম খাটাইয়া পারি ছাও আন্না বইলা।

হ হ. ঠিকই কইচ কর্করের পো। নদীর কিনারের জমিন না অইলে চাষ কইরা স্থখ নাই। পদ্মার পারে আর জমিন পাওন যাইব না। চল, যমুনার পারেই যাই। কৈ গ, তাইলডা একটু ধরবার পারবা নাকি? আমি বাদামডা খাটাইয়া লই, কুসুমকে তাড়া দেয় দীঘু।

ছেয়ের ভেতর কাৎ হয়ে শুয়ে নিশিকে মাই দিচ্ছিল কুসুম। দীঘুব সম্বোধনে চমকে ওঠে, তুমি কও কি! এই ঝড় তুফানের দিনে পোলাপান লইয়া ভরা গাং পারি দিবার চাও? তোমার কি মাথা খারাপ হৈছে?

হ হ. আমার মাথাই খারাপ হৈছে। না খাইয়া মকম নাকি তোমাব কথায়?

পাশাপাশিই চলেছ করিমেব ডিঙ্গি। কুসুমের কাতর কণ্ঠে চমক ভাঙে। ছেয়ের ভেতরে রক্তিমের মা-ও বিষ্ময় প্রকাশ করছে তার দিকে চেয়ে। মেজাজটা একটু খাদে নামিয়েই উত্তর করে করিম, ভাইজান, মা লক্ষ্মী ভাল কতাই কৈচে। কাম নাই ভরা গাং পারি দিয়া। তার খনে চল বাঁক ঘুইরা ধলেশ্বরীর মন্দির দিয়া যাই। ট্যাঙের ছাশের মানুষ গাঙের কিনারের জমিন পছন্দ করে না। গাঙের কিনারের জমিন কি কইরা চাষ করার লাগে তাও তারা জানে না। আমাংগ স্তবিদা অইবার পারে।

কথাটা মনে ধরে দীঘুর। সোংসাংই সায় দেয়, হ, ঠিকই কৈচ। তবে তাই চল দেখি, কি আছে বরাতে।

ধলেশ্বরীর তীর ধেসেই চলেছে দু'খানি ডিঙ্গি। পদ্মা যমুনা অপেক্ষা কল্পা ধলেশ্বরী আকারে ছোট হলেও বিক্রমে কম নয়। সেই একই রকম তজ্জন গজ্জন ফৌস-ফৌসানী। পূর্ববঙ্গের নদীগুলো সবই যেন এক একটা কেউটে সাপের বাচ্চা। কপা তুলেই আছে—বাগে পেলেই ছোবল মারবে।

দীলু করিম শক্ত হাতে হাল ধরে। কালনাগিনীর ছোবল এড়িয়ে চলবার মতো ফুলমস্ত জানা আছে ওদের। সময় বুকে পথ চলে। সময় বুকে থালের মব্যে লগি পুঁতে বিশ্রাম নেয়।

দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে চলেছে ডিঙ্গি। এক হাটে তাল, কলা, শশা, আক কিনে আর-এক হাটে বেচে দেয়। সামান্য ছ'দশ পয়সা মুনাফা। তা দিয়েই চলে ঘর সংসার—হাট বাজার। শুধু চারটে চাল আর একটুখানি মুন। পযাপ্ত মাছ তো মুফতই পাওয়া যায়। অবসর সময়ে একটা ছিপ ফেলে ধরে নিলেই হলো। টাটকা জলজান্দ মাছ। খোলা জলে প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস। দীর্ঘ এই মাসখানেকের ভ্রমণে শরীর ওদের কারো খারাপ হয় না। জলো হাওয়ায় বরং সকলেই বেশ মুটিয়েছে। এখন চাই জমি। জমি হলেই মনের শান্তি ফিরে আসবে। আবার চাষ আবাদ হবে—ঘরবাড়ি।

আষাঢ় থেকে আশ্বিন এমনিই কাটে। কার্তিকে জলে টান ধরে। শ্রোতের বেগ বেশ মধুর। এখন এগুতে হলে শক্ত হাতে বইঠা বেয়েই এগুতে হবে। রীতিমতো আয়াস সাব্য। কিন্তু মিছিমিছি পরিশ্রম করে লাভ কি? নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থান জানা নেই। সামনেই তে'মোনা। ব্রহ্মপুত্র-নন্দন বংশী এসে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে। বংশীর পূর্বপারে গঞ্জ সাভার—বিখ্যাত জনপদ। হাজার হাজার মণ মৃগ, কলাই, ধান, পাট, কেনাবেচা হয় সাভারের হাটে। স্থায়ী দোকানপাটেও গঞ্জ সাভার জমজমাট। প্রতি শনি মঙ্গলবারে হাট বসে। দশ বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ফল পাকুড় তরি তরকারী থেকে আরম্ভ করে অগ্নতি জিনিসের সমাবেশ। দূর দূরান্ত থেকে হাটুরেরা আসে। রুজি রোজগারে প্রতিপালিত হয় হাজার কয়েক সংসার। দীলু করিম লগি পুঁতে তিন চার হাট বেচাকেনায় মন দেয়। এর আগ পর্যন্ত যা রুজি রোজগার হয়েছে তাতে কোনরকমে দিন গুজরান সম্ভবপর হয়েছে। হাত থেকেছে সদাসর্বদা শূন্য। কিন্তু সাভারের হাটে বেচাকেনা করে সংসার চালিয়েও কিছু কিছু হাতে থাকছে। অনেক ঝড় ঝাপটার পর ঝুঁঝর বোধ হয় এতদিনে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন ওদের। সাভার ছেড়ে ওরা আর এক পা'ও নড়বে না। এখানেই মাটির সন্ধান করবে। প্রয়োজন হলে চিরজীবন অপেক্ষা করবে।

সাভারের ওপারে চারফুট নগর সবে জাগতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

সকলমুহুর্ত থেকে বন্দীপের মতো উঠে চলেছে বিরাট চর উত্তর দক্ষিণে। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে দুই পড়শী ঐ চরকে কেন্দ্র করে। চর নয়তো খেন মা লক্ষ্মীর আসনই ধীরে ধীরে জাগছে। মনের স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে। মা লক্ষ্মীর আসন স্থায়ী করে পাতার এই উপযুক্ত মাটি। এই মাটিতেই ফলবে ধান পাট সোনালী শস্ত। কিন্তু কে দেবে এই চরের নিশানা? কার কাছে গেলে পাবে অকুলেতে কূল? মাটি—মাটি—মাটি, না হলে প্রাণের জালা জুড়াবে না। মাটি না হলে ছেলেপুলেরা বাঁচবে না। মাটি না হলে ঘর বাঁধা চলবে না। জীবনে মরণে সর্বস্বরে চাই মাটির মায়ের কোল,— দীহু করিম কাজের শেষে সকাল সন্ধ্যা হুকো খায় আর বসে বসে ভাবে।

॥ ৩ ॥

চরফুটনগর একটু একটু করে জাগছে। দীহু করিমের মনে বইছে খুশীর হাওয়া। সাভারের হাটে খোজ পেয়েছে, কাশিমপুরের বড় তরফের দখলে ঐ চর। কেউ ওখানে চাষ আবাদ করে না। বিলি ব্যবস্থাও এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি। নায়ব রাখাল গোসাইয়ের ওপরেই সকল ভার গুস্ত। বেশ নাটুস মুহুস চেহারা গোসাইজীর, খানদানী মানুষ। কিছু দিলে খুলে আশা আছে। দীহু করিম দুরাশার স্বপ্ন দেখে।

চর অনেকটা জেগেছে। কচকচে বালুর ওপর কোথাও কোথাও সামান্য সামান্য পলির আস্তরণ। একদিন দুজনে চরের ওপর গিয়ে মাটি হাত দিয়ে পরখ করে দেখে। এখনো চাষ চলবে না। তবে এ দেশের মাছুষ হয়তো জানেই না কি করে এই উষর ভূমিকে শস্ত শ্রামল উর্বর ভূমিতে পরিণত করা যায়। দু'জনে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেরায়। এখনো সবটা চর জাগেনি। তবু কোথা থেকে কি ভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে ছুয়ে মিলে মনে মনে জরিক করে। ঈশ্বরের দয়ায় যদি বিলি ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে একবারের বর্ষতেই পলি ধরা যাবে। ধান পাট না হোক রবিশস্ত ফলানো কেউ আটকাতে পাবে না। দু'জনে দুমুঠো মাটি হাতে করে ডিক্কিতে ফিরে আসে। হুকো খায়—সজা করে। তারপর হাটের রোজগার থেকে যা বাঁচাতে পেরেছে তা নিয়ে গুনতে বসে। গোসাইজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা না করে শুধু হাতে কাছারিতে গিয়ে কোন লাভ নেই। ছুটো বাঁশের চোঙের

মধ্যে গচ্ছিত দুজনের ধনভাণ্ডার। মাত্র ক'দিনের উপাঙ্গন। গুনলে আর কতই বা হবে? পয়সা, সিকি, আনি, ছ' আনিতে মিলিয়ে—মাত্র টাকা পাঁচেক হয়। উছ, এতে গোসাইজীর মন উঠবে না। দোকানে বসে দই খেতে খেতে কান্দনী বোমের নিকট সব খোঁজ পেয়েছে। গোসাইজীর পেটটা একটু ডাগরই। তা ছাড়া আছে এদিক সেদিকের খরচা।

বিরাত চম্বব জুড়ে বাংলা ধরনের পাকা একতলা কাছারি বাড়ি। পূব, উত্তর, দক্ষিণ উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমে বংশীর তীর—ঘাটলা বাঁধানো। বর্ষীয় কানায় কানায় ফলে ওঠে বংশী। ছ'তিন বছর অস্তুর এই সময়েই খোদ মালিকের "গ্রানবোট" ঘাটলায় এসে লাগে। করিতকর্মা বাখালের তৎপরতা বেড়ে যায়। গোঁষামোদে মুখর হয়ে ওঠে। বড়ান স্থধা পান করে মালিক অষ্টপ্রহর বিভোব হয়েই আছেন। প্রায়শঃই কাছাবিতে নামা প্রয়োজন বোব করেন না। 'গ্রানবোটে' বসেই এক আববাব আঁধি মেলে হিসেবের খাতায় নজর দেন। চুলচেবা হিসেব কড়া ক্রান্তিতে মিল। পাইক পেয়লা পাঠিয়ে কিছু কিছু গরীব প্রজা আর চাটুকরদের ডেকে আনে রাখাল। প্রয়োজন বোধে প্রণামী আর নজরানাব স্থুল অংশটা নিজেব টেক থেকেই চাটুকরদের হাতে গুঁজে দেয়। নগদ লাতে ডগমগ হয়ে ওঠেন প্রভূপাদ। মনে মনে রাখালের তারিফ করেন।

ঘাটলা দিয়ে উঠেই ছ'দিক জুড় ফল বাগিচা। উত্তর দিকেব-দেয়াল বেঁবে আমলা মুহুরীদের থাকবার ঘর। দক্ষিণে বিরাত ফটক। স্থলপথে কাছারিতে প্রবেশ করার দরজা। পশ্চিমের ঘাটলার ওপরও একটি ফটক আছে। উভয় ফটকেই সশস্ত্র প্রহরী অষ্টপ্রহর মোতায়েন। কাছারি নয়তো, ঘেন একটি প্রমোদ উদ্যান। কেয়ারিতে কেয়ারিতে মরশুমী ফুলের বাহার নিয়তই পথিকজনের চোখ বাঁধায়।

মঙ্গলবারের হাটবাব। বিকেল প্রায় চারটে। দীক্ষ করিম ভাবে, সোজাস্বজি কাছারির ঘাটলায় ডিক্সিখানা বেঁবে গোসাইজীর সঙ্গে দেখা করে। কস্ত সাহসে কুলোয় না। কানায়ুযোয় শুনেছে, খাটলায় নোকো বাঁবা সাধারণের জ্ঞান নিষেধ। প্রথম যাত্রাই কি গোসাইজীর বিষ নজরে পড়বে? ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ষমদূতের মতো শিখ প্রহরী। কাজ নেই বাবা। হালে চাড় দিয়ে ঘাটলা ছাড়িয়েই একপাশে গিয়ে ডিক্সি বাঁবে। পরিষ্কার করে হাত পায়ের কাপা মাটি ধুয়ে দক্ষিণ ফটকে এসে দাঁড়ায় উভয়ে। সেখানেও

প্রহরী। কিন্তু আজ আর কিরে গেলে চলবে না। চর অনেকটা জেগেছে। হয়তো এর মধ্যেই আবার কেউ এসে বাগড়া দেবে। এ কদিন সংসার খরচা একরকম বন্ধ রেখেই গোটা পঞ্চাশ টাকা যোগাড় হয়েছে। ফরমাস তো অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। ছেলে বউয়ের কাপড় গামছা ছিঁড়ে কুটি কুটি। নিজের পরনের মধ্যেও চলেছে তালির পর তালি। সব কিনলে কাটলে টাকা কটা আর এমন কি? হয়তো কুলোবেই না। না না, সবার আগে চাই জমি। জমির মধ্যেই রয়েছে বাঁচার উৎস। খানিক ইত্তস্তঃ করে পাঞ্জাবী প্রহরীর শরণাপন্ন হয় দুজনে। মুসা সিং মুখে কোন জবাব না দিয়ে সোজা দেখিয়ে দেয় কাছারি ঘর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় উভয়ে ভেতরের দিকে।

নাকের ডগায় নিকেলের পুরু চশমাটা নামিয়ে দিয়ে গদীর ওপর বসে হিসেবের খাতা দেখছিল রাখাল। তরুপোবের ওপর ফরাসি বিছানো গদী। তিন দিকের দেয়াল খেঁসে আলমারীর ওপর থরে থরে সাজানো রাশিকৃত খেঁকিয়া মোড়া হিসেবের খাতা। ওপর দেয়ালে রামদা, হরিণ মুণ্ড, ঢাল, তলোয়ার, বাঘছাল। একটা বড় তৈলচিত্র পূর্ব দেয়ালের মধ্যভাগে। শিকারীর পোষাকে সূসজ্জিত বলিষ্ঠ দেহ। মোম দিয়ে চাড়ানো গোক। মুণ্ড সমেত বাঘছালে মোড়া একটা পা-দানীতে ভর করে সদস্তে দাঁড়িয়ে আছেন বর্তমান জমিদার কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। হাতের বন্ধুক উল্টো করে মাটির সঙ্গে ঠেকানো। করিম, দীলু খতমত খেয়ে যায়। মহাজনের গদীতে গিয়ে টাকার জঞ্জলধনী দেওয়া ওদের অভ্যাস আছে। মহাজনের সামনে চটের ওপর বসে কঙ্কের পর কঙ্কে তামাক সেজেও খেয়েছে। সময় বিশেষে তার তর্জন গর্জনও দেখেছে। কিন্তু জমিদারের কাছারি কি বস্ত্র জীবনে কখনো দেখেনি। খাজনা কড়ি তসিলদার নিজের বাড়ির ওপর এসে নিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি। কোনরকম ঝঙ্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। জীবনে এই প্রথম কাছারিতে পদক্ষেপ। থ বনে যায় করিম দীলু। ভেবে পায় না, কি করে মনোব কথা খুলে বলবে। রাখাল যেন ডুবে আছে হিসাবের খাতায়। দেখেও দেখে না। কিন্তু আজ যে কোন রকমেই কিরে যাওয়া চলবে না। চর প্রায় সবটাই জেগে উঠেছে। যে কোন মুহুর্তে হাত ছাড়া হয়ে ক্ষেতে পারে। বরাত তো সব দিক থেকেই ঝন্ড। নয়তো পাকা ধানই বা বাজ পড়বে কেন? দীলু সাহসে নির্ভর করেই সোধোন করে, দণ্ডব্য হই কস্তা।

বাখাল কপালের ওপর চশমাটা তুলে আড়চোখে প্রশ্ন করে, কি চাই ?
আইজা, আপনাদের ঐ চরটুকুনের লাইগা আইচিলাম, হাত কচলাতে
কচলাতে উত্তর করে দীহু।

কি নাম ?

আইজা আমার নাম দীহু বৈরাগী। আব উনি মিতা করিম ফকির।

নিবাস ?

আগে ফবিদপুর জিলার কাশাপুবে আছিল। এহন—দীহুর কণ্ড আবেগে
৭৫ হয়ে আসে।

এখন কোথায় ?

এখন জলের উপর ভাসচি কত্তা। বাইজসী পদ্মা আমাগ সব গিলা থাইচে।
আপনার ছিচরণে তাই একটু আশ্রয় চাই।

বাখাল সতসা হৃদিস কবতে পারে না কোন্ চরের কথা বলছে ওরা।
বলেস্বরীর ওপারে প্রতি বছর শীতকালে যে চর জাগে ভুলেও তো এ পর্যন্ত কেউ
কোনদিন তার খোজ করতে আসেনি। প্রজাবিলি তো দূরের কথা সাময়িক
ভাবেও কেউ কোনদিন ইজাবার কথা বলেনি। শুধুই তো কচকচে বালির
ঢিপি। বোশেখ থেকেই আবার তলাতে থাকে। বর্ষায় একেবারেই তলিয়ে
যায়। মুখেরা কি ঐ বালির চরেই ঘর বাধবার ফন্দী আঁটছে !

বাখালকে ইতস্ততঃ করতে দেখে করিম মুখ খোলে, দয়া কইরা দেন কত্তা
আনাগ ঐ চরটুকুন। আল্লা আপনার যোঙ্গল করব।

বাখাল আর এক নজরে উভয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝে নেয়, আনাড়ী
দুটো ঐ শৃগু চরের জঞ্জাই ধনী দিচ্ছে। তাই দাঁও বুঝেই কোপ মারে, ও চরের
জন্তো তো অনেকেই আসছে হে। ঠিক মতো নজরানা দিতে পারবে কি ?
অনেক দাম ঐ চরের।

আমরা গরীব মানুষ। নজরানা কুথায় পামু হুজুর ? দয়া কইরা দেন
একটু আশ্রয়। আল্লায় ভাল করব আপনার, পুনরায় অহরোধ করে করিম।

খালি হাতে জমিদারের দয়া হয় না বাপু। মালকড়ি যদি কিছু এনে থাক
দয়া করে বাঁর করো।

আপনাগ ছিচরণে নিবেদন করবার মতন ধন দৌলত কি আমাগ মতন
কাঙালের ঘরে আছে কত্তা ? তবে এই যেৎকিঞ্চিং পেলামী আনিচি। দয়া
কইরা কলা কয়ডা সেবায় লাগাবেন দেবতা। দীহু গামছায় জড়ানো বেশ

স্বপ্ন ও পৃষ্ঠ একছড়া মর্তমান কলা গদীর ওপর রেখে টাকার খলির জন্ত কোমর হাতড়াতে থাকে।

করিমও টিক সেই একই ভাবে গণ্ডা পাচেক মুরগীর আঙা গামছার বাবন খুলে গদীর ওপর রাখতে যায়। দুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল ছফার ছাড়ে, আরে কর কি—কর কি! নীচে রাখ নীচে রাখ! রাখা কৃষ্ণ—রাবা কৃষ্ণ—হরি হে—

করিম খতমত খেয়ে ডিমগুলো নীচে নামিয়ে রেখেই দীহুর মতো টাকার খলি খুলতে থাকে। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে। ভয়ে আর একটি কথাও বলতে পারে না। মুখ কাঁচুমাচু করেই টাকার খলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাখাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ভূতা হরির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে, হরে, এই হরে—? হরি হয়তো নিকটেই কোথাও ওতপেতে ছিল। ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

রাখাল পুনরায় দাত খিঁচায়, এই যে নবাব পুতুর। এতক্ষণ ছিল কোথায়? আইজ্ঞা—মাথা চুলকাতে থাকে হরি।

আর 'আইজ্ঞাতে' কাজ নেই। চট করে এক কক্ষে তামাক দিয়ে ডিমগুলো ভেতরে নিয়ে যা। ছ'বেলা গিলবার বেশ ভাল স্বযোগই জটলো।

হরি তাড়াতাড়ি ডিমগুলো আঁচলে জড়িয়ে বেরিয়ে যায়। রাখাল দীহুকে লক্ষ্য করে টিপ্তনী কাটে, প্রথম কিস্তিতেই যে জমিদারকে কলা দেখালে মোড়লের পো।

কি যে কন কত্তা!—ঈশং হেসে উত্তর করে দীহু।

করিমও দীহুর সঙ্গে হর মিলিয়ে বোকার মতো খানিক হাসতে থাকে।

রাখাল স্বযোগ বুঝে পুনরায় প্যাচ কবে, ও কলা মূল্য হবে না হে। রূপচাঁদ কত এনেছ চট করে গুণে ফেলো।

দীহু করিম সোংসাচে খলির মুখ খুলে মাটির ওপর বসে গুনতে থাকে। সিকি, আনি, ছ' আনিতে মিলিয়ে নগদ পঞ্চাশ টাকা গদীর ওপর রাখে ছ'জনে।

রাখাল যেন তেমন খুশী নয়। তাজিল্য ভরেই কি যেন বলতে যাচ্ছিল, উভয়ে একযোগে উঠে এসে পা জড়িয়ে ধরে: কত্তা, আর একটা কানাকড়িও নাই আমাগ। পোলাপান লইয়া জলের উপুড় ভাসচি। দেন একটু আশ্রয়।

তোমরা দেখছি আমাকে ঠেকাতে চাও! বিধা প্রতি যে কুড়ি টাকা আদায়ের রীতি রয়েছে মালিকের।

আপনি কাঙালের মা বাপ। আমাগ মুখের দিকে চাইয়া দয়া করেন,—
আরো শক্ত কবে পা চেপে ধবে দীহু।

আঃ, কি মুশকিল, পা ছাড়ো। কি বল হে বিকাশ, দেওয়া যায় নাকি ?

মুহূবী বিকাশ দত্ত—পকাশউধ্ব বয়স। পাশে বসেই খাতা লিখছিল।
সেতাবেব ঘাটেব মতো একই হবে বাধা। কৃত্রিম দবদ চেলেই সম্মতি জানায়,
কি আব কববেন ? এবা তো দেখছি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মালিকেব
কাছে আমাদেবই গালমন্দ শুনতে হবে।

দেখ হে বাপুবা, নিমক-হাবামী কবো না। যাহোক একটা ব্যবস্থা কবে
দিছি। আমাকে না হয কলাই দেখালে। কিন্তু সামনেব হাটে এদেব অন্ততঃ
কিছু দিয়ে য়ো—নযতো বর্মেব কাছে ঠেকা থাকবে, বিকাশ আব হবিব উদ্দেশ্তে
ইঙ্গিত কবে বাখল।

কত্তা, আব আমাগ মাইবেন না। ঘবে একটা কানাকড়িও নাই। আল্লায়
দিন দিল ছোট কত্তাব জগু যা পাবি দিয়া যামু, কথা দিলাম। এহন ছান
আমাগ একটা ব্যবস্থা কইবা, কবিম পুনরায় কাকূতি জানায়।

বিকাস তুমিও যখন বলছ তখন দাও দু'জনকে দু'ধানা দাখিলা লিখে।

বাখালেব সম্মতিতে দীহু কবিম কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বিকাশ আলমাবী
খলে বসিদ বই বাব কবে লিখতে যায়। বাখাল পুনরায় নির্দেশ দেয়, হ্যাঁ, এখন
এক এক জনকে দশ বিঘাব দাখিলা দাও। বিঘা প্রতি বার্ষিক এক টাকা
খাজনা। হাঁ হে, চব তো দু'ভাগে ভাগ হয়ে উঠেছে, কে কোন দিগটা নেবে ?—
বিকাসকে নির্দেশ দিয়ে দীহুকে প্রশ্ন কবে বাখাল।

আপনাব পছন্দ মতন ছান যাবে যেদিগে খুশি। আমাগ কোন আপত্তি
নাই। তবে বিঘা পচিশেব কমে কিন্তু চাষ কইবা সুখ নাই কত্তা। গবীবেব
আর্জিভা বাখেন, দীহু হাত জোড় কবে পুনরায় আকাব জানায়।

তোমবা দেখছি বসতে পাবলে শুতে চাও হে। যা দিছি তাতেই মালিকেব
কাছে কি গালাগাল শুনতে হবে জানিনে। তার ওপব আবাব পচিশ বিঘে।
না হে না, ওসব বাড়াবাড়ি করলে আমি কিছুই করতে পারবো না। সরে
পড়ো।

মুখ কাঁচুমাচু কবে উত্তর কবে দীহু, তবে যা দিচিলেন তাই ছান কত্তা।
গরীববে আপনারা না দেখলে আর কেব্বা দেখব ? এহন আব না ছান না
দিলেন। তবে পরে য্যান বঞ্চিত না হই।

আচ্ছা হে আচ্ছা, পরের কথা পরে। আগে দেখি তোমরা কি রকম চাষ আবাদ করো তারপর অল্প কথা।

আশীর্বাদ করেন কস্তা, মুখ ঘ্যান থাকে। আপনাগ ঘ্যান খুশী করবার পারি,—গদ গদ হয়েই করিম উত্তর করে।

বেশ, ভাল কথা। দীহু, তাহলে তোমার রইলো উত্তর অংশ আর কবিমের দক্ষিণ অংশ।

মনের মতো জমি না পেলোও প্রথম প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় উভয়েই খুশী হয়। রসিদ ছ'খানা কৌচার খুঁটে বেধে পুনরায় রাখাল আর বিকাশকে প্রণাম করে কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, অসম্ভবই সম্ভব হলো আজ। অনেক দিন পর আবার হাতে মাটি এল। এখন মা লক্ষ্মীব দয়া হলে অচিরেই ভরে উঠবে গোলা গোয়াল। পূজো পার্বনে আবার মুখব হয়ে উঠবে সমস্ত বাড়ি।... দুই মিতার আনন্দ আর ধরে না। টাঁকে একটা পয়সাও নেই। তবু আজ আর কোন দুর্ভাবনা হয় না। মা লক্ষ্মীব ভিত যখন পাকা হলো তখন আর ভাবনার কি?.. মনের খুশীতেই ডিকিতে এসে ওঠে উভয়ে। ফুফুক ফুফুক শব্দে হুকো টানতে থাকে!

দীহু করিম কাছারি ছেড়ে বেরিয়ে এলে বিশ্বয়ের সঙ্গে মন্তব্য করে রাখাল, ও বিকাশ, আনাড়ী দুটো বলে। ক হে, রানুর ওপব চাষ করবে!

আনাড়ী না হলে আমাদের চলে কি করে দাদা?—হাসতে হাসতেই জবাব দেয় বিকাশ।

ঠিক বলেছ। এখন নজরানার খাতায় দশ টাকা হিসেবে বিশ টাকা জমা করে নাও। বাকীটা—হে-হে-হে, খাসা কলার ছড়াটা এনেছে হে। খাবে নাকি দুটো? হরে, এই ব্যাটা হরে,—হকার ছাড়তে ছাড়তে দুটো কলা অনিচ্ছ। সব্বই বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয় রাখাল।

যথা লাভ মনে করে কলা দুটো হাত বাড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখে বিকাশ।

হরি আনতো, ওরা দু'জনে, উঠে গেলেই পুনরায় ওর তলব পড়বে। তাই ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটে আসে।

রাখাল ওর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই টিল্লনী কাটে, কিরে ব্যাটা, ডিমগুলো এরই ভেতর সব সেক্ষ বসিয়ে দিলি নাকি?

আইজ্ঞা না। তবে হাতের খেইকা পইড়া দুইডা ডিম ভাইকা গেচ, মাখা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে হরি।

জোর মাথা ভাঙবো গাড়ল ! যা, বাকী সবগুলো একুশি নিয়ে আয় এখানে ।
হরি বেরিয়ে গেলে রাখাল পুনরায় মস্তব্য করে, বুলে বিকাশ, ব্যাটারি সব
ওত্ পেতেই আছে । স্ব্যোপ পেলেই ভাগ বসাবে ।

হরি ইত্যবসরে ডিম নিয়ে পুনরায় ফিবে আসে । ভাগের আশা ও ছেড়েই
দিয়েছে—মুখ চোখ গম্ভীর । কিন্তু রাখাল ওস্তাদ খেলোয়াড় । সে জানে,
খোদ মালিকের পিয়ারেব চাকর এই হরি । কিছু কিছু দিয়ে-থুয়ে মুখ বন্ধ না
কবতে পারলে নিশ্চিত হবার জো নেই । দুটো ডিম ভেঙে ফেললেও ফের দুটো
ডিম হবির হাতে দিয়ে সেখান থেকে ওকে তাড়ায়, যা ব্যাটা যা, এই দুটোই
বেঁধে খা গে । এক সঙ্গে বেশী ডিম খেলে পেট ছাড়বে ।

দুটো ডিম ভাঙবার পবেও পুনরায় দুটো ডিম পেয়ে হরি আশাতীত খুশী
হয় । রাখালকে আব-এক কলকে তামাক দিয়ে বেশ ফুঁতির সঙ্গেই হেঁশেলের
দিকে ছোটো ।

হবি বিদায় হলে এক-একটা ডিম হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে
রাখাল । খুশীতে গদ গদ । বিকাশকে লক্ষ্য করে পুনরায় উচ্ছ্বাস জানায়,
বেশ বড় বড় টাটকা মুবগীর ডিম হে বিকাশ । তোমার চলে নাকি ? আমাদের
তো ঠাঁড়ি হেঁশেলেই ঢুকবার জো নেই । বাড়ীতে রাখা গোবিন্দজীর বিগ্রহ
বয়েছে । তবে সেবার বুকেব ব্যামোটা চাড়া দিতে ডাক্তার দত্ত 'ছাপ্ বয়েল'
কবে খেতে বলেছেন । তাই লুকিয়ে চুরিয়ে—হে-হে-হে । নাও, তুমিও গোটা
পাঁচেক নিয়ে যাও । সকালে আধ সেন্দ্র করে খেয়ো । বেশী করে খাটতে
পাববে । বিকাশের তরফ থেকে উত্তবেব অপেক্ষা না কবেই পাঁচটা ডিম তার
দিকে এগিয়ে দেয় ।

বিকাশ ঈষৎ হাশ্বে ডিম পাঁচটা আলমারীর নীচে রেখে হাত বাস্তু খুলে
ত্রিশটা টাকা রাখালের হাতে দিতে যায় ।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করে বাধা দেয়, না হে না, তুমিও খেটেছ ।
তোমারও কিছু পাওয়া দরকার । ও থেকে পাঁচটা টাকা রেখে দাও । অসময়ে
কাজ দেবে ।

বিকাশ আরো কিছু বেশীই আশা করেছিল কিন্তু মুখ-ফুটে কিছু বলতে
পারে না । পাঁচ টাকা নিজের পকেটে রেখে বাকী পঁচিশ টাকা রাখালের হাতে
দেয় । ডিম, কলা আর টাকা নিয়ে অগ্নদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই
বাড়ির দিকে রওনা হয় রাখাল ।

অজ্ঞানের শেখাশেখি। চরফুটনগর সম্পূর্ণ জেগেছে। উত্তরে হাওয়ায় ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠছে বালির স্তর। দীলু করিম ডিক্কি থেকে নেমে চরের ওপর ঘর বাঁধে। সামান্য চালাঘর। খড়ের ছাউনি—পাট কাটির বেড়া। নদীর ভাবগতি না দেখে পাকা কিছু করা সমীচীন নয়। তাছাড়া অত পয়সাই বা কোথায়? শুধু একটু মাথা গুঁজবার ঠাই। দীর্ঘকাল পর ছেলেপুলেরা আবার একটু মাটির মায়ের স্পর্শ পাবে। ডিক্কির ওপর থেকে দিন দিন যেন অসার হয়ে পড়ছে। খোলা চরের ওপর একটু দৌড়ঝাঁপ। মাটির মায়ের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠবে কচি প্রাণ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ে চৈত্র। কাঠ ফাটা বোদ খাঁ খাঁ করে চরের ওপর। ঘূর্ণি হাওয়া ওলটপালট করে দিয়ে যায় ঘর-দোর। কিন্তু দীলু করিম দমে না। আবার খুঁটি পুঁতে বাঁধে ঘর—সোনালী ভবিষ্যৎ।

বৈশাখে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে। আকাশে ভেসে বেড়ায় রাশি রাশি ক্লষ্ণ মেঘ। বর্ষার পদধ্বনি শোনা যায় গগনে ভুবনে। একটু একটু করে আসছে নতুন জল। এবার কোমর বেঁধে কাজে লাগার পালা। জমি হারিয়ে অচল হয়ে পড়েছিল ওরা। উল্লেখ্যের মধ্যেই কাটলো এ ক'মাস। গ্রহের কের হয়ত বা কেটেছে। আবার জমি হাতে এসেছে। সোৎসাহে কান্ডে টোকা বার করে দুই মিতায়। চাষ নয়, জমি তৈবীর কাজ। বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে মা লক্ষ্মীর আসন। দেবীর ক্লুপা হলে গঞ্জের মাছুষ দেখবে যাদুর খেলা। উষর মরুভূমি উর্বর শস্য শ্রামলা হয়ে উঠবে।

একটু একটু করে বাড়ছে জল। নদীর পার ঘেঁষে পুঁতে দেয় দু'জনে থোকা থোকা কচি করচার চারা। সঙ্গে ধনুচে গাছ। গঞ্জের লোক দাঁত বার করে হাসে। আনাড়ী ছোটের মাথা খারাপ হয়েছে। আঘাতে যাবে সব ওলিয়ে।...

আঘাত আসে। চর ডুবে যায়। দীলু করিম আবার এসে ডিক্কিতে আশ্রয় নেয়। চালের খড় বেড়ার পাটকাটিতে জালানীর কাজ চলে। কিন্তু ধনুচে করচা ভাবে না। সজাগ প্রহরীর মতোই হাত ধানেক মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরই মাঝখানে বাঁধা থাকে উভয়ের ডিক্কি—দু'খানি ছোট সংসার।

বিধাতা বোধ হয় ওদের ওপর কিছুটা প্রসন্নই এবার। বর্ষাব ধকল এবার অনেকটা কম। বংশীর দৃষ্টিও যেন পড়েছে গঞ্জের দিকে। গঞ্জের পাড়ই দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে! চরফুটনগরের ওপর দিয়ে বইছে মৃদু শ্রোত। দ্ব দ্রাস্ত থেকে নদনদী বয়ে আনছে লক্ষ্মীর আশীস্-কণা—জমির প্রাণশক্তি পলি মাটি। দীহু করিম আসন বিছিয়েই রেখেছে। এখন মা-লক্ষ্মী এসে পায়ের ওপর পা তুলে কেবল বসবেন। ধনচে করচার গায়ে বেশ পুরু হয়েই ধবা পড়ে শস্তপ্রাণ। কার্তিকে আবার টান পড়ে জলে। করচা ধনচের গায়ে বেশ পুরু হয়ে জমেছে শেওলা। কচকচে বালির পবিবর্তে গোড়ায় জমেচে পাক। কাস্তে দিয়ে ঝটপট কেটে দেয় ধনচে করচার গাছ। হেমস্তের টানে থকথকে হয়ে আসে পাক দিন কয়েকের মধ্যে। উভয়ে মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দেয় বীজ কলাই চবময়। ভিটির ওপর আবো উচু হয়ে বালি পড়েছে। চর বেড়েছে স্থিগুণ হয়ে। দীহু করিমের সংসার আবার মাটিতে নেমে আসে। নতুন করে গোছ-গাছ চলে ধর-দোরের। প্রাণে আর আনন্দ ধবে না দুজনের। প্রথম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে।...

লক লক করে বেড়ে চলেছে কলাইয়ের ডগা। আর ক'দিনের মধ্যেই শুঁটি দেখা দেবে। নতুন পলির ওপর প্রথম আবাদ। ফলন বেশ ভালই আশা কবা যায়। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে চৈত্রেই ঘরে উঠবে দেবীর আশীস-কণা। গঞ্জের লোক হতবাকই হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ এসে কৃতূহল জানিয়ে যায়। ফড়েরা এসেও টোপ ফেলবার চেষ্টা কবে। দীহু করিম অষ্টগ্রহর তদারকে নিযুক্ত। গক বাছুরের মুখ লাগলে বাড় বাড়ন্ত দমে যাবে কচি কচি ডগাগুলোর। মান্নবের চোখকেও বিশ্বাস নেই। এক এক জনের দৃষ্টিতে যেন বিস মাথানো থাকে। চোখ পড়লেই জলে যায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাঁশের মাথায় কালো হাঁড়ি বেঁধে চুন দিয়ে পুস্তলী এঁকে দেয় উভয়ে। করিম ভাল বাড় ফুক জানে। বংশ পরম্পরায় ফকির ওরা। ফকির বংশ নামেই বংশের পরিচয় ওদের। বংশী এখন এমনভাবে শুকিয়ে গেছে যে হেঁটে পার হয় গরু, ঘোড়া, ছাগল, মেঘ। জায়গায় জায়গায় পায়ের পাতা পৰ্বন্ত ভাবে না। ওপার থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে উৎপাত শুরু করে। চোখের পলক ফেলবার উপায় নেই। শুধু পশুপক্ষীই বা কেন? মাহুষ চোরও কম নয়। তনতনে শুঁটির লোভ অনেককেই হাতছানিতে ডাকে।...

কাস্তনের মাঝামাঝি। শুঁটিতে পাক ধরতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সোনালী শস্তের ঝলমলানী। আর ক'টা দিন, তারপরেই শুরু হবে কাটা। কম করেও পঞ্চাশ পঞ্চাশ মণের আশা করে এক এক জন। খুলী আর ধরে না। সন্ধ্যার পর করিমের দাওয়ার ওপর বসে দুই মিতাতে কথা হচ্ছিল। হুকো খেতে খেতে দীমুই প্রথম কথা পাড়ে, ভাইসাব, ধান পাট বুনবার না পারলে ক্ষণ নাই। অভাব কিছুতেই ঘুচব না। চল আব একদিন গোসাইজীর কাছে যাই! চর ত অনেকটা জাগচে। কান ভাঙানি দিবার মাইনষের অভাব নাই।

আল্লার দোয়া অইলে সবই অইব ভাইজান। আর কয়ডা দিন সবুর কর। খালি হাতে গেলে কি তাগ মন পাইবা? কলাই কয়ডা ঘবে উঠুক, কিছু হাতে কইবাই যাওয়ন যাইব, হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে নিতে করিম উত্তর করে।

কলাই উঠতে আর মাসটাক। তদ্দিনে সব ষতম অইব। দেখবাব পাও না, মাইনষে কেমন ঘুর ঘুর করবাব নইচে?

আমাগ আন্না ভরসা। ই'ছাড়া উপায় কি?

উপায় একটা আচে ভাইসাব।

কি উপায় মোড়লের পো?—করিম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

আচে আচে, একটু ভাইবা ছাত, মূহু মূহু হাসতে থাকে দীমু।

আরে ধুতর ভাইবা ছাত, তুমি কও না?

দীমু সহজভাবেই বলতে থাকে, আরে আমাগ খালেব মুখে ডাল-পালা দিয়া রাখ্চি, দেখ্চ ত?

হ, তাত দেখ্চিই।

ঐগুলি উঠাইয়া পলে কেপলে কিছু বড় মাছ উঠব না?

হ, তাতে উঠবই। তবে মাছ দিয়া তুমি কি উপায় করবা? জাইলার মত মাছ বেচবা নাকি হাটে বাজারে?

তোমার দেখ্চি বৃইড়া বয়সে ভীমরতিতে ধরচে। মাছ বেচুম কান! ঐ মাছ দিয়াই আসল কাম সাকুম।

মাছ দিয়া কাম সারবা!

হ, হ, মাছ দিয়া কাম সাকুম। তুমি বোজ না কান? বড় বড় গোটা দুই গরমা যদি গোসাইজীর চিচরণে নিবেদন করবার পান্নি, তাইলে কাম হইব না?—দীমুর ওষ্ঠে হাসি খেলে।

কিন্তু করিম সায় দিতে পারে না। না, ভাইজান, ও মাছটাছ লইয়া গিয়া কাম নাই। হেবার দেখলা না, আঙা দেইখা গৌসাইজী কেমন রাগ করল ?

তুমি কোন খবরই রাখ না ফকিরের পো। ও রাগ-টাগ নোক ছাখানো। হরির মুখে আমি হনচি, গোটা আষ্টেক বাদে ও সব আঙাই তিনার প্যাটে গেচে। মাছ মাংস পাইলে আর কিচুই চাই না ওনার।

তুমি দেখচি আদা জল খাইয়া লাগচ। তবে আর কথা কি ? লও, কাইল খেইকাই কামে লাগি।

হ হ, কাইল খেইকাই। আর দেরি করলে আমাগ কপালে আর জমি আইব না। হরি কইল, আর অনেকে নাকি কাছারিতে যাওয়া আসা করচে।

করিম সে-কথায় সায় দিয়ে ভেতর বাড়ির উদ্দেশে ছাঁক ছাড়ে, কৈরে রচিম, কইলকাডা একটু বদলাইয়া দে। আর বেড়ার মন্ডি খেইকা এক-তাবড়াও দিচ একবার। মোড়লের পো, আহ, দয়াল চানরে আইজ্ঞ একটু ডাকি।

হ ভাইশাব, আমিও তোমারে তাই কইবার চাইচিলাম। অনেক দিন তোমাব মুখে নাম ছনি না।

কলকেতে ছুঁ দিতে দিতে রহিম আসে। ফতিমা কয়েক খিলি পানও সঙ্গে দিয়েছে। হুকোয় গোটা কতক টান দিয়ে একতারা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। দীঘু দোহারের জন্ত তৈরী হয়। বসন্তের মাতাল বাতাস বয়ে চলে দাওয়ার ওপর দিয়ে। স্বচ্ছ চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রাণের আবেগে গান ধরে করিম। উভয়ের মিলিত কণ্ঠ অম্বরপিত হতে থাকে চরময় :

তুমি কোন বা ছাশে রইলা রে দয়াল চান।

আমি তোমার লাগিয়া যগিনী সাজিলাম

হারা-ইলাম কুলমান ॥

আলা-ইয়া প্রেমের বাতি

বইসা রইলাম সারা রাতি

তুমি না আসিলা গুণনিধি

বল কেমনে বাঁচে পরান ॥

চৈত্রের মাঝামাঝি কলাই ঘরে ওঠে। উভয়ের জমি আলাদা আলাদা। দীহু সত্তর মণ পেয়েছে। করিম একাত্তর মণ। যেমন বড় বড় দানা তেমন ধিয়ের মতো রং। নতুন শাড়ী পরে দুই গিন্নী প্রথম শস্ত ঘরে তোলে। কতিমা পীরের শিমির জন্ম নতুন মাটির কলসীতে আলাদা করে এক মণ কলাই উঠিয়ে রাখে। কুসুমও গোপীনাথের ভোগের জন্ম মণ খানেক আলাদা করে রাখে। সেবার দীহুর ইচ্ছে ছিল অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপান্ন প্রহর নাম গান করায়। কিন্তু সে সাধ ওর পূর্ণ হয়নি। রাফুসী পদ্মা সব তছনছ করে দিলে। নিজেরাও এতদিন জলের ওপর ভেসেছে। ঠাকুরের রুপায় আজ একটু আশ্রয় মিলেছে। অষ্টপ্রহর ছাপান্ন প্রহরের খরচা যোগানো এখনো সম্ভবপর নয়। এখন যৎসামান্য ভোগ নিবেদন মাত্র। মা লক্ষ্মীর পূজোও কোনরকমে সারতে হবে। গত বছর তো জলের ওপর ভিক্ষির মধ্যে হয়েছে। দেবীর রুপা হলে আবার কবিগান যাত্রাগান হবে। আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়বে। আরার উৎসব-মুখর হয়ে উঠবে দশদিক।...স্বপ্নে স্বপ্নে রঙীন হয়ে ওঠে সোনালী ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবারের হাটবার। মাত্র চার আনায় পাঁচ সের কলাই বেচে দেয় দীহু। সবটা দিয়েই গোপীনাথের আখড়ায় গিয়ে বাতাসা কিনে ভোগ দিয়ে আসে। ঠাকুর দেবতার ভোগ না দিয়ে একটা কানাকড়িতেও হাত ছোঁয়ানো চলাবে না। মরে গেলেও না। প্রথম শস্ত বেচা পয়সা—ও তো ঠাকুরেরই প্রাপ্য। তাঁর দয়াতেই তো অকূলে কূল পেয়েছ—ক্ষেত ভর্তি ধি-কলাই। বেশ ঘটা করেই হরিলুট দেওয়া হয় চার আনায় পাঁচপো বাতাসা। গোবিন্দ কীর্তনিয়া আসে। সন্ধে ত্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু। দীহু নিজের দোহার টানে—খোল বাজায়। ঘণ্টা দুই চলে নাম গান। তারপর বুম্বরের সন্ধে অঙ্গ ছলিয়ে নৃত্য। মে'ঘরা উলু দেয়। মোহন্ত চরণ দাস মন্দির থেকে ছিটিয়ে দেন মুঠো মুঠো লুটের বাতাসা। যে যেভাবে পারে লুকে নেয়। যে না পারে তাকে পরে হাতে হাতে বেটে দেওয়া হয়। মাত্র চার আনায় প্রাণগন্ধা বয়ে যায়।

রাখাল গোসাঁইকে দুটো বড় গরমা ও বুড়ি খানেক গল্‌লা চিংড়ী ভেট দিয়ে পাঁচ বিধে করে আরো দশ বিধে জমির দখল পায় দুই মিতায়। কলাই বেচে

পঁচিশ পঁচিশ করে নগদ টাকাও দিতে হবে পঞ্চাশটি। আর দুটো দিন দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। পদ্মার পার থেকে অল্প একদল চাষী এসে নাকি ধর্না দিতে শুরু করেছিল। রাখাল নিতান্ত খাতির করেই ওদের দিলে। তাইতো বললে সে। নাকগে, ঠকা জেতা যাই হোক—জমি তো হাতে এল। এখন দায় শুধু ঐ পঞ্চাশটি টাকার। তা দর যতো মন্দাই হোক এতগুলো কলাই বেচে এ টাকা শোধ দেওয়া যাবেই।...দীহু করিম অনেকটা নিশ্চিত। গজ থেকে দলে দলে সব ফড়েরা আসছে। অবশিষ্ট কলাই রেচে ফেলবার জন্ম উস্কানীরও অস্ত নেই। কিন্তু ওরা পাকা চাষী। কখন দর ওঠে আর কখন দর নামে পূর্ব অভিজ্ঞতায় সে-পাট ওদের জানা। এখদ চাই ধৈর্য। দাঁতে দাঁত চেপে থাকা। অভাব তো সংসারে লেগেই আছে। ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলোও যেন এক-একটা খুদে রাক্ষস। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাই এক বাটি পাস্তা নয়তো এক কাঠা গুড় মুড়ি। তা ওদেরই বা আর দোষ কি? ভালমন্দ তো আর কিছু মুখে দিতে পায় না। ঐ তো সামান্য দুটি ভাত আর মুড়ি। তাও না দিতে পারলে দাঁড়াবে কি দিয়ে? এ সময় হাটের রোজগার নেই বললেই হয়। চৈত্রের মন্দায় কোন চাষীই হাতের জিনিষ বেচতে বাজী নয়। ফড়েরাও বসে বসে আঙুল চুষছে আর হা হতাশ করছে। অভাবের তাড়নায় দীহু করিমও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক-একবার ভাবে, কলাই ক'টা বেচে সব ঝগাট চুকিয়ে ফেলে। রাখালকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপরেই নিভর কবছে জমির পাকাপাকি বন্দোবস্ত। তাবপর এখন বলদের আবশ্যক না থাকলেও একটা দুধেল গরু না হলে ছেলেপুলেদের বাঁচানো শক্ত। বর্ষার আগে ঘব-দোরের ওপরও নজর দেওয়া দরকার।...কিন্তু মোটে তো ঐ ক'টা কলাই সম্বল। এখনকার এই মাটির দরে বেচলে ক'টাকা আব হাতে থাকবে? ফড়েরা চরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুকো টানে। মূঠো ভর্তি কলাই হাতে নিয়ে যাচাই করে দেখে। কিন্তু দর আর কিছুতেই ওঠে না। সব শেরালেরই যেন এক রা। মাত্র একজন অতিকষ্টে দু'টাকা এক আনা দর দেয়, আর সকলেই দু'টাকা। কিন্তু তিন টাকার কম দরে বেচলে যে সংসার ধরচাই কুলোবে না। দীহু করিম দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে।...

• বৈশাখের মাঝামাঝ। দু'টাকা দু'আনা দরে সব কলাই বেচে দেয় উভয়ে। না বেচে উপায় নেই। সামনের হাটে রাখালকে টাকা না দিলে সব ব্যবসাই বানচাল হয়ে যাবে। জল আসার আগে সমস্ত চর জুড়ে লাগাতে

হবে ধনুচে করচ। এবার আর একা একা সব পেরে উঠবে না। কতিমা কুসুম সাহায্য করলেও জন দুই কামলা নিতে হবে। টাকার অভাবে গত বছর অপেক্ষা এবার বেশি দেয়িই হয়ে গেল। ভাগ্যিস জল এবার নামি আসছে। নয়তো বাড়তেই পারতো না ধনুচে করচার চারা। শিকড় ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তলিয়ে যেতো সব। মীরপুরের হাট থেকে গরু আনতে হলে সেও এই শেষ সময়। এবপব আর হাঁটা পথে গরু আনা সম্ভবপর হবে না। বড় নৌকায় চড়িয়ে গরু আনায় অনেক খবচ।...সাত পাঁচ ভেবে গোলা উজাড় করেই কলাই কঁটা বেচে দেয় দুজনে। বাড়ির উঠানে শক্ত কবে বাধা হয় মাচা। নদীর পার ঘেঁষে ধনুচে কবচাও টায় টায় লাগানো হয়ে যায়। রাখালের নিকট ওয়ালাও সময় মতোই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দুখেল গাই আর গোয়ালে আসে না। হাড় জিরজিব কবছে ছেলেপুলেগুলোর। মুখে আঙুল চুষেই দুধের তেঙা মেটায়। বুক ফেটে যায় দুজনেব। কিন্তু কিছু কবার উপায় নেই! অবস্থা চরমে ওঠে আঘাতে। কলাইয়ের মণ সাড়ে তিন টাকা। চোখের জলের সঙ্গে নদীর জল মিশে সমস্ত চব তলিয়ে যায়। তবু ভাগ্যি ভাল যে এবাব আর ডিক্কিতে উঠতে হয় না। মাচাব ওপরেই কোনরকমে টিকে যায়।

আবার কর্তিক আসে, জলে টান ধরে। চতুর্গুণ হয়ে জেগেছে চব। নাগিনী কন্ঠা ধলেখরী কিমিয়ে পড়েছে। একদা বিষ-দাঁতে কেটে ক্ষেত খামার তছনছ করেছে। কিন্তু এখন আর ওর সে দাপট নেই। বর্ষায়ও এখন আর তেমন ফণা তুলে নাচতে পারে না। বালিতে বালিতে বৃকে যেন পাষণ চাঁপা পড়েছে। দু'চার বছর অন্তবই তাই ওকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দেখা যায়। প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগবলয়। ব্রহ্মপুত্র নন্দন বংশীও আজ নিশ্চল। পিতৃদত্ত ব্রহ্মতেজ একেবারেই ত্রিয়মান। চবে চরে বিস্মক বক্ষকোষ। কোনরকমে এ ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে গড়িয়ে চলেছে মাত্র।

দীর্ঘ করিম ষথাবীতি কলাই ছিটিয়ে দেয় থকথকে পলির ওপর। সন্ধে ছোলা মুগ। বিস্তৃত অঞ্চল আজ শস্ত-দায়িনী হয়ে উঠেছে। অস্থবর বালুকারাশি উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। খুশীতে উপচে পড়ে উভয়ে। আর বিধা দশেক করে জমি দখলে এলে মুখর হয়ে উঠবে সংসার। আবার যাত্রাগান, কবিগাঁন আর ধামাল উৎসবে মেতে উঠবে আনাচে কামাচে। লক্ষ্মীর পদধনী শোনা বাচ্ছে। শুধু বরণ করে ধরে তোলা।

মরহমে মণ মণ বিক্রি হয় মুগ, কলাই, ছোলা । লক্ষ্মীর কাঁপি ফেঁপে ওঠে দিন দিন । রাখালকে পঞ্চাশের জায়গায় একশ দিয়ে আরো পাঁচ পাঁচ বিঘার অধিকার লাভ হয়েছে । কিছু কলমুল মাছ মিষ্টিও দিতে হয়েছে । গঞ্জ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল চেউ টিন আসে । শালের খুঁটি পুঁতে উঁচু ভিতের ওপর তৈরী হয় পাকা ঘর । কলাগাছের সারির ভেতরে সোনালী রন্ধুরে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে নতুন ঘরগুলো । গঞ্জের লোকের চোখ বলসায় । মাত্র বছর তিনেকের ভেতর স্বপ্ন দেখছে ওরা । চরফুটনগর এখন এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শস্ত-ভাণ্ডার । জমির দাম কাঠা প্রতি পঞ্চাশ বাট টাকা । রাখালের আকসোস হয় এতগুলো জমি হাতছাড়া করে দিয়ে । খোদ মালিকের কাছেও কটকটি শুনতে হয়েছে ওদের । ইচ্ছে থাকলেও দীহু করিম আর অধিক জমির আশা করে না । বালির টিপি শস্তাগারে রূপান্তরিত হয়েছে । এখন তো জুয়াড়দের পাল্লা চলবে । ধাপে ধাপে চড়বে জমির দাম । যা হোক, মা লক্ষ্মী হাতে তুলে যা দিয়েছেন তাতেই ওরা খুশী । নাগ নাগিনী যদি আর ওদের ছুবলে না খায় তা হলে কেটে যাবে দিন কোনরকমে । পূজো-পার্বণে বংশের ধারাও রক্ষিত হবে । বংশী ধলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায় উভয়ে, দোহাই মহাদেব মহাদেবী, রক্ষা করো আমাদের । কাঙালদের আর মেরো না ।...

এবার লক্ষ্মীপূজো ভিটির ওপরেই হয় । পূর্বরীতি অনুযায়ী গান-বাজনা না হলেও গঞ্জের জন কয়েক সাধু সঙ্কনের পদধূলি পড়েছিল । পেট ভরেই প্রসাদ পেয়েছেন সকলে । মোহন্ত চরণ দাসের অহুগ্রহে গোপীনাথের ভোগও হয়েছে মণ খানেক চালের অন্ন দিয়ে । শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তিনিয়া, অথও সাধু সকলেই যোগদান করেছিলেন । বেশ জমেছিল আসর নাম গান আর পালা গানে । তিন মণ ছুঁধের শিল্পিতে নারায়ণ পূজোও সম্ভবপর হয়েছে শুভ গৃহ-প্রবেশ-লগ্নে । গঞ্জের আবালবৃদ্ধ দলে দলে এসে প্রসাদ পেয়ে গেছে । সঙ্কে মূঠো মূঠো কচকচে মুড়ি ।...

করিমের বাড়িও উৎসব-মুখর । বছর তিনেক লাগ্নে পড়ে সব বন্ধ ছিল । ভিটে ছাড়া হওয়ায় শিশু সামন্তদের কোন খোজ খবর ছিল না । ইচ্ছে করেই কোন সংস্রব রাখেনি করিম । ছিন্নমূল মাহুয়ের আবার পরিচয় কি ? সে না ঘাটের না পথের । আজ খোদাতায়ালার ইচ্ছায় আবার সব হতে চলেছে । বাড়-ছুক এতদিন প্রায় বন্ধই ছিল । কাছের মাহুযও এতদিন ওর গুণপনার কোন সন্ধান পায় নি । ককিরাস্তি ওদের বংশের সাধনা । রুজি রোজগারের

ফন্দি নয়। তাই শত অভাব অভিযোগেও কারো নিকট হাত পাততে পারে নি। ও যেন ভুলেই গিয়েছিল সব মন্ত্রতন্ত্র। মিতা দীহু সব খবর রাখে। সম্পদে বিপদে সে-ই একমাত্র সাথী। কিন্তু দীহুও এতকাল সমগোত্র হয়ে জোয়াল টেনেছে। কারো কাউকে সাহায্য করার মতো সঙ্গতি ছিল না। দু'জনে একসঙ্গে নিরালায় বসে দয়াল চানরে ডেকেছে। খোদা দয়াময়। সংসারে দুঃখ আবার কি? বরং ভাগ্যবান ওরা। মিত্রতা ওদের অন্তরে বাহিরে। এক সঙ্গে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে এক সঙ্গে তীরে উঠেছে। এ যেন এক তন্নীতে পৃথক সত্তা। একজন কাঁদলে আর একজন কাঁদবে, একজন হাসলে আর একজনও হাসবে।

মাষী পূর্ণিমা। তিন বছর পর আবার করিম ফকিরের বাড়িতে ধামাল উৎসব শুরু হয়েছে। ফকিরাস্তির চরম উৎসব ধামাল উৎসব। দূর দূরান্তের শিষ্য সামন্তদের চিঠি লিখে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ ছুটে এসেছে, কেউ প্রণামীর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। একাদশী তিথি থেকেই খোলা হয়েছে মণ মণ চালের অন্নসত্র। চরফুটনগরের কারো বাড়িতে এ ক'দিন রান্না হবে না। অতিথি অভ্যাগতসহ খাও দাও আনন্দ কর। হোগলার ছাউনী দিয়ে নতুন নতুন ঘর তোলা হয়েছে চরময়। শত শত নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। দোকানীরা এসে দোকান খুলেছে। মেলায় পণ্যের বিপুল সমাবেশ। শূন্য চর কলকণ্ঠে মুখর। যাহুই বোব হয় জানে দীহু করিম। উৎসাহী জনতার মধ্যে কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গেই মন্তব্য করে, আরে এই তো কথা। এত বড় গুণী না হলে বালির চরকে কেউ এমন করে গড়তে পারে? সব ভোজবাজী। করিমের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় আশপাশের সমস্ত গায়ের লোকের। দলে দলে এসে মোমবাতি জ্বলে দিয়ে যায় ফকিরের আসনের সামনে। ফল ফুল বাতাসার ছড়াছড়ি। স্তূপাকার হয়ে পড়ে পয়সা, আনি, দু'য়ানি, টাকা। করিম এর একটি পয়সাও হাত দিয়ে ছোঁবে না। সব উৎসবে খরচ করে দিচ্ছে। আজ ওর পরম সৌভাগ্য। অগ্নিনতি মাহুশ এসে জমায়িত হয়েছে চরফুটনগরে। কারো তেলপড়া হাই, কারো বা জলপড়া। আপাদ মস্তক বেড়েও দিতে হবে কাউকে কাউকে। বিরামবিহীনভাবেই যথারীতি করে চলেছে করিম। বিরক্তির লেশ মাত্র নেই চোখ মুখে।

আজ পুণ্যাহ। সকাল থেকেই নিয়মিতভাবে ব্যাঙ বাজছে। আজ আর কোনরকম ঝাড়-ফুক হবে না। সমস্ত দিনরাতই চলবে গান। বিরাট

চব্বর জুড়ে আসর তৈরী হয়েছে। আকাশে ধ্বজা উড়ছে পং পং করে। রান্না খাওয়ার আজ বিপুল সমাবেশ। টাকা-কড়ি যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে সব উজাড় করে খরচ করা হবে। কাপড়, গামছা সব বিলিয়ে দেওয়া হবে গরীব দুঃখীকে। যদিও সংসার আছে তবু ফকিরের কোনরকম সঞ্চয় রাখতে নেই। বিশেষ করে দয়াল চানের নামে যা এসেছে তা তো নয়ই। করিম মহাশুণী।—সমস্ত চরফুটনগর জুড়েই যেন আজ খুশীর বান ডেকেছে। জীবনের বড় সঞ্চয়ই হলো আনন্দ। কবিম সেই আনন্দ সায়বেই ডুব দেয়।...

এক-একটি বর্ষা যায় চরফুটনগরের এক-একটি অঞ্চল ফেঁপে ওঠে। বছর পাঁচেকের চেণ্টায় ক্ষুদ্র চর বিরাট এক পল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছবেই নতুন নতুন মাহুশ ঘর বাঁধছে। চাষের জমি মেলাই এখন ভাব। জমিদার রমেন্দ্র নারায়ণ বায় চৌধুরীর মরা গাঙেও আবার জোয়াব বইতে শুরু হয়েছে। উজ্জ্বল জীবন যাপনে লাটের কিস্তি বন্ধ হয় হয় অবস্থা। প্রজাব বুকেব ওপর বাঁশ ডলাই করেও সংকুলান হচ্ছিল না। চরফুটনগরবে চবই আবাব নতুন সমৃদ্ধির সূচনা করেছে। ছোট ছোট খেও 'চলেছে প্রজাবিলি। মোটা নজরানা। একসঙ্গে অধিক জমি কাউকে দেওয়া হয় না। নায়েব গোমস্তাকে আর বিশ্বাস নেই। বছর তিনেক নিয়মিত এসে ঘাটে লাগছে তাঁর "গ্রীণবোট"। বৈশাখ জ্যেষ্ঠে আগমন, আশ্বিন কা্তিকে প্রত্যাবর্তন। দীহু করিম আর ছিটে-ফোঁটা জমিও পায় না। তা না পাক, মা লক্ষ্মী ওদের কুশলেই রেখেছেন। চরের মোড়ল ওরাই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও ওদেরই। বিপদে আপদে ওদেরই শরণাপন্ন হয় চরের মাহুশ। ছোট বড় প্রায় শ'থানেক ঘরের বসতি। লোকসংখ্যাও হাজারের ওপর।...

চর দু'ভাগে ভাগ হয়েছে, মাঝখানে খাল। দীহুরা জাতিতে নমশূদ্র। উপাধি বৈরাগী। বংশ পরম্পরায় হরিভক্ত ওরা। প্রতি সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করা, বৎসরে একবার অষ্টপ্রহর মহোৎসব করা, বিপদে আপদে লুটের মানত করা ওদের বংশ-রীতি। জাত বোষ্টমের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। পুরোপুরি সনাতন পন্থী। কাছা দিয়েই কাপড় পরে। তবে তিন লহরে কার্টের মালা ওদের প্রত্যেকের গলাতেই শোভা পায়। বোষ্টম নয়—হরিভক্ত বৈষ্ণব। দীহুর নাম অহুসারেই খালের নাম বৈরাগীর খাল নামে পরিচিত। বর্ষায় কানায় কানায় ভরে ওঠে—শীতে শুকিয়ে যায়। রমেন্দ্র নারায়ণ গঞ্জে

এলে রাজিবাস খালেব মুখেই কবেন। সম্ভবতঃ ঝড় তুফানের হাত থেকে গ্রাণবোট রক্ষা করা। গত দু'বছর থেকে একটু নেক-নজবই পড়েছে যেন তাঁব চবফুটনগরের ওপব। বর্ষে বর্ষে চরফুটনগব বাড়ছে—তাব আশা আকাজ্ঞাও। অর্থ চাই—প্রতিপত্তি। হয়তো আরো কিছু।

॥ ৬ ॥

বংশী বয়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণে, ধলেশ্বরী পূবে পশ্চিমে। নদ নদীব সক্ষম কেন্দ্র থেকে বদ্বীপেব মতো উঠেছে চরফুটনগব। বংশীব পূর্ব পাড়ে গঞ্জ সাভাব। ধলেশ্বরীব দক্ষিণ পাড়ে চবধল্লা—বর্ধিফু খামাব বাড়ি। চব না বলে ধল্লাকে সমৃদ্ধশালী জনপদ বলাই সমীচীন। চবফুটনগব অপেক্ষা চবধল্লাব ভৌগোলিক স্থায়িত্বও কয়েক পুরুষেব। বেশ কয়েক ঘব সম্পন্নশালী গৃহস্থেব বাস। অদিবাসীরা অরিকাংশই মুসলমান। সাদাসিধে ওদেব চাল চলন—সহজ সবল মনোবৃত্তি। মিথ্যে কথা কেউ বলাতে পাবে না ওদেব দিয়ে। স্বয়ং পীব এসে বললেও না। চবধল্লাব মোডল পলান বেপাবি।

আকাজ্ঞান বাট বছব বয়সে বেহস্তে গেলেন। পলান বছব দশেকেব বালক। আকাজ্ঞান তো শৈশবেই গত হয়েছেন। কি দিয়ে গেলো বহমৎ পলানকে? ছোট্ট একখানা ঝড়েব চালা ঘব আব গোটাকতক মাটিব সানকী পডা, বদনী। পোডা পেট কি আর ওতে চলে? বহমতের দোষ নেই। কিছু খামাব জমি তাব ছিল। গোটাকতক গরু বাছুবও। পলান তো 'কাল গাইযেব' দুধ খেয়েই মাহুব হয়েছে। গ্যাট্টাগোট্টা চেহারা তো সেই অতীতেবই সাক্ষ্য। কিন্তু বান্ধসী এলেশ্বরী সব গিলে খেলে। জমিজমা তলিয়ে গেল—আকাজ্ঞানকে খেলো কাল নাগিনীতে।

আঘাটেব বাত। ঘূট্ঘূটে অমাবস্তার স্বচ্ছকাব ভেপসা গবমে ঘবে তিষ্ঠানো দ'ঘ। দাওয়ান'র ওপর খেজুব পাতার পাটি বিছিয়ে শুয়েছে ছালেহা। পলান তখন দুধের শিশু। সাবা দিনের ষাট্টিনীর পর এক নিমেষে দু'চোখ এক হয়ে আসে ছালেহাব। রহমৎ নিয়মিত মাচার ওপরেই শোষ। ওব আবাব জিজ্ঞে মাটি সহ হয় না। স্নেহার ধাত—একটুতেই কাশির দমক ওঠে। দস্তি পলানকে বৃকে চেপে মাই দিতে দিতে অসাড়ই ঘুমিয়ে পড়ে ছালেহা। হঠাৎ বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ছোবল পড়ে। "মলাম মলাম, কালিয়ে

নিল কালিয়ে নিল” বলে চীৎকারে সমস্ত বাড়িখানাই যেন ডুকরে ওঠে।
 রহমতের ঘুম পাতলা। চীৎকার শুনে শিয়রে রাখা রামলা নিয়ে মাচা
 থেকে এক লহমায় লাফিয়ে পড়ে। না না, চোর ছাঁচর নয়। লঠন ধরিয়ে
 কাছে আসতে না আসতে বাজীমাত। মুখ দিয়ে গোলা উঠছে ছালেহার।
 অঝোরে খুন বরছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে। রাক্ষসী অনেকটা
 মাংস ছুবলিয়ে খেয়েছে। রহমতের বুঝতে দেবী হয় না। তাড়াতাড়ি পাটের
 দড়ি দিয়ে তিন জায়গায় তাগা বেঁধে ফেলে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে।
 কালনাগিনীবি বিষ দমকে দমকে উঠেছে শিরা উপশিরায়। কিছুক্ষণ দাপা-
 দাপি করে নিস্তক হয়ে পড়ে ছালেহা। বহমতের বুক কেটে কান্না আসে।
 সোরগোল শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড় হয়। ওরা ককিরও আসে। তিনদিন
 তিন বাত্রি চলে ঝড় ফুঁক। কিন্তু ছালেহা আর জাগে না। রাক্ষসী
 ধলেশ্বরী ওর গোরস্থানটা পদন্ত উদরে পুবেছে। যাক—সব যাক। রহমতের
 কোন শোক আকসোস নেই। ছালেহাই যদি না বইলো তবে আর জমজমা
 দিয়ে কি হবে? নদী আব নাগিনী কাকেও তোয়াক্কা করে নাও। বয়সেও
 ভাটি পড়েছে। এখন আর ওকে মেয়ে দেবে কে? তা ছাড়া কি আছে যে
 তাই দেখে পরেব কি হবে আসবে! সবই তো তলিয়ে গেল। নতুন করে
 গর বাধা আর হয় না রহমতের। পলানের দিকে চোখ তুলে চাইতে পাবে না।
 আধ আধ কথায় ‘আম্মা আম্মা’ বলে চীৎকার করে পলান। গলা শুকিয়ে
 ওঠে দুধের তেষ্ঠায়। এক হাতে চোখ পৌঁছে আর এক হাতে পলানকে
 সামলায় বহমৎ। কিন্তু পলানকে ভালভাবে মাহুষ করতে হলে গৃহলক্ষ্মীর
 দবকাব। মনকে শক্ত করতেও চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সব-দোরে
 পা দিলেই যে ছালেহার কথা মনে পড়ে। পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে
 গাঙের ঘাটে জল ভরতে যেতো ছালেহা। দাওয়ার ওপর বসে কঙ্কর
 পর কঙ্কর তামাক খেতো আর অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতো রহমৎ।
 মাঠ থেকে কিরতে দেরি হলে নিজে ছুটে যেতো ছালেহা নাস্তা নিয়ে।
 কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ঝাওয়াতো...আঁচল দিয়ে বাতাস করতো।
 ...রহমতের হুঁচোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কালনাগিনী ওকে খায় না কেন?
 একবার বাগে পেলে বিষ দাঁত ভেঙে দেবো না।...না না, সবই ষোড়াতারালার
 মর্জি। কপাল ভাল হলে অসময়ে ছালেহাই বা যাবে কেন আর পলানেরই বা
 এত দুঃখ হবে কেন? গলায় কলসী বেঁধে ধলেশ্বরীর জলে ডুব দিলে সব জালা

জুড়ায়। কিন্তু পলানের কি উপায় হবে? খাঁ বাড়ির আর রইলো কি পলান ছাড়া। ঘর-দোর জমি-জমা গরু বাছুর সবই তো গেল। একমাত্র পলানই যা ভরসা। ছালেহার বুকের রক্ত বইছে পলানের শিরায় উপশিরায়। পলানের মধ্যেই বেঁচে আছে ছালেহা। পলান—পলান পলান, ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরে রহমৎ পলানকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ওর কছি সোন মুখ।

মা ছাড়া দুধের শিশুকে মাছুষ করা কঠিন কাজ। আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ কেউ নিতেও চেয়েছিল পলানকে। কিন্তু রহমৎ দেয়নি। সংসারে ওর আর এমন কি কাজ? ক্ষেতখামার সবই তো গেছে। একা পলানকে সামান্য একটু যত্ন-আত্তি করতে পারবে না? নিজের জন্তুও তো ছুটো চাল কোটাতে হবে। পলানকে ভাসিয়ে দিলে বেহস্ত থেকে কি ছালেহাই ওকে ক্ষমা করবে?...অন্ত পর কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের জিন্মায়ই রাখে রহমৎ পলানকে। মাত্র দশে পা দিয়েছে পলান, রহমতেরও ডাক আসে ছালেহার পাশে।

দশ বছরের পলান আজ পঞ্চাশউর্ধ্ব পা দিয়েছে। জমিজমা, ক্ষেত খামার, বাড়িঘর, নৌকো, ডিক্সি সব হয়েছে। চরধল্লার মাথা আজ ও। ওর একটি মাত্র ইন্ধিতে সমস্ত চর ওঠে বসে। সালিসী দরবার কোন কিছুই ওকে ছাড়া হয় না। চরের কোন চাষী মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিতে গেলেও চাই ওর সই-সাব্দ—জামিন হওয়া। পলানের স্বথ সমৃদ্ধি অতুলনীয়। আল্লার মর্জিতে চরধল্লার কেউ কোনদিন না খেয়ে থাকে না। ঈদ, মহরম, রমজানেও প্রাণ খুলে মাততে পারে সকলে। চরধল্লার পসার লোভনীয়। গজ থেকে দলে দলে ফিরিওয়ালারা আসে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে। শাড়ী, গামছা, ফুলেল তেল নিয়েও আসে কেউ কেউ। সব নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। আর হবে নাই বা কেন? চরধল্লা তো এ অঞ্চলের মধ্যে পাটের একটি খুদে আড়ত। ক্ষেতের ধান, কলাইতে সারা বছরের ধোরাক চলে। পাট থেকে আসে বান্ডতি পয়সা। গঞ্জের বাজারে অন্ত অঞ্চলের পাট দশ টাকা দরে বিক্রি হলে চরধল্লার পাট বিক্রি হবে কম করেও দশ টাকা আট আনা দরে। এ অঞ্চলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাট বলতে চরধল্লার পাটকেই বোঝায়। ১৩৩২ সালে চড়া দরে পাট বেচেই সমস্ত চরময় নতুন ডেট টিনের ঘর উঠেছে। সোনালী রন্ধুরে ঝলমল করে চরধল্লা। গাঙের পথে নৌকোয় যেতে যেতে ভিন্দ দেশী মাছুষ হতবাক হয় চরধল্লার সমৃদ্ধি দেখে। ছোট বড় ঘরগুলোর

ওপর কলার-বাড় আর বাঁশ-বাড়ের ছায়াবান্ধী চলে বসন্তে শবতে। চর নয়
তো খেন এক ইন্দ্রপুরী।

হঠাৎ পাঁচ-সাত টাকা থেকে ত্রিশ-বত্রিশ টাকায় ওঠে পাটের মণ।
মহাজনের বাদ-বকেয়া কজ এক বছরে শেখ হয়ে যায়। গঞ্জের বাবু ভূইঞাবা
এবার আর ইলিশ মাছ ও ফজলী আম মুখে দিতে পারে না।

আত্রে কত চাই? দুই টেহা? নামাইয়া খোঁও মাঝির পো, আট আনাব
ইলিশ দু'টাকায় কিনে নিয়ে যায় চরবল্লাব এক চানী। পকাশ টাকার পাট
তিনশ' টাকায় বেচে হাত ভাঁও কবকরে নোট পেয়েছে আজকেব হাটে। আট
আনার ইলিশ দু'টাকায় খাবে তাতে আর হয়েছে কি? ক্ষেতে ফ বছর সোনা
কণ' ব। আনন্দে খাবে ঘুমাবে গান গাইবে। চাষের কলাকৌশল যখন জানা
আছে তখন আর ভাবনার কি? টাকায় চারটে দরের ফজলী আম দু'টাকা
দেখ তিনটে কিনে নিয়ে যায় আর একজন। হল্লে রঙের বাছাই মাথায়
লে গঞ্জের এক বাবুমশায় দব ক্যাঁকাষ করে দাঁড়িয়েছিলেন।

বন ঘান। হাঁড়ি ভর্তি মিঠাই মণ্ডা এক একজন চাঁবার হাতে।
সেবারে কারো সাবা নেই পাট-চাঁবার নজব বাচিয়ে কোন জিনিস
কিনে ঘান।

আল্লায় করনে নামনেব সন আর বান বুধুম না মিক্রা, একতাজা নোট
প্রণ ও প্রণ.ও মন্তব্য) ক.ব একজন আর একজনকে পক্ষ্য কবে। সকলেব
মুখঃ হাসিমুখী বাঁড়ি বাঁড়ি কাপড়-চোপড় আব ষাডসামগী কিনে ভিকি
তানায় দেখে মনব স্থখে। সারি গায়—চলে বঙ তামাস।

চরবল্লা আব চবফুটনগবে চলে মিতালী। ধলেশ্বরী স্মৃতিকা কৃগিনীব
ম গ্রাই নিজীব না আছে শ্রোত না উচ্ছ্বাস। সর এক কালি কপালী জরিব
দে ও খেন এক বেকে চলেছে আপন খেয়ালে। হাঁটা পথেই পাবাপার চলে।
চবল্লায় মাষ্টর আসে চবফুটনগবে। চরফুটনগবেব মানুষ যায় চরবল্লায়।
হেনসয় ভলে টান এবলেই ছোটবা একটু একটু করে পা কেলেতে গুরু করে।
গামছ বা লুক্কখানা মাথায় জড়িয়ে দিব্যি পাব হয়ে যায়। বর্ষার ধলেশ্বরী
দিমাতার মতোই এতদিন ওদেব দুঁরে রেখেছিল। ভিকি বেয়ে ষাতায়াত সব
সময় সম্ভবপর ছিল না। স্বযোগের অভাবে অনেক সময় মনের বাসনা চাপতে
হয়েছে। এবাব রাক্কসী শায়েক্তা হয়েছে। ছোবল মারা তো দুঁরের কথা পাশ
ফিরবার ক্ষমতাও এখন নেই

ডান পা'টা কিছুদিন থেকেই কনকন করতে শুরু করেছে পলানের। গঞ্জের ভোলা কব্জের ওষুধে এক গালা চাঁকা নষ্টই হয়েছে কেবল। কল কিছুই হয়নি। পা'টার জন্ম দিন দিন বড় ভাবনাই হচ্ছে পলানের। বেঁচে থেকেও খোঁড়া হয়ে থাকবে নাকি ও! কাজের বল যতই থাক—পায়ের বল না থাকলে চাষার চলে কি করে!...করিম ফকিরের তো বাড়ফুঁকের স্থখ্যাতিব অন্ত নেই, গেলে হয় না একদিন? সাকিনা তো অনেক দিন থেকেই ওষুধ ছেড়ে ফকিরের শরনাপন্ন হতে বলছে। সেই ভাল, যাওয়াই যাবে একদিন, হ'কো টানতে টানতে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল পলান।

সাকিনা মাস কলাই ফোটা'নো একবাটি গরম সরসের তেল খাতে নিয়ে কাছে এসে বসে। আন্তে আন্তে মালিশ শুরু করে। একটু ঝাজের সঙ্গেই বলে, কত দূর ছাশের মানুষ আইসা বালো হইয়া যাইবার নৈচে। আর ডুমি কাচের ধনে কাচে তাই যাইবার পার না?

পলান নিজের গরজেই যাবে বলে স্থির করেছিল। বউয়ের কথায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। ছেসে হেসেই সম্মতি জানায়, তা তোমরা তগলেই যখন কইবার নৈচ তখন যামুনে একদিন ফকিরের কাচে।

সাকিনা খুশী হয়। তাইতো, পূবন মাগুঘের ডান পায়ের বল। সেই ডান পা-ই যক্তি না রইলো তবে কাজকর্ম করবে কি দিয়ে? পলানের সম্মতিতে সোৎসাহেই জবাব দেয়, হ হ, তাই যাও। মিচামিচি আব দেবি কইরা কাম নাই। কাইল বিহানেই যাও।

পলান পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। স্বঘোদয়ের আগেই চরফুট-নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শুনেছে, সকাল আর সন্ধ্যা বেলাই বাড়ফুঁকের উপযুক্ত সময়। কিছুটা অস্থবিধা হলেও তাই যায় পলান। পীর পয়গম্বরের কাছে যেতে হলে শুধু হাতে যেতে নেই। গতকাল বিকেলেই একটা বড় তরমুজ ক্ষেত থেকে উঠিয়ে রেখেছে। বেশ বড়। পাঁচ সাত সেরের কম হবে না। কাটলে যেমন টুকটুকে রং তেমন মিষ্টি হবে। চতুর্থ পুত্র ফজলুলকে সঙ্গে নিয়ে চল। খোঁড়া পায়ের এত বড় তরমুজ বয়ে চলা সম্ভবপর নয়। ফজলুলই একটা ধামায় করে তরমুজটা নিয়ে চলে। পীর পয়গম্বরের কাছে আবার শুধু ফলও দিতে নেই। সঙ্গে মিষ্টি দিতে হয়। নম্বতো কোন কলই পাওয়া যায় না। দিন কয়েক আগে নতুন আখের গুড় তৈরী হয়েছে। এক কলসী গুড়ও সঙ্গে দেয় সাকিনা।

সকালে দাঁড়ায় ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল করিম। মিতা দীহুও পাশেই বসে। চাম্বাসের কথাই হচ্ছিল উভয়ের মধ্যে। আর কিছুটা বেলা হলেই পাস্তা খেয়ে মাঠে যাবে। পাটের নিড়ানি চলছে। হুকোটা দীহুর হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বিশ্বয়বোধ করে কবিম, ক্ষেতের আল ধবে ও পলান ব্যাপারী আসচে না!

হ, ব্যাপারী সাব্-ই তো!—দীহুও বিশ্বয় জানায়।

আজ ক'বছর হলো ওবা চবে এসেছে। ষংসামাগ্র চাযাবাদ করে কিঞ্চিং হুখেব মুখও দেখেছে। কিন্তু পলান ব্যাপারীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পাবে না। আট-দশখানা হাল পলানেব বাড়িতে। তা ছাড়া আছে ধান চালের কাববাব। বড় বড় দু'টো গস্তি নোকোও আছে। হাজার মণ ধান ববে এক-একটায়। হাটে বাজাবে অনেকদিন দেখা হয়েছে পলান ব্যাপারীব সঙ্গে। সৌভাগ্যশালী পুরুশকে দেখে মনে শ্রদ্ধাও জানিয়েছে উভয়ে। কিন্তু কখনো বাক্যালাপ করতে সাহস পায়নি। ভিন্ গায়ের মাহুস তাতে বড় লোক। ডেকে কথা না বললে কথা বলে কোন সাহসে?...পলান যতই ফকির বাড়ির দিকে এগিয়ে আস'ত ততই যেন ওরা হতবাক হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পলানেব মধ্যে কোনরূপ দ্বিবা নেই। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা এসে ফকির বাড়ির উঠানে দাঁড়ায়। আগে থেকেই সহাস্ত্রে আদাব জানায় করিম-দীহুকে। সাধারণ একখানা লুঙ্গি পরনে। কাঁধেব ওপর আধ-ময়লা আর একখানা ঢাকাই চাদর খোপানো। গায়েব বং নিকষ কালো। যেন তেল চোরাজ্ছে সারা গা বেয়ে। মাথায় বেতেব টুপি।

দীহু-করিমও যুগপৎ আদাব জানিয়ে পতমত খেয়ে যায়। এত বড় মাহুস, কোথায় কিসের ওপর বসতে দেবে ভেবে পায় না। কবিম একটা মাহুরের জগ্গ ভেতর বাড়ির উদ্দেশে ডাক হাঁক শুরু কবে।

পলান বাধা দেয়, আরে খাউক। মাহুরের কাম কি? মাটিই খাটি। খপ করে দাঁড়ায় ওপরেই বসতে যায়। ডান পায়ে টান লাগে। স্বল্পণার ককিয়ে ওঠে।

করিম সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করে, কি অইল ব্যাপারী সাব্?

আর কন ক্যান্। এই পাওডার লাইগাই ত আপনার ঠাই আইলাম। বাতে ধরচে।

করিম উত্তর দেবার আগে দীহুই আলসের আঙনে নতুনটুকরে তামাক

সঙ্গে পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মস্তব্য করে, ওয়ার পাইপা। কচু ভাবনার নাই। ফকিরের পো'ব এক ফুঁ, কোথায় ছুইটা ঘাইব বাত টাত।...

হ হ, আন্নর কাছে তাই কন। একটা ফুঁতেই ঘান হুত পলায়। অমাবইস্তায় পুন্নিমায় বড় কষ্ট পাই।

করিম জিজ্ঞাসা করে, বাসি মুখ ধুইয়া আইচেন নাকি ?

হ, নাকে মুখে ত জল দিচিই।

তাইলে কাইল বিহানে একবার না ধুইয়া আইবেন। খোদাব দোয়া হইলে তিন ফুঁর বেশী চাইব ফুঁ লাগব না। ধান, তামক ধান। তরমুজটা তো বড় কবব আনচেন ?

হ, খোদাব দোয়ায় ইবার ফলন খুব জোবই হইচে। শ'চাবি বেচলাম ই পষ্মস্ত। আব শতাবিদি অইব ক্ষ্যাতে আচে। ভাললাম পীবের কাছে যাম—খালি হাতে যাই কি কইবা। তাই এই গুড়-টুকুন আর তবমুজা লইয়া আইলাম। দাওয়াত দিয়েন আসনের কাছে। বযবে বাজান বয। ষাড়ইয়া রইলি কান ?—কজলুল ধামাটা উঠানের ওপব নামিয়ে বেগে দাতিয়েছিল। ওকে বসতে বলে জোবে জোরে হুঁকো টানতে থাকে পলান।

কজলুলকে এতক্ষণ বসতে না বলায় করিম লজ্জাই পায়। তাডাতাডি নিজের ভুল শোধরাতে চেষ্টা করে, ইদিকে এই ছেওয়ার মজি আইস' বস বাপ। আহা-হা চখ মুখে ঘান কালি ছড়াইয়া দিচে, কামডা বালো কবেন নাই ব্যাপারী গাব। পোলা-পানরে দিয়া কি এত বড় মোট বয়ায় ? ই গা আপনাব-

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান উত্তর করে, আমার চতুর্থ ছাওয়াল ফজলুল। হে হে হে—, ফুকক ফুকক শব্দে হুঁকো টানতে থাকে আবার।

তাই কন। আয় বাজান আয়। এইখানে আইসা বয়।

কজলুল ইকিত মতো কাছে গিয়ে বসলে ওর গায়ে মাধায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে করিম। হাসিমুখেই অন্তঃপুরের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে, কইরে বিটি, কব্বেক খিলি পান দিয়া যা। ব্যাপারী সাব, আইজ পবথম দিন আপনাগ পায়ের ধুলা পড়ল। কি দিয়া আব শাতির করম! দুইডা ছাতু মুড়ি দেই ?

না না, আপনি আ্যাত উতলা অইবার নৈচেন কান ? কপালের ক্যার না কাটলে কি আব আপনাগ মতন মাইনবের দেখা পাওয়ন যায় ? কতদিন খেইকাই ত ভাবচিলাম, আপনাগ চরে আহি। কিন্তু তা আর অইল কই।

ছাত্তু মুড়ি লাগব না। দয়া কইরা আমার পাওভারে সারাইয়া ছান। তাইলেই আমি আপনার বান্দা অইয়া থাকুম, বিনীতভাবেই প্রত্যুত্তর করে পলান।

তোবা তোবা। খোদাব দোয়া মাগেন। আমি কেজা? আমি ত তাব নকর।

আপনেইত আমার লাইগা তেনার কাচে নালিশ করবেন। আমবা পাপী তাপি মাহুয কি আর তেনাবে ডাকবার পারি?

কন কি ব্যাপ্যাবী সাব। পরান খুইলা দীন দয়ালবে ডাকবেন হার আবা কথা কি।

ত ৩ ব্যাপ্যাবী সাব, আহেন না একদিন সন্ধ্যা বেলা, ফকিবের পো'র মুখে গান ছনবেন। দয়াল চানবে এমুন কইরা ডাকে যে পরান আপনার খেইকাত মোচড় দিয়া ওঠে, দীহু সায দেয়।

বৈবাগীব পো'বে চিনলেন নি ব্যাপ্যাবী সাব?—দীহুকে দেখিযে পুনবায জিজ্ঞেস কবে কবিম।

আবে কি যান কন। ওনাবে ই মুহুকে কেজা না চিনে। হগল (সকল) লাকেব মুখেই না ওনাব নাম। ই তল্লাটে ওনার মতন কলাই কলাইবাব গাবচে বেভা? চবে এ্যাদিন আছি নাই বইলা কি গুণী মাইনবের খোহ, খববও বাকি না?

কি যান কন। আপনাব নখের যুগিয়া মাহুযও আমরা নই। পলান ব্যাপ্যাবীর নাম সাত গায়ের কেজা না জানে? দীহু অধিকতব বদান্ধতা জানায়।

পলান উত্তবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—মেহেবা একখানি বেকাবিতে কবে কয়েক খিলি পান নিয়ে প্রবেশ করে। মুখের কথা মুখেই থেকে যায় পলানব। মেহেবাব রূপ দেখে ছ'চোখ বিন্ময়ে কেটে পড়ে। বছব দশ বার বয়স মেহেরাব। নিচৌল স্বাস্থ্য। গায়ের বং উজ্জল গৌরবর্ণ।

মনে মনেই ভাবতে থাকে পলান, আল্লা আমাকে অনেকগুলো ছেলে দিয়েছেন। কিন্তু এরকম ফুটফুটে মেয়ে একটিও দেননি। ফকিব সাহেব যদি দিতেন আমাকে এই মেয়েটিকে...

মেহেবা কাছে এলে করিম অভ্যর্থনা জানায়, ব্যাপ্যাবী সাব, পান খান। এই আমাব বেটি।

বাইচা খাউক, বাইচা খাউক। আপনি ত আসমানের চান কোলে পাইচেন ফকিব সাব।

মেহেরা রেকাবি রেখে ততক্ষণে পালিয়েছে। দীলু স্বযোগ বুঝে পলানের কথার জবাব দেয়, আসমানের চানরে আপনার ঘরে লইয়া যান না ?

কি যান্ কন্ ! ফকির সাব কি আমার কালা পোলার লাগে ছাব দুদের মতন ম্যায়া (মেয়ের) সাদী দিব ? ফজলুর ত আমার সাদী অইয়া গেচে । এহ্ন বাকী কাশেমের । কাশেমের গায়ের রং ত না যান আলকাত্তা ।

বেটা ছাওয়ালের আবার গায়ের রং দিয়া কি অইব । চরিত্তির বালো রাইখা গতর খাটাইবার পারলেই অয় (হয়), উত্তর করে দীলু ।

তা যদি কন তাইলে নিজের পোলার স্থখ্যাতিই করম । চাম আবাদ ত এহ্ন কাশেমই ছাতে । আর স্থহাব চবিত্তির কথা মাইনঘেরে জিগাইলেই পারবেন ।

মাইনঘেরে আর জিগান লাগব না । আপনাব ঘরের পোলাপান বালো অইব না ত কার ঘরের পোলাপান বালো অইব ? এহ্ন কণ্ জান, আসমানের চান আপনি ঘরে নিবেন কি না ?

ফকির সাব কি কন ?—দীলুকে পাশ কাটায় কবিমকে জিজ্ঞেস করে পলান ।

ইত আমার নচিতের কতা । আপনার ঘরে যদি মেহেরা যাইবার পারে তার ধনে (থেকে) আর আনন্দের কি অইবার পারব । দব দরজার ফ্যারে (ক্ষেত্রে) পইড়া তিমসিম খাইবার নৈচি তাই । নইলে কি আব আমাগ সব ঘরে এত বড় শ্রায়না ম্যায়া থাকে ?

পলান খুশীতে ডগমগ । সোৎসাহেই বাধা দেয়, আল্লায় অরে আমার লাইগাই রাখচে ফকির সাব । বাড়ি গিয়া ফজলুর মারে কইগা । আম্মাজনের নিজে আইয়া একবার দেইখা যাউক ।

পোলার সাদী যখন তখন ত আপনেই কতা । আপনে কথা দিয়া যান, দীলু বাধা দেয় ।

ঘাবলান ক্যান মোড়লের পো ? ই ম্যায়া দেখলে পোলার মায় আর না কইবার পারব না । কাশেম ছাব (তার) আতুইরা গোপাল । টুক টুইকা বউ চাই ছাব । মেহেরা মারে দেখলে পাগল অইয়া যাইব । আইজ তাইলে উঠি । কাইল বিহানে বাছি মুয়ে আছম (আসব) । পলান উঠে দাঁড়ায় ।

দুইভা কিছু মুয়ে দিয়া গেলে খুশী হইতাম, বাধা দেয় করিম ।

পোলার সাদী অইলে ত রোজই আহম কুটুম বাড়ি, তখন যত পারেন

পাওয়াইয়েন। ঘুম খেইকা উইঠাই চইলা আইচি। হকালের (সকালের) কাম কাইজ কিছুই অয় নাই। এহন কিছু মুকে দিবার পারুম না, পলান উত্তব কবে।

তাইলে বাপজান কিছু খাইব, পুনরায় আবার কবে কবিম।

আইছা, দেন অরে আপনার যা মন চায়।

করিম ফজলুলকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। দীপ্ত আব এক কলকে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

গোটা কয়েক টান দিয়ে মস্তব্য করে পলান, হ, তামুক ধত দিবেন আমার না নাই। তামুক না অইলে এক দণ্ডও চলে না আমার।

আর কন কাবে? আমারও ঐ কতা। তামুকেই বুদ্ধি খোলে তামুকেই অয় শক্তি জোয়ায়। খান, বালো মতিহাবী পাতাষ তৈয়াব।

করিম দীপ্ত অনেকটা পথ পলানকে এগিয়ে দিয়ে আসে। ফিরতি পথে দীপ্ত উক্লাস জানায়, ভাই সাব, মা লক্ষীর রূপায় সবই এখন আপনাব খেইকা অইবার নৈচে। ব্যাপারী সাব তো বাড়ি বইয়া আইহাই মেহেবা মাবে নিবার চাইল। আর ভাবনার কিছু নাই।

সব কাম আগে মিটা বাড়িক তারপর কইও। খোদাব মর্জি বোজন যায় না।

তুমি দিন রাইত কয়াল চানরে ডাক। দায়ল চান তোমার অমুজল করবাব পাবে না।

জানে ধয়াল! এহন মেহেরাব মার কি মত হাড়াও গ্যাহ।

মেহেরার মাই সাদীর কতা ছনলে (সুনলে) খুশীই অইব।

তবু ছার মত লওয়ন লাগব। ম্যায়ার সাদীব চিন্তায় ত ছার চক্ষে ঘুম নাই।

হ, সব ম্যায়া মাইনযেরই ঐ এক কতা। নিশার মাও পোলার বিয়্যার লাইগা উতালা অইচে। দিন রাইত ঘ্যানর ঘ্যানরের কামাই নাই।

তা তুবন বিশ্বাসের ম্যায়ার লগে না কাম ঠিক অইয়াই আচে। ছাও না সাদী দিয়া?

না, অত দূর ছাশে কুটুম বাড়ি করুম না। কেডা যাইব পদ্দার পারে?

পোলার সাদী দিয়া বউ ঘরে আনবা ছার আবার দূর ছাশে কি করব?

হ, দেনি। একটা কিছু করন লাগবই। বেলা অইল, আনিও বাড়ি বাই।
আর এক ছিলুম তামুক ধাইবা না? নও, তোমার ছামনেই মেহেরাব মার
কাছে কথাডা পারি।

তবে নও।—তুই মিতায় গল্পে গল্পে পুনরায় এসে দাওয়ার ওপর বসে।
তামাক টানতে টানতে কতিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ে শীত। কতিমা
আশাতীত গম্বী হয়। পলান ব্যাপারীর ঐশ্বৰ্যের কথা তার কানেও গেছে।
স্বখেই থাকবে মেহেরা। পুস্তক মাহুয়ের গায়ের বংকে ও গাছ করে না।
বড় মধুময় মনে হয় আজকের এই সকাল।

॥ ৭ ॥

পলান বাড়ি ফিরলে সাকিনা ছুটে এসে প্রশ্ন করে, কি কইল ককির সাব?
পাওডা বালো অইব ত?

পলানের চোখে বোধ হয় এখনো মায়ী কাজল লেগে রয়েছে। সাকিনার
প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আপন খেয়ালেই জিজ্ঞেস করে, ছোট পোলার
সাদী দিবা নাকি ফজলুর মা?

রাগে সাকিনার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর করে, তুমি
তাইলে ফকিবের কাছে যাও নাই!

আরে যামু না ক্যান? খেইখান খেইকাই ত আইলাম। হাসতে হাসতেই
জবাব দেয় পলান।

যদি হেইখান খেইকাই আইহা থাক তবে কইল কি ককির সাব আগে
তাই কও!

বাহি মুকে ধাইবার কৈচে কইল। তিন ফুর বেশী নাকি চাইর ফু
লাগব না।

আল্লাহ ককক তাই য্যান অস্ত। আমি পাঁচ টেহার শিন্নী দিমু।

তুমি ইরা খোও—পাও আমার বালো অইয়াই গেচে। ককিরের কি আর
আমার পাও বালো কইরা না দিয়া উপায় আচে? নিজের গরজেই দিব নে।

ক্যান, ই কতা কও যে?

তোমাতে ত কইলাম, পোলার সাদী দিবা নাকি। বউ পাইবা না ত য্যান
আসমানের চান পাইবা।

হ, তুমিত তিন পোলাব বডই আমাবে আসমানের চান আইনা দিচ।
তোমার কতায় আমি আব কাশেমবে সাদী দিমু না।

আবে তাইত কই, কাইল বিহানে নও না আমাব লগে। নিজেব চক্ষেই
দেইখা আইছ (এসো)।

ফকিব সাবাব ম্যায়া আচে নাকি ?

ম্যায়া থাকব না তবে কি পোলাব লগে সাদী কথা কইবার নৈচি নাকি
আমি ? ম্যায়া ত না যান আসমানের চান। ৬৬দব মতন বং। এহন তোমাব
কাল মানিকের লগে ছাব। সাদী দেখ কি না তাই ছাহ।

না দেখ না দেউক কাশেমও আমাব ফালনাব না। গায়ে গজবে
সোনাব দেখাত।

নিজেব পোলাব বডই নিচ্ছ কইব না। দশ জনে কইলে তবেই
নালা।

কা, কেবা আমাব কাশেমবে মোন্দ কয় ভনি ?

না, তোমার পোলা হীবা টকবা।

হীবা টকরা না অব না অটল বাইচা থাকল এমনেই কত আসমানের
চান আইচা গডাগডি বাইব

আবে বাগ কব কান ফকিব সাব ত তোমাব কাল মানিকের লগে ছাব
ম্যায়াব সাদী কতা নিজেব পেইকাই কটল।

তাই কও ! তুমি নিজেব চক্ষে দেখচ নাকি ম্যায়া ?

দেখচি না। না দেখলে তোমাবে এত কইবা কইবার নৈচি কেমন কইরা ?

তবে ঠিক কইবা ফাল।

তুমি দেখবা না ?

কি যান কও ! কটম বাড়ি ম্যায়া মাইনসে কোনদিন আগে যায় নাহি
না কি) ?

দেইখ, পাচে যান আমাবে গাইল মোন্দ কইব না। আমি কইলাম কাইলই
পাকা কতা দিবা আভম।

তোমাব পোলাব সাদী তুমি পাকা কতা দিবা না ত গায়েব নোক আইচা
দিব নাকি ?

হ, এহন বালো ম্যায়াব কতা ছইনা বুজি আমাব পোলা অইল।

আইচা, না অব আমাব একলার পোলাই। এহন খোদাব দোয়ান তোমাব

পাওজ সারলেই বাঁচি। নাচতা বাড়া রৈ চে। যাও, হাত পায়ে জল দিয়া
আহ, কথার মোড় ঘুরিয়ে সাকিনা হেঁশেলব দিকে রওনা হয়।

খিদেম পলানের পেটও চৌ চৌ করছে। বদনীর পানিতে তাড়াতাড়ি হাত
মুখ ধুয়ে পেতে বসে।

কবিম ফকিরের কেরামতিতেই হোক কিংবা পূর্ব ব্যবহৃত কোন ওষুধের
গুণেই হোক—পলানের পায়ের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। দিন তিনেকের
ঝাড় ফুঁতেই পায়ের কনকনানি একরকম নেই বললেই হয়। বোয়াল মাছ আর
কলাইয়ের ডাল খেতে নিষেধ কবেছে কবিম। অথচ এ দুটোই পলানের প্রিয়
খাদ্য। তা হোক, খাবে না বোয়াল মাছ আর কলাইয়ের ডাল। পা
সাবলে ঢনিষায় খাবার জিনিষের অভাব নেই। কত ভাল ভাল খাবার
বয়েছে।

তিনদিন সমানে যাতায়াতের পব কুরিমও একদিন আসে পলানের বাড়ি।
মিতা দীর্ঘকৈ সঙ্গ কবেই আসে পলানের ঘববাড়ি দেখে ছুঁচোখ বিশ্বয়ে ভবে
ওঠে ছ'ভনাব। গোয়াল ভর্তি গব বাছুর। সাববন্দী টেউ টিনের দর
চারদিকে। বাব বাড়ি আব ভেতব বাড়িতে মস্ত বড় উঠোন। বাড়ি থেকে
নেমেই ধু ধু কবছে অনন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বাড়ি নয়তো যেন এক ফলস্ত
বাগিচা। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ থেকে আবস্ত করে যাবতীয়
ফলফুলের বিস্তৃত সমাবেশ। কবিম আপন মনেই ভাবে, মেহেবা যদি এ বাড়ির
বউ হয়ে আসতে পাবে তবে সেটা ওর পরম সৌভাগ্য।

পলান একবকম জোব করেই বাঁচি ভর্তি ছুধ, মুড়ি ও পাঁচ সাতটা করে
বড় মর্তমানে কলা উভয়কে খাইয়ে দেয়। সাকিনা আড়াল থেকে দেখে ফকির
সাবকে। কাঁচা পাকা গোক দাড়ী মুখ ভর্তি। আলখাল্লার মতো ঢোলা সাদা
পাঞ্জাবী গায়ের পবনে সাদা লুঙ্গি। অত্যন্ত সাদাসিধে। হ্যাঁ, এ রকম বাপের
মেয়ে বসনা হয়ে যায় না। বেশ লম্বা চওড়া মাছঘটা। কাশেমের বিয়ে
এঁর মেয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে। সাদী পাকা করতেই মত দেয় সাকিনা।
দিন পনেরো পরেই ধুমধাম।

আসমানের চাঁদ ঘরে আনে সাকিনা। চরধল্লার মুখে মুখে মেহেরার
রূপের প্রশংসা। হায়-আকসোসই করে অনেকে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল
এতকাল? এতদিন তো কারো নজরেই পড়েনি। ভাগ্যবানেরই ভাগ্য

খোলে। তবে এই মেয়ের সঙ্গে কি আর ঐ কেলে-মানিককে মানায়? শুধু পয়সা দেখেই মেয়ের সাদী দিয়েছেন ককির সাব।

বছর বারো বয়েস কাশেমের—বেশ গ্যাট্রাগোত্রা চেহারা। দোষের মধ্যে শুধু আবলুস কাঠের মতো রং। পাথুরে গোপাল ঘেন। বছর দুই গঞ্জের পাঠশালায় যাতায়াত করেছে কাশেম। সাকিনার ইচ্ছে, ছেলের মধ্যে অল্প কেউ লেখাপড়া না করলেও কাশেম অন্ততঃ কিছু শিখুক। কেউ যে কোরান গানাও পড়তে পারে না! ওর বড়দা কত স্বন্দর করে পড়ে।...

বছর দুইয়ের চেষ্টায় অক্ষর পরিচয় হয় কাশেমের। খিতিয়ে খিতিয়ে চাপার অক্ষরবেব কিছু কিছু পড়তেও পারে। মোটামুটি লিখতেও পারে বড় বড় কবে। নিজেব নাম—বাড়ির ঠিকানা—ভাই বেরাদারদের নাম। কিন্তু সাকিনাব পক্ষে আর বেশী দিন বৈধ রাখা সম্ভবপর হয় না। ঐ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে তো আর কারো গোলামী করতে যাবে না কাশেম। কোবানখানা যখন পড়তে পারে তখন মিছিমিছি লোঁড়রাপ করে লাভ নেই। বোজ রোজ নৌকোয় করে গঞ্জ যাওয়া সোজা কথা নয়। তাছাড়া ঝড় বাদল খবায় কষ্ট কি কম হয়? এক ফোঁটা ছেলে সোজা পরিশ্রম করেনি। ৫'বছর সমানে টানা-হেচড়া করেছে। সকাল দশটায় ডিক্তিতে উঠেছে আর ফিরেছে সেই সূর্য ডোবে ডোবে। মুখখানা ঘেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠতো। কাজ নেই আমার বেশী লেখাপড়া শিখে। শেষটায় কি বাছা আমার মরবে?... পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কাশেমের। দিনকয়েক ওকে বন্ধু-বান্ধবদের জল্প মন-মর' হয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টায় নতুন করে উৎসাহ এসেছিল। কিন্তু অঙ্কুরেই ছাই চাপা পড়ল। কাশেম এখন দাদাদের সঙ্গে মার্চেই যায়। চাষ আবাদের কাজেই চলে নতুন করে হাতখড়ি। দিন কয়েকের মধ্যেই ভুলে যায় বই খাতাপত্রের কথা।

ওসমান আর গণি ধান চালের কারবার করে। বড় বড় ছুটো গন্ডি নৌকোয় চলে আমদানী রপ্তানীর কাজ। হাজার মণ ধান-চাল ধরে এক একটায়। পাঁচ ছ'জন করে দাঁড়ি মাঝি প্রতিটিতে। চোর ডাকাত গাঙ্গা সর্বদা ওঁতপেতেই আছে। বাগে পেলেই লুট করবে নয়তো ছিনিয়ে নেবে মূলধন। কিন্তু গণি ওসমানকে ঘায়েল করা সহজ কাজ নয়। গায়ে এক এক জনের অস্ত্রের বল। তা ছাড়া আছে জোয়ান জোয়ান মাঝিমান্নার। সকলেই চরের মাছুষ—চেনাশুনো। নির্ভয়েই কাজ করে চলেছে উভয়ে। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন

বাড়ি থাকতে পারে। বাকী পাঁচ দিনই কাটে গন্তিতে। সেখানেই আহার— সেখানেই নিত্রা। কেবলমাত্র আর কঙ্গলুল দেখে ক্ষেত খামারের কাজ। পলানও প্রত্যন্ত মাঠে আসে। বাতে পলু হবার আগ পর্যন্ত নিজে ভাল ধরেছে। এখন আর তা পারে না। ছেলেদের কাজেরই তদারক কবে। দাড়িয়ে দাড়িয়ে হুকো খায়। তুলচক হলে শুধরে দেয় সকলকে। উপরি মজুরবাও কেউ ওর চোখকে কাঁকি দিতে পারে না। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চাশ আবাদ। শোকজন গরু বাড়রে সদাসর্বদা সরগরম।

ওসমান আর গণির বউ সংসারের কাজে সাহায্য করে সাকিনার। চাকব চাকরাণীতে মিলেও আছে আরো দশ বারো জন। কিন্তু হলে কি হবে চাকররা তো সকলেই ক্ষেত খামারের কাজে বাস্ত। ওদের দিয়ে সংসারের কুটোগাছও ভেঙে ছুঁখানা করানো যাবে না। উল্টো ওদের ভাত জল করতেই সকলকে হিমসিম খেতে হয়। এদিক থেকে মাত্র দুটো চাকরাণীই যা সাহায্য করে। ঘাট থেকে বয়ে বয়ে জল আনাই তো এক দুঃসাহায্য কাজ। নদী ছাড়' কোথাও একবিন্দু জল নেই। রান্না-খাওয়া থেকে হাত-মুখ ধোয়া সমস্ত কাজই হলে ঐ নদীর জল দিয়ে। তারপর আছে ধান, চাল, মুগ, মস্তুরি বেড়ে পুঁচে গোলায় তোলা। দৈনিকের রান্না নয়তো যেন এক মুসাকিরখানার কাজ। অষ্টপ্রহর উন্নন জলছেই। এছাড়া আছে মুড়ি ভাজা, ধান ভানা, ঘরদোরের কাজ। কাপড়-চোপড় ময়লা হলে তাও বাড়িতে সেক করেই ঘাটে গিয়ে কেচে আনতে হবে। সকাল সন্ধ্যা যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায় সাকিনা টেরই পায় না। গণির বউয়ের আবার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা কোলে। কাজ করবে কি ওদের সামলাতেই ও দফারফা। ভাগিস ওসমানের বউয়ের কোন ছেলেপলে হয়নি। কঙ্গলুল বউ তো এখনো লায়কই হয়নি। আমিনা আনোয়ারাব সঙ্গে ওকে দিয়েও কেবল ফাই-ফরমাসের কাজই চলে। এদিক থেকে দেখলে কাশেমের বউ ঘরে এসে স্তব্ধেই হয়েছে। তবু তো ছুঁ গ্রাস জল গড়িয়ে দিতে পারছে।' বয়েস হয়েছ, এখন আর কত খাটবে ও ?...মেহেরার কপের কথা চিন্তা না করেই ছোট পোলার বউ ঘরে আনে সাকিনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমিনা আর আনোয়ারাকে নিয়ে। মেহেরাকে দিয়ে সংসারের কোন কাজই ওরা করতে দেয় না। নিজেরাও অনেকটা জিলে দিয়েছে। বাপ-মা মরা পরের মেয়ে কিছু বলারও জো নেই। পলান তো নিজের ছেলেদের চেয়েও ভালবাসে আমিনা আনোয়ারাকে। দু' সম্পর্কের এক ভাই—মৃত্যুশয্যায় ঈশে দিয়ে গেছে

মনাধা মেয়েদুটোকে। বয়েস এই তো সবে একজনের নয় দশ আর একজনের
সাত আট। মেহেরাকে পেয়ে খশী আর ধরে না ওদের। অষ্টপ্রহর মেহেরার
শ্রমকেই আছে ছু'বোন। কি দিয়ে যে সাজাবে ভেবেই পায় না। কখনও
বা মেদি বেটে চিত্রিয়ে। দচ্ছ হাত পায়ের নখ। খোঁপায় দিচ্ছে খোকা খোকা
কাশ ফুল। কপালে কাচ পোকার টিপ। মেহেরার মতো ভাবী সারা চরবঙ্গা
খুঁজে কেউ বার করতে পারবে না। টুকটুক করছে গায়ের রং—বেলুনের মতো
গাত পা। কষ্ট হলেও সাকিনা কিছু বলে না। ক'দিন আব! একটু লায়েক
শলে আপনা থেকেই পরদোরের কাঁজে লাগবে। দিন কয়েক শ্রম করে নিক।...

কাশেমের সাজপোজও একটু বেড়েছে। দিনের মধ্যে বাব চার পাচ সাবান
ধরে গায়ে মুখে। কিছু কালো র' কালোই থেকে যায়, কোন ফায়দা হয় না।
'শিশি গন্ধ তেল' মানিয়েছে গন্ধ থেকে। ঘাড় আর জুগফি বেয়ে চোয়ায়
.সে চেড়ির বাহাব তুলতেও এক প্রহর সময় লাগে। গঞ্জের বাবু
দুই প্রহর ছেলেপুলেব ম'তাই জামা জুগে পবতে শুরু করেছে; সাকিনা দেখে
দখে হাসে। চূপি চূপি এক ফাঁকে এসে পলানের সঙ্গে তামাসা হোড়ে, কিগ
.গালাব বাপ, তোমার ছেটি পোলা যে ক্ষাত থামারে যাওয়াই ভুইলা গেল ?

পলান ভবাব দেয়, দিন কতক বাড়িব ক্ষাতই চাষ করুক। হি আলা, আমাগ
দিন কাইল সব গেচে, ঘরের মধ্যে একা পেয়ে সাকিনাব কোমর জড়িয়ে ধরে।

দিন দুপুইরে বুইড়া মদার ঢং ছাত। আরে ছাড়, ছাড়। গণির বউ
হাসচে, বিবক্তির সঙ্গেই ছ'হাত দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে সাকিনা।

পলান লাড়িতে হাত ব্লাতে ব্লাতেই ঘব থেকে বেরিয়ে যায়। হুধের
সংসার চারদিকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ফকির-বাড়ি যায়। দাওয়ার ওপর বসে
পান তামাক খায়। হুরে হুর মিলিয়ে দয়াল চানরে ডাকে—

আয় না প্রেমের বঁড়শী বাইয়া ঘাই নতুন পুকুরে...

॥ ৮ ॥

অধিনীর বিয়ে দিয়ে দীর্ঘও বউ ঘরে আনে। কুসুমের পক্ষে একা একা
আর সবদিকে ভাল দেওয়া সম্ভবপর নয়। লোক রেখেও পোষাবে না। সবে
তো চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এখনো হালের বলদ কেনা হয়নি। সব জমি
ভালভাবে চাষ করতে হলে কম করেও ছ'জোড়া হাল চাই। বিয়ে দিয়ে

ছেলের বউ ঘরে আনাই সবদিক থেকে স্থবিধে। তাছাড়া অধিনীর বয়েসও তো বেশ হয়েছে। বারো পার হয়ে তেরোয় পা দিল।

আট বছরের পার্বতী বউ হয়ে ঘরে আসে। খুব স্ত্রী না হলেও কেলনার নয়। বেশ আঁটসাঁট চেহারা। লায়ক হলে সংসারের কাজে খাটতে পারবে। নিশির জন্তুও পেড়াপীড়ি করে দীঘু। দুই পোলার বিয়ে একসঙ্গে দিলে খরচায় বেশ স্থবিধে হয়। বাড়ি খরচা এক। শুধু গয়না আর কাপড়-জামাই যা আলাদা। করিমও সেই পরামর্শই দেয়। কিন্তু কুসুম কিছুতেই বাজী হয় না। এত অল্প বয়সে কোলের পোলার বিয়ে দিতে ওর মন নেই। বাপের বাড়ি দেশে রায়বাবুদের বাড়ি দেখেছে, কত ভাগব ভাগব ছেলেমেয়েবা লেখাপড়া করে। কি স্থন্দর তাদের আচাব ব্যবহাব—মুখেব কথা। হোক না কেন চাষার পোলা, লেখাপড়া কবায় দোয় কি? “লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই,” সেই লীলার মুখে এ কথা ও বহুবাব শুনেছে। লেখাপড়া শিখে নিশি যদি গাড়ি ঘোড়া নাও চড়তে পাবে, তবু তো ভাল কবে ৩টা কথা বলতে পারবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চলাফেবা করতে পাবে—এখন বিয়ে দিলে তো চাষার পোলা চাষাই থাকবে। বিয়েব পরে আবার কেউ লেখাপড়া কবতে পারে নাকি। না, কিছুতেই কুসুমকে রাজী করাতে পাবে না দীঘু।

স্রীং দেওয়া পুতুলই যেন পার্বতী। টুকটুকে একখানা লাল বংয়ের শাড়ী পরে শান্তুড়ীর সঙ্গে এঘর ওঘর করে। ভাল কবে ঘর সংসাবেব কাজ করতে না পারলেও ছোট ছোট ফাই-করমাসে আটকায় না। স্বামী কি বস্ত ভাল করে তা না বুঝলেও তাকে দেখে ঘোমটা টানতে হয় ওব। গুরুজনদেব সকলকে দেখেই। পুতুল খেলার আনন্দে যে মেয়েটি দুদিন আগেও ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে সে আজ ছককাটা পথে বন্দিনী। এ যেন বনের মুক্ত বিহঙ্গীকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছে। একদিন হয়তো দেখা হবে পথের হেরকের ভাল করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জাগতিক নিয়মে মা হয়েছে পার্বতী। সর্বশেষ ধলেশ্বরীর বাঁকের মতোই একটি স্থতিকা কগিণী। অবশ্য ভাগ্য যদি ওর ভাল হয় তাহলে সবল স্থস্থও থেকে যেতে পাবে। দীঘুব ঘরে তো আর এখন খাওয়া পরার অভাব নেই। মাছুষ হিসেবেও সর্বত্র তাব স্থস্থ্যাতি। কুসুমের গুণপনারও তুলনা হয় না। পিতা ভুবন বিশ্বাস ঘর বর অপেক্ষা স্থস্তর শান্তুড়ীকে দেখেই কন্ডা সম্প্রদান করেছে। নয়তো কোথায় পদ্মার পাড় আর কোথায় চরফুটনগর। এত দুর্দেশে থেকে কি আর কুটুম্বিতা রাখা যায়?...

চরফুটনগরের চর বেড়েই চলেছে। এখন আর দশ বিশ টাকা ঘুঘাস কিংবা কলা মুলো দিয়ে জমি পত্তন পাবার উপায় নেই। স্বরং রমেন্দ্র নারায়ণের শনির দুটি পড়েছে চরের ওপর। যেখানে বিধা মিলতো বিশ পঞ্চাশে সেখানে কাঠাই বিকোয় সত্তর একশো'তে। দিন দিন বিরাট এক জনপদ আকাবে গড়ে উঠছে চব। চর নয়তো যেন সাজানো বাগান। দক্ষিণাংশে একমাত্র করিম ফকিরই জাগছে। সে ছাড়া আরো কয়েক ঘর মুসলমান বাসিন্দা এসে আশ্রয় নিয়েছে ধলেশ্বরীর মুখে। চর যদি আরও কিছুটা জাগে এই তাদের ভরসা। আর যা-ই হোক, বোল আনা লাভ রমেন্দ্র নারায়ণেব। জলে-ডোবা জমিই মোটা নজরানায় বিলি হয়ে যায়। আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে নতুন মালুঘেরা। চাষ আবাদ নেই—ঘর-দোরও ওঠে না। শুধু দিন মজুর খেটে দিন গুজরানো। দাঁহু করিমের মতো ওরাও পলি ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশামুঘায়ী সফল হয় না। নদনদীর কাটাল এখন গঞ্জের দিকে। বর্ষায় চরফুটনগবেব চব অনেকটা ডুবে গেলেও শ্রোতের বেগ ম্বর। যেন অবশ ওদের এ অঙ্গটি। আগের মত তেমন করে আর চরও ডোবে না পলিও দব' পড়ে না। যাদেব তৈরী জমি আছে তাদের এখন চাষ করে খুব সুখ। 'কিন্তু নতুন করে জমি তৈরীর কাজে এখন আব এগোবার উপায় নেই। আগন্তুকদের আশা আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আব পূরণ হয় না। রমেন্দ্র নারায়ণও সংশয়ে পড়েন। ক'বছর থেকে তার গ্রীনবোট নিয়মিত এসে খালের মুখে নোঙর ফেলছে। বিলাস ব্যসনের সঙ্গে চলে জমি পরখের কাজ। কোন কোন দিন বোটের ওপরেই বসে দরবার। সেখান থেকেই মোটা নজরানা নিয়ে বিলি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। মোসাহেবরা এসেও জড় হয় সকাল বিকেল। বিকেলেই আসর জমে।ভাল। সুখ অস্ত্র যায়-যায় ডেক চেয়ারে এসে বসেন প্রভু। পাত্র-মিত্ররা মোড়ার ওপর। বিশেষ লাভালাভের ব্যবস্থা থাকলে দু'দশ মিনিটে হাতের কাজ চুকিয়ে নেন। নয়তো বিকেলে আর অবধা দেখা সাক্ষাৎ করে রসভঙ্গ করেন না।

বর্ষার নদনদী কানায় কানায় ফুলে ওঠে। রমেন্দ্র নারায়ণের মনেও জোয়ার জাগে। কোনদিন বা খিচুড়ী ইলিশ মাছ ভাজা, কোনদিন বা মাংস-পরোটা চপ কাটলেট। মেজাজ হলে ভাজাতুজিতেও আপত্তি নেই। সঙ্গে রত্নিন সরাপ। নিরামিষ গান বাজনাও চলে কোন কোন দিন। কেননা, বছর কয়েক ধরে হাত টান যাচ্ছে বলে ঢাকা থেকে আর হরি বাঈ আসছে না। মনের কোনে বিরহ দেখা দিলে ছুপাত্ত বেনী করে চড়িয়েই ভুলতে চেষ্টা করেন সে খেদ।

তাতেও আশ্রয় চাপা না পড়লে পার্শ্বচরদের সঙ্গে খিন্তি-খেউড়ে মেতেই সময় কাটান। হাল আমলে রামকান্ত ভট্টাচার্যই সেরা পারিবারিক। কি জানি কেন, রামকান্তকে বড় ভাল লাগে রমেন্দ্র নারায়ণের। সে এলে হরি বাঈয়ের কথা বড় একটা মনেও হয় না। খোঁশ গল্প গল্পে বেশ মাতিয়ে রাখতে জানে লোকটা। চালাক চতুরও আছে বলস্বপ্ন। চব্বের খবরাখবরও পাওয়া যায় ওর কাছ থেকে। শুধু আড্ডা ফুঁড়িই করে না। আদায় উশিলেও সাহায্য করে।

ভাগ্যস্বধী রামকান্ত পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ভাসছিল। দীর্ঘর আহ্বানে চরে এসে আশ্রয় নেয়। ফলপুর্বাশ্রিতের দুঃখ-দুঃখী সইতে পারে না দীর্ঘ চরের বাসিন্দা বাড়ছে। পূজা আরাচা করে সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারবে রামকান্ত। সহজ সবল মানুষ, সরলভাবেই আহ্বান জানায়। কারে পড়ে রামকান্তও সাড়া দেয়। অন্যথাব অন্যথাব থেকে রক্ষা পায়।

রামকান্তের পিতা রাম নারায়ণ ছিলেন কাশীপুরের কুলপুরোচিত। পাঁচশ বছর নমশূত্র মন্ত্রশিষ্য। যজ্ঞ যাজ্ঞ অপেক্ষা ইষ্টমন্ত্র কানে দেওয়াই ছিল তাঁর রীতি। শিষ্যরাও গুরুজী বলাতে অজ্ঞান। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাগবৎ পাঠ করতেন রাম নারায়ণ। শিষ্যরা গোল হয়ে বসে শুনতো। খোল বাজিয়ে কীর্তন করতো। সিদ্ধা-সামগ্রীতে চলতো গুরুজীব ভরণপোষণ। কি আর এমন খরচা? নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ। দিনান্তে একবেলা ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন। চলতেনও সাদাসিধেভাবে। স্ত্রী সত্যবতী পাঁচ বছরের রামকান্তকে রেখেই স্বর্গে যান। দ্বিতীয়বার আর ঘর বাঁধবার ইচ্ছে হয়নি রাম নারায়ণের। রামকান্ত মাতুলালয়ে মানুষ হতে থাকে।

ভাগবৎ মহাভারত পাঠ করে—কীর্তন আর মহোৎসবাদি করে পরমানন্দে স্বর্গে যান রাম নারায়ণ। শিষ্যরা চান্দা তুলে তাঁর সমাধির ওপর একটি তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। শ্রাদ্ধাদি পর্বও চলে বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। কাশীপুর গ্রাম সত্যি সত্যি একজন ধর্মগুরুকে হারালো। রাম নারায়ণের জন্ম আবাল বৃদ্ধ বণিতা অশ্রু বধন করে। শ্রদ্ধেয় গুরুজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকান্তকেই সকলে মিলে বসাতে চায় সেই শূন্য আসনে। কিন্তু রামকান্ত নাচার। মাতুলালয়ে ইংরেজী ইচ্ছলে পড়ে সে। মোটে তো খার্ড ক্লাসের বিদ্যা। তাও আবার ক্রমাগত তিনবার কেল। তবু, রামকান্ত কিছুতেই রাজী হয় না। যজ্ঞ যাজ্ঞ তার ধাতে সইবে না। কিছুতেই পারবে না সে খেই খেই করে বাছ তুলে কীর্তনের রাখে নাচতে। তুলসীর মালা পলায় দিয়ে গদ গদ ভাবে ভাগবৎ পাঠও

তার দ্বারা হবে না। শেষবার ফেল করে বড় মামার কাছ থেকে ভাড়া খেয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় রামকান্ত। দিনকতক এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাজধানী কোলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। বয়েস তখন কম কবেও যোল মতেরো। কোলকাতায় থেকেই আজীবন ও ভাগ্যের সঙ্গে লড়বে। প্রয়োজন হয় জীবন ে.ন। তবু গুরু পুরোহিত সেজে ভিক্ষাপাত্র সরে নেবে না। না, কিছুতেই না।

আজব শহর কোলকাতা। কুয়োব ব্যাঙ সাগবে এসে পড়েছে। বামকান্ত হালে পানি পায় না। চাকবিব ধান্দায় ঘুবে বেড়ায় যত্র তত্র। তৃতীয় শ্রেণীর বিগা নিয়ে বেশী দূর অগ্রসব হওয়াও দুঃসাপ্য। হাতেব পয়সা উজাড়। হোটেলের ভাত বন্ধ হয় হয়, অনেক উমেদাবিব পব ভাগ্যগুণে কোন এক চিত্রগৃহের—‘গেট কিপাবের’ পদ জুটে যায়। মাস মাইনে পনেরো টাকা—দু’টাকা রাহা পবচ। বড় বাঁচা বেঁচে যায় রামকান্ত। দশ টাকায় খাওয়া খাকা—‘দু’টাকায় টাম বাস ভাড়া। বাকী পাঁচ টাকায় জামা জুতো জল খাবাব সব। খশী না হলেও একেবারে অখশী নয় ও। এখন কিছুদিন দম নিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাবে। অগ্রিম পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে নতুন বেশভূষাব ব্যবস্থা কবে কাজে লাগে। চেহাবাটি রামকান্তর সঠাম। মনব শান্তি ফিবে আসায় দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ ঔজ্জ্বলা ফিবে আসে। মালিক খশীই হন ওব আচার ব্যবহারে। ভাবেন, তয়তো টিকে যাবে ছোকরা।

টিকে রামকান্ত নিশ্চয় যেতো কিন্তু ভাগ্যই ওব প্রতি বিরূপ। সেজেগুজে মেয়েরা আসে সিনেমা দেখতে। একা একাও আসে অনেকে। রামকান্তর দিকে কেউ হয়তো এক বলক চোখ তুলে তাকালে। কারো ঠোঁটে হয়তো বা হাসিই খেলে গেলো তড়িৎ রেখার মতো। রামকান্ত ভাবলে, মেয়েটি নিশ্চয় ওকে ভালবাসে। আর হবে না-ই বা কেন? দেখতে-শুনতে কি ও ধারণা? সিনেমা ভেঙে যায়। যারা তাকিয়েছিল তারা হয়তো জ্রক্ষণ না করেই চলে যায়। কিন্তু রামকান্ত সোজা কথাটা বাঁকা ভাবে নিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। দিনে রাতে তিনবার শো। পারে তো রামকান্ত তিনবারই বেশভূষা পরিবর্তন করে। ঘন ঘন চুলে চিরুনি চালায়। রুমাল দিয়ে মুখ পৌছে।

একবার শনিবার রাতের শোতে যুগলে আসে রাতের রহস্যময়ী দুই তারকা। জেমন ভিড় নেই। রামকান্ত একাকী পাড়িয়ে টিকেট চেক করছিল। ফুটি সিনেমার সার্ট গান্বে—পরনে কোঁচানো দিশি তাঁতেন যুতি। পারে আগ্রার নাগরা।

দু'জনের একজন রামকান্তর হাতে টিকিট দিতে গিয়ে ক্লিক করে হেসে ফেলে। আর কথা নেই। বলি বলি করেও এতদিন যে কথা ও কাকেও বলতে পারেনি আজ লাগাম-ছাড়ি ভাবেই এগিয়ে যায়। প্রশ্ন কবে, হাসলেন যে ?

মেরেটি গদগদভাবেই উত্তর দেয়, এমনিই।

এমনিই ! বেশ মজা তো !

কথা আর হয় না। শেষ ঘণ্টা বাজছে। শো আরম্ভের তাব বাকী নেই। ওরা দু'জনে এক তলাতেই উচ্চাসনে গিয়ে বসে। রামকান্তর মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমায়।

অতদিন শো আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই মেসে ফিরে যায় রামকান্ত। কিছু সেদিন আর তা পারে না। ইন্টারভেল পড়ে। রামকান্ত মেয়ে দুটোর সিটের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আশপাশে লোক রয়েছে। কোন কথা হয় না। যতক্ষণ না আলো নেভে সূর্য আর সূর্যমুখীর মতো শুধুই চোখাচোখি চলে। পুনরায় শো আরম্ভ হলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় রামকান্ত কিছু প্রাণধান পড়ে থাকে ঐ সীট দুটোব ওপর।

সিনেমা যথারীতি শেষ হয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে ওরা দু'জনেও বেরিয়ে আসে। গুটি গুটি পা ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রামকান্তও পেছ পেছ। না, কোন পুরুষ সঙ্গী নেই। রাশিকৃত গহনা গায়ে। দেখতে স্তমভেও সুশ্রী। ভয়-ডর কিছু নেই নাকি প্রাণে। রাত তো প্রায় বারোটাই বাজতে চললো। বিন্মিত রামকান্ত অধিকতর বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আবাব এক বলক হাসি খেলে ওদের দু'জনের ঠোঁটে।

রামকান্ত আর দৈর্ঘ্য রাখতে পারেনা। ভিড় অনেকটা কমে গেছে। সোজাহুজি গিয়ে প্রশ্ন করে, হাসছেন যে ?

হাসি পায় তাই হাসছি, তব্বী মেরেটি হেসে হেসেই জবাব দেয়।

হাসি কি লোকের শুধু শুধুই পায় ?

পেল কি করবো বলুন, অপরাটি উত্তর করে।

রামকান্ত কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। খানিক ইতস্ততঃ করে পুনরায় প্রশ্ন করে, দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি আসবে নাকি ? কথা তো ছিল কিন্তু এলো কই ?—তব্বীটিই উত্তর দেয়।

পৌছে মেসে ?

তা হলে তো বেঁচে যাই।

ইঙ্গিত মাত্র ট্যান্সী এসে দাঁড়ায়। বামকান্ত ড্রাইভারের পাশে, ওরা দু'জন পেছনের সীটে।

কোথায় যাবেন?—পুনর্বার প্রশ্ন কবে রামকান্ত।

তরীটি উত্তর করে, নয়! রাস্তায়—

নয়! রাস্তায়।—ঠিক যেন বুকে উঠতে পারে না রামকান্ত।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার সায় দেয়, হাম সমজ গিয়া বাবু সাব, চলিয়ে।

পরেব ইতিহাস গতানুগতিক। মকাবাদি যজ্ঞে মশগুল রামকান্ত। সোনার অঙ্গ বলসে যায় বছব খানেকের মধ্যেই। মাইনের টাকা কর্পরের মতো উবে যায়। ধার-কর্জ আবস্ত হয়। প্রথম প্রথম ইয়াব-বন্ধুদের কাছে। তারপর চাকব দাবোয়ানের কাছে। তাতেও যখন কুলোয় না আসে কাবুলওয়াল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেমন মালিকের নেকনজরে পড়েছিল রামকান্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তেমন তাব বিষ-নজবে পড়ে। অবস্থা চবমে ওঠে যেদিন কাবুলওয়াল। সিনেমাগৃহে এসে হামলা শুরু কবে। মালিককে আর জবাব দিতে হয় না। বামকান্ত নিজেই একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে গা টাকা দিতে বাধ্য হয়।

উপোস দিয়ে মবা ছাড়া এযাত্রা আব গতান্তর নেই। তাই-ই মরতে হবে। বড় আশা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিল। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেলো। গায়ে থাকলে আব যাই হোক দুমুঠো ভাতের অভাবে মবতে হতো না। কিন্তু এখন কিরে যাওয়া মানে তো লোক হাসানো! না, এত সহজে পরাজয় স্বীকার কববো না।...

সত্যি, বিধাতা বোধ হয় একেবারে বিমুখ ছিলেন না ওর ওপর। কেমন কবে যেন যুবতে যুরতে এসে উপস্থিত হয় আসামের এক চা বাগানে। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাগান-আপিসের কেরানী। বেতন সামান্য—কিছু উপরি আছে। রামকান্তর স্বজাতি। একমাত্র অনূচা কছা ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই মহেন্দ্রনাথের। দেশ পূর্ববঙ্গেরই এক অঙ্গ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সে সব ধুয়ে মুছে গেছে অনেককাল। এখন বাগানই ঘরবাড়ি—বাগানই কর্মক্ষেত্র। মহেন্দ্রর ভাবনা অল্পরাধাকে নিয়ে। বেশ সেয়ানা হয়েছে মেয়ে, এখন একান্ত প্রয়োজন পাত্রস্ব করা। কিন্তু আসামের অঙ্গলে কোথায় বা পাত্র আর কোথায় বা তার খোঁজববর? কুম থেকে উঠে সংসর্ক তো শুধু কুলিকামিনের সঙ্গে। বড় বড় সাহেব স্ববেদারদের জন্ত রাধা আছে—

আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। সেখানে সমপর্ষায়ের লোকের দেখা-সাক্ষাৎও মেলে। কিন্তু নিয়মস্বদের জন্তে সে-সবের কোন বালাই নেই। তারা তো চব্বিশ ঘণ্টারই দাসখণ্ড লিখে দিয়ে বসে আছে। হাতে কাজ না থাকলেও ইচ্ছে মতো কোন দল পাকানো চলবে না। আসামের জঙ্গলে অহুরাধারা যেন নির্বাসিতা। কাজে ইস্তফা দিয়ে আসারও কোন উপায় নেই। এক আছে পোড়া পেটের ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ পদে পদে আইনের বাধা। চোখে মুখে অঙ্কার দেখে মহেন্দ্র। নিজের মৃত্যুর পর অহুরাধার কি উপায় হবে?...

কথায় আছে, যত মুশকিল তত আসান। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় হাবুডুব খাচ্ছিল মহেন্দ্র, সহসা বাগানে রামকান্তের আবির্ভাব হয়। আগেকাব সে জর্জোলুস না থাকলেও, এখনো রামকান্তকে বিনা দ্বিধায় স্থপুরুষ বলা চলে। কথাবার্তায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। মহেন্দ্র হাতে আসমানের চাঁদ পায়। প্রথমে চাকুরী—তারপর কত্তা সম্প্রদান। মাস পাঁচেকের মধ্যেই একেবাবে মুক্ত মহেন্দ্র। মুক্ত সবারকম ভাবনা চিন্তা আর ভবযন্ত্রণা থেকে। ..

জ্যোয়ান স্বামীব সান্নিধ্যে এসে পিতৃশোক ভুলতে বেশী দেবি হয় না অহুরাধার। স্ত্রী-বস্ত্রের সঙ্গে রামকান্তের হাতে আসে মহেন্দ্রের আজীবনের সঞ্চয়। বড় সাহেবকে ধরে বাগানের একটি পদেও ওকে বহাল করে গেছে মহেন্দ্র। একযোগে কামিনী আর কাঞ্চন লাভ। বিপদ কাটিয়ে ওঠে রামকান্ত। বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই বাটতে থাকে দিন। বছর না ঘুরতে অহুরাধারও মাতৃ-অঙ্ক ভরে ওঠে। সত্যি, ও আজ গরবিনী, মা হতে চলেছে। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ওঠের হাসি মেলাতে না মেলাতেই সহসা দুঃখের বান ডাকে। বিকলান্ন এক মৃত সন্তান প্রসব করে অহুরাধা। নিটোল স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙতে থাকে। রামকান্তের গোলাপী নেশায়ও ভাটা পড়ে। সামনেই তো রয়েছে চা বাগানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পুতুলের মতোই আশ্চর্য সুন্দর খাসিয়া মেয়েগুলো। টুকটুক করছে গায়ের রং। ধাত্তেশ্বরীর আকর্ষণও বড় একটা কম নয়। উঃ, কতদিন গলা ভেজানো যায়নি। এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে এতদিন ও কি করে উপোস দিয়ে আছে!... বাঘ বৃড়া হলেও খাপ ভোলে না। ওর তো নববোবন। রঙিন সুরা আর সাকী নিয়ে আবার মেতে ওঠে রামকান্ত। তারপর তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বছর ধানেরকের মধ্যেই অহুরাধার ডাক আসে মহেন্দ্রের পাশে। রামকান্ত বড় বাঁচা বেঁচে যায়।

অহুরাধা মরে বাঁচে আর রামকান্ত বেঁচে থেকে মরে। হিসেবের খাতার

বিরাট গোলমাল দেখা যায়। টমাস সাহেব তো রাগের মাথায় বুট সমেত এক ঘা লাখিই বসিয়ে দেয় বৃকের ওপর। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে রামকান্তর। তারপব অতিকষ্টে রাতের অন্ধকারে আবার একদিন গা ঢাকা দিয়ে আশ্রয়স্থল করে। এবার আর অল্প কোথাও নয়। সোজাহুজি স্বগ্রামে। পিতার শিষ্য সামন্তদের মাথায় পা তুলে দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়াই স্থির হয়। শহরে আর ওর ঠাই হবে না। সূখের ব্যবসা গুরুগিবির ব্যবসা। তোয়াজের ওপর থাকো, ভূঁড়ি বাগিয়ে খাও দাও ঘুমোও। তবে নিরামিষ খেতে হবে এই যা দুখ্য। তা হোক, এ ছাড়া আর উপায় কি?...রামকান্ত শত নিরাশার মধ্যেও আশা নিয়েই গ্রামে আসে। কিন্তু এখাতে পা দিয়েই মুষড়ে পড়ে। শিষ্য সামন্তদের চিহ্ন পৰ্বস্ত নেই। নিজেদের বসত বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। তারপব অনেক গোজ্ববরের পর দীহুর আকুল আহ্বানে চরণ রাখে এশে চরফুটনগরে।

চরফুটনগরে পা দিয়ে দিনকতক বড় মুশকিলেই পড়ে রামকান্ত। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ওকে হরি-সভায় বসতে হয়। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক হুর করে শ্রীমদ্ব্যাসবত পাঠ করতে হয়। কীর্তনের সঙ্গে ছ'বাহ তুলে নাচতেও হয় কোন দিন। নিজের প্রেম ভক্তি থাক আর না-ই থাক ওর মুখে পাঠ কীর্তন শুনে আবাল বৃদ্ধ বর্ণিতা গদগদ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি আর উল্ধনিতে প্রাণগঙ্গা বয়ে চলে। প্রভুপাদের কঠমহিমায় সকলেই পঞ্চমুখ। রামকান্তকে আর চাল ডাল তেল হুনের জন্ম ভাবতে হয় না। কাজের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা পদ্ম-রজ্জ বিতরণ আর পাঠ কীর্তন করা। বাপের বয়সী শিষ্য হলেও তার মস্তকে পদ্ম-রজ্জ দানে বাধা নেই। পালোদকও দিতে হয় অনেককে। ব্যবস্থা ভালই। তবে পুরোহিতগিরি অপেক্ষা গুরুগিরিতেই স্বখ বেশী। পুরোহিত-দের পূজো পাবনে তবু খানিকটা খাটা খাটুনী আছে। কিন্তু গুরুগিরিতে সে বালাই নেই। দিবিয়া খাও দাও ঘুমোও। চাই কি খুশি হলে ঘরের ঝি বউকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতেও বাধা নেই! গুরু ব্রাহ্মণ তো সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ সেবায় আশ্র-নিয়োগ করতে পারা তো সোঁভাগ্যেরই কথা। সময় সময় মাছ-মাংসের জন্ম প্রাণটা আঁকুপাঁকু করলেও চরফুটনগর রামকান্তর কাছে ভালই লাগে। মোড়ল দীহুই যখন সহায় তখন আর ভাবনার কিছু নেই। তবে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে কিছুটা মোহস্ত চরণ দাসকে নিয়ে। বেটা কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেয় না। স্বয়ং প্রেমদাতা নিত্যানন্দই বেন

চরে এসেছেন। ঘর ঘর মন্ত্র শিখাও বড় একটা কম করে ফেলাছে না। দীক্ষ বৈরাগীরও যেন ভাবের অন্ত নেই। একজন কুলগুরু, একজন দীক্ষা গুরু, একজন সখাগুরু। গুরুর বহর যেন। সব বেটাকে নিয়েই নাচানাচি। মোহন্তটাই দেখছি সব পণ্ড করবে।...সুখ থাকলেও রামকান্তব মনে স্বস্তি নেই। দিন দিন ভাবনা বেড়েই চলেছে।

রোজ সন্ধ্যায় রমেন্দ্র নারায়ণ গ্রীনবোর্টের ছাদের ওপর ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানেন। কখনো বা সিগারেট। কাঁটা-চামচের সাহায্যে জলযোগও করেন কোন কোন দিন ছাদের ওপর বসেই। রামকান্ত দাওয়ার ওপর বসে সখেদে ভাবে, আহা কি রোশনাই সর্বাঙ্গে! পোষাক আধাকেরই বা কি জোলুস। কোথাও ছন্দপতন নেই। আজ যেটা পরেন কাল আর সেটা পরেন না। অকুরন্ত বিধির ভাঙার যেন। আর হবে না-ই বা কেন? একে বিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক—তাতে আবার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। আমার মতো চাঁড়ালের বাগুনকে আর ক'জন ভদ্রলোক পৌছে? চাঁড়াল আবার একটা জাত...তার আবার গুরুপুরোহিত। এখনো হাজার বছর ওদেব পায়ের তলায় বসে শিখতে হবে।...

প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত পার্টে বসতে হয় রামকান্তকে। মন না বসলেও বসতে হয়। গলায় বিনাসুতোয় গাঁথা তুলসীর মালা। বাতাসে ফরফর করে উড়তে থাকে চাঁচর চিকুর। তিলক চর্চিত দেহ। ধ্যানগম্ভীরভাবেই আসরে বসে থাকে রামকান্ত। কিছু মনের খাতে বইতে থাকে দিবা রাত্রির স্বপ্ন। খোলে চাঁটি পড়ে। কীর্তনিয়ারা উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে জয়ধ্বনি শুক করে। সহিতে পারে না রামকান্ত, যত সব বর্বরের কাণ্ড। সকাল হতে না হতেই গরব পাল নিয়ে নাঠে যাও আর সন্ধ্যায় সমস্বরে জিগির তোলা। সুরুচি বলতে কোন পদার্থ নেই এগুলোর রক্তে। কোলকাতায় যদি কোনরকমে টিকে থাকি যেতো! প্রকৃত মানুষ আছে কোলকাতাতেই। উচুনিচুতে এমন দুর্লভ্য ভেদাভেদও নেই সেখানে। সাধারণ একটু ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে যে কোন লোক যে কোন লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। আর এখানে তো সব ধুলোয় অন্ধকার। একত্র মেলামেলা তো দূরের কথা, হুঁলে হকোর জল পর্যন্ত ফেলে দেয় উচুতলার মানুষেরা। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন দমে যায় রামকান্ত।...

আজ ক্ল'ধিন, চোখ বুজে বেদীর ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারছে না রামকান্ত। মন ঘুড়িটা করনার মীল আকাশে কেবলই উড়ে চলেছে। কি হবে

এই ভাগবত পাঠ আব কীর্তনাদি কবে? দুনিয়াব স্থখ শাস্তি তো সবই ওদেব
 গুস্ত। ওবা একটানা কেবল স্থখ কবে যাবে আব আমবা পায়ের তলায় পড়ে
 মববো। না, তা হবে না। দু'দিনেব জীবন। নগদা যা পাওয়া যায় সেই-ই
 ভাল। ডিকি নিয়ে একাকী ঘুব ঘুব শুরু কবে বামকান্ত গ্রীনবোটের চাবপাশে।
 আশা, কুমাৰ বাহাদুর যদি ভুলেও একবাটি চোখ তুলে তাকান। আহা,
 গান:বোট তো নয় যেন একখানা ভাসমান প্রায়াদ বাসব। কি নেই ওব ভেতব?
 শোবাব ঘব, বসবাব ঘব, বসুইখানা, মাষ স্নানাগাব পৰ্বস্তু। বসুইখানাব চিমনী
 দিয়ে অষ্টপ্রহব বোঁয়া বেরুচ্ছে। খোশবুতে ম ম কব'ছ চাবদিকেব বাতাস। এ যেন
 শহাবব কোন বেস্তোবাঁয মোগলাই বাস্তু চেপে'ছ। বৈবাগীদেব পাল্লায পড়ে ঘাস
 পাতা খেয খেয তো পেটে চড়া পড়ে গেলো। মাহু ম কাদি। পাসব কামনা
 বাসনাকে চেপে বাখ'ত। আব কেনই বা তা বাখবো। বামকান্ত আলগোছে
 ডিকিখানা গ্রীনবোটব পেছনে বেঁধে প্রাণভবে স্রাণ মনেতৈ থাক। কেমন কবে
 যেন এক নিমেষে দুব অতীতে পৌঁছে যায় : আশাচ মাস। তিনদিন অবিশ্রান্ত
 গাবায বৃষ্টি শছে। মহানগরী কোলকাতাব যান বাচন মব বন্ধ। যে যেভাবে
 গাবছে ঘবেব মধ্যেই আলস্তে দিন কাটাচ্ছে। দু'দিন আগে আপস থেকে
 মাইনে পেয়েছে বামকান্ত। নগদ পচিশ টাকা। অল্প সময় আশান্তিত পদোন্নতি।
 খশীব হাওয়াই বইছে প্রাণে। খুশীতে গদগদ হয়েই এক বোতল হুইকিসহ
 গ্রাস ওঠে স্বপ্নমাব ঘবে। অতি অল্প দিনেব প্রেম। ভবা ভাদব জোয়াব লাগে।
 চুপুবেব বেস্তোবাঁ থেকে আসে গবম গবম চিংড়ীব কাটলেট। হুইকি আর
 কাটলেট—সোনায সোহা'গা যেন। তাবপব খিচুড়ি, ইলশ মাছ ভাজা, মাংস।
 একটানা বৃষ্টিতে সোনাগাছিব গলি ঘিঞ্জি জলে টেটমুব। দু'দিন দু বাত্রি চোখেব
 পলকে কেটে যায়। আজো যেন মুখে লেগে আছে সেই চিংড়ীব কাটলেট।
 বামকান্ত অল্পমনস্কভাবই 'হোং' শব্দে পেছন টেনে বসনাব জল সদবপ কবে।

আঘাটেব স্থখ কখন অস্ত যায় বোকা যায় না। বৃষ্টি না থাকলেও জলভরা
 আকাশ থম থম করছে। বৈষয়িক ব্যাপারে আজ একটু ব্যস্তই ছিলেন রুমেশ
 নাবাষণ। চবে সান্ধ্য দীপ সবে জলতে শুরু হয়েছে ডেক চেয়ারে এসে বসেন।
 বামকান্ত অতীত ভুলে যায়। যেন ঠান্দ দেখছে আকাশে। কুমাৰ বাহাদুর
 কি সত্যি ওব দিকে চেয়ে আছেন। ডিকিতে চাড় দিয়ে সামনা-সামনি হতে
 চেষ্টা কবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো হরি হাত ইশারায় ওকেই ডাকছে। হুইকির
 সত্যি তাহলে এতদিন পর নদা হলো। মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে আর ভয়

নেই। ছ'দিনেই বশ করা যাবে।...রামকান্ত গ্রীনবোটের সামনা-সামনি এনেই ডিক্রি বাবে। হরি ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানায়।

কুমার বাহাদুর আজ একাই আছেন। রামকান্ত সম্ভ্রান্তভাবে এসে কাছে দাঁড়ায়। ভাবে, এত বড় মানী ব্যক্তি, হাত জোড় করে নমস্কার করলে খুশী হবেন না। তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতে উত্তত হয়।

কুমারবাহাদুর আপত্তি করেন না। অশ্রুর উন্নত মস্তককে স্বীয় পদতলে অবনমিত করানোই ওদের বংশ-রীতি। মনে মনে খুশীই হন রামকান্তর ওপর। একদিনেই যখন এতখানি আত্মগোঁড়া দেখা যাচ্ছে ভট্টাচারের মধ্যে তখন অনেক কিছু আশা করা যায়। বেশ একটু খাতির করেই পাশের মোড়াটাতে বসতে ইঙ্গিত করেন।

রামকান্ত আবার ভাবনায় পড়ে। হজুরের পাশে মোড়ার ওপর বসবে! সেটা কি ভাল দেখাবে?...

অবস্থা বুকে হজুরই পুনরায় সমর্থন করেন, অত ভাবছো কি হে ভট্টাচার? বসো বসো ওতে কোন দোষ নেই। তুমিও তো মানুষ।

দ্বিতীয়বার সম্মতি পেয়ে রামকান্ত গুটি স্তটি হয়ে মোড়ার ওপর বসে পড়ে। পুনরায় অবাক হয়েই ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, একেই বলে দিল। এত বড় লোক একটু মান অহংকার নেই। লক্ষ্মী কি আর সাধ করে ঘরে বাঁধা আছেন?..

রামকান্তর অবস্থা আরো চরমে ওঠে যখন বসতে না বসতে হরিকে আদেশ করেন ওর জন্তু ছুটো চিংড়ীর কাটলেট এনে দিতে। পরিচয় নেই—জিজ্ঞাসাবাদ নেই—সরাসরি খাবার ব্যবস্থা! হবে, জীবনে ও আর ক'জন বড় লোককে দেখেছে আর তাদের আচার ব্যবহার জানতে পেরেছে! না বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বাক্য সরে না রামকান্তর।

আদেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা প্রেটে করে গরম গরম ছুটো কাটলেট এনে হাজির করে হরি। বিস্মিত শুধু একা রামকান্তই হয় না। হরি নিজেও হতবুদ্ধ হয়। প্রথম দিনেই কুমার বাহাদুরের তরফ হতে এত আদর আপ্যায়ন জীবনে ও খুব অল্পই দেখেছে।

কাটলেটের খোশবুতে চারদিক ম ম করছে। এতক্ষণ যা ছিল স্বপ্নেরও বাইরে সহস্রা তা বাস্তব হয়ে ওঠে। কঠিন হলও রসনাকে সংযত রেখেই রামকান্ত ইতস্তত: করতে থাকে।

কুমার বাহাদুর রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। রামকান্তর আড়ষ্টতা লক্ষ্য

করে—মুচকি হেসেই উৎসাহ দেন, কই হে ভট্টাচার্য, চট করে খেয়ে নাও। জ্বলো
হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছুই স্বাদ পাবে না।

আমি একা থাকো হুজুর? আপনার—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেন রমেন্দ্র নারায়ণ, আমার এখনো অনেক
দেরি আছে হে। তোমার তো আবার ওদিকে কীর্তনের সময় হয়ে এল।
তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আজকের মতো এসো।

রামকান্তর তরফ থেকে আরো খানিকটা বিনয় প্রকাশ করাই হয়তো উচিত
ছিল। কিন্তু রসনাকে আর অধিকগ্ণ সংযত রাখা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া
সত্যিই তো, ইচ্ছে থাক আর না-ই থাক বৈবাগী বাড়িতে তো হাজিরা দিতেই
হবে। সংসারের চাল ডাল তো এখনো ওখান থেকেই আসছে। তবে
হুজুরের যদি দয়া হয়, নিদেন একটা মুহূবিব কাজও যদি দেন, তাহলে আর
চ্যাং চ্যাং করে কীর্তনের মাঝে লাফালাফি করতে হবে না। এক্ষেত্রে ভাগবত
পাঠ করেও আর মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে হবে না। না, হুজুরের একটা মতলব
নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে অনর্থক কেন ডেকে পাঠাবেন! এমন থাকারই
বা খাওয়ারই কেন!...আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই চোখের নিম্নে একটা
কাটলেট সাবড়ে দেয়। আঃ, কি মজাদার রান্না। বৈরাগীদের ঘাস গোবর খেয়ে
খেয়ে মগজের খিলু যে লোপ পেতে বসেছে! দ্বিতীয়াটাও মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়।

৬৭ খাওয়া দেখে রমেন্দ্র নারায়ণ কোতুক বোধ করেন। হেসে হেসেই
পুনরায় জিজ্ঞেস কবেন, আরো গোটা দুই চলবে নাকি ভট্টাচার্য?

আজ্ঞে না হুজুর, যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে আবার এফুনি কীর্তনে যেতে
হবে।

মুখে যত জোর দিয়েই কথা কটা বলতে যায় না কেন রামকান্ত মনের ভাব
বঝতে কিছুমাত্র দেরি হয় না রমেন্দ্র নারায়ণের। আরো দুটো কাটলেটের
জন্ত হুকুম করেন।

আবার কাটলেট আসে। খাওয়াও যথারীতি শেষ হতে চলে। রমেন্দ্র-
নারায়ণ হাসতে হাসতেই টিপ্পনী কাটেন, আজ কাটলেট পষস্বই থাক চে
ভট্টাচার্য! একদিনে বেশী এগোনো ভাল দেখাবে না।

কি যে বলেন হুজুর, মুচকি মুচকি হাসতে থাকে রামকান্ত।

কুমার বাহাদুর বলেন, কেন, খুব খারাপ বলছি নাকি? তা কাটলেট
কেমন খেলে?

জীবনে কখনো এরকম স্ব স্বাচ্ছন্দ্য কাটলেট খাইনি হুজুর—, চোক গিলে উত্তর করে রামকান্ত ।

আচ্ছা, তা হলে এখন এসো ।

হাত ধুয়ে রামকান্ত আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায় । কুমার বাহাদুর বাধা দেন, থাক হে, বারে বাবে পায়ে হাত দিচ্ছ কেন ?

কি যে বলেন হুজুর ! আপনি হচ্ছেন সং ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ের ধুলো নেনো এতো আমার পবন সৌভাগ্য ।

আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে, এখন এসো ।

বামকান্ত মোহাবিষ্টের মতোই আবার এসে ডিক্কিতে ওঠে । অপলক দুটি কুমার বাহাদুরের দিকে । খোশ মেজাজেই গড়গড়া টানতে থাকেন কুমার বাহাদুর, জালে বোঁদ হয় মাছ এবাব পড়লো ।

॥ ৯ ॥

পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত চরফুটনগর । মঙল পাড়া, বিশ্বাস পাড়া, ককির পাড়া, বৈরাগী পাড়া । এক একজন মোড়লের নাম অনুসারে এক একটি পাড়া । ককির পাড়া আর মঙল পাড়াই আয়তন দড় । লোকসংখ্যাও এ দুটিতে অধিক । পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত শুধু পরিচয়ের হবিবার জ্ঞান । নয়তো, চরফুটনগর আসলে এক । দীঘল আর করিমই চরের মাথা । সকলে মিলেমিশে চাষ আবাদ করে—প্রাণ খুলে ধামাল উৎসব আর কীর্তনে মাতে । ছোটখাটো ঝগড়াও সময় সময় পরস্পরের মধ্যে হয় । কিন্তু ভিন্ন গায়ের মানুষের সাধ্য নেই সেই স্বেচ্ছা চরের মানুষকে কিছু বলে । ঝগড়াই থাক আর মিতালিই থাক কেউ কিছু অগ্নায় করলে একত্র হয়েই তার ঘাড় মটকায় । চরের সম্মান সকলের সম্মান । নিজেদের ঝগড়া-ঝাঁটি নিজেদের মধ্যে মেটাতে হবে । বাইরের লোক যেন কেউ তার মধ্যে নাক গলাতে না আসে, দীঘল করিমের কড়া নির্দেশ । চরের অনিষ্ট করলে চরে বাস করা কিছুতেই চলবে না । আর ঝগড়াই বা হবে কেন ? হয়তো বা ক্ষণিকের মন-কষাকষি । তারপর য়েই সকলে কীর্তন কিংবা ককিরের আসরে এসে বসলে অমঙ্গল সন্দেহ-

মালিঙ্গ মিটমাট হয়ে গেল। একজন খাওয়ালে পাঁচ কলকে তামাক সেজে
আব একজন সাত কলকে। তাবপব মাতবববা খানিক দাঁত বাব কবে হাসলে—
দু'চারটে টিকা টিপ্তনী ঝাড়লে—পবম্পব গিয়ে পবম্পবের গলা জড়িয়ে ধবলে।

অপরাধ যদি খব গুরুতব হয় তাহলে বসবে পঞ্চায়েত। দীহু আব
কবিমেব বাব বাড়িব ঘব তাব জন্ত চিব উন্মুক্ত। বাটা ভর্তি পান হুপুবি আসবে,
কলকেব পব কলকে তামাক। আসব ভাল কবে জমবাব আগ পর্ষস্ত হাসি
মস্ববা চলবে এ ও তাব মধো। তাবপব আসল বাদী বিবাদী কবজোডে
সভাকে দণ্ডবং জানিয়ে পেশ বববে নিজ নিজ আর্জি। মন দিয়ে সব শোনা
হবে। কেউ সভাব মধাদা ক্ষণ কবলে মাতবববদেব মধে, একজন গগনভেদী
এমকে বসিয়ে দেবে তাক। তাবপব চলব খানিক কান-কানি দিস-ফিসানী।
সবশেষে বায় দান। অপবাধেব গুণত্র বুঝে দোমীকে মাবা হবে পাঁচ জুতো
যাতো দেওয়া হব নাকে খত। সময় সময় দু'পাঁচ টাকা জবিমানাও আদায়
হয় কাবা কাবো কাছ থেকে পঞ্চায়েতব জন্ত। বিচাব এইখানেই খতম। থানা,
পুলিশ আদালত কেউ কবতে পাববেনা। জমিব গোলমাল, বাড়িব গোলমাল,
ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, বাপ-বেটায় মন কষাকসি—সব মিটে যায় পাঁচজনেব
সালিসীতে।

মণ্ডল পাড' নাম হয়েছে মধু মণ্ডলেব নাম অহুসাৰে। মধুব আদি বাস ও
ছিল পদ্মাবই পাডে। কিছু কিছু লেখাপড়া জানে মধু। তাই তাব কথাবার্তা
অনেকটা মাজা ঘষা। চাবেব জমি-জমা আগেও বড় একটা ছিল না মধুব। তবু
বাড়িতে দুটা দুবেল গক পুখে এবং অন্তেব জমি পত্তন নিয়ে এক বকম স্বেই
দিন কেটেছে। কিন্তু কাল হল পদ্মা। কাশীপুবেব পাশাপাশি গ্রাম মোহনপুব।
তাই কাশীপুব যখন তলিয়ে গেলো মোহনপুবও একেবাবে বেহাই পেলো না।
ক্ষতি মধুরও হলো। তবু দীহু কবিম পিতৃপিতামহেব ভিটা ছেড়ে এলেও
মধু তা পাবলে না। অধিকতব দুঃখ কষ্টেব মধোই দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু
পদ্মা যে হাঁ করেই ছিল। ওব বিশ্বগ্রাসী ক্ষুবাব মুখে মধু লড়বে কতক্ষণ? বছর
না ঘুরতেই ভিটেমাটি সব সাক। মধুও বাধ্য হয় অন্তত মাথা গুঁজতে।

তিন্ গাঁয়েব মাতৃঘ হলোও দীহু আর মধু মধো গলায় গলায় তাব
ছিল। অঞ্চলেব সেরা কীর্তনিয়া মধু মণ্ডল। ঘেমন তার কৃষ্ণব ভেমন
ভাব ও ব্যক্তনা। কিন্তু দীহু বৈরাগী খোল না বাজালে মধুর ভাব স্রাসে না।

হুতরাং মাসের মধ্যে ছুঁশবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো। দু'র দুরাস্থ থেকে মধুর ডাক আসে। দীহুকেও খোল বাজাবার জন্ম সন্দেহেতে হয়। নৌকা বিলাস, মান ভঞ্জন, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালা গানে মধুর জুড়ি নেই। খোল বাজনায়ে দীহুর নাম-ডাকও দেশ-বিদেশময়। মধুর নিমজ্ঞ এলে দীহুরও তা আসবে। মধু দীহু যেন ষমজ দুই ভাই। স্বরং গৌর নিতাই-ই যেন কীর্তনের মাঝে অঙ্গ দুলিয়ে নাচতে থাকে। প্রতি বছর অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে দীহুর বাড়িতে মধুর আসা চাই-ই। তিনদিন তিন রাত্রি বিরাম-বিহীনভাবে চলে নাম নহা-ষজ্ঞ। চারদিক থেকে দলে দলে আসে অঞ্চলের কীর্তনিয়ারা। প্রাণ খুলে নাচে—নাম গান গায়। পেট পুরে ঢাবেলা পায় মহাপ্রসাদ। উৎসবেব পরিসমাপ্তি হয় দধি-মঙ্গল আর মহোৎসবে। নাম যজ্ঞের আগে মাসাধিককাল নিয়মিত চলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পবে পালা গান। মহোৎসবের পরেও তাই বৈরাগী বাড়ির ঠাঁড়ি হেঁশেল সহজে বন্ধ হয় না। দু'ব গা থেকে যে সব কীর্তনিয়ারা আসে তারা মধুর মুখের পালা গান না শুনে কেউ ফিবতে চায় না। গান নয়তো এক একটি কলিত যেন অন্তর বিগলিত হয়ে প্রাণ-গঙ্গা বয়ে চলে। পয়লা কাতিক থেকে শুরু অস্ত্রানেব মাঝামাঝি শেষ।

পুলয়ের পরে দীহু মধুকে অনেক কবে বলেছিল। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে মধু কিছুতেই রাজী হয়নি। তারপর তিলে তিলে যখন রাক্ষসী পদ্মা ভিটেটুকুও গ্রাস করলে তখন আর গত্যন্তর নেই। মধু নিজেই চিঠি দিলে দীহুকে। চরফুটনগরে তখন জমির দর অনেক। তবু মধু কীর্তনিয়ার মতো গুণী লোক চরে আসবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? বেচারি, হালে পুত্র-শোক পেয়েছে। পরমেখরের যে কি মর্জি বোঝা যায় না। এমন সাধু সজ্জন ব্যক্তি তাকেও কিনা মহাশোক ভোগ করতে হচ্ছে! সংসারে পা দিয়েই তো সংসার-দানীকে হারিয়েছে। বছর খানেকের নিবারণকে রেখে মোক্ষলা স্বর্গে গেলো। সেই থেকে সন্ন্যাসীর জীবনই কাটাচ্ছে মধু কীর্তনিয়া। নিজে কোলে গিঠে করে মাথুধ করেছ নিবারণকে। অনেক কষ্ট করে ছাত্রবৃত্তি পঞ্চ পড়িয়েছে। তারপর বিয়ে দিয়ে হীরের টুকরো বউ যের আনলে কিছু না পেয়ে না থুয়ে। মধুর সংসার নবলক্ষীর আগমনে ভরে ওঠে। নিজে পালা গান করে ছুঁশ টাকা পায়। নিবারণ চাষ-আবাদে

কাজ করেও আবার ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানীগিরি করে। ছোটো ছুখেল গল্প গোয়ালে। অভাব কিছু মাত্র নেই। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই নাতনীর মুখও দেখলে মধু কীর্তনিয়া। দয়াল হরির দয়া আর কাকে বলে? আগে দূর দ্বান্ড থেকে ডাক এলেও ওকে ছুটতে হতো। শুধু পুণ্য সঙ্ঘের জন্মই নয় পেটের ভাবনা ভেবেই। এখন আর তা হয় না। আশপাশের ডাক ন' থাকলে নাতনীকে কাছে বসিয়েই গান শোনায়। মনের আনন্দে কঙ্কে সেজে তামাক পায়। নাতনীও গায়ের রং বউমার মতো ফস। না হলেও মুখ-সৌন্দর্য চমৎকার। 'সয়' ওর রাধা-রমণই বোধ হয় নারীর বেশে পুনরায় ধরায় এসেছেন। ময়নার 'সয়'স বছর তিনেক। ওকে কাছে বসিয়ে খেলা দিতে দিতে ছ'কলি গানই বেঁধে ফেলে মধু :

ধনী—

কোথা ছিলে বল চাঁদবদনী।

আমি তোমার ও রূপে জলে মরি

কোথা ছিলে বল আদরিণী ॥

কৃষ্ণ নাম গানে, মহোৎসবে, স্তবের সংসারে পরমানন্দেই দিন কাটতে থাকে মধুব। অসময়ে মোক্ষদাকে হারিয়ে, এক সময় মনে যে খেদ হয়েছিল এখন আর তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। রাধাবরণ ওকে বেশ আনন্দেই রেখেছেন। দিব্যি খায় দায় পূজা-আহ্নিক করে। নাতনীকে কাছে বসিয়ে খেলা দেয়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুল ময়নার মাথা ভর্তি। ছোট ছোট দুধের মতো সাদা দাঁত। খিল খিল করে হাসে। মধুর আনন্দ ধরে না। পাড়া প্রতিবেশীরা অহুযোগ করে, তবু তো নাতির মুখ দেখেনি মণ্ডল। নাতি হলে হয়তো মাটিতেই নামাতো না।

মধু হাসে। মনে মনেই বলে, নাতি আর নাতনীতে তফাত কি? সকলেই তো কৃষ্ণের জীব। ভগবান ওকে প্রথম নাতি না দিয়ে নাতনী দিয়েই ভাল করেছেন। নারীই তো গৃহলক্ষ্মী। সর্বপ্রথম সেই লক্ষ্মীর আগমন তো পরম সৌভাগ্যেরই কথা! তাছাড়া বেটাছেলে লায়েক হতে চের সময় লাগে। কৃষ্ণ-দাসী তো শীগগীরই ভাগর হয়ে উঠবে। রাধারানীর পাশে এসে পাড়াবেন রাধারমণ। নয়ন জুড়াবে। বাপ মা পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ময়না.

ময়না। কিন্তু মধুর কাছে ও কৃষ্ণদাসী। মেয়েই বলো আর ছেলেই বলো বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তো পুরুষ। আর সকলেই নারী—তঁার দাসী।...
মধুর ভাবনা কুল পায় না। চিরানন্দময় জগৎ।...

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসেন। বটে! আনন্দ চাই ? পাবে। তবে জেনে
রেখো :

যে করে আমার আশ,
করি তার সর্বনাশ।
তবু যে করে আশ,
হই তার দাসাদাস।

নিবারণের বয়েস কুড়ি একুশ—জোয়ান ছেলে। ভোরে উঠে পাশ্চাত্যে
ক্ষেতের কাজে গিয়েছে। দুপুরে ফিরে এসে গরম ভাত খাবে। স্বপ্নের নিরামিষ
রাগা শেষ করে উঠুনে মাছের ঝোল চাপিয়েছে দুর্গা। মধু ঘাট থেকে স্বান করে
এসে সবে আছিকে বসেছে। ক্ষেত থেকে আট দশ জন ধরাধরি করে
নিবারণকে বাড়ি নিয়ে আসে। দু'বার ভেদবমির পর অচৈতন্যই নিবারণ। ওঝা
আসে, বৈষ্ণব আসে, মায় এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। কিন্তু নিবারণের আর
জ্ঞান হল না। হৃদয়স্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

গগনভেদী চীৎকারে ক্ষেটে পড়ে দুর্গা। কাটা পাঠার মতো দাপাতে থাকে।
ময়না ভাবাচাকা খেয়ে উচ্ছ্বরেই কাঁদতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়
স্বজনদের চোখও জলে টেঁটুধুর। কিন্তু জল নেই শুধু মধুর চোখে। চিরজীবন
নাম গান করেছে ও—গীতা পড়েছে। ও জানে, জীর্ণ বস্ত্রের মতোই তো পরমাত্মা
একদিন এ দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে! এতো অনিবার্য পরিণাম। মায়াময়
জগৎ। কে পুত্র, কে কন্যা, কে স্ত্রী?...হাতে আছিকের তিলক-মাটি ছিল।
আর দ্বিল প্রভূপাদের যুগল চরণের ছাপ। মধু মৃতপুত্রের সর্বাঙ্গে একে দেয়
তিলক-রেখা। কণ্ঠে পরিয়ে দেয় জপের মালা। মুখে দেয় গঙ্গা জল! ওর হয়ে
আগে একাঙ্ক নিবারণেরই করার কথা ছিল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় ওকেই আগে
করতে হচ্ছে। বেশ তো তাই হবে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে একমাত্র
পুত্রের স্বশ্রম কার্য করে ধরে কেবল মধু। কিন্তু পরদিন সকালে আর নিস্ত্রের
ধরের দরজা খুলতে পারে না। রক্ত অশ্রু উছলিত হয়ে ওঠে। রাধারমণজীর
চরণতলে বসে আকুল হয়েই কাঁদতে থাকে মধু।

পুত্র গেছে। চতুর্দিকে অভাব অনটন। ঘর বাড়িও গেলো। কিন্তু কর্তব্যে
শেষ নেই। দুর্গা ময়নার ভরণ পোষণের ভার ওর। এ কর্তব্য পালন না করলে
বাধারমণজীউ ওকে ক্ষমা করবেন না। তাই সব হাবিয়েও আবার সব পাবার জন্ম
দীহ্নকে লিখতে বাধ্য হয়। যতদিন জীবন ততদিন কাজ করে যেতে হবে। আবার
বাধতে হবে ঘব। যারা আশ্রিত তাদের আশ্রয়েব ব্যবস্থা না কবে উপায় নেই।
প্রাণাধিক মধু-কীর্তনিয়াব পত্র পেয়ে দীহ্ন স্থিব থাকতে পারে না। জমি-
দাবয়ে কাছ থেকে যদি জমি পাওবা না যায় ক্ষতি নেই। নিজের ওপক্ক
আস্তা বেখেই মধুকে আসতে লিখে দেয়। একবার শুধু পবামর্শ করে মিতা
কবিমেব সন্ধে।

কবিম বলে, বল কি মিতা। এতবড় গুণীলোক আশ্রয়হাবা হয়ে পথে
পথে ঘুরবে। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, বয়েসও ভাটিব পথে। আমবা না দেখলে
কে দেখবে মঙলকে? তুমি লিখে দাও—দুজনে না হয় হ'বিষে ক'রে জমি
ছেড়ে দেবো।

দীহ্নর আমন্ত্রণ পেয়ে মধু চবেই আসে। সন্ধে দুর্গা ময়না। সামান্য কিছু
তৈজসপত্র। অনেকদিন পব কীর্তনিয়াব সন্ধে মুখোমুখি দেখা। চবে এসে
গত হ'বছর কাতিক মাসে কার্তনিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দীহ্ন। কিন্তু
কীর্তনিয়া আসেনি। কেন আসেনি সেকথা আজ বুঝতে পাবছে। পুত্রশোক
মাহুথকে বোধহয় এমনিই কবে ফেলে। ডাক ছেড়ে যদি মঙল কিছুদিন
কাঁদতে পারতো তাহলে বোধ হয় ভাল ছিল। মঙলের মুখেব দিকে চাইলেই
বুক ফেটে কান্না আসে। নীববেই অভ্যর্থনা জানায় দীহ্ন মধুকে। খবব
পেয়ে করিমও ছুটে আসে। তিন গুণী একত্রিত হয়। হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে
ওঠে। কিন্তু মুখে কারো কোন কথা ফোটে না। মধু যেন সকলকেই স্তম্ভিত
ক'র ফেলেছে।

চবফুটনগরে চট করে জমি পাওয়া এখন আব সম্ভব নয়। রাখাল
গোসাঁইকে দু'দশ টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করার জোও এখন আর নেই।
এখন জমি বিলির কর্তা স্বয়ং রমেন্দ্র নাবায়াণ। জলো জমিই এখন বিলি হয় চড়া
দবে। তুড়পরি মোটা নজরানা। মধুর তো সঘল বলতে কিছুই প্রায় নেই।
টেনেটুনে শতাধি টাকাও হবে কিনা সন্দেহ। এত অল্প টাকায় বাস ও চাষের
জমি পাওয়া খুবই মুশকিল। গয়নাগাটি বেচলে অবশ্য আরো ৭ দুই টাকা হতে
পারে। কিন্তু সোক্ষদার যা কিছু ছিল সে সবই তো দুর্গাকে ও দিয়ে দিয়েছে।

এখন দুর্গার কাছে কি করে এ প্রস্তাব করা যায় ? এ অঞ্চলে পালাগান গাইতেই বা ওকে কে ডাকবে ? দশ পাঁচ টাকা হয়তো তা থেকেও আসতো। আবার খেতে পরতেও কম টাকা লাগবেন। দীলু বৈরাগী অবশ্য যথেষ্ট সম্মান দিয়েই তার বাড়িতে রেখেছে। বৈরাগী বউয়ের যত্ন-আস্তিরও ত্রুটি নেই। ময়নাকে তো নিজের মেয়ে করেই নিয়েছে কুহুম। দক্ষিণ কোণের বড় ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছে ওদের তিন জনকে থাকার জায়। কিন্তু হলে কি হবে ! যত আদর আপ্যায়নই হোক—মালুম অস্ত্রের দাড়ে চেপে ক'দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে ? মধুর খাওয়া পরার ত্রুটি নেই ! কিন্তু মনে স্থখ নেই। রোজই এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায়। ফাঁক ফুক দেখলে জমির দর জিজ্ঞেস কবে। কিন্তু তাঁকের কড়িতে নাগাল পায় না। দীলু করিম আসরে বসে সাম্বনা দেয়, ঘাবরান ক্যান মগুলের পো ? বিপদে যিনি ফেলচেন তিনিই কুল দিব।...

কুল সত্যি সত্যি একদিন পায় মধু। চরের পশ্চিমদিক জমশঃই বেড়ে চলেছে। রামকান্তকে ধরে অনেক তোষামোদের পর বিধা-তিনেকের মতো একটু স্থবিধাতেই পাওয়া যায়। উঁচু দিকটায় একখানা চালা বেঁধে দিন কোন রকমে কাটানো যাবে। পলি যদি ধরা যায় তাহলে চাষাবাদেরও কিছুটা স্থবিধা হতে পারে। হাতের সর্বস্ব পণ করেই জমিটুকু কিনে ফেলে মধু। দীলু করিমের সম্মতি নিয়েই কেনে। ওরা ছাড়া এ চরে কে আর ওর আপনজন আছে ? মোহনপুরের জলো জমি বিক্রি করে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। হাতেও জমানো ছিল গোটা চল্লিশেক টাকা। বাকীটা নিবারণের মার খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার বেচে হয়েছে। বুদ্ধিমতী দুর্গাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয়নি। নিজের থেকেই ও ঝাঁপি খুলে শম্ভরের হাতে গুঁজে দিয়েছে সব। শাম্ভুড়ীর ছাড়া নিজের গলার সোপার হারছড়াও দিয়েছে। নইলে তিনশ টাকা হলো কি দিয়ে ?...স্বামী হারিয়েছে নিজের নিদানের সম্বলও খোয়ালে বেচার। বুকের পাজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যায় মধুর। তবু ওকে কঠিন হয়েই হাত পেতে সব নিতে হয়। ভিটে না হলে ঠাড়াবে কোথায় ?...জমির দাখিলাখানা কোঁচান্ন খুঁটে বেঁধে চোখের জল মুছতে মুছতেই কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে।

দীলু সাম্বনা দেয়, কাইন্দেন না মগুলের পো। তিনিই কুপা অইলে সব পাইবেন। জাহেন নাই, কি কাপরে পড়ছিলাম ? আপনাগ অলীর্বাঁদে দয়াল চান বাচাইয়া রাখচে ত। প্যাট ভইয়া এহন দুইজা খাইবার পারচি ত।...

পাষণে বুক বেঁধেই চরে ফিরে আসে মধু। দীলুর পরামর্শ মতোই পলিথরার

কাজে মন দেয়। পাটকাটির বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একখানা ডেরা বাঁধে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে। দীর্ঘ বাধা দিয়েছিল, এবারের বর্ষাটা ওর বাড়িতেই কাটিয়ে যেতে! কুহুম তো কিছুতেই ছাড়বে না। এক রত্তি ময়না। ভিজ়ে মাটিতে অস্থখ কবে যদি! কিন্তু সব চেষ্টাই ওদের নিফল হয়। নিজের ভিটের চেয়ে স্বর্গও মধুর কাছে বড় নয়। ময়নার কোন অস্থখই ওখানে কবতে পারে না। উঁচু করে মাচা বেঁধেছে। ভিজ়ে মাটিতে কি কববে? তাছাড়া চর ছেড়ে তো আর কোথাও যাচ্ছে না। যখন খুশি কুহুম ওকে দেখতে পাববে। হৃদয়ের আবেগ দিয়েই সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়। দীর্ঘ কুহুম গুচ্ছিয়ে দেয় ঘর-গৃহস্থলী।

ভক্তের ফাঁদে পা রাখেন মা লক্ষ্মী। হু'বছরের বর্ষায় বেশ পুক হয়েই পলি দূরা পড়ে। সামান্য জমি। ধান পাটের চাষ এখনো সম্ভবপব নয়। মৃগ-কলাই যা ওঠেছে তার সঙ্গে দুটো ছুবেল গক পুষে দিন কেটে যাচ্ছে। মধুর দেখা-দেখি আবো কয়েক ঘর এ অঞ্চলে সমানে যুঝছে। সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম পাড়াও দিন দিন বেশ পুষ্ট হয়ে উঠছে। মধুর চেয়ে জমির পরিমাণ অনেকব বেশী। লোকবল অর্থবলেও অনেকই বড়। তবু এ-পাড়ার মাতব্বর মধুই। মধুর নাম অস্থসারেই পাড়ার নাম মগুলাপাড়া। সকলে খশী হয়েই এ-নাম ধায় করেছে। টাকাই তো মাস্থয়ের জীবনের একমাত্র কথা নয়। মধুর মতো এমন শিষ্টাচারী মাস্থ্য চরে ক'জন আছে? অষ্টপ্রহর ভজন-পূজন নামগান কবে। কোনরূপ মিথ্যা বজ্জাতীর মধ্যে কখনো থাকে না। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়েও কখনো ঝগড়া করে না। এমন মাস্থ্য মাতব্বর হবে না তো'কে হবে?

বছর পাঁচেক বয়েস ময়নার। মাত্র হু'বছর চরে এসেছে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ছোট্ট বড় সকলকেই ও মায়ায় কলেছে। এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ওর অবাধ গতি। সকলেই ওকে ভালবাসে—স্নেহ করে। গায়ের রংটা একটু কালো। কিন্তু এ কালো যে জগতের আলো। কি স্বস্তির টানা টানা চোখ জোড়া! কুহুম একদণ্ডও ওকে চোখের আড়াল করতে পারে না। নিজের পেটের মেয়ে নেই কুহুমের। বড় ছেলের বউ পার্বতী খেঁদে অনেকটা পূরণ করেছে। কিন্তু ময়নাকে পেলে বোধ হয় সে সাধ ওর বোলকলায় পূর্ণ হয়।

নিশি অপেক্ষা ময়না বছর তিনেকের ছোট। তবু গলায় গলায় ভাব হু'জনার। একসঙ্গে খেলা করে একসঙ্গে খায়। কুহুম একবাটিতে দুধভাত মেখে হুজনকে

নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। হুঁমু কয়লে জুজুবুড়ীর ভয় দেখায়। রূপকথার গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ছ'বছর তো ওর কাছেই আছে ময়না। বাড়িতে মা দাদুর কাছে আর কতক্ষণ থাকে? শুধু যা রাতটুকু। ভোর হতে না হতেই আবার ছুটে আসে নিশির খোঁজে। কুম্বমের মনে হয়, নিশির বাপ তো দিনরাত ছোট পোলার বিয়ের জন্ত পেড়াপীড়ি করছে। তা মন্দ কি, ময়নার সঙ্গে নিশির বিয়ে হোক না? এমন মেয়ে খুঁজলে ক'টি মিলবে ওদের সম্বন্ধে?...আবার ভাবে, না এত ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। এখন বিয়ে দিলে নিশির আব লেথাপড়া কিছুই হবে না। হলোই বা চাচার পোলা সামান্য পুষ্টিগতখানা লিখতে পড়তে না পারলে পুরুষ মানুষের চলে কি করে? আর না হোক, করে-কম্মে খেতেও তো মোটামুটি হিসেবের প্রয়োজন। অস্থিনীর তো কিছুই হলো না। দিনরাত কেবল হালের গুটিই ঠেলেছে। না না, বিয়ে এখন কিছুতেই হতে পারে না। দিব্যি দুটিতে মনের আনন্দে হেসে খেলে কাটাচ্ছে। বিয়ে দিলেই তো ময়না কলাবউ হয়ে ঘরে ঢুকবে। তাছাড়া ঠাকুর করলে এ-বিয়ে তো হয়েই আছে। মঙল কীর্তিনিয়ার সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব পোলার বাপের! কেউ কারো কথা ফেলতে পারবে না। নিশি এখন দিন কতক পড়াশুনো করুক। ময়না যেমন আছে থাক।...

ময়না প্রতাহ বৈরাগী বাড়িতে আসে। সময়ে নিশিও মঙল বাড়িতে যায়। দুর্গার বড় ভাল লাগে নিশিকে! কি সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য! গায়ের রং তো রীতিমতো ফর্সা। দোঁধের মধ্যে মাথায় একটু খাটো। তা ওর ময়নাও এমন কিছু ধেরাং লম্বা নয়। বৈরাগীর বড় লোক। নয়তো ঘরে জামাই আনতে হলে এমন জামাই-ই কাম্য। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখে দুর্গা। নিজের স্বস্তরকে পর্যন্ত বলতে ভরসা পায় না। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। বৈরাগী-গিন্নী কি আর তার কোলের পোলার বিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে দেবে? তা রং যতোই ময়লা হোক দেখতে ময়নাও ফেলনার নয়। নাক, মুখ, চোখ, ভ্রু, চুল সবই তো নিখুঁত সুন্দর।...অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে দুর্গা নিশির দিকে। বাড়িতে এলে কিছু না কিছু ওকে খেতে দেবেই। নিশি কখনো একা থাকে না। বেশীটাই ময়নাকে দিয়ে দেয়। তারপর, পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা ধলেস্বরীর চড়ায় কখনো বা মাঠে ঘাটে। দেখে দেখে মধুও হাসে। বুকভরা আশা নিয়েই ভাবে, এখন যা ছেলেখেলা, দুদিন বাদে তাই হবে হয়তো জীবন-সত্য। মাছুষ তো এমনি

করেই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে। মায়া—সব মায়া। বাধারমণ স্বখে রাখন ওদের।...

কাঁকড়া কাঁকড়া চুল মাথায় ময়নার। ছ'বছর চরে এসে খাসা গোলগাল হয়েছে। রূপোব ছ'গাছা মোটা বালা স্কডোল দুই বাহুতে। পায়ে বল দেওয়া খাড়ু। বুন্ডর বুন্ডব শব্দে এবাড়ি ওবাড়ি আসে যায়।

সেদিন দাওয়াব ওপর বসে একটা পেয়ারা খাচ্ছিল নিশি। ময়না হস্তদস্ত হয়ে কাছে ছুটে এসে বায়না ধরে, এই নিশা, হত্রি-আম দে ?

দাত খিঁচিয়ে উত্তর করে নিশি, অল আমার অল্লাদিল, হত্রি-আম দিব হবে। যা যা, ছাই দিমু তবে।

কি কলি, ছাই দিবি ! দাঁড়া তব মজা দেহাই, রাগে গজ গজ করতে করতে দুপা এগিয়ে যায় ময়না।

হ, এইডা দিনু তবে—ছোঁচা কোঠানকার, জিত ভেঁচিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় নিশি—

ময়না আরো খানিকটা কাছে এসে উণ্টো ভেংচি কাটে :

নিশি ঋগি ভাঙা শিশি—

কান মইলা দেয় পদ্মা পিসি।

ছাথ রাইক্ষসী, তীত্র প্রতিবাদ করে নিশি।

কি দেখবরে, বলতে বলতে এসে এমন জ্বারে ধাক্কা মারে যে বেচারী নিশি ডিগবাজী খেয়ে মুখ থুবড়ে উঠোনব ওপব গিয়ে পড়ে। ময়না একটু দূরে সরে গিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে।

খব লাগে নিশির বাঁ হাঁটুতে...নাকের ডগায়। তব মনের রাগে গৌ গৌ করতে করতে উঠে এসে ময়নার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কচ্ করে কামড়ে দেয়।

ময়নার ডুকরে ওঠে ময়না। হেঁশেল থেকে ছুটে আসে কুসুম। সপ্তাহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে ক্ষতস্থানে। নিশি সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওর ছ'গালে ছোটো ঠোঁকনা দিয়ে ধমকাতে থাকে।

বেঁচারী নিশি, থ বনে যায়। ওকে যে আগে ধাক্কা মারলে সেকথা একবারও বলছেন না উনি। ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদেই কেলে।

অতি রাগেও হাসি পায় কুসুমের। কোন রকমে নিজেকে চেপে পুনরায় হেঁশেলের ভেতরে যায়। একটা বাটিতে করে তাড়াতাড়ি খানিকটা দুধের সর

তুলে নিয়ে আসে। দুজনকে কাছে বসিয়ে ভাগ করে খাইয়ে দেয়। মিটমাট হয়ে যায় ঝগড়া। তখন দু'জন দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট দলেখরীর বাকে।

এমনি দিনে দশবাব ভাব দশবার আড়ি। মনে মনে হাসে কুহুম। নিজেব বাল্যস্মৃতি মনের কোনে উঁকি দেয়। একরত্তি মেয়েই বৈরাগী বাড়িতে এসেছিল। নিশির বাপের সঙ্গে ঝগড়াও বড় একটা কম হয়নি। তবু তো...

মধুর মত না বয়েস পুত্র শোকে তার চেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়েছে। পালা গান করতে গিয়ে এখন আর দম পায় না। আসরে উপস্থিত থাকলেও প্রধান দোহার বন্দাবনই এখন মূল গায়নের কাজ করে। ভাবাবেগে কখনো-সখনো দু'একটা কলি ধরে টান দিতে গিয়েও অস্থির হয়ে পড়ে। কাশির দমকে দম আটকে আসে। কখন কি হয় বলা যায় না। ময়না তো সাত পা দিলে। পিতৃপিতামহের ধারা বজায় বেখে কাজ করতে হলে এই-ই বিয়ের উপযুক্ত বয়েস। আটের ভেতরে গোরীদান করতে না পারলে সাতপুত্র নবকে ধাবে।...দীলু ব বাড়ি কীর্তনে এসে মধু আজ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে। আসরের আর কেউ তখনো এসে জড় হয়নি। তামাক গেতে খেতে একটু জোব দিয়েই দীলুর নিকট কথাটা পাড়ে মধু, পুত্রা, ময়না নিশির চাইর হাত এক কইরা ছাও। আমার শরীরের অবস্থা ভাল না।

দীলু হাসতে হাসতে ছকোয় টান দিয়ে উত্তর করে, ধাবড়াও ক্যান ভালই, সব ত ঠিক অইয়াই আচে? দয়াল চান করলে এত শিগ্গীর আব ভূমি আমাগ ছাইয়া ঘাইবার পারবা না। আর কয়ডা দিন সব্বর কর। নিশার মায়া যে আবার ছার পোলারে ভদ্র নোক বানাইবার চায়?

হ, নিশি ত দেক্তি রোজই গঞ্জের ইন্ধুলে যায়। তা শিকলনি কিচু?

হ, কতা অব মায়ারে জিগাইয়। চাবার পোলার আবার নেকাপড়া! আরে বাবা, একটু ধম্মে কন্মে মতি থাকলেই অইল। নেকাপড়া শিকা আমাগ কি অইব?

মধু বাধা দেয়, না না পুত্রা, ওকথা কইয় না। ছাহ না, ভাগবতধান পড়বার গেলেও নেকাপড়া জানা চাই, দু'হাত কপালে তুলে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মধু।

হ, তা পারলে ত ভালোই অয়। এহন তোমাগ দশজনের আশীর্বাদ।
 তা তুমি দেইখা নিয়, তোমার ও পোলা একজন অইব।
 কথা আর বেশীদূর এগোয় না। ইতিমধ্যে আসরের আরো অনেকে এসে
 জড় হয়। সংসারের চিন্তা ছেড়ে কীর্তনেই মন দেয় উভয়ে।

॥ ১০ ॥

নিশির ওপর কড়া নজর কুহুমের। চেষ্টা স্বপ্নের ক্রটি নেই। মনের কোণে
 স্বপ্ন-মায়া। গাটশালার সময় এগারোটায়। নিশিকে ডিস্কিতে উঠতে হয়
 দশটায়। কুহুম নয়টার মবেই খাইয়ে দাইয়ে বই প্লেট গুছিয়ে দেয়। চরের
 আরো চার পাঁচটি ছেলে যায় নিশির দেখাদেখি। বড় বড় হরপের ওপর হাত
 ঘুরোয় নিশি। স্বরবর্ণ পরিচয় হয়ে গেছে। ব্যঞ্জনবর্ণও শোজাহজি পড়তে
 পারে। তবে উণ্টো পান্টা পরলে বলতে পারে না। কুহুমের আনন্দ আর ধরে
 না। ওর কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে। দয়াল হরি দয়া করলে নিশি মাছুষ হবে।
 বাবুভুইকাদের মতোই কথাবার্তা বলতে পারবে। চিত্রিপত্র লেখাতেও আর
 অগ্রকে তোষামোদ করতে হবে না।...স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয় কুহুম।
 ঠাকুর যদি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহলে সোয়া সের বাতাসার
 হরিলুট দেবো। সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে এসে গলবস্ত্র হয়ে
 মানত করে।

বছর থানেকের ভেতর থিণ্ডিয়ে থিতিয়ে—‘অজ, আম, ইট, ইহ...’ পড়তে
 পারে নিশি। এখন আর ওকে তাড়া দিতে হয় না। পাটশালার আকর্ষণ
 এখন ওর সবচেয়ে বেশী। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস।
 দশটায় রওনা হয়—কেবে বিকেল ছ’টায়। এই স্থদীর্ঘ সময় ময়নার আর কাটে
 না। ইস, স্থধি যে ডুবু ডুবু! কখন নিশি আসবে—কখন ওরা খেলা করবে।
 একবার বাড়ি একবার ঘাট, ময়নার আর স্বস্তি নেই। ডিস্কি ঘাটে লাগার সঙ্গে
 সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিশির গলা জড়িয়ে ধরে। কুহুম দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে
 দুখভাত খাইয়ে দেয়। নিশির শুকমুখে হাসি কোটে। শুরু হয় মজার খেলা।
 ময়না হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে ধলেশ্বরীর বাঁকে। জলের ওপর থপ
 থপ করে পা ফেলে ছ’জনে পার হয়ে যায় ওপারে। চড়ার ওপর দাগ কেটে
 কেটে মস্তবড় একটা বাড়িই তৈরি করে কেলে অয়না। পরিশ্রমে গলা শুকিয়ে

কাঠ। গিন্নীর মতো স্বর নিয়েই আঝার করে, এই নিশা, একটা কুয়া খোদ।
আমি জল খামু

নিশির হাসি পায়। সমতা রেখেই জবাব দেয়, জল খাবি গাঙের ঘাটে
যা না।

না, আমি কুয়ার জল খামু, ময়নার বায়না বেড়ে যায়।

ঠিক খাবি ত? নইলে কইলাম মজা দেহামনে।

তুই খইদাই ছাপ, খাই কিনা?

কথায় কথায় ছোট একটা কুয়ো খন্দে ফেলে নিশি। বেশী গভীর না হতেই
বালি চুইয়ে জল বেরুতে থাকে। নিশি উল্লাসে হাঁক ছাড়ে, এই মইনি, জল
খাবি আয়।

অনমনস্কভাবেই উত্তর করে ময়না, বাবে, আমি বলে গ্রহন রানবার নৈচি!

কি, তুই জল খাবি না? ক্রোধে গর্জে ওঠে নিশি।

না, আমি খামু না, ঠোট উল্টিয়ে উত্তর করে ময়না।

তবেরে রাইক্ষসী, ছুটে গিয়ে চূলের মুঠি ধরে টেনে আনে নিশি ময়নাকে
কুয়ার কাছে।

ময়না দূর থেকেই শাসায়, ছাড় বলচি? বালো আইব না কইলাম।

কি বালো আইব না ল?

ছাড় বলচি?

আগে তুই জল খা?

না, আগে তুই ছাড়?

ছাড়লে খাবি তো?

হ, খামু।

নিশি ছেড়ে দেয় চূলের মুঠি। ময়না এক লহমায় কুয়ার ওপর উপুড় হয়ে
চূহাতে কাদা জল ছিটাতে থাকে। নিশির গা, মাথা, কাপড় মুহূর্তে কাদা
মখোমাখি হয়ে যায়। দিশেহারা হয়ে ময়নাকেও ও জোর করে ধরে কুয়ার
মধ্যে চুবিয়ে দেয়। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে ভেঙে দেয় ওর তৈরী ঘর-বাড়ি। সারা
চরময় চলে দু'জনের দোড়রাঁপ ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয় হয় ভয়ে দুজনেই কাঁপতে
থাকে। এভাবে বাড়ি ফিরলে কারো আর রক্ষা থাকবে না। ভেবে-চিন্তে
ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ জলে গিয়ে নামে। উভয়ে উভয়ের গা, মাথা, কাপড় পরিষ্কার
করে ধুইয়ে চুপি চুপি বাড়ির দিকে রওনা হয়।

নিশির দেখাদেখি ময়নাও বায়না ধরে পাঠশালায় যাবে। বুড়ো দাছ মধু আকার শুনে হাসে। তবু আদরের নাতনীর মজি মাকিক বই, প্লেট, পেন্সিল ঠিকনে দেয়। দিন তিনেক ডিক্বিতে চড়ে যায়ও ময়না গঞ্জের পাঠশালায়। নিশির ভারি মজা লাগে। কিন্তু গুরু মহাশয় রাজী হন না। মেয়েদের সময় সকালে। পড়তে হলে ময়নাকে সকালেই আসতে হবে। একত্র পড়া চলবে না। একা একা যেতে আর উংসাহ বোধ করে না ময়না। দিন কয়েকের ঠেঠায় দাছর কাছেই বর্ণ পরিচয় হয়ে যায়। নিশির চেয়ে ময়নার মাথা ভাল। নিশি এক বছরে যা শিখেছে ময়না ছ'মাসেই তা শিখে ফেলে। নিশিকে নিয়ে কুহুমের উংসাহ দমে যায়। ছেলের চেয়ে ছেলের বউ বেশী লেখাপড়া শিখবে নাকি? কাজ নেই আব কারো লেখাপড়া শিখে। পুপি পাচালি তো নিশি এক ব্রকম পড়তেই পারে। পুকস মাহুঘের এখন কাজ-কর্ম শেখা দরকার। সংসারও এখন বেশ বড় হয়েছে। একা পার্বতীকে দিয়ে আব চলছে না। ময়নাও সংসাবে আসুক। মেয়ে মাহুঘের পিন্দীপনায় কোন লাভ নেই। বয়েস তো শুনছি সাত পেবিয়ৈ চললো। এই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তো ও বৈরাগী বাড়ির হেঁশেলে এসে ঢুকেছে... নিশি ময়নার বিয়ে দিতেই উত্তোঙ্গী হয় কুহুম। প্রস্তাবটা দীহুর নিকট পেশ করতেই দীহু দাঁত বার করে হাসে। বলে, কি গ পোলার মা, তোমার পোলারে না ভদর নোক বানাইবা?

কথাটা কুহুমের ভাল লাগে না। তবু নিজের পক্ষ সমর্থন করেই উত্তর করে, ভদর নোক ত বানাইচিই। চ্যাষ্টা করচিলাম বইলাই না নিশা এখন বই পড়বার পারে। তোমাগ বংশে কেরা কবে লেকাপড়া শিখচিল?

হ হ, তাত ঠিকই। তবে ভয় পাইলা ক্যান?

ভয় আবার পামু ক্যান? বই পড়বার শিখচে এখন কাম শিকুক।

আমাগ মতন অশিক্বিতের কাছে কাম শিকলে কি আর কাম করবার পারব? তার খনে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া ছাও, শিক্বিত অইয়া আইব।

কতায় কতায় বাপের বাড়ির খোঁটা ছাও ক্যান তুমি? তারা কি কেউ তোমাগ খাইবার পরবার আহে?

না, খোঁটা আবার দিলাম কই? তাগ গুণগানই ত কল্লাম!

তাগ গুণগান করনের আর কাম নাই। সামনের হাটেই ময়নার লেইগা গয়না গড়াইবার ছাও। তালইর যদি অমত না অয় তাইলে সামনের মাসেই আমি নিশির বিয়া দিমু।

আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয় নিশি ! আবার শেষ হয়ে যায় । কিন্তু ময়নার বায়না বেড়েই চলে । একে একে তিন চারখানা গং বাজাবার পরও যখন ময়না থামে না তখন নিশির বৈধৃত্যটি ঘটে । হাতের বাঁশী দিয়ে এক বা বসিয়ে দেয় ময়নার পিঠের ওপর । ময়না ডুকরে ওঠে, রূপ করে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে । হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ।

নিশির চোখ দিয়েও জল বেরুতে চায় । ময়নার হয়তো খুবই লেগেছে । নিজেও লাফিয়ে পড়ে ডাল থেকে । কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, খুব লাগচে মইনি ?

যা, তুই আমার লগে কথা কইচ না, কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর কবে ময়না ।

কান্দিচ না । আর তরে মারুম না । এই বাঁশী ছুঁইয়া কই, নিশি ব্যাকুল ভাবেই সাঙ্ঘনা দেয় ।

চোখ ঢেকেই জিজ্ঞেস করে ময়না, ঠিক কচ্ ত ?

হ, ঠিক কই । আর কোন দিন তরে মারুম না ।

ময়না ফিক করে হেসে ফেলে আবার বায়না দবে, তবে আর একটা গং বাজা ?

নিশি আবার বাজাতে থাকে :

- রাধে তোর তবে ছল করে বাজাই বাঁশী ।

জটীলা কটীলা আছে নয়ন জলে ভাসি ॥

দূর থেকে ওদের ছেলেখেলা দেখে দেখে অস্থিনীর হাসিই পায় । আপন মনেই ভাবে, হ্যাঁ, ময়নাকে শিগগীর পার্বতীর জা করে ঘরে নিতে হবে । ওদের আর বেশী দিন দূরে রাখা ঠিক নয়.....আশায় আনন্দে দিল ভরে ওঠে অস্থিনীর । শক্ত করে হালের গুটি ধরে । হুকো টানতে টানতে দীহুও স্বপ্ন দেখে ।

মা লক্ষ্মীর রূপায় শংসারে এখন দু'পয়সা সঞ্চয় হচ্ছে । পঁচিশ ভবির ওপর রূপো দিয়ে গজ থেকে খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার তৈরী করে আনে দীহু ময়নার জন্ত । এখন বাকী কোমরের বিছা, নাকছাবি, আর হাতের রুলি । কুহুম গামছার বাঁধন খুলেই দীহুর ওপর ফুঁসে ওঠে, কোলের পোলার বিয়া দিমু মুটে এই তিন পদ গয়না দিয়া নাকি ? তোমার আঙ্কল কি ! ভাত খাও না ছাই খাও ?

দীলু হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়, যা ছাও তাই খাই। তবে মছ
তালইয় ত কিছু দিব।

হায় গরীব গালুয। দেয় দেউক—না দেয় না দেউক। আমি হার
ভরসায় থাকুম নাকি? বাড়ি ভইরা ইষ্টি কুটুম থাকব। তাগ কাছে আমার
নাক কাটা যাইব না!

বেগতিক দেখে দীলুও সায় দেয়, হ হ, তুমি ঠিকই কইচ। সামনের
হাটে সব আনন যাইব। এহন খাইবার ছাও। বড় খিদা পাইচে।

আনন যাইব না। আনন লাগবই। আর নাকছাঁবিটা সোনার আনবা।
কত আর দাম অইব? আমি ঐড়া দিয়াই বউয়েব মুখ দেহুম, হাটেব সওদা
গুছাতে গুছাতে পুনরায় নংকাব তোলে কুহুম।

আইচ্ছা—আইচ্ছা তাই অইব। তামুক কি তইল? তাড়াতাড়ি
তামুক ছাও এক ছিলুম।

আনচে তামুক। বাবারে বাবা, কইলকার গোয়া আর জুড়াইবার পারে
না, দিনের মধ্যে চৈদ্দ বার কইরা তামুক খাওয়ন!

কুহুমের কথা শেষ হতে না হতে হাঁকোব মাথায় কলাকে বসিয়ে ফুঁ দিতে
দিত্তে হাজির হয় পার্বতা।

দীলু হাতে যেন স্বগ পায়। তার কোন কথা না বাড়িয়ে ফুৎক ফুৎক শব্দে
অবিরাম টানতে থাকে।

কুহুম হাটের সওদা গুছিয়ে রেখে খাবাব বাড়তে যায়।

সামনের মাসেই নিশির বিয়ে। কুহুম তাড়া দিয়ে বাড়ির উঠোনে আরো
তু'খানা ঘর ওঠায়। ছোট ছেলের বিয়ে। বলতে গেলে এই তো শেষ কাজ।
আস্বীয়-কুটুম কাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। সকলে যদি আসে তাহলে উপস্থিত
যা ঘর আছে তাতে কুলাবে না। কুহুমের ইচ্ছে, পাকা টিনের ঘরই হোক।
কিন্তু দীলু সাহস পায় না। খাওয়া-দাওয়া বাড়ি খরচায় একগাদা টাকার
দরকার। তাছাড়া গয়নাগাটিতেও নেহাত কম খরচা হলো না। এরপর
আছে নিকট আস্বীয়দেব ব্যবহারের কাপড়-চোপড় দেওয়া। নানাদিক ভেবে
খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে উঠানের ওপর তু'খানা কাঁচা ঘরই
তোলে দীলু, বেশ বড়সড়। কুহুম এ নিয়ে আর কথা বাড়ার না। হাজার
হোক, ও তো আর অব্ব্ব নয়। এই তো মাত্র বছর সাতকের কথা জলের

ওপর ভাসছিল। ঠাকুরের অশেষ দয়া যে একটু কূল পেয়েছে। একা মানুষ, অতো না পেরে উঠলে করবে কি? খুব খুশী হতে না পারলেও বেশ যত্ন করেই কুহুম ঘর দু'খানার মেঝে লেপে পুঁছে তক্তকে ঝকঝক করে, তোলে। মুড়ি ভাজা, খৈ ভাজা, হলুদ লস্কো কোটা—কোন কিছুই বাদ থাকে না। আর তো মোটে কয়েকটা দিন। তারপর সারা বাড়ি উৎসবে মেতে উঠবে। অস্থিনীর বিয়েতে সখ আহ্লাদ কিছুই হয়নি। আত্মীয়স্বজনও কাউকে তেমনভাবে জিজ্ঞেস কবতে পাবেনি। এবার সব সাধ—সব বাসনা ভালভাবেই মেটাতে। গোছগোছের কাজে সাহায্য করবার জগ্ন মাসখানেক হয় মাকে লোক পাঠিয়ে আনিয়েছে। বুড়ো মানুষ, বসে বসে নিদেশ দিলেও অনেক স্নবিধে হবে। নিজের পেটের দশটি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কোন কিছুতেই ভুল হবার নয়। তাছাড়া নিশি তো আজীমা বলতে অজ্ঞান। একমাত্র আজীমা আর পার্বতীর কাছেই তো মনেব কথা খলে বলতে পারবে ও। আর তো সকলেই সন্তুষ্ট পাত্র। আজীমাকে অনেক আগে কাছে পেয়ে নিশিও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

মধুরও তোড়জোড়ের অন্ত নেই। দীহুর সঙ্গে নিজের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে তো আর একমাত্র নাতনীব বিয়েতে চূপচাপ বসে থাকার জো নেই। মনেব সাধ আহ্লাদকে তো আব সব সময় অবস্থার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। ময়নাকে কেন্দ্র করেই ঘর সংসার। নইলে আব কিসের বন্ধন? যেদিকে খুশি চলে যেতে পারে। দুর্গা মা-কে নিয়ে তো কোন ভাবনাই নেই। ভোগ স্নখ ত্যাগী—সন্ন্যাসিনী। ও আছে তাই। নইলে একাকিনী পথ চলতেও ভয় পাবে না দুর্গা মা...নানাদিক ভেবে সাধ্যাতীত ভাবেই বিয়ের উৎসবে মাতে মধু। চরফুটনগরের নোড়ল দীহু বৈরাগী। তার কোলের ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে। দু'পক্ষেরই শেখ কাজ। বরযাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। চবফুটনগরের সকলে তো আসবেই। তাছাড়া চরধন্না থেকেও কেউ কেউ আসছে। বিশেষ করে পলান ব্যাপারী আর তার বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো নিশ্চয়ই। ব্যাপারীর সঙ্গে বৈরাগীর গলায় গলায় ভাব। তাছাড়া চরফুটনগরের নতুন কুটুম হয়েছেন ব্যাপারী সাহেব। ধরতে গেলে তো দীহুর নিজেরই মেয়ে মেহেরা। করিম আর দীহুতে হরিহর আত্মা। দীহুই তো মধ্যস্থ হয়ে কাজ করে দিলে। আর কেউ না আসুক মেহেরা তো আসবেই। বড় ঘরের বউ হয়েছে। ওর খাতির যত্ন না করলে চরের মান থাকবে না।

দিনের পব দিন ভেবে ঠিক হয়, আর যাই হোক, সকলের মুখ উচা রাখতে হলে গতাভুগতিক ভাত-মাছ খাওয়ানো চলবে না। বৈরাগী তো শুনছি তিন নিঠাইয়ের ফলার দেবে। তা দিক, সে বড় মাছ। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলবে না। কিন্তু এক পদ লিঠাই না খাওয়ালে আর কি করে ইজ্জৎ থাকে? রসগোল্লা যদি না-ই পারা যায় অমৃতি তো করতেই হবে। সন্তায় বেশ খাবাব। চরের মাছ বড় বড় ঢাকাই অমৃতি খুবই পছন্দ করবে। সঙ্গে কান্দনী ষোণের চন্দনচড় দই! এতে যদি সর্বস্বাস্থ্য হতে হয় তবু করতে হবে। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলে ক্ষেত-খামার টাকা-কড়ি আর তেমন দবকারই বা কি। একে দিয়ে খুয়ে যা থাকবে তাই যথেষ্ট। তাতে যদি না চলে, দুর্গা মাকে সঙ্গে করে কোন তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে থাকবে। সেখানে তো আর ভাতের অভাব হবে না। ছুঁবেলা নামগান করো—পেট ভরে প্রসাদ পাও।...মধু বাড়ি খরচ নিয়ে দীহুর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে তলায় তলায় রামকান্তর শরণাপন্ন হয়। কবিতকর্মা রামকান্ত যেন হাতে আকাশের চাঁদ পায়। তার পরামর্শে কুমার বাহাদুর ক্ষেত-খামাব বাঁধা রেখে নগদ দু'শ টাকা কর্জ মঞ্জুর করেন। রামকান্তব সঙ্গে চপি চুপি একদিন কাছারিতে গিয়ে টাকা দু'শ নিয়ে আসে মধু। পথে পা দিয়ে মনটা একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু মধু সে ভাবনাকে আমল দেয় নি। জীবনে কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেনি। দয়াল চানের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে এক বছরের শস্ত বেচেই এ পণ শোঁব দিতে পারবে। হাতে বিশেষ কোন টাকা ছিল না। নগদ দু'শ টাকার করকরে নোট পেয়ে উৎসাহ বেড়ে যায়। দীহুর মতো মধুও ঘরদোরের কাজ গুছাতে থাকে।

প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণের জন্ত দিন গুণতে থাকে। মোড়ল বাড়ির বিয়ে, শুধু শুধু মাছ ভাত কেউ খাবে না। কিন্তু কথাটা দীহুর কানে দেয় কে? একমাত্র ভরসা রামকান্ত। সে বললে মোড়ল কিছুতেই তার কথা ফেলতে পারবে না। উৎসাহী জনকন্ডেক রামকান্তকেই ধরে। চরে তো এ পর্যন্ত কেউ পাকা ফলার দিলেই না। আর মোড়ল ছাড়া দেবার ক্ষমতাই বা কার আছে? কথাটা রামকান্তরও মনে ধরে। প্রতিশ্রুতি দেয়, আজকের আসরেই সে উত্থাপন করবে।

সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের পর খোল বাজিয়ে অনেকক্ষণ নাম সংকীর্তন চলে। আজকের আসর বেশ জমেছে। হরিলুটের ব্যবস্থার মধ্যেও আজ একটু নতুনত্ব রয়েছে। বাতাসার সঙ্গে কিছু ফল মিষ্টি। নিশির বিয়ে উপলক্ষেই দীহু এ.

ব্যবস্থা করেছে। লুট হয়ে যায়। জয়ধ্বনির পর আসির ভাঙ্গে ভাঙ্গে, রামকান্ত উঠে, দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাসতে হাসতেই আরম্ভ করে, আপনারা যাবেন না। দীহুকাকার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আপনারা বহন।...

রামকান্তর চরিত্রে যত দোষই থাক ভাগবতের আসরে সে ভাব গম্ভীর। কখনো কোনরকম বাচালতা করে না। কিন্তু আজকের তার এই বাচন ভঙ্গীতে দীহু একটু বিচলিতই হয়। হাঁ করে রামকান্তর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জনতার মধ্যেও অনেকের অবস্থা তদ্রূপ। কেবলমাত্র যারা ওয়াকিবখাল ব্যক্তি তারা ই বসতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের গা টেপাটেপি করতে থাকে!

রামকান্ত সমতা রেখেই পুনবায় আরম্ভ করে, না না, চিন্তা-ভাবনা করবার মতো এমন কিছু আমি বলবো না নোড়লকাকা। তবে এঁরা সব বলছিলেন, নিশির বিয়েতে কেউ ভাত মাছ খাবে না।

হ হ ভালই, তোমার কোলের পোলার বিয়াতে মিঠাই না খাওয়াইলে আমরা কেউ খামুই না, পড়শী মদন বিশ্বাস আরো জোর দিয়েই রামকান্তকে সমর্থন করে।

দীহু যেমন বিস্মিত হয়েছিল প্রস্তাব শুন তেমনি খুশী হয়। তবু বিনয় সহকারেই আমতা আমতা করে বাধা দেয়, দশজনের মিঠাই খাওয়াইবার ভাগি কি আমার অইব?

না, অইব না। বলি বৈরাগীর পো, আমাগ এক প্যাট মিঠাই খাওয়াইলে আর তোমার গোলা ফুয়াইয়া বাইব না, আবার নিজের কথায় জোর দেয় মদন।

দীহু মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। রামকান্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে কিস্ কিস্ করে কি যেন বলে। পান্টা রামকান্তকেও দু'চার কথা বলতে দেখা যায়। তারপর দাঁকিয়েই ঘোষণা করে রামকান্ত, আপনারা স্তনে খুশী হবেন। নোড়লকাকা আপনাদের প্রস্তাবে রাজী আছেন। পদ হবে লুচি, অমুড়ি, দৈ।

সমস্ত সভা উল্লাসে ঝেটে পড়ে। ঘরের ভেতরে কুহুমের কানেও কথাটা পৌঁছোয়। ওর মতো খুশী বোধ হয় আর কেউ হয়নি। নিশির হাতে তাড়াতাড়ি বাটা ভর্তি পান সেজে পাঠিয়ে দেয় সকলের জন্ত। এই তো শেষ কাজ। অধিনী নিশি যদি বাঁচে, ঠাকুরের দয়ায় যদি ওদের ঘরে কাক্সা-বাক্সা হয় তবেই না আবার বাড়িতে ঢোল সানাই বাজবে। কিন্তু সে তো অনেক

পরের কথা। তদ্দিন কে থাকবে কে থাকবে না তা ঠাকুরই জানেন। ঐ তো পাবতী এক ফোঁটা মেয়ে। ময়নাকে তো দুখেয় শিশু বললেই হয়। ওদের আবার ছেলে মেয়ে, তাদের আবার বিয়ে থা...না না, যা হয় এখনি হোক। নিশির বাপ তো আর বে-হিসেবী মানুষ নয়। কোমরের জোর বুকেই চরস্বদ্ধ লোককে মিঠাই খাওয়াতে চেয়েছে।...পার্বতীব নাচতে ইচ্ছে করে। দয়াল হরি আবার তাহলে মুখ তুলে তাকালেন! আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই তো আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভবে যাবে। প্রত্যেকের পাত জুড়ে পবিবেশিত হবে স্নগন্ধি গাওয়া পিয়ের গবম গবম লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা। বেগুন আর ডাল নিজেদের ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু গোটা কয়েক ফুলকপি আর মশলাপাতি গঞ্জ থেকে নগদ পয়সায় আনতে হবে। ছাঁ, ফুলকপি চাই-ই। ফুলকপি কি জিনিস তা এ তল্লাটের কেউ কোনদিন চেখেও দেখেনি। কি করে রাখতে হয় তাও কেউ জানে না। এই জিনিসই সকলকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। বাপের বাড়ির দেশে সেইদিন বিয়েতে সর্বপ্রথম খেয়েছে ও এই স্বস্বাদু তরকারি। কি চমৎকার রান্না! গঞ্জের অমূল্যঠাকুর তো শুনি ভাল রান্না জানে। তাকে দিয়েই যত্ন করে রাখতে হবে। মাছ দিয়ে কাজ নেই। মাছের বদলে ফুলকপিই হোক। শীতের নতুন তরকারি চরের মানুষ খেয়ে তারিফই করবে। তবে মিষ্টিই যদি খাওয়াবে বলে স্থির করে থাকে নিশির বাপ—তাহলে শুধু অমৃতি নয়। ছানার মিষ্টি এক পদ করতেই হবে। কলাইর ডাল আর চাল বাটার মিঠাই আবার একটা মিঠাই নাকি? কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে কখনো শুধু এ মিঠাই খাওয়াবে না। মানুষ তো আর দশ দিন ওদের বাড়িতে খেতে আসছে না! একদিন খাবে ভাল করেই থাক।...ভাবতে ভাবতে ডুবে যায় কুসুম স্বপ্ন-মায়ার।

বাটা ভর্তি পান হুপুরি পেয়ে আবার সরগরম হয়ে ওটে আসর। যাদের সম্পর্কে আটকায় না তাদের কেউ কেউ নিশিকে নিয়ে ঠাট্টামাসা আরম্ভ করে। কেউ কেউ কুসুমের স্বগৃহিণীপনার তারিফেও পঞ্চমুখ হয়। মদন দীহুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, কি তালই, আইজু খেইকাই জুলাপ নিম্ন নাকি?

দীহু মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। নিশি পানের বাটা রেখে পালায়। রাত এগারোটা নাগাদ আসর ভাঙে। পাকা ফলার খাওয়ার আনন্দ বৃক করে পড়শীদের সকলেই গদগদ হয়ে বাড়ি ফেরে। একরাঙের মধ্যেই সমস্ত চরময়

খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায়। স্বামী পুত্রকে রাত্রের ভাত বেড়ে দিতে দিতে সবিস্ময়েই ভাবতে থাকে গিন্নী-বান্নিরা, পাকা ফলার খাওয়ানো কি সহজ কথা! মুঠো ভর্তি টাকা চাই! বৈরাগীর না জানি কত টাকা হয়েছে! ...বিস্ময়ে আনন্দে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু ঘুমোতে পারে না একজন। সে ক্ষ্যান্তমণি। খিটখিটে মেজাজ ক্ষ্যান্তর। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, বালবিধবা। শুচিবাই। হাতে পায়ে থক থক করছে পাকুই হাজা। জলে নামলে উঠবার নাম নেই। চোষটিবাব ডুব দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় নিশি কোমরে গামছা বেধে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। স্নানার্থি অনেকের গায়েই তাতে জলের ছিটা যায়! বিরক্ত হলেও মুখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু ক্ষ্যান্ত গর্জে ওঠে, মর মর মুখপোড়া। যম তরে চোখে দেখে নারে? মর মুখ পোড়া, মর... নিশির মাথাটা পারে তো চিবিয়ে খায়।

ভরা কলসী কাঁকালে করে কুসুমও সে সময় জল থেকে উঠে আসছিল। ক্ষ্যান্তর গালাগালে থমকে দাঁড়ায়। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের প্রাণ টনটনিয়ে ওঠে। কলসীর জল ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিশির দু'গালে দুই ঠোঁকনা বসিয়ে দেয়। অগ্র সকলে এসে না ধরলে হয়তো জলে চুবিয়েই ও মেরে ফেলতো নিশিকে। কেন ও যার তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়? রাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলে কুসুম। ক্ষ্যান্তর মুখে অনর্গল ভুবড়ী ছুটে থাকে। কুসুমের সাধ্য নেই ওর সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে ওঠে। অগ্র দশজনেই যার যা মুখে আসে ক্ষ্যান্তর গালাগালের প্রত্যুত্তর দেয়। সেই থেকেই ক্ষ্যান্তর সঙ্গে কুসুমের কথা বন্ধ।

বন্ধ তো বন্ধ। ক্ষ্যান্ত কাকেও তোয়াক্কা করে না। বৈরাগী বউয়ের মতো অমন ঢের বড় মাহুর ওর দেখা আছে। ও কারো বাড়ি হাত পাততে যাবে না...

ছ'মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি একটি দিনের জন্মও বৈরাগী বাড়ি-মুখো হয়নি ক্ষ্যান্ত। ছাটে পথে কুসুমের চোখে চোখেও কোনদিন চায় নি। কিন্তু আজ যে বড় বিপদ! আর ক'টা দিন পরেই তো পাকা ফলারের ধুম লাগবে বৈরাগী বাড়িতে। চরের সকলেরই নিমজ্ঞণ হবে। একা শুধু ও-ই যা বাদ যাবে। হায়রে কপাল! ঝগড়া কি কখনো পড়লীতে পড়লীতে হয় না! রাগের মাথায় না হয় ছুটে কথা অগ্রায়ই বলেছি, তাই বলে কি তার কোন ক্ষমা নেই! মাথার ওপর চন্দ্র স্থখ আছে। তারাই এর বিচার করবে। এত দেখাক

ভাল নয়।...কথাটা কানে যাবার পর থেকে সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে ক্যাস্ত।

পরের দিম কুসুম জলের কলসী কাঁখে করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ক্যাস্ত তাঁর কোলে দাঁত মাজতে মাজতে এসে হাজির হয়। বাব বার তাকাতে থাকে তলচোখে। দেখে দেখে হেসেই ফেলে কুসুম। সাহস পেয়ে ক্যাস্তই প্রথম মূগ খোলে, কিগ বইন, তোমার ছোট পোলার বলে বিয়া ?

কুসুমও ঝগড়াব কথা ভুলে যায়। সোংসাংই উত্তর করে, হ দাদী, খাইয় কইলাম ? তোমরা পাঁচজন না দেখলে আমাবে আর কেয়া দেখব ?

ছাত্তে কি কয় ! আমাগ পাড়ার কাম আমবা না দেখলে কেয়া দেখব ? গালোমোন্দ কিছু অইলে পাড়াব দুমাম অইন বা!—একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করে, তা নিশাবে কয়ান্দন দেতি না ক্যান ? গাছ ভইব হরিমাম পাইকা বইচে। আইজ বিকালে পাঠাইয়া দিয় অবৈ।

কুসুম গদগদ হয়েই বাবা দেয়, না দাদী, অরে আব তোমবা আস্কারা দিয় না। তোমার গাছেব ডালপালা ভাইকা কিছু রাখব না। বড় দুই ডা।

তাই কি, পোলাপানে ভট্টমী করব নাত কি করব ? তুমি অবৈ বিকালে পাঠাইয়া দিয়।

আইচ্ছা, হাসতে হাসতেই কুসুম অগ্রসর হতে যায়।

ক্যাস্ত বাধা দেয়, পাকা ফলার নাকি দিবা ?

তাইত ইচ্ছা আছে। এহন ঠাকুর জানে কি অইব। কামের কয়দিন কইলাম বাড়িতে রানবার পারবা না।—আমাগ ঐহানেই খাইয়া লইয়া কাম কুলাইয়া দেওয়ন লাগব।

আইচ্ছা আইচ্ছা, আমারে আবার নিমন্তন করবার কি আছে ? আমি ত গরর (ঘরের) মাহুবই।

না, ড-কতা কইলে ছাড়ুদ না। বিয়ার দিন হকালেই খাইবা। এহন আহি। নিশার বাপ আবার গঞ্জ খাইব। জিনিসপত্রের জায় দেওয়ন লাগব।

হ, যাও। যগিয়া কাম, মুকের কতা নয়। শরীল বালো থাকলে নিচ্চয় যামু।

শরীল বালো-মোন্দ বুজি না। যাওয়ন তোমারে লাগবই, ভিজে কাপড়ে মপসপ করতে করতে কলসী কাঁখে বাড়ি ফেরে কুসুম।

ক্ষান্তর ঘাড় থেকেও একটা দৃষ্টিস্তার বোকা নেমে যায়। বাব্বা, কাল থেকে কি ভাবনাই না চলেছে! ঠাকুরের দয়ায় এখন পেটটা দুটো দিন ভাল থাকলে বাঁচি। সেই ছোটবেলায় একবার পাকা ফলার খেয়েছি আর এই বৃদ্ধো বয়সে আর একবার সুযোগ আসছে...ক্ষান্ত রটপট গিয়ে জলে নামে।

॥ ১২ ॥

সাতই অত্নান নিশির বিয়ের দিন। চোঁঠা অত্নান গোপীনাথের আখড়ায় ভোগের ব্যবস্থা হয়। আধমণ চালের অন্ন-ভোগ। কেবল মাত্র সাধু সন্তদের নিমন্ত্রণ করা হবে। পঞ্চাশজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব প্রসাদ পাবেন। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তিনিয়া, অখণ্ড সাধু গাইবেন ভোগ-আরতি। মধু মণ্ডলও সদলবলে উপস্থিত থাকবে। সামান্য এই ব্যাপারে স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম কাকেও বলা হবে না। তারা সকলে পাকা ফলার খাবে বৌভাতেব দিন। শুভকাজের আগে বৈষ্ণব-সেবা বৈরাগী বংশের রীতি। অশ্বিনী বিয়েতে তো কেবল মাত্র নিয়ম রক্ষা হয়েছে। মাত্র পাঁচজন বৈষ্ণবকে সিধে দেওয়া হয়েছিল। সে তো গেছে এক চরম দুর্দিন। সখ আহ্লাদ তো দূরের কথা ভাল করে খাওয়া থাকার ঠিক ঠিকানাই ছিল না। আজ মা লক্ষ্মী কিছুটা মুখ তুলে চেয়েছেন। তাছাড়া এই তো শেষ কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনের সকল সাধ এবারেই মেটাতে হবে। ফুলগুরুকেও বিয়েতে উপস্থিত থাকার দ্রষ্ট নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। ককির বাড়িতেও আসর বসছে আসছে পূর্ণিমার দিন। তার ঝাড় ফুঁকেই তো নিশি বেঁচে উঠেছে। দয়াল চানের দয়াল এখন বেশ সবল সুস্থই আছে। কে ভেবেছিল নিশি বাঁচবে তার আবার হবে বিয়ে? রোগ বালাই তো জন্ম থেকেই লেগে থাকতো। সাতটি কড়ির বিনিময়ে ককিরের কাছে বাঁধা আছে নিশি। ককিরেরই ছেলে নিশি। যদি তার দয়াল রক্ষা হয়; তিন বছরের রোগা ছেলে কোলে করে ককিরের আসনের সামনে এসে ব.স কুম্ভম। দু'চোখ দিয়ে টস টস করে জল ঝরে পড়ছে। ডাক্তার কবরেজ সাফ জবাব দিয়েছে, আশা নেই। হাড় জির জির করছে সারা অঙ্গে। মায়ের প্রাণ দৃষ্টে দৃষ্টে মরছে। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটাকে তো ষমকে দিয়েছে; তবে কি নিশিও বাঁচবে না?...না বাঁচারই কথা ছিল। কিন্তু করিমের হাতে পড়ে সে-যাত্রা বেঁচে যায় নিশি। শুধু বেঁচেই যায় না, দেহও পুষ্ট

হতে থাকে। সেই থেকেই তো ফকিরের কাছে বাঁধা আছে। করিম বলে, দয়াল চানেরই ছেলে। দশ বছর পার হলে ফল-মিষ্টি দিয়ে ওজন দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ দশ বছর ভীষণ ফাঁড়া আছে।

দশ পার হয়ে বারোও পার হতে চলে। কুহুম ছাড়াবার কথা মুখেও আনে না। থাক না ফকিরের কাছে বাঁধা—তবু তো ছেলে ওর বেঁচে আছে। মায়ের বুক ঠাণ্ডা আছে!

বিয়ের আগে করিমই প্রস্তাব করে ছাড়িয়ে নিতে। আর কোন ভয় নেই। এখন চুল কাটতেও আপত্তি নেই। এ ক'বছর তো মাথায় ক্ষুর কাঁচি ছোয়ানোও নিষেধ ছিল। নিশির বিয়ে তো করিমের নিজের ছেলেরই বিয়ে। স্তবরাং স্তবকাজের আগে দয়াল চানের আসব তো বসবেই। সমস্ত রাজি গান হবে, একুশ মোমবাতি জ্বলবে, নানা উপকরণে হবে শিন্নী নিবেদন। তারপর ফল-মিষ্টি একদিকে আর একদিকে নিশিকে বসিয়ে ওজন দিতে হবে। আশ-পাশেব আরো দশ বিশজন গুণীকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। সকলে মিলে এক সঙ্গে দয়াল চানরে ডাকবে। নিশির বিয়ে ধুমধামের সঙ্গেই হবে। আতসবাজারি কোয়ারা ছুটবে। হাউই-এব রড়ে আকাশে ফুটেবে লক্ষ তারার কুহুম। সারা বাড়ি সারা চর বলমল করবে বংশালের রোশনাইতে। শুধু ঢোল সানাই-ই বাজবে না। ইংরেজী ব্যাণ্ডও বাজবে। পলান ব্যাপারী তার পোলার সাদীতে যে ব্যাণ্ড আনিয়েছিল তাই আসবে। ...আহ্লাদে ডগমগ করিম। মনের কথা একদিন দীহুকে খলেই বলে।

সখ দীহুরও হয়। কিন্তু কোথায় পলান ব্যাপারী—আর কোথায় দীহু বৈরাগী! কিসে আর কিসে। পলান ব্যাপারীর সঙ্গে কি আর ওর তুলনা হয়? উজ্জ্বাস চেপেই দীহু বলে, কি যান্ কও ফকিরের পো? ব্যাপারী সাবের লগে কি আর আমরা পাইরা উরুম?

দীহুর উত্তরে করিমের টনক নড়ে। সে ঠিকই। চরধন্নার সমস্ত লোক অতিথিসহ তিনদিন সমানে ব্যাপারী সাহেবের বাড়িতে খেয়েছে। চরফুট-নগরের সকলেও স্ত্রী পুরুষ অতিথি অভ্যাগতসহ একদিন খেয়েছে। ষাণ্ডরা নয়তো যেন পেটে জ্বালা বাঁধা। মাছ, মাংস, মিষ্টির বিপুল আয়োজন। মিতা দীহু আর কি করে পারবে তার সঙ্গে পান্না দিতে। রূপোর গহনা ক'খানাই না হয় আমি দিয়েছি কিন্তু সোনার তিন পদ্ম তো ব্যাপারী সাহেবই দিয়েছেন মেহেরাকে। গলার বিহুট হারছড়া পাচ ভরির কম হবে না।

অশ্বিনতি পয়সার মালিক ব্যাপারী সাহেব। তাব সন্ধে কি আর আমাদের চরের মাছুষের তুলনা হয়? ...গলার স্বরটা একটু খাদে নামিয়েই কবিম উত্তর করে, না পারি না পারুম। তাই বইলা সক আলাদ ককম না নাকি বাপজানব সাদীতে ?

হ, করবা। তবে ঢোল সানাই দিয়াই সাবন লাগব।

ইস, কি যান কও তুমি। ইংরাজী বাজনা তোমাব আননই লাগব !

খালি বাজনাই হনবা, খাইবা না কিছ ?

খামু না ক্যান ? পাকা ফলাবেব জায় না তুমি ধইবাই থুইচ ?

পাকা ফলারও খাইবা আবার ইংবাজী বাজনাও হনবা ?

হ, তাই খামু—তাই হুমুম।

তাইলে তোমার ধরে সিঁদ কাটন লাগব।

পাইবা এই কলাডা, ডান হাতের বুডো আঙুলটা উঁচু করে দেখায় কবিম।

কথা আর উভয়েব মধো এগোয় না। যাকে নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল সেই পলান ব্যাপারীই আজ একটু সকাল সকাল এসে হাজিব হয়। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাবেলা আসে পলান। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাণেব আবেগে দয়াল চানরে ডাকে। পায়ের বেদনাটা এখন ঢের কম। অমাবস্তা পূর্ণিমায় একটু চাগাড় দেয় বটে। তবে করিম বলেছে, আসছে ধামাল উৎসবে বিশেষ ক্রিয়া করবে। আশা করা যায় সম্পূর্ণই সেরে যাবে। যদি যায় তো ভালই। না গেলেও ক্ষতি নেই। চলাফেরা এখন একরকম কবে করা যাচ্ছে। উঠোনে পা দিয়ে করিমকে বুড়ে। আঙুল উঁচাতে দেখে হাসতে হাসতেই রসিকতা করে পলান, ভর সাইন্ড্যা বেলাই (সন্ধ্যা বেলা) যে কলা দেহাইলেন-বরাতে আইজ কলাই আছে নাকি ?

তোবা—তোবা—কি যান কনু! আপনারে কলা দেহামু ক্যান? কলা দেহাইলাম এই ইনিরে, দীমুকে দেখিয়ে উত্তর করে করিম।

মোড়ালর পো'রে কলা দেহাইলেন।

না দেহাইয়া আর ককুম কি। উনি যে ধরে সিঁদ দিবার চায়! ধরে ত ওডা ছাড়া আর কিছু নাই।

সিঁদ দিব!

হ, সিঁদ দিব। নাইলে নাকি পোলা বিয়ার পাকা ফলারের ধরচ ছুটব না।

তোবা—তোবা! দীঘ্ন মোড়ল পোলার সাদীতে পাকা ফলার দিব তা একবার কান্, দশবার দশ গায়ের নোকরে দিবার পারে। সিঁদ দিবার যাইব কোন ছুখো ?

হেই কতাডাই কন ওনারে। উনিত এহন খেইকাই ওল্লার গোয়ার থনে (পিপড়ের পাছা থেকে) গুড় টিপবার নৈচে, পলানের কথার জবাব দিয়ে মূছ মূছ হাসতে থাকে করিম।

ব্যাপারী সাব ত নিজের মতনই হগলেরে ভাবেন! বলি একবারের ঠেলাতেই ত পাছা দিয়া ধুমা বাইরইব তার আবার দশবার, করিমকে ডিঙিয়ে দিল্ল উত্তর করে।

পলান হাসতে হাসতেই বাবা দেয়, আরে যান্! কি যান্ কন্! আল্লার মজিতে ক্ষ্যাতের লক্ষ্মীত দিন দিনই ফাইপা উঠচে আপনার ঘরে। মুটে দশ টেকা লাগব। দিমুনে ইলাহিরে কইয়া। তিন দিন ভইরা মাং কইরা রাখবেন চররে। বড় বালো (ভাল) বাজায় ইলাহির দল।

দ-শ টে-কা! বিশ্বয় ঝরে পড়ে দীঘ্নর কণ্ঠে।

হ, দশ টেকা। এমুন কিচ বেশী না। দশজন নোক তিন দিন ধইরা সমানে বাজাইব।

আমি কই, আপনে ঠিক কইরা ফালান। বৈরাগীর পো'র ত সবটাতেই দোন্দর দোন্দর (দ্বিধা) করন চাই; কবিম জোরের সঙ্গেই সায় দেয়।

পলান বলে, হ হ বৈরাগীর পো, টেকা পয়সা জমাইবেন কার লেইগা? লগে কইরা আছেনও নাই লগে কইরা যাইবেনও না। দয়াল চান বা ছান দশজনের লইয়া ছুতি কইরা খান।

ধন দৌলতের ভাবনা দীঘ্নও বেশী ভাবে না। তবে হিসেবের বাইরে খরচ করতে ভয় হয় ওর। কারো কাছে হাত পাততেও লজ্জা বোধ করে। সংসারের খরচা তো দিন দিনই বাড়ছে। মাত্র তো ঐ বিধা কয়েক জমি। জমানো তো দূরের কথা সব দিক বজায় রাখাই দুঃসাপ্য। কিন্তু সকলেই যখন বলছে তখন হোক ইংরেজী বাজনা। নিশির মা'ও খুশী হবে'খন। ছোট পোলার বিয়েতে তো কি করবে ঠিকই করতে পারছে না বেচার। যাই কেন হোক না, বিয়েতে ব্যাও পাটি না হলে জমেই না।...ভাবনা রেখে প্রকাশেই সায় দেয় দীঘ্ন, তবে তাই ঠিক কইরা ফালান। আপনাগ দশজনের কথাত আর ফেলবার পারি না ঠেকলে আপনাগই চালাইবার লাগব।

পান বল, আরে চালাইবাব যে মালিক হে-ই চালাইব। আমরা কেরা ?
আহেন, এহন দয়াল চানরে একডু ডাকি। ককির সাব, একতারাডা লন।

একতাড়া আসে—সঙ্গে পান স্থপুৰি। তিনজনে মৌজ করে পান তামাক
খেয়ে শ্রাণ খুলে গাইতে থাকে :

(৩ মন) আছে আপন ধবে-বে তোমাব

আছে আপন ধবে।

জ্ঞানেব একটা বাতি জালিয়ে

তালাস কইরে দেখলি নাবে ॥

ছয় কানাতে ছয় জন চোবা

পেইতে আছে বিষম মোড়া

ফাঁকে জুখে পাইলে পবে

ঠাইসা বুৰি ধবে-বে তবে ॥

॥ ১৩ ॥

আজ বহু প্রত্যাশিত সাতই অস্থান। গতকাল ভোর থেকেই দীঘুর
বাড়িতে পলে পলে ব্যাণ্ড বাজছে। সমস্ত চরফুটনগরই যেন তালে তালে
নাচছে। দীঘুর বাড়িতে আজ ষাওয়া-দাওয়াব ধুম নেই। কেবল বিয়েব
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াটুকুই সম্পন্ন হবে। আর যারা বরযাত্রী যাবে তাদের
সময় মতো ডাক খোঁজ করা। আজকের যত ঝঙ্কি ঝামেলা মধুর বাড়িতে।
মঙ্গল উষায় ময়নার গায়ে-হলুদ হয়েছে। পুরনারীরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে
গান করেছে। ঘাটে গিয়ে জল-ভবা, বরণ ডালা সাজানো, ময়নার মুখে ক্ষীর
চিনি দেয়া—সবই একে একে করে চলেছে এয়োতির।

শেষ রাত থেকে মণ্ডল বাড়িতে শুরু হয়েছে নহবত। মধু নাম-করা
কার্তনিনা। সীলা কীর্তন কবে করে কাব্য-রসে রসিক। চারুকলায় কোথায়
কি প্রয়োজন সে রসবোধ ওর আছে। বিয়েতে নহবত ওর মনের মতো বাজনা।
পলে পলে রাগ রাগিনীর সমতা রেখে বাজবে সানাই—কাড়া নাকাড়া। এর
চেয়ে সুসঙ্গত বাজনা আর কি হতে পারে? দীঘু ইংরেজী ব্যাণ্ড করেছে
ককক—ও কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িতে বাজবে শুধু ঢোল,
সানাই আর কঁাসর। এ শুধু অবস্থার কথা নয়। ঋচির কথা। অবশ্য দীঘুর

মতো ও-ও যদি পাঁচজনের পাতে রসগোল্লা দিতে পারতো তা হলে খুশীই হতো। মিষ্টি বলতে তো ছানার মিষ্টিই বোঝায়। অমৃতি, বৃদে, আবার একটা মিষ্টি হলো নাকি? কিন্তু কি করা যাবে? হাতে আর একটিও বাড়তি টাকা নেই। টায় টায় কর্দ করা হয়েছে। লুচি, অমৃতি, আর রসকরা। বৃদে ওর দু'চক্ষের ব্যব। বাঙ্গালীর খাবাবই নয় ও। টেনেটেনে রসগোল্লা অবশি হয়ে যেতো। কিন্তু বরযাত্রীকে পাকা কলার খাইয়ে তো আর ময়নাকে বালি গায়ে শস্তর বাড়ি পাঠানো যাবে না। বৈরাগী না হয় তার নিজের উপরতা দেখিয়েছে। একটা কড়িও ষোঁতুক চায়নি। কিন্তু তাই বলে বিয়েব কনেকে কিছু না দিয়ে পারা যায় কি করে? পাঁচজনেই বা বলবে কি? অশপচাৎ ভেবেই মধু তালিকা থেকে রসগোল্লা বাদ দিয়েছে।

দক্ষিণ ভিটার বড় ঘরখানায় বসেছে ভিয়েন। তিন মণ ময়নার লুচি ভাজা হবে। অমৃতি মন দেড়েক। এছাড়া—রসকরা, ডাল, ডালনা, বেগুন ভাজা। কান্দনীর ঘোষের চন্দনচূর দইও প্রচুর পরিমাণে সকলকে দেয়া হবে। চরের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে দীঘুর মতো চরধারার সকলকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বেছে বেছে মাত্র কয়েক ঘরকে। পলান ব্যাপারী আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা তো এমনিতেই বরযাত্রী হয়ে আসছে। তবু নিজের তবক থেকে নিমন্ত্রণ করে মুখ রক্ষা করা। নয় তো ব্যাপারী সাহেব কি মনে করবেন। ..

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। অম্বানের বেলা খুবই ছোট। তড়িৎস্বপ্নে সখ গুছিয়ে গিয়েও সময়ের সঙ্গে পারা যায় না। কিন্তু দীঘুর বৈরাগী যে রকম খুঁতখুঁতে মানুষ তাতে পাঞ্জি-পুথি ঠিক রেখে কাজ করতে না পারলে রগড়াই বাঁধবে। মধুর দম নেবার ফুরসত নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা অবশ্য যথেষ্টই সাহায্য করছে। কিন্তু সেতো শুধু হাঁটা খাটার ব্যাপারে। একটা বিয়েতে আনুষ্ঠানিক রামেলাই কি কম? সে সব তো ওর নিজেরই করতে হচ্ছে। বিকেল চারটে না বাজতেই কনে সাজাতে তাড়া দেয় মধু। চমৎকার মানিয়েছে ময়নাকে লাল টুকটুকে চেলী খানায়। চন্দন কাজলে চললে মুখখানা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তবু তো সারাদিন উপোস যাচ্ছে। সারা দিনে খেয়েছে মাত্র একবাটি দই আর থই। যে মানুষ দিনে অস্ততঃ সাত আটবার খায় তার পক্ষে এ কম কথা নয়। কিন্তু ময়না

আজ লক্ষী মেয়ে । এতটুকুও গোলমাল করছে না । নতুন গয়নাগুলো শরীরের সঙ্গে লেপটে ধরেছে । যেন পটে আঁকা ছবি ।

বিকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই বরযাত্রীদের মধ্যে সাজসাজ রব ওঠে । ব্যাঙ বাজতে থাকে তালে তালে । চরধল্লা থেকে পলান ব্যাপারী আর কাশেম আসে । মেহেবা সকালেই এসেছে । নিশির বিয়ে তো ওর ছোট ভাইয়েবই বিয়ে । বউমার হাতে পলান একখানা আলপাকার শাড়ী পাঠিয়েছে । নতুন কুটুমিতা—আলপাকার না দিলে ইজ্জৎ থাকে না । গঞ্জের হাট থেকে সাত টাকা বাবো আনা দিয়ে এনেছে এ শাড়ী । চামীর ঘরে এত দামের শাড়ী দেখে হয়তো অবাকই হবে অনেকে । তা হোক । সামান্য এটুকু না দিলে ইষ্টতা থাকে কি করে ? কুটুমের কুটুম দীহু বৈবাগী । শুধু শাড়ী নয়, শাড়ীর সঙ্গে এক ঠাঁড়ি মিঠাইও পাঠায় পলান ।

ধরতে গেলে কাশেম তো দীহুব জামাই-ই । নিশির চেয়ে বছর তিনেকের বড় । শালাব বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছে ও, হুতরাং কোনরকম খুঁত থাকলে চলবে না । একে চব্বদল্লার আতুরে গোপাল, তাতে আবার হালে সাদী হয়েছে । সাজগোজের বাহাব কাশেমেরই বেশী । বউদার বিলেতী অর্গেত্তীর পাঞ্জাবীর নীচে জাপানী সিন্ধের জালি গোলাপী গেল্লী । পরনে কালো ইঞ্চি পাড়ের সিমলাই কোরা ধুতি । পায়ে ডারবি হু । চিকন করে চুল ছাটা । ভুরভুব করছে লেবুব তেলের খশবু । বুক পকেটে লাল সিন্ধের কমালখানা কিঞ্চিং মস্তকের দিকে উডডীন । ঠিকবে বেকচ্ছে অগুরুর উগ্রগন্ধ । এক শিশি অগুরু গঞ্জ থেকে আনিয়েছিল কাশেম । অধেক কমালে ঢেলেছে । বাকীটুকু খবচ হয়েছে বরযাত্রীদের আব দশজনকে বিলোতে । পলানও কয়েক ফোঁটা দাড়িতে বুলিয়ে নিয়েছে । বিয়েতে একটু রং মশলা খরচ না হলে আবার বিয়ে কি ? মজাদাব গন্ধই অগুরুতে । নিজের দাড়ির হুবাসে নিজেই মাতোয়ারা । কাশেমের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে করিম আর দীহুর গালেও কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে দেয় পলান । খশীর বান ডাকে চোখে মুখে । করিমকেই মানিয়েছে ভাল । সাদা লুঙ্গি, সাদা আলখাল্লা, মাথায় বেতের টুপি । পলান পরেছে সবুজ লুঙ্গি আর সাদা ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী । দীহু তার বরাবরের বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছে । হাক হাতা বুক কাটা নিমার ওপর ঢাকাই সাদা চামরখানা কাঁধের ওপর খোপানে ।

ব্যাঙ এবার আরো জোরালো সুরে বাজতে থাকে । মদন, আনন্দ, রহিম,

ইলাহি বরষাত্রীদের প্রায় সকলেই এসে জড় হয়। আজ আর বৈরাগী বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পাট নেই! শুধু পান, বিড়ি, তামাক। ডান হাতের ব্যাপার আজ মধুর বাড়িতে। মদনের আর তর সয় না। সকলের চেয়ে সে-ই বেশী উৎসাহী বরষাত্রী। পেট নয় তো যেন একখানা খুদে জালা। আলু থেকে গরু আনতে গিয়ে মঙল বাড়িতে রান্নার খশবু শুঁকে এসেছে। গরম গরম গাওয়া ঘিয়ের লুচি—সঙ্গে ডাল ডালনা দই মিষ্টি।...ন, আর কত দেরি করবে এরা! গিদেয় যে পেট জলছে...

সকলের সঙ্গে বসে হুকো খাচ্ছিল দীহু, মদন কাছে এসে তাড়া দেয়, কৈগ কাকা, তেমরা আর কত দেরি করবা? বেলা না গেল, ইআর পর গিয়া কি খাব লগন পাইবা?

দীহু হুকো খেতে খেতেই বলে, তা বাপ, তর কাহীরে (কাকীমাকে) একটু তাড়া দেত। শিগগীর নিশারে বাইর কইরা দেউক।

দীহুর সমখন পেয়ে মদন তক্ষুনি ভেতর বাড়িতে ছোট্টে। আর বেশী দেরি হয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিশি এসে পালকিতে ওঠে।

চমৎকার মানিয়েছে নিশিকে। হলুদ মাখানো লালপাড় ধুতি পারনে। গলায় নতুন কাঠের মালা। গায়ে বন্দাবনী ছাপার রেশমী চাদর। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশি, ছুরি ও কচি কলার-মাজ। চন্দন চর্চিত ললাট-কপোল। শাদা সোলার টোপের মাথায়। মুখখানা হাসি হাসি।

এয়োতিদের বরণ হয়ে যায়! কহুম আসে মাতৃধারা দিতে। ডান হাতের তালুতে দুধ রেখে কহুই চুইয়ে তা নিশির মুখে দেয়। একে একে তিন বার। ভাবখানা, আমি তোমাকে মাতৃধারা দিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার সেবার জন্ম দাসী আনতে যাচ্ছ।...চিরাচরিত প্রথায় প্রতিজ্ঞা করে নিশি। কুহুম প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে ওকে। নিশি এসে ওঠে পালকিতে। ব্যাও এবার আরো জ্বেরে বাজতে থাকে। তালে তালে চলে শোভাযাত্রা। চ্যাংড়া বরষাত্রীরা সব আগে আগে—মাঝখানে পালকি। সর্বশেষ অভিভাবকেরা। কুহুমের ভাইপোদের হাতে রংমশাল। মাতুল পুলিন আর মদন ছাড়া ছে তুবড়ী। হাউইয়ের ভার কাশেমের ওপর। খুব সতর্ক হয়েই একটার পর একটা ছেড়ে চলেছে কাশেম। আকাশে লক্ষ তারার দীপালি।...

বিয়ে গোধুলি লগ্নে। কিন্তু সমস্ত চর ঘুরে, শোভাযাত্রা মঙল বাড়িতে পৌঁছতে এক প্রহর রাত হয়ে যায়। পরের লগ্ন সেই রাত তিনটেয়। বর-

কনের খুব কষ্ট হবে। তা আর করা কি? পাঁচজনকে নিয়েই কাজ। কাউকে কিছু বলা যাবে না। এখন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।...

২. বরষাত্তীরা পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলবাড়ি উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেখানকার ক্যাণ্ডপাটিও সমানে পাল্লা দিয়ে বাজতে থাকে। সকাল থেকে শুধু ঢোল, কুম্ভার, নহবত-ই বাজছিল। এবার শুরু হয়েছে ব্যাণ্ড।

নিশিকে পালকি থেকে বরণ করে তুলে নিয়ে যায় এয়োতিবা প্রতীক্ষাগৃহে। ততক্ষণে বরষাত্তীরা না হলে ততক্ষণ বব-কনের চোখোচোখি হতে নেই। বাসরঘরে একা শুধু ময়নাই আছে। ওর খেলার সাথীরা সারাদিন থিরে ছিল ওকে। এবার বরকে পেয়ে সকলে এসে জড় হয় প্রতীক্ষাগৃহে। এ-কথায় সে-কথায় চলে হাসি-তামাসা। নিশিকে বাঁশী বাজাবার জ্ঞান কেউ কেউ আন্দার কবে। কিন্তু নিশির মুখে সাড়াশব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে একটুখানি মিষ্টি হাসি খেলে যাচ্ছে ওর নিম্ন ওঠে। ঠাকুরমা দিদিমা সম্পর্কের বর্ষীয়সীরা ফোঁড়ন দেয়, তরা কচ্ কিলো ছুঁড়ীরা। নিশি তগ বাঁশী হনাইব। তরা কি অর রাদা (রাধা)?

রাদা না আইলে বুকি আর বাঁশী হনা (শোন) যায় মা ঠাকুরমা? বিশ্বাস বাড়ির তুলসী মূচকি হেসে আড় নয়নে বাধা দেয়।

অল ছুঁড়ী—না। বাঁশী যদি হনবার চাস তয় কদমতলায় যাইচ্—যমুনায়। কিগ নাগর, তাই না? তুলসীর কথার জবাব দিয়ে নিশিকে প্রশ্ন করে ঠাকুরমা।

নিশি হেসে হেসেই স্বকীয়তা রক্ষা কবে।

তর তর করছে মণ্ডলবাড়ির মেটে উঠোন। উপরে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চার কোণে জ্বলে চাবটে গ্যাসের আলো। বরষাত্তীরা দাওয়ার ওপর বসে পান গ্রামাক নিয়ে বাত। কলার পাতা আর মাটির গ্রাস দিয়ে সারবন্দী জালগা করা হয়েছে। স্বজাতি সকলে এক বৈঠকেই বসে। করিম, পলান, কাশেম, রহিম প্রভৃতি মুসলমান অখিত্রিরা বসে পৃথক বৈঠকে। ককিরের আসরে একত্র পান ভোজনে কারো কোন আপত্তি না থাকলেও সামাজিক ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেখানে সকলে গুরুবাদী। সে গুরু হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক সকলেই তার মন্ত্রশিষ্য। কোনরকম

ভেদভেদ নাই তাদের মধ্যে। গুরুর আচার আচরণই সর্ব্বলের আচার আচরণ। কিন্তু যেখানে সামাজিক ব্যাপার সেখানে ধর্মীয় রীতি না মেনে উপায় নাই। বিশ্বাস পাড়ার মোড়ল গোষ্ঠী বিশ্বাস একসময় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শুধু দীন্তর সমর্থন না থাকতেই আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু গোষ্ঠীর কোন সমর্থক ছিল না একথা বলা যায় না। ফকিরের যে যত বড় ভক্তই কেন হোক না সামাজিক ব্যাপার কেউ কাবো গণ্ডী ভাঙতে বাজী নয়। অন্ততঃ এখনো সে ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়ে এ বাস্তব উপলব্ধি দীর্ঘব হয়েছে। স্তত্রাং ৩৩ চায় না নিজের মতবাদ কারো ওপর জোর কবে চাপিয়ে দেয়। তাতে আর যা-ই হোক বিভেদ দূর হবে না। বিভেদের বীজ অন্ব থেকেই মুছে ফেলতে হবে। এবং তা সম্ভবপর হবে পরম্পরের মেলামেশায়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যার যার সামাজিক রীতি মেনে চলাই স্থির হয়। গোষ্ঠী আর মাথা তুলতে পারে না। কাশেমের বিয়েতে পলানও তার হিন্দু অতিথিদের অন্ন পৃথক বন্দোবস্ত কবেছিল। তাতে পীত্বির সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে। মধুও সেই রাস্তাই বেছে। পলানেব চেয়ে মধুর ঝামেলা আরো কম। পলান খাইয়েছে মাছ, মাংস। মধু খাওয়াচ্ছে লুচি, মিষ্টি। কে কবে এ নিদান জাহির কবেছে জানা যায় না। ঘৃতপঙ্ক দ্রব্যে নাকি কোন দোষ নেই। বিশেষ করে লুচি মিষ্টিতে। স্তত্রাং বৈঠকই শুধু আলাদা—পরিবেশনকারী এক এবং অভিন্ন। উঠোনে শামিয়ানার নীচে বসে থাকে স্বজাতির। আর দক্ষিণ ভিটের বারান্দায় বসে থাকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অতিথি-বন্ধুর। পরম্পব দেখছে পরম্পরের মুখ, তবু আছে ব্যবধান। এ যেন একই নদীর দুই তীর। প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা রয়েছে ঋবার প্রত্যেকেই একান্ত।

লুচি ভেজে কল পাচ্ছে না ছ'জন ময়রা। গরম গরম পাতে পড়ছে কি নেই। তরকারি আসে তো লুচি নেই। লুচি আসে তো তরকারি সাফ। পবিবেশন করছে ছ'জন ঠাকুর। গঞ্জের জনকয়েক বাবু ভূইঞাদের নিমন্ত্রণ করেছে মধু। স্তত্রাং সতর্ক হয়েই হাঁড়ি হৈশেলের ছোঁয়াচ বাঁচাতে হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে বরষাত্রীদের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বারেই সব চুকে যাবে।

বড় ভাল হতো যদি গোধূলি লগ্নে বিয়েটা হয়ে যেতো। মেয়েদের বৈঠক উঠতেও রাত দশটার বেশী হতো না। বাড়ির লোকের খেতে গুছাতে বড় জোর বারোটা। যজ্ঞি বাড়িতে এতো সামান্য রাত। প্রচুর সময় পাওয়া

যেতো ঘুমোবার। এখন সব কাজ শেষ করেও বিয়ের জন্ম জেগে থাকতে হবে। তা আর কি করা, কুতুমকে তো আর কিছু বলা যাবে না! কাঁছের থেকে কাছে, বৈরাগী একটু তাড়া দিলেই ততো।...মধু ময়না-নিশির জন্ম ভাবতে থাকে। বিদেয় বড় কষ্ট পাবে বেচারারা।

বৈঠকে ভাজা, ডাল, ডালনা পড়েছে। এরপব পড়বে চাটনী, দই, মিষ্টি। মধু গলবন্দ হয়ে যাচাই করে, ঠাকুর, গবম গরম কয়খান লুচি নিয়া আছ। কই ব্যাপারা সাব, কিছু যে খাইলেনই না? রান্দন বুঝি বালো অয় নাই?—পলানকে লক্ষ্য করেই বলে মধু।

পলান দাত বার করেই উত্তর দেয়, কন কি মোঙলের পো! পাট যে ফুইলা জয়ঢাক অইচে! আর রাগুম কোন হানে?

করিম বাধা দেয়, মোঙলের পো, ব্যাপারা সাবরে ঠকাইবাব চাইয়েন না। মিঠাইর লাইগা জাগা রাগন লাগব ত।

মিঠাই আর আপনাগ পাতে দিবার পারলাম কই? আনা চাইল (আতপ চাল) আর কালাইব ডাইলের ডেলা কত খাইবেন?—সবিনয়ে মধু উত্তর করে।

কি কন আপনে? আমিত্তি/অমৃত্তি। কি খারাপ মিঠাই নাকি? আমাব কাছে ত ঘব বালো মিঠাই, পলান বলে।

কেগুন, কইচিলাম না? লুচি রাইখা গঙা পাঁচেক আমিত্তি ফেইলা ছান উনার পাতে, করিম টিপ্তনী কাটে।

'ঠাকুব ঘরে কে রে? আমি ত কলা খাই না,' বুজলেননি মোঙলের পো, পাচ গঙা মিঠাই কার লাগব?—পলান পান্ডা জবাব দেয়।

আমার গরীবের বাড়ি, আপনাবা যে দয়া কইরা আইচেন সেই আমার কপাল, বদাশ্রুতা জানায় মধু।

গরীব! গরীব দনিব (বনী) কি কতা ইহানে! আমাগ মোছলমানের বিয়ায় হাবার কেব' কবে ছুচি মিঠাই কবে?—পলান বলে।

লুচি মিঠাই আপনারা করবেন ক্যান? আপনারা যে নওয়াব বাদশার জাত। কালিয়া কোরমা খাওয়া অব্বাস (অভ্যাস), হাসতে হাসতে মধু জবাব দেয়।

হ, কেবা কত কালিয়া কোরমা খায় ছাহা আছে। পেইজ পাস্তা জোটে না তার আবার কালিয়া কোরমা! আপনি ঐ চ্যাংড়াগ দিগে যান। আমাগ

যা লাগব আমরা চাইয়াই নিম্নে। পাক বড় ভালো হৈছে, খোলাখলিই উচ্ছ্বাস জানায় পলান !

মধু হাত জোড় কবে এসে দাঁড়ায় পুলিন আর মদনের কাছে। কিছু বলবার আগে মদন স্বেদে দেয় ওকে কাশেমের কাছে। বলে, আমাগ কিছু কওয়ন লাগব না। প্যাট যতক্ষণ আছে আমরাও ততক্ষণ আছি। গণ্ডা দেশক কইরা লুচি টান্ছি ! এহন মিঠাইজা দেহন লাগব। আপনাগ জামাইর কি লাগব ঠাহেন। কাশেম ভাই ত কোন কিচু দিবার আগেই জোড়আত কঠবা বয়।

পুলিন আর মদনকে ছেড়ে মধু আসে কাশেমের কাছে। বলে, কি বাবাজী, কিছুই ত থাইলা না ?

বেচারি কাশেম লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সতি, বিশেষ কিছু খেতে পারেনি ও। মাছ মাংস না হলে ওর রোচে না। তবু ভদ্রতা রেখেই জবাব দেয়, আমাবে কিচু কওয়ন লাগব না। আপনে বহেন গা (বসন গিয়ে)।...

একে একে বরযাত্রীদের সকলকে ভালভাবে যাচাই ক'ব মধু অন্যদিকে তাল দিতে যায়। বাত ন'টার মধোই প্রথম বৈঠক ওঠে।

ক্ষ্যান্তমণি ববের পিসী কনের মাসী। মণ্ডল বাড়িতেও নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়। এক গায়ে দু'দুটো পাকা ফলার। এ স্বযোগ কি জীবনে কোন দিন এসেছে না আর কোনদিন আসবে! মধু কীর্তিনিয়া তো সম্পর্কে মামাই হয়। মামাবাড়ির দেশের মাহুম মামা হবে না তো কি হবে? তাছাড়া দিদিমার সই ছিল মধু কীর্তিনিয়ার মা। তবে আবার ওরা পর হলো কেমন করে? কীর্তিনিয়ার বেটার বউ দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তো আরও নিকটতর। তাহুর পো'র সাক্ষাৎ শালীকে বিয়ে করেছে দুর্গার আপন মামাত ভাই। কুটুম্বিতা তো আর অমনি অমনি গড়ে ওঠে না। ক্রিয়াকর্মে আসা ধাওয়া করলেই কুটুম—কুটুম। নয়তো পরও যা কুটুমও তা!...

ক্ষ্যান্ত সম্পর্কের অলিগলি খুঁজে দিন কয়েক আগে থেকেই ঘন ঘন মণ্ডলবাড়ি যাতায়াত শুরু করে। ডাক খোঁজের মধ্যে মধু বর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। বিয়ের দিন তিনেক আগে শনিবারের এক সন্ধ্যায় পৈঠার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ময়নার চুল বেধে দিচ্ছিল দুর্গা। ক্ষ্যান্ত রোজকার মতোই হাজিরা দিতে

এসে বাধা দেয়, আঃ, কর কি বিয়াইন, ভর সন্ধ্যা বেলা পা খুলাইয়া বইসা বিয়ার কয়নার চুল বানবার নৈচ। পাও উঠাইয়া বহ। একজন আচেন ই চবে, বাও বাতাস লাগব।

দুর্গা নিজেও সংস্কার মুক্ত নয়। ক্ষ্যাস্তর কথাটা ছ্যাং করে গিয়ে বুকেব মধ্যে বেঁধে। মুখ কাঁচুমাচু করে তাড়াতাড়ি মা মেয়েতে পা উঠিয়ে নেয়। খতমত খেয়েই অভ্যর্থনা জানায় : বহেন বিয়াইন।

কথাটা দুর্গার মনে ধরেছে দেখে ক্ষ্যাস্ত খুশী হয়। পান দোক্তা চিবাতে চিবাতেই পৈঠার ওপর বসে পড়ে।

দুর্গা তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, মাটিতে বৈহেন না। এই মইনৌ, মাঈমাংবে একটা পিড়ী আইনা দে।

না না, পিড়ী লাগব না। আমি কি পর আইচি নাকি? পিড়ী দিয় তোমার নতুন ফুটম আইলে। একটা কতা বইলা যাই, ম্যায়াবে ই কয়দিন একা একা ঘাটে পথে যাইবাব দিয় না। ওনার নজর বড খাবাপ।

শঙ্কায় দুর্গা কেমন যেন জড়সড় হয়।

ক্ষ্যাস্ত সমতা রেখেই সাহস দেয়, ভয় কইর না কিচু। উনি যেমুন আচেন আমাগ চম্পও তেমন আচে। চিনলানি চম্পবে?

হ, গঞ্জের চম্পি জাইলানীর (জেলেনীব) কতা কইবার চান ত?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ক্ষ্যাস্ত বাধা দেয়, আবে জাইলানী অইলে কি অইব, ওনাগ সাইক্ষ্যাং যম : চম্পর মতো ওজা ই মুল্লকে নাই। গঞ্জের ক্ষ্যাত্র বাইনার (বেনের) ব্যাটার বউরে বিয়ার দিন বাইত্রেই জিন পুরীতে ধরচিল। বউ বালো কইরা কথা কয় না, খায় না, ঘুমায় না। ক্যাবল থাকে থাকে আর হি হি কইরা হাসে। মত্তে মত্তে ফিট অইয়া যায়। বালো করল ত আমাগ চম্পই। ওনারে এমুন শিক্ষা (শিক্ষা) দিয়া দিল যে ভান্না জোতা (জুতো) কামড় দিয়া পালাইবার পথ পায় না। বউডা ত হারপর খেইকাই বালো আচে। পোলাপানও ঐচে (হয়েছে) কয়ডা।

দুর্গা বলে, হ হনচি। চম্পি ত নিজে রাড়ে না, নেছ জাইলারে দিয়া রাড়ায়।

ছাই হনচ তুনি। ম্যায়া লোকের রাড়ায় ত আর ম্যায়া লোকের ভূত ছাড়ে না। তাই নেছর মুখ দিয়া চম্প মস্তর পড়ে। যার লেইগা বেমুন আদেশ অয়, ক্ষ্যাস্ত বাধা দেয়।

দুর্গা বলে, তা যে ঝাড়ে ঝাড়ুক। আমাগ ককির সাবের মতন এমুন
প্তা ই মুলুকে কেউ নাই।

ছাই গুণী তোমাগ ফাকর সাব। হার নীলা (লীলা) খেলা ছাব-ছাবতা
লইয়া। ভূত প্যাতের ঝাড়-ফুক হায় কিছুই জানে না। ছাহ না, দিনে
রাইতে কত বড় বড় ধরের মায়া। মন্দার নাও বান্দা থাকে চম্পর ঘাটে ? দুর্গাব
কথায় কিছুটা স্কুল হয়েই বাধা দেয় ক্ষান্ত।

দুর্গা আর কথা বাড়ায় না। ক্ষান্তকে বসতে বলে সন্ধ্যা দিতে উঠে যায়।
ক্ষান্তও মশনার সঙ্গে খানিকক্ষণ রংচং করে সোদিনের মতো উঠে পড়ে।

বিয়েব দিন স্থিব হবার পব বোজই এমন আসে ক্ষান্ত। যেদিন যেভাবে
পাব তাব জমায়। পাকা ফলাব খাবার নেমস্তন্ত একরকম পাকাই হয়ে যায়।
এখন আব একটু এঁগিয়ে গিয়ে যদি আগে পাঁচুব আব দুটো চারটে দ্বিগ্নব
অতিবিক্ত বাবস্থা কব' যায়।...

বিয়েব দিন নিজের বাড়ি থেকে বাঁচি বয়ে এনে কুটনো কুটতে লেগে যায়
ক্ষান্ত। গায়ের শক্তি দিয়ে একগাদা মশলা বেটে দিতেও পেছপা হয় না।
দুর্গা রুকে মনেপ্রাণেই যত্ন কবে চলেছে। একথা সেকথা নিয়ে আগে দু'চার দিন
বচসা হলেও মধু এখন ওর পতি প্রসন্ন। নিজে বউমাকে বলে এক বাচি মুড়ি
মুড়িকি ও দই খাইয়েছে সকালের জল খাবার হিসেবে। দুপবেব ভাত খাবারের
সময়েও নেমস্তন্তেব রান্না থেকে খানিকটা কবে চাখিয়ে দেখিয়েছে। খেয়ে বেশ
সন্তুষ্টই হয় ক্ষান্ত। এমন স্তম্ভ রান্না জীবনে ও কখনো খায়নি। মুখপোড়া
বামুনটা যদি পেছনে না লাগতো তাহলে দই, মিষ্টি, তবি-তরকারি পেট পুরেই
খেতে পারতো। কিন্তু গেঞ্জেলটার হাত দিয়ে যেন কিছু গলতেই চায় না। ওর
বাঁপ চৌদ্দ পুকষের ধন যেন দিচ্ছে হারামজাদা। ঝাড়া পাঁচ-পাঁচখানা লুচি
উহনে দিলে তবু একখানা পাতে ছোঁয়ালে না। উহুনই যেন ওকে বলে দেবে
বুচিতে হুন ময়েম ঠিক হয়েছে কিনা। মুখপোড়ার কাছে আনন্দর পোলাব নাম
করেও দুখানা লুচি চেয়েছিলাম। কিন্তু তাই কি দিলে ?...আচ্ছারে আচ্ছা,
বৈঠকে বসলে তো আর না দিয়ে পারবিনে !...মধু মামা কাজটা ভাল করেনি।
ওদের কি চিনতে বাকী আছে ? কাউকে কিছু খেতে না দিয়ে সব গায়েব
করবার তালে আছে।...আঃ কি খশবু ছাড়ছে ঘিয়ের ! গাড়লটা যদি দুখানা
লুচিও চেখে দেখবার স্লযোগ দিতে !...

রাত দশটার মেয়েদের বৈঠক বসে। জায়গা ক্ষান্তই করে। বেছে

বছে নিজের পাতাখানা বেশ বড়সড় দেখে নেয়। আলগা পাতও একখানা পাশে রাখে। ভাবখানা—কেউ একটু পরে বসছে, যা দেবার সেখানাতেও দিয়ে যাও। খাওয়াব পব ফাউ পাওয়া। শীতের দিন নষ্ট হবে না। পরের দিন বেশ চলবে।

ক্ষ্যান্তর ফাঁদে প্রথম প্রথম সুব কিছুই পড়তে থাকে। বাইরের নিমগ্নিত লোকের খাওয়া হয়ে যাওয়ায় এখন পবিবেশন করছে বাড়ির লোকেরা। তারা ক্ষ্যান্তব চাতুরী সহসা ধরতে পাবে না। কিন্তু পব পর খাবার জমে জ্বাওয়ায় দই পরিবেশনকারী এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্ষ্যান্তকেই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস কবে। বড় লজ্জায় পড়ে ক্ষ্যান্ত। কেননা, চেয়ে ওই সমস্ত তবি-তরকাবি নিয়েছে! দই, মিষ্টটা পড়লেই লাঠা চুকে যেতো। কিন্তু ববাত মন্দ তাই ধরা পড়ল। নিশ্চয় কেউ কান ভাঙানি দিয়েছে।...

দই-ওয়ালার সঙ্গে ক্ষ্যান্তব মন কসাকবি ছিল। জ্বদ করবার জগ্ন তাই সে উঠে পড়ে লাগে। আব একটু হলে হয়তো দঙ্গলজ্ঞ হয়ে যেতো, দুর্গা পাতের কাছে এসে দাঁড়ায়।

লজ্জাব হলেও ক্ষ্যান্ত কতকটা বল পায়। আমতা আমতা করেই বলতে থাকে, ছাহত বিয়াইন, আমার ভাইপাব বাইত্রে আইবাব কতা আচে বইলা; একটা পাবস নিবার নৈচি, তা মুখপোড়া কেনুন তরপাইবার নৈচে!

দুর্গা সবই বোঝে। তাই একটু হেসে দই-ওয়ালাকে ধমক দেয়, ওকি নিমাই, যা দিবার দিয়া যাও না। দিনভর খাটচে ব্যাচার, ভাইপোর লেইগা পারস না নিলে হায় খাইব কি?...

ভাইপে' খাইব না ছাই! ও সব চালাকি আমবা বুজি। রাগে গজগজ করতে করতেই এক চামচ দই থপ করে পাতের ওপর ফেলে দিয়ে যায় দই-ওয়াল।

ক্ষ্যান্ত আব কথা বাড়ায় না। ধরা যখন পড়েছেই তখন ছুঁকথা বলে বলুক।...

রাত বারোটার মধ্যে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে হাঁড়ি হেঁশেল গুছোনো হয়ে যায়। তিনটেয় শেষ লগ্ন। ভোর থেকে সানাই বাজছিল। বারোটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়। সবে অন্নান মাস, তবু চরে শীতের ধকল বেশ। ঠাণ্ডায় বেচারাদের গলা দিয়ে ফুঁ বেরুচ্ছে না। ব্যাও পাটির সঙ্গে রাত দশটা

পর্যন্ত থাকার চুক্তি ছিল। কিন্তু গোথুলি লগ্নে বিয়ে না হওয়ায় সব কিছুই পও হয়ে গেল। বিয়ের সময়েই যদি ব্যাণ্ড না বাজাবে তাহলে আর আমোদ হবে কি দিয়ে? ওরা তো কিছুতেই আর থাকতে চাচ্ছে না। আর এক জায়গায় নাকি রাত এগারোটা থেকে বায়না আছে। সে প্রায় মাইল খানেকের ওপর পথ। তাঁর পর্যন্ত থাকতে হবে ওদেব ওখানে। মধুর মনটা খিঁচড়ে যায়। সেই পয়সা খরচ হবে অথচ সখ আহ্লাদ কিছুই হবে না। গোথুলিতে বিয়ে হলে সারা বাড়ি লোকজন জম্জম করতো। হাউই রংমশালে হতো রূপ-দীপালি। ব্যাণ্ডেব তালে তালে ময়না বরণ করতো নিশিকে। কিন্তু এখন তো হবে সেই ছেলেপুলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে হরিলুট দেওয়া। ..

রাত একটা পর গোটা মণ্ডল বাড়িই যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বরযাত্রীদের অধিকাংশই ফিরে গেছে। বাতের শরীর বলে পলান ব্যাপারী থাকতে পারেনি। তাঁর বদলে কাশেম অবশ্য আছে। কিন্তু নিশির সঙ্গে অনেকক্ষণ ঠাট্টা মস্তুরা করে শেষ পর্যন্ত ও-ও টাল সামলাজে পারেনি। বেশ নাকই ডাকছে এখন ওর। চ্যাংড়াদেব মধ্যে আবে যা দু-পাঁচটি আছে তাঁদের অবস্থাও তাই। দীর্ঘ নিজেও একটু আয়াস করতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে অবশি নিশি ময়নাকে এখনো জাগিয়ে রেখেছে এয়োত্রি। কিন্তু সে শুধু নামেই জেগে থাকা। হাসি নেই—কথাবার্তা নেই... দু'চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু।

দুর্গা এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—বেশ ছিল। কিন্তু বাড়ি নিরুৎসাহ হতেই বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। যার আজ সব থেকে প্রয়োজন সেই-ই নেই। শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই। কিন্তু দুর্গা নিজের আঁধিকে বাগ মানাতে পাবে না।

কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মধুও বোধ হয় ছেলের কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হয়তো পাষণ চাপা বুকখানায় অগ্নুৎপাত হচ্ছিল। কিন্তু মধু তা কোনক্রমেই প্রকাশ হতে দেয় না। মায়ার এ সংসার। কে পুত্র, কে কন্যা, কে জায়া এখানে? শুধু কর্তব্য করে যাও... শক্ত করেই বুক বাঁধে মধু। সন্ধ্যা থেকে গ্যাসের আলোগুলো জ্বলছে। হয়তো দম ফুরিয়ে গেছে। নিভে যাচ্ছে কোনটা, কোনটার বা জল প্রয়োজন, মধু উঠে গিয়ে তদারক করে। প্রয়োজন বোধে পান্টে দেয় গ্যাস। আবার মিটমিট করে জ্বলতে থাকে আলোগুলো। ভাগাড়ে খেঁকি কুকুরগুলি বেশ সতেজ থেকেই বাসর জাগছে। মাঝে মাঝেই খেঁকানী শোনা যাচ্ছে। মধু বার বার উঠে

গিয়ে ঘড়ি দেখে। লগ্ন ঠিক রাখার জন্ত গঞ্জের অখণ্ড সাধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে ছোট টেবিল ঘড়িটা।

সারাদিন একটানা উপোস চলেছে। এ বয়সে এরকম উপোস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবু মনের জোরেই শক্ত আছে মধু। কি আর করা যাবে, হিন্দু শাস্ত্রে যখন খেয়ে কন্যা সস্ত্রদান করার রীতি নেই তখন থাকতেই হবে। অনাচার করে তো আর একমাত্র নাতনীর অমঙ্গল করতে পারে না।...

আর হয়তো ঘণ্টাখানেক বাকী। দূরে প্রহর ঘোষণা করছে খেঁক-শিয়ালীরা। মধুর দু'চোখ জুড়ে আসছিল—খড়কড় করে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখতে যায়। কিন্তু কিসে কি হলো বুঝা যায় না। হঠাৎ মাথা ঘুবে মেঝের ওপর পড়ে যায় মধু। দুর্গা নিকটেই বসেছিল, শব্দ শুনে ছুটে আসে। মধুর বুকে হাত দিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, বাবা—বাবা—

আর বাবা! সব শেষ। বুকের স্পন্দন থেমে গেছে মধুর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

চৈচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে এয়োতিবা—ময়না নিশি। দীহুর ঘুম ভেঙে যায়। কাশেমও উঠে বসে। চারদিকে শুরু হয় ছোটোছুটি। গঞ্জ থেকে আসেন নরেন কবরেজ। চোখ মুখেব দিকে তাকিয়েই মন্তব্য করেন, সন্ন্যাস রোগ। পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

শাঁখ সানাই-এ যে বাড়ি মেতে উঠেছিল সে বাড়িতে নামে গভীর শোকের ছায়া। দুর্গা কাটা পাঠার মতো দাপাতে থাকে। ময়না বেচঁশ। নিশি ভেবেই পায় না, ওকি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে।...সমস্ত চর শোকের বিহ্বল। আর কেউ শুনবে না, নৌকাবিলাস, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস মধুর মুখে। এমন মাহুঘেরও এমন হয়! বেচারী দুর্গা ময়না।...

সংবাদ পেয়ে পলান, করিম সেই রাতেই ছুটে আসে। ভোর হতে না হতেই আসে শ্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু, গোবিন্দ কীর্তনিয়া। উদগত অশ্রুধারার সঙ্গে পড়ে খোলে চাঁটি। আবেগ-বিগলিত-কণ্ঠে চলে নাম সংকীর্তন। পলান করিম আলাহুর কাছে দোয়া মাগে ওদের অভিন্নফলয় বন্ধুর জন্ত। শোভা-স্বাক্ষার বদলে শব্দাজ্ঞা বার হয় মণ্ডল বাড়ি থেকে। ধলেশ্বরীর বাঁকে চিতা সাজানো হয়। কালের নিয়মে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মধু।

ময়নাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল মধুর সংকল্প। কিন্তু ভগবান ওকে সকল সংকল্প থেকেই মুক্তি দিলেন। মধু মুক্ত হলো, পড়ে রইলো ময়না, দুর্গা আর অণ্ডছানো সংসার। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। জমি ঠাধা দিয়ে নাতনী'র বিয়ের উৎসবে মেতেছিল মধু। ভেবেছিল, দীহুব সংসারে হুখে থাকবে ময়না। ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ হবে। ময়নাব যদি সুখ হয় তাহলে হাব ওদের ভাবনা কি? পারে ক্ষেতখামার থেকে টাকা তুলে জমি ছাড়াবে, না পারে দুচোখ যেদিকে যায় চলে যাবে। শ্রীক্ষেত্র, নবদ্বীপ, বন্দাবন যেদিকে খশি। দুর্গা মাও তো সারাদিন ভজনপূজন নিয়েই ব্যস্ত। ময়না সুখী হলে সংসার ছেড়ে যেতে তবে আর মায়া কি? মন্দিরে মন্দিবে ভজন গাইবে—যা ভেগটে মা-বেটায় প্রসাদ পাবে। হায়রে আশা হায়বে মানুষ...

ময়না না থাকলে দুর্গারও কোন ভাবনা ছিল না। যদি বিয়েটাও মিটে যেতো। কি মূল্য আছে এ প্রাণেব। ধলেশ্বরী'ব জল তো এখনো শুকিয়ে শায়নি। দড়ি কলসী নিশ্চয় জুটতো। রোগে স্বামী খুশুর মরয়েছে। কিন্তু দোষটা যেন ওবই। ও-ই যেন ওদের মাথা দুটো চিবিয়ে থেয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ওব কলঙ্গ—হতভাগী পোড়াকপালী। না না, আশ্বঘাতী হতেই বা যাবে কেন? বন্দাবন বয়েছে—নবদ্বীপ, কাশী। গতর খাটালে কি দুমুঠো ভাত জুটবে না? কিন্তু কাল হয়েছে ময়না। কে জানে, ববাতে আরো কি আছে।...

ময়নাও দমে যায়। পাড়ার বুদ্ধিগুলি যেন ওকে দেখে কি সব বলাবলি করে। কত যেন অপরাধ করে কেলেছে ও। জ্ঞান হবার বয়েস হয়নি। তবু কেন যেন চলায় কেঁরায় মধুরতা এসে যায়। নিশি আগের মতোই গরু পাল নিয়ে মাঠে যায়। কিন্তু ময়না পারে না ওর পাশে ছুটে যেতে। বাশীর ডাকেও আর সাড়া দিতে পারে না। এ যেন বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।

ওদিন জান করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না। পাশাপাশি আসছিল ক্ষান্তমণি। হয়তো ময়নার ভিজে আঁচল থেকে জলের ছিটা গিয়ে থাকবে ওর গায়। বাস, আর কোন কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাজখাই গলায় গালাগাল শুরু করে ক্ষান্ত, ছাই কপালী—বাপ থাকী—দাদারেও চাকাইয়া খাইচ। পথ

ঘাট দেখেইখা চলচ্ নালো শাবাতী? মাইনবের গায় যে জল আহে,
ছাহচ না?...

ভিজ্জে কাপড়ে দুর্গাও পেছ পেছ আসছিল, ক্ষ্যান্তর গালাগাল শুনে বুকের
ভেতরটা আছড়াতে থাকে। অব্ব মেয়ে—একটু না হয় জলের ছিটাই গিয়েছে।
ও তো আর বাসি জামা কাপড়ে নেই কিম্বা কোন নোংরা ধাটেনি। স্নান
করেই না ঘাট থেকে যাচ্ছে। তবু এমন ইতরের মতো গালমন্দ করবে!...এই
না সেদিনও কত ইষ্টতা দেখিয়ে চলিয়েছে। তিন দিন ধরে সমানে খেয়েছে
নিয়েছে, একটু লজ্জাও কি থাকতে নেই!...ক্ষ্যান্তব কথার কোন জবাব না দিয়ে
রাগে গো গো করতে করতেই বাড়ি চলে আসে। কাঁধের ওপর থেকে ভিজ্জা
কাপড়ের রাশ নামিয়ে ছুটে গিয়ে ময়নার চুলের মূঠি ধরে। হুম্ হুম্ করে
কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় পিঠের ওপর। ময়না ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। ঠাঁরুর
ঘরে এসে খিল দেয় দুর্গা। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। কত কথাই না মনে
হতে থাকে। কুসুম বেয়ান যদি ওদের মুখ থেকে এসব লাগামী ভাঙানী
শোনে তাহলে মন খিঁচড়ে যেতে কতক্ষণ? কে অলক্ষণে মেয়ের সঙ্গে আছুরে
ছেলের বিয়ে দেয়? কাল-অর্শোচের জগ্ন পুরো এক বছরই তো অপেক্ষা
করতে হবে!...

ময়নার বিয়ের জগ্ন জমি বন্ধক রেখে দু'শ টাকা কর্জ করে গেছে মধু।
রামকান্তর মধ্যস্থতায় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ দিয়েছেন টাকাটা। মধুর ভরসা
ছিল, ধবি শশু বেঁচে অর্ধেক শোধ করতে পারবে। বাকীটা পরের সন পাট
বেচে। হিসেব ভুল ছিল না মধুর। ফসল যেভাবে বাড়ছিল তাতে হয়তো
অর্ধেকের বেশীই শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রকৃতি। অসময়ে
বিরাম বিহীন বৃষ্টি শুরু হলো। শীতের সময় এরকম বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায়
না। শুঁটি দেখা দিয়েছে মুগ্ মটরের ডগায়। লকলক করে বেড়ে চলেছে।
মহাশুক পতনের বছর। শান্ত্রে আছে, গুরুদশার বছরে ঘোরতর বিপদের
সম্ভাবনা থাকে। সর্বদা আশঙ্কায় থেকেও দুর্গা বুক বল পাচ্ছিল। শশু কাঁটা
ঘরে উঠলে আগে কুমার বাহাদুরের দেনা শোধ করবে। খায় না খায় এ পাপ
ও ঘাড়ে রাখবে না। কিন্তু মনের বাসনা মনেই চাপা পড়ে। অবিরত বৃষ্টিতে
মুগ্, কলাই, মটর পচে সাক। বৃষ্টির মধ্যেও অছোরা শুঁটি কুড়িয়ে এনে কিছু
আয়ের পথ করে নিয়েছে। যা আসে দু'দশ টাকা। কিন্তু ও সেদিক দিয়েও
স্ববিধে করতে পারেনি। মধুর মৃত্যুর পর থেকেই ছোট ভাই আনন্দ সংসারে

আছে। একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে একা একা থাকে কি করে? ক্ষেত খামারই বা দেখে কে। আনন্দের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব আনন্দ পালন করতে পারেনি। খেতে ঘুমোতে হাঁকো খেতেই ওব দিন কাবার। ক্ষেতে যাবার সময় কই? তাও আবার জল বৃষ্টি মাথায় করে। ও তো আর কাজ করতে আসেনি এ বাড়িতে। ময়নার বিয়েটা চুকে-গেলে দিদির কাছ থেকে যদি জমি-জায়গাটুকু লিখিয়ে নেওয়া যায়।...

চৈত্র মাস, গোলায় টান পড়ে। গত সনের মজুত শস্ত যা ছিল টেনেটেনে তা দিয়ে এপযন্ত কোনরকমে চলেছে। মুড়ি, মুড়কি, ছাতু খাবার বলতে যা কিছু প্রায় সবই ফতুর। অথচ প্রতাহ সকালে ময়না আনন্দব জন্ম কিছু না হলেও এক বাটি করে গুড়-মুড়ি চাই। নিদেন এক সানকী করে হুন-পান্তা তো না হলেই নয়। কিন্তু দুর্গা এত খাবার পাবে কোথেকে? আনন্দকে ক্ষেত খামারে গিয়ে কাজ করবার কথা বলেও কোন লাভ নেই। ঠেলেঠেলে পাঠালেও ও দিনভর ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়েই কাটিয়ে দেয়। ওকে নিয়ে এক জ্বালাই হয়েছে। ছোট ভাই, মুখ ফুটে তাড়াতেও পারে না, সহিতেও পারে না। এতদিন যাও বা ছিল এখন তো ভাত দেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। চার বেলা চার খালা না হলে মুখ চোখে আঘাটের মেঘ থমথম করবে। একটুতেই রেগে যায়। শুধু কি খাওয়াই? পণ্টাথানেক বসে বসে গায়ে তেলই মাখবে ছটাকখানেক। অবশ্য চললে কিছু বলতো না ও। কিন্তু এখন যে উপোস দেওয়া শুরু হবে। আনন্দ পারবে কেন এত কষ্ট সহিতে?...ঘরের পাশেই বয়েছে নতুন কুটুমেরা। তাদের আব যা-ই হোক খাওয়া-পরার কোন কষ্ট নেই। লোকে গিয়ে যদি সাত পাঁচ কান ভাঙানী দেয় তবে কি আর ইজ্জৎ থাকবে?...ভাবনায় ভাবনায় আস্থিক করতে বসে দুর্গাব দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

হাঁড়িতে চাল আজ সতি্য বাড়ন্ত। কিন্তু দুর্গা নিরুপায়। কোথায় পাবে টাকা? একি আর একদিন আধদিনের ব্যাপার? রোজ চাই, চার বেলা চাই। একা ময়না থাকলে কোন কথা ছিল না। যা জুটতো মা-মেয়েতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। কিছু না জুটতো জল খেয়েই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু আনন্দকে নিয়ে তা চলবে না। ওদের দু'জনের চেয়েও ওর একার খোরাক চের

বেশী। বলতে গেলে প্রতি বেলায় আধ সের চাল ওর একরাই চাই। এখন
করে কি ও?...

বিয়ের সময় নতুন বউয়ের মুখ দেখে আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ দুটো
একটা রুপোর টাকা ওর হাতে দিয়েছিল। এতকাল তা পেটরায়ই তোলা
আছে। প্রতি বছর ভাদ্রমাসে কাপড় রোদে দেবাব সময়—পেটরা খুলে
একটা একটা করে গুণ দেখে। কতই বা আর হয়? সব মিলিয়ে দশ
টাকাও নয়। অনন্তোপায় দুর্গা সেই টাকাই আজ কাপড়ের নীচে হাত
গলিয়ে বায় করে। দুটো টাকা আনন্দের হাতে গুঁজে দেয় গঞ্জ থেকে চাল
কিনে আনার জন্ত। হাঁ, শুধু চাল, আর কিছুই নয়। ছুন যা আছে তাতে
আরো দুটো দিন চলে যাবে।

সকালে বরাদ্দ মতো খাবাব পায়নি বলে মুখ ভার করে বসেছিল আনন্দ।
টাকা হাতে পেয়ে লাঙ্কিয়ে ওঠে! দ্বিদির নিকট বায়না ধবে, চাইব পয়সার
জিলাপি আনবার চাই, কি কও তুমি? ওদিন দেখা আইলাম কান্দনী
ঘোষের দোকানে বড় বড় কইরা জিলাপি ভাজবার নৈচে। তুমি গইনা পয়সা
ছাও। শ্বাহুম কোহান খনে? মইনীরে আইহা কইলাম, অর ত জিব্বা দিয়া
জল পড়বার থাকে।

অতি দুঃখেও হাসি পায় দুর্গার। সম্মতি না দিয়ে পাবে না। বয়েস হলে
কি হবে আনন্দটা সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে দুটো বেঁচে
থাকলে তো এতদিন প্রায় ময়নার সমানই হতো। বউ বেচারিও মরে বেঁচেছে।
নয়তো দুঃখের সীমা থাকতো না।...

আনন্দ ক্ষেতের আল ধরে গঞ্জের পথে মিলাতে থাকে, দুর্গার বুকের
ভেতরটা মোচড় দেয়। কি আর ওদের এমন বায়নাকা? সামান্য দুটো ছুন
ভাত নয়তো মুড়ি চিঁড়ে। দিতে পারছে না এ ওর নিজের অক্ষমতা। আনন্দ
না থেকে নিজের পেটের আর একটা থাকলেও তো তাকে খাওয়া-পরতে হতো।
...ভাবতে ভাবতে ছুঁচোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতেও
সংসারে অভাব ছিল। এমন কি নিবারণ বেঁচে থাকতেও। কিন্তু সে অভাব
অল্প ধরনের। হয়তো হাল বলদের জন্ত টাকা চাই। পাটের নিড়ানী পড়বে
তার জন্ত চাই টাকা। কোনরকম আকস্মিক বিপদের মুখে পড়েও দায়
দেনার দরকার হতো। কিন্তু তাই বলে দুটো ভাতের ভাবনা কখনো
এমন করে ভাবতে হয়নি। এ যেন দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী উড়ে এসে চোঁপে বসেছে।...

ময়না বাসি ঘর-দোর নিকিয়ে একবারে ঘাট থেকে স্নান করেই ফেরে। ওকে দেখে দুর্গা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে সহজ হতে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বলে, হারে, এত সকালে ছান করি সন্দি লাগে যদি ?

এত সকাল দেখলা কোন হানে ? বৈদ্য বলে পৈঠার উপুর আইহা পন্ন ! তুমিও যাও না ডুব দিয়া আহ গা ? মিচামিচি বেলা কইরা কি কাম ? সমতা রেখেই ময়না জ্বাব দেয়।

দুর্গা তাই যাবে। এ সময়ে মেয়েটার চোখের সামনে না থাকাই ভাল। এক-কোঁটা মেয়ে, এতটা বেলা হয়েছে কিছই মুখে দিতে পারলে না। স্নান কবে এলে তো ক্ষিদে আরো জোর পায়। কিন্তু কি আছে ঘরে যে তাই দেবে ? জিলিপি ক'থানা আনলে আনন্দ ভালই করবে। চার পয়সায় আটখানা জিলিপি পাবে। কোন কোন দিন কাউও পাওয়া যায় এক-খানা। দু'জনে চারখানা করে মুখে দিয়ে একটু জল খেতে পারবে।... দুর্গা পেতলের কলসীটা কাঁখে করে ঘাটের পথেই পা বাড়ায়।

গঞ্জ থেকে আধ মণ মোটা সেদ্ধ চাল কিনে আনে আনন্দ এক টাকা চৌদ্দ আনা দিয়ে। এক আনার আনে জিলিপি। বাকী চার পয়সার দোস্তা পাতা ও চিটে গুড়। তামাক ফুরিয়ে গেছে। তামাক না হলে পুরুষ মানুষের চলে কি করে ? ইষ্ট কুটুম এলেই বা তাকে দেয় কি ?...

চার পয়সা অপব্যয় হয়েছে দেখে দুর্গা মনে মনে বিরক্তি বোধ করে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। ইচ্ছে করেই বলে না। সংসারে যখন আছে তখন ওকে ওর অভ্যাস মতো জিনিস দিতেই হবে। তা ছাড়া সত্যিই তো দীক্ষ বৈরাগীও তো এক ঝাঁকে এসে পড়তে পারেন। নতুন কুটুম, এক ছিলুম তামাক দিয়ে ভদ্রতা না করতে পারলে ভাববেন কি ?...খরচ যদি কমাতে হয় তাহলে তা আসল খাওয়া কমিয়েই কমাতে হবে। চার বেলায় পরিবর্তে দু'বেলা খেয়েই দু'ঘণ্টার সঙ্গে লড়া উচিত। তবেই যদি আসে সুদিন।—

ঘরে এক কোঁটা কেরোসিন নেই। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার। কুপি না জালিয়ে রাত্রে রান্না করা অসম্ভব। খাওয়ার পাট না হয় কোনরকমে দাওয়ায় বসে চুকানো-যাবে। কিন্তু...সবদিক ভেবে চিন্তে দু'বেলায় ভাত এক বেলাই রেঁধে রান্না দুর্গা। শুধু দু'বেলায় মতো। তাই পরের দিন আর সকালের জন্ম পাস্তা থাকে না। একদিন খেয়ে দশদিন উপোস দেওয়ার চেয়ে অন্ন অন্ন খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাত্র সামান্য ক'টা টাকা পুঁজি।

এ টাকা ফুরলে গতাস্তর নেই। বছর না ঘুরতেই যদি ঘর-দোর বাঁধা দিতে হয় তা হলে সমাজে বাস করা দুর্লব হবে। হয়তো কুম্ভম বেয়াইন বেঁকে বসবেন ছেলের বিয়ে দিতে। বেচা কেনা ঘরের সঙ্গে কে আর কাজ করতে চায়? লোকে তো এমনিতেই খঁত ববতে ওস্তাদ। মইনীকে নিয়েই হয়েছে যত জালা।...ঐতন্তত: চিন্তায় অনেক বাত পর্যন্তও ঘুমোতে পারে না দুর্গা। আনন্দ নিজের ঘরে দিবি্য নাক ডাকাচ্ছে। ময়নাও হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। না, মিছে আব ভেবে কি হবে? যা করেন শ্রীমধুসুদন।...হাতে মুখে জল দিয়ে ময়নাকে বুকে জড়িয়ে দুর্গা শুয়ে পড়ে। হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে।

ভোরে উঠেই আবার সেই সমস্তা। আনন্দর আর যত দোষই থাক ঘুম থেকে ও খব ভোরেই ওঠে। হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। খালি পেটে হাঁকোও টেনেছে দু'বাব। পেট এখন কাঁকা গড়ের মাঠ। হু হু কবে জ্বলেছে। দেখতে দেখতে বোধ প্রায় পৈঠার ওপব এসে পড়লো। কিন্তু দিদি যে খাবার কথা মুখেও আনছে না। লোকে কি না খেয়ে মববে নাকি? ..

পেছন কিরে ঠাকুর ঘব নিকোচ্ছিল দুর্গা, আনন্দ ফেটে পড়ে, অ দিদি, এত বেলা অইচে কিছু খাওয়ান লাগব ত?

আবার শুনে দুর্গার বড়-বিরক্তি বোব হয়। এত বড় জোয়ান মবদ, ঘটে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে। একবক্তি মেয়ে, কই আমার ময়না তো কিছু খেতে চাচ্ছে না? ওর হলো কি।...রাগে ঝংকার দিয়েই উত্তব করে, খাইবার দিমু ধবে আছে কি? বান্দন হউক ভাত খাইচনে।

বারে, হাত দুপইবে খাঁমু। এহন কি দিবা? দুইডা পাস্তাও রাধ নাই? না, গলাব স্বর গস্তীর করেই উত্তর করে দুর্গা।

জানইত সকালে দুইডা পাস্তা খাই। রাইত্রের চাইল দুইডা বেশী কইরা নিবার পারলা না, অভিমানের স্বর আনন্দর কণ্ঠে।

বেশী কইরা নিমু চাইল আছে কোতান খনে? ক্ষ্যাত খামার কি তুই কিছু জ্বাহচ?

হার লেইগা তুমি খাইবাব দিবা না? দুইডা বাসি ভাত, তাও না!

না, দিমু না। ইহানে বইহা তর চাইর বেলা গিলনের কাম নাই!

আনন্দ বোধ হয় এবার সত্যি সত্যিই ব্যথা পায়। মুখখানা কাঁচুমাচু করে দিদির দিকে ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যথাটা আনন্দর চেয়ে দুর্গাই বেশী পায়। ছি ছি ছি সামান্ত দুটো

খাওয়া-খাকা নিয়ে এমন করে বলতে পারলে ও ! ছোট ভাই, ঘরে মা বাবা ছেলে বউ কেউ নেই। এক রকম নিবোধ বললেই হয়। নয়তো এতটা বয়সে কেউ কখনো খাবার জন্ত এ রকম করতে পারে?...নারী জন্ম মোচড় দিয়ে ওঠে দুর্গার। বাকে করে দই, চিঁড়ে, গুড় নিয়ে বাড়ির উঠান দিয়েই হরিচরণ ঘোষ যাচ্ছিল। দুর্গা ওকে ডাকে। গঞ্জ থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালেই ফেরি করতে আসে হরিচরণ। দই, চিঁড়ে, গুড়, সন্দেশ, জ্বিলপি নিয়ে শ্রায় মগ্ন দুই হবে। অধিকাংশ দিনই চরফটনগরে কাবার হয়ে যায়। কোনদিন চরধল্লা পর্যন্তও যেতে হয় হরিচরণকে। চরধল্লায় অবশ্য অগ্র ফেরিওয়ালা আছে। তবু হরিচরণ গেলে কেউ তাকে ফেরাতে পাবে না। যে এক সের নিয়েছে তাকে দু'সের গচিয়ে আসে। দাম—তা দামের জন্ত ভাবনা কি? আজ না পারো কাল দিয়ে। কাল না পারো পবন্ত...

হরিচরণ কাঁপ থেকে বাক নামিয়ে জিরোতে থাকে। দুর্গা পেটের খুলতে ধরে ঢোকে। আনন্দের সকল ভাবনা উবে যায়। মহাবলী হরিচরণকে দেখে। আহা, কি স্বাদ ঘোষেব পো'ব 'মান্নইনা দইয়েব।' বসনার মস চেপে এক কলকে তামাক সেজে' এনে হরিচরণকে দেয়। হরিচরণ যেন হাতে স্বর্গ পায়—আনন্দও। আরো একখানি মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে মুখ ময়নার।

পেটেরা বলে একটা টাকা বার করে এনে আনন্দের হাতে দেয় দুর্গা। টাকা হাতে নিয়ে আনন্দ জিজ্ঞেস করে, এক টেকার দই চিড়াই রাকুম?

নারে, চাইর আনার রাক। তুই আর ময়না খাবি, দুর্গা উত্তর করে।

তুমি খাইবা না?

না, আমার সর্দি লাগচে। ভাত অইলে আমি ভাতই খামু।

আনন্দের মাথায় আর বেশী প্রশ্ন যোগায় না। হাটু গেড়ে বসে পড়ে বাকের সামনে। মাক জোখ সব ভাল করে দেখে নিতে হবে।

হরিচরণ তাড়া দেয়, কওনা পুত্রা, কি দিমু?

আরে রাক, দই তোমার কেমন আগে চাইখা দেখি, নিজের ভানহাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে হরিচরণের প্রশ্নের জবাব দেয় আনন্দ।

হরিচরণ চামচে দিয়ে কিছুটা দই ওর হাতের ওপর দিতে দিতে মন্তব্য করে, একটু কাউ খাইবার চাও খাও। হরিচরণের মান্নইনা দই আবার চাইখা ছাহন লাগে নাকি?

আনন্দ সে প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে ক্র কুঁচকিয়ে বলে, তা চলবার পারে কোনরকমে। এখন ভাও কি কও ?

তোমার আর ভাও জিগাইবার লাগব না। কত দিমু কও ?

না না, দর ভাও না কইলে আমি নিমু না। হেবে যে তুমি গলা কাটবা তা অইব ন।

দুই আনা শ্রাবইত (সেব) বেচবার নৈচি। তা তুমি যখন তামুক খাওয়াইলা তখন তোমাব খনে আব নাব না-ই কবলাম। ছও পয়সা স্ত্রারই দিয়।

ঈস টানা দুদেব দই, তা আবাব ছও পয়সা স্ত্রার। কাইল বাজাবে দুদেব দব কি গেচে তা বুজি আমি জানি না ভাবচ ?

আরে রাকও তোমাব বাজার ভাওয়েব কতা। আদাব ব্যাপারিব আবাব জাহাজের খবব।

আনন্দ হয়তো আবো কিছুক্ষণ দব কবাকষি কবতো। কিন্তু দুর্গা এসে বাধা দেয়, 'দর ভাও রাকত। বোষ মশয়, এক স্ত্রার দই, এক স্ত্রার চিড়া আব আধ স্ত্রার গুড় ছান।

হরিচরণ তাই মেপে দেয়।

দাঁড়ি পাল্লার দিকে তীক্ষ্ণ নজব রাখে আনন্দ। মাপা হয়ে গেলে চাঁৎকার করে ওঠে, কই, হর (সর) দিলা না ?

হবিচরণ চামচে দিয়ে দইয়েব সব কিছুটা তুলে দেয়।

আনন্দ আবার চাঁৎকার করে ওঠে, ফাউ ছাও।

হরিচরণ উত্তর দেবাব আগে দুর্গা এবার ধমক দেয়, একবাব ত ফাউ খাইচস্। আবার কতবার ফাউ দিব তরে ?

দুর্গার কথার কোন জবাব না দিয়ে হরিচরণকেই পুনরায় বলতে থাকে আনন্দ, কি গ ঘোষের পো, কওত, দুদে হাত পড়ব নাকি ? জলের উপুড় দিম্মাই বাইব না ?

হাসতে হাসতে হরিচরণ উত্তর দেয়, না, পুত্রার লগে আর পারন বাইব না। নেও—খর, বলে আর এক চামচ দই ফাউ দেয়।

দাম নিয়ে উঠে যায় হরিচরণ। আনন্দ টাকার কেবত সাড়ে বারো আনা পয়সা হাতে নিয়ে উলটিয়ে পালটিয়ে পরখ করে দেখে। দুর্গা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, পয়সার ঝামেলায় নিজে না গিয়ে দ্বিধার হাতেই ওটা তুলে দিতে

যায়। এক এক করে বারো আনা গুণে দিয়ে ছ' পয়সা হাতে রেখে আবার
বায়না ধবে আনন্দ, বিড়ি ফুরাইয়া গেচে, পয়সা ছইজা নিমু ?

আগে হলে হয়তো দুর্গা কাঁজিয়ে উঠতো, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই কোমল
প্রাণে কাঁটা ফটেছে। তাই আর না বলতে পারে না।

আনন্দের আজ পোয়া বাবে। একসঙ্গে দুই, চিড়ে, বিড়ি। উল্লাসে ময়নাকে
ডাকতে থাকে, এই মইনী, খাবিত শিগ্গীর আয়। ফুরাইয়া গেলে কইলাম
আমি জানি না।

ময়না আসে। মামা-ভাগনীতে মিলে খাওয়ায় মন দেয়। দুর্গা দেখে
দেখ হাসে। ভা.ন, কত অল্পে এবা সন্তুষ্ট। ভগবান, তাই আমি জোটাতে
পাচ্ছিলে। তুমিই জানো কি আছে অদৃষ্টে।...ঘব দোব নিকিয়ে কলসী কাঁখে
ঘা.টর দিকে বড়না হয় দুর্গা।

॥ ১৫ ॥

বিয়ের সামান্ত কাঁটা মুখ-দেখা টাকা, কাঁদিনেই উবে যায়। কিন্তু রান্নাসে
অভাব মেটে না। মাত্র তিনটে প্রাণীর সংসার। তবু এই তিনজনকেই এক
একটা খুদে রান্নাস বলে মনে হয়। গোলায় যখন খাবার মজুত থাকতো তখন
মনে হতো ওবা যেন কেউ খেতেই পাবছে না। কম খেয়ে খেয়ে শরীর শুকিয়ে
যাচ্ছে। ময়নাকে তো সেদিনও ধরে বেঁধে ভাত খাওয়ানো হয়েছিল। আর
আজ ? আজ যেন খালা ভর্তি করে ভাত দিলেও ময়না না বলে না। যত দেবে
ততোই যেন থাকবে।

গোলায় মজুত দিন কয়েকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। অসময়ে জল ঝড়
হওয়ার রবিশস্ত্রও ক্ষেতেই পচেছে। এখন সফল মাত্র গোটাকয়েক খালা,
ঘটি, বাটি আর চালের টিন ক'খানা। বেচে খেলে দু'দিনেই সাক্ষ হয়ে
যাবে।...দুর্গা মহা ভাবনায় পড়ে। চালই হোক আর খালা ঘটি বাটিই
হোক—কিছুই আটকাতো না যদি ময়নার বিয়ে হয়ে যেতো। এখন
কাল হয়েছে কাল-অশৌচটা। এগুবারও উপায় নেই-পেছুবারও উপায় নেই।
বৈরাগী-গিন্নী এপর্যন্ত আছেন ভালই। কিন্তু কখন যে কি দেখে কি হবেন
তা বলা যায় না। মুখপুড়ী ক্ষেস্তী তো দিন-দিনই গজরাচ্ছে। একবার
যদি ওর কথা কানে তোলেন উনি তা হলে তো সর্বনাশ। কোন্ ছেলের

মা তার ছেলের অমঙ্গলের সম্ভাবনা জেনেও বিয়ে দিতে রাজী হয়? হোক না পাকা কথা। চরের ঘোড়ল দীর্ঘ বৈরাগী। কার সাধা তার ওপর কথা বলে। না না, ঘরের কথা এখন কিছুতেই বৈরাগীব কাছে বলা যেতে পারে না। না খেয়ে মরলেও না...অনেক ভেবে চিন্তেই দুর্গা সংকল্পে দৃঢ় থাকে।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে মনকে বাঁধা গেলেও পেটকে বাঁধা যায় না। অপ্রতিহত গতিতে চলে তার তাড়না। দুটি অপগণ্ড নিয়ে সংসার। একটি মুখ বুজে থাকলেও আর একটি তা পারে না। তার চাই ঘুম থেকে উঠেই বাটি ভর্তি গুড়-মুড়ি—খালা ভর্তি ভাত। ধরতে গেলে নিজের কথাটাই বা কম কি? দিনান্তে সামান্য কিছু মুখে না দিলে বাঁচা যায় কি করে? আর আজ ওই যদি না বাঁচে তা হলে ময়নার কি গতি হবে? কিন্তু সামান্য যা চাই তাইবা আসবে কি করে? বামকান্ত বলছিলেন কোন ভয় নেই। দরকার হলেই যেন ঠুকে জানানো হয়। বেশ, সেই ভাল, ঠুকেই মনের কথা খুলে বলব। শুনেছি, কুমার বাহাদুরের কাছে গুর খাতির আছে। যদি আব ঝিছু টাকা নিয়ে দিতে পারেন উনি।...

সন্ধ্যার পর বামকান্ত আসে। আনন্দ গিয়ে ডেকে আনে। বড় ঘরের দাওয়ার ওপর একখানা জলচৌকি টেনে ওকে বসতে দেয় দুর্গা। গলবস্ত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। আনন্দ আলসের আগ্রহে যত্ন করে এক ডিলুম তামাক সেজে দেয় তাড়াড়াড়ি। খশীতে ডগমগ বামকান্ত। ফুরক্ ফুরক্ শব্দে হুকো টানতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতে অনেকদিন ও মণ্ডল বাড়িতে এসেছে। কিন্তু সে শুধু মধুর সঙ্গেই বাক্যালাপ। দুর্গার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পায়নি। ঘোমটার আড়ালে যেটুকু দেখেছে তাতেই মনে হয়েছে—দুর্গা পিরমাসন্দরী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওর আচার ব্যবহার। মধু মরেছে সেও প্রায় মাস কয়েকের কথা হলো। কিন্তু শ্রদ্ধা শাস্তিতেও ওর মুখখানা ভাল করে দেখা যায়নি। আজ সেই দূরের দুর্গা স্বেচ্ছায় কাছে এসেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। এখন আব ওর সেই আড়ষ্টতা নেই। মুখ ফুটেই বলতে হবে মনের কথা...ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে এক ঝলক তাকায় বামকান্ত। মনে হয়, একদা শহর জীবনে যাদের কৃত্রিম জলুস দেখে ও মুছাঁ গিয়েছে দুর্গা তাদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী সন্দরী। হ্যাঁ, দুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।.....

প্রণাম করে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গা। ঘরের বউ, কোনদিন বাইরের

কোন পুরুষের কাছে মুখ খোলেনি। আজো পারে ন্ন। কি করে কাঙালের মতো ভিক্ষা মাগবে?—দুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।.....

কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখ তুলতেই রামকান্তর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে জিক্সেস করে রামকান্ত, তোমার কি কোন কথা আছে বোঁমা? আমাকে আবার এঙ্কনি হরিসভায় যেতে হবে।

দাম দিয়ে জর ছাড়ে দুর্গার। পোমটাটা আর একটু টেনে বলে, হ্যা, আপনারে একটা কথা কইবার চাই।

বেশ বেশ, বলো। আমি তোমার ঘরের লোক—আমাকে আবার অতো সংকোচ কিসের? রামকান্ত আবার এক বলক চোখ তুলে তাকায়।

দুর্গা আপন মনেই হোঁচট খায়। গোসাই ঠাকুর বলে কি গা! এবে দেখছি খাটি কোলকাতার কথা। বড় মামার ছেলে গদাইদাও এমনি কথাবার্তা বলতেন। সাতবছর কোলকাতায় ছিলেন গদাইদা। বেশ মিষ্ট করে কথা বলতেন। কিন্তু বার বার অমন মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন উনি। ...দুর্গা রামকান্তর কথায় সাড়া দিতে পারে না।

রামকান্ত ওকে নিরন্তর দেখে আবার তাড়া দেয়, কই, কি বলবে বলো।

দুর্গা এবার সংকোচের সঙ্গেই মুখ খোলে, আপনার লগে একটা পরামশু আছে ঠাকুর মশয়।

বেশ তো বলো?

দুর্গা তবুও সহজ হতে পারছে না দেখে রামকান্ত বুঝে নেয়, নির্বোধ আনন্দটার সামনে হয়তো ও কিছু বলতে চায় না। তাই আনন্দকে তাড়াবার জগ্গই ফন্দী আঁটে, ওরে আনন্দ, একবার দেখে আয় তো কীর্তনের লোক সব জড় হয়েছে কি না? আমার তো দেখছি যেতে একটু দেরিই হবে।

কলকে প্রসাদের জগ্গ কাছে বসে আঁকুপাঁকু করছিল আনন্দ। কিন্তু রামকান্ত ওকে সেদিক থেকে কোন স্নযোগ না দিয়ে তাড়াতে চাচ্ছে দেখে মনে বড় কষ্ট পায়। বার বার ফ্যালফ্যাল করে হুকোটার দিকে তাকাতে থাকে।

চতুর রামকান্তর পক্ষে আনন্দের মনের কথা বুঝতে দেরি হয় না। হুকোর মাথা থেকে কলকেটা নামিয়ে দিয়ে বলে, নে, দুটো টান দিয়ে যা।

আনন্দ তাড়াতাড়িতে দুটো টান দিয়েই ঠোট উঠায়, কিছুই রাকেন নাই দেবতা। কথাতেই আছে, “বাহুর চোষা নারকল আর বামন চোষা হুকা”, অর মগ্গে আর কিছু পাইবা না।

হাঁসে হাঁস, আর এক কণ্ঠে সেজে ধ্যেয়ে যা, হাসতে হাসতেই রামকান্ত জবাব দেয়।

আনন্দ তাই হয়তো সাজতো। কিন্তু দুর্গার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতেই বলে, না দেবতা, আমি এখন যাই। খবরটা লইয়া আহি।

আনন্দ চলে যায়। রামকান্ত একটু নড়েচড়ে বসে। একটু ইতস্ততঃ করেই জিজ্ঞেস করে, ময়না কোথায়? আর এক কণ্ঠে তামাক হলে সতি বড় ভাল হতো। তামাক না হলে মাথায় বুদ্ধি খোলে না।

দুর্গা ঘোমটার ভেতর মুখ রেখেই বলে, ময়না গেচে অর সইয়ের বাড়ি। এখনই আইহা পড়ব। তা আমিই সাইজা দেই।

তুমি তামাক সাজবে। না না থাক, দরকার নেই, বাধা দেয় রামকান্ত।

দুর্গা বলে, হার লেইগা কি? - আপনে একটু বহেন।

আনন্দের ঘরের দাওয়ার ওপরই রয়েছে সাজসরঞ্জাম।

দুর্গা বিনা দ্বিভাষ গিয়ে সাজাত থাকে। রামকান্ত ভেবে পায় না, কি ওব গোপন পরামর্শ। যে মাহুষ ভুলেও কোনদিন ঘোমটা খুলে মুখোমুখি হয়নি সেই মাহুষ একা বাড়িতে ডাকছে, তাও আরার রাতের বেলায়, বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

ভাববার বেশীক্ষণ সময় পায় না রামকান্ত। দুর্গা কণ্ঠেতে হুঁ দিতে দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। আঃ, কি উজ্জল দেখাচ্ছে ওর চলচলে মুখখানা। রামকান্ত সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে নিতে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না দুর্গা। দৃষ্টি দিয়ে রামকান্ত যেন ওকে ঞ্চংটো কুরে দেখছে। বড় লজ্জা পায়। হুকোটা তাড়াতাড়ি রামকান্তর হাতে দিয়ে ঘোমটাটা আরো একটু বড় করে টেনে দেয়।

রামকান্ত হয়তো কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়। ডেকে এনে কেন এ অপমান? ওকি যেচে এসেছে কারো কাছে? না না, বুদ্ধির ভুল। গংয়ো বউ-লজ্জা তো একটু থাকবেই। আমাকে ও অপমান করলে যাবে কেন? আপনজন ভেবেই না এমন নিরালায় ডাকতে সাহস পেয়েছে।

হুকো টানতে টানতে বুক বল পায় রামকান্ত। আবেগ নিয়েই বলে, কি বলবে বলা নাগো গিন্নী?

গিন্নী। বলে কি গোঁসাই ঠাকুর! না, এভাবে একা বাড়িতে ওঁকে ডেকে আনা ভাল হয়নি। আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। ময়নাটাও যে সেই কখন গিয়েছে কিববাব নাম নেই। ভয় হতে থাকে দুর্গাব।

ওকে নিকন্তব দেখে বামকান্তও ভাবনায় পড়ে। সম্বোধনটা হয়তো একটু বের্ফাসই হয়েছে। তাই তাডাতাডি স্তম্বে নিয়ে বলে, আমাব তো দেবি কবা পোষাবে না বউ-গিন্নী। যা বলবে শিগগীব বলে।

গিন্নী শব্দের বাম তটে আব একটা শব্দ যোগ হতেই দুর্গা নিজেকে অনেকটা নিবাপদ মনে কবে। একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তেই বলে, কইছিলাম কি— আমাব একটা উপুকাব কবণ লাগব আপনাব।

বিলক্ষণ, তা এতে এত সংকোচব কি আছে? কি কবতে হব বলোই না?

ভবসা পেযে দুর্গা সোজাহুজিই উত্তব দেয, দবব কতা আব আপনাবে কি কম্। হাতে একটাও পযসা নাই। তাই কইচিলাম, দযা কইবা যদি কুমাব বাহাদুবব কাচেব খেইকা কিছু কজ লইযা ছান।

এ আব এমন কি শব্দ কাজ। তবে উনি কাছাবিতে নিজ্ উপস্থিত না হওযা পর্যন্ত নাযেব গোমস্তাব কাছ থেকে কিছু হব না। তা পাঞ্জিতে যা লিখেছে তাতে জল এবাব তাডাতাডিই এসে পডবে। বোশেখব প্রথম দিকেই হয়তো গ্রীনবোট ঘাটে এসে লাগবে।

বৈশাক মাস। হাবত এহনে অনেক দেবি। দুর্গাব কণ্ঠে বিন্ময়েব সুব।

তা তোমাকে বেশী কিছু ভাবতে হবে না। এ কদিন আমি বা হোক করে চালিয়ে নিতে পাববে।

আপনে চলাইবেন! আপনাব ত খুব কষ্ট অইব।

আমাব আর তোমবা ছাড়া আছে কে। তোমাদের দিয়েই তোমাদের করবো। আচ্ছা এই আধুলিটা এখন বাধো। সন্ধে তো আব বেশী কিছু নেই, কাল আবার দেখা যাবে।

না না, আইজ আমাব না অইলেও চলব। আপনে ছাহেন, দুই একদিনের মধ্যে আর কোন ব্যবস্থা অয় কিনা।

এখন আর অল্প কোন ব্যবস্থা হবে না বউ-গিন্নী, আধুলিটা তুমি বাধো। ছেলেপুলেরা এসে পড়লে আবার লক্ষ্য পড়বে, হুকো হাতে উঠে গিয়ে

দুর্গার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় রামকান্ত আধুলিটা। কোমল স্পর্শে সারা অঙ্গে
চলে বিদ্যায় শিহরণ।

দুর্গাও থ বনে যায়। ভাবতে পারেনি রামকান্ত এরকম করবে। আধুলিটা
হাতে করেই চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে রামকান্ত, তোমার কোন দ্বিধার কারণ নেই।
কর্জ পেলে তুমি না হয় এ পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে।

যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আজ সেই কাজই দুর্গাকে করতে
হয়। তেজ দেখিয়ে রামকান্তকে পয়সা আট আনা ফিরিদে দেওয়া যায় বটে কিন্তু
তাতে ওর নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কারো কোন ক্ষতি হবে না। রামকান্ত
ছাড়া ধাবে কাছে এমন কেউ নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়।
রাত পোহালে তিনটে প্রাণীর মুখের গ্রাস ওকে যোগাতে হবে। হাতে একটা
পয়সা পর্যন্ত নেই। মেয়েমানুষ এর চেয়ে আর কি করতে পারে? পয়সা
এমন চীজ যে চাইতে গেলে আত্মীয়ও পর হয়ে যায়। সেই ভাল, কজ
পেয়ে রামকান্তর এ ঋণ ও স্বপ্নে-আসলে শোধ করে দেবে।...মনে মনে চিন্তা
করে খোলাখুলিই বলে দুর্গা, জাহলে খাতায় লেইখা রাখবেন। কুমার-বাহাজুরেব
টেকা পাইলে আপনারে দিয়া দিমু।

রামকান্তর মনে খুশীর বান্ ডাকে। নিজের মনের মতো করেই ভবিষ্যতের
ছবি আঁকতে থাকে। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠেই বলে, বেশ লিখে রাখবো। তবে
জানো কি বউ-গিন্নী, সংসারে শুধু পয়সাটাই বড় নয়। দেবার এরং নেবার
আরো অনেক কিছু আছে।

সহজ কথা সহজভাবে নিয়ে দুর্গা উত্তর করে, তাইত কই ঠাকুর মশয়.
কোতায় আপনারে দিমু—তা না আপনার কাছেই হাত পাতলাম।

নারায়ণ জানেন, তোমার হাত যেন আমি ভরে দিতে পারি।

হেই আশীর্বাদই করেন ঠাকুর মশয়।

আশীর্বাদ, নিশ্চয় আশীর্বাদ করবো। তোমরা ছাড়া আর আমার আছে
কে সংসারে? আজ উঠি তাহলে। মোড়ল হয়তো আমার জন্ত হাঁপিয়ে
উঠছে। কাল আবার আসবো।

উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

দুর্গা হাত বাড়িয়ে হুকোটা নিতে যায়। আর একবার চোখাচোখি হয়
রামকান্তর সঙ্গে।

চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নিঃসীম অন্ধকার। কেরোসিনের অভাবে কুপি জ্বালা হয়নি। আকাশে শুধু লক্ষ তারার বলমলানি। সেই ক্ষীণ আলোতেই সলজ্জ ছুটি কালো হরিণ চোখ পঞ্চশর হানে রামকান্তর মনন-মনে। চলতে গিয়েও চলতে পারে না রামকান্ত। ধমকে দাঁড়ায়।

দুর্গা হুঁকোটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবতার পায়ের ধুলোঁ মাথায় নিতে থাকে।

তীরবিদ্ধ রামকান্ত ধীবে ধীরে ওর পিঠের ওপর হাত ঝুলিয়ে যায়।

গঞ্জের পারে ভাঙন লেগেছে। সহসা বিরাট একটা চাপ ধসে পড়ে বংশীর ফলে। শব শুনে চমকে ওঠে রামকান্ত। আনন্দকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। রামকান্ত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় বৈবাগী বাড়ির দিকে।

৭

॥ ১৬ ॥

প্রবান আছে, 'রেস' আর মদেব পয়সা ভূতে যোগায়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে হয়তো এই দাঁড়ায়, নেশামাত্রই তাই। মদের চেয়েও মাতাল করা মৌতাতে উন্নত রামকান্ত। হিসেব করে দেখতে গেলে নিজের পেট চলাই ওর পক্ষে দুষ্কর। নিয়মিত ভাগবত পাঠ আর পূজা-পার্বন করে যে অর্থ হাতে আসে তা দিয়ে কোনরকমে পেট চলতে পারে—নেশা চলে না। তাই নেশার পয়সা বোধ হয় রামকান্তকেও ভূতেই যোগায়।

রামকান্তর চোখে বড় নেশা দুর্গা। সেদিন সেই যে সন্ধ্যাবেলা দুর্গাকে মুখোমুখি দেখে এসেছে এ পর্যন্ত আর ভুলতে পারেনি। গাঁজার নেশাও সময় সময় ফিকে হয়ে যায় দুর্গার চড়া নেশার কাছে। শয়নে স্বপনে ধ্যানে দুর্গাই ওকে অহোরাত্র পাগল করছে।

প্রেম-পাগল রামকান্ত ইতিপূর্বেও বার কয়েক হয়েছে। প্রথম পাগল করে চিত্রতারকারা—টেকশোর যৌবনের সে এক পরম সন্ধিক্ষণ। তারপর চা-বাগানের স্বাস্থ্যবতী খাসিয়া মেয়েরা। ছিটে ফোঁটা আরো অনেকেই করেছে। কিন্তু এই বিপত্তীক জীবনে দুর্গাই ওকে প্রাণে মারছে। তিল তিল করে তুঁষের আঙুনে পুড়িয়ে মারছে ওকে দুর্গা।

আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় রামকান্তর জীবন-ভর সমস্তা। বর্তমান আয়ে পেট পুরে ডাল ভাত তর্রি-তর্রকারি খাওয়া চলে, নেশা চলে না। কিন্তু রামকান্ত



কায়দাকাহ্নন করে সে নেশাও এপর্যন্ত বজায় রেখে চলেছে। নিদেন দৈনিক এক দু'আনি পরিমাণ গাঁজা ওর চাই-ই। ছপূরের আহ্বারের পর একমাত্রা আর বিছানায় যাবার আগে আর-এক মাত্রা। না খেলে পেট ফুলে ঢোল হবে। সারারাত ঘুমই হবে না। শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে এখনো এ ঠাট বজায় আছে। অল্পপানের আধ সের টাক দুধও ঠিকমতোই বরাদ্দ আছে। প্রতিদিন ভাগবত পাঠে বসবার আগে কুহুম বেশ ঘন করে জ্বাল দেওয়া একবাটি গরম দুধ হাজির করে। সেটুকু চুমুক দিয়েই ও পাঠে বসে।

বেশ আছে রামকান্ত। রমেশ্বর নারায়ণ উপস্থিত থাকলে দু' একপাত্র রঙিন পানিরও অভাব হয় না। সঙ্গে এটা-সেটা স্নানার্থে ভোজ্য বস্তু। দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিন্তু কাল হয়েছে দুর্গা। কি ক্রম্বে যে ওর সঙ্গে দেখা হলো— এখন দিয়ে থুয়ে কুল নেই। ধার কর্ত্ত করে এ কদিনের ভেতর খুব কম করেও পাঁচ টাকাব ওপব দিতে হয়েছে। পাড়া গা, চাইলে এখানে এক সের চাল কর্ত্ত পাওয়া যায়। কিন্তু একটা ফুটো পয়সা কারো কাছে পাওয়া যায় না। নগদ পয়সার বড় কাণ্ডাল এখানকার মাভ্রষ। তবু রামকান্ত যাহোক করে এ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। বরাদ্দ গাঁজার পয়সায় দিন দুই টান পাড়েছে।

অনেক দিনের নিয়মিত অভ্যাস ছেদ পড়ায় রাত্রে ঘুম হয়নি—পেট ফুলে উঠেছে। তবু দুর্গাকে চাহিদা মতো পয়সা না দিয়ে পারেনি। দুর্গাও সরল মনেই সে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে—। এক এক করে দিন গুণছে। ঘাটে জল আনতে গিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে কাছাবির দিকে। গ্রীনবোটি ঘাটে লাগলেই ঋণ পাবে। একদিনে শোধ করে দেবে রামকান্তব সমস্ত ধার দেনা।...

স্বপ্ন রামকান্তও দেখছে। দুর্গাকে ঋণ নিয়ে দিতে পারুক আর না-ই পারুক, নিজের জন্ত অস্ততঃ কিছু আদায় করতে পারবেই। আর তা যদি পারে তাহলে একদিন রাতের অন্ধকারে সরে পড়বে এখান থেকে দুর্গাকে নিয়ে।... কিন্তু একি হচ্ছে! চোত মাস যে শেষ হতে চললো, জল এক বিন্দু বাড়ছে না। গ্রীনবোটি ঘাটে না লাগলে যে আর একটা পয়সাও পাবার উপায় নেই। এখন তো ঘাটে পথে বার হওয়াই দায় হয়ে উঠলো। দু'চার আনার জন্তই লোকগুলো অস্থির করে তুলছে। পাড়া গাঁয়ের ভূত না হলে এমন কখনো হয়! শহরের লোক তো দু'চার আনাকে গ্রাহের মধ্যেই আনে না। তাগাদা করা তো দূরের কথা সামান্য এ পয়সা ঋণের মধ্যেই ধরে না কেউ।

না, এ হতভাগা দেশ থেকে পালাতেই হবে। ভদ্রলোক কেউ কখনো এখানে থাকতে পারে?—রামকান্ত দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

হু'রাত্র ঘুম নেই রামকান্তর চোখে। মাথার শিরাগুলো সব ফুলে উঠে নন্দন করছে। চোখ কান দিয়ে যেন আঙুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে হাতে পায়ে জল দিয়ে আসে রামকান্ত। না, তবু স্বস্তি নেই। শহর জীবন ছাড়ার পর দুখ কলার অভাবে বে কালনাগিনী কিম্বিয়ে পড়েছিল আজ আপনার তার ফোস-ফোসানি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কণা তুলেই জেগে উঠছে নাগিনী। রমেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ইয়ার্কি আড্ডায় মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙলেও এতদিন বহিঃপ্রকাশের পথ ছিল না। আজ দুর্গাই ওকে সে স্তম্ভ পথেব সন্ধান দিচ্ছে। কেন ও ওকে নিভূতে ডেকে পাঠালো? কেন হাত পেতে দাহায্য চাইলে ওর কাছে? ওকি জানে না, রামকান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ! অর্থের তাড়নায় চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে শহর ছেড়ে এই নরকে। অর্থ-ই যদি থাকবে তাহলে কি দরকার ছিল ওর আত্মাকে বঞ্চিত করে এই ভগামী কববার? স্বর করে ভাগবত পড়লেই যেন মানুষের সব কামনা বাসনা ধুয়ে মুছে যায়! না না, মিথ্যা এই ভাববিলাস। কেউ আনন্দ পেলেও ওর এতে কোন আনন্দ নেই। ও কখনো চায় না ফোটা তিলক কেটে সং সাজতে। হাতে পয়সা থাকলে রমেন্দ্র নারায়ণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ও।...

দুর্গার মোহে আচ্ছন্ন থাকলেও এতদিন ভাগবতের আসরে না গিয়ে পারেনি রামকান্ত। নয় তো চলবে কিসে? হু'চারটে পরসা তো ওখান থেকেই আসে। চোখ বুজলে ভেসে ওঠে দুর্গার প্রতিমূর্তি। রঙিন পাখা মেলে দুর্গাই ওর ধ্যান ভাঙে। ভাগবতের ঠাকুর বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তবু ওকে মিথ্যা ভাব-গদগদ-চিত্তে বসে থাকতে হয়। তবু কীর্তনের তালে তালে হু'বাহ তুলে নাচতে হয়। ও যেন এক কলের পুতুল।...না, রামকান্ত আর পারে না। সত্যি সত্যিই বোধ হয় অস্থস্থ হয়ে পড়ল ও। দিন দুই আর আসরে যেতে পারে না। রুটিয়ে দেয়, কষ্টনালীতে ভীষণ যন্ত্রণা—চেষ্টাতে পারবে না। সংবাদ পেয়ে শিষ্যেরা দলে দলে ছুটে আসে। যে যেভাবে পারে প্রভুর সেবায় মন দেয়। রামকান্ত এক জালা থেকে আর-এক জালায় পড়ে। তবু যদি নগদ হু'পাঁচটা টাকা কেউ হাতে দিতো! ওর কি হু'দণ্ড একা থাকারও অধিকার নেই?—আবার ভাবে, আস্থক সকলে। ওদের সঙ্গে একদিন হয়তো দুর্গাও আসবে। হয়তো নিভূতেই

আসবে। এত করছি, সামান্য এটুকুও কি করবে না ও ? কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন বস্তু নেই সংসারে ?...বিছানায় শুয়ে নিশিদিন ছটকট করতে থাকে রামকান্ত। রুগ্ন না হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার যে কি জালা তা শুধু ও নিজেই জানে। কিন্তু কই তিন দিন হয়ে গেলো, দুর্গা তো একবারও এল না ! তবে কি শুধু পয়সার সন্ধেই ওর সন্ধ ? না না, দুর্গা কখনো এতটা স্বার্থপর হতে পারে না। হয়তো কোন অন্নবিধা আছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই হবে। নয় তো চুপি চুপি রাজের অঙ্ককারেই বা ডেকে পাঠাবে কেন ? ক্ষেপ্তিটা তো কোটনামীর তালেই আছে। নিজের ছিদ্রের অভাব নেই তবু অষ্ট-প্রহর ব্যস্ত অস্ত্রের ছিদ্র খুঁজতে। নচ্ছারটা আস্ত ছেনাল। দুর্গার পেছনে লেগেই আছে।...শুয়ে শুয়ে শিরদাঁড়া ধরে যায় রামকান্তর। নিবিবিলিতে একটু উঠে বসে। এখন আর কেউ আসবে না। গৈয়ো ভ্রতগুলো কীর্তনে মেতেছে। রামকান্ত নিশ্চিত মনেই উঠে বসে।

কৃষ্ণ-চতুর্দশী। রাজির হয়তো মধ্য-প্রহর। চারদিক জুড়ে থমথম করছে ঘন অন্ধকার। সমস্ত চর নিরুন্ম নিস্তব্ধ। গঞ্জের দোকান পাটও সব বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে দোকানীরা। চব্বল্লাকে চোখেই পড়ে না। অন্ধকার ভৈরবী গিলে ফেলেছে যেন। রামকান্তব বৃকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জীবনে পেলো কি ও। সবই যে অন্ধকার ! সংসারে কে আছে ওর আপন জন ? দু'দিন না হয় ভান করে শুয়ে আছে। আর ভানই বা কেন ? দেহের না হলেও মনের অস্থখ তো বটেই। কিন্তু কে দেখলে ওকে ? দীহু বৈরাগী আর ওর ঐ সাক্ষপাক্ষরা ? কি জানে ওরা ? ওরা তো জানে শুধু চাব-আবাদ করতে আর খেতে শুতে। হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি ওদের ?... দু'দিন পেটে ভাত পড়েনি রামকান্তর। মাথাটা বোঁ করে পাক দেয়। উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ে।

বসন্তের বাতাস ধীরে বইছে। খানিক জিরিয়ে নিয়ে খিল খলে বেরিয়ে আসে রামকান্ত দাঁওয়ার ওপর। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আরো খানিকক্ষণ। দু'চোখ জলে ভরে আসে। পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন গিলে খেতে আসছে চারদিক থেকে। না না, ও মরবে না—মরতে পারবে না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মণ্ডল বাড়ি। পৃথিবীতে আর কেউ না থাক ওর দুর্গা আছে। দুর্গার কাছেই যাবে ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো দুর্গা হাত ছানিতে ডাকছে। দুর্গা—দুর্গা—

একসঙ্গে মগজের পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে রামকান্তর। দ্রুত পা
 চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে। কিছুটা যেতেই গতি মন্থর হয়ে আসে।
 ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছের আড়ালে? কেউ কি পেছ নিলে ওর?
 চুপি চুপি বসে পড়ে কাশ বনের অন্ধকারে। একটা কেউটেই না শেষে
 ছবলে ধায়। ঊঁকি দিয়ে দেখে রামকান্ত। না না, ও কিছু নয়। মরা
 কলাগাছ একটা। ঐ তো হাওয়ায় তুলছে শুকনো পাতা। আবার উঠে
 পা চালায়। এবার আর হন্থনিয়ে নয়। পা টিপে টিপে মণ্ডল বাড়ির
 চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ে। ঐ তো দুর্গার ঘর! চেউ টিনের চাল, বেড়া।
 বাড়ির ভেতর এই একখানা ঘরই পাকা। মেয়ে নিয়ে এই ঘরেই শোয় দুর্গা।
 কলার ঝাড়কে আড়াল কবে উত্তরের জানালায় এসে দাঁড়ায় রামকান্ত। যুট-
 ঘট করছে অন্ধকাব। হায়, চাঁদও যদি উঠতো আকাশে! না, ভগবান সব দিক
 থেকেই বিরূপ। দুর্গা—দুর্গা, ডাকবে কি ওকে? মেয়েটা তো অঘোরেই
 ঘুমোচ্ছে পাশে। ডাকলে কি সাড়া দেবে না? যদি বলি, মুঠো ভর্তি টাকা
 এনেছি, তবুও কি না?...ওকি! ওদিকটায় অতো কুকুর ডাকছে কেন? শেয়াল
 গাড়া করছে বৃষ্টি। যদি এদিকটাতেই এসে পড়ে? এত চেষ্টামেচিত্তে কি আর
 কারো চোখে ঘুম থাকবে? আনন্দটা একটা আস্ত গৌয়ার। চোর বলে ঠেসে
 ধলেই গেছি।...বুকুর ধুকপুকানী বেড়ে যায় রামকান্তর। পা টিপে টিপে ঝড়ের
 গাদায় এসে গা ঢাকা দেয়। থাক, কেউটেই ছবলে থাক। ছি ছি ছি, এমনও
 মানুষের হয়। যার জন্ত মরছি সে তো কিছুই জানলে না। সাহস থাকলে স্পষ্টই
 তো বলা যায় দুর্গাকে। নিভতে যে ডাকতে পেরেছে তার সম্বন্ধে এর চেয়ে আর
 বেশী কি ভাবা যায়? আমিই আহাম্মক তাই আঁকুপাঁকু করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ,
 কাল স্পষ্টই শুনিয়ে দেবো, টাকা যদি চাও তবে তার জন্ত বিনিময় দিতে হবে।
 তোমার জন্ত শুধু শুধু ভিখিরী সাজতে পারবো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
 টাকা উপায় করতে হয়। চাইলেই কারো কাছ থেকে অমনি পাওয়া যায় না।
 ...না না, এত ভাবনার কিছু নেই। মেয়েমানুষ হয়ে দুর্গা অনেকটা এগিয়েছে।
 শুধু টাকাই ওর কাম্য নয়। টাকা ধার ও চরের অনেকের কাছেই পেতো।
 নিজের স্বজাতি ফুটমের মধ্যেও রয়েছে অনেক টাকাতে মানুষ। তবু তাদের
 কাছে না গিয়ে আমাদের ডাকলে কেন? কি আশ্চর্য। এই সহজ কথাটাই
 এতদিন মাথায় আসেনি।...ঝড়ের গাদায় মুখ গুঁজে আকাশ-কুসুম ভাবতে থাকে
 রামকান্ত। কিছুক্ষণ যেউ-বেউয়ানীর পর পাড়া আবার শান্ত হয়।

রামকান্ত নিঃশ্বাস ফেলে মুখ বার করতে যাবে এমন সময় কানে আসে, এই মইনী, বাইরে যাবি নাকিল ? ওঠ না—এই মইনী ?...কুকুরের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গার। গা-টা কেন যেন ছম্‌ছম্ করতে থাকে। ঘুম জড়ানো চোখে কিসের যেন খস্‌খস্ শব্দ শুনেছে বাইরে। অতদিন তাই একা একা বেরুলেও আজ আর সাহস পায় না।

বিপদের উপর বিপদ রামকান্তর। মণ্ডল ঘাড়ের নিকাশের জায়গা খড়ের গাদার পাশেই। ওরা হয়তো এখানেই আসবে। ছায়ামূর্তি দেখে চীৎকার করে হয়তো গগন ফাটাবে। এদিকে আবার দেহের সবটা গাদার ভেতর সৈধোতে গেলেও প্রচুর শব্দ হবে। এখন করে কি ও ? না, এতদিনের পাপের ফল আজ হাতে হাতেই ফলবে। হাটুরে-কিলে গিঠের হাড়গোড় আর আস্ত ধক্কবে না।...ভয়ে ভাবনায় ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে রামকান্ত। দুর্বল দেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ খিল খোলার শব্দ হয়। রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। টেনে এক দৌড়। দুর্গাও খতমত খেয়ে যায়। এক পা মাত্র চৌকাঠে বাড়িয়েছে, চোখের ওপব দিয়ে দৌড়ে পালায় ছায়ামূর্তি। চীৎকার করতে গিয়েও কেন যেন পারে না ও। অন্ধকারের মধ্যেও ছায়ামূর্তির বাববি বাবরি লম্বা চুল ওর দৃষ্টি এড়ায় না। ছি ছি ছি, এমন মাহুঘও এমন হয়! ভাগ্যিস ময়না আসেনি! কুকুর ভেতরটা তোলপাড় কবতে থাকে দুর্গার। সারা রাত আব দু'চোখ এক করতে পাবে না।

॥ ১৭ ॥

সাদা মনে বিষের আঁচড় পড়ে দুর্গার। ছি ছি ছি, সন্তানের মা আমি— গুরু পুরোহিত রামকান্ত। নিত্য নিয়মিত ভাগবত পড়েন। কীর্তনের সঙ্গে অঙ্গ হুলিয়ে নাচেন। তাঁর এমন দুর্মতি! মাহুঘ কি এমন পশুও হতে পারে! কি চান উনি? শুধু সাহায্য করতেই কি চোরের মতো চুপি চুপি এসেছিলেন দুপুর রাত্রে। তাই যদি হবে তবে পালালেন কেন? আজ বুঝতে পারছি, কি ইঙ্গিত করতেন উনি চোখে-মুখে। আমাকে কি এ রকমই ভাবলেন? কি দেখলেন উনি আমার মধ্যে? গুরু পুরোহিত ভেবে নিভুতে দুটো স্মৃৎ-স্মৃৎের কথা বলাতে কি এতই অপবাধ হয়েছে?...ঠাকুর ঘরে

পূজা করতে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে দুর্গা। পেটের নাড়ীভূঁড়ি সব ঘেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ছি ছি ছি, এই মাহুঘের অন্ন আমি মুখে দিয়েছি—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি! নারায়ণ—দয়াময় আমাকে তুমি মার্জনা করে প্রভু। ময়না না থাকলে বংশীর জলে একুনি আমি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাম। আমাকে তুমি পথ দেখাও...পথ দেখাও... বার বার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে দুর্গা, বার বার ভুল হয়ে যায়। বিগ্রহের চরণে চন্দন দেয় তো তুলসী বাদ পড়ে।

সেই কোন সকালে মা পূজায় বসেছে তবু শেষ হচ্ছে না পূজা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ময়নার। নেই বলতে কিছু নেই ঘরে। আনন্দ তো অনেকক্ষণ ঘুরোঘুরি করে রাগের মাথায় চলে গেছে বাড়ি থেকে। না, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। উপোস দিয়েই যদি মরতে হয় তাহলে ভিটেয় গিয়েই মরবে। মিছিমিছি পরের বাড়ি থেকে দশজনের টিটকারি শুববে না।...

রোদ প্রায় মাথাব ওপর এসে পড়েছে—দুর্গা ঠাকুর ঘব থেকে বেরোয়। বেরিয়েই দেখে, খিদের জ্বালায় দাওয়ার ওপর আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ময়না। হয়তো অবশ হয়ে পড়েছে শিথিল দেহ! তর্গার বড় দুঃখ হয়। ময়নাকে কোলে করে বিধবা হয়েছে। সেই থেকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়েই চলে আসছে। একটি দিনের জন্মও ব্যতিক্রম হয়নি। তবু পেলো কি ও সংসারের কাছে? একটা মাত্র মেয়ে—উপোস দিয়েই তো মরতে চলেছে। মাথার ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে শেয়াল শকুন! এত পূজা অর্চনা ব্রত উপবাস সবই কি তবে মিথ্যে? ঠাকুর কি শুধুই পাথর?... ভরা দুপুরেও আঁথির কোণে ঝড় ওঠে দুর্গার। না না, ও কোন মাহুঘের সাহায্য চায় না। যদি দাঁড়ায় তো নিজের পায়ের ওপর ভর করেই দাঁড়াবে! নয় তো ডুবে মরবে ঐ বংশীর জলে। ময়নাকেও গলা টিপে মেরে রেখে যাবে! শয়তানের লালসার টোপ ও হবে না—হতে দেবে না।...মা হচ্ছে যদি দুটি ভাতই দিতে না পারলো তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?...আবার ভাবে, না, ময়নার ওপর ওর কোন অধিকার নেই। পরের ঘরের বউ ময়না। গায়ে হলুদ হয়ে খাবার পর আর বিয়ের কিছু বাকী থাকে না। কাল-অর্শোচ না থাকলে এখন ওকে পাঠাতে পারতো বৈরাগী বাড়িতে। চরে যত মন্দাই থাক দীঘ বৈরাগীর বেটার বউ কখনো না খেয়ে মরতো না। মরতে পারে না।...কিন্তু সে তো গেলো পরের কথা, এখন উপায় কি? ঘরে যে

একটা দানাও নেই। আনন্দটাই বা গেলো কোথায়? একটু যদি আঙ্কেল থাকে? নিজের আর কি, এক পেট খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ খেলে কি না খেলে ক্রক্ষেপ নেই। আমারই হয়েছে যতো জালা।...

জালা আনন্দরও। এতদিন শুধু পেটের জ্বালাতেই জ্বলছিল এখন আবার মনের জ্বালাও শুরু হয়েছে। দুর্গা ভেবে নিয়েছে, পেট ভর্তি খেয়েই রান্না-বাটে আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। কিন্তু খাবে কি? গর কি কিছু ছিল? গত বাতের ঘটনায় ওর হয়তো মাথারই ঠিক নেই। আনন্দ গিয়েছে গঞ্জে—খাবে যদি কারো কাছ থেকে কিছু আনতে পারে। বাড়ির সওদাগর তো দীর্ঘদিন ও-ই আনছে। দোকানীদের সঙ্গে চেনাশুনোও হয়েছে। চাইলে কি আর একদিনের জগু কেউ ধার দেবে না? কিন্তু অদৃষ্টের বোধ হয় এইটেই চরম পরিহাস, প্রয়োজনের সময় মানুষ কোথাও কিছু পায় না। আনন্দও পেলো না। কিন্তু ও যে সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খালি হাতে আজ কিছুতেই ফিরবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেই গঞ্জে এসেছে, দিদি যদি মেয়েমানুষ হয়ে দশদিন চালাতে পারে—তাহলে পুরুষ মানুষ হয়ে ও একটা দিন চালাতে পারবেই। চুরি, জুরাচুরি, ডাকাতি, তা সে যে-ভাবেই হোক। দোকানীরা একে একে ফেরাতে থাকে, আনন্দের জিদ বেড়ে যায়। সামনেই খালাস হচ্ছিল কেরোসিনের 'ফ্ল্যাট'। প্রায় পঁচিশজন মুটে কাজ করছে। টিন প্রতি মজুরি এক পয়সা। ফ্ল্যাট থেকে মাথায় কবে নামিয়ে মহাজনের গুলামে তুলে দিতে হবে। সর্দারকে বলে মাজার কাপড় শক্ত করে বেধে কাজে লেগে যায় আনন্দ। এক এক মোটে ও দুটো করে টিন নামাতে থাকে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে উপায় হয়ে যায় নগদ একটা টাকা। আনন্দের মনে খুশীর বান ডাকে। রোজ ও এ কাজ করবে। সকলের আগে যে দোকানদার ওকে কিরিয়েছিল বুকে টাকা মেরে তার কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো জিনিসের জগু জহুম করে! দোকানদারের স্বর পাটে য'য়। সদাই মাপার আগে একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয় আনন্দর দিকে। বলে, মোড়লের পো, বউনীর সময় ধার চাইলা তাই দিবার পারিনি। দরকার থাকে ত নিয়া যাও অহন।

না না, তোমাগ কাছে আর ধার চাই না। তোমরা চামার। ক্যামতা থাকে নগদ পয়সা দিয়াই জিনিস কিছুম, বিড়ি টানতে টানতে রক্ষস্বরে জবাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার গালখেয়েও আর রা করে না। হাসতে হাসতেই সওদা মাপতে থাকে।

আনন্দ আবার ধমক দেয়, মাপ ঠিক দিয় কইলাম। চাউলে য়ান্ কোন রকম গন্দ না থাকে।

এবার দোকানদার মুখ খোলে, আগে জিনিস খাইয়া তারপর কতা কইয়। হরি সা মাপে কাউরে কোনদিন ঠকায় না।

হ হ, অনেক সাউকারকেই ছাহা আছে। কত দাম অইল?—পান্টা জ্বাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার বলে, সাড়ে বার আনা। এই নেও চৌদ্দ পয়সা। জিনিস কিনবার অইলে এইহানেই আইহ। খাটি ওজন, এক নম্বর জিনিস।

আনন্দ পয়সা এবং সওদা গামছায় বেঁধে উঠতে উঠতে বলে, একটু ত্যাল দিবা নাকি? বেলা অইচে, একটা ডুব দিয়া যাইতাম।

দোকানী মুচকি হেসে বলে, ত্যাল তামুক দোকানীরা সর সময়েই গাহাকের লেইগা খরচ করে, এই নেও, বলতে বলতে এক পলা সরষের তেল আনন্দর হাতের তালুতে ঢেলে দেয় দোকানী।

আনন্দ তেলটুকু মাথায় ঠাসতে ঠাসতে বেরিয়ে আসে। ময়রার দোকান থেকে চার পয়সা দিয়ে আট খানা জিলিপি কিনে ফেলে। সঙ্গে একখানা কাউ। তারপর ঘাট থেকে পরিষ্কার করে হাত, পা, মাথা রগড়িয়ে একবারে স্নান সেরেই বাড়ি ফেরে। খুশীতে ময়নাকে ডাকতে যাবে, চেয়ে দেখে দাওয়ার ওপর ঘুমিয়ে আছে ময়না। দুর্গা জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেদনায় আনন্দর বৃকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। সকাল থেকেই দিদির যেন কি হয়েছে। কথা নেই—বার্তা নেই—চাঁপা ফুলের মতো মুখখানায় কে যেন এক শোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। ধমকেই দাঁড়ায় আনন্দ কলার ঝাড়ের আড়ালে।

দুর্গা করুণভাবেই চেয়ে দেখছিল ময়নাকে। কি স্বন্দর কচি মুখখানা। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি হরিণ চোখ। দেখলে মায়্যা হয়। কিন্তু কি বরাত নিয়েই না জন্মেছে মেয়েটা। সামান্য দুটি ভাত তাও জুটছে না। ক্ষেস্তি সেদিন গাল দিলে, রাক্‌সী—হাড়-হাবাতি। একে একে সব গিলছে। বাপ ঠাকুরদাকে খেয়েছ এবার মাকেও খাবে।...শুনেন বড় কষ্ট হয়েছিল সেদিন। কত আদরের ময়না, ও কিনা রাক্‌সী। এমন করে কেউ কাউকে গাল দেয়!...

কিন্তু আজ কেন যেন ওর নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, ময়না কি তাহলে সত্যি অপয়া? জন্মে অবধিই তো কপালে স্বথ হলো না। তবে কি...না না না, ও কেন অপয়া হতে যাবে? ঘাট বালাই। লক্ষ্মী মা মণি আমার! ক্ষেস্তি যদি আর কোনদিন এ-মুখো হয় তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।...ডাকবো কি ওকে? না থাক, ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে খেতে দেবো কি? তবুও তো দুদণ্ড শান্তিতে আছে।...কিন্তু সারাদিন তো আর ঘুমিয়ে কাটবে না। জেগে এক সময় উঠবেই, তখন? ছুটে ঘরের ভেতর যায়। ভক্তির ভরে প্রণাম করে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশে। তারপর খুলে ফেলে কাঁপি। সিঁছর মাখানো পাঁচটা টাকা রয়েছে। শাস্ত্রী ঠাকুরণ বলে গেছেন, মা লক্ষ্মীর কাঁপি যেন কখনো শুল্ল করো না। এতদিন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ও। শত অভাবেও হাত চোঁয়ায়নি। কিন্তু আজ যে ওর ময়না উপবাসী—ওর মাণিক—ওর নয়নের মণি। আজ ও কারো কথা রাখতে পারবে না! না-না-না।...ছুটে টাকা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার বাইরে ছুটে আসে দুর্গা। ভীষণ রাগ হয় আনন্দের ওপৰ। কাম কাজ তো কিছু করবেই না সময় মতো যে ছুটো ফাই ফরমাশ শুনবে তাও নয়। ইস্, বাছাব আমাব মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আহুক আজ, দূর করে দেবো।...

আনন্দ ভেবেছিল খাবার নিয়ে মনের উল্লাসে বাড়ি ঢুকবে। ময়নার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গান্ধগ হয়ে প্রথম উপার্জনের পরসায়-কেনা খাবার খাবে। কিন্তু দুর্গার তাবভাবে মনের সাধ মনেই চাপ পড়ে! শাস্ত্র-ভাবগন্তীর ভাবেই দাঁড়ায় কাছ খেঁবে এসে দাঁড়ায় আনন্দ।

এতগুলো জিনিসসমেত ওকে দেখে বিফারিত চোখেই প্রশ্ন করে দুর্গা, ই কিরে, এত-জিনিস তুই কোনহানে পালি?

আনন্দ সরল মাহুধ—সহজভাবেই উত্তর দেয়, কুখায় আবার পামু? পয়সা দিয়া কিনা আনচি?

কিনা আনচ্, কারা দিচে তরে পয়সা?

কারা আবার দিব? উপায় কইরা আনচি!

ইস্, উপায় কইরা আনচে! অরে আমার ক্যামতার মাহুধরে! ঠিক কইরা ক, কারা দিচে তোরে পয়সা? দুর্গার ভয়, রামকান্তই ওকে পয়সা দিয়েছে। কাল ফিরে গিয়ে শয়তানটা আজ আবার খাবার দিয়ে ভূলাতে চাচ্ছে। গলার স্বরে তাই তীব্র ঝাঁজ!

আনন্দ আর কথা বাড়ায় না। সোজাহুজ্জিই বলে ফেলে উপার্জনের ইতিহাস।

দুর্গার দেখে এতক্ষণ জ্বালা ছিল এবার দুঃখে দ্রব হয়ে যায়। এও ওর কপালে ছিল! আপন মার পেটের ছোট ভাই। ওদের অভাবের জন্ম আজ মুটেগিরি করলে! আর সেই পয়সাতে কেনা চাল ডাল ওকে গিলতে হবে!...

দিদির চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখে আনন্দের দু'চোখ দিয়েও অজান্তে জল গড়াতে থাকে! কে জানে, কতক্ষণ কাটতো এভাবে? ভগবানকে ধন্যবাদ যে চেষ্টামেচি শুনে ময়নার ঘুম ভেঙে যায়! হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে ময়না। একি! ওকি স্বপ্ন দেখছে নাকি? দু'দিন ভাল করে নুন ভাতও জ্বোটেনি—আর আজ জিলিপি! চাল, ডাল, তেল নুন এক-গাঙ্গা!...ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ময়না জিলিপির ঠোঁড়ার দিকে।

ময়না ভাল করে জেগে না উঠতেই আনন্দ চোখ পুঁছে নিয়েছে। স্বভাব স্নলভ চপলতা নিয়েই বলে, তর চক্ষে রাইত দিন খালি ঘুম। কহন খেইকা ডাকবার নৈচি ঘুমই ভাঙে না। নে, জিলাপি খা, তিনখানা জিলিপি একসঙ্গে ময়নার হাতে গুঁজে দিয়ে চূপ চাপ বসে থাকে আনন্দ।

চোখেব জল দুর্গাও পুঁছে নিয়েছে। ঝড় বইছে বৃকের ভেতরে। ধবা গলায় বলে, তুই খালি না?

দুর্গার সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আনন্দ পাণ্টা জিজ্ঞেস করে, তুমি?

আমার প্যাটটা বালো (ভাল) নাই, আমি কিছু খামু না।

তবে আমার প্যাটও বালো নাই, আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ? খাইয়া নে।

পাগলামী আমি করচি না তুমি করচ? গতর খাটাইয়া পয়সা উপায় করচি হ্যার আবার দোষ কি?

আনন্দের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দুর্গা ময়নাকে বলে, ষাত মা রান্দন ঘর খেইকা এক লোটা খাওয়নের জল নিয়া আয়!

ময়না ইঙ্গিত মাত্র উঠে যায়। দুর্গা আবার আরম্ভ করে, গতরই যদি খাটাবি তয় মৌটাগিরি করবার গেলি ক্যা? নিজ্জগ ক্যাভের কাম কল্পেই ত অয়। আটে বাজারে যদি মৌটাগিরি করচ তয় কি আর বৈরাগী মশয় তর বাগনীর লগে হ্যার পোলার বিয়া দিব? আমাগ বংশে কি কেউ কোনদিন মৌটাগিরি করচে?

খিদেয় পেট চো চো করছে আনন্দর। তাই আর বেশী কোন কথা না
বাড়িয়ে গম্ভীরভাবেই সম্মতি জানায়, তা তুমি যদি মানা কর তয় না কলাম।

হ, ও কাম আর করবি না। লোকে নিন্দা করব।

কাম করম না তয় খাইবা কি ?

হ্যা ভাবন' আমার। তুই এহন খা।

তয় তুমিও খাও।

নাবে, আমি এহন কিছু মুখে দিবার পারম না।

খুব পারবা। নইলে আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ। খাইয়া নে না ?

হ, আমি পাগলই। তুমি এহন খাইবা নাকি খাও। কইলাম ত, এহন
খেইকা ক্ষাতের কামই করম।

তাই কর আনন্দ। তুই কাম করলে আমাগ আবার দুখ্য কি ?

করম—করম—করম। তুমি এহন হাঁ করত, আনন্দ একটা জিলিপি তুলে
নিয়ে একরকম জোর করেই দুর্গার মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে।

দুর্গা দাঁত চেপে থেকে বাধা দেয়, তুই রাখ, আমি পরে খামুনে।

আনন্দর মেজাজ এবার সপ্তমে গিয়ে ওঠে, বালো অইব না কইলাম। না
খাও ত আমি সব কাউয়ারে (কাককে) দিয়া দিমু।

দুর্গা আর আপত্তি করতে পারে না। ধীরে ধীরে মুখ নাড়তে থাকে।
মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় ওর।

॥ ১৮ ॥

অসময়ের জল ঝড়ে রবিশস্ত নষ্ট হয়েছে। তারই জের চলেছে ভাগারে—
চাষ আবাদে। অভাব অনটন শুধু বিধবা দুর্গার সংসারেই নয়। ছোট বড়
চরফুটনগরের সব চাষীর অবস্থাই প্রায় সমান। শুধু চরফুটনগরই বা কেন ?
চরধল্লারও বিরাট ক্ষতি হয়েছে। অন্তপর দুবের কথা, পলানের মত চাষীও
মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ১৩৩২ সালে পাঁচ সাত টাকার পাট পঁচিশ ত্রিশ
টাকা দরে বেচে চরময় উঠেছে সারবন্দী ডেউ টিনের ঘর। টাকায় দুটো দর
কজলী আম, দু' তিন টাকা জোড়া ইলিশ মাছ খেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি।
হাঁড়ি ভর্তি দই, সন্দেহ, রসগোল্লাও খেয়েছে। তিনগুণ চারগুণ দরে নতুন

আবাদী জমি কিনতেও কোন বেগ পেতে হয়নি! নগদ টাকা হাতে কারো থাকেই না। তা না থাক, কি হবে নগদ টাকা দিয়ে? ওরা তো আর স্ত্রধোর নয় যে টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়াবে! টাকার খনি ওদের ক্ষেত-খামারে। মজার কসল পাট। একটু গতির খাটাবে কাঁড়ি কাঁড়ি করকরে নোট হাতে আসবে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকা। ভাবনার কি—চলমান টাকশাল ওদের হাতের মুঠোয়।।...

ভাবনার সত্যি কিছু ছিল না। এক বছরের পাটে দশ বছরের বকেয়া ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এই তো সবে শুরু। পৃথিবীর মানুষের চাই পাট। পাট-ই টাকা পাটই সমস্ত স্বখ-ঐশ্ব্যের উৎস। কি হবে ধান ফলিয়ে? এক মণ পাট বেচলে দশ মণ ধান উঠবে গোলায়। পাটের তুলনায় ধান তো বুনো বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ ওরা আর ধান বুনো জমি নষ্ট করবে না। পাটই বুনছে—পাটই বুনবে।।...

প্রবাদ আছে, অতি আশায় চাষা নষ্ট। চরধল্লা-চরফুটনগর সত্যি সত্যি আজ নষ্ট হতেই বসেছে। চাল, ডাল, তেল, হুন সব কিছুই কিনে খেতে হচ্ছে এখন। তা কিনে খেতেও আটকাতো না যদি না রবিশস্ত্র সমূলে বিনষ্ট হয়ে যেতো। রবিশস্ত্র থেকে কম টাকা ঘরে আসে না। মন্দার ক'মাস ও থেকেই চলে। মায় পাটের নিড়ানি পর্যন্ত। কিন্তু জল-ঝড়ই সব পণ্ড করলে। কে জানে, না খেয়েই মরতে হবে হয়তো।।...পাট চাষীর মনে স্ত্রধ নেই। দীহুর বাড়িতে প্রাত্যহিক হরিসভাতেও আর তেমন লোক জড় হয় না। সকলের মুখেই হা হতাশ। করিম ফাঁকরের বাড়িতে বিগত ধামাল উৎসবেও শিঘ্রা প্রাণথুলে যোগ দেয়নি। বেশ অনটন লক্ষ্য করা গেছে। পলানের গস্তি ছ' খানাও মাসেকের ওপর ঘাটে বাঁধা রয়েছে। কিন্তু চলাচলের টাকা নেই। পুঁজির সম্পূর্ণ-ই বাজানকে দিয়ে দিতে হয়েছে ওসমানের। পলান তাতেও কুল পাচ্ছে না। বৃহৎ সংসার। চালের খরচাই এক কাঁড়ি। তাছাড়া আছে তেল, হুন, কাপড়-চোপড়। চাষের যোগানও দিতে হচ্ছে আবার। সবে তো বীজ ছিটানো হয়েছে। এরপর আছে নিড়ানি, কাটাঁই, জাগ, ধোয়া, শুকানো। দফায় দফায় খরচা। ঋণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গঞ্জের নিতাই সাহা বড় মহাজন। লক্ষাধিক টাকার লগ্নি কারবাব। ১৩৩২ সালের পর বছরখানেক রীতিমতো মন্দা গিয়েছে। ১৩৩৩ সালে তো কারবাব একরকম বন্ধ বললেই হয়। গণেশ উর্গিটে চাষআবাদ

করবে ভাবছিলু নিতাই। সহসা চোখ খুলে তাকান মুখিক-বাহন। ১৩৩৩ এর রবিশস্ত ক্ষেতে পচেছে। চৌতিরিশের গোড়াগোড়িই আবার এসে ঋণের জন্ত ধর্বা দিতে থাকে চরের চাষী। নিতাইয়ের নাইবার খাইবার সময় নেই। ব্যবহারের অভাবে হুঁকোগুলো সব অকেজো হয়ে পড়েছিল। একদিকে খোল আর একদিকে নলচে। সবগুলোই আবার সচল হয়ে ওঠে। বামুনের হুঁকো, স্বজাতির হুঁকো, নমশূত্রের হুঁকো, মুসলমানের হুঁকো। সব কয়টির জাত আলাদা আলাদা। ভুলে কেউ কাউকে ছুঁয়ে দিলেই সর্বনাশ। গদিব বিছানাও টুঁরকমের। বাবু মশায়দের জন্ত ফরাস বিছানো ঢালা বিছানা আব খাতকেব জন্ত শুধু এক ফালি চট। স্থানাভাবে কেউ শানের উপর বসলেও নিতাইয়ের কিছু করার নেই। নিজের তাকিয়াটি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থাকলেই সে খুশী। টাকা ধার করতে এসেছে তার আবার কথা কি? আগে সেলাম বাজাও তারপর সোজা চটের ওপব বসো। ইচ্ছে হয় নিজের হাতে তামাক সেজে খাও। তা সে তুমি লাখ টাকার চাষীই হও আর চুনোপুঁটিই হও।

চটেই এসে বসে চরেব মানুষ। বাধাবমণ ভেঙার তমসুক লিখে কুল পায় না। পাট নিড়ানির আগে চকিশ ঘণ্টাব আঠারো ঘণ্টাই চলে দলিল লেখাব কাজ। নিতাইছাড়া গঞ্জে ছোটবড় আবোজনকয়েক হুদখোর আছে। রসিক ঘোষের পুঞ্জি মাত্র শ পাঁচেক। টাকা প্রতি মাসিক ছ' আনা দশ পয়সা হুদে প্রথম মরশুমেই হাতখালি করে লাগিয়ে ফেলেছে। এখন হুদের হার তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। কপাল চাপড়ায় রসিক। বউয়ের হাতেব জমানো দশ বিশ টাকা ও ছোট ছেলে মরণচাঁদেব একটা দুটো পয়সা কবে জমানো পাঁচ টাকাও লাগিয়ে ফেলে রসিক। সকলকেই বুঝিয়ে শাস্ত করে, যা দিলে তার দেড়া পাবে।...

দীলু করিম পোড় খাওয়া মানুষ। ভেবেছিল জীবনে আর ঋণ করবে না। মহাজন কি চিজ তা কাশীপুর থাকতেই টের পেয়েছে। কাশীপুর আর চরধল্লা তো ঘরের কাছে ঘর। হুনিয়ার সব জায়গাতেই হুদখোরদের এক বা। উপসী ছারপোকাই যেন এক একটি। কিন্তু তবু আসতে হয়। ঋণ করা বোধ হয় বিধাতা ওদের কপালে লিখে দিয়েছে। নিতাইয়ের চটের ওপর এসেই বসে দুজনে। প্রাপ্য সেলাম বাজাতেও কস্তর করে না। তামাক সেজে আর একজন চাষী হুঁকো করিমের হাতে তুলে দেয়। নেহার মাদকতায় ফুরুক ফুরুক শবে টানতে দেরি হয় না। তারপর খতে দস্তখত। দীলু করিম দুজনেই

তিনশ টাকা করে কর্জ করে। স্বেদ মাসিক টাকা প্রতি দু' আনা। মোড়ল বলেই কিছুটা খাতির করলে নিতাই। নয়তো এখন স্বেদের হার ঢের বেশী।

পলানের দায় শ'তে মিটবে না। কর্ম করেও হাজার তিনেক টাকা ওর দবকার। বড় ছেলে ওসমান কর্জ করতে রাজী নয়। পই পই করে নিষেধ করে সে বাজানকে। নিজেদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয় তাই হোক। ধার দেনা করে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে কাজ নেই।

পলান বলে, খাবড়াচ ক্যান বাজান? তর বাজানের কিছু অচিল্ না। সাহস কইরা কাম কাইজ করচিলাম বইলাই আইজ দুইডা পয়সা হৈচে। পাটের দর ইবারও গরম যাইব। যহন বালো যায় তহন (তখন) পব পর তিন চাইর সালই বালো যায়। মুগ কালাই গরে (দরে) উঠলে কি আর আমাগ দেনা করন লাগত?

হেইত কই, বরাত যহন ইবার মোন্দ তহন দাঁতে কামড় দিয়া থাকনই বালো, বাধা দেয় ওসমান।

পলান বলে, তর সাহস নাইরে বাজান। ব্যাটা ছাওয়ালের অত ভয়ডর করলে চলে? তিরিশ ক্যান কুড়ি টেকা দরে পাট বেচলেও কত টেকা গরে আইব কত?

স্বেদটাও একবার ইসাব (হিসেব) কইরা গাহ, আবার বাধা দেয় ওসমান।

আরে ধুংতর, স্বেদের মাথায় মারি লাখি। ও হালার (শালার) স্বেদ খোরের টেকা আমি বাছ-পাট বেইচাই দিবার পারুম। আর বোচ্চ না ক্যান, আন্লায় বুজি অগও কিচু দিবার চায়। স্বেদ খাওয়া ছাড়া ত ও হালাং আর কিচু করণের নাই। গুণায় মরব হালাং, বিরক্তি ফুটে ওঠে পলানের কর্ণে।

তা তুমি যা বোজ কর। ধার দেনা করণে আমার মত নাই, ওসমানও সমতা রেখেই জবাব দেয়।

আইছা—আইছা, তুই এক সন বইহা খাইকা গাখ আমি কি করি।

পরের হাটেই পলান আসে নিতাইয়ের গদি বাড়িতে। এতদিন বড় অস্বস্তিতেই কাটিয়েছে নিতাই। কে জানে, পলান ব্যাপারী আবার অল্প কোথাও থেকে টাকা নিয়ে বসলে কিনা? পলানকে টাকা দেওয়া মানে তো নিজের সিদ্ধুককে ধার দেওয়ার সামিল। এ হাট দেখে একদিন নিজে গিয়েই খোঁজ নিয়ে আসবে ভাবছিল নিতাই। তাই পলানের উপস্থিতিতে আশাতীত

খুশী হয়। অন্তান্ত খাতকরা নিজের হাতে তামাক সেজে খেলেও পলান্নের জগ্ন নিজের চাকরকেই হুকুম করে নিতাই। হুকোর জলটাও পালটিয়ে দিতে বলে। আপাব জানিয়ে বসে খোলা মনেই তামাক টানতে থাকে পলান্ন।

নিতাই গৌফের ফাঁকে হাসি টেনেই গগগদ কর্তে কুশল সমাচার জিজ্ঞেস করে। যেন কত আত্মীয়কুটুম এসেছে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাই পাঁচবার জিজ্ঞেস করে।

পলান্ন পরিহাস প্রিয়। সবই বোঝে। ঘোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই জবাব দেয়, বালো খবর আর কৈখনে থাকব? বালো খবর থাকলে কি আর আপনার ঠাই আহি?

উত্তর শুনে নিতাই হয়তো খুব খুশী হতে পারে না। তবু হেসে হেসেই জবাব দেয়, আরে আমাদের ভাগে তো অষ্ট-রজ্জা। বাঁধা গবর টাটা ঘাস। ভালতেও আপনাবা মন্দতেও আপনাবা...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান্ন বলে, ওকতা ছাইড়া ছান। খোদায় মহন যারে যেমুন বাকে তাই বালো। এহন যাব লেইগা আইচি তাই কই।

নিতাই উৎকর্ণ হয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন। কাজ ছাড়া তো আর আপনার দেখা মিলবে না।

তোবা—তোবা, কি যান কন! আমি কি আব আপনাগ পায়ের যুগিয়া মাছুষ যে আমার ছাহা পাইবেন?

নিতাই বাধা দেয়, কে পায়ের যোগ্য আর কে মাখার যোগ্য তা এ তল্লাটের মাছুষ জানে। আপনি চাকতে চাইলে কি হবে? এখন বলুন কি কাজ?

এক গাল ঘোঁয়া ছেড়ে পলান্ন বলে, আজারথানেক টেকার লেইগা আইচিলাম। দয়া কইরা যদি ছান?

উত্তরে নিতাই বলে, আপনাকে টাকা দেবে না গজে কে আছে? তবে আসল কাজ বোধ হয় অগ্গজই সেরে এসেছেন। নেহাত চক্ষুলজ্জায়—

মুখের কথা শেষ হয় না নিতাইয়ের। পলান্ন বাধা দেয়, না—না, খোদায় কসম। একটা টেকাও কারুর খন নেই নাই। আপনার ঠাই-ই পেরথম আইলাম।

তাহলে মোটে হাজার টাকা দিয়ে কি কববেন? আপনার ঘে এককোণের চাষও হবে না, নিতাই উত্তর করে।

হ, কতাদা ঠিকই ধরচেন। হাজার তিনেকের কম কিছুতেই অইত না। কিন্তু কি করুম, ওসমান কিছুতেই কর্জ করবার দিবার চায় না। বলে, পাট বইনা কাম নাই ইবার।

নিতাই লাঞ্ছিত্যে ওঠে, কন কি ব্যাপারী সাহেব! এ সন পাট বুনবেন না। পাটের দর যে আশুন হবে। আমার বড় সঙ্কী রেলির আপিসে কাজ করে। সেই তো আমাকে কথটা চুপে চুপে বললে।

ঠিক, ঠিক কইচেন, পাটের দর ইবার আশুন না অইয়া যায় না। তন্ন ছান তিন আজারই। স্তদটা একডু কম কইরেন, পলান সোৎসাছেই সায় দেয়।

সুদেব ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি বলি পাঁচ হাজারই এক পতে নিয়ে যান। খরচা অনেক কমে হবে'খন। দফায় দফায় খতে শুধু সবকারের পেটই ভরবে।

না—না, আপনে ঐ তিন আজাবই ছান। কেউবে ঘান কইয়েন না। ওসমান ছনলে বাগ কবব।

কারো সাধ্য নেই নিতাইর পেটের কথা বার করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! তোমরা যেন আবার কোথাও বটিয়ো না হে, পাখস্থিত মুহুরী ত'জনকে লক্ষ্য করে বলে নিতাই।

মুহুরিরা মুখ বুজেই লিখছিল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে এক বলক তাকায় মাত্র।

পলান সাধ্য দেয়, না না, দেওয়ানজী মশয়রে কিছু কওয়ন লাগব না। উনার হা বিবেচনা আচে। এহন সুদ কত কইরা লেখব কইয়া ছান।

নিতাই উদাসভাবেই বলে, কিছু বলতে হবে না। বাজার থেকে আপনার কমই পড়বে।

তবু কত কইরা ক্যালবে একবার ছনইয়া (শুনিয়ে) ছান।

নিতাই হাসতে হাসতেই বলে, বাজার তো এখন তিন আনা, আপনাকে দশ পয়সা করে ফেলছি।

হায় হায়—মইরা যামু। দুই আনা কইরা ক্যালেন, পলান ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বাধা দেয়।

ব্যাপারী সাহেবের শুধু আমাদের মারবার তাল। আচ্ছা, দেওয়ানজী মশায়, ওনার কথাও থাক আমাদের কথাও থাক। ন' পয়সা করে লিখে নিন, নিতাই মাঝামাঝি পথ ধরে।

পলান আবার বাধা দেয়, না না, ই যাত্রা ওয়ার বেশী দিমু না। ছই আনাই
লেইখা খোন দেওয়ানজী মশয়।

আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হলো। দেখবেন, পার্টের দর উঠলে যেন কিছু পাই।

আশীর্বাদ করেন, আল্লায় দিলে মিঠাই খাইবার লেইগা কিচু নিচ্চয় দিমু।

দলিল লেখা শেষ হয়ে যায়, পলান বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা
টিপসই দেয়।

সিঙ্কু খলে করকরে তিন হাজার টাকা গুণে দেয় নিতাই।

টাকা হাতে নিতেই, পলানের বকের ভেতরটা কেন যেন ছ্যাং করে ওঠে।
দীর্ঘকাল পর আজ আবার ওকে ঋণ করতে হচ্ছে। কে জানে, কি আছে
বরাতে?—নোটগুলো এক এক করে গুণে খুতির ভেতরে রাখে। শক্ত কবে
বাঁধে কোমরের সঙ্গে।

পুনরায় সেলাম জানিয়ে উঠতে যাচ্ছিল পলান। নিতাই বাধা দেয়,
আর এক কলকে তামাক খান।

চাকরকে আর হুকুম করবার আবশ্যক হয় না। ঠিক জায়গায় ওরা ঠিকই
থাকে। আলসের আগুনে ঝাঁ করে আর এক কলকে তামাক সেজে পলানের
হাতে দেয়।

পলান অল্পমনস্কভাবেই হুকো টানতে থাকে। মাথায় বোধ হয় হুশিচ্চা
পাক থাকে। এতগুলো টাকা না নিলেই ছিল ভাল। ওসমান, গণি শুনলে
হয়তো রাগই করবে। সিকি জমিতেও তো পাট নেহাত কম হতো না। কি
দরকার ছিল যেচে মাথা মুড়াবার?—

পলানকে অল্পমনস্ক দেখে নিতাই বলে, আর কোথাও যাবেন নাকি?
কি অতো ভাবছেন? এর চেয়ে কম স্তম্ব কোথাও হবে না।—

তোবা—তোবা, আমার যা কারবার আপনার লগেই। কোনদিন ত আর
কারোর ঠাই যাই নাই। এহন মারেন কার্টেন হেডা আপনার দয়া।—হুকো
অত্তের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পলান।

অল্প কোথাও যে যাননি তা আমি জানি। তবে একবার ঘুরে দেখে এলে
পারতেন, তারা কি চীজ, নিতাই জোর দিয়েই পুনরায় নিজের পক্ষ সমর্থন
করে।

পলান সেলাম জানাতে জানাতেই উত্তর করে, ও কতা কইয়েন না।
আশীর্বাদ করেন শ্যান আর কারোর ঠাই যাওয়ান না লাগে।

নিশ্চয়, আপনাদের সঙ্গে তিন পুরুষের কারবার। আপনাদের কুশল কামনা করবো না তো কার করবো। মাঝে মাঝে আসবেন। চরের যদি আর কারো টাঁকার দরকার হয় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পলান ষাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিতাই মনের খুশীতেই হুকো টানতে থাকে। আজ ও কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছে? দিনটা বেশ ভালই গেলো।

চরফুটনগর আর চরধল্লা মেতে ওঠে। নাইবার খাবার সময় নেই কোন পাট চাষীর। চৈত্রের ঝাঁঝ পোড়া রোদে টোকা মাথায় যে যার কাজ করে চলে। সকালের 'নাস্তা' বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে। ছপুরের ভাত ঝি-বউরা মাটির সানকিতে করে ক্ষেতেই এনে দেয়। ছোট ছেলেপুলে থাকলে তাদের হাত দিয়েও কেউ কেউ পাঠিয়ে দেয়। যার সময় হয় সে নিজের হাতেই খেয়ে নেয়। যার হয় না তাকে খাইয়ে দিতে হয়। মুখে খায় হাতে কাজ করে। এতে কারো কোন অস্ববিধে নেই। এখন খাওয়া তো শুধু পেট ভরানো। তবে হুকো কলকের বেলায় সেটি হবার উপায় নেই। যারা খাইয়ে দিলে তারা হাত ধুয়ে সাজে তামাক। হুকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গনগনে করে তোলে ধুঁটের আগুন। এখন টানলেই তুরতুর করে ধোঁয়া বেরুবে। চাষী মাত্রই কাজ খামিয়ে খানিক জিরিয়ে নেয়। আমেজে রসিয়ে রসিয়ে টানতে থাকে। পেট ভরেছে, এবার একটু আরাম ও চান্স হয়ে ওঠা। হুকো কলকে নয়তো যেন এক সাজোয়া বহর। ক্ষেতেব কাজে সকলেই যেন মার্চ করে চলেছে। আগুনের আলসে আর হুকো কলকে যোগাচ্ছে ওদের কাজের রসদ। তামাক নেই তো কাজও নেই। ঝিমুনীতে চলে পড়বে—কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। ইংরেজ সরকার বোধ হয় এই কলার্কোশলটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শোষণের হাতিয়ার রূপে দেশীয়দের ওপর হাজার রকম ট্যাক্স বসিয়ে থাকলেও বিড়ি তামাকের ওপর কোন ট্যাক্স বসাননি। চাষী মনের আনন্দে খেয়েছে তামাক—সোৎসাহে কাজ করেছে। যে যত বড় চাষী তার তামাকের ব্যবস্থা ততো ব্যাপক। ধান, পাট, মুগ কলাইয়ের সঙ্গে জমির এক কোণে কিছুটা তামাকের চাষও তাই প্রত্যেকেরই আছে। প্রয়োজন মতো পাতা সেখান থেকে পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে এ পাতায় ঝাঁজ কম। রংপুরের কড়া মতিহারি পাতা মিশাল না দিলে নেশা জমে না। অনেক দায়

মতিহারি পাতার। শুধু মতিহারি দিয়ে তামাক মাখলে আবার গলায় লাগে। চাষীর স্ববিধেই হয়। অল্প মাত্রায় মতিহারি কিনে নিজের বাড়ির পাতার সঙ্গে মিশাল দিয়ে বেশ সস্তাতেই মনোমত তামাক পাওয়া যায়। সারা বছর এখন মোজা করে খাও। অত্যাশ্চর্য খরচার সঙ্গে তামাকের খরচাও চাষীর একটা মোটা খরচা। তামাকের ভালমন্দর ওপরই নির্ভর করে চাষাবাদ। ঢিলে তামাক দিলে কাজও ঢিলে হয়ে যাবে। একদিনের কাজ উঠবে তিনদিনে। আবার বেশী কড়া দিলেও কেশে কেশে নাস্তানাবুদ। বেশ মেজাজসই হওয়া চাই। ভাল চাষীর কায়দাকাছন জানা আছে। বছরের তামাক সময় মতোই সংগ্রহ করে রাখে তারা।

রবিশস্ত ক্ষেতে নষ্ট হয়েছে। সময় মতো পাট বুনতে না পারলে সারা বছর উপোস দিয়ে মরতে হবে। কিন্তু পাট চাষে যে চাই এক কাঁড়ি টাকা। স্বামকান্তব ওপব ভরসা করে অনেকটা নিশ্চিত ছিল দুর্গা। গঞ্জের কাছারিতে গ্রীনবোট লাগলেই হাতে টাকা আসবে। নিড়ানির সময় থেকেই প্রচুর টাকার দরকার। বীজ ঘরেই আছে। জমি তৈয়ারীর কাজও আনন্দকে দিয়ে একরকম করে হয়ে যেতো। খুব বেশী হলে দু'পাঁচ দিনেব জিহ্বা দু'চাবজন ক্ষেত মজুরের আবশ্যক হতো। স্বামকান্ত তো বলেছিল চালিয়ে নেবে। লম্পট-শয়তান, ধর্মাবতার সেজে চরের সর্বনাশই ওর মতলব। আগে জানলে কে খাল কেটে কুমীর আনতো? সোজা মোড়ল বৈরাগীকে বললেই সব মিটে যেতো। চরের অনেকেই তো তাঁকে জামিনদার খাড়া করে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছে। তবে ওর কেন এ দুর্মতি হলো?...কুকথা তো বাতাসের আগে ধায়। শয়তান হয়তো নিজেই রটাবে কত কথা। না না, বাঁচতে ওকে হবেই। ময়নার জিহ্বাই বাঁচতে হবে। আর তা যদি হয় মেড়লের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। স্বজাতি—কুটুম, সকলের আগে তো তাঁর কাছে যাওয়াই উচিত ছিল। দেরি হলেও তাই যেতে হবে। মোড়ল তো ইসারা ইঙ্গিতে অনেক দিনই বলে পাঠিয়েছেন। কোন কিছু দরকার হলেই যেন তাঁকে বলি। তবে এ ভুল কেন হলো?...দুর্গা দাওয়ার ওপর বসে ইতস্ততঃ ভাবছি, আনন্দ হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে তাড়া দেয়, অ দিদি, ক্যাতের আগাছা ত সব সাক কল্লাম, এহন কতডা জমিনে পাট বুনবা কও?

দুর্গা অবাক হয়। আনন্দ—যে আনন্দ পেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বুঝতো না সে একা একা ক্ষেত পরিকার করে কেলেছে! একাই চায় পাট

বুনতে! তা বেশ। যা পারে একাই করুক। আর কারো কাছে ধার-কর্জের কথা বলে কাজ নেই। কিন্তু খাবে কি বেচারা? চাষের কাজে যে বেজায় খাটুনী। হুন ভাতের ব্যবস্থাও যে নেই। আনন্দ কি ক্ষেপে গেলো। তামাক নেই, ভাত নেই, পাট চাষ করবে।

দুর্গাকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোমার কি অইল কওত। কয়দিন যে তোমার কোন দিশাবিশাই পাই না?

আনন্দের তাড়ায় দুর্গার সংবিৎ ফিরে আসে। কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। নিজেই কি জানে, কতটা জমিতে চাষ করলে কত ফসল উঠবে? আগে দেখতো বাপ-বেটায়। তারপর বাবা একাই। এখন কে বলে দেবে ওকে কত খরচা লাগবে আর কি দিয়ে কি হবে? আচমকাই উত্তর দেয় দুর্গা, কি আবার অইব? আমিও তো হেইডাই ভাববার নৈচি, কতডা জমিনে পাট বৃহ্ম!

আর ভাববা কবে—বুনবাইবা কবে? হগলের কাম না পরায় (প্রায়) অইয়া আইল। জল ত ছনচি ইবাব আটগের (প্রথম দিকে) আসব, আনন্দ আবার তাড়া দেয়।

জল—এই জলের কথা বলেই শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছে। জল প্রথম দিকেই আসবে—কুমার বাহাদুরের ডিস্কিও এসে ঘাটে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ভর্তি টাকা। শয়তান—সব ধাপ্লাবাজী।...আনন্দব মুখে জল বাড়বার কথা শুনে আবার মনেব কোণে হেঁচট খায় দুর্গা। বুঝিবা খেই-ই হাবিয়ে ফেলে।

আনন্দ রেগে যায়, না, তোমাবে আইজকাই ফকির সাবেব কাছে লইয়া বাওয়ন লাগব। ভূতেই ধবচে তোমারে। কি ককম কইবা ত?

ফকিরের নাম শুনে দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। আনন্দকে বিশ্বাস নেই। মোটা বুদ্ধি। সত্যি সত্যিই হয়তো ফকিরের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। আর তা যদি হয়, ভাববেন কি ওঁরা। কীর্তনিয়ার বেটার বউ হয়তো পাগলই হয়ে গেছে। পাগলীর বেটির সঙ্গে আবার কে পোলার বিয়ে দেয়? মোড়ল বৈরাগী হয়তো বের্কে বসবেন। ময়নার আর বিয়েই হবে না।...গলার স্বর ঝঙ্ক করেই বাধা দেয়, কি তুই যা তা কচ আনন্দ! চাষের কাম বিদ্যার কাম সমান। ভাইবা ছাহন লাগব না? আগা-পাছা না ভাইবা কাম কল্পেই অইল?

তন্ন তুমি ভাব, আমার আর কিচু কইরা কাম নাই, আনন্দ গজগজ করতে করলেই স্বান করতে ঘাটের পথে পা বাড়ায়।

গঞ্জে মোট বয়ে সামান্ন বা চাল, তেল, হুন এনেছিল আনন্দ তা দিয়েই

এ কদিন চলছে। টেনেটুনে বড় জোর আর দিন দুই চলবে। তারপর? আনন্দ তো কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। মোট বইতেও এখন আর ওর কোন আপত্তি নেই। পরের খামারে দিন মজুর খাটতে বললেও ও রাজী। কিন্তু কুটুমের সঙ্গে একত্র বাস করে তা কি করে সম্ভব। মানই যদি গেলো তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? কুটুমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নিজেদের বংশেও কেউ কোনদিন যে কাজ করেনি, দুটি ভাতের দুঃখে তাই করবে? মাহুশ তো আছে শুধু তামাসা দেখতে। নিশির বাপের কি উচিত ছিল না একবার খোঁজ খবর নেওয়া? শুধু ওপর ওপর ছুতো ভাঙালেই হলো! সম্পর্কের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চরের মোড়লও তো বৈবাগী। কার কি স্থবিধে অস্থবিধে সেটা দেখাও কি মোড়লের কাজ নয়? কই, নিজেদের কাজ তো কিছুই ঠেকে নেই।... কথায় কথায় দীহুব ওপব বিরক্তি আসে দুর্গাব। আবার ভাবে, না দোষ কারো নয়—নিজের বরাতেরই দোষ। কপালে যদি স্থখ থাকবে তাহলে অসময়ে ময়নাব বাবাই বা যাবেন কেন আর লোকেই বা এত হেনস্তা করবে কেন। কপাল মন্দ বলেই না ময়নাব বিয়েটা পর্যন্ত শেষ হতে পারলো না। -

ময়নাই আজ ঠাকুরঘবে সন্ধ্যা দিচ্ছে। দাঁওয়াব ওপব একক বসে অকুল পাথারে হাবুডুবু খেতে থাকে দুর্গা। ভাবতে ভাবতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু পথের কোন হৃদিস মেলে না।

ময়নাব ডাকে ঠাকুর প্রণাম করতেই উঠে বাচ্ছিল দুর্গা, দোব গোড়ায় দীহুর হাঁক শোনা যায়, বিয়াই মশয় আচেন নাকি—বিয়াই মশয়...

দুর্গা খতমত খেয়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই সশরীরে মোড়ল এসে হাজির। আনন্দটা সতি সতি গিয়ে কিছু বললে নাকি। অনেকক্ষণ তো বাড়ি নেই—ওর যা বুদ্ধি।

দীহু ততক্ষণে প্রায় উঠানে এসে পা দেয়। গলার স্বর আরো একটু উচ্চগ্রামে চড়িয়েই হাঁকে, বিয়াই মশয়—

দুর্গা জ্বাই পায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে আলো জ্বালা উচিত ছিল। কিন্তু ঘরে তো এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই। অন্ধকারে বসেই ভাত খেতে হয়। কি আর করবে। তাড়াতাড়ি বোমটাটা একটু টেনে সাড়া দেয়, আনন্দ ত বাড়ি নাই। আহেন, বহেন আইহা। আমি কুপা জ্বালাইয়া আনি।

দীহু বাধা দেয়, না খাউক, কুপা জাগাইবার কাম নাই। আলো আমার চক্ষে লাগে। আপনার ঠাই দুইডা কথা জিগাইবার আইলাম।

আইছা আপনি বহেন, আমি তামুক লইয়া আহি, দীহুকে একটা জল চৌকি এগিয়ে দিয়ে দুর্গা তামাক সাজতে যায়।

না না, আপনারে আর কষ্ট করন লাগব না। আমি এহনি তামুক ধাইয়া আইচি। দুইডা কতা বইলা উঠি। কীত্তনের সময় আইল। আবার ইঙ্গিগে আমাগ ভটচাইঘ মশয় কয়দিন খেইকা বিছানা নিচেন। তেনারেও একবার দেইখা যাওয়ন লাগব, দুর্গাকে পেছন ধেরাতে চেষ্টা করে দীহু।

কিন্তু দুর্গা সে কথায় কান দেয় না। নতুন কুটুম, তাতে আবার চরের মাথা। যত্ন-আস্তি না করলে মান থাকবে না। কিন্তু সারা দিনে তো আনন্দকে একবারও তামাক খেতে দেখা যায়নি—যদি এক ছিলুমও না থাকে। লজ্জায় যে মাথা কাটা যাবে। ময়নাও তো সন্ধ্যা দিচ্ছে—এখনো ঠাকুর শয়ন দেওয়া হয়নি। ওকে পাঠিয়েও ওর সহইয়ের বাড়ি থেকে ছিলুম দুই চেয়ে আনা যেতো। এখন উপায় কি হবে? তাছাড়া স্বপ্নের স্বমুখ দিয়ে ভর সন্ধ্যা বেলা বাড়ির বারই বা হবে কি করে? এর চেয়ে যে আদর না দেখালেই ছিল ভাল।...ভাবতে ভাবতে আনন্দর ঘবে এসে ঢোকে দুর্গা। না, ভগবান মূখ রক্ষা করেছেন। বাঁশের চোঙ হাতড়িয়ে বেশ খানিকটা তামাক পাওয়া যায়। মনের খুশীতে নিশ্চিন্ত হয়েই তামাক সাজতে থাকে। কিন্তু এক চিন্তা মাথা থেকে না নামতেই আর এক চিন্তা মগজে খোঁট পাকাতে থাকে। তবে কি আনন্দই মোড়লকে পাঠালে? সেই জহই কি নিজে না খেয়ে তামাকটুকু বেখে দিয়েছে? কি আশ্চর্য! এমন বোকাও হতে আছে! ঘরের কথা কেউ কখনো কুটুমের কাছে বলে?...ভাবতে ভাবতেই হুকোর মাথায় কলকে বসিয়ে হুঁ দিতে দিতে আবার এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়ায় দুর্গা।

দীহু তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে হুকোটা টেনে নিয়ে নিজেই হুঁ দিতে থাকে। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠেই বলে, ছি ছি ছি, মিচামিচি আপনারে আবার কষ্ট দিলাম। আমার ময়না মা কুথায়? তারে ত দেখচি না।

ও ঠাকুর শয়ন দিবার নৈচে, এহনি আইব, দুর্গা উত্তর করে।

বালো বালো, এহন খেইকাই ঠাকুর দেবতার কাম করন বালো, হুকো টানতে টানতে দীহু মস্তব্য করে।

ই, ওত জনমের খেইকাই ঠাকুর ঘরে আছে। আপনার তালহইত অরে

মুকে মুকেই ঠাকুরের শতনাম শিকাইচে। সোবার বলবার পারে, হুর্গা ময়নার হয়ে ওকালতি করে।

তা কি আমি জানি না। তালইরত আমাব এক শ ঠাকুব। রাদাকিষ্ট, গোপাল, জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রা কত কি। স্বকে থাকুক—স্বকে থাকুক, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে দীহু সায় দেয়।

হুর্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, স্বক আব বরাতে আইল কই? এহন আপনাব ধরে গিয়া যদি স্বক পায়।

দীহু বলে, আইব আইব, ধাবরান ক্যান? ভাগবতে আচে, কিষ্ট প্রেম যাব অয় তাব মতন স্বকা কে? মাব আমার লকখন বালো।

জানেন ঠাকুব, হু'হাত কপালে তুলে ইষ্ট দেবতাব উদ্দেশ্য প্রশ্নাম কবে হুর্গা।

দীহু কথাব মোড় ঘুবিয়ে বলে, যাউক, যে কথা কইবার লেইগা আইলাম। চাব আবাদের কি কবলেন? ইয়াব পব পাট বুনলেত আব মাখা তুলবাব পারব না। জলে ডুইবা যাইব।

হুর্গা ভাবনায় পড়ে। কি উত্তব দেবে ভেবে পায় না। আমতা আমতা করেই বলে, হ, তাইত ভাববার নৈচি। আমাব কি কিচু জানা আচে।

মুখ থেকে কথা লুকে নিয়ে দীহু বলে, আমিত বিয়াই মশয়বে কয়দিন কইলাম, কি কববা কও। ঠেকা বেঠেকা থাকে ত হা কতাও কও। গঞ্জব নিতাই সাজি টেকা দিবার চাইচে।

হুর্গাব সংকোচ হয়। পুলকও হয় কিছুটা। এত সহজে টাকা পাওয়া যায় অথচ এই টাকার জ্ঞ ও শয়তানটাব খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। তবু মনেব কথা খোলসা করে বলতে পারে না। গায়ের মানুষের এ এক অভূত আচরণ। ইষ্টি কুচুন নয়তো যেন এক লজ্জার পাহাড়। ঘরের কোন গোপন কথা কিছুতেই তার কাছে বলা যাবে না। না খেয়ে মরলেও না। এমনিতে আন্তবিকতার অভাব নেই। গরম্পর পরম্পরের বিপদে এসে বুক দিয়ে দাঁড়াবে—সাদামতো সাহায্য করবে। কিন্তু অভাব অভিযোগের কথা কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না। হুর্গাও পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেয়াই মশায়ের কাছে মুখ বুজে থাকলেও আর চলছে না। লম্পটের হাত থেকে ওকে বাঁচতেই হবে। পাট বুনতে না পারলে তার কোন উপায়ই নেই। আনন্দ বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ওকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে। তাই

দীহুর প্রেমের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে দুর্গা, অপেনেত
সবই জানেন, কতটা জমিনে চাষ কল্পে বালো অয় ?

তা পাখী আট দশের কম জমিনে বুনলে খরচ খরচায় কুলাইব না। চক্ষেও
কিছু দেখবেন না।

খরচ কত পড়ব ?

শ' আড়াই টেকাইত আগে পড়ত। তবে এহন কামলার রোজ দেড়া,
তিন শ'র কমে কুলাইবার পারবেন না।

তিন শ'।

হ, তাত চাই-ই।

আইচ্ছা, কাইল আপনারে খবর দিমুনে। আনন্দ আহক।

বেশ, তাই-ই দিয়েন। ঠেকা বেঠেকা কিছু থাকলে হ্যা কতাও কইয়া
দিয়েন। উঠি তাইলে, দীহু ছঁকোটা নামিয়ে রেখে উঠতে যায়।

দুর্গা বাধা দেয়, আর এক ছিলুম তামুক খান। আপনাগ বউমা আইল
বইলা ?

না, পূজায় বইচে, অরে আর বিরক্ত কইরা কাম নাই। আর একদিন
আহম।

দীহু উঠে এক পা বাড়াতে যায় ময়না ঠাকুরঘর থেকে বেরোয়।

দুর্গা বলে, ঐ ছাহেন, আপনে আর ফাঁকি দিবার পাল্লেন না।

দীহু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উল্লাস জানায়, আয় মা আয়, তরে একডু দেইখা
যাই।

ময়না মাথা নীচু করেই কাছে এসে প্রণাম করে। কে খশুর, কে ভাহুর,
কার সঙ্গে কি আচরণ করণীয়, তা ওর বুঝবার কথা নয়। বোঝেও না ঠিক
ঠিক। তবু খান্নিক পুতুলের মতো সব ওকে করে যেতে হয়। ও যেন একটি
কলেরই পুতুল। মাথা নীচু করে কথা বলছে কারো সঙ্গে—কাউকে দেখে
দিচ্ছে ঘোমটা—আবার কারো সঙ্গে পাকা গিল্লিপনা করতেও আটকাচ্ছে না।...

দীহু সন্নেহে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।

ময়না মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দুর্গা তাড়া দেয়, যা, এক কইলকা তামুক সাইজা লইয়া আয়।

ময়না ছঁকো ককে হাতে করে মামার ঘরের দিকেই পা বাড়াতে যায়।

দীহু বাধা দেয়, আর তামুকের কাম নাই বিয়াইন, উঠি এহন।

দুর্গার মুখে হাসি খেলে। বলে, হাঙ্গা নন্দী পায়ে ঠেলবেন ?

হ, তা যা কইচেন। মাগ, একডু তরাতরি আন। কীত্তনের লোক আবার সব বৈহা (বসে) থাকবনে। দুর্গার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ময়নাকে তাড়া দেয় দীমু।

যথাসময়ে তামাক আসে। ঠাকুরের ভোগের জল বাতাসাও এনে হাজির করে ময়না। দীমু সব কিছু সর্বব্যবহার করে সেদিনের মতো উঠে পড়ে। দুর্গা আবার নতুন করে ভাবতে বসে।

সন্ধ্যা বেলাই ঘুম পায় ময়নার। না খেয়ে শুলে জেগে উঠে খেতে আর সেই রাত দশটার আগে নয়। হাঁড়িতে দুপুরের রান্না ভাত রয়েছে। গরমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুর্গা ওকে একবারে খেয়ে শুতেই তাড়া দেয়। আনন্দটা এলেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু কোথায় যে গেছে হতভাগা— ফেরার নাম নেই। ভাত নষ্ট হয়ে গেলে খাবেখনে কোন ছাই ?...

একা একাই দাওয়ার ওপর বসে একথা সেকথা ভাবছিল দুর্গা। ময়না হয়তো ততক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছে। হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আনন্দ। দুর্গার গা ঘেঁষে এসে বসে বলে, দিদি, আর ভাববাব কিচু নাই। কাম গুচাইয়া আইচি।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, কি আবার কইরা আইলি ! কোনহানে গেচিলি ?

আরে যামু আবার কোতায়—আর গোরামে (গ্রামে) আচেইবা ক্যারা ? ইষ্ট কুটুমের কাছে ত কিচু কওয়ন যাইব না। তাই ভটচাষ মশাইর ওহানে গেচিলাম।

দুর্গার বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেউটের ছোবল পড়ে। ফুঁসে ওঠে, করচচ কি তুই ? ক্যান গেলি হেহানে ? ক্যারা যাইবার কইচিল তরে ?...

ক্যারা আবার যাইবার কইব ? নিজের খেইকাই গেচিলাম—আনন্দ সমতা রেখেই জবাব দেয়।

ক্যান গেলি আমারে না জিগাইয়া ? তর কি আর একটা দিনও সবুর সইল না ?

তোমারে আবার জিগামু কি ? জিগাইলে কি তুমি কোন উত্তর ছাও ?

বেশ, আমি যহন কিচু না তহন যা খুশি কর। আমি কাইলই ইহান থনে চইলা যামু।—দুর্গা প্রায় কেঁদেই ফেলে।

আনন্দ ভাবাচেকায় পড়ে। বুঝে উঠতে পারে না কি ও এমন অজ্ঞায় করে ফেলেছে। সবিস্ময়েই বলতে থাকে, কি জানি, তোমাগ ভাব-সাব কিছু আমি বুজবার পারি না। এই না কয়দিন ভট্‌চাইয় মশাইর লগে সজা কজা। এহ্ন আবার হায় তিতা অইয়া গেল!

দুর্গার কান্না এবার ক্রোধে ওঠে, কি সজা করলামরে হার লগে? কি দেখচচ্‌ তুই?

আনন্দ অধিকতর অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, মিচামিচি রাগ কর ক্যান। না কর আর কোনদিন যামু না হার কাচে।

অপ্রস্তুত দুর্গাও হয়। ভাবে, তাই তো, ওর আর এমন কি দোষ। আমি ডেকে এনেছিলাম বলেই না ও যেতে সাহস পেয়েছে। ও কি করে জানবে ভণ্ডটার মনের কথা?...নিজকে সংযত করে দুর্গা বলে, হ্যা, আর যাইচ না পর লোকের কাচে। নিশির বাপ আইছিল, যা পরামশু হার লগেই কব। ছাগ—

মুখের কথা শেষ না হতে আনন্দ বাধা দেয়, হারা না কুটুম! ঘরের কতা হার কাচে কইবা?

আত্মীয় কুটুমের কাচে কমু না তয় কি পর মাইষের কাচে কমু? তর বুদ্ধি অইব কবে?

ভট্‌চাইয় মশায় আইলে হারে তবে কি কমু?

ভট্‌চাইয় মশায় আইব! তুই হারে আইবার কইচচ্‌ নাকি?

না, ঠিক আইবার কই নাই। হ্যা ত পাঁচ ছয় দিন বিছানায় পৈড়া আছে। আইজ্‌ই নাকি কীতনে যাইব। আমার মুখের খন সব হইনা নিজের খনেই কইল, ফিরবার পথে তোমার লগে দেখা কইরা যাইব।

দুর্গার সর্বাঙ্গ আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। কর্কশ স্বরেই বলে, না না, হার লগে আমার কোন পরামশু নাই। তুই হারে এহনি গিয়া বারণ কইরা আয়।

এহ্ন গিয়া কি হারে পামু? হ্যা না এতক্ষণে পাঠে বইহা গেচে।

কথাটা দুর্গার মনেও ধরে। তা ঠিক, ভণ্ডটা এতক্ষণে নিশ্চয় আসনের ওপর গিয়ে জেঁকে বসেছে। এখন আনন্দকে ওখানে পাঠালে আরো কেলেঙ্কারীই হবে। নির্বোধটা কি বলতে কি বলে ফেলবে। তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে চূপচাপ শুয়ে পড়াই ভাল। ডাকলে সাড়া না দিলেই হলো। আনন্দক

তো বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে। তাই প্রকাশে আনন্দকে সমর্থন করেই বলে, তয় আর দেরি করিচ না, হেই কোন ছুপৈরের ভাত—নষ্ট অইয়া গেল বৃজি। খাইয়া লইয়া ছইয়া পড়।

ধিধে আনন্দরও জোর পেয়েছে। দুর্গা এতক্ষণ ওকে না খাটালে কখন খেয়ে নিত। সোৎসাহেই বলে, কও কি, ভাত নষ্ট অইয়া গেল। তরাতরি ছাও তাইলে, খামুনে কি ?

তুই হাত মুখ দুইয়া আয়, আমি বাইড়াই রাখিচ।

অন্ধকার লাওয়ার ওপর বসেই ছু ভাইবোনে ধেতে থাকে। সামান্য দুটি ভাত ও একটুখানি মিষ্টি কুমড়োর তরকারি। যেন পরমাশ্নই থাক্ছে আনন্দ। একটা ভাত ছিটকে মাটিতে পড়লে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে দোরের হাঁক শোনা যায়, বড় কুটুম আচ—বড় কুটুম, গায়েব সম্পর্কে আনন্দকে বড় কুটুম বলে ডাকে বংশী।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। একি, শয়তানটা এত শিগ্গীর ফিরলে! কিন্তু...

দুর্গা কোন কিছু জিজ্ঞেস কবার আগে আনন্দ সাড়া দেয়, খাড়ও (দাঁড়াও) বংশীদা, আমার অইয়া গেচে।

দুর্গা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ও শয়তান নয়, বিশ্বাস বাড়ির বংশী!...এত রাইতে আবার বংশী ডাকে ক্যানবে?—আনন্দকেই জিজ্ঞেস করে।

ঐ যা, তোমাবে কইতেই ভুইলা গেচি। বৈবাগীৰ খালে আমরা মাচ ধরবার যামু! বড় বড় মাচ উজ্জয় ওহানে বাইতে।

না না, আমাগ মাছ মোছ ধরনের কাম নাই, ছইয়া থাক।

বারে, আমি বলে কত কইবা বইলা ছাবে মত করাইচি। আমাগ কি হারিকল (হারিকেন) আচে নাকি যে একা একা যামু ?

মাচ না খাইলে কি অয় ?

হ, তুমি নিজে খাওয়া না ত তাই আর কারেও খাইবাব দিবার চাও না। মাচ ছাড়া কি ভাত খাওয়ন যায় ? ছাহ না মইনী দিন দিন কেমন বোগা অইয়া বাইবার নৈচে। ..

আনন্দর কথার জবাব দেবার আগে বংশী এসে উঠানে দাঁড়ায়। বড় ভাল ছেলে বংশী। দুর্গার খুব পছন্দ ওকে। কখনো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। বংশীই বলে, বোঁঠান, দেইখনে, কেমন বড় বড় মাচ ধইরা আনি। বেশী দেরি অইব না। কই গ কুটুম, তোমার হইল ?

আনন্দ ইত্যবসরে কোমরে গামছা বেঁধে প্রস্তুত। দুর্গা ওকে আর বাধা দিতে পারে না। রাত দশটার কাছাকাছি দু'জনে বেরিয়ে যায়।

আনন্দ বংশী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ভাবে, দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়বে। পাড়া নিস্তব্ধ, ময়নাও ঘুমিয়ে পড়েছে। শয়তানটা যদি সত্যি সত্যি এসেই পড়ে! আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। গাটা কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। আবার ভাবে, না, রাত বেশ হয়েছে। কীর্তনের আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে! মুখে যাই বলুক, প্রাণে ভয়ভর আছে নিশ্চয়। সেদিন যেভাবে পালিয়েছে কিছুতেই আর আসছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সেয়ে ঘরে যাবারই উপক্রম করে দুর্গা।

জলের বালতিটা ঘরে নিলেই দরজায় খিল দিতে পারে এমন সময় কে যেন আনন্দের নাম ঘরে ডাকতে থাকে। চিনেও চিনতে পারে না দুর্গা। এ যেন কেমন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। রামকান্ত নিশ্চয় নয়। তার তো মাজা গলা, তবে! কান খাড়া করেই খানিক দাঁড়িয়ে থাকে।

আগন্তুক আরো এগিয়ে এসেই ডাকে, আনন্দ আছ—আনন্দ। ঘুমোলে নাকি হে, ও ও আনন্দ ?

এবার আর দুর্গার বুঝতে বাকী থাকে না। এমন জোরালো গলায় এ চরে ঐ একটি জীবই কথা বলে। সে হচ্ছে—সেই লম্পটটা। দোর বন্ধ করতেই ঘাছিল দুর্গা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। মনে করে, এই স্লযোগ। এই স্লযোগেই ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভয় কি অতো? বাঘও নয়, ভালুকও নয়। গায়ের জোরে কখনো ভগুটা পেরে উঠবে না। সটান বেরিয়ে এসে উত্তর করে, আনন্দ বাড়িতে নাই।

এই দেখ, আমাকে আসতে বলে আবার কোথায় গেলো! তা যাক গে, তুমিই তো রয়েছ, যা বলবার সে তো তুমিই বলবে, বলতে বলতে দাঁওয়ার কাছে এগিয়ে আসে রামকান্ত।

দুর্গা রুখে দাঁড়িয়েই জবাব দেয়, আমার কিছু কইবার বলবার নাই। আপনে যাইবার পারেন।

আহা-হা, তুমি দেখছি চটে আছো বউগিন্নী! কদিন বিছানায় ছিলেম তাই খোঁজ নিতে পারিনি। একবার তো দেখতেও গেলে না।

বিচানায় ছিলেন! বিচানায় ছিলেন তয় ছপইর রাইতে আইচিলেন কেমন কইরা?—হুঁসে ওঠে দুর্গা।

রামকান্ত কঠোর স্বর স্বাভাবিক রেখেই আকাশ থেকে পড়ে, তুমি কও কি বউগিন্নী! আমি এসেছিলাম ছপুর রাত্রে! কবে!

কবে হেড়া নিজের মনরে জিগাইয়া ছাহেন। আমার চক্ষুরে ফাঁকি দিবার পারবেন না।

রামকান্ত এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায়। তারপর ঘাড় বেঁকেই বলতে থাকে, তবে তো ছিলামের কথা ঠিক। সেও দেখেছে। আচ্ছা, তুমি কি গত মঙ্গলবারের কথা বলছো?

হ হ, মঙ্গলবারের কতাই। ছপইর রাইতে কুস্তায় খেউখেউ করল, আপনে জানেন না নাকি?

আমি জানবো কেমন করে বাছা। আমি তো তখন বিছানায় শুয়ে—সর্বদে ভীষণ বেদনা। নড়া-চড়ারও শক্তি ছিল না।

দুর্গার কেমন যেন গায়ের কাঁটা দিয়ে ওঠে। চূপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে।

রামকান্ত বলতেই চলে, পরদিন সকালে ছিলাম আমাকে দেখতে এসে বললে, ঠাকুরলা, তাজ্জব ব্যাপার! মাথায় ঠিক আপনার মতোই বাবরি, দৌড়ে এসে জলে নামলো। তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেলো হদিসই পেলাম না। ...ক্ষ্যান্তও আমাকে কতদিন বলেছে, চরে একজন আছে দাঠাকুর, রাত বিরাত সাবধানে চলবেন। না বউগিন্নী, তুমি ঠিকই দেখেছ, এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হবে। করিম ফকিরকে দিয়ে হবে না। গঞ্জের চম্পকেই লাগাতে হবে। দেও দস্তির কারবার, কখন কার ঘাড় মটকায় বলা যায় না।

রামকান্তকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল দুর্গা এখন পারে তো ওকে মাথায় করে রাখে। ভাগ্যিস ওদিন ও উঠানে একা একা বার হয়নি...বুকের ভেতর খর খর করে কাঁপতে থাকে। কোনরকমে জল চৌকিটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে রামকান্তকে।

ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে রামকান্ত মনে মনে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। জল চৌকির ৭৭৭ বসতে বসতে আশ্বাস দেয়, সর্বদা মনে মনে নাম জপ করে। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। সামনের অমাবস্তাতেই আমি চম্পকে দিয়ে ক্রিয়া করাচ্ছি। ও সব দেও দস্তির চম্পর কাছে কেঁচো।

হ, তাই যা অন্ন একটা কিছু করান। রাই বিরাইত মাইনবে মরব না কি?

অতো ভয়ের কি আছে? মনে ভক্তি থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।

জানে ভগবান, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে হু'হাত কপালে তুলে প্রণাম করে দুর্গা। তারপর উঁপুড় হয়ে ডান হাত দিয়ে রামকান্তর চরণযুগল ধরে কাকূতি জানায়, আমারে আপনে ক্ষেমা করেন ঠাকুর মশয়। না জাইনা আমি আপনার মনে দুখ্য দিচি।

আরে করো কি করে কি! তোমরা হচ্ছ আমার 'আপনার জন। তোমাদের কোন কথা কি আমি মনে রাখি? বাধা দিতে গিয়ে দুর্গার হাত চেপে ধরে রামকান্ত। মাথার ওপর দিয়ে একটা নিশাচর বাজ উড়ে যায়। বিকট তার পাখার শব্দ।

দুর্গা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে হাত ঠেঁকিয়েই প্রণাম করে।

শুধু গলায় রামকান্ত বলে, এ কদিন একটু সাবধানেই থেকো। আনন্দর সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে—শুয়ে পড়েছে নাকি?

আর কন ক্যান, অরে নইয়াই অইচে আমার জালা। বংশীর লগে মাচ ধরবার গেচে।

না না না, কাজটা ভাল হয়নি! ওদের দৃষ্টি থাকে সদা-সর্বদা মাছ মাংসের দিকে। বাড়ি কিরলে একটু মুন জল খাইয়ে দিও, দুর্গার ভয় পাওয়া মনে অধিকতর ভয় ধরিয়ে দেয় রামকান্ত।

খাউক—অরে দেও দস্তিতেই খাউক। নইলে অর এত বাড়াবাড়ি অইব ক্যান, অভিমানে হু'সে ওঠে দুর্গা।

ছি, ও কথা বলতে নেই। ছোট ভাই, ফেলতে তো আর পারবে না। বলে কয়ে যদি ওকে একবার কাজে লাগাতে পারো তাহলে দেখবে খুব কাজের হবে ও। গায়ে বেশ শক্তি আছে ছোকরার।

আশীর্বাদ করেন, আপনাগ দশজনের আশীর্বাদেই যদি কপাল কিরে।

কিরবে—নিশ্চয় কিরবে। সদা-সর্বদা ভগবানকে ডেকো। হ্যাঁ, ভালকথা, চিঠি পেয়েছি, কুমার বাহাদুর শিগগিরই আসছেন। ওদিককার খাল বিল সব ছুটেছে। দিন কয়েকের ভেতরেই তুমি টাকা পেয়ে যাবে। এখনকার মতো সামান্য এই টাকা হু'টো রাখো, রোগ শযায় দশজনের কাছ থেকে পাওয়া অতিকষ্টের জমানো দুটো টাকা দুর্গার হাতে গুঁজে দেয় রামকান্ত। একরকম না খেয়েই জমিয়েছে টাকা দুটো। মনই যদি অস্থস্থ থাকে তাহলে খেয়ে আর কি হবে! প্রবাদ আছে, টাকায় টাকা আনে। কিন্তু ও তা চায় না। ও চায় দুর্গার একটু অহুগ্রহ। না না, মিথ্যাচার এ নয়। সারা

জীবন ও দুর্গাকে নিয়ে থাকবে। চর ওদের ঠাই না দেয় ছুনিয়ায় স্থানিভাব হবে না।...টাকা দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে ইতস্ততঃ ভাবতে থাকে রামকান্ত।

হাত শূন্য। রাত পোহালেই টাকার প্রয়োজন। তবু টাকা দুটো কিরিয়ে দিতেই চায় দুর্গা। বলে, অহুকে আপনারে কিচুই দিবার পারলাম না, উঁটা আপনার খনেই নিমু! না, তা আমি কিচুতেই নিমু না। আপনে ফেরত নিয়া যান, দুদ খাইয়েন।

দুধের আমার অভাব হবে না বউগিন্নী। নগদ পয়সা-কড়ি বেশী না পেলেও চরে আমার খাওয়া থাকার কষ্ট নেই। তুমি ও দুটো রাখো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দুর্গা বলে, খায়নের চিন্তার খনে চাবের চিন্তাই এহন বড়। আনন্দ কেইগা গেচে। একা একা ক্ষ্যাতের আগাছা সব সাক কইরা ফালাইচে। এহন জমিনে লাঙ্গল দেওন লাগব। হার লেইগা চাই জনকতক কামলা আর তাগ রোজের টেকা।

টাকা তো পাচ্ছই। তবে ক'টা দিন সবুর করতে হবে এই যা।

ঐ হানেইত গোলমাল। নিশির বাপ আইজ সন্ধার সময় আইছিল। কি করম না করম কাইল বিহানে হারে কওয়ন লাগব। টেকার দরকার অইলে তাও হায় মহাজনের খন লইয়া দিবার পারব কাইল।

ছি ছি ছি, তুমি ঘরের কথা সব তার কাছে বলে দিয়েছ নাকি? উংকঠা ঝরে পড়ে রামকান্তর কণ্ঠস্বরে।

না, তা কিচু কই নাই। তবে না কইয়া আর উপায় কি। হগলের কাম কাইজত অইয়া গেল আর কবে চাষ করামু। কি করম, আমার কপালই মোন্দ। নইলে কুমার বাহাজুরই বা ই-সন এত দেবি করব ক্যান?...

না না না, ইষ্ট কুটুমের কাছে তোমাকে ইজ্জৎ খোয়াতে হবে না। যে কোরেই হোক, কালই আমি তোমাকে টাকা দেবো। আনন্দকে তুমি কাজ চালিয়ে যেতে বেলো।

আপনি এত টেকা কোনহানে পাইবেন? পরথম কিস্তিতেই যে নগদ পঞ্চাশ টেকার মতন চাই। রোগা শরীলে খালি খালি ঘোরাঘুরি কইরা শরীল ধারাপ করবেন।

সে ভাবনা আমার। অস্তুত এটা রেখেও তো কিছু পাবো, ছাতের সোনার আংটিটা দেখিয়ে জ্বাব দেয় রামকান্ত। চা বাগানের প্রে ওকে উপহার দিয়েছিল আংটিটা। সন্তান প্রসব করাতে গিয়ে মারা যায় প্রে। সেই থেকে

শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও আংটিটা রামকান্তর হাতে আছে। কুপণের মতোই রক্ষা করে আসছে ও এটা।

কন কি। সোনা রাইখা টেকা লইবেন আর হেই টেকা আমি নিমু। মইরা গেলেও ত না, দুর্গা বলিষ্ঠ কর্ত্তেই বাধা দেয়।

আরে না না, আংটি বাঁধা আমাকে দিতে হবে না। নায়েব মশায়কে বললে ও টাকা আমি দিন কয়েকের জন্ম হাওলাত নিতে পারবো।

কিন্তু—

মুখের কথা শেষ হয় না দুর্গার, রামকান্ত বাধা দেয়, তাতে কি হয়েছে? সব টাকা তো তুমি আমাকে শোধ করেই দেবে। দেখলে না, মধুদা কেমন বিচক্ষণ ছিলেন। পাছে রটে যায় সেই ভয়ে কোন মহাজনের কাছ থেকে কর্ত্ত করেনি। কুমার বাহাদুর কখনো তাগাদায় আসবেন না। এমন কি কাউকে কিছু বলবেনও না। দীহুকাকাকে যেন ঘরের কথা কিছু বলো না। ওতে সম্মানী বাড়ির সম্মানই শুধু নষ্ট হবে।

দুর্গা আর ভাবতে পারে না। রামকান্তর কথাই ওর মনে ধরে। সেই ভাল, কাল সকালে নিশির বাপকে খবর পাঠাবে, টাকার দরকার ওর নেই। শুধু যেন একটু দেখে শুনে দেন উনি।

দুর্গাকে নিরন্তর দেখে রামকান্ত আবার বলে, ভাবছ কি? আমি তোমার ভালর জন্মই বলছি। রাত হয়েছে শুয়ে পড়গে। আমাকেও আবার একা একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

হ, রাইত অইলই। একা একা যাওয়ান লাগে একটা লণ্ঠন নিয়া বাইরইবার পারেন না।

ভয় নেই, আমার গলায় ষজ্জ উপবীত আছে, দেও দস্ত্র আমাকে কিছু করতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়ো, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

হ, কি আর করুম। কপাল মোন্দ তাই আপনারে এক ছিলুম তামুকও দিবার পাল্লাম না।

দরকার নেই, আমার কাছে বিড়ি আছে। এখন আসি।

দুর্গা গড় হয়ে প্রশ্রাম করে। রামকান্ত ওর পিঠের ওপর হাত রাখতে গিয়েও কেন যেন পারে না। মুখেই শুধু 'কল্যাণ' হোক বলে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আসে।

চৈত্রের টানে বৈরাগীখাল প্রায় শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তলানি কিছু কিছু জমে থাকলেও সে শুধু কাঁদা গোলা। বাইরের কাজ কোন রকমে চলে তা দিয়ে। বাঁমা থাওয়াব জল ধলেশ্বরী থেকে আনতে হয়। চাষী বৌদের এ সময়ে কাজ করে কুল নেই। ঘরের মরদরা ক্ষেতের কাজেই ব্যস্ত। তাদের দিয়ে এদিকের কুটোগাছও সরাবার উপায় নেই। উর্টো ক্ষেতেই তাদের দুপুরের ভাত পৌঁছে দিতে হয়। গোয়ালে গরু থাকলে এ সময়ে তার যাবতীয় কাজও নিজেদেবই সারতে হয়। কিন্তু সকল কাজের সেরা কাজ জল তোলা। কারো বাড়িতেই জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ঘর গৃহস্থলি যাবতীয় কাজ করতে হয় নদীর জলে। দুর্গার সংসাব ছোট হলেও জলের ঝঙ্কি অনেকের চেয়ে বেশী। কেন না, ওবা কেউ থালের জল মুখে দিতে পারে না। একে বিশ্রী গন্ধ তাব ওপব কোন বাছবিচার নেই। খার যেমন খুশি ময়লা কাচছে। না না, ও জলে কোন কাজ হবে না। ঘবে ঠাকুর সেবা রয়েছে, নদীর জল ছাড়া উপায় নেই। মা মেয়ের ছ'জনের একজন জল টানতেই হিমসিম। আনন্দকে দিয়ে এখন আর এদিকের কিছু হবাব নয়। খামারের কাজেই ও ভীষণ ব্যস্ত। রামকান্ত নগদ এককালীন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। আরো দিয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিনের যৎসামান্য যা। নেশায় মাহুস বুঝি সব কিছুই করতে পারে। দিন টাকা প্রতি ছ'পয়সা হুদে নায়েব রাখালের কাছ থেকে কর্ত্ত করেচে পঞ্চাশ টাকা। বুক ছুরত্ব করে কাঁপে রামকান্তর। কুমার বাহাদুর এসে ব্যবস্থা না করলে নির্ঘাত চব ছেড়ে পালাতে হবে। ভগবান বোধ হয় কোথাও ওকে থাকতে দেবেন না। ভাগবত পাঠে বসে এলোমেলো চিন্তায় ডুবে যায় রামকান্ত।...

স্নানের সময় বড় ঘড়ার এক ঘড়া জল দুর্গা আনলেও সংসারের বেশীর ভাগ জল ময়নাকেই টানতে হয়। কাঁ কাঁ পোড়া দুপুরের সময় খানিক বিরতি থাকলেও সকাল বি কুল কামাই নেই। বেশ মামায় ময়নাকে ছোট পেতলের ঘড়াটায়। কাঁকড়া কাঁকড়া পিঠভর্তি কালো এলো চুল। বাবুর হাটের রঙিন একখানা ডুরে শাড়ী পরনে। 'ডল' পুতুলই যেন একটি। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। পিং-দেওয়া পুতুলের মতোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার জন্ম ছটকট করে। কিন্তু এখন তো আর তেমন দৌড়কাঁপের স্বেগ নেই। বৈরাগী

বাড়ির বউ ও। রয়ে সয়েই চলতে হবে। ময়নার সময় সময় বড় অতিষ্ঠ মনে হয়। সময় সময় আবার ভালও লাগে। সুভোল হুঁবাহতে বলমল করছে কপোর চুড়ি ক'গাছা। পায়ের 'বল-ভোড়াও' নতুন তৈরী হয়েছে। মনের মতো বেশ ক'খানা রঙিন শাড়ীও পরতে পারছে। বিয়ের কনে বলেই না এসব পেয়েছে। নয়তো কবে আর এমন বাহারের জিনিস পেয়েছে ও!...মনের উৎসাহেই ছবেলা কলসী নিয়ে ধাটে যায় ময়না। আকুল আবেগে মায়াবী দৃষ্ট তুলে চেয়ে থাকে চরধলাব বুড়ী বটগাছটার দিকে। চঞ্চল হরিণীর মতো মনে মনেই চরময় ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে এক বলক নিশির দিকেও তাকাতে চেষ্টা করে। গুরুজনরা কেউ কাছে থাকলে মাথা নীচু করে দেয়। সই, খেলার সাখা, ঠাকুরমা, দিদিমারা ঠাট্টা-তামাসা করে। কলসীর জলের সঙ্গে কানায় কানায় ভরে ওঠে মনের আনাচে-কানাচে। দৈব ওদের আত্মগোষ্ঠানিক মিলনে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিশি তো ওর জীবন-মরণের সাথী ছাড়া আর কেউ নয়। পুতুল-মেয়ে—স্বভাবের চাপে যেন এক পাকা গিন্নী। প্রেম প্রীতি ভালবাসার ও যেন এক মৃত প্রতীক।...

চৈতালী প্রভাত। ঝিরঝির কবে বইছে মাতাল বাতাস। পূব আকাশে সূর্য ঠাকুর ধলেশ্বরীতে নেয়ে উঠলেন। কামারশালার টুকটুকে তাওয়াই একখানা যেন। নিশি একপাল গরু নিয়ে মাঠে চলেছে। বিয়েটা এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন ভড়কে গেছে ও। দোষ যেন ওরই। ওরই কপাল দোষে যেন মধুর এ দশা। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। পোড়া-কপালে লোককে কে আর স্নহজরে দেখে।...মনমরা হয়েই চলে নিশি। এর চেয়ে বিয়ের দিনটা ঠিক না হলেই ছিল ভাল। দিব্যি ময়নার সঙ্গে হেসে খেলে কাটাতে পারতো। এখন তো শুধু লুকোচুরি খেলা। ঘাটে পথে ময়নার সঙ্গে ওর যেন ভাঙ্গুর-ভাদ্রবউ-সম্পর্ক।...দম্ভে মরায় সার হয়েছে এখন। যাকে নিভূতে একক পাবার কথা—সে হয়ে আছে নাগালের বাইরে। কিন্তু—মন যে মানে না। বাণীতে ফুঁ দিলেই যে বেজে ওঠে, "রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি।"...আগে হলে দূরের বাধা ছুটে কাছে আসতো। আকুল হয়ে সুনতো একটার পর একটা গং। নয়তো হাত থেকে বাণী কেড়ে নিয়ে কিক করে..হেসে কেলতো—মুখোমুখি বসে গুড় মুড়ি খেতো। আর এখন? এখন তো রাধার পথেও সহস্র বাধা। বিয়ের কনে, দৌড়কাঁপ আর

চলবে না। কাছে ধেঁষতেও মানা। শহর নয় যে মন্ত্র যখন খুশি পড়লেও—
 অবাধ মেলামেশায় দোষ নেই। এ পাড়া গাঁ। এখানে আছে কঠোর
 সামাজিক শাসন। মন্ত্র পড়ে সাত পাক না দিলে নরনারীর মিলন এখানে
 অবৈধ। সে তুমি মোড়লের ছেলেমেয়ে হলেও ঠিক তাই। ছোটবেলায় এক
 সপ্তে খেলেছ—খেলেছ। এখন যখন বিয়ের বরকনে তখন শাসন মেনেই চলতে
 হবে। ...কিন্তু শাসনের প্রলম্ব এখনো ওঠেনি। মনই নিশির ভেঙে গেছে। মধুর
 জন্ম সময় সময় ভেতরটা বড় পোড়ায়। অমন ধর্মপ্রাণ মানুষ—কি করতে কি
 হয়ে গেলো। কে জানে, অদৃষ্টে আরো কি আছে। ঠাকুর বোধহয় ওদের
 মিলন চান না। ময়না কি তাহলে পরই হয়ে গেলো? অপরিণত মনে অনল
 জিজ্ঞাসা নিশির ...

প্রলম্ব ময়নাব মনেও উঠেছিল। কিন্তু এখন আব ওর কোন সংশয় নেই।
 ঠাকুরদার কাল অর্শোচটা মিটে গেলেই আবার মিলন হবে ওদের। এ দিবা
 রাত্রির মতোই সত্য। বিধাতা ওদের দু'জনকে মিল করেই পাঠিয়েছেন।
 ধরতে গেলে বিয়ে ওদের হয়েই গেছে। শুধু মন্ত্র পড়াটাই যা বাকী। সে আব
 এমন কি ব্যাপার। একদিন তা হবেই। অর্শোচ মিটে গেলেই হবে। ...
 ময়না নিশিকে স্বামী জানেই ভক্তি করে। খেলাব সাথী ছিল নিশি, এখন
 দেবতার আসনে বসেছে। হ্যাঁ, স্বামী তো দেবতাই। মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা
 তো তাই-ই শিখিয়েছে ওকে। স্বামীর অণু যে রূপই থাক না কেন—দেবত
 ছাড়া সে আর কিছুই নয়। অন্ততঃ ময়নার কাছে তো নয়ই। কিন্তু দেবত
 তো আর দানব নয়। তবে ওকে ভয় করার কি আছে? কলসীতে জল ভরে
 ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না, নিশিকে দেখে ফিক করে হেসে ফেলে।
 কচকচে বালুর ওপর ভোরের স্বচ্ছ জল। প্রভাতী রোদের কনক আভায়
 দীপ্ত। ওর ঢলঢলে মুখখানা খুবই উজ্জ্বল দেখায়। দেখে নিশিও হেসে
 ফেলে। শিশু দিতে দিতেই গরুর পাল নিয়ে এগিয়ে যায়। কলসী কাঁথে করে
 ময়নাও হাসতে হাসতেই জল থেকে উঠে আসে।

ঘাটে আর আর ঘারা ছিল প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ময়না
 নিশির চোখাচোখিতে কেউ কোন সাড়া দেয় না। হয়তো দেখতেই পায় নি
 কেউ। যদি দেখেও থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। ছোট ছোট ছুটি
 প্রেমিক প্রেমিকার পুতুল খেলা ভালই লাগে ওদের। কি স্বন্দর ছুটিকে
 দেখতে! ...কিন্তু ক্যান্ডর কথা আলাদা। রিক্তা নারী। আজীবন লাহনার

মধ্যেই কেটেছে। কারো এতটুকু স্বথ, স্বাচ্ছন্দ্য, রং-তামাশা আদৌ সহ হয় না ওর। কি পেয়েছে ও জীবনে? রূপ যৌবনের জৌলুস কি সংসারের কারো চয়ে কিছু কম ছিল ওর? এই রূপ দেখেই না বিশ্বাস বাড়ির বড় ছেলে ওকে বিয়ে করেছিল। সোনার চাঁদ বর—ধাসা চেহারা। কিন্তু নির্মম বিধাতা। মাত্র ন'দশ বছর বয়েস। হয়তো ঐ ময়নার সমবয়সীই হবে তখন। বরের বয়েসও নিশির মতোই। গা ভতি গয়না—ভাল শাড়ী—ভাল খাওয়া থাকা। পরীর মতো বউ পেয়ে বিশ্বাস বাড়িতে খুশীর বান ডেকেছে। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এসিয়াটিক কলেরায় চকিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গাপদ ঋতম। কমল-কলির চোখ আর ফুটলো না। যখন ফুটলো তখন অনাহৃত ভ্রমরের দংশনে সর্বাঙ্গ জর্জর। স্বস্তরকুলে ঠাই নেই ক্ষান্তর। মা বাবাও দৃষ্টি দৃষ্টি বছর কয়েকের মধ্যেই স্বর্গে গেলেন। দীঘির কমল পান্না পুকুরের পাকেই ভেসে ললো। সর্বশেষ ঘুরতে ঘুরতে এসে উঠেছে এই চরে। এখন তো বিগত যৌবনা এক বুড়ী মাগী। সামনের চারটে দাঁতই নেই। দগড়া দগড়া মেচেতা ঠাড়া কনক বরণ পোড়া কার্শে রূপান্তরিত। কপাল আর গালের বলিরেখা-খেলোও হুম্পট হয়ে ফুটে উঠেছে। আদরিণী আজ দু'মুঠো ভাতের কাঙালিনী। ঠা, এ সব বেহায়াপনা ও সহ করবে না। ঘাটে পৃথৈ নাগর নিয়ে কিসের এত লাটলি? লঘু গুরু জ্ঞান নেই!...পাশেই হুকোর গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ত মাজছিল গৌরদাসী। ওকে লক্ষ্য করেই ঝংকার তোলে ক্ষান্ত, দেখলিত রি, ছাই কপালীর তামসাদা? ছ্যামড়া গরু লইয়া যাইবার নৈচিল, কেমন থ' মারল?

তুমি চুপ কর দাদী। বয়সকালে অমুন একটু-আধটু কইরাই থাকে। তামরা কর নাই? গৌরদাসী গলার স্বর স্বাভাবিক রেখেই বাধা দেয়।

আল নাল ছেঁড়ী, না। আমাগ কালানে ইসব ছিনালী আছিল না, সমর্থন না যয়ে ক্ষান্ত রাগে কেটে পড়ে।

তুমি যে কি কও দাদী, এহন কি আর হ্যা কাল আচে? এহনকার পোলা গায়রা আগে ভাব করে—পরে বিয়া বয়। ও সব ছাইড়া জাও, পাশ কাটাতেই ঠা করে গৌরদাসী।

কিন্তু ক্ষান্ত ছাড়ে না। বলে, এত বাড়াবাড়ি বালো নয় ল বালো নয়। ঠাঁতির আগায় সিদ্ধুর উঠবার আগেইত দাদারে খাইচে, এহন ভাতারও কপালে কে কিনা জাখ। ছ্যামড়ারে যেভাবে মজাইচে, গিলা খাইতে কতক্ষণ?

গৌরদাসী এবার আর শাস্ত থাকতে পারে না। তীব্রভাবেই বাধা দেয়
কি তুমি যা তা কইবার নৈচ! তোমার মুখে কি কিছু আটকায় না? মাতবরে
কত সাদের কোলের পোলা, হ্যারে তুমি এই সব কও! যাইট বালাই, বাইচ
খাউক।...

আল আমিওত হেই কতাই কই। ঐ ডাইনী মাগীর নজরের খন ছুটবার
না পাল্লে কি ছ্যামড়া বাঁচব? তুই না দিনের মদে সাতবার যাচ মাতবর বৌয়ের
কাচে, কতাডা কানে দিবার পারচ্ না?—ক্ষ্যাস্ত গলার স্বর খাদে নামিয়েই
জবাব দেয়।

কিন্তু গৌরদাসী এবার সপ্তমে ওঠে, সাতবার আবার যাইবার দেখলা তুমি
কোনহানে? দিনে রাইতে তুমিওত কমবার যাওয়া আসা কর না, তুমি কইলেই
পার! আমি ইসব মোন্দ কতা কইয়া মোন্দ অইবার যামু কোন দুখে?

আল মোন্দ অবি নাল মোন্দ অবি না। বাড়িতে আবার পাকা ফলার অইলে
তর ডাক পরব, জ্ব কঁচকিয়েই জবাব দেয় ক্ষ্যাস্ত।

পাকা ফলারের লোবে তোমার মতন লাং-লাং কন্তে কন্তে আমার
মাইনধের বাড়িতে যাই না। অম্ন সাত হাত নোলা আমাগ না। মাইনধে
আমাগ আপনার খেইকাই ডাকে।...

গৌরদাসী কথা শেষ করতে পারে না। ক্ষ্যাস্ত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে
ফেটে পড়ে, কি কলি, তুই আমারে খাওয়ার খোটা দিলি। তর মতন কবে ল
আমি মাইনধের লগে ঢলাইবার যাই? বাড়িতে আইসা নিমন্তন্ না কলে
ক্ষেপ্তি কারুর বাড়ি হাগতে মুত্তেও যায় না।

আহা-হা, ছিনালরে আবার মাইনধে পায়ে ধইরা সাদবার আহে। মাইনধের
বইয়া গেচে! নিশার মার লগে তর কাইজা আচিল নাল হারামজাদী। পাকা
ফলারের গন্দ পাইয়া তার পায়ে তুই ত্যাল দিবার যাচ নাই?

সাপের মুখে ধুলা-পড়া পড়ে যেন। রাগের মধ্যেও কিছুটা লজ্জা পায় ক্ষ্যাস্ত।
ঘাটের পথে একা পেয়েই কুম্বের সঙ্গে যেচে দুটো কথা বলেছিল। হয়তো
একটু দীনতাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কিন্তু সে কথা যে মাতবর বউ তামাম
লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে একথা ও ভাবতেও পারেনি। কপাল মন্দ তাই
সকলেই হেলাফেলা করে। রাগে দু'চোখ কেটে জল বেরোতে চায় ক্ষ্যাস্তর।
তবু দম রেখেই গৌরদাসীকে পাণ্টা জবাব দেয়, ঢলাইবার গেচিলাম বেইশ
করচিলাম। অরা আমাগ আত্মীয়। তর কি ল কইড়া খানকী?

আল আমার আত্মীয় আলি ল! দীহু বৈরাগী কি তর বাপ না?—ভেংচি কেটে জবাব দেয় গৌরদাসী।

ভেংচি ক্ষ্যান্ডও কাটে। বলে, আমার বাপ অইবার ঘাইব ক্যান, তর বাপ। তগ চৈন্দ পুরুষের বাপ ভাতার। খানকী, ছাই কপালী, হাবামজাদী...এক নিশ্বাসে উন্নাদিনীর গায় বকতে থাকে ক্ষ্যান্ড।

গৌরদাসী মুখে আর কিছু না বলে তেড়ে এসে গলা চেপে ধরে।

ঘাটময় সোরগোল পড়ে যায়। আশপাশের আর সকলে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারাও হকচকিয়ে ওঠে। পতুর মা ভারিকী মাগুয। নিকটেই বালি দিয়ে কলসী মাজছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাড়িয়ে দেয়। টানতে টানতে গৌরদাসীকে নিয়ে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।

যাচ্ছেতাই করে গালি দিতে দিতে বাড়ির দিকেই বওনা হয় গৌরদাসী। যাবার সময় সব কথা কুহুমকে বলবে বলেও শাসিয়ে যায়।

ভয়ে ঠকঠক কবে কাঁপতে থাকে ক্ষ্যান্ড। আন হয়তো ওব পাকা ফলাবের আশা নেই। তাব চেয়েও ভাবনাব কথা, প্রায়ই যে চেয়ে-চিন্তে ভ'মুঠো আনে মাতব্ব বোয়েব কাছ থেকে তাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। না, কপালই ওব মন্দ। নইলে অগুদিন যে কত রসিয়ে রসিয়ে সায় দেয় সে আজ এ রকম চটেবে কেন? এত দুঃখও কপাল আছে বাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলে ক্ষ্যান্ড। ইস, ছিনালটা এমন করে পরেছিল যে গাল গলা এখন টাটাচ্ছে। গলায় হাত বুলাতে বুলাতে এবং গৌরদাসীকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে ক্ষ্যান্ডও ঘাট থেকে উঠে যায়।

॥ ২০ ॥

চরখলা আর চরফুটনগরের চাষীদের পাট বোনা নিবিয়ে শেষ হয়। এখন সময়মতো পরিমিত বৃষ্টি আর জল হলে ফসল ভাল হবারই আশা। এখনকার কাজ শুধু তীক্ষ্ণ নজর রাখা। গরু বাছুরের ভয়ই সব চেয়ে বেশী। চারা ফনফনিয়ে উঠবার মুখেই যদি ওদের দাঁত লাগে তাহলে ভাল ফল লাভের আশা নেই। কুচুটে মাগুযের দৃষ্টির ভয়ও কম নয়। এক একজনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাধানো থাকে। অঙ্করেই জলে-পুড়ে যায় সব। হাতে বিশেষ কোন কাজ করতে না হলেও ক্ষেতে প্রত্যেককেই নিয়মিত বে করতে হয়। ঘুরে কিরে

দেখতে হয় কোথাও কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। সামনের মাসধানেক তো প্রত্যেকেরই একরকম ছুটি। তারপর আবার একটু খাটা-খাটুনি করতে হবে। চারা হাতধানেক বড় হলেই নিড়িয়ে দিতে হবে। বেশ কিছু খরচাও ওতে আছে। আগাছা আর অপুষ্টি চারা হিসেব করে বেছে ফেলতে হবে। উপযুক্ত নিড়ানির উপরেই নিভর করে ভাল ফসল। একটা চারার সঙ্গে আর একটা চারার দূরত্ব বেশ হিসেব কবে রাখতে হবে। বাড়বার মুখে মাথায় মাথায় জড়িয়ে গেলেই সর্বনাশ। ফসল তো ভাল হবেই না—পোকা ধরারও সম্ভাবনা থাকে। পাকা চাষীকে অবশ্য তা নিয়ে বেশী ভাবতে হয় না। জরিপ-বিদের চেয়েও তীক্ষ্ণ ওদের দৃষ্টি। এক নজর দেখেই কান্ডে চালাতে পারে। এমন কি গান গেয়ে গেয়েও পারে। এ সময় যাদের ঘরে দু'মুঠো চাল-ডাল আছে তাদের পরম সুখ। আত্মীয় কুটুমের বাড়ি যাও, প্রাণ খুলে দয়াল চানবে ডাকো, গভীর রাত পর্যন্ত খোল বাজিয়ে কীর্তন করো। মনের আনন্দে কলকব পর কলকে তামাক খাওয়া তো আছেই। অভাব থাকলে ঘরে বসে কুলো কাঠা বুনো, গরু দুইয়ে দুধ নিয়ে গঞ্জে যাও, নয়তো বেচ ঘাস। গঞ্জের হাতে তরিতরকারি বেচারও স্বেযোগ আছে। উৎসব করার মতো প্রাচুর্য না থাকলেও দিন কারো মন্দ কাটে না। সব চেয়ে আশার কথা, মা লক্ষ্মীর চরণ রাখার জন্ত আসন পাতা হয়েছে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে। একবার উনি পা রাখলে আর কথা কি। মুঠো ভর্তি আসবে করকরে টাকা—সারা বছরের বাড়তি খরচা। আশায় আনন্দে দিন একরকম ভালই কাটছে।

বৈশাখের শেষাশেষি নিড়ানি আরম্ভ হয়! কালবৈশাখী বড় জলে বীজ ধুয়ে মুছে যায়নি। চারাগুলি বেশ ফনফনিয়েই উঠেছে। শত শত কান্ডের চলে অবিরাম কাজ। প্রচণ্ড রোদ মাথার ওপর। কিন্তু সবুজ চারাগুলি ওদের দৃষ্টিতে এনেছে আশার স্বপ্ন। সোনার খনিই যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওরা। ক্লাস্তি নেই, বিশ্রাম নেই, এমন কি ঘুম পর্যন্ত নেই দু'চোখে। ক্ষেতে জল ঢোকান আগেই চারাগুলিকে মাথা বাড়া দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি যোগাতে হবে। ওদের হাতের কান্ডেই হলো সে শক্তির উৎস। ভাল নিড়ানি হলেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে ওরা। নয়তো সমূলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বর্ষার বংলী ধলেশ্বরী। বালি চাপা দিয়ে গিলে ফেলতেও পারে নাগ-নাগিনী। চাষীদের নাইবার খাইবার সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

কান্তে হাঁতে অনন্দও ক্ষেতে নামে। কিন্তু এতো ওর একার কাজ নয়। সন্ধে চাই আরো জন পাঁচ সাত। সকলে মিলে একযোগে কাজ করলেই নির্দিষ্ট সময়ে নিড়ানি শেষ হতে পারে। কিন্তু দিদি যে লোকের কথা মুখেও আনছে না। দম বন্ধ হয়ে মরবে নাকি ও? এক তো সকলের শেষে চাষ হয়েছে। নিড়ানিও যদি সময়মতো না পড়ে তাহলে চারা বাড়বে কি করে?... অপেক্ষা করে করে তেলে-বেগুনেই জলে ওঠে একদিন। দুর্গা ঘর নিকোচ্ছিল, আনন্দ তোড়া দেয়, অ দিদি, বলি তোমার মতলবখানা কি কও ত? কয়দিন ধইরা কইবার নৈচি নোক নেই, তা তুমি হ হ-ই করচ না। চারাগুলির কি সর্বনাশ করবা নাকি? জল যে দিন দিন বাড়বার নৈচি হাদিগে দেখচ ত?

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে তবে কুমার বাহাদুর আসছেন না কেন? হ্যাঁ, জল প্রথম দিকে দিনকয়েক বেড়েছিল বটে। বৈশাখী হাওয়ায় বেশ বড় বড় টেউ জাগছিল বংশী ধলেশ্বরীর বৃকে। হয়তো আর কিছুটা বাড়লেই চারদিকের খাল বিল ছুটতো। কুমার বাহাদুরের বোট আসতেও বিলম্ব হতো না। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই যে আবার কমে গেলো। ঘাটলার দুটো সিঁড়ি ডুবেছিল তিনটে আবার জেগে উঠেছে। কপালই মন্দ। এখন আবার একটু-আধটু বাড়ছে বটে। কিন্তু এ বাড়ায় তো কাজ হবে না। কুমার বাহাদুরের 'বোট' ভাসলেই কথা। টাকা কোথায় যে লোক নেবে। পাঁচটি লোক নিলে খোরাকীর চালই চাই কম করেও দৈনিক পাঁচ সাত সের। তারপর আছে মজুরীর টাকা। নিজেদের না হয় যা জুটছে আধ-পেটা খেয়ে কাটছে। পর লোক না খেয়ে কাজ করবে কেন? ঠাকুরমশায় তো রোজই গঞ্জের কাছারিতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মালিক না এলে উনিইবা আর কি করতে পারেন। নিজেইবা চাই কি করে। একটা মাহুসকে কতবার অভাবের কথা বলা যায়... আনন্দের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আকাশকুসুম ভাবতে থাকে দুর্গা।

ওকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ আরও চটে যায়। বলে, চূপ কইরা রইলা যে, কি করবা কইবা ত?

কি আবার করুম, যা পারচ নিজে কর, বিরক্তির সন্ধেই এবার জবাব দেয় দুর্গা।

নিজে করুম। ইডা কি একলার কাম? আনন্দের কণ্ঠে বিশ্বয়ের স্বর।

তবে চূপ কইরা বইসা থাক,—উগাসীন থেকেই বলে দুর্গা।

না, তোমার মাথাই খারাপ অইচে। আমবা বইসা থাকলে কি জল আমাগ
লেইগা বইসা থাকব ? সব না তলাইয়া লইয়া যাইব।

গেলে আমি কি করুম ?—দুর্গা পাশ কাটাতেই যায়।

তুমি করবা না তয় কি আমি করুম ? তহন ত কইলা, আনন্দ কাম কর।
চাষে মোন্ দে। এহন চোক উন্টাইয়া থাকলে চলব ক্যান ?

যা তা কইচ না আনন্দ। কইলাম ত, পারচ নিজে কর না পারচ
চূপ কইরা বইসা থাক।

হ, বইসা থাকলেই খাওয়ন আইব আর কি ? আমি যাই, বিয়াই মশইর
লগে পরামশ্ত করিগা, আনন্দ সকালের পাস্তা না খেয়েই বেরিয়ে যাবার
উপক্রম করে।

দুর্গা ধমক দেয়, বালো অইব না আনন্দ। পানরা গিলা (খাবার খেয়ে)
ক্ষ্যাতে যাবি নাকি যা। তর আর মোড়লগরি করন লাগব না।

আনন্দ মনের রাগে ফিবে দাঁড়ায়। বলে, বেইশ, আমি কিচুব মন্দে থাকবার
চাই না। তবে পরে যান আমারে আর কইয় না, আনন্দ ইড়া কর ওড়া কর।

আইচ্ছা, তাই অইব। এহন খাবি নাকি থা।

আনন্দব আজ আর খেতে মন চায় না। এত পরিশ্রম কুরেছে, সব ভেসে
যাবে! দিদির মাথায় যে কি মান-সম্মের বাই ঢুকেছে তা ভগবানই জানেন।
আপনজন দীহু বৈরাগী—কত স্নেহ করেন—ভালবাসেন। ঘরের কণা তাঁকে
বললে ওনার মানের হানি হবে। যাক, যা পারে করুক। আমি আর কিছুতে
থাকছিনে !...ভাবতে ভাবতেই অনিচ্ছাসম্মেও রান্নাঘরের দিকে যায় আনন্দ।
পেঁয়াজ পাস্তা অতি প্রিয় হলেও আজ আর তেমন রোচে না।

খেয়ে-দেয়ে আনন্দ বোধ হয় ক্ষেতেই চলে যায়। দুর্গার ভাবনা উখাল দিয়ে
ওঠে। জোর করে আনন্দর মুখ বন্ধ করে দিলেই সমস্তা মিটবে না। কিন্তু
কি করতে পারে ও ? ভাগ্য যদি পদে পদে প্রতারণা করে তাহলে ওর
দোষ কি ? রামকান্ত তো রোজই এসে আশ্বাস দিচ্ছেন। নদীর বুকোও ছোট
ছোট চেউ জাগছে—জল বাড়ছে। গ্রহ-দোষ কাটলে হয়তো কুমার বাহাদুর
শীগগীরই এসে পড়বেন। ঠাকুরমশায়ের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো
আসা মাত্রই টাকা হাতে আসছে। দিনকতক দৈঘ ধরে থাকাই সমীচীন।
পার ছাড়িয়ে ক্ষেতে জল উঠতে এখনো ঢের বাকী। কিন্তু তার আগেই দ্বিতীয়
বার নিড়ানি দিতে হবে। চাষ যখন সকলের পরে হয়েছে নিড়ানিও না হয় তাই

হবে ।...এলোমেলো চিন্তায় হাতের কাজ আর এগোয় না দুর্গার। দু'এক পৌছ দিতে না দিতেই আবার ভাবে, চাইলে হয়তো ঠাকুরমশায় আরো কিছু দিতে পারেন। খালি হাতে যে একযোগে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে পারে সে কি আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে পারবে না? টাকা পঁচিশেক হলেই তো এ যাত্রা চূকে যায়। সেই ভাল, আজ বিকেলে এলে মুখ ফুটে চাইব।... ঝিমিয়ে পড়া মনে একটু বল পায় দুর্গা। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ঘাটে যায়। যেতে যেতে ভাবে, আনন্দটাকে ওভাবে দাঁতখিঁচুনি না দিলেও চলতো। বেচারী, কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। এরকম উৎসাহ থাকলে ক'দিন আর লাগবে ঋণশোধ করতে। দু'জনের সংসার, বেশ কেটে যাবে। না না, দু'জনইবা হবে কেন? মায়নাব বিয়েটা হয়ে গেলে ঋণ যদি শোধ হয়ে যায় তাহলে আনন্দকেও আবার বিয়ে দিতে হবে। এই বয়সে ও কেন নেংটা শিব হয়ে থাকবে? নিজেব নিলানই বা দেখবে কে? হাজার হোক, মেয়ে মেয়ে। বিয়ে দিলেই সে পর চয়ে যায়। আনন্দের যদি ছেলে-পুসে হয় তাহলে ওদেব নিয়ে বেশ ভুলে থাকা যাবে। হ্যা, প্রথম স্ত্রযোগেই ওব একটা বিয়েব ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধিই না হয় একটু কম। কিন্তু ওর মতো এমন স্বাস্থ্য ক'জন অবিয়ত ছেলেব আছে?...ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘাট পেকে ডুব দিয়ে ফেবে দুর্গা।

- রামকান্ত প্রায় প্রতিদিনই দুর্গার খোঁজপবর নেয়। কোনদিন বা ভাগবত পাঠে যাবাব পথে কোনদিন বা ফেবাব সময়। পথে ভাবতে ভাবতে আসে, আজ মনের কথা মুখ ফুটে বলবোই। এত করছি, একটু অনুকম্পা কি করবে না ও? ওকি কিছু বোঝে না? নিশ্চয় বোঝে, নয়তো মেয়ের মা হয়েছে কি করে।...রামকান্তর তৎপরতা বেড়ে যায়। মুখে মধু ঢেলেই উঠোনে পা দেয়। দুর্গা যেখানেই থাক ছুটে এসে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিতে কহর করে না। আনন্দ বাড়ি থাকলে তাড়াতাড়ি হ'কো এনে হাজির করে। আদর আপায়নের বিন্দুমাত্র ক্রটি নেই। কিন্তু ঐটুকুই। দুর্গা যেমন রাশভারি তেমন রাশভারিই থেকে যায়। প্রয়োজনের সব কথাই বলে কিন্তু চোধ মুখ গুরুগম্ভীর। বলি বলি করেও এ পর্যন্ত মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি রামকান্ত। কিন্তু তবু আসে। একরকম রোজই আসে। না এসে উপায় নেই তাই আসে। কোন কোন রাত বিছানায় শুয়ে ভাবে রামকান্ত, ওকি মনোহিনীর মায়ন

পড়েছে ? পুরাণে তো আছে, মহামায়া নানা বেশে অসুরকে ভুলিয়ে বধ করেছেন। দুর্গা কি সেই মায়ার ফাঁদই পেতেছে ওর সঙ্গে ? পঞ্চাশ টাকা কর্ত্ত হয়েচে নায়ের রাখালের কাছে। দৈনিক টাকা প্রতি দু'পয়সা হুদ। দশ পাঁচ দিনের ভেতর কুমার বাহাদুর আসবেন—তাঁর নিকট থেকে দুর্গাকে কর্ত্ত নিয়ে দেবো—সমস্ত ঝগাট চুকে যাবে। কিন্তু দশ পাঁচের জায়গায় যে মাসেক হতে চললো। এখনো কবে উনি আসছেন বলা যায় না। তাছাড়া এসেই যে টাকা দেবেন তারই বা স্থিরতা কি ? মধু মণ্ডলের সম্পত্তির ওপর তো কোন আকর্ষণই নেই ঠর। সকল আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ দুর্গা। মনে হয় সেখানেই ঠর দৃষ্টি। কিন্তু পাশার ছকে যদি দুর্গাকেই হারাতে হয় তাহলে আর লাভ কি হলো ?...ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলেই চলে রামকান্ত। বাত গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে তবু ঘুম নেই দু'চোখে। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—মায়াবিনী রাক্ষুসী। আবার পঁচিশ টাকা দিতে হবে ওকে। কিন্তু কেন ? কি দিয়েছে ও বিনিময়ে ? যে নিজে কিছু দিতে জানে না, সে এত চায় কোন লজ্জায় ?...কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে রামকান্তের। উঠে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আসে। মায়াবিনী রাক্ষুসী মুহূর্ত্তে আবার প্রেমময়ী—কপময়ী হয়ে ওঠে। না না, যেভাবেই হোক পঁচিশটা টাকা ওকে দিতেই হবে। এতে এত ভাববারই বা কি আছে ? প্রের দেওয়া আংটিটা তো এখনো সফল আছে। অবশ্য দিব্য দিয়ে দিয়েছিল খাসিয়া হুন্দবী। কোনদিনই যেন হাতছাড়া না করি। কিন্তু তা কি করা যাবে। মানুষ কি সকল অবস্থায় সকল দিব্য রাখতে পারে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আংটিটা বেচেই দুর্গাকে টাকাটা দিয়ে দেবো। হয়তো দু'চার টাকা হাতেও থাকবে। হ্যাঁ, তাই দেবো। হয়তো এই আংটিটাই অপয়া। প্রের প্রেতাঙ্গাই হয়তো দুর্গার পথ রোধ করে আছে। যত শিগগীর সম্ভব এটাকে দূর করাই সমীচীন। সম্ভব হলে কালই গঞ্জে যাবো।...ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে রামকান্ত।

আরো পঁচিশ টাকা দুর্গা একরকম বিনা আয়াসেই পায়। শুধু নিরি-বিলিতে এক কক্ষে তামাক সেজে খাওয়ানো আর মুখফুটে বলা। রামকান্ত ভাঙেই গলে জল হয়ে যায়। রামকান্ত তো তুচ্ছ, কুমার বাহাদুরও হয়তো গলে জল হয়ে যেতেন ওর কাম-কটাক্ষে। অবশ্য দুর্গাকে এক্ষেত্রে কোন কটাক্ষপাত করতে হয়নি। ওর মৌন ভাবগস্তীর মুখাবয়বই রামকান্তকে পাগল করেছে। অমৃত সায়রে রামকান্ত বোধ হয় হাবুডুবু খেয়েই মরবে।...

টাকা পেয়ে দুর্গা সময় বিশেষের জন্ম অনেকটা নিশ্চিত হয়। নিড়ানির কাজ একরকম করে হয়ে গেলো। আনন্দ খুব খেটেছে। তিনজনের কাজ একাই করেছে ও। কাজ না পেলেই মানুষ অকেজো হয়ে পড়ে। কই এখন তো ওর মধ্যে কোনরকম গাফিলতি দেখা যায় না। তামাক ও এখনো-প্রচুর পরিমাণে খায়। কিন্তু আগের মতো এখন আর ওকে তামাকে খেতে পারে না। এক ছিলুম তামাকের শোভ দেখিয়ে এখন আর কেউ ওকে বশও করতে পারবে না। আনন্দ তো এখন রীতিমতো কাজের লোক হয়ে উঠেছে। কাজই ওকে রীতিমতো কর্মী করে তুলেছে। কাজ না থাকলে মানুষ অলস হবে না তো কি হবে?...

দুর্গার আশু প্রয়োজন মিটেছে। ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় থাকলেও বর্তমান ও নিশ্চিত। কমলী যখন বিয়িয়েছে তখন শাকাম জুটেবেই। দু সের দুধ তো বাঁধা। বর্ষার মুখে দরও থাকবে ভাল। কম করেও সের প্রতি দু-আনা পাওয়া যাবেই। দুঃখ, ময়নার ঠাকুরদা একটা ফোটাও মুখে দিয়ে যেতে পারলেন না। অতটুকু বাছুর এনেছিলেন কমলীকে। সংসারে নিস্ত্র অভাব চলেছে। তবু তারই মধ্যে বড় হয়েছে ও। আজ তো অমৃতদায়িনী মা। ওর মাতৃধারাই আজ তিনটে প্রাণীর বড় সহায়। নিড়ানির কাজ শেষ করে দুর্গা আজ সত্যি সত্যি নিশ্চিত। এরপর আরো প্রচুর টাকার প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু তার জন্ম বিচলিত হবার কিছু নেই। দয়াল রামকান্তই রয়েছেন। নিঃস্বার্থভাবে কি না করছেন বেচার। কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে টাকা পেলে সর্বপ্রথম ওঁর টাকটাই শোধ করে দিতে হবে। বলা যায় না মানুষের কখন কি প্রয়োজন হয়। লজ্জায় হয়তো কিছু বলতেই পারবেন না। আশ্চর্য মানুষের মন। এই মানুষ সখদেই একদিন আমি কি জঘন্যতম ভাবনা ভেবেছি। একান্ত অনুকম্পা বশেই না যখনকার যা করে যাচ্ছেন উনি। নয়তো আমার কি গুণ আছে।...দুর্গা মনে মনে প্রণাম করে রামকান্তকে।

বহু ভাবনা-বিচলিত দুর্গা নিশ্চিত হয়। কিন্তু খাওয়া-পরায় নিশ্চিত রামকান্ত দিন দিন তলিয়ে যেতে থাকে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াই হয়তো খেলে চলেছে ও। দান তো এখন হারের দিকেই। প্রের স্মৃতি বিজড়িত আংটিটাও শেষ পর্যন্ত বিক্রিয়ে দিতে হলো। বেচার। প্রে। স্মৃতিতে দেহ—বুকভরা আশা। যে বয়সে মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কাঁটায় কাঁটায় সেই বয়সেই হয়তো হবে ওর।

চা বাগানের দ্বারা নিয়ত ওকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওর বৃড়ী মাও ওকে
 অবলম্বন করয়েই খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রে তা
 পারলো না। শরতের শুভ্র শিউলীর মতোই নিভূতে এসে আত্মসমর্পণ করলো।
 সঙ্গে বাবার গচ্ছিত একরাশ টাকা ও কিছু সোনাদানা। বললে, ভট্টাচার্য,
 আমাকে তোমার বউ করো—চলো আমরা এখান থেকে পালাই।...ভট্টাচার্য
 উচ্চারণ করতে পারতো না প্রে। ভট্টাচার্য বলেই সন্ধান করতো। কিন্তু
 উচ্চারণে কি এসে যায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারী সাপের ফণাও হাতের
 মূঠায় চেপে ধরতে পারে। নিশ্চিন্ত বুঝা গেলো, তাড়া খেয়ে আশ্রয় চাচ্ছে প্রে।
 অমুরাধা তখন স্মৃতিবায় ধুকছে। যমদূতের কাঁধে চড়ে বসে আছে বললেই
 হয়। ভাগ্যই বোধ হয় হাত ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। অর্পেক
 রাজত্ব আব রাজকণা। জানি না, কি দেখেছিল ও এই দীন ব্রাহ্মণের মধ্যে।
 তবে ওর মুখে শুনেছি, ওর ধাবণা, বাঙালীবা সত্যিকারে ভালবাসতে জানে।
 ধরের বৌয়ের মর্দাণা একমাত্র তারাই দিতে পারে। প্রেব কথায় হাস
 পেয়েছিল। অমুরাধা তখন গত হয়েছে। ও হয়তো তার কোন খবরই রাখতো
 না। রাখলে কি আর কখনো পারতো এমন করে আত্মসমর্পণ করতে?...
 ধন আর মান একসঙ্গে উজাড় করে তুলে দিলে উন্মাদিনী। এ কোন
 অমুরাধার কথা নয়। নৈবেদ্য সাজিয়ে সত্যি সত্যি দেব পূজাতেই মেতে
 উঠলো অনাঘ্রাতা নারী। কি সে নিষ্ঠা—কি সে আকুলতা। সময় সময় বড় ভয়
 হতো। মুখের দুধ সরে গিয়ে বিয়ের হাঁড়ি বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ। নারী
 তো শুধু আর প্রেমময়ীই নয় রুদ্রাণীও সে। যেহাতে স্বধা পরিবেশন কবে
 সেই হাতেই খজা ধরে।...কিন্তু ভাগ্য সেদিন স্মপ্রসন্নই ছিল। প্রে তখন
 জোয়ারের জলে সাঁতার কাটছে। খোঁজখবর নেবার সময় 'নেই ওর। প্রে ছাড়া
 শাবকের অকল্যাণ চিন্তায় হিংস্র বাথিনীর মতো যে গর্জে উঠতো সেও আর
 বেঁচে রইলো না। প্রের বৃড়ী মা মার পথেই স্বর্গে গেলো। আমি স্বস্তির হাঁক
 ছেড়ে বাঁচলাম। না না, প্রতারণা আমি করতে চাইনি। মাছুষ যা চায় তার
 সব কিছুই ছিল প্রের মব্যে। হোক বিধর্মী—ভিন্ন সমাজ হুহিতা, প্রে আমার
 জীবন সঙ্গীনীই।...প্রেও খুশীতে ডগমগ। খুশীর বাধ ভেঙেই ওর কোলে
 আঁগন্তক আসছে। কত রঙিন কল্পনা মনের মণিকোঠায়। দারুণ শীত
 আসামে। দু'জোড়া মোজা, টুপি, সোয়েটার—রাম না জন্মতেই রামায়ণ
 রচনা শেষ হয়ে যায় প্রের। কিন্তু হায়রে নিয়তি। বর্ষার ঢল নেমেছে

পাহাড়ের গা বেয়ে। সাত দিন অবিরত বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলায় কাঠের ছোট্ট একখানি ঘর। সিঁড়িও কাঠের। প্রে সাত মাসের অস্থঃস্বা। চর্চাৎ একদিন জলের বালতি নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায়। প্রায় দোতলার কাছ থেকে গড়াতে গড়াতে এসে এক তলায়। আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অর্টচতন্ত্র। চক্ষিণ দন্টা পর হাসপাতালে চৈতন্ত্র ফিরলো। কিন্তু প্রে আর উঠে দাঁড়ালো না। তিনদিন পর মরা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে জন্মের মতো চোখ বুজলো। মরণের দন্টীধ্বনি বোধ হয় প্রে আগেই স্তনতে পেয়েছিল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অনামিকা থেকে থলে আংটিটা আমার কড়ে আঙুলুকে পরিয়ে দিলে। বললে, ভট্‌চাষ, আমাকে মনে বেখো। সন্তান হলে তাকে মানুষ করো। আমি আর বাঁচাবো না।...

প্রে'র অল্পরোব দীর্ঘকাল রক্ষা করেছে। এমন অনেক দিন গিয়েছে উপোস দিতে হয়েছে। তবু প্রে'র দেওয়া আংটিটা হাত থেকে খুলিনি। আজ দুর্গা পূণ ভঙ্গ করালো। তা আমি কি করবো? দুবার নিয়তি।...আংটি বেচে দুর্গাকে টাকা দিয়ে এসে রাত ভোর ভাবতে থাকে রামকান্ত। প্রে স্বেচ্ছায় নিজকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল। আর দুর্গা? না না না, এ পাপাচার—এ অন্ডায়। ভাগবতের ঠাকুর, তুমি আমকে বাঁচাও। ভুল করেও দীর্ঘকাল আমি তোমাকে স্মরণ করেছে। তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাকে রক্ষা করো! আমি পালিয়ে যাবো এ চর থেকে। রক্ষা করো, রক্ষা করো দয়াময়...।

নিরুম নিস্তরু চর। রামকান্ত ছাড়া বোধ হয় কেউ আর জেগে নেই। ঘন ঘন বিবেকের ছোবল পড়তে থাকে রামকান্ত'র মগজে। অন্ধকারে ভেসে ওঠে প্রে'র দুটি সজল সক্রুপ আয়ত আঁধি।...

সান্ধ্য জল ভরতে প্রতিদিন ময়নাই ঘাটে আসে। কিন্তু ময়না আজ বেলাবেলি সহইয়ের বাড়ি গেছে। সূর্য ডোবে ডোবে পেতলের বড় কলসীটা কাঁখে করে দুর্গাই আজ জল ভরতে আসে। বালি দিয়ে কলসীটা মাজতে মাজতে চোখ তুলে তাকায় পাট ক্ষেতের দিকে। বেশ পুষ্ট হয়েই বাড়ছে চারাগুলো। এরপর আছে দ্বিতীয় দক্ষা নিড়ানি। তাতেও একগাণা টাকার দরকার। ঠিকমতো যত্ন করতে পারলেই স্বকলের আশা করা যায়।...

ভাবতে ভাবতে গঞ্জের দিকে চোখ ফেরায় দুর্গা। ওকি। কাছারির ঘাটে ও তো গ্রীনবোটাই! গোধুলির আবীর রঙের সঙ্গে বোটের তলার সিঁদুরে রং একাকার হয়ে জল জল করছে। ও তো কুমার বাহাদুরেরই বোট। ঐ তো তাঁর নিশান উড়ছে প্রতীক চিহ্ন নিয়ে। ঠাকুর তাহলে এতদিনে দয়া করলেন। দ্বিতীয় দফা নিড়ানির ভাবনা তাহলে আর ভাবতে হবে না। জল যেভাবে বাড়ছে এভাবে বাড়লে আর পনেরো বিশ দিনের ভেতরেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তা হোক, নিড়ানি কেন, একেবারে কাটা, বাছাই, খোলাইয়ের খরচা পর্যন্ত ঋণ নেবো। মায় ভট্টাচার্য মশায়ের টাকা।...মনের উল্লাসে জল ভরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে দুর্গা। উনি যদি ভাগবত পাঠে যাবার পথে দেখা করে যান তাহলে তখনই ওকে খবরটা বলবো। আবার এমনও হতে পারে আমার বলবার আগে উনিই আসবেন খবর বলতে।

দুর্গার ভাবনা ঠিকই হয়। ওর অনেক আগেই রামকান্ত ঘাটে বোট ভিড়তে দেখেছে। ওর গরজের চেয়ে রামকান্তের গরজ টের বেশী। প্রের আংটি গিয়েছে যাক কিন্তু রাখালের লেলিহান চোখ নিয়ত তেড়ে আসছে ওকে। টাকা প্রতি দিনে দু'পয়সা হ্রদ। কাবুলিওয়লাও যে হার মানবে।...ছুটে কাছারিতে যায়। কিন্তু কথা বেশী কিছু হয় না। শুধু কুশলবার্তাই আদানপ্রদান হয়। ভক্তি গদগদ চিত্তে পদরজ মস্তকে ঠেকাতেও কহর করে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ ভীষণ ব্যস্ত কুমার বাহাদুর। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু রয়েছেন জনকয়েক। আজ আর রামকান্তের মতো চাটুকায়ের প্রয়োজন নেই।...

রামকান্ত নিজ থেকেই “কাল অসবো হুজুর” বলে চলে আসে। অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওতে বিরক্তির কারণই বাড়বে। না না, ভয়ের কিছু নেই। এইতো সবে এলেন। পথের ক্লাস্তি বলেও তো একটা কথা আছে। তা'ছাড়া সঙ্গে বন্ধুজন রয়েছেন। এর চেয়ে কি আর খাতির করতে পারেন? প্রসন্নভাবেই তো কুশল জিজ্ঞেস করলেন। নিজের মনেই একথা সেরে কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর দুর্গার কাছে হাজির হয় রামকান্ত।

বদার আগে নিজেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে থাকে, তোমার কপাল খুলল বুউ-গিন্গী। লক্ষ্য করেছ বোধ হয় কাছারির ঘাটে বোট লেগেছে?

দুর্গা ঘাড় কাত করেই সমর্থন জানায়। ওঠে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি।

রামকান্ত গদগদ হয়েই বলতে থাকে, বলেছিলাম না, দুঃখ কারো চিরদিন থাকে না। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকলে উদ্ধার তিনিই করবেন।

ভগবান তো আছেই। কিন্তু আপনিই তার উপলক্ষ। আপনি না দেখলে
কারা আমাদের বাঁচাইত, দুর্গা উত্তর করে।

না না, আমি কে ? তোমার বরাতেই সব হচ্ছে। কাল কুমার বাহাদুর
যেতে বলেছেন। আশা করি কালই সব ঠিক করে ফেলতে পারবে।

হ্যা ভাবনা আপনার। একটু বহেন, আমি তামুক ভইরা আনি।

না থাক, বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন উঠি।

তা কি হয় ? বালো একটা খবর আনলেন মিঠাই খাওয়াইবার না অয় না
পাল্লাম, তামুক ছিলুমও কি খাওয়ামু না।

কিন্তু ওরা যে আবার সব খোল করতাল নিয়ে বসে আছে, রামকান্তর কেন
যেন আজ একটু আদর খেতে ইচ্ছে হয়।

এক ছিলুম তামাক খাইতে আব কত দেরি আইব ! আনন্দ নতুন তামুক
মাথচে, খাইয়া গাহেন, বলতে বলতে উঠে যায় দুর্গা।

রামকান্ত খানিক একা একাই আকাশকুম্ভ ভাবতে থাকে।

তঁকোর মাথায় কন্ধে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে খানিক পরেই ফিবে আসে
দুর্গা।

রামকান্ত বোধহয় আকাশে মহসা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে। তাড়াতাড়ি হাত
বাড়িয়ে ছকোটা নিয়ে বলে, বউ-গিন্নী, ময়নাব বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলো।

দুর্গার পুরোনো ক্ষতটা হঠাৎ কেউ যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘশ্বাস
ছেড়েই উত্তর করে, তাইত দিবার গেচিলাম ঠাকুরমশয়। কিন্তু কপালে সইল
কই ?

প্রভু মঙ্গলময়। তাঁর লীলা-খেলা সব সময় আমবা বুঝে উঠতে পারিনে।
যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর দেরি করো না, কথকঠাকুরের কণ্ঠ মুখর
হয়ে ওঠে।

দুর্গা বলে, এহন ত কিছু করনই যাইব না ! কাল অশুচ (অর্শোচ) না
গেলে—

মেয়ের বিয়ে কাল অর্শোচের মধ্যেও হতে পারে, মুখ থেকে কথা কেড়ে
নিয়ে বাধা দেয় রামকান্ত।

না ঠাকুরমশায়, হ্যা আমি করুম না। এমনেই ত বালো নাই তাতে
আবার চৈন্দ পুরুষের মন্নি কুড়ামু কোন ভস্তায় (ভরসায়)।

রামকান্ত যতখানি এগিয়েছিল ঠিক ততোখানিই পেছবার চেষ্টা করে, না—

- তা এই বলছিলাম কি তোমার যখন মত নেই তখন অশৌচ মিটে গেলেই করো। কিন্তু তারও আর বেশী দেরি কোথায়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আশীর্বাদ করেন 'তাই যান যায়। এহন ত কোন দিক দিয়াই সম্ভব না! পাট উঠলেই না কত।

রামকান্ত আবার একটু উৎসাহিত হয়। জ্বোরে একটা স্থখটান দিয়ে উত্তর করে, তা তুমি যদি মত করো তা হলে টাকার জ্ঞ কিছু আটকাবে না। ও দু'শই বলো আর পাচশই বলো কুমার বাহাদুরকে যা বলবো তাই হবে!

টেকা ছাড়াও মঙ্গিল আছে। নিশির বাপেরে ত জানেন, অশুচ না গেলে ছায়-ই কি রাজী অইব?

রামকান্ত বলে, বল তো একবার বলে দেখতে পারি।

না না, গুরুদশার বছরে আমি আর শুভ কাম করবার চাই না। আশীর্বাদ করেন, বছরজা বাধোভাবে ঘুরুক।

তবে থাক। এখন উঠি, তাহলে। গলার স্বরটা বেশ একটু শুষ্ক মনে হয় রামকান্তর।

দুর্গা তাড়াহাড়ি হাত বাড়িয়ে ছঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে বাখে। আঁচল গলায় জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে রামকান্তকে।

স্বযোগের অবহেলা কবে না রামকান্ত। পিঠের ওপর হাত বেখেই আশীর্বাদ করে। দুরাশার ঝড় বইতে থাকে বৃকের ভেতরে।

॥ ২১ ॥

চরফুটনগরের সমৃদ্ধি যেন দিন দিন ফেঁপে উঠছে। মাত্র দিন কয়েকেব কথা—এরই মধ্যে নতনের ছোপ পড়েছে চরে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকলক করছে সবুজ পাটের চারাগুলি। এক এক গাছা-স্বর্ণ-ছিলকারই প্রতীক ওরা। চরের চাষীর তো পেঁয়াবারো! খড়ের চালার পরিবর্তে চেউ-টিনের ঘর উঠছে সারি সারি। আর দিনকতক পরে হয়তো ওরাই হবে আসল জমিদার। গাড়লগুলি আছে শুধু নিজের কোলে বোল টানতে। একটু যদি বৃদ্ধি থাকে। সামান্য হয়তো দু'পাঁচ টাকা পকেটে পুরে গোটা চরটাকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর ওদেরই বা দোষ কি। সিদ্ধক খোলা পেলে কে না চুরি করে। এদিক-টায় যে নজরই দেওয়া হয়নি। আরো বছর থাকে না এলে তো সবই উজাড়

করে দিতো দীন্ত বৈরাগী আর করিম ককিরের কাছে। পশ্চিম অঞ্চলের মতো যদি গোটা চরটা বিলি থাকতো তাহলে এক চর থেকেই লাট-কিস্তির অর্ধেক উঠে আসতো। হতভাগারা যার খায় যার পরে তারই সর্বনাশ করলে।... বাখাল আর বিকাশের ওপর ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কিছু মুশকিল, প্রকাশ্যে কাকেও কিছু বলাব উপায় নেই। সেরেস্তার, অলি-গণি এদের হাতের মুঠোয়। এখন কিছু করতে হলে দুটোকে হাতে রেখেই করতে হবে।...গড়গড়া টানতে টানতে ইতস্ততঃ ভাবছিলেন রমেন্দ্রনারায়ণ, রামকান্ত প্রবেশ করে। প্রভুকে চিন্তাম্বিত দেখে প্রণাম ঠেকে নীরবেই অপেক্ষা করতে থাকে। রমেন্দ্রনারায়ণ প্রথমটা ঝাঁজিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ রামকান্তের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার বীজ আবিষ্কার করে ফেলেন। চরকে পাকে পাকে বাঁপতে হলে রামকান্তের সহায়তা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এরকম চাটুকার হাতে থাকলে সবকিছুই গুছিয়ে ওঠা সম্ভব। তাই গড়গড়ার মলটা হাতের মুঠোয় রেখে উদাত্ত কণ্ঠেই সম্ভাষণ জানান, আরে এসো— এসো ভট্‌চাষ। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

শংকায় হাঁপিয়ে উঠেছিল বামকান্ত—সম্ভাষণে খাম দিয়ে জর ছাড়ে। তর্গাকে নিশ্চিন্ত থাকতেই আশ্বাস দিয়ে এসেছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্নই। কুমার বাহাদুর বেশ খোশ মেজাজেই আছেন। সব চেয়ে নিরাপদ, উনি নিজেব দরটিতে একলা আছেন। সেরেস্তায় থাকলে কান ভাঙানি দেবার লোকের অভাব ছিল না। তাছাড়া অপমান করলেও লোক জানাজানি হয়ে যেতো। সব দিক থেকেই নিরাপদ কাছারির এই স্বকীয় ঘরটি। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা কারো হুকুম না নিয়ে প্রবেশ করার উপায় নেই। বেটা মুসা সিং দোরো ছিল না বলেই ঢুকতে পেরেছি। অর্ধচন্দ্র না দিলেও ধঁকিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বরাত জ্বোরে আজ-অভ্যর্থনাই পাচ্ছি। তা করতেই হবে বাবা, বেরোবার মুখে যে শেয়াল ঝাঁ-হাত করে বেরিয়েছি। খুশীতে গদগদ হয়েই মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে রামকান্ত। চেয়ার ছাড়া এ ঘরে ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা নেই। এখানে যারা আসে তারা পদমর্খাদা নিয়েই আসে। অগ্নিনি ভয় ভয় করলেও আজ আর ভয় হয় না রামকান্তর। উল্লসিতভাবেই জিজ্ঞাস করে, দেশ গাঁয়ের খবর সব ভাল তো স্মার ?

রমেন্দ্রনারায়ণ হাসতে হাসতেই উত্তর দেন, আমাদের আর ভালো কোথায় হে ভট্‌চাষ, পোয়াবারো তো এখন তোমাদেরই।

কি যে বলেন স্মার !

কেন, খারাপ কিছু বলছি নাকি ? খাসা এক একটা শিশু তোমার । নৈবেদ্যেব চিনিব মতো ওদের মাথার ওপর নিশ্চিন্তে বসে আছি । তোমার মতো সুখী আবার কে হে ?...কথা শেষ করে হাসতে হাসতেই নলটা আবার মুখে পোরেন বমেন্দ্রনারায়ণ ।

ক্ষিকে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধবময়-ছড়াতে থাকে । মনোহারী গন্ধে জ্বিলে জল আসে রামকান্তর । এমন আমেজী নেশা কতকাল ভাগ্যে জোটেনি । কোলকাতার জীবনে নিজস্ব একটা মোরদাবাদী গড়গড়া ছিল ওব । অল্প সময় ফুরসত না হলেও শোবার আগে বেশ খানিকটা মোতাভ হতো । গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর যেদিন যে জায়গার জিনিসে অভিলিচ । এখন তো অতীতের জাবর কাটা ছাড়া আর কিছুই নেই ।...অতিকষ্টে বসনাব বাশ টেনে জবাব দেয় রামকান্ত, সুখ তো কত । দেখেই করে নাচো আর হরি-মটব খাও ।

বল কি হে, শুধু হরি-মটব ! আর কিছুই না ? শুনেছি তো—না থাক । হরে, ভট্টাচার্যকে তামাক দে । বমেন্দ্রনারায়ণ কি যেন একটা ইঙ্গিত করতে গিয়েও চেপে যান । প্রকাশে শুধু রামকান্তব তামাক ললুপতারই কয়সালা করেন ।

তামাক দানের আদেশ হওয়ায় মনে মনে উৎফুল্ল হয় রামকান্ত । কুমার বাহাদুর তাহলে মনের কথা বুঝতে পেরেছেন । কিন্তু ওটা কি বলতে চাইলেন ! দুর্গার সম্বন্ধেই কি কিছু ইঙ্গিত করলেন । তবে তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন ।...না না, তা কি করে হতে পারে ! যে কথা চরের কেউ জানে না সে কথা কুমার বাহাদুর কি করে জানবেন ? ওটা ওঁর স্বাভাবিক হাসি ঠাট্টা । ক্ষণেকের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধদের মতোই মিলিয়ে যায় । তামাকেব প্রত্যাশায় বেশ চান্দা হয়ে ওঠে রামকান্ত ।

যথাসময়ে হরি এসে বেশ বড় কন্ডের এক কন্ডে তামাক দিয়ে যায় । হুকোটা অবশ্য গড়গড়া নয়—নারকেলের । তা হোক, রামকান্তর ওতে কিছু এসে যায় না । আসল মাল তো ঠিক আছে । খাঁটি বিষ্ণুপুরীই হবে—খাসা গন্ধ । মনের আনন্দে হুকো টানতে থাকে রামকান্ত ।

বমেন্দ্রনারায়ণ কথার মোড় ঘোরান, কিছু বলবে নাকি হে ভট্টাচার্য ?

রামকান্তর উত্তরের আগেই হরি এসে জানায়, দু'জন আমিন কাছারি ধরে অপেক্ষা করছে ছজুর ।

রামেন্দ্রনারায়ণ ওদের এঘরে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন। হরি ফিরেই যাচ্ছিল। আবার বাধা দেন, না থাক, ওদের বসতে বল, আমিই যাচ্ছি।

রামকান্তর মনের আনন্দ উবে যায়। বিষ্ণুপুরীতেও যেন আর আমেজ নই। দিব্যি নিরিবিলিতে পাওয়া গিয়েছিল কুমার বাহাদুরকে। আর কিছুটা সময় পেলেই আসল কাজ হাসিল হয়ে যেতো। যা সুন্দর পরিবেশ ছিল কিছুতেই না বলতে পারতেন না। এখন আবার কে এসে মেজাজ বিগড়িয়ে দেয় তার ঠিক কি? বেশ জ্বোরে জ্বোরে হুকো টানছিল, গতি ক্রমশঃ ঢিলে হয়ে আসে।

রামেন্দ্রনারায়ণ নলটা মুখ থেকে নামিয়ে উঠে দাড়ান। বলেন, চলো হে ভট্টচাষ, কাছারিতে বসেই তোমার কথা শোনা যাবে'খন।

অগত্যা রামকান্তকেও উঠতে হয়। দৃষ্টিস্তাব গুরুভার ললাটের বলিরেখায় ফুটে ওঠে।

রামকান্ত চূপচাপই কাছারির এক কোণে এসে বসে। রামেন্দ্রনারায়ণ আমিনদের সঙ্গে যথারীতি নিজের কাজ করে চলেন। রাখাল বিকাশও নিজ নিজ দায়িত্ব মতোই সাহায্য করে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমিনদের কাজ শেষ হয়। পাওনা-গণ্ডার বোল আনা বুঝে পেয়ে মনের খুশীতেই উঠে পড়ে ছু'জনে। তা খাতির মন্দ হলো না। চা, বিস্কুট, মিষ্টি-মুখ যা হলো তাতে এবেলার মতো নিশ্চিত! রামেন্দ্রনারায়ণও মহাখশী। এত সহজে কাজ মিটবে আশা করেননি উনি। রামকান্ত বসে বসে ঝড়িকার্ট গুণছিল। ওকে চান্দা করতেই হাঁক ছাড়েন, তুমি যেন কি বলছিলে ভট্টচাষ?

রামকান্ত বিব্রত বোধ করে। দশজনের সামনে যে কুমার বাহাদুর পূর্বকথার জের টানবেন তা ও ধারণা করতে পারেনি। তাই আমতা আমতা করেই জবাব দিতে চেষ্টা করে, না—কথা আর কি—মানে—

একান্ত গোপনীয় কি?—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রামেন্দ্রনারায়ণ শুধোন!

শুক হাসি হেসেই রামকান্ত বলে, কি যে বলেন স্তার! নায়েবমশায় আর বিকাশবাবুর সামনে বলবো তাতে আবার গোপনীয়তার কি থাকতে পারে।

না, চলো ও ঘরেই যাই। আমার আবার 'কাইলটা' দেখা হয়নি; অবস্থা বুঝে পরিবেশটা হান্ধা করে দেন রামেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। উঠতে গিয়ে রাখালের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়।

নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যগ দৃষ্টি হানছিল রাখাল। চোখোচোখি হতেই জ্ব কুঁচকিয়ে সেরেস্তার খাতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অপমানে মগজের পোকাগুলি কিলবিল করে ওঠে। অবশ্য এসব ছোটখাটো মান অপমান চেপে যাওয়াই ওদের পদ-রীতি। পোকাগুলি এক লহমায় যেমন ঝংকার দিয়ে উঠেছিল এক লহমাত্তেই আবার তেমন শান্ত হয়। ঝং হাঙ্গিই খেলে নিয় ওঠে। ও জানে, কুমার বাহাদুর যত ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ই করুন না, চরের কোন খবর ওর কাছে চাপা থাকবে না। চাষা-ভূষা মাঝেই জানে, এ শর্মা কে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু হবার নয়! উনি তো তুচ্ছ, স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারেরও ক্ষমতা নেই ওদের অধিকারে হাত ছোঁয়ায়। এ বাবা তাকেয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানা আর মদ মেয়েমানুষ নিয়ে ফস্টনষ্ট কবা নয়। রীতিমতো মগজের ব্যাপার। রাখালের মনে মনে হাসিই পায়।

বাখাল আর বিকাশ কি ভাবলে সে তোয়াক্কা রমেন্দ্রনাথায়ণ করেন না। পুলিশ আর লাঠি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। প্রজাই হও আর নায়েব গোমস্তাই হও গুঁতোব চোটে সব ঠিক। এতদিন দেখিনি—সাঁপ কেটেছে। এখন আর চালাকিটি চলছে না। রাখাল বিকাশকে পবোয়া না করে রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় এসে নিজের ধবে বসেন রমেন্দ্রনাথায়ণ। রামকান্তকেই বাজিয়ে দেখবেন, কতদূর এগোনে' যায়। সম্ভব হলে চুপি চুপি নিজেই এঁগিয়ে যাবেন। গাড়লদের যতদূর এড়িয়ে চলা যায় ততাই মঙ্গল। ওদের দৃষ্টি তো শকূনের দৃষ্টি। কেবল পকেট ভারী কববাব তাল।।...

মনিবের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অন্তরে ঘা লাগলেও বাহ্যিক সামলে নেয় রাখাল। কিন্তু মনেব আগুন বেড়েই চলে। মেটের কি এমন ক্ষতি করেছে ওরা। চর তো এতদিন কাছিমের পিঠের মতো সামান্য একটা বালির টিপি ছিল। শীতে জাগতো বর্ষায় তলিয়ে যেতো। বৃন্দ করে দৌহু আব করিমকে বিলি-ব্যব'গ্য দিয়েছিল বলেই না আজ শশুশ্রামলা এক উবর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কই, কতবার তো ঘাটে পান্সী ভিড়িয়ে হৈ ছল্লোড় করেছেন। কিন্তু কোনদিন তো কিছু করতে দেখিনি। বাড়া ভাতে কাটি দিতে সবাই পারে। দুটো পয়সাই না হয় খেয়েছি, কিন্তু ও চর গড়লে কে? মানুষ তো আর দৈবজ্ঞ নয় যে ভূত ভবিষ্যৎ সব জানবে। আর পয়সার কথাই যদি ওঠে

তাই বা এমন কি। একজন পদস্থ নায়েব যদি বছরে তিন শ টাকা বেতন পায় তবে সে চুরি করবে না তো বসে বসে আঙুল চুষবে নাকি। তাছাড়া চুরিই বা একে বলবো কেন? এতো মগজ খাটিয়ে নেওয়া রীতিমতো পারশ্রমিক। নজরানা, সেলামী, প্রণামী নিয়ে ওরা কোন ধর্ম পুস্তকের কাজ করেন?...রামেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্ত উঠে গেল আপন মনেই গজরাতে গাকে রাখাল।

সহকর্মী বিকাশ পাশে বসেই খাতা লিখছিল। সেও নিজেকে অপমানিত বোধ করে। আসির ফাঁকা পেয়ে রাখালের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, তামাসাটা দেখলেন তো দাদা?

হঁ, ব্যাপার বেশী স্ববিধের ঠেকছে না। ভট্টাচার্য দেখছি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছাঁড়ি ধোরাতে বাস্তু। একটু কড়া নজর রেখো, হিসেবের খাতায় নজর রেখেই জবাব দেয় রাখাল।

অতো ভাবছেন কি। একটু সবুর করুন না, ও বোয়ালের ডিম বোয়ালেই ভাঙবে। কথায় বলে না, 'উই পোকাক পাখা হয় মরিবার তরে!' মুচকি মুচকি হাসতে থাকে বিকাশ।

মারণ অস্ত্র আমার হাতেই আছে হে। তবে কি জানো—না ন', যা ভাবছো ব্যাপার অতো সোজা নয়। দেখছো না, তুমিনেই কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ভট্টাচার্য? আমার তো মনে হয়, নিগূঢ় কোন রহস্য আছে এর ভেতরে।...

ও যতো রহস্যই থাক, দাদার চোখে ধুলো দেবার সাধ্য কারো নেই।

হে হে হে, কি যে বলো, আমরা হলেন মুখ্য-স্বখ্য মাহুষ, তেনাগো সন্দেহ কি আমরা পারি।

চুপ করুন দাদা, হরে বেটা আসছে।

হঁ, ও শালা তো আবার পিয়ারের চাকর। সব কথা ওর বাপের কাছে গিয়ে একুনি লাগাবে।

রাখাল বিকাশ মুখ বুজেই কাজে মন দেয়। হরি এসে আমিনদের এঁটো কাপ ডিস নিয়ে চলে যায়।

রামকান্তকে সন্দেহ করে পুনরায় আপিস ঘরে এসে বসাই ঠিক ছিল।
কিন্তু সামান্য এই পথটুকু আসতেই মত বদলে ফেলেন রামেন্দ্রনারায়ণ।

আপিস ঘরে না বসে সোজা এসে শয়ন ঘরেই ঢোকেন। সমস্ত অস্ত্রপুৰ খাঁ খাঁ করছে। একা হরি ছাড়া আর কেউ নেই। খাওয়া, খাকা, শোয়া, সবই তো গ্রীনবোর্টে। বাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো এলেই এ ঘর-দোরে পা পড়ে। খেয়াল-খুশি হলে এককও কোন কোন সময় রাত কাটান। আসবাব পত্রের বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই। খানকয়েক যা' আছে সবই আভিজাত্য পূর্ণ। ঘরে এসে একটা ডেক-চেয়ারেই গা এলিয়ে দেন রমেন্দ্রনারায়ণ। রামকান্ত থ বনে যায়। কি করতে চান কুমার বাহাদুর ওকে নিয়ে! শেষ পৰ্বশ্ব কি অর্ধচন্দ্রই আছে নাকি অদৃষ্টে!...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল রামকান্ত। রমেন্দ্রনারায়ণ সন্তাষণ জানান, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে, বসো ?

রামকান্ত না বলতে পারে না। জড়সড় হয়ে একটা মোড়ার ওপর কোন রকমে বসে পড়ে।

রামেন্দ্রনারায়ণ হহার চাড়েন হরির উদ্দেশে।

ডাক কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হরি ছুটে আসে। ইঙ্গিত মাত্র আলমারি খুলে পুরো একটা বোতলই বাব করে। বিলেতী মদ। সুদৃশ্য লেবেল আঁটা...তকতক করছে রং। না, রামকান্ত হয়তো দম বন্ধ হয়েই মরবে আজ। পূর্বস্মৃতিই মনে পড়ে ওব। শহর জীবনে কতদিন আশ্বাসন করেছে এ চীজ। কি অমৃতই না সাগরপারাব মানুষ তৈরী করতে জানে। জিভে ঠেকাতেই দেহ মনে নেমে আসে সজীবতা। এই তো আসল দেব-ভোগ্য জিনিস। এ ক'বছর চবে তো শুধু হরি-মটর চিবিয়েই কাটছে। ভাগ্য—ভাগ্য, মানুষ ভাগ্যের দাস।...জিভেব জল সম্বরণ করা দায় হয়ে ওঠে রামকান্তব পক্ষে।

হিসেব মতো হরি দুটো গ্লাসই বার করে। স্বচ্ছ জাপানী কাঁচের গ্লাস। এই গ্লাসেই এ রকম সুখা মানায়। দোডার বোতলটা খুলতেই রামেন্দ্রনারায়ণ ইঙ্গিত করেন। হরি বেরিয়ে যায়। একটু সোডা মিশিয়ে প্রথম পাত্র টেনে নেন উনি। দিলটা চাঙা হয়ে ওঠে। রামকান্তর ইচ্ছে হয় ছুটে পালায় এখান থেকে। রমেন্দ্রনারায়ণ সবই বোঝেন! বুঝেই স্বাগত জানান, কি হে ভট্টচাষ, ফেয় চেয়ে দেখছো কি? চলবে নাকি ছ'চার পাত্র ?

ছ'চার পাত্র—ছ'চাব পাত্র কেন গোটা বোতলটাই ওর দরকার। কিন্তু চরের বৈরাগীগুলোই যে মাঝ পথে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকালে খালি পেটে টানলে ধকল সামলানো দায় হয়ে উঠবে! তা'ছাড়া রাখাল গোসাইয়ের হাবভাবও সুবিধের ঠেকছে না। প্যাচ কষা মাথা, আড়-ঠারে কথাটা দীর্ঘ

বৈরাগীর কানে দিলেই সর্বনাশ। একদিন ফুঁটি করতে এসে দশ দিনের ভাত বন্ধ। চরে হয়তো আর থাকতেই দেবে না।...অন্তর্ধামী মন লাকাতে থাকলেও বাহ্যিক তেমন উৎসাহ দেখাতে পারে না রামকান্ত।

ওকে নিরন্তর দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ পূর্ব কথার জের টানেন, কি হে, সাড়া শব্দই দিচ্ছ না যে? নাও, টেনে নাও এক পাত্র, দ্বিতীয়বার নিজের গ্লাস পূর্ণ করতে গিয়ে দুটো গ্লাসই পূর্ণ করেন।

রামকান্ত দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, না, আমি ভাবছিলাম—সকাল বেলা—স্নান আফ্রিক কিছুই হয়নি—

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শায় দেন, তুমি আমায় হাসালে হে ভট্টচাষ। এ তো হলো মা কালীব নিতা ভোগের সামগ্রী। ইচ্ছে হয় নিবেদন করে নাও।

না স্তার, এখন থাক।

বুকেছি, বৈরাগীদের ভয়। তা কিছু ভেবো না। বাগান থেকে তুলে এনে গোটাটাকয়েক নেবুপাতা চিবিয়ে নিয়ো, কেউ টের পাবে না। নাও, আরম্ভ করো, রমেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয় পাত্র টানতে থাকেন।

রামকান্তও আর ভাবতে পারে না। মায়ের নাম স্মরণ করে পুরো গ্লাসটাই এক দমে টেনে নেয়।

শাবাস, তুমি তো দেখছি পাকা খেলোয়াড় হে ভট্টচাষ। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হয় আবার ছ'জনে নিঃশেষ করে।

নেশায় ছ'চোখ ঝিমিয়ে আসে রমেন্দ্রনারায়ণের। টেনে টেনেই বলতে থাকেন, এবার বলহে ভট্টচাষ, কি তোমার বক্তব্য।

রামকান্ত এত সহজে কাবু হবার নয়। তাছাড়া ওর অভ্যাস, নেশা হলে ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসে থাকা। একটা উদ্‌গার তুলে সবিনয়েই জবাব দেয়, বক্তব্য আর কি স্তার, মধু মণ্ডলের বেটার বউ আপনার কাছে আরো কিছু ঋণ চায়।

আরে ছো ছো, তোমার তো হে রসবোধ নেই ভট্টচাষ। আর একটু হলে গোলাপী নেশাটাই মাটি করেছিলে। ও সব চাষাভূষার মুখে বাঁটা মারো, ভাল কোন মালের সন্ধান থাকে তো বলো—রমেন্দ্রনারায়ণ ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

উত্তর শুনে রামকান্ত নেশার মুখেও আঁৎকে ওঠে? রক্ষা দুর্গাকে নিয়ে

টানাটানি করছেন না। তা হলেই তো হয়েছিল আর কি। কাজ নেই বেশী ষাটিয়ে। দুর্গাকে সোজা গিয়ে বলা যাবে, এত কম টাকা দিতে কুমার বাহাদুর রাজী নন। বেশী নাও তো ব্যবস্থা হতে পারে। টাকা ধার পেতে ওর কোন অসুবিধা হবে না। দাঁয়কে বললেই সে নিতাই সা'র কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারবে। হয়তো এতে ও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। তা হোক, কুমার বাহাদুরের পাল্লায় পড়লে তো ঠিকেই ভুল হয়ে যাবে। না না, দুর্গকে কিছুতেই কুমাব বাহাদুরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো যায় না। আমারই আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি সম্ভব হয় নিজেই চেষ্টা করবো। মাত্র তো শতিনেক টাকা। যেভাবে খাতির করছেন দিলে দিতেও পারেন...পর পর পাড় টানতে টানতে ভাবতে থাকে রামকান্ত।

পাত্রের পর পাত্রে দু'জনেই বৃন্দ। রামকান্তর শক্তি নেই উঠে বাড়ি যায়। রমেশনারায়ণও নাওয়া খাওয়া ভুলে যান। চাট হিসেবে সামান্য যা ভাজা-ভুজিই পেটে পড়েছে। বিকেলে চারটে নাগাদ ঘোর কাটে। সর্বাঙ্গ বিম্বিম করতে থাকে। এখন দরকার স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে গ্রীনবোটে হাওয়া খাওয়া। হরি বাড়ির ভেতরেই স্নানের জল দেয়। একে একে দু'জনেই বালতির পর বালতি জল ঢেলে কিছুটা সস্ত হয়।

গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত আকাশ। সূর্য ডুবুডুবু। আবীর মাখামাখি দিগ্‌ বলয়। মিষ্টি আমেজ বাতাসে। নতুন জলে একটু একটু কবে ফেঁপে উঠছে বংশী ধলেশ্বরী। শ্রোতের বেগে সাড়া জাগছে। রামকান্তকে সঙ্গে করে গ্রীনবোটে এসে ওঠেন রমেশনারায়ণ। চিরাচরিত অভাগা মতো ছাদের ওপর এসেই বসেন ডেক চেয়ারে। লেজুড়টির মতো রামকান্তও একটি মোড়ার ওপর। মাঝিরা দাঁড় টেনে খানিক উজাতে থাকে। তারপর পাড়ি দিয়ে এসে নোঙর ফেলে বৈরাগীর-খালের মুখে। রামকান্তই ইচ্ছে নয় এভাবে এখানে অপেক্ষা করে। বেশ তো চলছিল মাঝ দরিদ্রা দিয়ে। ঘুরে ফিরে হাওয়া খাওয়াতেই তো আনন্দ কিন্তু রমেশনারায়ণর ঐ এক বৌক, বেড়াতে বেরোলেই খালের মুখে এসে দাঁড়াবেন। এ সময়ে চরের কি বউরা সান্ধা জল নিতে ঘাটে আসে। কে জানে, ময়না না এসে দুর্গাও আসতে পারে। কিন্তু করবে কি ও। কুমার বাহাদুরকে তো আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই। এখন ভালয় ভালয় সন্ধ্যাটা উত্তরোলেই ভাল। ভাগবত পাঠে যাওয়া আজ তো হতেই পারে না। সারা দিন ভাত খাওয়া হয়নি। অবসাদে টুল আসছে। এখন

চাঁপা হতে হলে চাই কিছু ভাল খাবার ও সঙ্গে আবার চ'চার পাত্র। তা বোটের হেশেল থেকে তো বেশ মিষ্টি গন্ধই ভেসে আসছে। অল্পপানের ক্রটি হবে না নিশ্চয়। খানদানী মাছগ, এটুকু জানবেন বই কি।...পাশে বসে রামকান্ত আপন মনেই ইতস্ততঃ ভাবছিল। হঠাৎ ঘাটের দিকে চোখ পড়ে। ও কে! তুর্গা না! এ সময়ে ও কেন জল নিতে এসেছে। সারাদিন এত জল দিয়ে কি হয় ওদের? শুধু তো তিনটে প্রাণের সংসার। এ সময়ে ঘাটে না এলেই কি নয়। না না, আজ তো সোমবার, বাবার উপোস। অস্ত্রের জলে ব্রত হবে না। কিন্তু ঘাট যে একেবারে ফাঁকা। আব একটু বেলাবেলি এলে কি দোষ ছিল, রামকান্ত বড় অস্থিত্তিতে পড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ নীরবেই বসে বসে গড়গড়া টানছিলেন, সহসা মুখ খোলেন। রামকান্তকে লক্ষ্য কবেই শুধোন, মালাটি কে হে ভট্‌চাঁষ?

তুর্গা পেতলের কলসীটা চকচকে করে মেজে বুক-জলে এসে নামে। খালের মুখ কিছুটা দূরে হলেও ঘাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জায় তাই বোটের দিকে পেতন ফিরেই গলা পষন্ত ডুবে কাপড় কাচতে থাকে। গোধূলির আবীর রাগে ওর গৌরবণ বাহ যুগল দেখে মনে হয় ছুটো রাজসংসীই যেন অবিরত ডুবছে আর উঠছে। কাপড় কাচা হয়ে যায়। এরপল মাত্র একটা ডুব। ভিঙ্গে কাপড় সর্বান্ধে জড়িয়ে কলসী কাঁখে পাট থেকে উঠতে যায়। রামকান্তর নন্দর এড়ায় না। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। ময়োচিনীই যেন রূপ-সায়র থেকে নেয়ে উঠলো। রমেন্দ্রনারায়ণের প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারে না। কাছে থেকেও যেন শুনতে পায় নি কি উনি জিজ্ঞেস করেছেন।

রামকান্তকে নিরন্তর দেখে পাশ ফিবে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন রামেন্দ্রনারায়ণ, মুছাঁ গেলে নাকি হে ভট্‌চাঁষ?

আজ্ঞে না, আমি স্বাস্থ্য দেখছিলেম। কি অপূর্ব রং বৈচিত্র্য, হকচকিয়ে উঠে উত্ত্ব করে রামকান্ত।

স্বাস্থ্য দেখছিলে না স্বর্ষমুখীকে?—পাণ্টা প্রপ্ন করেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

কি যে বলেন শ্রার!—রামকান্তর মুখে শুষ্ক হাসি।

না, আপাতত বিশেষ কিছু বলছি। শুধু জানতে চাই—শ্রান করে যাচ্ছে ও মালাটি কে?

রামকান্তর বৃকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। স্ত্রী জাতির সন্মম রেখে কথা বলতে

জানে না লম্পট!... কিন্তু উপায় নেই। রাখাল গোসাঁই-ই হাত পা বেঁধে ফেলেছে। টাকার জন্ম এখন তো বেশ কড়া তাগাদাই শুরু করেছে গোসাঁই। কুমার বাচ্চাদের ছাড়া আর আশা কোথায়। যত অপমানেরই হোক গুরু মন যুগিয়েই চলতে হবে।...অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবিনয়েই উত্তর দেয় রামকান্ত, ওর কথাই তো বলছিলাম শ্রাব। মধু মণ্ডলের বেটার বউ? কিছু কর্তব্য চায়।

তাই নাকি হে! তোমার তো দেখেছি পোয়াবারো, মুচকি মুচাক হাসতে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

বামকান্তর সম্বন্ধে যেন জল বিচুটিব চাবুক পড়ে! তবু শুধু হাসি হেসেই সমতা বক্ষা করে, কি যে বলেন শ্রাব। খুব ভালো মেয়ে ও।

খুব ভাল না হলে কি আর তুমি ওর ভালব জন্ম এত আঁকুপাক কবছো! যা'হোক, কত টাকা চাই ওব, আমি দেবো।

টাকা তো চাই তিন শ' এখন আপনি যা দেন।

তিন শ' বড্‌ডা বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?

কিন্তু ওব কমে যে পাট চায় উঠবে না শ্রাব।

বেশ, দেবো টাকা। কাল ওকে বোটে আসতে বলো।

বোটে আসা কি ওব পক্ষে উচিত হবে শ্রাব?

তোমার তো দেখছি গভীর নীতিজ্ঞান হে ভট্‌চায়। বেশ, তাহলে না আসবে।

যদি বিশ্বাস কবেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই শ্রাব।

বেশ বলো।

টাকাটা আমার হাতে দেবেন, আমি ওকে দিয়ে আসবো।

কৌশলে কাজ সারতে চাও তো?

আপনার চোখে ধুলো দেবার স্পর্ধা আমার নেই শ্রাব। তমস্ককে আমি ঠিকই সই করিয়ে আনবো।

শুধু মাই, আব কিছুই না? ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসতে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে আবার জ্বালা ধরে। মনে মনেই ভাবতে থাকে, তুমি যা ভাবছো শয়তান ও সে ধরনের মেয়ে নয়। দুর্গার রূপ দেখছো, কিন্তু হাতের পাঁড়া দেখোনি। মরবে—ছটকট করেই মরবে।...প্রকাশ্যে বলে, দুখিনী নারী, আপনাকে আর কি দিতে পারে?—বুঝেও যেন বোঝে না রামকান্ত।

তুমি দেখছি এখানেও ভাগবত আউড়াতে শুরু করলে হে। যাক, টাকা যখন দিচ্ছি...তখন স্তম্ভ উস্থলের ভার আমার ওপরেই থাক। কাল সকালে কাছারিতে এসো—বাবস্থা করে দেবো।

কাছারিতে—

ভয় নেই, আপিস ঘরে বসেই সব ঠিক কবে দেবো! কেউ টের পাবে না। জানি হুজুরের দয়ার শরীর। বেচারী বেঁচে যাবে শ্রার। বড্ডো ঠেকায় পড়েছে। এখন তাহলে উঠি ?

বলো কি হে, থাকে না ? ভাল খাবার আছে কিন্তু।

না শ্রার, শরীবটা বড্ডো খারাপ লাগছে। তাছাড়া জানেনই তো ভাগবতের আসরে একবার না গেলে নয় !

ভাগবতের আসরে না ভগবতীর আসরে হে ?

আপনি বড্ডো লজ্জা দিতে পাবেন শ্রাব।

বলো কি হে, এখনো দেহে লজ্জা আছে। তা বেশ, এসো তাহলে।

বামকান্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মদের আব এখন ওব কোন প্রয়োজন নেই। মদের চেয়ে সেরা নেশা এইমাত্র কুমার বাহাদুর ওকে দিলেন! দুর্গাকে আজই গিয়ে খবরটা দিতে হবে। কাল সকালেই তো হাতে টাকা আসছে। কসাই নায়েবটার হাত থেকেও কালই মুক্তি মিলবে। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করা। ময়নাব বিয়েটা চুকে গেলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। কুমার বাহাদুরকে এ কটা দিন চাটুপাক্যে ভুলিয়ে রাখতে হবে। তারপর দুর্গা যদি সায় দেয় ছেড়ে চলে যাবো এ চর।...ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়ায় বামকান্ত। হাত বাড়িয়ে চরণ ধুলো মাথায় নেয় রমেন্দ্রনারায়ণের! তারপর খুশীতে পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে।

রমেন্দ্রনারায়ণের মনেও খুশীর বান ডাকে। একাকীই চরের দিকে চেয়ে চেয়ে শিস্ দিতে থাকেন।

॥ ২২ ॥

পাঁচই আঘাট রথযাত্রা। বাছ পাট চরফুটনগর ও চরখল্লার চাষীরা মন্দ পায়নি। রথযাত্রায় শুভ সাইন হবে। প্রত্যেকেই অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত কেউ একগাছা পাটও বেচেনি। মাসের প্রথম দিকেই যখন শুভক্ষণ মিলছে-

তখন আর অদিনে-অক্ষণে বেচে ববাত খাবাপ কববে কেন। পাটের সেবা শুভক্ষণ বখবে সাইদ। এ সময় কেউ কাউকে ঠকায না। ফড়েবাও মাপ-জোখ ঠিক রাখে। শুভক্ষণে ধাবের কথা তো কেউ মুখেই আনবে না। অনেক দায় দায়িত্ব গেছে তবু বখযাত্রার আগে কেউ পাটে হাত দেয়নি। বেশ ভাল ফলন হয়েছে এবার। বাছ পাটই বং, পদ, লঘায় প্রায় গাছ পাটের সমান দেখাচ্ছে। চাতিদা থাকলে গত সনের তুলনায় এ সন অনেক বেশী দব পাওয়া যাবে। গত পাঁচ বছরের মতো এত ভাল ফসল এ অঞ্চলে ফলেনি। ঈশ্বর কবলে বক্তচোষাবা আব স্বেযোগ পাবে না। এই ওদেব শেষ কামড। টাকা প্রতি মাসে দু'আনা তিন আনা সুদ। কসাই ছাড়া ওদেব আব কি বলা যায়। নিক, ওদেব ঘাটের কড়ি এই শেষবাবের মতো উপায় কবে নিক। চবের মানুষ আব সামানব সন থেকে ওদেব দোবে হাত পাততে যাব না। ওদেব টাকা ওদেব দবেই ছাতা বববে। আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে চবের চান্দী। পলানব গস্তি দুটো অনেকদিন থেকে একেজো হয়ে ঘাটে পচছে। ববে পাট বযে নেবাব ও ঢাঢাঠি হালা সবচেযে ভাল ব্যবস্থা। একটাতে যাব পাট যাব একটাতে চবব সব মাছষ। হাতাহাতি ধুয পুঁছে গাব দিযে সকল মিলে আবাব সচল কবে তোলে গস্তি দুটোকে। কে বত মণ পাট নেবে তাব ফদ হয়। হাজাব মনী গস্তি। বাছ পাট আব এত কোথেকে হবে। বড জোব ড'শ আড়াইশ মণ। প্রযোজন হলে পাটব নৌকাযও জনকযেকক যেত হবে। সকল মিলে একত্রে যাবে। একসঙ্গে আনন্দ উৎসব কববে। চবময নতন কবে সাড়া জাগে।

বাছ পাট দুর্গাও মন্দ পাযনি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রমেন্দ্র-নাবায়ণেব কাছ থেকে দু'শব পবিবর্তে মাত্র দেড়শ টাকা কর্ত্ত কবেছে ও। বামকাস্তব কাছে সতি ওব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুদ খুবই কম। টাকা প্রতি মাসে মাত্র এক আনা। বাছ পাট বেচে নিঃসন্দেহে চাবেব অগাচ্ছ ধরচা মেটাতে পাববে। তাবপব আসল পাট বেচে এককালীন সমস্ত ঋণ শোধ করা যাবে ঠাকুব কবলে তা খুব পাববে।

এখন আব আশংকাব কিছু নেই। বামকাস্তব আলাপ-আচবণও দিন দিন বেশ ভদ্র হয়ে উঠছে। এক দিন গুঁকে ভুল বোঝাই হয়েছিল। নিয়মিত ভাগবত পড়া মাছষ—গুঁর কেন মতিভ্রম হবে। তবে মুশকিল হয়েছে কুমাব বাহাদুরকে নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে এসে খালের মুখে বোট বাঁধেন। ছাদের ওপর

ডেক চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চেয়ে থাকেন। বউ-বিরাসকলেই এ নিয়ে কানাকানি করছে। মোড়লদের মধ্যেও কথাটা উঠেছে। কে জানে, কি থেকে কি হয়। চরে তো একমাত্র আমিই ওর টাকা নিয়েছি। কিছু হলে আমারই দোষ পড়বে। বেশ ছিল, এতদিন ময়নাই বিকেলের জল ভরতে আসতো। কিন্তু মেয়েটারও যেন কি হয়েছে, এখন আর কিছুতেই বিকলে পাট আসতে চায় না। ক্ষেস্তিই নানা কথা উঠিয়ে লজ্জায় ফেলেছে ওকে। এ নিশিকে দেখে একটু হাসলে কিংবা দুটো কথা বললে কি এসে যায়। কই আর তো কেউ কিছু বলে না। এ মাছারটাই যত গোলমালের মাঝকাটি... ভাবতে ভাবতে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে উঠতে যায় দুর্গা। মুখ তুলতেই বমকুনারায়ণের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। বড় অসস্তি বোধ হয় ওর।

চৌঠা আষাঢ় সন্ধ্যায় পাট দোঝাই শেষ হয়। যে যাব মাল নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। একখানা গস্তিও অর্ধেকটাই ভরে না। ঠিক হয়, পাটের গস্তিও পেছনেই দয়াল চানের আসর বসবে। মাদুর, একতারা, পান, তামাক ঠিক মতোই ওঠে। করিম, পলান, দীন্দ্র এরাই যাবে গস্তিতে। কারো কোন চ্যাংড়ার ঠাই হবে না এখানে। ওরা সকলে যাবে আর একখানা গস্তিতে। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রথমে লোক যা যাবার কথা ছিল এখন তার চেয়ে দেড়া লোক যাবার জন্তু বায়না পরেছে। চরধল্লার ঘাটেই দ্বিতীয় গস্তিপানা বোঝাই হয়ে যায়। ছেলেপুলে আর মেয়েদের তো জায়গা একটু বেশী চাই-ই! তাছাড়া এতো আর মালামাল নয় যে একটার ওপর আর একটা চাপবে। রুস্তি না থাকলে অবশ্য ছেয়ের ওপরও জনকয়েক যেতে পারবে। কিন্তু সে তো শুধু পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। ছেলেপুলে মেয়েদের জন্তু আর একখানা নৌকো না হলেই নয়। খাওয়ার-দাওয়ার জিনিসও বড় একটা কম যাবে না। আজ মাঝ রাত্রে নৌকো ছাড়বে, পরের দিন সমস্ত দিন-রাতই নৌকোতে থাকতে হবে। এই স্বদীর্ঘ সময় এতগুলো লোক শুধু মুড়ি, চিড়ে খেয়ে থাকতে পারে না। রান্না খাওয়ার যোগাড়ও রাখতে হবে। রথ দেখা আর কলা বেচাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আনন্দ উৎসবটাও বড় কম হবে না। এতদিন সকলে প্রাণপণে ক্ষেতে খেটেছে। কিছুদিন পর আবার খাটুনী আসছে। মাঝখানের এই কয়েকটা দিন একটু জিরিয়ে নেওয়া। পাট কাটা, জাগ দেয়া, খোলাই, বাছাই, শুকানো এ সব কিছুতেই হাড়ভাঙা খাটুনী। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ

ভাল করেই করতে হবে। ঠিক হয় বিপিন মণ্ডলের বড় ঘাষী নৌকোখানাও সঙ্গে যাবে। একশো-হাতি ঘাষী-রথের কেবোয়া মোটাই পেতো বিপিন। কিন্তু টাকার চেয়ে চরের মাছের স্বথ স্থবিধার দিকে আগে নজর রাখতে হবে। দু'চার জন গিয়ে বিপিনকে ধরতেই সে রাজী হয়ে যায়। সারা বছরই তো নাও বাওয়া আছে। হোক মোটা কেবোয়া, ও ছুটিই নেবে। সকলের সঙ্গে রথের পার্বেই মাতে বিপিন। ওব নৌকোয় খোল, করতাল ওঠে। কীর্তনেব আসব বসবে। সমবয়সী জোয়ান জোয়ান ছেলেবাই থাকবে এ নৌকোয়। এ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হলো। বুড়োবা পাটের গস্তিতে, ছেলপুলে মেয়েবা আর একখানা গস্তিতে। রান্না খাওয়ার যোগান ওবাই দেবে। ভাঁড়াবও থাকবে ওদেরই জিন্দায়। ঘাষীতে চলবে শুধু কীর্তন আর ছৈয়ের ওপর ইয়ার-বন্ধুদেব সথ আহ্লাদ।

বাত আনুমানিক একটা। জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ধামবাইর রথ ভারত বিখ্যাত। চব থেকে জলপথে মাইল সাতেকেব পথ মাত্র। কিন্তু বংশীর শ্রোত এত তীর যে বাতাসেব জোব না থাকলে ভোব ভোব পৌছানো মুশকিলই হবে। দু'ঘণ্টা বাদাম উড়ছে গস্তিতে তবু যেন শ্রোতের মুখে উজাতে পারছে না। এ ভাবে গেলে বেশ বেলা হয়ে যাবে। পাটের শুভক্ষণ সকালের বাজাবেই ভাল। কিন্তু কবাব কিছু নেই। এত শ্রোতে দাঁড় টেনেও কোন লাভ নেই। বাতাস চড়লেই একমাত্র ভরসা। ঘন ঘন জয়ধ্বনি পড়ে, জয় দয়াল চান—জয় মাধবজী। মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়।

বর্ষায় বংশীর বিবাট বক্ষ ফেঁপে উঠেছে। দুপুব রাতে মাদল বাজনাব মতোই শোনচ্ছে শ্রোতের গর্জন। রথের পণ্য নিয়ে শত শত নৌকো উজাতে চেষ্টা করছে। আবার ঘাত্রীবাহী নৌকোও চলেছে কিছু কিছু। সারারাত নৌকোয় কাটিয়ে বেশ ভোবে গিয়েই মেলায় জমবে। যত বেলা বাড়বে ততোই ভিড় বাড়বে। ঘাটে হয়তো নৌকা রাখারই ঠাই মিলবে না। ভোরে ভোরে পৌছতে না পারলে অনেক অস্থবিধা। হয়তো ক্রোশ খানেক পথ হেঁটেই যেতে হবে। বংশী ধলেশ্বরীর বিবাট বক্ষ দিন দশেক আগে থেকেই নৌকোয় নৌকোয় সরগরম।

পুরীর রথের ভিড় শুধু তীর্থ যাত্রীদের নিয়ে। কিন্তু ধামবাইর রথ ঠিক তা নয়। এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আসে। বিবাট এক শিল্প

বাণিজ্যের মেলাই বসে ধামরাইর রথে। হাজার হাজার মণ পাট, চন্দনী, ধনে বেচা-কেনা হয়। আবার সার্কাস, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, বাধা-চক্র এমন কি প্রকাশ জুয়ার ছেকরও অভাব নেই। শিল্প-বাণিজ্যের ধারাবাহী শ কয়েক রূপজীবিনী এসেও আঁচল বিছায়। নদীর চড়ায় ছোট ছোট হোগলার চালা ওঠে। এক-একটি ঘর এক-একটি বিলাসিনীর। রূপ হয়তো ওদের কোন কালেই কারো ছিল না। তবে প্রচুব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হুঁচার জনকে দেখা যায়। হয়তো স্বাস্থ্যেব চেয়ে মেকী জেল্লাটাই প্রধান। দু' আনা চার আনায় লোক দব ঢুকছে। প্রকাশ দিবালোকেই ঢুকছে। একজন ঢোকে তো আর দশজন তাকে বেড়ার কাঁক দিয়ে দেখে। হয়তো মিনিট আট দশ পং বেমে নেয়ে বেবোয় বেচারী—সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ঢোকে। সে বেরুত না বেরুতে আবার একজন। এ যেন বাদিনী কাঁদ পেতে বসে তাতে ছাগল ছানার মতো তাব মুখের ভেতরে গিয়ে লাফিয়ে পড়া। সমাজ আছে, থানা পুলিশ আছে, তাব চেয়েও বড় কথা জেলা-শাসক স্বয়ং উপস্থিত আছেন সদস্যবলে কিন্তু তবু কারো কিছু করার নেই। বেশ মজার খেলাই চলে।

জুয়াড়িরা ছকে ছকে দু' আনা চাব আনা এমনকি আপুলি টাকা পর্যন্ত হারছে। আবার দিশী ধাত্তেশ্বরীর নেশায় পচা নর্দমায়ও গড়াগড়ি যাচ্ছে অনেকে। ঠাকুব মাধবজীউর অনন্ত লীলা। ভক্তদের লীলা খেলারও অস্থ নেই। প্রথম রথ থেকে ফিরতি রথ পর্যন্ত ধামরাই গ্রাম জমজমাট। মাদক বর্জন আর জুয়া বন্ধের জ্ঞত একদল প্রচারেও নামেন। হয়তো গান্ধীজীর মন্ত্র শিগুই হবেন, প্রাণপণেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে চান। কিন্তু পারেন না। প্রথম হামলা হয় জমিদারের তরফ থেকে। তারপব পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানায় আবগারী ভেঙাররা। ব্যবসা তাদের মাটি হচ্ছে। গান্ধী-বাদীরা পথরোধ করায় মাহুঘ স্বাভাবিক হুঁতি করতে পারছে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন... দু'দণ্ড পাড়িয়ে পাড়িয়ে মজা দেখছিলেন ইংরেজ কমচারী। অবশেষে অবরোধ কারীদের ওপর বেঠন চার্জ আরম্ভ হয়। এইতো চাচ্ছিল সে, মাদক বর্জন হবে মানে ? মদ জুয়া মেয়েমাহুঘই যদি না রইলো তাহলে হাট বাজার জমবে কি দিয়ে ? আর হাট বাজারই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণ্য আমদানী রপ্তানী হবে কোথায় ? না না, ওসব চালাকি চলবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইংরেজ এদেশে কলা চুষতে আসেনি।...সমানে দিন দুই ধরপাকড় চলে। হুঁচার জায়গায় বেঠন

চার্জও করতে হয়। প্রয়োজন হলে রাইফেলও চলতো। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন। প্রথম কিস্তিতেই ঠাঁও হয়ে যায়। রথের মানুষ আবার চান্দা হয়ে ওঠে। গৌকে রেখা দেখানি এমন ছেলেকেও দিনে দুপুরে হোগলার ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। মাথা পিছু দু'আনা দশ-পয়সা রেট। মিনিট কয়েকের ছায়াবাজী আর যাজিক ক্রিয়াকাণ্ড। একজন ঘাম মুছতে মুছতে বেরোয় তো আর একজন ঢোকে। তারপর আবার একজন। দিবা রাত্রির ঘূর্ণিচক্র। জগন্নাথের হাতে যে যার মতে। ব্যস্ত। কারো কাউকে দেখবার অবকাশ নেই। গ্রামের জোয়ান মানুষগুলো অজ্ঞতা বশত কুৎসিত রোগ বাজ নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। শাস্তির নীড় এদেরই অঙ্গস্পর্শে অশান্ত হয়ে উঠবে—সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে রোগ বীজ। কারো সন্তান অঙ্গুরেই বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ট হবে। করো বা দুটি ক্ষমতাই পাবে লোপ। আবার কারো বা নিষ্পাপ স্বাস্থ্যবতী গৃহলক্ষী রোগ জালায় আত্মহত্যা করবে—উন্নাদিনী সেজে পথে পথে ফিরবে। আজ যে মানুষ পাপ করলে আগামীকাল সেই মানুষই ছুটেবে পেঁচোয়-পাওয়া সন্তানের জন্ম ওবা ডাকতে—দগ্ন স্ত্রীব জন্ম দেও-দস্ত্রি জিনের পূজা দিতে। তাতে যখন ফল হবে না এবং ভাগ্যগুণে যদি কোন সংপরামশ জোটে—তাহলে ছুটেবে ডাক্তার বৈঠোর কাছে। শোষকের করাত ছাঁকিকেই ধার।

দিশী হকিম বাড়ির সাধ্য নেই এ রোগ সারায়। অদ্ভুত রোগ অদ্ভুত তার দাওয়াই। যারা প্রেমদাতা তারাই মুক্তিদাতারূপে দেখা দেন। তাদেরই ছক কাটা পথে কোটি কোটি টাকার ওষুধ আসে সাগর পার থেকে। গরল আসে বিনিময়ে জাহাজ ভর্তি অমৃত পাচার হয়ে যায়। জাতি দিন দিন পঙ্গু হতে থাকে। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। দাঁত বার করে হাসতে থাকে শোষক।

পলানের গস্তি চ'খানা ও বিপিনের ঘাষীখানা ঠিক সময়ে এসেই ধামরাইর ঘাটে লাগে। আর কিছুটা বেলা হলে আর ঘাটে ঠাঁই পাওয়া যেতো না। হাজার হাজার নৌকো—লক্ষ লক্ষ যাত্রী। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ছোট ছোট ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। ওদের বাড়ি থেকে দুর্গা, আনন্দ, ময়না তিনজনেই এসেছে। পাঁচ মণ বাছ পাট দিয়ে রথের সাইদ করবে ওরা। মোট দশ মণ উঠেছে। বাকী পাঁচ মণ দেখে শুনে গঞ্জের হাতে বেচবে।

বেব সমস্ত পাট মিলিয়ে শ'দেড়েক মণ হবে। একা পলানেরই পঞ্চাশ মণ।
 -তু করিমবও হবে মণ পঁচিশেক। বাকীটা আর আর সকলের। গুস্তি ঘাটে
 -পাব সঙ্গে সঙ্গে ফড়েরা এসে ছেকে ধরে। পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই
 -ব করে চাবীর হাতে দেয়। খারা কাজ গুছাতে জানে তারা জনে জনে
 -শামোদ না করে মাতব্বরকে হাত কবতেই চেষ্টা করে। প্রথম কিস্তিতে
 -সবি বেচা-কেনার কথা না বলে বং-ভামাসাতেই মন দেয়। মাতব্বরের
 -লপুল কাছে থাকে। ল ঝাঁ কবে হয়তো তার হাতে চারটে পয়সাই গুঁজে
 -ন। কাউকে বা কোলে নিয়ে চুমুই খেল দু'গালে দুটো। একটা শেষ
 -আবাব একটা নিড়ি দিলে মাতব্বরকে। নিজেও ধবালে একটা। তারপর
 -স আসল কথায়। স ওলা গলে অবশ্য এ সব খরচাই হিসেব ধরা হবে। ওজনে
 -পাব সম্ভাবনাই বেশী। তাতে যদি একান্তই অন্তবিধে হয় তাহলে তো হিসেব
 -সবার কোঁশল আছেই। আট টাকা মণ সোয়া সেরের দাম হয় তিন আনা,
 -চ্ছা আপনাকে তেরা পয়সাই পরে দিলাম ব্যাপারী সাব...নিজেরও সব দিক
 -য়। ব্যাপারী সাংগেও খুশীতে আটখানা। বসিক ফড়ের কাছে জয়নাল
 -তব্বরের খাতিবই আলাদা। নিজের পাটতো বসিককে দেবেই জয়নাল উপরস্থ
 -ব মৌজার সমস্ত পাটই পাবে বসিক। কাছে অল্প ফড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও
 -কান অঘটন ঘটবে না। বসিক কি দব দিলে টেরই পাবে না অল্প কেউ।
 -বিশ দর উঠতে উঠতে হয়তো এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যে আর কেউ
 -পয়সাও উঠতে সাহস করে না। এমন কি রসিকও না। দু'পাঁচ মিনিট
 -ড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রসিক। মাতব্বরকে চোখ টেপে। তারপর তার
 -ন হাতখানা নিজের হাতে টেন নিয়ে চেটোর ওপর সাক্ষেতিক ভাষায় লিখে
 -জানায় আসল দর। কড়া ক্রান্তির হিসেব জুড়ুতে না পারলেও দর কত উঠছে
 -সহজেই বুঝতে পারে জয়নাল। রসিক হয়তো লিখলে, দশ টাকা এক আনা।
 -জয়নাল জানায় দু'আনা। অনেকক্ষণ ঝকাঝকির পর শেষ পর্যন্ত জয়নালের
 -জিই বজায় থাকে। দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করতে রসিকের আফসোস আর ধরে
 -না, নিচ্ছি মাতব্বরের পো, কিন্তু বরাতে আজ লোকসানই আছে। দু'চারটে
 -পয়সাও আপনি আর আমাদের খেতে দেবেন না। উত্তরে জয়নাল বলে, হ হ,
 -বিনা লাভেই আপনারা কারবার করেন। হেই বান্দাই আপনারা।...

প্রত্যুত্তরে রসিক বলে, দশজনের কাছে লাভ করলেও আপনার কাছে এক
 -পয়সাও লাভ হয় না। তবে আপনার হাতের সাইদ ভাল তাই বা...

কথায় কথায় হয়তো অশ্রমনস্ত হয়ে পড়ে জয়নাল। রসিকের দাঁড়ির মিটার একবারের পরিবর্তে দু'বারই পাঁচ থেকে যায়। এক এক দাঁড়িতে পাঁচ সের করে মাপ চলেছে। এক দাঁড়ি সটকাতে পারলেই লাভের লাভ তন্তু লাভ এসে রসিকের তহবিলে জমা হবে! দরের চেয়ে দু'আনা কম দরে বেচলেও ক্ষতি নেই। ফড়ের কাছে শত-করা নিরানব্বই জন চাঘীরই এই হাল। তা সে ওজন হোক কিংবা হিসেব জুড়তে হোক।

দীক্ষু করিম পলানও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। ফড়ের বিড়িই টানছে। রসিক কম করেও বার তিনেক হাত টেনেছে। তবে তিন মোড়ল একসঙ্গে থাকায় তেমন কায়দা করতে পারছে না। রথের সাইদে ঠকাতে গিয়ে ধরা পড়লে কিল গুঁতো খাবাব ভয় আছে। সর্বশেষ সোজাস্বজি দর দিয়েই অপেক্ষায় থাকে রসিদ। মাথবের দিবিয়া ব্যাপাবী সাবরা, এ দরে বেচলে যেন আমি পাই।...

এক ফাঁকে ডাঙায় নেমে বাজার দেখে আসে ওরা তিনজন। সেখানেও চেনাশুনো ফড়ের অভাব নেই। তাদের কাছ থেকেও মোহিনী বিড়ি খেতে হয়। মাথা ঠিক করতে পারে না। দর তো দেখছি রসিকেরই সব চাইতে ভাল। কি হবে টানে পাট নামিয়ে? ফড়ের সংখ্যা যতোই থাক অনেক বড় বড় কোম্পানীই খরিদে নামেনি। অশ্র পর দু'রের কথা—আসল ক্রেতা রেলি ব্রাদার্সেরই পাত্রা নেই।...লক্ষণ ভাল নয়, তিন মোড়ল বটতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সল্লা কবে। না, রসিককে মাল বেচাই ভাল। অবশ্য সম্পূর্ণ টাকা যদি সে নগদ দিতে পারে। আজকের দিনে ধার কর্ত্ত হবে না। টাকা হাতে নিয়ে নিশ্চিত মনেই ফুঁর্তি করবে। নয়তো আজকের দিনে কে যাবে ওদের সঙ্গে বামেলায়। মুখে তো কিছু আটকায় না ওদের। শেষ-বাজার যদি টান যায় তা হলে অবশ্য টাকা পেতে তেমন বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ঢিলে গেলে ধার দিয়েছ কি সর্বনাশ। হাজারো রকম বায়না ধরবে। কাঁটায় ওজন করতে গিয়ে অনেক ধেঁটেছে, ভেতরে বেশ ভিজা ছিল, হেড-অপিস থেকে এখনো টাকা এসে পৌঁছায়নি ইত্যাদি...না না, আজকের দিনে ওসব চলবে না। নসদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।

নগদের জন্তু জেদ ধরাতে গস্তির সমস্ত পাট কেনা রসিকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ভাবনারও কিছু আছে। হঠাৎ রেলি-ব্রাদার্সের লঞ্চ কেন এল না? পূর্ণ পারসেজার আসরে নেমেও কেন হাত গুটিয়ে রইলেন?...রসিক

আধাআধি খরিদ করেই ক্ষান্ত হয়। তিন মোড়ল যেভাবে শ্রেন দৃষ্টিতে দাড়িয়ে আছে তাতে ওজন বৃদ্ধি হবাব আর্শে সম্ভাবনা নেই। দীহুর উপস্থিতিতে হিসেব জুড়তেও কিছুমাত্র ফাউ বোজগাব হলো না। এখন তো সপাল ঠোকা ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ালো।

বসিকের দেখাদেখি ছোটগাটো ফড়েরাও ঘাবড়ে যায়। তাবাও হু'পাচ কবে কিনে ক্ষান্তি দেয়। গস্তিতে এখনো প্রায় পকাশ মণ রয়ে গেলো। গাজকের দিনে প্রত্যেককেই হাব বজায় বেখে বেচতে হচ্ছে। কেউ হাসবে দট কাঁদবে তা হবে না। চব্বের সমস্ত পাট একসঙ্গে মিলিয়ে দু'তিনটি লট করা হয়েছে। এখন যে লটেব যা দাম ওঠে সেই হাবেই পাবে যা ঘা টাকা।

বেলা দশটাব মমোই প্রত্যেকের হাতে নতুন কবকরে নোট এসে যায়। শে বিচাবে দবেব কিছু কিছু তাবতমা হলেও দশ টাকা দবেব নিচে কেউ পায় না। দুর্গা আর্টক্রিশ টাকা বাবো আনা পেলো। আনন্দ নগদ আর্টক্রিশটা টাকা দিদিব হাতে দিয়ে বাকীটা টেঁকে গৌজে। দুর্গা আপত্তি করে না। না চাইলেও হাজ বখেব পার্বণী পেতো আনন্দ। গাধাব মতো খেটেছে বেচার্য, একটু আমোদ আহ্লাদ কববে বইকি। তাছাড়া ওকে নিয়ে কোন ভয় নেই। কোন বকম বাজে খবচায় যাবে না ও। ওব মতো চিন্তা নিজেব পেট নিয়ে। চোখে দেখাব মতো কোন নেশা ওব নেই। খব বেশী সখ চাপে তো নাগব দোলায় নাচাব পাক দিতে পাবে। বাস, ঐ পর্যন্তই।

নগদ বাবো আনা পয়সা হাতে পড়ায় আনন্দব আনন্দ আব ধবে না। গামবাইব অলি-গলি ওব নখদর্পণে। উল্লাসে ছুটে যায় মেলার মাঝখানে। বৌ বৌ কবে ঘুরছে রাধা-চন্ডব। শিঙা ফুকছে সার্কাসেব দল। তালে তালে ব্যাও বাজছে। তারেব ওপর দিয়ে এক পায়ে হেটে নড়িব মাথায় সানকী ঘোরাচ্ছে একদল। গাব একদলে সখি নাচছে। বাঘ ডাকছে ওদিক থেকে। হই হই ব্যাপার। পাশের ঘরে নাকি দু'মুখো জীবিত মানুষ। ওধারে লটারি হচ্ছে। হু' আনার টিকিটে ঘড়ি, গ্রামোফোন, সাইকেল। না না, এসব এখন ও কিছু দেখবে না। আগে পেট' তারপর অন্য কথা। কিন্তু ওধারের চরায় ছোট ছোট হোগলার ঘরে ওগুলো কি বসেছে? মানুষ যে হেঁকে ধরেছে সবগুলো ঘরকে। ও আবার কি তামাসা, হু' পা এগিয়ে যায় আনন্দ। আগে বাপ ঠাকুরদার সঙ্গে রখে বারকয়েক এসেছে। কিন্তু ওদিকটায় কোনদিন যায়নি। তাজ্জব ব্যাপার তো। মানুষ তো সব চেয়ে বেশী খুঁকেছে ওদিকটায়। আরো একটু এগিয়ে যায় আনন্দ।

ধামে নেয়ে আখা-বয়সী একটি লোক রুমালে মুখ পুঁছতে পুঁছতে কিরছিল। চিকন করে চুল ছাঁটা। গায়ে মম করছে আন্নের গন্ধ। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে তাকেই শুধায় ও, ওহানে কি খেলা বসচে দাদা ?

আগস্তক বক্রিশ পাটি দাঁত বার করে জ্বাব দেয়, বড় বাগের (বাঘের) খেলা।

বড় বাগের খেলা।

হ দাদা, বড় বাগের খেলা। দেখবা নাকি ? চাইর আনা লাগবো।

খাবা খোবা দিব না ত ?

খাবা দিব কিগ ! বুকের উপুর উঠাইয়া নাচাইব। কি যে স্তখ দাদা, ঢ় চুল চোখে অতীতে কিরে যায় আগস্তক।

আনন্দ সোৎসাহেই এগিয়ে যায়। ভিড় ঠেলে একটা ঘরের কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে, স্কলার্সী মধ্য-বয়সী একটি স্ত্রীলোক মধ্য-বয়সী আর-একটি পুরুষের কাছা ধরে টানছে। ধামে নেয়ে গেছে বেচারী। বুটিদার ভয়েলব পাঞ্জাবী ভিজ্জ জপ্, জপ্, করছে। হাব মতো নগদ একটা রূপোর সিকি সে স্ত্রীলোকটিকে দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তবু ছাড়া পাচ্ছে না। পান দোক্ত খাবার জঞ্জ আরো চারটে পয়সা চাই স্ত্রীলোকটিব। চারদিকের লোক হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে—বক দেখাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি নাছোড়বান্দা। তাব মতে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ঘরে অনেকক্ষণ বেশী থেকেছে পুরুষটি। অতএব আঙ্কেল সেলামী দিতে হবে। পুরুষটির গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। যে কোন মুহূর্তে সে এক ঘুঘিতে স্ত্রীলোকটির নাক মুখ খেঁতো করে দিতে পারে। কত পারছে না শুধু লজ্জায়। চেনাশুনো মাহুঘই হয়তো অনেকে দেখে ফেলছে। ভাঙানো চারটে পয়সা থাকলে না হয় ছুঁড়ে দিয়ে পালাতো। কিন্তু একটা ফুটো পয়সাও যে নেই পকেটে। রূপোর টাকা একটা কোঁচার খুঁটে বাঁধা আছে বটে। কিন্তু ওটা বার করলে রান্ধুসী গোটাটাই কেড়ে নেবে। না, নাক মুখ কাটাই যাবে আজ। লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে উঠেছে বেচারার। স্ত্রীলোকটি কাছা ধরে যতো টানছে ও ততোই মাথা হেঁট করছে। মাঝে মাঝে জ্বাব দেখাতেও চাচ্ছে। কিন্তু চারদিকের কহুড়িতে মাথা তুলতে পারছে না। অবশেষে টেক হাতড়ে কিছু না পেয়ে স্ত্রীলোকটি জামা ছেড়ে বুক পকেটের রুমালটাই ছুঁলে নেয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ছাড়া পেয়ে বেচারী কাছা সামলাতে সামলাতে উর্ধ্ব্বাসে ছুটে পালায়। চারদিকের মাহুঘ—হই হই করে ওঠে।

দৃশ্য দেখে আনন্দ হতবাক। শহর বন্দরে অনেক বেড়া আছে বলে ও শুনেছে। কিন্তু তাই বলে মেয়েগুলো যে এতোটা বেহায়া হতে পারে তা ও করনায়ও আনতে পারে না। থু থু ফেলেতে ফেলেতেই আনন্দ ছুটে পালায় সেখান থেকে। একটু ফাঁকায় এসে খানিক জিরাতে থাকে। ঘোঁসায় পেটের নাড়ী-ভূঁড়ী সব পাক দিতে শুরু করেছে। ছি ছি ছি, দেব-দেবতার পূজো পার্বণে এসে এসব কি অন্যচার। না, দোশ ওরই, কেন ও মরতে এল এদিকে।...

বটের ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে জিরোবার পর খানিক স্থির হয় আনন্দ। কিন্তু অবিরত থু থু ফেলে ফেলে গলা শুকিয়ে উঠেছে। এখন কিছু মুখে না দিলে এক পাও এগোনো যাবে না। সামনেই বড় বড় আক বিক্রী হচ্ছে। বেশ পুষ্ট, তক্তক করছে হলদে রং। এক আনা দিয়ে বাছাই একটা আকই কিনে ফেলে আনন্দ। হাটে বাজারে অগুদিন এর দাম দু' পয়সার বেশী নয়। আজ বখের মওকা পেয়ে দাম চড়িয়ে দিয়েছে হাটুরেরা। তা দিক-প্রাণ তো এখন বাচলো।... আনন্দ খুশী মনেই আনিটা ব্যাপারীর হাতে দেয়। ওর নির্দেশ মতো কাটারি দিয়ে সমান তিন টুকরো করে কেটে দেয় আকের ব্যাপারী। গোড়ার দিকটা বেশী মিষ্টি হলেও অপেক্ষাকৃত শক্ত। দিদি আর ময়নার চিবাতে বেশ কষ্ট হবে। ও নিজেই তাই চিবাতে থাকে গোড়ার দিকটা। মিষ্টি রসে আবার মনের মিষ্টি ফিরে আসে। এবার সোজা হুজি চলে আসে খাবারের দোকানের কাছে। ময়নার দোকান, তেলে-ভাজার দোকান, খেলনার দোকানের ছড়াছড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কোনটা রেখে কোনটা কেনে। কম পয়সায় পেট ভর্তি খাবার পেতে হলে তেলে-ভাজার দোকানই শ্রেয়। খাবারের রাজা, গরম গরম বেগুনি, ফুলুরি, ছোলা সিদ্ধ আর মুড়ি। দু'পয়সা দিয়ে বড় দেখে একটা মাটির হাঁড়ি কিনে নিয়ে তার ভেতর চার আনার তেলে-ভাজা আর মুড়িই সর্বপ্রথম কিনে ফেলে আনন্দ। জিলিপী তো গজে প্রায়ই খাওয়া হয়। সুতরাং সাবেক দর পয়সায় দু'খানা করে জিলিপী হলেও আজ আর জিলিপী নয়। রথ উপলক্ষে তৈরী বিশিষ্ট রস-বড়াই আজকের দিনের সেরা খাবার। বেশ বড় বড় লাল লাল বড়া। পেতলের গামলার রসে গাঁতের কাটছে যেন। গাওয়া দিয়ে তৈরী। মুখে হোঁসাতে না হোঁসাতে গলে জল। দু' আনার আট খানা বড়াও কিনে নেয় আনন্দ। তা খরচা নেহাত কম হলো না। সাড়ে সাত আনা তো এরই মধ্যে খাবার। বাকী মাত্র সাড়ে চার আনা। সার্কাস এর

আগে আরো দু'বার দেখা হয়েছে। স্মৃতরাং সার্কাস না দেখলেও চলেবে। কিন্তু দু'মুখো মানুষ কেমন তা তো দেখতেই হবে। এক আনা যাবে ওতে। তারপর খেয়েদেয়ে রথটানের আগেই আবার এসে লটারির টিকেট ধরা চাই। দু' আনায় যদি একটা কলের গান পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। সারা চরফুটনগর ছুটে আসবে মণ্ডল বাড়িতে। না, আগে কাকেও কিছু বলা হবে না। বরাত খুললে, সামগ্রী হাতে করেই সকলকে বলা যাবে। কিন্তু না পেলে পয়সা দু'আনা মিছিমিছাই নষ্ট হবে।...তা হোক, পুরুষ মানুষকে অতো ভাবলে চলে না। কথায় বলে, সাহসে লক্ষ্মী নয়তো মাথায় বাঁশ। সেই ভাল, এখন আর এক পয়সাও খরচ করা যাবে না। সর্বশেষ দু' পয়সার বিড়ি কিনে বাকী পয়সা কৌচার খুঁটে বেধে ফেলে আনন্দ। তারপর খাবারের হাঁড়িটা হাতে নিয়ে হন-হনিয়ে ঘাটের দিকেই পা চালিয়ে দেয়। পেছনের গলিটা এখনো বেশ ফাঁকা আছে। তবে বেলা বারোটাের পরে আর হাঁটা যাবে না।

বিকেল চারটেয় রথ টান। বিরাট লম্বা দুই কাছি। বাসুকী নাগের মতোই বিস্তৃত স্থান জুড়ে পড়ে আছে। কম করেও পাঁচ শো গজ হবে এক একটা। ওজনেও দশ বারো মণ হবে। রথের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস হওয়া আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্মৃতরাং এখন আর কোন ভক্তকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। প্রাণের আবেগ এখন শুধু নেচে-কুঁদেই শেষ করতে হয়। রথের পেছনের চত্বরে বসেছে সার্কাস, হোগলার ঘর, দোকান পসার। সামনের চত্বর উন্মুক্ত। স্থায়ী কোন দোকান পাট নেই এখানে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত দলে দলে এসে গান গাইছে, নাচছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে। রথটানের আগ পর্যন্ত কেরিওয়ালারা পুরোদমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁশের বাঁশী আর কলা-চিনিই প্রধান পণ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত ছোঁয়াবে। ধীরে ধীরে চলবে মাধব জীউর রথ। জগন্নাথ যেন জগৎ জনের আকুল আহ্বানে বিশ্ব-ত্রাণেই চলেছেন। শোক তাপ জ্বালা সব দূর হবে আজ। কাছিতে হাত লাগাও—থকলে কুল পাবে—অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। প্রতি বছর মানুষ এই বিশ্বাসেই ছুটে আসে। “রথচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন ভবতু।” রথের ওপর প্রভুকে দর্শন করলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। শোক তাপ জ্বালা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে। শাস্ত্রের এই অভয় মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রথে আসে। গাছের নতুন ফল নতুন ফুল ভবকাণ্ডারীর জন্ত নিয়ে আসে। শুদ্ধ-ভক্তি-ভরে নিবেদন করে রথের

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। জীবনের অচল রথকে সচল করবার জন্মই প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত লাগায়। আবার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের আশায় কাছি থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ আঁশ ছিঁড়ে নিয়ে মাদুলি করে গলায় পরে। হোগলার ধরের ভিড় অপেক্ষা এখানকার ভিড় ঢের বেশী। এখানকার মানুষের মধ্যে কোনরূপ লুকোচুরি নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের আশ্রয় চেষ্টায়ও যদি ঠাকুরের বখ না নড়ে তবে প্রকাশ্যেই আকুল হয়ে কেঁদে বুক ভাষায় এরা। এ ভিড় আছে বলেই হরতো সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে কিনা তা পরলোক-স্বামীই জানেন। কিন্তু ইহলোকে কিছু না পেয়েও মানুষ মন থেকে এ বিশ্বাস একেবারে মুছে ফেলতে পারছে না। বস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতা মানুষকে অনেক দিয়েছে, হয়তো আরো অনেক দেবে। কিন্তু তবু কি মানুষ পারবে এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি নিতে?...জগন্নাথের রথ চলেছে হয়তো ঠিকই চলবে।...

চারদিক থেকে দলে দলে অমুবাগীরা এসেছে। গতি নৌকো, বাঘী নৌকো, ডিক্সি নৌকোর ছড়াছড়ি। নদীর মাঝ ববাবর নোঙর কেলে পাড়িয়ে আছে পুলিশ সাহেবের ঝকঝকে লঞ্চখানা। ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে পতপত করে আগে পিছে। ঢাকা, মহেরা, বালিয়াটি থেকেও খানকয়েক গ্রীনবোট পাশাপাশি এসে নোঙর ফেলেছে। কোনটায় চলেছে ইয়ার বন্ধুবান্ধবদের হইচই, কোনটায় গান বাজনা বাইজী নাচ। আবার কোনটায় সপরিবারে এসেছেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা। জগন্নাথের হাটে কারো আসতে বাবণ নেই। যার যেভাবে মন চায়।

চরের ঘাঘী এবং গস্তি হু'খানা সরাসরি এসে ঘাটে ভিড়তে পারেনি। ভোর ভোর পৌঁছেও কিছুটা দূরেই বাঁধতে হয়। আর খানকটা দেরি হলে ঘাট ছেড়ে অঘাটেই বাঁধতে হতো। ঢাকার একখানি গ্রানবোট পাশাপাশিই রয়েছে। বখটান না দেখে বয়স্কদের কেউ জলও স্পর্শ করবে না। এক এক খানা নৌকো এসে ভিড়ছে সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি উঠছে। কুলনারীরা দিচ্ছে উলুধ্বনি। ভিন্ন ধর্মী যারা মেলায় এসেছে তারাও এবেলা কেউ রান্না-বান্না করছে না। বাজারের খাবার খেয়েই দিন কাটাচ্ছে! বেচা-কেনা সখ-আফ্লাদ মিটলে ওবেলা ইলিশ মাছের ঝোল ভাত খাবে। চরের মানুষদের তো কথাই নেই। ওরা সম্প্রদায় গত আলাদা হলেও এক আত্মা এক প্রাণ। রথের বাজার ভাল গেলে পুরো ভোজ্যই আজ খাবে সকলে মিলে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে শুধু ঢাকার

বোটখানায়। সকাল বেলাতেই ওদের রহস্যখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেকছে। রকমারী রান্নাই হচ্ছে হয়তো। অল্পকুল বাতাসে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে খুশ্ব। ছ'চারটি ফিনফিনে ছোকরা থেকে থেকেই ছাঁদের ওপর উঠে কি সব কাড়াকাড়ি করে থাকে। কারো পরনে গোলাপী সিন্ধের লুঙ্গি, শ্রাণ্ডো গেঞ্জি। কারো বাম মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, ন্যাকের ডগায় চশমা। শুধু আঙুর ওয়ার পরেও কেউ কেউ হৈ হুল্লোড় করছে! মুহুমুহু: সিগারেট ফুঁকছে কেউ কেউ। হাসছে, শিস দিচ্ছে আবার হুড় হুড় কবে নীচে নেমে যাচ্ছে। চব্বি-বউবা দেখে দেখে অবাক। বথে এসেছে তা অমন ফকুড়ী করছে কেন?—হঠাৎ ভবলায় চাটি পড়ে। প্যা পো করে বেজে ওঠে হারমোনিয়ম। সঙ্গে বেশ সুরেলা গলায় সুব ধরে একটি চাঁপাব কুড়ি। ঠ্যা ঠ্যা চাঁপা ফলেব মতোই ওব গভরের রং—ছিপছিপে চেহাৰা। বলমল করছে বাশিকৃত গহনা! বৃট্টার বেনারসীখানা তো বেশ দামীই হবে। ইস, একটু যদি লজ্জা থাকে। একপাল পুকথব সামনে কেমন সেজেগুজে গাইতে বসেছে। গালে হাত দিয়েই ভাবতে থাকে চাবদিকেব তীথষাত্রীবা। হবি বাঈ মেন্দিকে ক্রক্ষেপ না করে আপন চঙেই গাইতে থাকে—

কে বিদেশী মন উলাসী

বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।

গান সোমের মাথায় এসে জ্বিয়ট বাধে। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি কাৰো। পাশে বসে আছে আরো দুটি স্ত্রী মেধে। বয়েস হরির চেয়ে কমই হবে। বড় জোর আঠারো উনিশ। সহসা ঘুঙুর পায়ে তিড়িং করে উঠে পাড়ায়। গানের তালে তালে বমবম শব্দে শুরু হয় নাচ। বিলোল লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী। চোখের ইসারায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। সোমের সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ছে ছোকরাবা। শিস দিচ্ছে, গোলাপ ছুঁড়ছে, 'মরে যাই, মরে যাই, প্রাণ' বলে লুটিয়ে পড়ছে। মাসের পর মাস পরিবেশিত হচ্ছে রঙিন সুখা।...দেখে দেখে গা পাক দিয়ে ওঠে কুসুমের। মাগো, কি ঘেমা! ধুম্মা ধুম্মা মাগীরা একপাল ছোকরার মাঝখানে কেমন কোমর তোলাচ্ছে। একটুও কি লজ্জা নেই মুখপুড়ীদের!... পুরুষদের একজনও যে নৌকোয় নেই। একে একে সকলেই তো ডাঙায় গিয়েছে। একুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ঠাকুর দর্শন করতে এসে একি দেখতে ও ছাই-ভস্ম!...নিশি গ্রীনবোটের দিকে চেয়ে মিটমিট করে

হাসছিল। কুহুম চীৎকার করে ওঠে, ছেয়ের ভিতরে আয়, নিজেও উঠে আসে পেছন ফিরে। ছি ছি ছি কি খেলা!... ১

রথ টান সময়মতোই হয়ে যায়। বেশ ভালভাবেই দর্শন হয়েছে ওদের। সকালে যে সব অযাত্রা দেখেছিল, তাতে ভয়ই ছিল, মাধবজীউ দর্শন দেবেন কি না, প্রভু ওদের মুখ রক্ষা করেছেন।

পুরুষ মানুষরাও হাঁপ ছেড়ে বাচে। খুব রক্ষা যে প্রথম চোটে বেশীর ভাগ পাট বেচে দিয়েছে। বিকেলের দিকে তো বাজার এক টাকা নরম। তাছাড়া খন্দেরই নেই। বসিক ফড়ে তো এরই মধ্যে সাতবার এসে মাথা চাপড়িয়ে গেছে। তা যা হোক। ব্যবসা—ব্যবসা। ঠকা জেতা আছেই। তাই বলে তো আর সাইদের পয়সা ফেরত দেওয়া যাবে না। আর দেবেই বা কেন? এই তো মাত্র একবার এ বকম হলো। নয়তো বছর ভরেই তো ওরা কলা দেখায়। এখন মুশকিল হলো বাকী পাট ক'গাছা আর বেচা যাবে না। কে জানে, কি হবে এবাব পাটের বাজার? নমুনা তো বড় ভাল ঠেকছে না। যাকগে, সে পবের ভাবনা পবে ভাবা যাবে। এখন চাই খাবার। তেঁস্তায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ছোটরা অবিবত মুখ চালালেও বড়দের পেটে জলবিন্দুও পড়েনি। এখন বেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরি হবে। শুধু মুখে অতক্ষণ থাকা যাবে না। তাছাড়া সোজাশুজি ডাল-ভাতও আজ আর হবে না। আজ একটু রকমফের বান্নাই হবে। আর কিছু না হোক ইলিশ মাছের ঝোল ভাত ভাজা তো হবেই। সন্দেহজ্বলী আম আর দই। ইলিশ মাছ সকলকে যাচাই করেই পরিবেশন করা হবে। তা হয়ে যাবে এখন। মাধব জীউর দয়ায় কারবার একরকম মন্দ হয়নি। বাছ পাট যখন গড়পড়তা এগারো বারোয় বিকোলো তখন গাছ পাটের দর উঠবেই। বত্রিশ সালেও তো তাই হয়েছিল। দশ বারো থেকে চড়তে চড়তে একবারে ত্রিশ বত্রিশ। কিছু পাট অবশ্য ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে তা হোক, এ সব ব্যবসাদারদের চালাকি। চাষীর মনের বল ভেঙে দেওয়ার মতলব। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন টাকা উঠানো দরকার। এর আগ পর্যন্ত যা খরচা হয়েছে সে যার যার তার তার। এখনকার বারোয়ারি ভোজ টাকা তুলেই হবে। গস্তির ছেয়ের ওপর বসে হুকো টানতে টানতে সন্না চলে মোড়লদের। অস্তেরাও খুশী মনেই এসে যোগ দেয়। হাতে সকলেরই করকরে

নোট রয়েছে। স্বর্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাঁদা উঠে যায়। দীহু, করিম, পলান চাঁদা ছাড়াও প্রত্যেকে এক হাঁড়ি করে দই দিতে প্রতিশ্রুতি বেয়। মদনই প্রস্তাবটা তুলেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও সব সময়েই অগ্রণী। গন্তি আর ঘাষীতে হই হই পড়ে। সব চেয়ে খুশী হয় ছোটরা। মনের আনন্দে তালপাতার বাশি জোরে জোরে ফুঁকতে থাকে। কিন্তু এতো সবই গেলো পরের কথা। এখন যে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী মোচড়াতে শুরু করেছে। এখনকাব মতো কিছু চাই যে।...হুকো টানতে টানতে দীহুর নজরে পড়ে, ঘাটের পারে বড় বড় কাঁসার বগী খালায় করে মালাই নিয়ে উপস্থিত হয়েছে স্থানীয় গোয়ালারা। যেমন পুরু তেমন তকৃতকু করছে রং। ও আর স্থির থাকতে পারে না। হুকোটা করিমের হাতে দিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে ডিঙাতে ডিঙাতে ঘাটের পারে গিয়ে নামে। এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বাছাই বাছাই চারখানা মালাই কিনে কেলে দেড় টাকা দিয়ে। ওজন সের দেড়েক হবে। দরটা একটু চড়াই হলো। তা হোক পালপার্বণের দিনে হবেই। সময়মতো যে এমন জিনিস পাওয়া গেছে এটাই ভাগ্য।...কলার পাতায় জড়িয়ে দেয় গোয়ালার যত্ন করে। তিনবার কপালে ছুঁইয়ে সাইদের টাকা টেকে গোঁজে। দীহু খুশী মনে এগিয়ে যায় আরও একটু ভেতরের দিকে। বড় রাস্তার ধারে বিল্লী (এক রকমের মিহি খই, স্নগন্ধিমুক্ত) আব চিনিব ছাঁচ নিয়ে বসেছে দোকানীরা। আড়াই সের ছাঁচ ও পাচ পো বিল্লী একটা মাটির হাঁড়িতে করে কিনে কেলে। মাধর জীউর কুপায় জলযোগটা বেশ জমবে। আজকের এত লোকের ভিড়ের মধ্যেও যে এ রকম মালাই পাবে তা ও ধারণাই করতে পারে নি। মুড়ি তো নৌকোয় আছেই, এখন গণ্ডাকয়েক কচি শসা হলেই মিটে যায়। কিন্তু একা একা আর এত জিনিস বয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলো বেধে এসেই আবার নিতে হবে।...দীহু ছ'হাত জোড়া সওদা নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকোয় ফিরছিল। কিন্তু পেছন ফিরতেই পলান আর করিমকে আসতে দেখে। করিমের হাতে বড় বড় বারো চৌদ্দটা ফজলী আম পলানের কাঁধের ওপর বিরাট একটা কাঁঠাল। ওজন কম করেও সাত আট সের হবে। দাম পাচ সিকে। ফজলী কয়টা ছুঁটাকায় কিনেছে করিম। দীহুকে হঠাৎ ছেয়ের ওপর থেকে কিছু না বলে না কয়ে ছুটতে দেখে ওরা ছ'জ'নও অহুসরণ করেছিল। যার যা মন চেয়েছে সওদা করেছে। কেউ কাকেও বাধা দেয়নি। এ সওদা ওদের নিজেদের পরসায় কেনা। স্তরাং কারো কিছু বলবার নেই।...

ছোটরা দিনভর মুড়ি চিড়ে আর তেলে-ভাজা খেয়ে খেয়ে খিত্তিয়ে পড়েছিল। শুধু ও-জাতীয় খাবার হলে ওরা আর ধারে কাছেও খেঁবতো না। কিন্তু মালাই, আম আর কাঁঠাল দেখে আবার সকলে পাতা নিয়ে ঘুরঘুর শুরু করে। খাবার সবই গিন্নীদের জিম্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারাই যাকে যা দেবার দেবে খুবে। মদন আনন্দ মেলায় পা দিয়েই হুঁচোখে যা দেখেছে গিলেছে। বড়োদের মতো ওরা কেউ উপোস দিয়ে নেই। তবু মালাইয়ের লোভে পাছ ছাড়ছে না। করিম, পলানও রীতিমতোই ছাত্ত মুড়ি চিড়ে খেয়েছে। সাবান্নের ঘোবাঘুরিতে সে খাওয়া জল হয়ে গেলেও যারা উপোস দিয়ে আছে তোড়জোড় করে সর্বপ্রথম তাদেরই বসিয়ে দিতে যায়। কিন্তু দীন্ন ওদের বেখে কিছুতেই বসে না। আনন্দ, মদনের ইচ্ছে ওদের সঙ্গেই একত্র বসে। কিন্তু দীন্ন বেছে বেছে ওদের ওপরেই পবিবেশনের ভার দেয়। পরস্পর হতাশায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেও শেষ পর্বন্ত কাজে লাগতে বাধ্য হয়। মেয়েরা সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছে ওরা এনে পরিবেশন করছে। ছোটদের কাউকে পাত পেতে বসতে দেওয়া হয় না। এক একটা তো খুদে রান্ধস। সারাদিন যা পাচ্ছে গিলছে আর হাগছে। পেট নয়তো যেন জয়ঢাক। যার যার জেলেমেয়ে সে সে সামলায়। যৎসামান্ত যা দেবার হাতে হাতে দিয়েই শাস্ত কবতে চেষ্টা করে। কেউ চূপ করে—কেউ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে থাকে। মায়েরের সঙ্গেও কেউ কেউ বসে আবার।

সকলের জলযোগের পর জয়ধ্বনি দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। এবার আর কোন আয়াস নেই। স্রোতের মুখে শুধু হাল ধরে বসে থাক। বংশীর জল নেচে নেচে চলেছে। সাত আট মাইল পথ ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ছপূরের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি দিয়েই গা ঢাকা দিলে। ঝিরঝির করে বইছে জলো হাওয়া। পুরুষরা সকলেই এসে ছৈয়ের ওপর বসে। দল আগের মতোই ঠিক আছে। গিন্নী-বান্নিরা এবার রান্নার কাজে মন দেয়। মদন ধামরাইর বাজার থেকেই ইলিশ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু পলান রাজী হয়নি। বাজারে দর বেশী হবে। আবার বাসি পচা হবারও সম্ভাবনা আছে। সামনেই ঘুঘুদিয়া। জেলেদের আড়ত। ওখান থেকে দেখেগুনে কিনলে সব দিক থেকেই সুবিধা হবে। সকলেই পলানকে সমর্থন করে।

ভাটির টানে গন্তি হুঁখানা বেশ গা ছেড়ে দিয়ে চলেছে। এদিক থেকে

ঘাষীখানার গতির্ই বেশী। একক ছেড়ে দিলে নাগালের মধ্যেই থাকবে না। কিন্তু তাতে আর হতে পারে না। সকলে একসঙ্গে এসেছে একসঙ্গেই ফিরবে। মেয়েদের গম্ভীখানার সঙ্গেই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় ওটাকে। গতি প্রতিহত হয়।

কেরার পথে আর ফকিরের আসর বসে না। কীর্তনও না। সকলেই এবার খোশ গল্পে ব্যস্ত। সকলের মনেই বইছে খুশীর হাওয়া। ঘাষীখানায় চলেছে চ্যাংড়ার দল। এর ভেতরে আবার একটু যাবা বয়স্ক তাবা বসেছে ছেয়ের ওপর। কেউবা পেছনের গলুইতে। আনন্দ, অশ্বিনী, ওসমান, মদন এদেব দলে। সামনের গলুইব দিকে আছে, কাশেম, নিশি, কজলুল প্রভৃতি। পাশাপাশি গম্ভীর সামনে বসেছে ময়না, পার্বতী, মেহেরা, আমিনা, আনোয়ারা। ছেয়ের মাঝামাঝি বাচ্চা-কাচ্চারা। গিন্নী-বাম্মিরা পেছনের দিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ময়না নিশির মধ্যে তেমন কোন জড়তা নেই। আজ অনেক দিন পব ওরা এত কাছাকাছি বসতে পেরেছে। কিন্তু মেহেরার ঘেন লজ্জাই কাটে না। কাশেমকে দেখে স্তম্ভিত ঘোমটা টেনেই ও জবুখু হয়ে বসে আছে। পার্বতী সামনে বসে কুটনো কুটে দিচ্ছে। মেহেরাব উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতেই বলে, কিগ বেগমসাহেবা, ঘরেব নোকেব কাছে আবার এত সবম কিসেব? ঘুমটা খুইলাই বহ (বসো) না।

মেহেরার তবু লজ্জা কাটে না। ঘোমটার নীচেই ফিকফিক করে হাসতে থাকে।

ওকে নিরন্তর দেখে পুনরায় কাশেমের সঙ্গেই বসিকতা শুরু করে পার্বতী, মিঞা সাবও যে চূপচাপ কইরা বইহা রইলেন। বিবিজানরে কোলে লইয়া বহেন না।

মেহেরা নিরন্তর থাকলেও কাশেম নিরন্তর থাকে না। সমতা রেখেই জবাব দেয়, কোলে উঠবার লেইগা যদি আপনার সক অইয়া থাকে তাইলে কন অশ্বিনী লাদারে ডাইকা দেই। মনের মাছবরে কোলে লইয়া বইহা খাউক।

হেসে পার্বতী বলে, আমরা পুরান অইয়া গেচি, আমাগ আর পোচে ক্যারা। মনের নাছব দেখবার চান ত তবে এই জ্বাহেন, এক বটকায় মেহেরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে দেয় পার্বতী।

বেচারা মেহেরা ভাড়াভাড়ি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অবিরত হাসতে থাকে।

কাশেম বলে, অত হাসবার কি আছে। দিদির স্বধন সখ অইচে তখন কোলে না বইলা ঘুমটাড়া খইলাই বহ না।

হ, তাই কনচে। চাঁদ মুখ কি আমরা গিলা খাইয়া কালামু?

এর পর আর মেহেরা ঘোমটা দিয়ে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকতে পারে না। শুধু চাঁদ পর্ষন্তই ওঠে। মুখখানা সম্পূর্ণই দেখা যায়।

পার্বতীর দৃষ্টি পড়ে এবার নিশির ওপর। সবসতা নিয়েই বলে, নিশি-ভাইয়েরও কি মইনীরে দেইখা নতুন কইরা লজ্জা অইল নাকি? প্যাট খেইকা বইড়াই না দুইজনে গলাগলি ধইরা আচ।

কথাটা সত্যি হলেও নিশির মধ্যে কেমন যেন জড়তা এসেছে এখন। আগের মতো কিছুতেই আর ও ঝাঁ করে ময়নার চুলের মুঠি ধরতে পারবে না। ময়নাও হয়তো পারবে না কথায় কথায় ওর গলা জড়িয়ে ধরতে। কেমন যেন পবিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। সর্বাঙ্গ গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে। এ যেন এক অভিনব রহস্য। জানা ময়নাকে নতুন করে জানতে ইচ্ছে করে।...পার্বতীর স্বথায় কোন জবাবই দিতে পারে না। শুধু একটু হাসি খেলে ঠোঁটের কোণে।

কিন্তু পার্বতী ছাড়বার পাত্রী নয়। কাশেমও ছাড়ে না। পার্বতীকে সমর্থন করেই কাশেম বলে, কিগো ময়না পাখী, আর কিচু কইবার না পার নিশি ঠাইরে একটা গৎ বাজাইবার কও না।

হ নিশিদাদা, ইসব ফাইজলামির কাম নাই। তুমি আমাগ একটা গৎ বাজাইয়াই ছনাও, এতক্ষণ পব মেহেরা মুখ খোলে।

পার্বতী সায় দেয়, বেশ, তাই বাজাও নিশিভাই। মেহের সোনা নাগরের গলা ধুইরা ঝুলুক।

আমরা ঝুললে আপনাগও ঝোলন লাগব দিদি। অশ্বিনীদাদা ত পাছার গলইতেই আছে, ভাইকা দিমু নাকি, কাশেম পাণ্টা রসিকতা করে।

নিশি আর কাকেও কোন স্বযোগ না দিয়ে বাঁশীতে হুঁ দেয়। ভাটিয়ালির স্বর অল্পরগিত হতে থাকে বংশীর মেঘ-ঘন বক্ষে। মিছিল করে চলেছে নৌকোর বহর। পাশাপাশি ষাচ্ছিল আর একটা সৌধীন দল। স্বরের মুর্ছনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলে বৃড়ো সকলের প্রাণেই সাড়া জাগায় নিশির বাঁশের বাঁশী। বেজে বেজে থেমে যায় এক সময়। কিন্তু শ্রোতাদের রেশ কাটে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে পার্বতী আবার আন্কার করে, ঐ গৎটা বাজাও নিশিভাই।

কোনটা...নিশি জিজ্ঞেস করে।

হেসে পার্বতী বলে, ঐ যে সেই—“রাধে তোর তরে কদমতলে বসে থাকি”...

নিশি কিছু বলার আগে কাশেম টিপ্পনী কাটে, হ হ নিশিভাই, তাই বাজাও।
দিদির লেইগা যে দাদায় এহনো পছাঁর গলইতে বইহা আছে।

পার্বতীও ছাড়ে না, বলে, দিদির কতা পরে ভাইবেন। বিবিজান যে
আপনার লেইগা সামনেই বইহা আছে।

কি খালি খালি বাজে কথা। নিশিভাই, বাজাও গংখান, মেহেরা
অহুরোধ করে।

নিশি আবার কাউকে কিছু বলবার স্বেযোগ না দিয়ে স্বর ধরে। আবার
উচ্ছ্বাস জাগে আবাল বৃদ্ধ বনিতার বুকে। সামনের গস্তিবিদ চৈয়ের ওপব বসে
বুড়োরা জটলা করছিল। বাশির স্বর তাদেবও উন্ননা করে তোলে। কেউ আর
কোন কথা বলতে পারে না। কান পেতে নীরবেই শুনতে থাকে। বাশী
ধামলে দীহুকে লক্ষ্য করে পলান বলে, বৈরাগীর পো, পোলাব সাদী তাড়াতাডি
দিয়া ছান। কদমতলায় আব কতদিন বইহা থাকব ?

দীহু মুখ টিপে টিপে হাসে।

উত্তরটা করিমই দেয়, বেশীদিন না থাকলেও এক বছর ত থাকনই লাগব।
ইনাগ শাস্ত্রে যে আবার এক বছর অশৌচ পালন লাগে।

হ, তা কাটল ত কয় মাস। বাকীজ কাটলেই অইয়া যায়।...

হিসেব মতো ওরা হয়তো প্রথম রাত্রেই চরে পৌঁছুতে পাবতো। কিন্তু
ভোজ থাকায় ঘুঘুদিয়ার ঝাঁকে হিজল গাছেব সঙ্গে নোকো বেঁধেই রাত কাটাতে
হয়। প্রাণপ্রাচুর্যে চলে খাওয়া-দাওয়া রং-তামাসা। ভোর ভোর সকলে
এসে চরে পৌঁছায়।

॥ ২৩ ॥

প্রথম রথের পর ফিরতি রথও কেটে যায়। কিন্তু পাটের দর আর ওঠে
না। কেমন যেন ধম ধম করছে বাজার। অছাছবার মাসখানেক আগেই
গঞ্জ রেলি ব্রাদার্সের আকিস খোলা হয়। কিন্তু এবার সবই ভেঁা-ভেঁা। পূর্ণ
পার্সেজার বার কয়েক নারান্ধ গঞ্জে শুধুই দৌড়বঁাপ করলেন। এ পর্যন্ত এক
ছটাকের ধরিত্রও আনতে পারেননি। ধামরাইর রথে গড়পড়তা এগারো বারো

ঢাকায় সাইদ হয়েছিল। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এখন সে পাট আট নয় টাকার বেশী নয়। তাই বা খন্দের কোথায়? শুধু ফাঁকা কথার ছড়াছড়ি। দিন যত যাচ্ছে চরের মানুষের বুক কেঁপে উঠছে। মাসখানেক পরেই তো আসল গাছ পাট লাগবে। তার আগে আছে কাটাটাই, জাগ, বাছাই, ধোলাই ও স্ত্রকোবার খরচ। প্রথম দফার খরচা বাবদ মোটা স্ত্রদে অধিকাংশেরই কর্জ নেওয়া আছে। ভেবেছিল, দ্বিতীয় দফার খরচা বাছ পাট বেচেই হবে। কিন্তু তা আব হচ্ছে কই। রথে যা বেচেছে, বেচেছে। তারপর তো এ পর্যন্ত একটা ছিনকাও বেচতে পাবে না কেউ।...

দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে থাকে। হাতে এখন আব তেমন কোন কাজ নেই। ধলেশ্বরী বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। চেউয়েব ফোস-ফোসানী না থাকলেও শ্রোতেব টান ভয়ংকর। চাবদিকের নালা-ডোবা থেকে দলে দলে ভেসে আসছে কচুরিপানা। পাট গাছ এখন যথেষ্টই বড়ো হয়েছে। এখন আব চাপায় পড়ে মারা যাবাব সম্ভাবনা নেই। তবু যদি ক্ষেতের ভেতবে কচুরিপানা ঢোকে তাহলে ক্ষতিব সম্ভাবনা আছে। গাছের গায়ে পোকাও লাগতে পারে। চরের মানুষবেব এখন প্রধান কাজ চারদিকে স্ত্রতীক্স নজর রাখা। কিছুতেই যেন কচুরিপানা ক্ষেতে না ঢোকে।

দামান্ত্র কাজ, সকলেই মন দিয়ে কবে। সাবাদিন তো শুয়ে বসে তামাক পেয়েই কাটাতে হয়। নোকো ছাড়া এক পা বাড়ির বা'র হবার জো নেই। ব'ব-বাড়িগুলো সবই যেন জলের ওপব ভাসছে। বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক একটি জীবন-বন্না যেন। মাঝে মাঝে দু'পাঁচ জনকে নিয়ে দয়াল চানের আসর ফমেও ভাগবতের আসব আর তেমন জমে না। চরের সকলের নোকো ডিক্সি নেই। দীলুর ডিক্সিতে সময়মতো যাবা আসতে পারে কেবল মাত্র তারাই আসে। সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে রামকান্তকে নিয়ে। এক তো উত্তর কোণের শেষ প্রান্তে তার বাড়ি—ডিক্সি নিয়ে অনেকটা পথ যেতে হয়, তার উপর আবার প্রায়ই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সৈতসৈতে খর ছেড়ে গঞ্জের কাছারিতেই অধিকাংশ সময় কাটায় রামকান্ত। বেচারার দোষ নেই। বন্দী অবস্থায় একা এক খরে কতক্ষণ লোকের মন টেকে। চরে ওর দোশর কেউ নেই। নাম-কীর্তন আর ভাগবত পাঠ ব্যবসা হিসেবেই করতে হয় ওকে। মনের শান্তি কিছুমাত্র ওতে হয় না। তাই রমেশনারায়ণের সঙ্গে গ্রীনবোটে মাতোয়ারা হয়ে পড়লে কোন কোনদিন ছেদও পড়ে যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও স্বেচ্ছায়ই ঘটাতো। পারে না

শুধু রমেশ্বরনারায়ণের সামান্যতম অনুকম্পার অভাবে। নিদেন যদি একটা তলিলদারের কাজও ওকে উনি দিতেন।...

ধরতে গেলে তামাক খেয়ে আর আলসেমী করেই দিন কাটছে চরের মানুষের। তবু এরই মধ্যে আর একটা কাউ কাজ জুটে যায়। ভরা বর্ষায় গঞ্জের মানুষ মাছ একবকম খেতে পারে না বললেই হয়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নদনদী উথলে পড়েছে। পাড় কূল কিছুই নেই। জেলেরা এখন আর বেডাজাল দিয়ে মাছ ধরতে পাবে না। জালের পরিধি খই পায় না। স্রোতের মুখে বড় বড় মাছ কে কোথায় লুকিয়েছে পাত্তা পাওয়াই ভার। বর্ষাব মাছ একমাত্র ইলিশ আর চিংড়ী। ইলিশ মাছ আবার সবদিন সমান ধরা পড়ে না। তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে ওদের চলাচলের যোগ। যখন ধরা পড়বে তো ঝাঁকের ঝাঁক। আর যখন না পড়বে তখন সারাদিন পরিশ্রম করেও দু'চারটে ধরা শক্ত। তবে চিংড়ীর ব্যাপাব অবশ্য আলাদা। চিংড়ী সব সময়েই ধরা পড়ে। মাঝ গাঙে নৌকোর ওপর থেকে টানা-জাল ফেলেই ধরতে হয় বর্ষার চিংড়ীকে। যেমন ব্যয়সাধ্য তেমন পরিশ্রমেব একশেষ? গঞ্জের বাজারে তাই দামও তাব তেমনি চড়া। গবীর-গরবার সাধ্য নেই মাছ মুখে দেয়।

গঞ্জের মানুষের অবস্থা যা-ই হোক চরের মানুষের কিছু পোষাবারো। প্রত্যেকের বাড়িব বাঁকে সামান্য ছুটা একটা পারন (মাছ ধববাব খাঁচা) পেতে রাখলেই সংসারের মাছ অফুরন্ত। পেট পুরে খেয়েও দিতে থুতে আটকায় না। এক এক বাত্রে গালা গালা চিংড়ী আর বেলে ধরা পড়ে। গবীবদের অনেকে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বেশ চড়া দামেই বেশীটা বেচে আসে। পারন ছাড়া ছিপ দিয়েও অনেকে বড় বড় বেলে মাছ ধরে। শুধু শুয়ে বসে না থেকে অনেকেই তাই মাছ ধরে সময় কাটায়।

কোপ বুঝে কোপ মারতে গঞ্জের মানুষ ওস্তাদ। চরের ঘরে ঘরে তাদের পাতানো ইষ্টতা। মামু, নানী, চাচা, মিতা, দোস্ত যার সঙ্গে যে যেভাবে পেরেছে। স্বতরাং মিজদের অভাবের সময় পারনের মাছ চরের মানুষ একা খেতে পারে না। দু' পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ভেট না দিয়ে উপায় নেই। হিসেবের খাতা খতাতে গেলে শুধু বাঁ-দিকের অঙ্কই বেড়ে চলেছে দেখা যায়। জমার ঘরে হয়তো শুধুই শূন্য। তবু চরের মানুষ চোখ কান বুজতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা ওদের যেন শুধু দেবার জগেই সৃষ্টি করেছেন। ওদের কেউ দিলে কি না সে হিসেব ধতিয়ে দেখতে ওরা জানে না। মহাজনরা তো আরো এক

কিছু সরেস। স্বদের বেলায় কানা কড়িটিও মাপ হবে না কিন্তু নেবাব
বেলায় ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। স্বদ দিতে এসে রসিদ হয়তো
ফলে, কর্তা কিছু মাপ চাই।

কর্তার মুখে না নেই। বিড়বিড় করে তিনবার আঙড়ালেন স্বদের অক্ষ।
টাকা প্রতি মাসিক ছ'আনা স্বদ। তিন মাস দশ দিনে পনেরো টাকার স্বদ
হলো ধর সাত টাকা চার আনা—আচ্ছা দে তুই এক টাকা কম।

এক টাকা মরুব পেয়ে নিবক্ষর বসিদের আনন্দের সীমা নেই। দাঁত বার
কবেই হাসতে থাকে। সারা বর্ষা হয়তো পাবনের চিংড়ী আব বেলে কর্তাকে
দুপটোকন দেবে—দশ জায়গায় কর্তার গুণগান করবে।

কর্তার ঠোঁটেও খণীব হাসি। যাতুব খেলাই যেন। হিসেবের মধ্যে অগ্রিম
এক টাকা বেশী ধরে পবে সেই টাকাই বাদ দিয়ে দয়াল সাজা।

এ শুধু একক একটি স্বদখোরের কথা নয়। ওদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই
এটা। হাটের দিনে হাটে এসেছে দেদার বক্স। সঙ্গে গোটাকয়েক কুমড়ো
দাব শসা। বেচে হয়তো সপ্তাহেব ছুন তেলের পয়সা হবে। আব এক কর্তা
হাতে আস্তে এসে হাজির হলেন দেদাবেব কাছে। শোন পক্ষীর দৃষ্টি—লুকোবার
পায় নেই। নেড়েচেড়ে কচি শসা জোড়া ও বড় কুমড়োটাই গামছায় বেঁধে
গটা দিলেন। আসার সময় দশজনকে সুনিয়েই বলে এলেন, গদী থেকে দাম
নিয়ে আসিস দেদার।

দাম যা পাবে তা দেদারও জানে আর দশজনেও জানে। তবু মুখ খুলবার
উপায় নেই দেদারের। একের ঝাল অস্থির ওপর ঝাড়তে উচ্চত হয় সে।
যাবা নগদ পয়সায় জিনিস কিনতে এসেছে তাদের ওপরেই লোকসানের অক্ষ
সপাতে চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে দেদার হয়তো দামেব জন্ত গদীতে এল। এসে দেখে,
কর্তা হরিনামের ঝোলা নিয়ে বসেছেন। বাহ্যিক চেতনাই নেই যেন তার।
দেদার ডাকতে সাহস পায় না। প্রয়োজন থাকলেও ফিরে যেতেই মনস্থ করে।
উঠে হয়তো বেরিয়েই আসবে, কর্তা চোখ খোলেন। হরিনামের মালা তিনবার
ফপালে ছুঁইয়ে পেছু ডাকেন, কে রে, দেদার নাকি ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আদাব জানায় দেদার। বলে, আইজ্ঞা হ।

কর্তা বলেন, বোস, তামাক ধা। একেবারে যে সন্ধ্যা করে কেশেছিল।

আইজ্ঞা হ, কাম সারতে সারতে বেলা অইয়া গেল।

তা তোর জিনিসের দাম কতো দেবোরে ?

জ্ঞান কত্তা আপনার যা মোন চায়।

না না, বল, কত দেবো ?

আমি আবার কি কম। আপনিই জান ছাম কইরা।

কর্তা আর সময় ক্ষেপ করেন না। স্বযোগ বুঝে বলেন, শসা জোড়া কচি জলেও বড় ছোটরে। কুমড়োটা বোধ হয় তেমন মিষ্টি হবে না। বড্ডো কাঁচা। আচ্ছা নে, তোকে আব ঠকিয়ে কি হবে, ঢেঁক হাতড়িয়ে একটা ছ'আনি দেদারের দিকে ছুঁড়ে দেন।

সারাদিনের ক্লাস্তির পর বেশ আরাম করেই তামাক ছিলুম খাবে ভেবেছিল দেদার। কিন্তু কর্তার বেহিসেসবী কাধ দেখে মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বাজারে বেচলে কম করেও কুমড়োটাই চাব আনায় বেচতে পারতো। শসা জোড়াও চার ছয় পয়সার কমে বিকোতো না। এমন আক্কেল-নাশা মানুষ!...ইচ্ছে কবে ছ'আনিটা ছুঁড়ে মাবে কর্তার নাকের ডগায়। কিন্তু পারে না।

কর্তা ভাব বুঝেই পুনরায় কীর্তনে মাতে, পাট এবার কেমন হ'লরে দেদার ?

গলার স্বর শুধু করেই দেদার উত্তর করে, অঠেটে একবকম। আইচ্ছা, উঠি এখন কত্তা, উঠে দাঁড়াতে যায় দেদার।

কর্তা বাধা দেন, আরে বোস বোস, আর-এক ছিলুম তামাক খা। ছেলেপুলে সব ভালো আছে তো ?

রাগ হয়েছিল দেদারের, কর্তার আন্তরিকায় মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ অশীর্বাদে আন্নায় রাকচে একবকম, বসে পড়ে আবার এক ছিলুম তামাক সাজতে থাকে।

দেদারকে খুশী করতে পেরে কর্তা নিজেও খুব খুশী হন। জপের মালায় বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে আসল কথায় আসেন, পারনে মাছ-টাছ কেমন পড়ছে ?

কঙ্কতে ফুঁ দিতে দিতে দেদার বলে, তা মোন্দ পড়চে না কত্তা। কাইল বিহানে চাইরডা দিয়া যামুনে। বড় বড় ডিমওলা ইচা (চিংড়ী) আর বাইলা (বেলে মাছ)। বাইলার প্যাটেও ঠাসা ডিম।

কর্তার জিভ দিয়ে টসটস করে জল গড়াতে থাকে। সমানে ডাল ভাত খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়বার উপক্রম হয়েছে। কে খাবে ছ'আনা দশ

পয়সা কুড়ি চিংড়ী মাছ কিনে? খুঁদের টাকা অতো লপচপিয়ে খরচ করে ফেললে চলে না।...রসনার রস সজোবে চেপেই কর্তা বাধা দেন, না না, দেবার জন্য বলিনি। এমনিই জিন্জের কবলাম, আমাদের এপার্ব তো মাছ নেই বললেই হয়।

কি যে কন কত্তা। কিনা দিমু নাকি যে তাই না করেন। পারনের মাছ দিমু তায় আবাব কি অহব। কাইল বিহানেই আইনা দিমু, পোলাপানে পাইব। ত্রান, সেবা কবেন, দু' দিতে দিতে কঙ্কটা কর্তাব দিকেই এগিয়ে দেয় দেদার।

না, আমার হাতে এখন মালা রয়েছে, তুই খা।

দেদাব মনের খুঁশিতেই হুকো টানতে থাকে। বেশ মৌজ হয়েছে এমাক ছিলুমে। হবিনামেন মালা আর একবাব কপালে ঠেকিয়ে কর্তা ঠাক চাডেন, কই রে, কে আছিস। দেদাবকে গোটাকয়েক মোয়া দিতে বলে।

শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কতাব বাড়িতে মোয়া মুড়কী পাক হয়েছে। মোয়ায় খাসা ভাজা তিলের সোদা গন্ধ। গোটাকয়েক মুখে দিলে দেদার নিশ্চয় গলে যাবে। তাবপর...

হাক শুনে দেদার লজ্জা পায়। হুকো থেকে মুখ উঠিয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না কত্তা মশয়, এখন কিচ খাইবার পারম না। নামাজেব সময় আইয়া আইল, উঠি এখন।

আরে বোস বোস। না খাস ছেলেপুলেদের জন্য নিয়ে যা। ও তো ছেলেপুলেরই জিনিস।

দেদার আর আপত্তি কবতে পারে না! মনে মনে খুঁশীই হয় আদর আপ্যায়নে। তা মন্দ নয়, মোয়া কয়টা নিয়ে গেলে ছাওয়াল-পাওয়ালরা বেশ খুঁশীই হবে'খন। নাড়ু, মোয়া, মুড়কী বড় ভাল পাক হয় কর্তা মশায়ের বাড়ি। সেই ভাল, গামছায় জড়িয়ে নিয়েই যাবো মোয়া কয়টা।...

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বেতের কাঠায় করে আন্দাজ গোটা বারো মোয়া, কিছুটা তিলের ছাতু ও মুড়কী এনে হাজির করে কর্তার আট দশ বছরের এক ছেলে।

দেদার খুঁদে কর্তার হাত থেকে কাঠাটা নিয়ে গামছার মধ্যে ঝড় করে বেঁধে নেয় জিনিসগুলো। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে, কর্তা আর খুঁদে কর্তাকে সেলাম জানিয়ে উঠে পড়ে।

দেদার উঠে গেলে কর্তার দিল চাক্স হয়ে ওঠে। যাক বাবা, আর খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড় খেতে হবে না। কাল থেকেই একটু মুখ বদলানো যাচ্ছে। আহু-হা, বর্ষার ডিমওয়াল চিংড়ী আর বেলে তো বাদশাহী খাবার। বোল খাও, কাল খাও, অম্বল খাও কোন কিছুতে আটকায় না। মালার কোলা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে কর্তা গদগদ হয়ে বাড়ির ভেতরে যান।

সত্যি, গতকাল যা লাগ্ন করেছিলেন কর্তা আজ থেকেই তার হুদ আদায় শুরু হয়েছে। বড় একটা খালুইতে করে শ' খানেক বেশ বাছাই চিংড়ী ও বিশ পচিশটে ডিমওয়াল বেলে নিয়ে উপস্থিত হয় দেদার। সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা কাঁচা-পাকা কুমড়ো। কর্তা তো খুশীতে আটখানা! খুদে কর্তা ছুটে এসে জ্যান্ত চিংড়ীর গৌফ ধরে নাচাতে থাকে। বাবাঃ, আজ কতদিন পরে মাছ খেতে পারবে।...

খুদে কর্তার উল্লাস দেখে দেদার অন্তরে সহসা বেদনা বোধ করে। মাছ নিয়ে আসার সময় ছোট ছোট্টা মাত্র দু'টো বেলে আর গোটা দশ-বাবো চিংড়ী রেখে যাবার জন্ম বায়না ধরেছিল। কিন্তু ও তা রেখে আসতে পারে নি। সামান্য একটা মাছ না দিলে কতার কাছে ওর মান থাকে কি করে?... দু'টো দশটা তো দূরের কথা—নামমাত্র একটা মাছও রেখে আসে না দেদার। খুদে কর্তার বয়সীই হবে ইলাহি। মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বেচারার আজ হয়তো খাওয়াই হবে না।...তা ও আর কি করতে পারে। মুখ ফুটে চাইলেন কর্তা। ও তো আর না বলতে পারে না। আবার দিতে গেলে এ ক'টা মাছ না দিলেই বা কেমন দেখায়। মনের দুঃখ মনেই চাপতে চেষ্টা করে দেদার। মাছ ক'টা ঢেলে দিয়ে শুধু খালুই নিয়ে বাড়ির দিকেই রওনা হয়।

॥ ২৪ ॥

ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়ে, বড়শি পারনে মাছ ধরে, খোল বাজিরে কীর্তন আর দয়াল চানরে ডেকেও দিন কাটছিল না চরের মাহুঘের। একে তো হাতে তেমন কোন কাজ নেই তার ওপর আবার পাটের বাজার ধমধম করছে। ধামরাইর রথে যে পাট এগারো বারোয় বেচে এসেছে তারই অবশিষ্টাংশ ঠেকায়

পড়ে নয় দশে বেচতে হচ্ছে। চাষীর মনে সুখ নেই—দিনও কাটে না। নামী চাষ হয়েছে, ভাতের মাঝামাঝি না হলে গাছ পাট কাটা যাবে না। হিসেব করে দেখতে গেলে আরো পনেরো কুড়ি দিন চুপচাপই বসে থাকতে হবে। না, এভাবে বসে থাকা বিরক্তির একশেষ। নতুন একটা কিছু জোড়া দিয়ে নিতে পারলে হতো ...

ওদের মুখ চেয়েই বোধ হয় দয়াল চান দয়া করেন। গঞ্জে ফি বছর মনসা পূজোয় ধুম হয়। প্রতি ঘরে ঘরে পূজো। কুল-নারীরাই এ পূজোয় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। শ্রাবণ সংক্রান্তির পাঁচ-সাত দিন আগে কার্ঠের পিড়ের ওপর, “আলা” পাতে (পিড়ের ওপর কাঁদা মাটি করে তার মধ্যে মৃগ ও কলাই ক্ষেত করা)। পাঁচ-সাত দিনে লকলকিয়ে ওঠে কলাই ও মৃগের চারা। সংক্রান্তি আগের দিন হয় ‘আলার’ অধিবাস। রং তুলি দিয়ে চিত্রানো হয় প্রত্যেকটি পিড়েকে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সন্ধ্যা রাত্রে হয় অধিবাস উদ্‌ঘোষন। কারো পাঁচখানা, কারো সাতখানা, আবার কারো বা ন’খানা পিড়ে। মনসা দেবীর বেদীর ছ’পাশে খবে পরে কচি সবুজের সমাবেশ। দেবী আসবেন সংক্রান্তির দিন ভোরে। কারো রীতি অষ্টমাগের পূজো, কারো বেয়াল্লিশ নাগের। আবার ছাপ্পান নাগের পূজোও করে কেউ কেউ। নাগ দিয়েই চালচিত্র—মাঝখানে দেবীর ভূবন-ভুলানো মূর্তি। মর্ত্যে দেবী পূজোর প্রবর্তন করেন চাঁদ সওদাগর। ভক্ত আর ভগবানের সে এক অর্শোকিক কাহিনী। চাঁদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সওদাগর। তাই পূর্ববঙ্গেই দেবী পূজোর ঘট। দেবীর প্রধান ভোগ দুধ আর কলা। কলার দাম আর দুধের দাম তাই এ দু’দিন পঞ্চমে ওঠে। তিন আনা চার আনা সের থেকে চৌদ্দ আনা এক টাকা পর্যন্ত ওঠে দুধের দর। অধিবাসের দিন কোন ভোগ-রাগ নেই। শুধু ফুল, আলপনা আর ‘আলা’ দিয়ে সাজানো হয় বেদীমূল। পরের দিন সংক্রান্তিতে হয় দু’বেলা পূজো—ভোগরাগ। তার পরের দিন এক বেলা পূজোর পর হয় ভাসান। এই ভাসানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর গঞ্জে বেহুলার হাট বসে। এ কোন পণ্যের হাট নয়—দেবীর হাট। এ হাটে দেবীর মাছাছাই কীর্তিত হয়। নমশূত্রের মেয়ে শ্রামদাসী। বয়েস পঞ্চাশ পঞ্চান্ন—বিধবা। কালো গায়ের রং। সামনের তিনটে দাঁত নেই। মাথার চুল ছোট ছোট করে হাঁটা। প্রবাদ, বংশীতে নাইতে গিয়ে মা মনসার ঘট পেয়েছে শ্রামদাসী। ‘জিয়ন’ ঘট। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঘটের জল নতুন করে মন্ত্রপূত করেন

হাটের ঠাকরুন। মা মনসার গুণগান করেন। ঘুড়ুর পায়ে নাচেন। আশ্রপল্লব দিয়ে পুতবারি ঘন ঘন সিক্কন করেন ভক্তগণের শির-পরে। কুললক্ষ্মীর দলে দলে আসেন বেহুলার হাটে। সিধা জলপান দেন হাটের ঠাকরুনকে। মতজ্ঞান হয়ে শিবে ধারণ করেন 'জিয়ন' ঘাটের সিধব—পুতবারি। একবছর ধার সাপের ভয় নেই। কেউ কেউ আবার তাগা, তাবিজ, ঔষধি-শিকড়ও নেন শ্রামদাসীর কাছ থেকে।

প্রতিবারই বেহুলার হাটের মধ্যে হয় উৎসবের সমাপ্তি। তার আগে ভাসান উপলক্ষে চলে নোকো বাইচ। স্থানীয় প্রতিযোগিতাই কেবল যোগ দেয় এতে। বিশেষ কোন পুরস্কার বিতরণের রীতি নেই। শুধু বাহবা আর করতালি। তাতেই গ্রামের মানুষ মুগ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রাবণের প্রথম দিকেই মেরামতের পর ছিপে গাব দেওয়া আরম্ভ হয়। একশ হাত দেড়শ হাত লদা ছিপ। কোনটার গলুই মধুর-মুখে। কোনটায় বা গরুড়, মকর, জলপরী। আবার সাধাসিধে ছুঁচলো মুখও কোন কোনটার। তাতে আবার সারবন্দী পেতলের কলসী বাধা। বড় থেকে ক্রমাগত ছোট হয়ে গেছে কলসীর বহর। প্রত্যেকটির পেছনের গলুইতে স্ব স্ব প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা। নিচে পঞ্চাশ ঘাট, উর্ধ্বে একশ দেড়শ জন জোয়ান প্রতিদ্বন্দী সারবন্দী হয়ে বসে দু'দিক থেকে বৈঠা চালায়। ছোট ছোট কাঠের হাত বৈঠা। সর্দারের হুকামে তালে তালে অবিবত জলেব ওপর পড়তে থাকে। ছিপ যায় তরতর করে এগিয়ে। যেন মনপবনের নাওই চলে জলের ওপর দাগ কেটে।

চরেব মানুষ ফি বছরেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে করে একত্রে দৃষ্টি—জারি, সারি, গোষ্ঠ গায়। গতাহুগতিকতায় কেউ কেউ আবার কিমিয়েও পড়ে। অগ্ন্যান্ত বারের কথা ঘাই হোক, এবার আর কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। শ্রাবণের প্রথম হাট থেকেই শুরু হয়েছে "ছাগবিল" বিলোনো। গঞ্জের বাবু ভূইঞরা এবার বিশেষ বাবু করছেন। এবার আর শুধু বাহবা আর করতালির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সীমাবদ্ধ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় স্বয়ং দিচ্ছেন একখানি সোনার মেডেল ও তিনটি বড় রূপোর কাপ। তার বন্ধু ইন্দ্র পোদ্দার দিচ্ছেন ছোট বড় দশখানা মেডেল। বন্ধকী কারবার ইন্দ্র মোহনের। বহু ডরি খাদ মিশানো রূপো অচল হয়ে পড়ে আছে সিক্ককের তলায়। গোটাকয়েক মজুরীর ছোঁকা ছাড়া টেকের একটি কানাকড়িও খসবে না। এ তো খুবই সামান্য

ব্যাপার। স্বদের ওপর দিয়েই যাবে—আসলে হাত পড়বে না। এতে যদি ভবিষ্যতে ভাগ্যা খোলে সে তো আনন্দেবই কথা। না না, ও খুশী হয়েই দিচ্ছে মেডেল ক'খানা। মা লক্ষ্মীব রূপায় পয়সার কিছুমাত্র অভাব নেই। এখন চাই যশ ও প্রতিপত্তি। আব তা পেতে হলে সর্বাগ্রে জনচিত্তে প্রবেশ কবতে হবে। তাহেবই প্রতিনিধিকপে যেতে হবে ইউনিয়ন বোর্ডেব সদস্য পদে। আব-এক ধাপ উঠে ডিসিট্রিক্ট বোর্ডেব চেয়াবম্যান, তাবপব এম, এল, এ। তাব পবেব ধাপ কেন্দ্রেব সদস্য হওয়া। মাহুয তো এমনি কবেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। মাহুযই মাহুযকে অমব কবতে পাবে। টাকা কিছু নয়।... ইন্ড মোহনেব বৃকে ছবাকাজ্জাব বড ওঠে। শুধু মেডেল দশখানাই নয়। 'জাংবিল' বিলি ও ঢোল শহবহেব যাবতীয় খবাব এ পরস্তু সেই যুগিয়ে আসছে। প্রয়োজন হলে আবো যোগাবে।...

ইন্ড মোহনেব পবে উৎসাহদাতা হলে। বহিমুদ্দীন খলিফা। প্রেসিডেন্ট আব ইন্ড মোহনেব সঙ্গে বহিমুদ্দীনেব গলায গলায ভাব। সে দোব ভলেট্টিযাবদেব ব্যাজ, পবিচালক মণ্ডলীব প্রতীক পতাকা ও পাচখানা কপোব মেডেল। আবো শ'খানেক মেডেলেব প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় বিভিন্ন বাবসায়ী ও গণ্যমান্ন লোকেব কাছ থেকে। স্বয়ং বমেস্ত্রনাবায়ণও উৎসবে মাতেন। তাব কাছাবি বাডিই হবে পবিচালক মণ্ডলীব আপিস ঘব। টাকা ও মেডেল উনিও দেবেন।...

ঢোল শহবং যোগে জানানো হয়, প্রতিযোগী প্রত্যেকটি দলকে পান স্তপুবি বিড়ি মুফত দেওয়া হবে। আব দেওয়া হবে একবেলার খোবাকী বাবদ—জন পেছ এক পো কবে চি'ড়ে, আধ সেব দই ও আধ পো গুড়। প্রবেশ কি এক পয়সাও লাগবে না কাবো। ২৫শে আবণ ভর্তি হবাব শেষ তাবিধ।...

দূব দূরাস্ত থেকে আসে তাটুবেবা। বাতা বটে যায় দিকে দিকে—গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তবে। দলে দলে এসে ভর্তি হতে থাকে প্রতিযোগিরা। লোক সংখ্যা জানিয়ে যায়। নিজেদেব মধ্যে চলে সংগঠনেব কাজ। পুবোনো ছিপ বাতিল কবে কোন কোন দল টাকা তুলে নতুন ছিপ গডতে আরম্ভ করে। সাবি, জাবি, গোষ্ঠিব সঙ্গে গজেব বাব্দেব গুণপনার উল্লেখ করে গানও বাঁধতে থাকে বেউ কেউ। প্রতিদিন প্রতি রাজে চলে মহড়া। চরের মাহুযেব মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওদের দু'খানি ছিপ প্রতিযোগিতা করবে। একটি চরধল্লার আর একটি ফুটনগরের। ভাগবত আর দয়াল চানের আসর

একরকম বন্ধ বললেই হয়। জনকয়েক বুড়ো-বুড়ীর পাঞ্জায় পড়ে রামকান্তকে নিয়মিত যেতে হয় বটে কিন্তু আসর মোটেই জমে না। সবাই ব্যস্ত বাইচের তোড়জোড় নিয়ে। তা সংগঠন নেহাত মন্দ হয়নি। সোনার মেডেল ও কাপ না পেলেও হুঁচারটে রূপোর মেডেল কেউ আটকাতে পারবে না।...

বাইচ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ হাতি নৌকোর এক ভাগ। চল্লিশের ওপর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আর এক ভাগ। এবং পঁচাত্তরের ওপর থেকে মতো উর্ধ্বেই হোক তার আর এক ভাগ। দিন যতো ধনিয়ে আসছে প্রতিযোগীর সংখ্যা ততোই বাড়ছে। হিসেব মতো ধরতে গেলে লকাধিক লোক আসছে গজে। স্থূল কমিটির নিকট দরখাস্ত করে বাইচের দিন স্থূল ছুটি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রই হবে ভলেন্টিয়ার। এ ছাড়া অগ্রান্ত সাধারণ লোকের মধ্য হতেও শ' পাঁচেক কর্মী পাওয়া যাবে। শান্তিরক্ষার জন্ম পুলিশ সাহেবের নিকটেও সদরে দরখাস্ত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের আবেদনে স্বয়ং এম্ পি-ই আসছেন সদলবলে বাইচ দেখতে। এছাড়া আছে স্থানীয় থানার রক্ষীবাহিনী। আয়োজন যতদূর সম্ভব নির্খুঁতভাবেই এগিয়ে চলে। তল্লাট জুড়ে হই হই রৈ রৈ কাণ্ড।...

পয়লা ভাত্র বুধবার। গজে আজ বহু বিঘোষিত বাইচের দিন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নহবত বাজতে শুরু হয়েছে। একদল বসেছে যেখানে থেকে বাইচ আরম্ভ হবে সেখানে। আর একদল যেখানে শেষ হবে। উঁচু শালের খুঁটির ওপর সুন্দর হুঁখানি সাজানো-গুছানো ঘর। রহং দুই পতাকা উড়ছে শীর্ষদেশে। এছাড়া একদল ব্যাণ্ড অবিরত বেজে চলেছে ভ্রাম্যমাণ নৌকোয়। ভলেন্টিয়াররাও সময়মতো এসেই দলে দলে যোগ দিচ্ছে। পুলিশ সাহেবের লঞ্চও শেষরাতেই থানার ঘাটে এসে পৌঁচেছে। ভোরের দিকেই কর্ম পরিষদের জনকয়েক সভ্যকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আ.সন। প্রেসিডেন্টের অল্পরোধে তিনিই আজ পুরস্কার বিতরণ করছেন। আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বেলা একটা থেকে শুরু হবে বাইচ। গজের মাহুষ আজ সকাল সকালই রান্না খাওয়া সেবে যে যেখানে পারে জড় হতে থাকে। ষাটে বে জায়গা না পায় সে টিনের চালার ওপর— দালানের ছাদে এমন কি বড় বড় গাছের ওপর উঠে প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ আবার নৌকো ভাড়া করে সপরিবারেই বাইচ দেখতে বাঁ'র হয়।

সকাল না গড়াতেই দলে দলে আসতে থাকে ছোট বড় ছিপ। কোন দল গাইছে সারি, কোন দল জারি, কোন দল আবার বহুঙ্গী সেজে রং-তামাসা কবছে।

সীমারেখা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। প্রবেশপত্রের রসিদ দেখে দই চিড়ে ও পান বিড়ির টিকিট দিচ্ছে। টিকিট হাতে পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিচ্ছে আগস্তুকরা। গঞ্জের গুণগান কবছে উল্লাসে। কিন্তু মুর্শাকল হচ্ছে পঞ্জীয়নকৃত ছিপ ছাড়া বাড়তি ছিপ নিয়ে। তাদের আবদাব, গঞ্জের নাম-ডাক শুনে বহুদূর দেশ থেকে আসছে তারা। সময়মতো খবর পৌঁছোয়নি বলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশপত্র পেশ করতে পারেনি। দয়া করে তাদের সুযোগ দেওয়া হোক।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বিপদে পড়ে। নিজেরা বুঁকি নিতে সাহস পায় না। কর্মপরিষদের মূলকেন্দ্রে খবর পাঠানো হয়। পরিষদ সামান্যতম দলের কথা বিবেচনা করে প্রথম দফায় অহুমতি দেন। রবাহুতরা সমুদ্র হয়। তারাও পায় নিয়মিত দলের মতোই খাণ্ড আর বিড়িব টিকিট।

ঝাঁকব ঝাঁক ছিপ এসে বংশীর জল কাঁপিয়ে তোলে। কাড়া-নাকড়া বাজছে কোন কোনটায়। কোন কোনটায় ঢোল কাঁসর। সিঙাও ফুঁকছে কেউ কেউ। বেলা যতো বাড়ছে অগুনতি ছিপ এসে ভিড় কবছে। পঞ্জীয়নকৃত ছিপ অপেক্ষা অপঞ্জীয়নকৃত ছিপের সংখ্যাই বেশী। এ যেন রক্তবীজের ঝাড়। বীর বিক্রমে স্বর্গরাজ্য গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পাল শালুফ ফালি দিয়ে বেশ আঁটনাট করে বাঁধা। কাবো বা চাড়ানো গৌফ। কেউ পরেছে লুঙ্গি, কেউ কাঁপড়ই মালকাছা করে। খালি গায়েরই আছে বেশীর ভাগ। আবার জাপানী সিকের গেলী অথবা রঙবেরঙের হাফ সাটও পরেছে কেউ কেউ। হাতে প্রত্যেকেরই ছোট ছোট বৈঠা।...না না আর একখানা বাড়তি ছিপকেও টিকিট দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ওরকম কাউকে। প্রথম দফার আদেশ নাকচ করে পরিষদ থেকে দ্বিতীয়বার আদেশ যায়। স্বেচ্ছাসেবকরা মতোই ঝাটি আগলাতে থাকে। মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই উত্তর দুক্কিন সীমানায় শ'খানেক ছিপ আটকে পড়ে। কোন দলের সদীর এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট হাত জোড় করে : ছান কস্তারা আমাগ একখান টিকিট, অনেক দূর স্থাশের খনে আইচি। আন্লায় আপনাগ বালো করব।...

স্বৈচ্ছাসেবকরা নিরুপায়। এরকম হারে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাইচ দেবার জায়গাই থাকবে না। দই চিড়ের ব্যবস্থা করাও আর সম্ভবপন নয়। উত্তরে ওবাও হাত জোড় করেই অক্ষমতা জানায়।

উত্তর শুনে পাশের আব-এক দলের সদীর মাথার বাবরিতে ঝাঁকুনী দিয়ে কুখে দাঁড়ায়, ক্যা মশয়রা, আমাগ ঢুকবার দিবা না তয় আগেব দলগ দিচ ক্যান? হারা কি তোমাগ বাপঠাকুবলা না?...

তাব কথা শুনে ছোকরা এক স্বৈচ্ছাসেবক কুখে দাঁড়ায়, এই মিক্রা, মুখ সামালয়ে কথা বলে।

কি কতা তোমাগ লগে কইব মাইনয়ে? খাইবাব দিবাব পাববা না তয় ঢোল দিচিলা ক্যান? ...দূর থেকে আব-এক দলের সদীর মৌ.কাব ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে কেটে পড়ে।

অবস্থা বিপদজনক নুবে স্বৈচ্ছাসেবক দলেব অধিকতা এত জোড় কবেই সামলাতে চেষ্টা কবে। অত্যন্ত বিনীতভাবেই বলতে থাকে : ভাইসব আপনারা মাথা ঠাণ্ডা কমন। আপনাদের জন্ত সাধামতো ব্যবস্থা আমবা করবো। আপনাদের জন্ত আগামীকাল দিন স্থির হচ্ছে...

আরে রাইখা ছাও তোমার ঢলাইনা কতা। কাইল হনা (শুভ) গাঙ্কে বাইচ দিমু কি তোমাগ পুট্কাই (পাছা) চুষবার জন্ত না?

অধিকর্তা বিপদে পড়ে। ছোকরা স্বৈচ্ছাসেবকদের সামাল দেওয়াও দায় হয়ে ওঠে। ওরাও যে ষার মতো জামার আন্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। এ বকম অসংলগ্ন কথাবার্তা কিছুতেই বরদাস্ত কবা হবে না। ..

অধিকর্তা তবু হাতজোড় করেই সকলকে শাস্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ছিপের দানবরা ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে ওদের। মুহূর্তের মধ্যে ছফার ওঠে, মার শালাগ বৈঠার বারি, মার...

প্রথম বৈঠার আঘাত অধিকর্তার কাঁধের ওপর পড়ে। অল্পের জন্ত মাথা রক্ষা হয়। জলে লাফিয়ে পড়ে বেচার। উন্নত জনতার সম্মুখে স্বৈচ্ছাসেবকরা ফুৎকারে উড়ে যায়। যে যেভাবে পারে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কারো মাথা ফাটে, হাত ভাঙে। আবেষ্টন-বেষ্টনী চোখের পলকে ভেঙে যায়। দলে দলে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে বে-আইনী ছিপ। কণ্ঠস্বরীই যেন এক একখানা। বাতাসে করকর কবে বাবরি উড়ছে এক একজনের। হাতের বৈঠা কাঁধের ওপর। ষার বা মন চাইছে বিস্তি করছে—কাড়া-নাঙ্ড়া শিঙা ফুঁকছে।

বাণ্ড পাটির নৌকো পা দিয়ে ডুবিয়েই দেয় একদল। ধরশ্রোতে ভেসে যায় ঢাক, জয়ঢাক, ব্যাকপাইপ। দর্শকদের নৌকোও চড়াও করে কেউ কেউ। ভয়াত দী শিশু চিংকার করে কাঁদতে থাকে। যে পারে পুলিশ সাহেবের লঞ্চার কাছে নৌকো নিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুহূর্তে শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। যারা লাইন দিয়ে বরাদ্দমতো দই, চিড়ে, পান, বিড়ি নিচ্ছিল তারা পেটের খিদেয় এতক্ষণ ধুকছিল, এবার জলে ওঠে। চারদিক জুড়ে শুষ্ক মার মার কাট কাট শব্দ। দেখতে দেখতে লুটপাট আরম্ভ হয়ে যায়। রহিমুদ্দীন পলিকার দোকানই লুট হয়ে যায় সবার আগে। ভাগ্যিস সময় মতো গা ঢাকা দিয়েছে রহিমুদ্দীন নয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় তার দোতলা গন্ডি-বাড়ির চিলে কোঠায় আত্মগোপন করে ঠেকঠেক করে কাঁপতে থাকেন। দরওয়ানও বাব থেকে সদরে তাল্লা চাবি দিয়ে সরে পড়ে। ভাবখানা গদীতে কেউ নেই। ইন্দ্র পোদ্দাব তো কাছা বাড়তে বাড়তে সমানে দৌড়। হাণ্ডবিলে ওদের তিনজনের স্বাক্ষর ছিল। তাই সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বন্দর তিনজনের ওপর। পায় তো কাঁটাই চিবিয়ে খায়।...

বেলা একটা থেকে বাইচ শুরু হবার কথা। এখন বেলা মাত্র এগারোটা। পুলিশ সাহেব একটু সকাল সকালই "লাঞ্চ" সারছিলেন। কথা ছিল, রমেন্দ্র নারায়ণের কাছারিতে বসে বাইচ দেখবেন ও পুরস্কার বিতরণ করবেন। কিন্তু চারিদিকেব হইচইএ তক্ষুণি টেবিল ছেড়ে ডেকের ওপর উঠে আসেন। দূরবীণ দিয়ে দেখতে থাকেন অগণিত জনতার তাণ্ডব। এ রকম পরিস্থিতির জন্ম আর্দে প্রস্তুত ছিলেন না উনি। খানায় মাত্র জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ। গুলি চালিয়েও আশাহুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তাতে হয়তো উদ্বেজনাই বাড়বে কেবল। এক মিনিট ভেবে সারেরঙকে লঞ্চ ছাড়তে হুকুম করেন। ঘন ঘন টহল দিতে থাকেন এ-মাথা ও-মাথা।

হামলাকারীরা এখন লুটপাটে মাতোয়ারা। যারা লুট করতে নারাজ তারা খেউর গেয়েই মনের ঝাল ঝাড়ছে। একদল সমস্বরেই গাইছে—

দে চিড়া দে শালারা—

দে চিড়া দে।

দে চিড়া না দিবার পারলে

মাইগ (বউ) ভাড়া দে শালারা

মাইগ ভাড়া দে ॥...

হঠাৎ পুলিশ সাহেবের লঞ্চ একটি দলের পাশে এসে ভেঁা ভেঁা শব্দে সিটি মারে। দলের কর্তা গান খামিয়ে সকলকে বৈঠা চালাতে হুকুম করে। তীরবেগে ছুটে পালায় ছিপ ভাটির পথে। কিছুটা ফল হয়েছে দেখে উৎসাহিতই হন পুলিশ সাহেব। ঘন ঘনই সিটি পড়তে থাকে লঞ্চ থেকে। তীরের লুটেরা ছিপে এসে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। লাল মুখকে বড় ভয়। ডেকের ওপরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেব। এক গুলিতেই তামাম শোধ।...যে যেদিকে পাবে ছুটতে থাকে। একদল আবার রুখেও দাঁড়ায়। তাদের দাবী, গ্রাঘ্য প্রবেশপত্র নিয়ে বাইচ খেলতে এসেছে তারা। মেডেল, কাপ না নিয়ে যাবে না। বাইচ খেলা আরম্ভ হোক।...যারা ছুটে পালাচ্ছিল দাবীর জিগিবে তাবাও আবার কিরে দাঁড়ায়। নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

পুলিশ সাহেবও নতুন করেই ফন্দী খোঁজেন। কাছারির ঘাটে এসে লাগে লঞ্চ। রমেল্লনারায়ণ নিজের রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ বুঝলেই গুলি চালাবেন। সাহেব এখানে বসে বাইচ দেখবেন বলে থানাব ছুঁজন রাইফেলধারী সিপাই সকাল থেকেই মোতামেন আছে। স্তরাতঃ আশ্রয়কার কিছুমাত্র অহবিধা হবে না। কিন্তু হামলাকারীদের এভাবে বেগা-ক্ষণ সময় দিলে গঞ্জ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। পুলিশ সাহেব আব বমেল্ল নারায়ণের মনো কিছুক্ষণ সন্না চলে। বামকান্ত পাশেই ছিল। সে-ই জোর দিয়ে বলে, চবে খবর পাঠালে সহজেই এ হামলা দূর হতে পারে স্তার। হাজার দুই লাঠিয়াল দীহু, করিম আর পলান ব্যাপারীর মূঠোর মধ্যে...

উত্তম প্রস্তাব। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যাক। লঞ্চ পূব থেকে সটান পশ্চিম পাড়ে এসে লাগে। রামকান্ত গিয়ে খবর দেয় মোড়লদেব। ছিপ প্রস্তুতই ছিল। এতক্ষণের এই হলুস্থল কাণ্ডের কথা বিন্দুমাত্রও টের পায়নি চরের মাহুষ। গঞ্জ লুট করবে বাইরের গুণ্ডারা। কখনো হতে পারে না।...ছুঁখানি ছিপে বোঝাই হয়ে আসতে থাকে চরের জোয়ান জোয়ান মাহুষ। দমাদম পড়তে থাকে বৈঠার বাড়ি। এরার আর কেউ রুখে দাঁড়াতে সাহস পায় না। ছিপ নিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।...

বাইচ উপলক্ষে যে মেডেল কাপ পুরস্কার হিসেবে দেবার কথা হয়েছিল তা দেওয়া হয় চরের বীরদের। তাদের প্রচেষ্টাতেই গঞ্জ আজ সর্বনাশের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। পুলিশ সাহেব নিজের হাতে পরিষে দেন পুরস্কার। সোনার মেডেল আনন্দই পায়। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি আনন্দর লাঠির শক্তি

এমন দুর্বার। পেট-পাগল মানুষ অষ্টপ্রহর খাওয়ার ধান্দাতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে মানুষের বাহুতে যে এত বল একথা চিন্তারও অতীত। সাড়ে তিন হাত লাঠি—কেউ রুখে দাঁড়িয়েছে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দ তার ওপর। বৌ বৌ করে ঘোর লাঠি—চিল ছুঁড়েও কোন ফায়দা নেই। দলবদ্ধ হয়ে যারা খামলা শুরু করেছিল দলবদ্ধ হয়েই তারা পালাবার পথ খোঁজে। দু'চারজন রুখে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম প্রহার খায়। যেন ষাঁড়ের পিঠেই পড়ছে লাঠি। আব এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, লেজ তুলে দৌড়।

সোনার মেডেল পেয়েছে আনন্দ—চরফুটনগরের মাথা আজ উঁচু হয়েছে। দুর্গার বুকখানাও গর্বে ভরপুর। আজ আর ও নিজকে তেমন অসহায় ভাবে না। আনন্দ যেন সকলকেই চিন্তায় ফেলেছে। পুলিশ সাহেব প্রশংসায় গদগদ হয়েই মেডেল পরিয়ে দিলেন। বীরেব সম্মান দিতে ইংবেজ জানে। তবু চবেব এই সঞ্জবদ্ধ শক্তি দেখে মনে মনে একটু ভাবিতই হন উনি। রমেন্দ্র নারায়ণের ললাটেও চিন্তার বেথা ফুটে ওঠে। বামকান্তর মনেও নূতন করে ভাবনার উদয় হয়। সাপের গর্তে পা দিয়েই তাহলে ও এতদিন খেলেছে, আনন্দ তাহলে হাবা নয়। শক্তিহীনও নয়। অভাবেই তাহলে এ রকম পশু হয়ে আছে।...

যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। গঞ্জের মানুষ আজ চরের মানুষের কাছে ঋণী। তাদের বীরত্বেই আজ সকলের মান সম্মম রক্ষা হয়েছে। যে দই চিঁড়ে প্রতিযোগীদের খাওয়ার কথা ছিল তা দিয়ে চরের সকল মানুষকে পেট ভরে খাওয়াতে থাকে। শুধু দই চিঁড়েই নয়—রসগোল্লা, অমৃতি, লালমোহনও। গঞ্জের বাজারে সেদিন যা যা তৈরী ছিল তার সবকিছু দিয়েই চরের মানুষকে আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করে ওরা। ক্ষতি রহিমুদ্দীন খলিকারই বেশী হয়েছে। কাপড়ের খান বলতে একটিও নেই। সেলাইয়ের কল দুটিও বৈঠায় আঘাতে ভেঙে চুরমার করে রেখে গেছে। তবু আনন্দ লাঠি ঘুরিয়ে পুরো দু'খান কাপড় উদ্ধার করেছে। লাঠির বাড়িতে হাতও ভেঙে দিয়েছে তিন চারটে লুটেরার!

আলস্ত্রে আলস্ত্রে দিন কাটছিল না চরের মানুষের। এখন প্রবল একটা উত্তেজনার মুখে দিন বেশ অনায়াসেই গড়াতে থাকে। গঞ্জের মানুষের কাছে চরের মানুষের খ্যাতিরই এখন আলাদা। যে দোকানী কোনদিন এক পয়সার হুন ধার দিতে রাজী হয়নি সে এখন অনায়াসেই দু'এক টাকার সওদা ধারে দিয়ে ফেয়। আনন্দ বাজারে এলে তো গান বিড়ি তামাক খেয়ে কুলই পায় না।

ঐ তো সামান্য একটা মানুষ কিন্তু কি অহুরের শক্তি বাহতে! ছোটদের অনেক এসে আনন্দর বাহুর পেশীতে হাত বুলাতে থাকে। আনন্দর হাসিই পায়। দু'চারটি শিগুও জুটে যায় ওর। না না, ওরা শুনবে না। লাঠিখেলা ওদের শেখাতেই হবে। আনন্দ-বারকয়েক আমতা আমতা করেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রীতির সম্পর্কে।...

॥ ২৫ ॥

বথ দেখে আর গল্প রক্ষা করে চব্বের মানুষের আলগ্নেব দিনগুলো কেটে যায়। আসে পাট কাটা মরশুম। তাদের মাঝামাঝি আবাব ওরা কান্তে হাতে মাঠে নামে। চরময় কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল। কিন্তু জলের ভয়ে ওরা কেউ ভীত নয়। ওদের ভয় পাটের দর নিয়ে। বথের মেলায় বাছ পাট যে দবে বেচে এসেছে গঞ্জের বাজারে অগ্নাঙ্ক অঞ্চলের গাছ পাটের দরই সে পর্যায়ে ওঠেনি। পাটের বাজার একবারেই ভেঁভে। রেলি ব্রাদার্স এবার আপিসই খুললে না গঞ্জে। পূর্ব পার্সেজার নাবায়ণগঞ্জে শুধু শুধুই দৌড়কাঁপ করলেন।...মাঠে পাট কাটতে নেমে চরের মানুষের মনে স্বস্তি নেই। অনিশ্চিত্যায় বুক দুকদুক করে কাঁপতে থাকে। দশ বারো টাকায় যদি গাছ পাট বেচতে হয় তা হলে তো ভরাডুবি নিশ্চিত। মহাজনের ঋণ শোধ তো দূরের কথা বছরের খাবার যোগানোই দায় হবে। নিতাই সা'র কি, গৌড়ে তা দিয়ে দিবি্য বলে যাচ্ছে, পাটের দব নিশ্চিত বাড়বে। চাবীদের উচিত কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকা...কিন্তু সে তো আর নিজে এক ছটাকও পাট কিনছে না। কিংবা দর না উঠলে হৃদের কড়িরও মাপ দিচ্ছে না। তবে আব তার কথার মূল্য কি? ফি দিলে ডাক্তাররাও তো নাভিষাসের রোগীকে ওরকম আশ্বাস দিয়ে থাকে। এ তো সবই ওদের নিজ নিজ ব্যবসার কথা। চাবীর দুঃখ বুঝবে কে? চটকলের মালিক তো সবই বিদেশী। রাজ্যের শাসন ভারও ওদেরই। নিতাইয়ের সাধ্য কি মাথা তোলে। সে তার নিজের টাকা চাপ দিয়ে স্বন্দে-আসলে আদায় করে নিতে পারবেই। মরতে মরবে শুধু চাবী।... কাজে হাত ওঠে না চরের মানুষের। তবু সময়মতো পাট না কেটে উপায় নেই। খালি মাথায় এক বুক জলের ওপর দাঁড়িয়ে হতাশা আর আশংকার মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে পাট। চরের চাষ নামী হয়েছে তাই। নয়তো অগ্নাঙ্ক

অঞ্চলের পাট এরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হতে শুরু হয়েছে। চারদিকের ফসলও খুব ভাল হয়েছে এবার। চাহিদা থাকলে বত্রিশ সালের চেয়েও বেশী দর ওঠার সম্ভাবনা আছে। কে জানে, হয়তো নিতাইয়ের কথাই সত্য হবে। কলওয়ালারাই সব এককাটা হয়ে বাজার উঠতে দিচ্ছে না। মতলব হয়তো ঐ রকমই একটা কিছু হবে। পাটের সঙ্গে চাষীকেও কলে পেঘাই করে ফেলতে চাচ্ছে ওরা। কিন্তু দম ধরে বসে থাকা আর চাষীর কর্ম নয়। শক্তকরা নিরানকুই জনই তো হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছে।

চাষী অনেক কিছুই বোঝে—ভাবে কিন্তু দম ধরতে পারে না। এক এক করে কাটা, জাগ দেওয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো শেষ কবে ফেলে। নগদা-নগদি বেচে মাঠের কড়ি হাতেও নেয় কেউ কেউ। যে পারে কিছুদিনের জম্ম গোলাজাত করে রাখে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকাই এক এক গাছ। এ রকম সরেস পাট গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে গল্পে ওঠেনি। চরেও এব আগে কোনদিন এত ভাল পাট জন্মায়নি। না না, কিছুতেই ওবা এ রকম মাটির দরে সোনার ছিলকা হাতছাড়া করবে না। দর নিশ্চয় বাড়বে। সব কলওয়ালাদের বজ্জাতি। প্রয়োজন হয় উপোস দিয়ে মরবে তবু মা লক্ষ্মীকে হু'পায়ে ঠেলে বার করবে না। না না, কিছুতেই না!...মোড়লরা সকলে একত্র বসে সন্না করে। ফড়েরা উস্কাতে এলে গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।...গোটা ভাদ্র মাস পার হয়ে যায়, কেউ এক চটাক পাটও বেচে না! লাভ তো দূরের কথা এ দরে বেচলে খরচাই উঠবে না। কি ভুলই না করেছে সকলে ধানের জমিতে পাট বুন। এতগুলো মাথা, একজনও যদি পরিণাম ভাবতে পারতো।...বিশস্ত ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে। পাট বুন আশায় আশায় হাতের সর্বস্বও বেচে খেয়েচে এ ক'মাসে। এখন হয়তো হাঁড়িই চড়বে না। ওদিকে আবার নিতাইয়ের দলও সমানে আনাগোনা শুরু করেছে। আসল না হলেও সন্দের কড়ি ওদের চাই-ই। না, পাট চাষীর এবার নিশ্চিত মরণ।...

ভাদ্র পার হয়ে আশ্বিন এসে পড়ে। পূজা আর ঈদের পরব এবার পাশা-পাশি পড়েছে। ষা'বার ঘরে থাক আর না-ই থাক পাল-পার্বনের বাড়তি খরচা যোগাতেই হবে। আর না হোক উৎসব দিনে ছেলেপুলের পোষাক-আষাক চাই-ই। বাংলার জাতীয় উৎসব এ দুটি। সারা বছর এ দুটি দিনকে কেন্দ্র করেই বাংলার মাহুস দিন গুণতে থাকে। দীহু আর পলানের ব্যাপার তো আরো সঙ্গীন। ঈদের পার্বণে পলানকে অনেকেই দিতে-থুতে হয়।

গাঁয়ের গরীব-গরবারা ওর মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। দীন্তব অবশ্র দান-ধ্যানের তেমন বরাদ্দ নেই। কিন্তু লক্ষ্মীপুঞ্জোর ভাবনা বড় একটা কম নয়। দু'বছর থেকে তো আবার কবি গান শুরু হয়েছে। নিমন্ত্রণেব ঘটীও বেড়েছে। এছাড়া কাল অশোচ কেটে গেলেই বিয়ের ধুম লাগবে। পাকা ফলারেব প্রতিশ্রুতি বয়েছে গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে। সব কিছুতেই চাই এক কাঁড়ি টাকা।...চিন্তায় চিন্তায় দয়াল চানের আসরও আর তেমন জমছে না। লোভে পড়ে পাট বুনই সর্বনাশ হলো।...

ভাদ্রেব ভবা বর্ষ। বংশী ধলেথবী কানায়-কানায় ফুলে উঠেছে। করিমেব দাওয়ার ওপর বসে তিন মোড়ল হঁকো থাক্ছিল আর দুর্দিনেব কথা ভাব্ছিল। সহসা দেখা যায় একখানি ঘাষী নৌকা এসে লাগছে।

কে ও নিতাই সাজ্জি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো ছৈয়ের ভেতব থেকে বেবিযে আস্ছেন সাজ্জি মশায়, পলান তাড়াতাড়ি হঁকোটা বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে বেধে অভ্যর্থনা করতে ওঠে। দীহু করিমও সঙ্গে যায়।

নিতাই স্ততক্ষণে নৌকোর ওপর থেকে পাড়ে নেমেছে। ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে ওবা। সকলে মিলে কিরে আসে আবাব দাওয়ার ওপব। করিম একটা জলচৌকি এনে নিতাইকে বসতে দেয়। দীহু এক কন্ধে তামাক সেজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরে। জল ছড়া হঁকো। জল-ভরা হঁকোয় তামাক খেতে গঞ্জের বাবুদের আপত্তি আছে। ওতে নাকি তাদের জাত যায়।

হঁকো হাতে নিতাইকে প্রসন্নই মনে হয়। সামনেই রয়েছে মাচার ওপব গাঙ্গা-করা পাট। গোথুলির আবীর রাগে জলজল করছে সোনার ছিলকা। নিতাই ধোঁয়া চাড়তে চাড়তেই শুধোয়, পাট বেচলেন না আপনারা ?

প্রশ্ন শুনে পলানেব ইচ্ছে করে হুদ-খোরটার মাথায় বাঁশ মারে! পাট বেচবো কেন, তুমি না বলেছিলে দর উঠবে। এখন উঠছে না কেন দর ? খুব তো মাহুধকে লোণিয়ে দিয়েছিলে পাট বুনতে। এখন স্তদের কড়ি না নিলে তো বুন্নি বাপের বেটা...

্যাগ যতোই হোক মনে মনেই তা চাপতে হয়। টাকা লাগাবার জগ্জ একদিন নিতাই ওদের গঙ্গীর ওপরে বসিয়ে খাতির করেছে—ঘন ঘন তামাক খাইয়েছে। সেদিন যেন নিতাই-ই ছিল ওদের কুপার পাত্র। ওরা দয়া করে টাকা নিলে ওর ব্যবসা চলবে—সিন্দুক ফাঁপবে। কিন্তু অবস্থা এখন উটে গেছে। এখন ওর দয়ার ওপরেই নির্ভর করছে ওদের মান-সন্ত্রম—মরা-বাঁচা। পলান

মেজাজ খাদে নামিয়েই উত্তর করে, না, বেচবার আর পারলাম কই। ই দরে বেচলে ত মইরা যামু।

আপনাদের না হয় না বেচলেও চলছে কিছু ছোটদের চলবে কি করে, নিতাই আবার প্রশ্ন করে।

ছোট বড় হগলের অবস্থাই এক। পাট বেচবার না পারলে আর মান থাকব না, পলান খেদের সঙ্গেই উত্তর দেয়।

নিতাই বলে, হ্যাঁ, রকম-সকম যা দেখছি তাতে আধা-আধি পাট আপনাদেরও বেচে ফেলা উচিত। শেষ বাজারে যদি দর বাড়়ে তাহলে বাকী অবশ্যই পুথিয়ে যাবে।

উত্তরে দীপ্ত বলে, দর বাড়়েনেব কতা ত আপনে কবে খেইকাই কইয়া আসচেন। আমাগই কপাল মোন্দ, দর আর বাড়়ব কবে।

এই দেখুন, আজো 'ঢাকা পঞ্চায়তে' কি লিখেছে। জাপান তো পাট কিনবার জন্ম ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজ তাদের বাজারে নামতেই দিচ্ছে না। নিজেদের বেলায় শুদ্ধ নেই, ওদের বেলায় মোটা শুদ্ধ দিতে হবে। এ রকম একচোখো ব্যাপার হলে আব বাইরেব ক্রেতার আসবে কি করে, হাতের কাগজখানা উন্টে পাণ্টে সংবালটা বার করতে ব্যস্ত হয় নিতাই।

কা, ও হালারা নিজেরাও কিনব না আবার বাইরের মাইবেবেও কিনবার দিব না ক্যা!—সংবাদ শুনে ফুঁসে ওঠে পলান।

হাসতে হাসতেই নিতাই মন্তব্য করে, সেখানেই তো মজার ব্যাপার। জাপানের সঙ্গে সমানে কল চালিয়ে ওরা পাল্লা দিতে পারবে না। উৎপন্ন মাল জাপান যে দরে বেচবে ইংরেজ তার ধারে কাছেও ধঁষতে পারবে না।

তন্ন ত দেখচি ও হালারা ডাকাইত। ইচ্ছামতো আমাগ কান ধইরা উঠাইব নামাইব। আগে জানলে কোন সম্বন্ধি পাট বুনত, পলানের মেজাজ সম্বমে ওঠে।

আর বলেন কেন। দেখছেন না, এখানকার যত পাটকল সব ইংরেজের। রাজস্ব পেয়ে ছুনিয়ার বাজার ওরা একলাই লুটতে চায়। তবে ভরসার কথা, লীগ অফ নেশনে কথাটা উঠেছে। হয়তো একটা কিছু গতি হবে।

আর হালার গতি। আমরা মরলে যদি কোন গতি অয়। আগে জানলে বাইচের দিন ও হালার ইংরাজ পুলিশ সাবরে আমরা গাঙ্গের মধ্যেই চুবাইয়া মারতাম, কিন্তু হয়ে ওঠে পলান।

যা বলেছেন—বলেছেন। ওরকম কথা মুখেও আনবেন না। পুলিশের কানে গেলে বুড়ো বয়সে টানা-হেঁচড়ায় পড়বেন, কথাটা চাপা দিতেই চেষ্টা করে নিতাই।

হ, ও হালারা আমাগ ভাতেও মারব আবাব জানেও মারব, শিরে করাঘাত করে পলান।

কি করবেন, সবই অদৃষ্ট। খোদার কাছে নাশিশ জানান, তিনিই এর বিচার করবেন।

নিতাইয়ের সান্ধনায় পলানের চোখ মুখ দিয়ে ঠিকরে আগুন বেরুতে চায়। মুখে কোন উত্তর করতে পারে না। করিম অবস্থার মোড় ঘোরায়, নায়ে আর কে আছে, সিদা-খজের ব্যবস্থা করি।

নিতাই বাধা দেয়, না না, ও সবের কোন দরকার হবে না। আমি কোথাও ভাগাদায় বেরুই নি। ‘পঞ্চায়েৎ’ খানা পড়ে ব্যাপার বেশী স্ববিধের মনে হলো না বলে বেড়াতে বেড়াতে একবার/খবর দিতে এলাম। আমার বিবেচনায় পাট প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বেচে ফেলা উচিত।

এতক্ষণ দম ধরে থেকে দীর্ঘ এবার ফেটে পড়ে, হ, আপনি ত সব সময় আমাগ বালো পরামশুই ছান। এহন ই দরে পাট বেচলে নিজেরাই খামু কি আর আপনাদেরই বা দিমু কি ?

আমার জন্ম আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। পূজা-পার্বণ এসেছে, কিছু বেচে কিনে নিজের ঘর সামলান। আমাকে যখন পারেন দেবেন। নিতাইয়ের কথার মধ্যে যেন অমৃত বরে পড়ে।

বাড়ি বয়ে এসে পাওনাদার কখনো এ বকম বলে। নিতাই সাজি সতি সত্যিই মহাজন। অতটুকু মান-অহংকার নেই। বিশ্বয়ে কেউ আর মুখ খুলতে পারে না।

স্বযোগ বুঝে নিতাই নিজের কথার জের টানে আবার, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করুন। আমার ঘরেও ছেলেপুলে আছে—আমি সব বুঝি। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

করিম এবার আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সবিনয়ে বাধা দেয়, না না, খালি-মুখে ঘাইবার পারবেন না। একটা কিছু মুখে দেওয়ন লাগব।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। স্থানি আসুক পেট ভরে খেয়ে যাবো। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে বেরিয়েছি এখন কিছু মুখে দিতে পারবো না।

উত্তর শুনে করিম আর জোর করতে সাহস পায় না। তাছাড়া ঘরে আছে কি যে তাই দিয়ে নিতাইয়ের মতো লোককে অভ্যর্থনা করবে। রাজী হলে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। বড় জোর গাই দুইয়ে খানিকটা টাকটা দুধ। সেই ভালো, আর একদিন না হয় যোগাড়-যন্ত্র করেই খাওয়ানো যাবে। এখন সঙ্গে গোটাকয়েক আক দিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বাড়িতে ছেলপুলেরা পেতে পারবে। হাত জোড় করে প্রকাশে নিতাইয়ের কথার জবাব দেয় করিম, তাইলে ত আব জোর দেখাইবার পারি না। আইচ্ছা, আর-এক কইলকা তামুক খান, আমি একড় আছি। দীন্নু তামাক সাজতে আরম্ভ করলে করিম ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়। পেছনের উঠোন থেকে ঝটপট আট দশখানা বাছাই করা আক কেটে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।

নিতাই দেখে বিষয় প্রকাশ করে, এগুলো আবার কেন!

ঐযং হেসে করিম বলে, সামান্য গোটাকতক কুশইর পোলাপানের খাইবার লেইগা বুনচিলাম। লইয়া যান, বাড়ির ছাওয়াল পাওয়ালরা খুলী আইব।

আচ্ছা, দিন তাহলে, হুকোটা দীন্নুর হাতে এগিয়ে দিয়ে নিতাই উঠে দাঁড়ায়। নিজেই আক ক'খানা হাতে করে তুলে নিতে যায়।

করিম জিভ কেটে বাধা দেয়, ছি ছি ছি, আপনে ক্যান বইয়া নিবেন! চলেন নায়ে দিয়া আহি।

নিতাই মনে মনে তাই চেয়েছিল। খাতকের বাড়ি থেকে সামান্য ক'খানা আক হাতে করে বেরুতে ওর সম্মুখে বাধছিল। স্ততরাং আর কথা বাড়ায় না।

পলান, করিম, দীন্নু এক সঙ্গেই উঠে গিয়ে নিতাইকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসে। যেতে যেতে কথা হয়—কিছু পাট ওরা সামনের হাটেই বেচে দিচ্ছে। এষাত্রা আর কিছু দিতে পারবে না। পারে তো বাকী পাট বেচে সূদের টাকা সম্পূর্ণই দিয়ে দেবে। আর যদি তা না পারে তাহলে সূদে আসলে তমসুক পালটে দেবে।

আকের সঙ্গে অবাচিতভাবে আসল কথা শুনে নিতাই আশাতীত খুলী হয়। গদগদ হয়েই নৌকোয় গিয়ে ওঠে।

নিতাইয়ের পরামর্শ মতো পাট বেচে ঈদের নিয়ম রক্ষা করে পলান। যাকে যা দেবার রীতি আছে তা দিয়েছে। এক কথায় সবই হয়েছে। শুধু হয়নি অনাবিল আনন্দ লাভ। শংকায় বুক ছুরছুর করে কেঁপেছে। এখেনো জের চলেছে তার। না, পাটের দর আর এ বছর বাড়বে না। ঘরের পাট ঘরেই থেকে যাবে। নিতাই সাজিকে তমস্ক বদলে দেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। ওসমান বলে, আংশিক জমি বেচে দেনা শোধ করে দাও। বেটা একটা আস্ত পাগল। জমি বেচলে খাবি কিরে মুখ্য! সংসারে ধার দেনা কার না আছে। তাই বলে কথায় কথায় অন্নদাত্রী মাকে বাজারে বিক্রিয়ে দিতে হবে!... না না, তা হতে পারে না। নসিবেবর ক্ষের যদি কাটে তা হলে মুগ কলাই বেচেই ও স্কদের কড়ি শোধ করা যাবে। বাকীটা সামনের সন পাট বেচে। স্কদে অবশ্য অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তা আব কি কবা যাবে। বিনা স্কদে তো আর কোথাও কর্জ পাওয়া যায় না। নিতাই সাজি তো বেশ ভাল ব্যবহারই করছে।...

দীক্ষুও পলানের মতোই লক্ষ্মীপূজো সারে। আসল তো দুবের কথা স্কদের কাণা-কড়িও শোধ করতে পারেনি। কবি গান দেবার ইচ্ছা এবছর একেবারেই ছিল না। কিন্তু পাকে চক্কর শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়া গেলো না। কালী কবিয়াল আঁটালিব মতোই লেগে রইল। মা লক্ষ্মীব আসরে গান না গাইলে নাকি ওর গোটা বছরটাই মাটি হবে। তা অবশ্য নগদ পরস্যা একটিও দিতে হয়নি। শুধু তিনদিনের ধোরাকি আর নোকো ভাড়া। যাক গে, সবস্ক বড় জোর কুড়ি-পঁচিশটে টাকা গেছে। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে ওতে আটকাবে না। ঘরের কোণে নতুন কুটুম রয়েছে, গান বন্ধ করালে ওরাই বা ভাবতো কি। চরের মাছঘেরও বছরের আনন্দ উৎসবটা মাটি হতো।...কিন্তু খরচার তো আর এখানেই শেষ নয়। লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত স্কর হবে ভাগবত পাঠ। পুণ্যাহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন—মহোৎসব। চরণ দাসজী আবার তীর্থে যাচ্ছেন। বাকী জীবন বৃন্দাবন আর নয়তো মথুরায়ই কাটাবেন। স্তরায় এই শেষবার ঠুকে নিয়ে মহোৎসব করা। আর কিছু বাদ গেলেও এ উৎসবকে

বন্দ দেওয়া যাবে না। এর পর আছে, সকল দায়ের্য সেরা দায় নিশির বিয়ে।
ম' লক্ষী মুখ তুলে চাইলেই বক্ষা নয়তো অনিবার্য মৃত্যু!...

একে একে কোন রকমে সবই মিটে যায়। দীর্ঘকে সবটা পাটই বেচতে
হচ্ছে। পার্বণ শেষ কবেও পলান আর কবিমেব হাতে আধা-আধি পাট থেকে
যায়। একদিক দিয়ে বিচার করলে ভালই কবেছে দীর্ঘ। পাটের দর এখন আরো
এক টাকা কম। কিন্তু হলে কি হবে হাত একেবারেই শূন্য। নতুন বউ হয়ে ময়না
ব'ব এসেছে। খাওয়া-পবায় কষ্ট দেখলে কুটুমের কাছে মান ইজ্জত থাকবে না।
নতাইয়ের কাছে না হয় তমসুক পাণ্টে দিয়েই রেহাই পাওয়া গেছে। তিন শ
গাঁকাব জন্ম হুদে-আসলে মূল দলিল গিয়ে সাড়ে পাচ শ'তে দাঁড়িয়েছে।
গুচো আরো কয়েক টাকা হয়েছিল কিন্তু নিতাই খাতিব কবে তা' নেয়নি।
হুদেব হাব সমানই থেকে গেলো। খোক দু'পাঁচ টাকা খাতিব করতে রাজী
নতাই কিন্তু হুদেব হাব কমাতে পারবে না। তা না পারলে আর করার কি
যা'ছ। একটা পয়সাও কিরে না পেয়ে যে শুধু কাগজ লিখিয়ে নিয়ে শাস্ত আছে
গুটাই ভাগা। চৌচামেচ শুরু কবলে তো চরে মুখ দেখানোই ভার হতো।
চ'ব বিয়েতে পাকা কলার খাইয়ে যে দেনার জন্ম তাগাদা শোনে তাকে আবার
পা'ছে কে। এখন মুগ কলাই ঘরে উঠলেই জাত বাচবে, নয়তো বরাতে কি
গা'ছে বলা যায় না। একদিক দিয়ে রক্ষা, চাল ডাল ঘরে আছে। টেনেটুনে
যে ফাস্তান পর্যন্ত চলে যাবে। নগদ টাকা একেবারেই হাতে নেই। তা কোন
পদ-আপদ না ঘটলে ওতেও আটকাবে না। ঘরে গরুর দুধ আছে। সাক-
জিও ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাবে। মাছের তো ভাবনাই নেই। শুধু তেল,
ন, আর মসলাপাতি। তাতেও আটকাবে না, চলে যাবে একরকম করে।
কলে গঞ্জের বুধাই মূদীর দোকানে ধার পাওয়া যাবে।...নিশ্চিন্তে না হলেও
ন একরকম করে কাটতে থাকে দীর্ঘর।

কিছুদিন পর পলান করিমও অবশিষ্ট হাতের পাট বেচে দেয়। না দিয়ে
পায় নেই। বৃহৎ সংসার—ধান চাল সব কিনে খেতে হচ্ছে। কম হোক বেশী
কি একমাত্র পাটই তো সম্বল। আশায় আশায় দেরি করে মিছিমিছি শুধু
মাই সার হলো। কি আহাম্মকীই না হয়েছে ধানের জমিতে পাট বুনে।
ধান হুদেব একটা কানা কড়িও শোধ করতে পারে না। দীর্ঘর মতোই হুদে
সলে তমসুকটা পাণ্টে দিতে বাধ্য হয়। তিন হাজার টাকা সাড়ে পাঁচ

হাজারে দাঁড়ায়। চরের সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। একমাত্র করিমই যা ব্যতিক্রম। বাড়তি খরচা বিশেষ না থাকায় স্নদের টাকাটা সম্পূর্ণই দিতে পেরেছে করিম। প্রথম মরশুমে পাট বেচলে আসল টাকাও কিছু দিতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে। বরাত মন্দ, তাই স্নদখোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না।

প্রতিবারই জলে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনবোট নিয়ে কাছারি ছেড়ে চলে যান বমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু এবার কার্তিকের বদলে অম্বান পার হতে চললো কাছারি ছাড়ার নাম নেই। পিয়ারের চাকর হরিকে জিজ্ঞেস কবলে বলে, কুমার বাহাদুর এবার আর স্নদের কিরবেন না। কে জানে, হবেও হয়তো। অন্যপর দুবের কথা স্বয়ং রাখালই যখন কিছু জানে না তখন আর কথা কি। আগে হলে রামকান্ত খুশীই হতো। দিব্যি পরের পয়সায় জাড্ডা ইয়ার্কি খাওয়া বেড়ানো। কিন্তু এবার ও এসব চায় না। মধুর রয়েছে দু'শ টাকা ঋণ। তার ওপর দুর্গাও নিয়েছে দেড় শ টাকা। স্নদের হাব কম হলেও কবে দেখলে মোটা অঙ্কই হবে। একে জলের দরে পাট বেচতে হয়েছে। তার ওপব আবার ময়নার বিয়েতে দ্বিগুণ খরচা হয়েছে, দুর্গার হাত একেবারেই ষালি। আসল তো দুবের কথা স্নদ বাবদও একটা ফুটো পয়সা দিতে পারেনি ও। কখন যে কি হুকুম হবে কে জানে। দিন-রাতই তো জপের মালা হয়েছে দুগা। সেদিন স্নানের ঘাটে দেখে অবধি পাগল হয়েছেন। মিথ্যা বলে বলে না ঠেকালে এদিন হয়তো জুলুমবাজী আরম্ভ হয়ে যেতো। তা আর কুমার বাহাদুরেরই বা দোষ কি। ও আগুনের শিখা দেখলে কে না পাগল হবে। ভুল নিজেই করেছি। মাথা ষাটীতে পারলে টাকা কড়ির প্যাচে না জড়িয়েও দুর্গাকে হাত করা যেতো। টাকা ধার পেতে ওর অতটুকু আটকাতো না। দীর্ঘই ব্যবস্থা করে দিতো। রমেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে ভয় ভাবনা রাখাল বিকাশেরও আছে। কিন্তু রামকান্তর যতো এমন বিপদ বোধ হয় ওদের কারো নয়। জালে মাছ আটকিয়ে যদি তা চিলকেই ষাওয়াতে হয় তবে আর সে মাছ ধরে লাভ কি।—চিন্তায় চিন্তায় রামকান্ত বুঝি বা পাগল হয়ে যায়!

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে এবাব। চরের মানুষের সঞ্চল মাত্র চেঁড়া কাঁথা কয়ল। পাটের বাজাব ভাল গেলে হয়তো নতুন কিছু কিছু কিনতে পাবতো। এখন তো দোকান-মুখো হবাবও উপায় নেই। জামা-কাপড় অপেক্ষা পেটই ওদের দিন দিন কাবু কবে ফেলছে। জীবনে বহু শীত ওরা আগুনের আলসে সঞ্চল কবে কাটিয়ে দিয়েছে। পেট যদি ভবা থাকে তাহলে একটুও আটকায় না। কিন্তু সেই পেটেই যে খিল পড়ছে। মায় তামাকটুকু পয়স্তু জুটছে না। তবে আব শীত সৈকাবে কি দিয়ে। এখন একমাত্র ভবসা রবি-শস্ত্র। চবব জমিতে মা লক্ষ্মীব পদ-রেণু বয়েছে বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাবা ফনফনিয়ে বাড়ছে। মুগ, কলাই, যবের বাড়তিই বেশী। এরই মধ্যে কোন কোনটায় গুটি দেখা দিয়েছে। গক ছাগল ভাড়িয়ে বাধতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ধাব শোধ না হোক খেয়ে পরে পাট চামের কড়ি হাতে থাকবেই!... মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে ডাকে চবব মানুষ। প্রাণ খুলে নামকীর্তন কবে—দয়াল চানের আসরে জমায়েত হয়। অসময়ের জল ঝড়ে গত সন সমস্ত নষ্ট হয়েছে। ঠাকুর যদি এবার রক্ষা করেন।

দাঁলু শুধু মুগ কলাই আব মটরের মধ্যেই ক্ষেতের কাজ সীমাবদ্ধ রাধেনি। কয়েক বিধা জমিতে খিবাঁইও (এক প্রকার শসা) বুনছে। কুমড়া, ভবমুজ, বাঙি (এক প্রকারের খবমুজা) ক্ষেতও করেছে কয়েক বিধা জুড়ে। মোড়লের দেখাদেখি চরের প্রত্যেকেই এবাব কিছু না কিছু জমিতে ফলমূলের চাষ করেছে। রাঙা আলু আর গোল আলুর চাষও করেছে অনেকে। পলানের কাছে তো এসব সাবেকী ব্যাপাব। শুবু চামের আয়তন একটু বেড়েছে এই যা। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলন বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দয়াল চানের দয়া হলে দুঃখ হয়তো ঘুচবে।...

আনন্দ আর এখন সে আনন্দ নেই। এখন আর ওকে কেউ কুঁড়ে কিংবা নিৰ্ক্ষমা বলতে পারবে না। সারাদিন ক্ষেতের কাজে থাকে। যদি কোন কাজ হাতে না থাকে তা হলে বসে বসে জাল বোনে। তবু বসে থাকে না। তবে

পেটের ব্যাপারে অতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং খোরাকি আগের চেয়ে বেড়েছে। তা বাডুক, দিদি ভাইয়ের সংসার—ওতে আটকাবে না। তাছাড়া খাওয়ার মধ্যে আছেই বা কি। শুধু তো দুটো চাল আর একটু মুন। পোষাকী খাওয়ার মধ্যে জোটে খাটি একটু গরুর ছব ও কিছু কিছু ক্ষেতের ফল-ফলাদি। ওতেই সন্তুষ্ট ওরা। ধার দেনা না থাকলে কেউ ওদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারতো না। কি সর্বনাশই না করেছে ধানের জমিতে পাট বুন। রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে রাতারাতি গরীব বনে গেলো। এখন তো পর পর জুয়া খেলে যাওয়া। পাট চাষের দেনা একমাত্র পাট বুনই শোব হতে পারে। অবশ্য যদি দর ওঠে। এ ছাড়া এককালীন এত টাকা হাতে আসা আর কোন কিছু থেকেই সম্ভব নয়। হৃদযোরের হাঁড়িকাঠ থেকে যতদিন না মাথা টেনে আনতে পার ততদিন নিষ্কৃতি নেই। আনন্দের মতো সহজ সরল মানুষের পক্ষেও এ সত্য বুঝে উঠতে দেরি হয় না। ভাবনায় দুর্গার হুঁচোখে ঘুম নেই।...

ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। ফল মূল তরি-তরকারি থেকে অতি সহজেই চরের মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো মুন ভাত খেতে পারছে। পলান দীঘু করিমও বড় বাঁচা বেঁচে যায়! মুগ কলাই ঘরে উঠতে এখনো ঢের বাকী। এগুলো ছিল বলেই রক্ষা। গঞ্জের বাজারও এবার বেশ টান যাচ্ছে। পাট বুন যদি জমি নষ্ট না করতো তাহলে এগুলো বুনও দায় মুক্ত হতে পারতো। কিন্তু করার কিছু নেই, সবই কপালের গেরো।

চৈত্রে মুগ মটর কলাই ঘরে ওঠে। খাসা তক্তক্ করছে রং। আর কোন ভয় নেই। দয়াল হরি বিপদে ফেলেছিলেন দয়াল হরিই আবার রক্ষা করছেন। অগ্নাঙ্ক অঞ্চলের আগে চরের ফসলই এবার গঞ্জের বাজারে যাবে। চরের ফসল দিয়েই হবে প্রথম সাহিদ। পরম নির্দার সঙ্গে সকলে বেড়ে পুঁছে গোলায় তোলে মা লক্ষ্মী আশীষ কণা। গৃহলক্ষ্মীরাও আলাদা করে উঠিয়ে রাখে ভোগ-রাগের স্তম্ভ। এরই মধ্যে ফড়িদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। না, এখন সব বেচে বরাত খরাপ করবে না। পাটের বাজার যখন মন্দা গেছে তখন এসব জিনিসের দাম চড়া যাবেই। চারদিক জুড়েই তো পাটের চাষ হয়েছে। বেশীর ভাগ জমি পাটেই গিলে খেয়েছে। এসব বুনবার মতো জমি কোথায়? তার প্রমাণ তো ধান চালের দর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তরি তরকারির বাজারও বেশ টান গেলো। না, দেখে শুনে ধীর-স্থির বেচতে

হবে। পাটের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে হবে মুগ কলাই যাবে...আশায় আশায় স্বপ্নজাল বোনে চরের মাছুষ।

রমেশ্বরনারায়ণ সমস্ত ঋতুই গজে থেকে গেলেন। কেন রইলেন সে খবর কেউ রাখে না। কাছারির কাজে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাখালকে এ নিয়ে প্রায়ই ক্র কুঁচকাতো দেখা যায়। ফুরসত পেলেই বিকাশের সঙ্গে টীকা-টিল্পনী কাটে।

ওদিন বিকেলে হিসেবের খাতা খুলে আপন মনেই কাজ করছিল বিকাশ। কাছারিতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। রাখাল নাকের ডগা থেকে নিকেলের চশমাটা কপালে তুলে বিরক্ত প্রকাশ করে, দিনরাত অতো নাক ডুবিয়ে কি লিখছ হে বিকাশ, ওতে হুজুরের মন পাবে না।

তা কি আর জানিনে দাদা, কিন্তু কি করবো, বরাতই যে মন্দ, হাতের কাজ বন্ধ করে বিকাশ উত্তর করে।

বাখাল মাত্রা ভড়িয়ে পুনরায় বলে, আচ্ছা, দিনরাত ঐ ভট্টাচার্যটার সঙ্গে ঘরে বসে কি করেন বলতো ?

কি আবার কববেন। বোতল বোতল মদ গিলেছেন আর ফুসুর-কাহুর করছেন।

শুধু নেশা-ভাঙাই নয় হে, আরো কিছু বহুস্ত আছে এর ভেতরে। দেখছো না, ক্ষেপ্তি ছিনালটা দিন দিন কেমন ঘুরঘুর শুরু করেছে। শুনলাম, চম্পি জেলেনীর ওখানেও বাবু তিন চার দিন গিয়েছেন।

তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, বাতাস কোনদিকে বইছে।

বইতে দাঁও হে বইতে দাঁও। সময় মতো সবই টের পাবে।

সে স্বেযোগ কি আর আসবে দাদা ?

জানেন নারায়ণ। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করছি। দিনরাত কাছারিতে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকতে হয়। বিনিময়ে কি পাও তাতো জানোই। বাবুর গোসা হলো চর বিলি করেছে বলে। কিন্তু এখন নিজে কি করছো যাহু! আমরা না হয় টাকাটা-সিকিটা নিয়েছি। কিন্তু আসলে চরটা গড়লে কে? কই, সে তারিক তো একবারও করতে শুনিবে? উন্টে ঝাল বাড়তে শুরু করেছেন। তোমাকে আমি বলে রাখছি বিকাশ, আমার নামও রাখাল গোসাই। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাড়াবে যে কোথায় সে কথা কি বুঝতে পারছেন না দাদা।

বুঝতে খুবই পারছি। কম হুদে টাকা লগ্নি হচ্ছে। এক কিস্তি আদায় না হতে আবার আর এক কিস্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমি ভেবেছো এ সবের মানে আমি বুঝিনে ?

বুঝতে আর পাবছেন কই দাদা ? হুদে যে দেবে, হে হে হে—

হেসে বাখালও ফেটে পড়ে, ধরেছ ঠিকই। তবে সেটি আব হচ্ছে না। ঐ যে বেটা ভট্টাচার্যকে দেখছো আসলে ও বেটা হচ্ছে একটি আস্ত খেঁকশিয়াল।

বলেন কি !

বলি ঠিকই। বাঘে মোঘে লাগিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে ও বেটা কল ধেতে চায়।

তা হলে উপায় ?

উপায় আবার কি। যেমন চলছে চলতে দাও। সময় মতো এমন হেঁচকা টান দেবো বেটা পালাবাব পথ পাবে না।

সহসা ভেতব বাড়িতে জ্বতোর শব্দ শোনা যায়। বিকাশ বাস্তসমস্তভাবে বলে, চূপ ককন দাদা, ওরা বোধ হয় আসছে। ...তু'জনে চোখেব পলক না পড়তে মুখ বন্ধ করে।

রমেন্দ্রনারায়ণ খানিক পবেই বামকান্তকে সঙ্গে কবে কাছাবিব ওপর দিয়ে সান্দ্রাভ্রমণে বেরিয়ে যান।

শীতের বংশী শুকিয়ে এতটুকু। বিরীট চর পড়েছে গন্ধেব এ পাবে। জলে না ভোবা পর্যন্ত বেশীর ভাগ লোক হাটে-বাজারে চরের ওপব দিয়েই যাতায়াত করে। টাকা শহর থেকে মোটির চলাচলও শুরু করেছে চরের ওপব দিয়েই। উত্তরে শ্মশান থেকে দক্ষিণে ডাক-বাংলো পর্যন্ত সটান প্রশস্ত রাস্তা। স্বাস্থ্য-কামীরা সকাল সন্ধ্যা এ ক'মাস এ পথেই ভ্রমণ করবে ! এ ছাড়া জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে আরো একটি পায়ে হাঁটা সুরু পথ। বড় বড় নৌকোব মাঝিরা গুল টেনে যায় ও পথে।

বসন্তে বংশীব কোল হিমশীতল। শ্রোতের তর্জন-গর্জন এখন আর নেই। শীতলপাটিই যেন পড়ে আছে একথানা। পশ্চিম দিগন্ত আবীর মাথামাথি। দিনের শেষ। দিনমণি পাটে বসেছেন। ঝির ঝির করে বইছে মলয় বাতাস। ভ্রমণকারীর সংখ্যা আজ একটু বেশীই। এতো হইচই রমেন্দ্রনারায়ণের ভাল লাগে না। ওপারের শান্ত পরিবেশ সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। ধু ধু করছে

চর দিগন্তে! মাঝে মাঝে কলার ঝাড়ের ভেতরে চেউটিনের ঘরগুলো ছবির মতোই জ্বলছে। আবার ঝড়ের ঘরের বৈচিত্র্যও কম নয়। ঘবের ক্ষেতে সোনালী মায়ার সঙ্কেত। কোন কোন ক্ষেতের শস্য কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত পরিপূর্ণ। মৃৎ বাতাসে হেলে ছলে নাচছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৈচিত্র্যের সমারোহ। খেয়া পার হয়ে ওপারেরই ঘান রমেশ্র-নারায়ণ। সঙ্গে রামকান্ত। বৈরাগীর খাল ধরেই সোজা এগিয়ে যাবেন পশ্চিমে। মেঠো পথ স্থন্দর নিরিবিবি। ভ্রমণে আমেজ আছে। তা ছাড়া... কিন্তু রামকান্তকে তেমন উৎসাহী মনে হয় না। আসতে হয়েছে তাই ও এসেছে। নয়তো গঞ্জের সদর রাস্তাই ছিল বেড়াবাব পক্ষে স্থন্দর জায়গা।

বৈরাগী খালের উত্তর পার নিস্তরু। গোধূলির আবছায়ায় মাঝে মাঝে শুধু রাশালগগকেই গোধন নিয়ে ছুটতে দেখা যাচ্ছে। চরের মাছুষ এ সময় কেউ বড় একটা ঘাটে পথে থাকে না। মাঠের কাজ, ঘাটের কাজ শেষ করে এ ওদের বিশ্রাম নেবার সময়। তারপব কিছুক্ষণ জিরোবার পরে কিছু মুখে দিয়ে ছুটে দয়াল চানের আসবে আর নয়তো নামগান করতে। যে না যাবে সে দাওয়ার ওপর বসে হুকো খাল নয়তো ছেলেপুলের সঙ্গে গল্প গুজব করবে। বউ-ঝিরাও ঘাটের কাজ বেলাবেলিই সেরে নেয়। বেরতে একটু দেরি হয়ে গেছে ভেবে রমেশ্রনারায়ণ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুতই পা চালাতে থাকেন। তাছাড়া কিছুক্ষণ জোরে না হাঁটলে ভাল খিদে হয় না—থাবার নষ্ট হয়। ভ্রমণের প্রথম পর্বে তাই স্বাস্থ্য রক্ষার্থেই মন দেন। ভাল লাগে তো ফেরবার সময় গল্পে গল্পে ফেরা যাবে।...

রমেশ্রনারায়ণ দ্রুত ছুটলেও রামকান্ত তা পারে না। নিয়মিত ডাল ভাত খেয়ে অতো শক্তি কোথায় পাবে ও। বৈরাগীদের পাল্লায় পড়ে মাছ মাংস তো লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়া। বেটারা নিজেরা দিব্যি কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ গিলবে। শুধু ভাগবত পাঠকের বেলাই যা দোষ। আর ওদেরই বা দোষ কি। বেটা চরণ দাসটাই মাথা গরম করে দিচ্ছে সকলের। স্বয়ং চৈতন্তই যেন এসেছেন গঞ্জের আখড়ায়। কিন্তু কি আর করা যাবে, বরাত মন্দ। নিয়ম ভঙ্গ করলে চরে থাকা যাবে না। সব দিকেই হয়েছে জালা। এত তোষামদ করে কি মাছুষ কখনো বেঁচে থাকতে পারে? কোনদিকে যায় ও? দুর্গা—দুর্গা, দুর্গাই ওকে সকলের কাছে হেয় করছে। কিন্তু পাবাণী কিরেও তাকাচ্ছে না একবার।...চলতে চলতে দম আটকে আসে রামকান্তর।

পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে হাঁটা খামান কুমার বাহাদুর। ছড়িতে ভর করেই ধলেশ্বরীর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। বিরাট চর। আলো আঁধারিতে ঝিক-ঝিক করছে শুভ্র বালুকণা। ধলেশ্বরী যেন নীল শাড়ীর পাড়ে লক্ষ কোটি চুম্বকীর সাজ পরেছে। বেশ লাগে রমেশ্বরনারায়ণের। মনের খুশীতে রূপোর কেস খুলে একটা সিগারেট ধরান। রামকান্তকেও একটা দেন। অনেকক্ষণ পরে একটু চাক্ষু হবার ফুসরত পেয়ে মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় রামকান্তর। যা আশংকা করেছিল তা হয়নি। চরের কারো সঙ্গেই দেখা হয়নি। বোর্টার কেউ পছন্দই করে না কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মেলামেশা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত...

চরে সন্ধ্যা নামে। ধরে ধরে দীপ জ্বলা শুরু হয়েছে। কোন কোন বাড়িতে মঙ্গল-শাঁখ বাজছে। পলেখবীর বৃকের ওপর দিয়ে ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গি। বড় ভাল লাগে রমেশ্বরনারায়ণের। নীরবেই বালুর ওপর বসে পড়েন। রামকান্তও পাশে বসে। স্নেহের মুছনা অস্বরণিত হতে থাকে চরময়—

ও রঙ্গিলা নায়েব মাঝি —

নিগুণ কথা কইয়া যাও শুনি।

গান দূর হতে দূরান্তে মিলিয়ে যায়। কৃষ্ণ একাদশীর ঘন অঙ্ককার থমথম করতে থাকে চারদিকে। রমেশ্বরনারায়ণ জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন কিনা বোঝা যায় না। রামকান্তর পক্ষে আব অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়। ভাগবতের আসরে হয়তো এরই মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে টোক গিলে ধ্যান ভাঙায়, ফেরবার সময় কিন্তু হলো স্তর।

হ্যাঁ চলো। বড় ভাল লাগছে তে ভট্টাচার্য, উঠতে ইচ্ছে করছে না। রমেশ্বরনারায়ণ উত্তর দেন।

রামকান্ত অধিকতর ভয় পায়। তবেই হয়েছে, রোজ রোজ এখন খেকে এখানে বেড়াতে এলেই তো গেছি আর কি!...তবু সাহসে বুক বেঁধেই বলে, বেশ তো আর একটু না হয় বহুন।

না, চলো। তোমার আবার কীর্তনের সময় হয়ে এল, উঠে দাঁড়ান রমেশ্বরনারায়ণ।

রামকান্তও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। এবার আর দ্রুত নয়। হেলে হুলেই পথ চলতে থাকে। গলে গলে বৈরাগী খালের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় দুজনে।

খালের মুখ থেকে বংশীর চর অনেকটা নীচ। স্নানের জন্ত কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঘাট তৈরী করে দিয়েছে চরের মানুষ। ওকি! কলসী কাঁখে একটি স্ত্রীলোক উঠে আসছে না ঘাট থেকে! কে ও? চেনা চেনা বোধ হচ্ছে, রামকান্তর উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়।

দুর্গা সন্ধ্যার জল ভরতে বংশীর ঘাটে এসেছিল। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই এখন ওকে ছুটতে হয়। অল্প দিন বেলাবেলিই সব হয়ে যায়। আজ অসময়ে ক্ষান্ত এসে গ্যাট হয়ে বসায় দেরি হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে। নিজের বিবেচনায় উঠে না গেলে মানুষ মুখ ফুটে বলে কি করে। তাছাড়া যে রকম ঝগড়াটে। এই তো দু'দিন আগেও ঝগড়া গেছে, এখন আবার চলাতে শুরু করেছে। দুর্গাও অপ্রস্তুত হয়। দূর থেকেই উভয়কে চিনতে পারে। চাঁদ্রির ওপরের ঘোমটা নাকের ডগা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে রাস্তা দেয়। কাঁথের ওপরে মাজা পেতলের কলসীটা অন্ধকারেও ঝকঝক করতে থাকে।

রামকান্তর চিনতে বিদ্রুমাভ্র বিলম্ব হয় না।

রমেন্দ্রনারায়ণের চোখের ওপর সহসা যেন একটি রঙিন প্রজাপতি পাখা মেলে এসে দাঁড়ালো। মনের কোণে বিদ্রুৎ চমকতে থাকে। একি সত্যি না স্বপ্ন! দুর্গা কি তাহলে ওকে দেখেই এই নিরুম ঘাটে জল ভরতে এসেছে... কি করবেন ভেবে পান না রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত বোবা হয়ে গেছে। একটি কথাও মুখ দিয়ে সরে না। সত্যিই কি ও দুর্গা। কই, এর আগে তো কখনো ওকে এ সময়ে জল ভরতে দেখা যায়নি। তবে কি...না না, হয়তো কোন কাজে আটকে গিয়েছিল। বেচারী কতক্ষণ ভরা কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মুক্তি দেওয়া উচিত।... রামকান্ত আর ভাবতে পারে না। সচীন পার হয়ে আসে রাস্তা। ওর দেখা দেখি রমেন্দ্রনারায়ণও পার হয়ে আসেন। দুর্গা দম কেলে তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে ছুটতে থাকে। ভরা কলসীর জল ছলকে পড়তে থাকে চলার ছন্দে। স্বর্গের উর্বশীই যেন মর্ত্যের নদীতে জল ভরতে এসেছিল। রমেন্দ্রনারায়ণ পথটুকু পার হয়ে এসেও চাতকের মতোই পেছন ঘুরে দাঁড়ান। দু'চোখে লোভাতুর দৃষ্টি।

দুর্গা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখ ঝোলেন, তোমার সেই তিনি না ভট্টাচার্য?

রামকান্ত নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। তবু উত্তর না দিয়ে পারে না।
রুজ্জিম রসান দিয়েই বলে, হজুরের অনুমান সত্য।

খাসা মালটি পাকড়েছ তে ভট্টচাষ। মধুতে যেন টে-টুগুর।

হুলের কথাটাও ভেবে দেখবেন হজুর, মিটমিট করে হাসতে থাকে
রামকান্ত।

বমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, আনন্দটা গৌয়ার না? কিন্তু হুল আছে বলে কি মধু
থাবে না রসিকজন?

রামকান্তব ইচ্ছে করে ঠাস কবে একটা বিবাহী সিদ্ধাব চড় বসিয়ে দেয়
বেহায়াটার গালে। কিন্তু ক্ষমতায় কুলায় না। অবস্থা আয়ত্তে রেখেই পাশ
কাটাতে চেষ্টা করে, দেখা যাক না, চারে মাছ পড়ে কিনা।

ও দেখাদেখির মতো আমি নেই তে ভট্টচাষ। যা করবে তাড়াতাড়ি করো।

হজুর কি তাহলে পাইক-পেয়লা লাগাতে চান?

প্রয়োজন হলে তা আমি লাগাবো। তবে তুমি কতদূর এগিয়েছ আগে
সেইটেই জানতে চাই।

শটন শটন এগিয়ে যাওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় হজুর!

দেখো, বেশী খাটাবে না বলছি। কতদিন আর তুমি আমাকে লেজ
খেলাতে চাও বল তো?—রমেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

রামকান্তও নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করে। ঢোক গিলে খিতিয়ে
খিতিয়েই জবাব দেয়, হজুর কি তা হলে আমাকে অবিশ্বাস করেন?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এটা নয়। এককাঁড়ি টাকা তুমি আমাকে দিয়ে
দেওয়ালে। আসল তো দূবের কথা স্বদটা পর্যন্ত আদায় হলো না। বছর
ঘুরতে চললো। আমলা, মুহুরি, নায়েব সকলের মুখে চোখেই বিক্রপের কটাক্ষ।
অথচ তোমার মধ্যে কোন সাড়া-শব্দই নেই। আরো কত কাল আমাকে তুমি
ঝুলিয়ে রাখতে চাও?

রামকান্ত থ বনে যায়। রাগে দুঃখে নিজের গাল নিজেরই চড়াতে ইচ্ছে
করে। কি কুক্ষণেই না চরে পা দিয়েছে ও। দুর্গা দুর্গা, দুর্গার জন্মই আজ
লোকের কাছে ওকে অপমান সহ করতে হচ্ছে। টাকাটাই যদি না নেওয়া
ধাকতো তাহলে ও দেখিয়ে দিতে পারতো, কাশিমপুরের কুমার বাহাদুরের চেয়ে
ওর ক্ষমতা কম নয়। হাজার লাঠিয়াল ওর কথায় ওঠে বসে। কুল ললনার
অপমান চরের মাছুষ কিছুতেই সহ করতে না। কিন্তু দুর্গার কাছে নিজেরই ও

পরাজিত। কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানানো ওর পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। চব ছেড়েই ওকে পালাতে হবে...ভাবতে ভাবতে মাথাটা বৌ বৌ করে ঘুরতে থাকে রামকান্তর। মুখে কোন কথাই বলতে পারে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন। রাগের মাথায় কথাগুলো বলে যেন ভাল করেননি। পাইক পেয়দা পাঠানোর কথা মুখে বলা যতো সহজ কিন্তু কাজে ততো সহজ নয়। চরই একমাত্র জায়গা যাব আয়ে লাট কিস্তি চলে। সেই চরের মানুষ যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ঠেঙিয়ে শায়ের্তা করা গেলেও আয় নিশ্চিত কমে যাবে। না না, এ ভুল কিছুতেই করা যায় না। পুনরায় বামকান্তকেই বুরিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। হান্কাভাবেই শুধোন, বাবু সাহেবেব বুরি রাগ হলো ?

কিন্তু বামকান্ত তবুও সহজ হতে পারে না। বড় লেগেছে আজ ওর। মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার কবে বলেন, নাও হয়েছ, আর রাগ দেখাতে হবে না। হাসতে হাসতে নিজেকে একটা ধরিয়ে আর একটা রামকান্তর দিকে এগিয়ে দেন।

রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে সজোরে টানতে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় নিজের কথায় ফিরে আসেন, দেখ হে ভটচাষ, তুমি রাগই করো আর যাই বলো, ও মাগী কিন্তু সাচ্চা নয়। চও দেখলে না, কেমন পাছা ছলিদি হনহন করে চলে গেলো। কথায় আছে :

জল কেলে জল ভবতে আসে

সে যে কেমন সতী—

কদমতলায় চিকন-কাল

আয়ান মিছে পতি।...

বলি সন্ধ্যা বেলা—নির্জন ঘাটে—একা একা জল ভরতে আসা, মানে কিছু বুঝতে পারলে কি ?

রমেন্দ্রনারায়ণের কথায় আপন মনেই ধান্কা ধায় রামকান্ত। তা ঠিক বটে। আমি কতদিন চেষ্টা করেছি, নিরিবিলিতে ঘাটে পঁখে ছুটো প্রাণের কথা বলতে। কিন্তু মাগী কোন সাড়াশব্দই করেনি। ভাবখান, যেন কিছুই বুঝতে

পারছে না। কই, এর আগে তো কোনদিন রাজিবেলা জল নিতে আসতে দেখিনি। কুমার বাহাদুর ঠিকই বলছেন। চঙ দেখাতেই এসেছিল ছিনাল। রূপ আর রূপটারের মোহে স্থির থাকতে পারেনি। কুমার বাহাদুরকে মুখোমুখি দেখবার ছুখনোতেই জল ভরতে আসা হয়েছিল। ভেবেছিল, আমি ভাগবতের আসরে সরে পড়বো। দিব্যি একা একা নিরালস্য প্রাণের কথা বলবে। কিন্তু সে-শুড়ে বালি পড়েছে। তাই আবার চঙ করে ঘোমটা টেনে হনহনিয়ে চলে যাওয়া হলো। বেশ, তাই হবে। তোর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করবো। তখন দেখে নিস, কে তোর সত্যিকারের ভাল করতে চেয়েছিল। হতভাগ্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ না বারো ঘাটের এই মড়াটা।...এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রামকান্তও সক্রোধে জলে ওঠে। রমেশ্বরনারায়ণের হাঙ্কা কথার জবাব হাঙ্কাভাবেই দেয়, দয়া করে আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন ছজুর। চঙ দেখানো আমি বার করছি।

সাবাস, এইতো চাই। জানলে হে ভট্‌চাষ, জীবন দুদিনের, ভোগ স্বখ বা কিছু সময় থাকতেই করে নাও।

অথম কি ছজুরের প্রসাদ পাবার আশা করতে পারে ?

ভোগ আরতির আগে প্রসাদের কথা মুখে এনো না হে ভট্‌চাষ, পাপ হবে।

সাধ্যমতো দেব-সেবার ক্রটি হবে না ছজুর।

তাহলে প্রসাদ তো নিশ্চয় পাবে।

ছজুরের জয় হোক।

না না, আগেভাগে জয়গান করো না। চলো, একটু চাঞ্চা হওয়া যাক।

আজ থাক ছজুর। শুনেছন না, খোলে কেমন চাটি পড়ছে ? দেরি হলেই খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। রসবোধ বলতে যদি কোন বস্তু থাকতো বেটারের।...

তা আর কি করবে, দুটো দিন সবু করো। নায়েব শালা আবার দলবল নিয়ে পাঁচের কথতে শুরু করেছে। আগে শালাকে চিট করে নিই তারপব সোজা বসিয়ে দোবা গদিত্তে, হে হে হে...

মুখের কথা আর শেষ করেন না রমেশ্বরনারায়ণ। রামকান্ত স্বপ্ন দেখতে থাকে। বলছেন কি কুমার বাহাদুর। গজের কাছারির নায়েব করবেন আমাকে! এ-ও-কি সম্ভব। তাহলে তো কোন কথাই নেই। দুদিনেই চরের জারিজুরি জেঙে কেলা যাবে। হাঙ্কার হোক আর লাখ হোক, বিজ্ঞানের

গাং লাঠি-সোটার কাজ নয়। মাত্র ছুটো বোড়ের কিস্তি—সব শালা শায়ন্তা হয়ে যাবে। কথায় কথায় শালারা, মেজাজ খারাপ করতে শুরু করেছে। ঐ ছিনাল মাগীকেও এক হাত দেখে নেবো। পায়ে ধরে সাধাবো তবে আমাব নাম রামকান্ত ভট্টাচার্য।...আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে ধোয়াঘাট পর্যন্ত এসে পড়ে রামকান্ত।

বমেজনারায়ণ একাকী ডিক্রির ওপর গিয়ে ওঠেন।

রামকান্ত তীরে দাঁড়িয়েই হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

দেখতে দেখতে ডিক্রি এপার থেকে ওপারে গিয়ে পৌঁছোয়। রামকান্তও বৈবাগী বাড়ির দিকে চলতে থাকে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবে, নায়েবিটা একবার হাতে এলে হয়। ও শালার জমিদারী চালও হুদিনে ঘুচিয়ে দেবো। শালার বড্ডো বাড় বেড়েছে। টাকার বিনিময়ে ধরাকে সর। জ্ঞান করছে। বেশ, দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল।...ভাবনায় ভাবনায় দুর্গার বাড়ির কাছেই এসে পড়ে রামকান্ত। ভাবে, দেখে যাবো নাকি একবার মাগীকে। না, থাক। ভাল বৃষ্টি তো ফেরবার পথেই নাড়াচাড়া করে দেখে যাবো...কোন দিকে না তাকিয়ে সোজাসুজিই পা চালাতে থাকে রামকান্ত।

॥ ২৮ ॥

দোল পূর্ণিমা। দূর গগনে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সমারোহ। চন্দন মাখামাখিই যেন নীল গগনের প্রশস্ত ললাটখানি—চন্দ্র সুষমায় উজ্জল। সঙ্গীত মন্ত্রিত ভুবন গগন। এ সঙ্গীত বিরহের সঙ্গীত। আবার মিলনের মহা সঙ্গীতও এ।

কান্ত কুঞ্জে আসবেন। ঝবা পাতায় বাজছে তার পায়ের নূপুর। রঙীন পাখা মেলে প্রজাপতি গুঞ্জরণ তুলছে। চামর ছলছে কাশের বনে। বন-বিতান পুষ্পিত। শ্রীমতী প্রতীক্ষারতা বাসরঘরে। মধুধামিনী ভোর হয়ে আসে। না, কান্ত আর এলেন-না। বিরহী আত্মা গুমরে ওঠে। সে বিরহ অল্পরপিত হয় কোকিলের কুঞ্জে, ঝরা পাতার মর্মরে—নীরব নিশীথে। বসন্ত এখানে রোদন-ভরা। আর কান্ত যার কুঞ্জে আসেন তার কাছে এ সঙ্গীত-মুখর—মিলন প্রতীক।...

মিলনেই যেতেছিলেন বৃন্দাবনের সখীরা সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। কুহুমিত নিধুবন। বাতাসে মিষ্টিগন্ধ। রাগ-রঞ্জিত দেহ। কণ্ঠ সঙ্গীত-মুখর। গোপিনীরা

উৎসবে মাতোয়ারা। মাতোয়ারা আবীর কুমকুম আর চূয়া-চন্দনে। নৃপূরের রোল উঠছে, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে—প্রাণ যাচ্ছে প্রাণে মিশে। এ উৎসব যৌবন উৎসব—মদন উৎসব—বসন্ত উৎসব। শ্রীবন্দ্যাবনে দোল উৎসব এ...

ময়না নিশির বিয়ের পর এই প্রথম দোল উৎসব। গঞ্জের বাজারে ধুম লেগেছে। বিহারী মজুর আর দোররক্ষীরা প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই লীলা গানে মত্ত। প্রতি রাত্রে ঢোলক বাজে—খঞ্জনী। সমস্বরে চলে গান-বাজনা—অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস। সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পরেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ওরা। পূর্ণিমার দিন দুই আগে থেকে গতি আরো বেড়ে যায়। দলের কেউ একজন নায়িকা সাজে। সকলে রসবতীকে ঘিরে সারারাত্‌ চালায় সা-রা-রা আর খিস্তি খেউর। এ কোন লীলাগান নয়। ভরা যৌবন আর বসন্তের উৎসব সঙ্গীত। আদিম যুগের কোন্‌ এক আদিম পুরুষ কবে যে এদেব হয়ে এ সঙ্গীত ফেঁপে গেছেন তা কেউ না জানলেও আজো তার ধারা বদলায়নি। সেই আদি ও অকৃত্রিম সুরেই আজো এরা যৌবনের বন্দনা গায়—উৎসব করে।

হরির আখড়ায় দোল উৎসব চলেছে। মোহন্ত চরণ দাস তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুত্র সনাতন দাসের ওপব আখড়ার ভাব। পিতাব সমস্ত শিষ্য সামন্তকে নিমন্ত্রণ করেন সনাতন। যে যা পারে গোপীনাথের ভোগ বাগেব ব্যবস্থা করে। দু'দিন দু'রাত্রি চলে বিরামবিহীন পালাগান। চরের দল গাইছে পূর্ণিমার দিন। “নৌকা বিলাস” গাইছে তারা। মধুর মৃত্যুর পব সুরেন্দ্রই এখন চরের সেরা গাইয়ে। মধুর মতো রাগ-রাগিণীতে ওস্তাদ না হলেও সুরেন্দ্রের কঠিন স্বমিষ্ট। আসরের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ ওর গানে।

মাঝ রাত্রে শেষ হয়ে যায় পালা। চলে বুমুর আর জয়ধ্বনি। আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি। ভক্তগণ আজ শুধু বিগ্রহের মধোই সীমাবদ্ধ রাখবে উৎসব।

আগামীকাল হোলি উৎসব। প্রিয়জন দেবে প্রিয়জনের গায়ে রং আর আবীর। হোলি গান বেরোবে পাড়ায় পাড়ায়। গঞ্জে বাঙালীদের হুঁদল। উত্তর থেকে আসবে উত্তর পাড়ায় দল আর দক্ষিণ থেকে যাবে দক্ষিণ পাড়ার দল। মাঝামাঝি জায়গায় চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে এসে মিলবে উভয় দল। প্রত্যেক দলেই থাকবেন একজন করে রাজা। রাজার সাজ-পোষাক আবার অদ্ভুত ধরনের হওয়া চাই। গাধার পিঠে উণ্টো-মুখো হয়ে বসবেন তিনি। মাথায় থাকবে ভাঙা ধানুই-এর মুকুট। গলায় হেঁড়া জুতোর মালা, পরনে চট নয়তো

১ ছেঁড়া কাঁথা। রাজার পাত্র-মিত্ররাও কেউ কম যাবে না। কারো হাতে কাঁটা, গাছের ডাল, বাতুন। হইহই করে শোভাযাত্রার আগে আগে রাজাকে তাড়া করে নিয়ে চলবে একদল। আর তার ঠিক পেছনেই ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে আর একদল যাবে গান গাইতে গাইতে। উৎসব কেন্দ্র থেকে শোভা-যাত্রা বার করবার সময় এ গান বৃন্দাবনজীর লীলামাহাত্ম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শেষে এসে দাঁড়াবে খিস্তি-খেউরে। দক্ষিণ-পাড়ার রাজার মুকুটে লেখা থাকে “উত্তর পাড়ার রাজা চলেছেন, সাবধান।” আবার উত্তর পাড়ার মুকুটে লেখা থাকে, “দক্ষিণ পাড়ার রাজা চলেছেন, সেলাম দাও।” সেলাম ঠিকই দিচ্ছে। রাজার পিঠে সমানে পড়তে থাকে কাঁটা আর বাতুনের বাড়ি।

২ চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে উভয় দলের আড়াআড়ি আরো বেড়ে যায়। রং-তামাসা খিস্তি-খেউর সমানে চলে। যে দল এঁটে উপতে পারে না তাদের কেউ একজন চুপিচুপি এসে ভিন্ন দলের ঢোলক দেয় ফাঁসিয়ে। খিস্তি-খেউর থেকে অবস্থা হাতাহাতি মারামারিতে গিয়ে পৌঁছায়। খবর পেয়ে ছ’ দলের দলপতিরা ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মামলা মিটে যায়। আবার লীলামাহাত্ম্য গাইতে গাইতে যে যার পাড়ায় কিরে আসে।

দুপুর তখন গড়িয়ে যায়। বংশীর স্বচ্ছ জলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। চড়া রোদে সমস্ত শবীর তেতে গেছে। গাল, গলা থেকে আলকাতরা, বাঁহুরে রং আর অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ঘষে ওঠাতে গিয়ে ছাল-চামড়াই উঠে যায় অনেকের।

৩ সন্ধ্যায় আবার ঠাকুর গন্তের পালা। এবার আর কোন রং-তামাসা কিংবা বক্রপী সাজসজ্জা নয়। ভদ্র জামা-জুতো পরে সম্ভ্রান্তরাই বেরবেন এবার। শোভাযাত্রার আগে থাকবে পঞ্চ বাজনা। ঢোল, কাঁসর, সানাই, কাড়া-নাকাড়া। তারপর বাহকের মাথায় দোল-চৌকির ওপর বিগ্রহ। বিগ্রহের পরেই থাকবেন বাবুশাইরা। হারমোনিয়ম, ঢোলক, করতাল-যোগে চলবে লীলা-গান। নূল গায়ের আগে গেয়ে যাবে এক-একটি পদ, অন্তেরা সমবেত কণ্ঠ করবে তার পুনরাবৃত্তি। এ বেলা আর এক ফোঁটাও জলো রং নয়। শুধু আবীর আর কুমকুম। রাস্তার দুঁদিকের বাড়ি থেকে পুরনারীরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আবীর ছিটাবেন—উলু দেবেন—সন্ধে লুটের বাতাস। বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যেই উত্তর দলের শোভাযাত্রা আবার এসে মিলবে চণ্ডীমণ্ডপে। প্রাণ খুলে একের পর এক যে যার দলের রচিত গান গেয়ে শোনাবে উপস্থিত

জনতাকে। মণ্ডপের বিরাট চত্বর লোকে লোকারণ্য। বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মিজদের মধ্যেও চলবে আবীর খেলা। শুভ কামনা জানাবে পরস্পর পরস্পরকে। গভীর রাত পর্যন্ত চলবে গান! সর্বশেষ ফিরে আসবে যে যার পাড়ায়। এবার প্রসাদ পাবার পালা। মোহন্তরা হাতে হাতে বেঁটে দেবেন খিচুড়ি, মিষ্টান্ন আর লাবড়া। উৎসবের হবে পরিসমাপ্তি।

দোল উৎসবে চরণ দাসের শিখরা গঞ্জে গেলেও চরে আমোদ-প্রমোদ কম হয় না। আবীর রং খেলার ধুম চরেও জমে ওঠে। হোলির দিন ছোটরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই রং পিচকারি নিয়ে মাতোয়ারা। বড়দের মধ্যেও আবীর বিনিময় চলে। পরস্পর করে পরস্পরের মঙ্গল কামনা।

দীহুর বাড়ির ধুম এবার একটু বেশী। বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছে ময়না। পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে নড়ছেই না। সকালেই রং-এ নেয়ে ওঠে ময়না। নিশিও বাদ যায় না। পার্বতী আচ্ছা করে ওদের দু'জনকে রং মাথিয়ে দেয়। নিশিও পার্বতীকে ছাড়ে না। বড় ঘরথানায় ওরা সকলে মিলে হৈ-হল্লা শুরু করে। কুহুমের ভালই লাগে এ আনন্দ-উৎসব। এবেলা আর রান্না বান্না নেই। মুড়ি চিঁড়ে খেয়েই সকলকে পেট ভরাতে হবে। দীহু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে হরির আখড়ায় ছুটেছে। অস্থিনীকে দিয়ে গঞ্জের বাজার থেকে এক টাকার জিলিপি আনায় কুহুম। রং খেলে কেউ খালি মুখে যাবে না। আর কিছু না হোক একটু মিষ্টিমুখ সকলকে করাতেই হবে।

নিশির হাতে রং খেয়ে পার্বতী বলে, আমাকে আর রং দিমা কি করবা-নিশিভাই। গলার মালারে রং ছাও গা।

উত্তরে নিশি বলে, হ, আপনারা যা করচেন কইয়া ছান, তাই করি।

পার্বতী বলে, আমাগ ছা কালের (সেকালের) কতা ছাইড়া ছাও। তোমাগ রাদা যে বাঁশী হইনা ঘরে আইচে। হারে বিন্দাবন নীলা ছাহাও। কি কচ'ল তরা?—সরলা কালী প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন সকলের দিকে চেয়ে হেসে কেটে পড়ে পার্বতী।

সকলেই পার্বতীকে সমর্থন করে সম্বন্ধে চেপে ধরে নিশিকে, হ হ নিশি ভাই, ময়নারে কোলের উপর বহাইয়া রং মাখাইয়া ছাও।

নিশি বলে, তবে তোমরা হগলে মিলা খইয়া আন অরে।

লঙ্কায় মুখ ঢেকে এক কোণে ঠাঁড়িয়েছিল ময়না। নিশির মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে স্কলে মিলে টানতে টানতে ওকে নিশির কাছে নিয়ে আসে।

কোলে বসানো আর হয় না। দু'হাতে ঘন করে গোলাপী রং গুলে ময়নার মুখে মাথিয়ে দেয় নিশি।

পার্বতী এবার ময়নার হয়ে ওকালতী করে, এই মইনী, তুইও ছাড়চ ক্যান দে না আইছা কইরা মাখাইয়া।...

কিন্তু ময়না তা পারে না। কিছুদিন আগেও যে মেয়েটি বংশীর চরময় একসঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করেছে সে আজ লজ্জাবতী লতা। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নীরবেই খিলখিল করে হাসতে থাকে শুধু।

বাড়ির সখ মিটিয়ে বন্ধু বাব্ববদের সঙ্গে ভিন্ন পাড়ায় রং খেলতে যায় নিশি। একরকম সারাদিনই চলে আবীর আর রং খেলা। হৈ ছলুড়ে শরীর কিমিয়ে আসে। গঞ্জের লোক হোলিগানে গভীর রাত পর্যন্ত ডুবে থাকলেও চরের মানুষ বেশীক্ষণ বেশ রাখতে পারে না। দীর্ঘ গঞ্জ থেকে ফিরে আসার আগেই নিশি শুতে যায়। একবার ভেবেছিল, গঞ্জে গিয়ে গান শুনে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। ও তো সেই মামুলী ব্যাপার। অনেক বারই তো দেখেছে, এখন ঘুমিয়ে পড়ে সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাত দশটা না বাজতেই শোবার-ঘরে চোকে মিশি। একে একে সমস্ত চরই এক রকম নিস্তর হয়ে পড়ে। রামকান্তও বেশী পেড়াপীড়ি করেনি। সেই ছলুড় ওর ভাল লাগে না। চেপে ধরলে চরেও কীর্তনাদিব ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু তাতে সনাতন দাসের চেয়ে ওর নিজের ক্ষতিই হতো বেশী। নিজেকেও আটকে থাকতে হতো কীর্তনের সঙ্গে। এই বেশ ভাল হয়েছে, ওরা গেছে ওদের মোহস্তের আখড়ায়, ও পেয়েছ ছুটি। ষত খুশি বেটারা নাচানাচি করক ওর কিছু আসে যায় না। ও কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কাছারিতে বেশ আছে। হ্যাঁ, একেই তো বলে বসন্ত উৎসব। সুরা শাকীই যদি না রইলো তবে আবার উৎসব কিসের? নেশার ঝোঁকে কুমার বাহাদুর অবশ্য দুর্গার জন্ম হাঁপিয়ে উঠেছেন। খিত্তি খেউরও বাদ দিচ্ছেন না। তা একটু দিন, নেশা বেশ ভালই জমেছে। এখন নায়েবিটা হাতে এলেই কেলা ক্ষতে। আর ও তো এল বলে। মাসী যখন ঘাটের পথে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবো। গোসাঁই শালাকেও তখন দেখে নেবো। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে শালা যেন মাথা কিনে কেলেছে। একবার বসে নিই গলিতে সব শালাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।...নেশার ঝোঁকে এলোমেলো ভাবতে থাকে রামকান্ত।

সায়ী চরই একরকম নিস্তর। নিশি অধিনীও যে যার ঘরে গেছে। শুধু চক্কলঙ্কায় ময়না পাবতী যেতে পারছে না। শান্তডীকে একা বাইরে রেখে নিজেরা ঘরে যায় কি করে। অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার কোন বামেলা নেই আজ। বাড়ির সকলের ব্যাপারই চুকে গেছে। শুধু স্বত্তরঠাকুরই যা একা বাকী। কিন্তু উনি তো গঞ্জের আখড়াতেই প্রসাদ পাবেন। তবু ঠাকরুন যখন মুখ ফুটে ওদের কিছু বলছেন না তখন আর যায় কি করে। কিন্তু ছ'চোখ যে ঘুমে বুকে আসছে। সারাদিনের খাটুনির পর কতক্ষণ আর চূপচাপ বসে থাকা যায়। তাই তুলতে তুলতে পাবতী উঠে দাঁড়ায়। কুসুমের শরীরেও আর বইছে না। খাওয়া দাওয়ার পর পান চিবুচ্ছিল, পাবতীর ওপর নজর পড়ে। ঢোক গিলে নিয়ে ওকেই বলে, তোমরা শোও গা বোমা, রাইত অইচে।

পাবতী এই অহুমতিটুকুর জগ্গই অপেক্ষা করছিল। স্ততরাং আর কোন রকম স্থিধা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, আপনে হইবেন না ?

হ, আমিও গিয়া গৈড় (শোয়া) দেই গা। কতক্ষণ আর বাইরে বইয়া থাকুম। ওনার ফিরতে অনেক রাইত অইব। তোমরা ঘরে যাও।

পাবতী ময়না উঠে দাঁড়ায়। কুসুমও আর দেরি করে না।

দক্ষিণ ভিটির ঘরখানায় নিশি শোয়। চারদিক জুড়ে চেউটিনের বেড়া—চেউ টিনের চাল। পূবদিকের জানালা খুললে ঘর থেকে বংশীর জল দেখা যায়। ময়না আস্তে আস্তে এসে ঘর চোকে। নিশি জেগে আছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যায় না। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নেই। টিপটিপ করে মাটির প্রদীপ জ্বলছে এক কোণে। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা লম্বা গোটা তিনেক শিকে। মাটির পাতিল ও পেতলের গামলায় হয়তো কোন খাচ্চ রয়েছে। গোটাকয়েক বড় বড় মাটির জালাও রয়েছে আর-এক কোণে। এছাড়া আছে বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করানো ছোটবড় এক ঝাঁক কাঁটাল কাঠের পিঁড়ি। বেড়ার সঙ্গেই বড় একটা কাঠের তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে আয়না চিরুনি প্রভৃতি ময়নার প্রসাধন সামগ্রী। উত্তর-দক্ষিণের বাতার সঙ্গে টাঙানো দড়ির ওপর গালা-করা শ্যামা-কাপড় ঝুলছে। দক্ষিণের জানালা ধঁষে রয়েছে শোবার বড় চোঁকিখানা। ময়না ঘরে ঢুকেই প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। পূবের বড় বড় জানালা দুটো দিয়ে পুঁদিমার শুভ্র জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। বংশীর কোল ঝলমল করছে উজ্জল জ্যোৎস্নালোকে। গঞ্জের ছ'চারটে দোকান পাটে এখনো বাতি জ্বলছে।

নিশ্চরতা ভেদ করে ভেসে আসছে ক্ষীণ গানের রেশ। গঞ্জের মাহুয হয়তো সারা রাতই উৎসব করবে আজ।...কিন্তু ও কি ঘুমিয়ে পড়লো এরই মধ্যে! খুব মাহুয যা হোক। অতো লোকের মধ্যে পায়ে-আবীর দিতে আমার বৃষ্টি লজ্জা করে না!...এক ফাঁকে একপ্লানা পেতলের রেকাবিতে করে তাকের ওপর খানিকটা আবীর এনে রেখেছে ময়না। ইচ্ছে, নিরিবিলিতে নিশির পায়ে দিয়ে প্রণাম করবে। গুরুজনের পায়েই তো আবীর দিতে হয়। কিন্তু ও যে ঘুমিয়েই পড়লো। শোয়া অবস্তায় তো আবার কাউকে প্রণাম করতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়।...ভাবতে ভাবতে ময়না জানালা থেকে চৌকির কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন যেন বাধবাধ ঠেকে ওর। কিছুতেই গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে পারে না। ফিসফিস করেই ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে, এই—ঘুমাইলা নাকি। বারে, ওঠ না, এই।...

না, কোন সাড়া শব্দ নেই নিশির। বিরক্ত হয়ে ময়না আবার এসে জানালায় দাঁড়ায়। দু'চোখের ঘুম কোথায় যেন উবে গেছে। ঐ তো বংশীর বিরাট চর ঝিকমিক করছে, ঐ দেখা যাচ্ছে চরধল্লার বুড়ো বটগাছটা। কত নিভৃত সন্ধ্যায়—কত দুপুরে দু'জনে ওখানে গলাগলি ধরে খেলেছে। লোকচক্ষুর সামনেই মাবামারি হাতাহাতি কবেছে, লজ্জার লেশমাত্রও কোনদিন টের পায়নি। কিন্তু আজ এই নিভৃত ঘরে একি ওর লজ্জা!...না না, লজ্জা আবার কিসের! বেচাবা সারাদিনের ক্রান্তিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'দণ্ড থাক না, পরেই জাগানো যাবে। এমন কি রাত হয়েছে! এই তো বেশ লাগছে... ময়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের শোভা দেখতে থাকে।

ঘুম নিশির চোখেও নেই। চূপচাপ শুয়ে মজাই দেখছিল ও। কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়। ময়না যে চাঁদের শোভায় ডুবে গেলো!...জল খারার ছুঁনো করে বিছনার ওপর উঠে বসে নিশি।

ময়না শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকায়। সবিস্ময়ে বলতে থাকে, অ, তুমি তাইলে জাইগা জাইগা ঘুমাইচিলা!

কৃত্রিমভাবে চোখ বগড়িয়ে নিশি উত্তর করে, বইয়া গেচে আমার জাইগা থাকবার। তিষ্টায় বলে আমার গলা শুকাইয়া গেচে! জল আছে নাকি?

জল থাইব না হাতি। এই ঝাও, ময়না কলসী থেকে এক গ্লাস জল গাড়িয়ে নিশির হাতে দেয়।

রেশ রাখবার জন্ত অনিচ্ছাস্বেষেও নিশিকে খানিকটা জল পান করতে হয়।

ময়না হাত বাড়িয়ে পুনরায় গ্লাসটা নিতে যায়।

নিশি গ্লাসটা হাতে দিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে যায় ওকে।

ময়না ধরা না দিয়ে মুচকি হেসে চলে যায় জানালায়।

নিশিও আর বিছানায় থাকতে পারে না। উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

আবার চেপে ধরতে যায় ওকে বুকের সঙ্গে।

ময়না বাধা দেয়, দাঁড়াও তোমারে একটা পেঙ্গাম করি।

নিশি খতমত খেয়ে চূপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

ময়না তাঁক থেকে আবীরের রেকাবিখানা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এক মুঠো আবীর নিশির পায়ের ওপর দিতে যায়।

নিশি বিশ্বয় বিস্ফারিত চোখে বাধা দেয়, কর কি—কর কি! গোবিন্দের আবীর কি মাইনবের পায়ে দিতে আছে।

ময়না ওতে কিছুমাত্র দমে না। হেসে উত্তর দেয়, গোবিন্দের আবীর গোবিন্দের পায়েই ত দেই। তুমিই ত আমার সাইক্কাইত (সাক্কাং) গোবিন্দ।

নিশি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ময়না ততক্ষণে ওর দু'পায়ে দু'মুঠো আবীর দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ওকে। সকালে দশজনের সামনে রং দিতে পারেনি। এবার ও সাধ মিটিয়েই ওর গোবিন্দের পায়ে আবীর দিতে পারলো। নারী জন্ম সার্থক ওর। স্বামী তো সাক্কাং দেবতাই। মা, দিদিমা তো বরাবর এই কথাই ওকে বলে আসছে। পূর্ণিমায় দেবতার পায়ে আবীর-অর্ঘ্য এ তো ভাগ্যের কথা...ময়না অস্তরে অস্তরে গর্ব অনুভব করে।

নিশির বয়োঃসন্ধির উন্মাদনাও মূহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। সোহাগে প্রাণের রাখাকে দু'হাতে টেনে তুলে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। হিয়ায় মিশে যায় হিয়া।

বসন্ত হিল্লোলে কঁপে ওঠে ধংশীর কোল। অদূরে মৃদু মৃদু ছলছে পাশাপাশি দু'টি কাশ ফুলের গুচ্ছ। জানালা থেকে ফিরে আসে ওরা বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়ে মনের স্বপ্নে।

চরের মাহুঘের বরাতই মন্দ। গোলা ভর্তি প্রত্যেকেরই ঘি-কলাই, ঘব, সোনা-মুগ। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এগুলোর যেন কোন দামই নেই। প্রথম মরশুমে তরি-তরকারির দাম দেখে মনে হয়েছিল, ররিশস্তের দামও চড়া যাবে। কিন্তু চড়া তো দূরের কথা এখন যে কোন খরিদারই নেই গঞ্জে। লোকে এখন গরু খাওয়ানোর জন্তু কলাই কিনছে। এক টাকা, উর্ধ্ব পাঁচ সিকের বেশী নয় কলাইয়ের মণ। যবেব অবস্থাও তথৈবচ। সোনা মুগের দর কিছু বেশী আছে বটে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা মুগ আর ক'জনের গোলায় আছে। কাঁড়ি কাঁড়ি কলাই-ই তো রয়েছে এক একজনের হাতে। অল্প পর দূরের কথা পলানের মতো চাষীও বাজার গত্যিকে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দীর্ঘ করিমের বুক শুকিয়ে কাঠ। না, কসাইয়ের হাত থেকে আর বাঁচার কোন আশা নেই। হৃদযোর মহাজন ওদের ললাটের লিখন। বিখাতা ওদের হাড়ের রস টেনে বার করার জন্তুই শয়তানের সৃষ্টি করেছেন। এরপর পাট চাষ আর হবে কি দিয়ে। ভগবানই রুপ্ত হয়েছেন চরের ওপর। বানের জল ঘরে ঢুকে আসল জল টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। টিনের ঘর-দোর তো ধাবেই — ভিটেমাটিও থাকবে কিমা সন্দেহ।...

রামকান্ত এখন আর নিয়মিত ভাগবতের আসরে আসে না। কেউ তার জন্তু কোন কথাও তোলে না। আসর কই যে তা নিয়ে মাথা গরম করবে। সন্ধ্যার পর দু'পাঁচজন আসে, কোনরকমে খোলে চাটি দিয়ে ধনি দেয়। বাদও পড়ে কোন কোন দিন। চিন্তায় চিন্তায় মাহুঘ সব ভুলতে বসেছে। দয়াল চানের আসরও ফাঁকাই যায় একরকম। সকলে মিলে জড় হলেও গান বাজনা অপেক্ষা দুর্দিনের আলোচনাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিন্তা ভাবনাকে ঠেলে ফেলবার জন্তু কোন কোন দিন করিম জোর করে একতারা নিয়ে বসে। গলা বেড়ে স্বরও ধরে। কিন্তু সে তো গান হয় না। মরা কান্নাই যেন কাঁদে সকলে মিলে।

দুর্গাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। পাট চাষ এখন শুরু না করলেই নয়। পাজিতে লিখেছে, জল এবার গোড়াগোড়িই আসছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হবে। মুগ কলাই হাতে যা আছে তা বেচে আধা-আধি জমির চাষও হবে না।

ক্ষেত মজুররা খোঁচ পাকিয়েছে, পেট ভরে ওদের প্রত্যেককেই খেতে দিতে হবে। তা না হলে কেউ কাজ করবে না। কিন্তু ওদের পেট ভরাবার মতো চাল ভাল পাবে কোথায় চাবী! ধান চাল বলতে তো চরের কারো হাতে কিছু নেই। গোলা ভর্তি আছে শুধু গরুর খাণ্ড—মাষ-কলাই। অনেক সালিসী দরবরের পর সকালের নাস্তার সময় পাস্তা ভাতের বদলে ছাতু গুড় খেতে রাজী হয়েছে বটে ক্ষেত মজুররা। কিন্তু দুপুরের ভাতের ঝুঁকিও কম নয়। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কাঁড়ি কাঁড়ি ভাতই গিলবে এক একজন। লোক রেখে চাষ করাতে হলে এ দাবি মানতেই হবে। বেকারের সংখ্যা অনেক হলেও কেউ ভাত না খেয়ে কাজ করতে রাজী নয়। রোজের পয়সা আট আনার বদলে সাত আনা দিলে চলবে। কিন্তু পেট ভর্তি ভাত না হলে চলবে না।

দুর্গা একবার ভাবে, এ সাল আবার পাট বুনবে না। কিন্তু আনন্দ তা কিছুতেই হতে দেবে না। কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে বেচারার। একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। তা ছাড়া পাট না বুনলে মহাজনের ঋণই বা শোধ হবে কি দিয়ে। চরের মানুষ তো সকলেই বলছে, পাট চাষ করবে না। জমি দু'সাল পতিত থাকবে তা হলেই পাটের বদলে পান বোনা যাবে। ধান ঘরে থাকলে আর যা হোক খাবার ভাবনা থাকবে না।...কিন্তু ভাবা পর্যন্তই সাব। মহাজনের তাড়াতেই হুড়হুড় করে সকলকে ক্ষেতে নামতে হবে। নাচতে নামলে ঘোমটা টানা চলে না।

চৈত্রের শেষ শেষ নিতাই আবার একদিন চরে আসে। ওসমান, গণিকে ওর বড় ভয়। কেমন ঘেন চাঁচা ছোলা কথা বলে ছোকরা হুঁটো। তাই চর-ধল্লায় না গিয়ে সোজা করিমের বাড়িতে ওঠাই স্থির করে নিতাই। স্বযোগ হয় পেটের কথা খুলে বলবে নয়তো ককিরের হুঁটো গান শুনে উঠে পড়বে। সন্ধ্যার পর খেয়া পার হয়ে হাঁটা পথেই রওনা হয়। বেশ তাল মতোই এসে পৌঁছায়। পলান, করিম, দীক্ষু সবেরা একত্র হয়েছে। বার বাড়ির উঠানে পা পড়ে ওর। তিন মোড়ল হকচকিয়ে ওঠে। যে যেভাবে পারে অভ্যর্থনা জানায়। পলান বিশ্বয়ের সঙ্গে শুধায়, থবর কি সাজী মশায়? হঠাৎ সাইনজা বেলা আইলেন?

নিতাই পেটের কথা পেটে রেখেই উত্তর দেয়, আর বলেন কেন। গিয়ে ডিলাম ছোট মেয়ের বাড়ি জয়মণ্ডপ। বেয়াই মশায় এ কথা সে-কথায় দেরি করে

কেললেন। চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেন যেন মনে হলো ফকির সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই আর কি...

তোবা তোবা ইত আমগ সোঁভাগ্য। বহেন, তামুক খান, জল চৌকিখান এগিয়ে দিয়ে করিম উত্তর করে।

নিতাই বলে, সোঁভাগ্য আমারই। আপনাগ মতো গুণীজনের সঙ্গ লাভ ক'জনের ভাগ্য ঘটে ?

কি যান কন, সব খোদা তাল্লার মজি। আমি হার গুণগান কতটুকু জানি। একটু ঠাণ্ডা হন, আমি হাত মুখ ধোয়ার পানি লইয়া আহি, উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে যায় করিম।

নিতাই বাধা দেয়, বলেন কি! আপনার হাতের জল দিয়া হাত পা ধোবো! মহা পাতক হবে না আমার! আপনি বহন, আমি এক্ষুণ উঠবো।

করিম হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ শাস্ত্রে ত আছে, অতিথি নারায়ণ। তবে আর হার সেবা শুশ্রূষা করলে গুণা অইব ক্যান! একটু বহেন, আমি যামু আর আমু।

না না, শরীর আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে। পানির আর দরকার হবে না। দয়া করে আপনি আমাকে একটা গান শোনান।

হেই বালো, কাম নাই পানি দিয়া। সাজী মশায় কিছুতেই আপনার আনা পানি দিয়া হাত পাও ধুইব না, পলান সায় দেয়।

তা যদি কন তয় রহিম আইনা দেউক পানি!

না না, পানির কোন দরকার হবে না। আপনি গান ধরুন। আপনার মুখের গান শুনলেই প্রাণ জুড়াবে।

করিম আর কথা বাড়ায় না। দীমু তাড়াতাড়ি এক কঙ্ক তামাক সেজে নিতাইয়ের হাতে দেয়।

বেড়ার গা থেকে একতারাটা টেনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। মুহু ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচোখ বৃজে আসে। পলান দীমুও তৈরী হয় দোহারের জন্ত। আবেগে সারা চর অম্লরপিত হতে থাকে—

(অ মন, দিন চারি পাঁচ কালাফালি (লাফা লাফি)

করিচ না তর ভাঙা নায়

আগার খেইকা, পাছায় বেইতে (বেতে)

কখন তরি ডুইবা যায় ।

স্বরের মুছনায় নিতাই কেমন যেন খিতিয়ে পড়ে। ককির কি তা হলে
ওর মনোভাব জানলে ! ওদের তরি ভোবাতে গিয়ে শেষটায় না নিজেরই ভরা
ডুবি হয়।...তিন' মোড়ল তয়য় হয়ে গাইতে থাকে। নিতাইয়ের হৃদ-তন্ত্রী
কঁপে কঁপে ওঠে। এব চেয়ে না আসাই বোধ হয় ছিল ভাল।...

গান থেমে যায়। নিতাই আসনের উদ্দেশে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। না,
আজ আর কোন কথা হতে পারে না। মনটা কেমন যেন বিবাকী হয়ে উঠছে।
করিম হয়তো যাদুই জানে। বলা যায় না, পেটের কথাও বলে দিতে পারে।
গানের ভাবাতেই পারে। মানে মানে এখন উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
নিতাই বেবিয়ে আসতেই চায়।

কবিরের তখনো মোহ কার্টেন। এ বাজোই যেন' নেই ও। হঠাৎ
নিতাইকে উঠতে দেখে প্রমত্ত করে, গান কি মনে ধবল না সাজী মশয় ?

অপ্রস্তুত হয়ে নিতাই বলে, কি যে বলেন। এমন প্রাণ মাতানো গান
কার মনে না ধববে। ইচ্ছে তো কবে, দিনরাত আপনাব কাছে পড়ে
থাকি। কিন্তু কি কববো। ভগবান যে কেবল জোয়াল টানতেই সংসাবে
আমাদের পাঠিয়েছেন।

হেসে কবির বলে, কাজ সংসাবে কার না আছে সাজী মশায়। তবু
দিন গেলে একবার দীন দয়ালেরে ডাইকেন।

আশীর্বাদ কবেন, তা যেন পারি।

তোবা তোবা, আমি কেরা আশীর্বাদ করবার, তাঁর কাছে দোয়া মাগেন।

টোক গিলে নিতাই বলে, জানেন দয়াল। তাঁব রূপাতেই যদি অধমেব
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

অইব অইব, উঠলেন ক্যান ? আব এক কইলকা তামুক খান, খোলাখুলি
উচ্ছ্বাস জানায় পলান।

দীহু আবার তামাক সাজে। এক সঙ্গে দু'কন্ডে। একটা জল ছাড়া
হুকোর মাথায় বসিয়ে নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। আর একটা করিমের
দিকে।

নিতাই নির্বিবাদে টানতে থাকে।

করিম বাধা দেয়, আগে তুমিই ধুমা বাইর কর।

দীহু হুকোটা পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ব্যাপারী সাব চোপার
জোর আপনারই বেশী। আপনেই টান ছান।

এ-কথায় সে-কথায় আসরের গাঙ্গীর্ষ শিখিল হয়ে আসে। স্বযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নিতাই। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে, চাষ আবাদের এরার কি করলেন সকলে ?

পলান সোজাসুজি জানায়, না, পাট আর ইবার বৃহ্ম না ঠিক করচি। ও হালা (শালা) ইংরাজের হাতে যখন কলকাটি তখন বেগার খাইটা কাম নাই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিতাই বলে, এবার কিন্তু অবস্থা একটু অন্তরকম। যত শুদ্ধই ধার্ষ হোক, জাপান এবার পাট কিনবেই।

হ, হাবারও ত আপনে কইছিলেন জাপান পাট কিনব। তা হালারা পানিতে ডুব দিচিল ক্যান ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। পানিতে ডুবিয়েই মারছিল বেচারাদের। তবে “লিগ অব নেশন” নজর দেওয়ায় এবার কিছু সুবিধা পাচ্ছে ওরা। পাটের দর এবার ভাল যাবে বলেই আমার মনে হয়।

মনে ত আমারও অয়। ও সন যখন মোন্দা গেচে ইসন চড়া যাইবই। কিন্তু ও হালা বোম্বাইটাগ যে আগা পাছা কিছু বৃজন যায় না। তাছাড়া পাট বৃহ্ম কি দিয়া ? টেক ত গডের মাঠ, আক্ষেপের সঙ্গেই পুনরায় মস্তব্য করে পলান।

এতক্ষণের চেষ্টায় আসল জায়গায় পৌঁছতে পেরে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে নিতাই। কৃত্রিম দরদ দিয়েই বলে, টেকের ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। আসলে চাষ করবেন কি না সেইটেই স্থির করুন।

তা যদি কন তয় আমরা এক পায় খাড়া। পাটে ডুবচি—পাটেই উঠুম, উল্লাসে কেটে পড়ে পলান।

তাই-ই তো উচিত। জেনে রাখুন, নিতাই সা সব সময়েই আপনাদের পেছনে আছে।

ধোন্দা রহুল, আপনার বালো করব, পলান উচ্ছ্বাস জানায়।

নিতাই বলে, তা'হলে আর দেরি করবেন না। কাজ আরম্ভ করুন।

আপনে আমাগ বাঁচাইলেন সাজী মশায়। একটা পয়সাও দিবার পারি নাই বইলা আপনার ধারে কাচে যাই নাই। দয়াল চানই আইজ আপনারে টাইনা আনচে ইদিগে, করিম উদাসীন থেকেই মস্তব্য করে।

নিতাই ছ'কোটা বেড়ার গায়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আসি তাহলে আজ। টাকার দরকার হলেই জানাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে নিতাইকে।
ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আবার জোয়ার আসে। আবার চরের ক্ষেত ভরে
উঠবে সোনার ফসলে।...

মাত্র পঞ্চাশ টাকা সম্বল করেই পাট চাষ আরম্ভ করে দেদার। বোন এক
রকম করে হয়ে যায়। কমলী আছে তাই রক্ষা। তিন সের সাড়ে তিন সের
দুধ দেয় কমলী। ও থেকেই আসে তেল হুন মসলা-পাতির পয়সা। ঠেকলে
দু'পাঁচ সের চা'লও কেনা চলে। কান্দনী ঘোষের লোক রোজ ডিক্রি বেয়ে
এসে দুধ দুইয়ে নিয়ে যায়। নিঃশেষেই নিয়ে যায়। বাড়ির ছেলেপুলেগুলোর
আঙুল চোবাই সার হয়। তা আর কি করা যায়, দুধ খেয়ে তো আর পেট
ভরবে না। পেট ভবাতে চাই হুন-ভাত—গুড়-মুড়ি।

বৈশাখের শেষ-শেষ ক্ষেতে নিড়ানি পড়বে। আবার চাই মূঠো ভর্তি টাকা।
সময়মতো নিড়িয়ে দিতে না পারলে আগাছাই বাড়বে, পাট যাবে তলিয়ে।
কিন্তু টাকা কোথায়? হাতে যে একটা পয়সাও নেই। মুগ, মটর, কলাই
যা হাতে ছিল তাতে এ পর্যন্ত হুন-ভাত কোনরকমে জুটেছে। কমলীই সব রাস
টেনে চলছে। নিড়ানির পয়সা কোথেকে পাওয়া যাবে? রবিশস্ত্রের দর
ভাল থাকলেও না হয় কথা ছিল। কলাই তো গঞ্জের মানুষ গরুকে খাওয়ানোর
জন্ত কিনেছে। মাটির দর বললেই হয়। তিন মণ কলাই বেচলে এক মণ
ধান পাওয়া যায়। বাছ-পাট উঠতে এখনো মাস দুই দেরি। এ দু'মাস হাঁড়ি
চড়বে কী ভাবে তাই-ই এক ভীষণ সমস্যা। মোড়লরা তো পাট বুনবে না
বুনবে না করেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত জমিতেই পাট বুনছে। তাদের বোন-নিড়ানো
নির্বিষেই চলছে। গঞ্জের বড় মহাজন নিতাই সাহা তাদের সহায়। হাঁ করতে
থলে ভর্তি টাকা বাড়ি বয়ে এনে দিয়ে যায় নিতাই। মরতে মরবে ছোটরাই।
দশবার গদিতে গিয়ে ধনী দিলেও দু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায় না। কি আহাশুকিই
না হ'লে সমস্ত জমি পাটের করে! আধা-আধি যদি ধনের থাকতো তাহলে
আর খাবার ভাবনা থাকতো না।...অনেক ভেবে চিন্তে ছোটরা ঋণের জন্তই ধনী
দেয় মহাজন রসিক ঘোষের কাছে। স্বদের হার একটু চড়া হলেও একমাত্র
তার কাছেই আমল পায় তারা। দেদারও রসিকের শরণাগত হতেই মন
স্থির করে।

শনিবারের হাটবার। চরের চাষী মাত্রই পণ্য নিয়ে গঞ্জে যায়। সকলে

মিলে নৌকা ঠিক করেছে। গোটা বর্ষা ওতে করেই যাতায়াত চলবে। ষার
 যেমন পণ্য তাকে সেই পরিমাণে পয়সা দিতে হবে। নৌকো ছাড়া এক পা-ও
 কোথাও ষাবার উপায় নেই। নৌকোই চলাফেরার একমাত্র সঞ্চল। দেদার
 সকালেই একটা ডুব দিয়ে হুন-পাস্তা নিয়ে বসে। বউ তাহেরা একটা পের্নাজ
 ছাড়িয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে গরম ভাত বেঁধে দিতেও পারতো তাহেরা।
 কিন্তু দেদার মত দেয়নি। এত সকালে গরম ভাত খেয়ে পোষাবে না। হাতে
 বাজারের কাজে পাস্তা খেয়ে শাস্ত হওয়াই ভাল। মেজাজও ঠিক থাকে, ক্ষিদেও
 মরে।...

পের্নাজ আর লক্ষা দিয়ে তিন খাবায় খেয়ে ওঠে দেদার। তাহেরা এক খিলি
 পান আর হুকোটা এগিয়ে দেয়। দাওয়ার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বেশ আমেজের
 সঙ্গেই হুকো টানতে থাকে ও। মেজাজটা আজ সবদিক থেকেই খুশী—
 নিভানির জন্ত আর ভাবনা নেই। গত হাটেই রসিক সম্মত হয়েছে। এখন
 টাকা ক'টা এনে কাজে লাগাতে পারলেই হয়। লোকে তো বলছে, পাটের
 দর এবার চড়া যাবে। এক সাল মন্দা গেলে তার পরের সাল ভাল না হয়ে
 যায় না। তা যদি হয় তাহলে আর ভাবনা নেই। সব ক'টা টাকা দিয়ে
 ধানের জমি করতে হবে আগে। তা হলেই নিশ্চিন্ত। পাট থেকে আসবে
 বাড়তি খরচার পয়সা—ধানে চলবে সংসার।...

দেদারকে প্রসন্ন দেখে তাহেরা হাটের সওয়ার জন্ত কর্দ পেশ করে। হুন
 আর লক্ষা এই হাটেই আনতে হবে। চাল যা আছে তাতে সামনের হাট
 পর্যন্ত চলে যাবে।

কর্দ পেয়ে দেদার আজ আর বিরক্ত হয় না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে,
 আইছা, আনন যাইব নে। আর কিচু ত লাগব না? যা কইবার একবারে
 কও। শ্রাবটায় যান আবার পিছনে ডাইকো না, শুব কামে যাইবার
 নৈচি।...

হেসে তাহেরা বলে, আনলে তো কত জিনিসই আনন লাগে। তবে হার
 আর কাম নাই। হুন নক্ষা অইলেই চলব।

গিল্লীর উত্তরে খুশীই হয় দেদার। নবীর মা হিসেবী বলেই এখনো সংসার
 চলছে। নয়তো কবে যেতো তাসের দর ঝড়ে উড়ে...

নবীর বড় আদর দেদারের কাছে। কোলের ছেলে, ছোটবেলায় বেশ
 দেখাতো ওকে। খোঁদাই করা নাক মুখ—হুটপুট। বড় হয়ে দিন দিন কেমন

যেন মেদা মেয়ে যাচ্ছে : কে দেখে বলবে পাঁচ বছরের ছেলে। ঠিক যেন বছর তিনেকের বাচ্চা। পেট মাথা ফুলে ঢোল, বুক যাচ্ছে শুকিয়ে। আর হবে না-ই বা কেন? জন্মে অবধি তো দুখ কাকে বলে চোখে দেখেনি। বড় দুঃখ হয় দেদারের নবীর দিকে চেয়ে। এতটা বেয়স হলো ভাল একটা জামাও দিতে পারলো না।...হঁকো খেতে খেতে নবীকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে দেদার।

নবী ওকে খুশী দেখে বায়না ধরে, আমি তোমার লগে যামু বাজান।

ওর দু'গালে দুটো টোকা দিয়ে দেদার বলে, কিয়ের লেইগা শাবি বাজান? আমি যে আটে (হাটে) যাই।

আমিও আটে যামু।

বুচ্চি, জিলাবী খাইবার মতলব। তা তব যাওয়ান লাগব না। আমি দুইখান জিলাবী অগ্রম নে তর লেইগা।

না, আমি তোমার লগে যামু।

তাহেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল। নবীর আবদারে ধমক দেয়, কিয়ের লেইগা শাবিরে তুই রৈত্রে রৈত্রে? কইলই না জিলাবী আনব।

মার কাছে ধমক খেয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে দাঁড়ায় নবী। আর কিছু বললে হয়তো কেঁদেই কেলবে। দেদার ওকে সাস্থনা দেয়, ন রে বাজান না। নায়ের মন্তেই শাবি তার আবার রৈত্রে কি করব। খারইরা রইলা ক্যান, ছাও না ছ্যাম্বারেরে জাইকাজা পরাইয়া?

হ, আলাদা দিয়া দিয়া তুমিই ত পোলাডার মাতা খাইলা, দেদারের উদ্দেশে মুখ ঝামটা দিয়ে প্যান্ট আনবার জন্ত ঘরের ভেতরে যায় তাহেরা।

বেলা দশটা নাগাদ পণ্য বোকাই চরের নৌকো গঞ্জের ঘাটে এসে লাগে। হাট মাত্র জমতে শুরু হয়েছে। দেদারের তেমন কিছু মালামাল নেই। ছোটবড় গোটা দশেক মিষ্টি কুমড়ো মাত্র সম্বল। ঘণ্টা ধানেরকের ভেতরেই খুচরো বেচে ফেলে। পাইকাররা অনেক রকাবেকি করেছিল। কিন্তু দেদার ওদের কাউকে বেচে নি। একে ত পয়সা কম ভাতে আবার দাম দেবে শেষ বেশান্ন। না না, ওসব বাজে ঝামেলায় আজ আর ও যাবে না। ঘা পায় নগদাই বেচবে।...দর বেশ ভালই পাওয়া গেলো। নাটা কুমড়োতে মোট দশ আনা হলো। সবচেয়ে বড়টা আর বেচলে না। ওটা হাতে করেই রসিকের বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হুন্ আর লক্ষা নৌকোয় উঠবার আগে কিনলেই হবে'খন। কিন্তু নবীর মুখখানা যে এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। বেচারি, মিষ্টি খাবার লোভেই এতটা পথ এসেছে।...পথে কান্দনী ঘোষের দোকানে বসিয়ে এক আনা দিয়ে ছুটো বড় রসগোল্লাই কিনে দেয় ওকে দেদার। পয়সায় হু'খানা করে জিলিপি তো অনেক দিনই খেয়েছে। আজ যখন এসেছে ও তখন রসগোল্লাই থাক। বেঞ্চের ওপর বসে কলার পাতায় করে একদমে রসগোল্লা ছুটো খেতে থাকে নবী। দেদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানে। নবীর খাওয়া হয়ে গেলে ওকে সঙ্গে করে টানবাজার থেকে একখানা তমহুক কাগজ কিনে ক্রত পা চালিয়ে দেয় রসিকের বাড়ির দিকে।

দুপুরের আহার শেষ করে গদির ওপর বসে তামাক টানছিল রসিক। মনে মনে হয়তো স্বপ্নের অঙ্কই আঁড়াচ্ছিল। দেদার এসে উপস্থিত হয়। কুমড়োটা মেঝেয় নামিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানায়। বড় ভাল সময় এসেছে ও। গদি একদম ফাঁকা। ভিড় হবে আবার সেই বিকেলের দিকে। ছাটুরেরা সব হাটের বেচা-কেনা শেষ করে আসবে টাকা কর্ত্ত কবতে।

কুমড়োটার আকৃতি দেখে রসিক প্রশ্ন করে, কতো দিয়ে আনলিবে দেদার ? বেশ পুরুষ্টু তো!

দেদার বলে, কি য়ান্ কন্ কত্তা! কুমড়া আবার আমরা কিনা খামু নাকি! আমাগ বাড়ির চালে ঐচে। আপনার সেবার লেইগা লইয়া আইলাম। না না না, এ তোর ভারী অগ্নায়। রোজ রোজ এটা-সেটা দিবি ক্যান্। নিয়ে যা তুই, কুমড়োর কোন দরকার নেই আমাদের, রসিকের কঠে বিরক্তির হবে।

দেদার হাত জোড় করে মিনতি জানায়, বাড়ির জিনিস হাউস (সখ করে) কইরা আনচি। গরীব বইলা যদি কিরাইয়া ছান তাইলে আর কি করুম।

ঐতো তোদের এক কথা, গরীব। বেশ, এনেছিস আজ নিচ্ছি। তবে আর কোনদিন কিন্তু কিছু আনবি নে। দেদারের মিনতিতে মনে মনে খুশী হলেও ক্লজিম আভিজাত্য বজায় রাখে রসিক। কুমড়োটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নবীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে, এটি আবার কে রে ?

দেদারের ঠোটে হাসি খেলে। লক্ষা জড়িত কঠেই জবাব দেয়, আমার ছোট ছাওয়াল, নবী। বাড়ির খেইকা বাইরনের সময় কিছুতেই পাছ ছাড়ল না।

তা বেশ—বেশ। ছেলে তো তোর খাসা হয়েছে দেখছি। কিন্তু এত রোগা করে ফেললি কি করে ?

আর কনু ক্যানু কত্তা। দিন রাইত খালি খাইব আর হাগব। আমাগো চাষার গরের (ঘরের) পোলাপানের কথা ত জানেনই।

তা কিছু ভাবিস নে। ও খেতে-নিতেই ভাল হয়ে যাবে। এক সময় সকলের ঘরের ছেলেপুলেরাই ওরকম করে। ওরে কালী, দেদারের ছেলে এসেছে। তাদের গিন্নীমাকে কিছু খেতে দিতে বল। দেদারের কথার জবাব দিয়ে ভৃত্য কালীর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে রসিক।

দেদার অগ্রস্বত হয়ে বাধা দেয়, না কত্তা, অরে আইজ্ঞ আর কিচু খাইবার দিবেন না। বাজারের খেইকা আইবার সময় কান্দনী ঘোষের দোকানে জল খাওয়াইয়া আনচি। একদিনে বেশী খাইলে প্যাট ছাড়ব।

আরে না না। বাড়ির জিনিস খেলে কিছু হবে না। তা ছেলের কি যেন নাম বললি ?

আর কত্তা, আমাগ আবার নাম ধাম ! নবী বইলাই হগলে ডাক অরে।

কেন রে, নবী তো বেশ খাসা নাম। বোস রে বাপ, দেদারকে তারিক করে নবীকে বসতে ইঙ্গিত করে রসিক।

নবী ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে এতক্ষণ চারদিকের দেয়ালের শোভা দেখছিল। কত বিচিত্র রকমের পট। পেট মোটা গণেশ ঠাকুরকে দেখে ওর তো গা ছমছম করতে থাকে। কে জানে, শুঁড় দিয়ে যদি গলায় একটা হেঁচকা টান মারে ! লকলক করছে মা কালীর টুকটুকে জিভ। ভয়ে কেমন যেন থ' মেরে গেছে বেচারী। মুখ দিয়ে একটা কথাও সরে না। দেদারের গা খেঁষে কোনরকমে চূপচাপ বসে থাকে।

কালী ইতিমধ্যে একটা বেতের কাঠার মধ্যে মোয়া, মুড়ি, মুড়কি নিয়ে হাজির হয়। পরিমাণ যা হবে তাতে শুধু নবীর একার নয়, দেদারেরও পেট ভরবে।

গিন্নীর কাণ্ড দেখে রাগে সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে রসিকের। ছোট্ট একটা বাচ্চা থাকবে, শুধু ছ'টো মোয়া পাঠালেই হয়ে যেতো। তা না, বাটি ভর্তি মুড়কি দেওয়া হয়েছে। ওদের আর কি নিজেরা তো উপার্জন করে খায় না ! পরের ধনে পোদারি সকলেই করতে পারে।...কিন্তু করা যাবে কি ? দিয়ে যখন ফেলেছেই তখন আদর আপ্যায়ন করাই ভাল। ধোলাখুলিই বলে রসিক,

নে রে দেদার, ছেলে নিয়ে খেয়ে নে। দলিলের কাগজ এনে থাকিস তো দে,
লেখাপড়াটা এই ফাঁকে সেরে নিই।

দেদার লুঙ্গির গোঁজা থেকে তমস্ককখানা বার করে। হাত বাড়িয়ে দিতে
দিতে বলে, রোজ রোজ খাওয়ান কিসের কত্তা! অরে একটা মোয়া ছান খালি।
আমি এহন কিছু খাইবার পারুম না।

রোজ আবার তোর ছেলে এল কই রে! টাটকা তিলের মোয়া, খেয়ে
দেখ, ভাল হয়েছে।

হ, গিল্লীমার হাতের জিনিস তুখার অয়। গেলো বার দিচিলেন, মনে নাই?
গতবারের চেয়েও এবার ভাল হয়েছে। আর দেরি করিসনে, খেয়ে নে।
আমি এদিকের কাজ সারি।

তা যদি কন তয় বাড়িই লইয়া যাই। হগলেই চাইখা দেখবনে।

বেশ, তবে তাই নিয়ে যা।

দেদার কাঠাসুদ্ধ মোয়া মুড়কি-গামছায় বাঁধতে যায়। নবীর মুখের ভাব
লক্ষ্য করে রসিক বাধা দেয়, ও কিরে! তুই যে সবগুলোই বেধে কেলেছিল।
ওর হাতে ছুটো মোয়া দে।

দেদার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা মোয়া নবীর হাতে দিয়ে বলে, না কত্তা এহন
হুইড়া দিলে আবার বাড়ি গিয়াও ছাড়ব না। এহন একটাই খাউক।

খব সন্তুষ্ট না হলেও নবী কোন রকম গোলমাল করে না। ছোট ছোট
দাঁত দিয়ে কচকচ শব্দে কামড়িয়ে খেতে থাকে হাতের মোয়া।

রসিক দলিল লেখায় মন দেয়। কুড়ি টাকার ঋণ পত্র। দৈনিক টাকা
প্রতি দশ পয়সা সুদ।

মোয়াটা সম্পূর্ণ খেয়ে জলের জগ্ন বায়না ধরে নবী। নিজেকে বড় অপ্রস্তুত
মনে হয় দেদারের। এখন আবার জল পায় কোথায়? বাবুদের ঘটি গেলাসে
তো আর জল খাওয়া চলবে না!...কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চূপ কর।
নায়ে গিয়া খাইচনে।

নাক ডুবিয়ে দলিল লেখা শুরু করলেও কথটা কানে যায় রসিকের। নবীকে
কিছু না বলে উল্টো দেদারের ওপরেই দাঁত খিঁচোয়, ওকে ধমকাচ্ছিলি কেন?
ছেলেমানুষ, মিষ্টি খেয়েছে জল খাবে না?

দেদার কাঁচুমাচু হসেই জবাব দেয়, নায়ে গিয়াই খাইবনে কত্তা। দয়া কইয়া
তাড়াহুড়ি একটু ছাইড়া ছান আমাগ!

খুব বুদ্ধি তো তোর! তেষ্ঠা পেয়েছে এখন আর জল থাকে দু'ঘণ্টা পরে
ঐ বদনাতে ভাল জল আছে, ছেলেকে ধাইয়ে দে, তাকের ওপরের পিত্তলে
বদনাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রসিক।

স্নানের সময় তেঁতুল আর বাগি দিয়ে নিজের হাতে বদনাটা মেজেছে রসিক
ঝকঝক করছে। একটাতেই দু'কাজ চলে যায়। নিজের শৌচের কাজ আর
খাতকদের জল খাওয়া।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলে ঢালা হুকুম পেয়েও জেমন উৎসাহ বোধ করে ন
দেদার। ওরা তো জল খায় মাটির সানকিতে আর না হয় কলাইয়ের মাসে।
কর্তা হয়তো দায়ে পড়েই বদনাটার জাত মারতে দিচ্ছেন। ইতস্ততঃই করবে
থাকে দেদার।

নবীর ঘ্যান-ঘ্যানানি বেড়েই চলে। দেদার তবু উঠে গিয়ে বদনাট
ছুতে সাহস পায় না।

রসিক আবার ধমক দেয়, কই রে, ছেলেকে জল দিলিনে?

দেদার আর বসে থাকতে পারে না। সংকোচের সঙ্গেই উঠে গিয়ে বদনাট
নামিয়ে নিয়ে আসে।

রসিক পুনরায় দলিল লেখায় মন দেয়।

জল খেতে খেতে নবী তো অবাক—এ আবার কি জিনিস! বাড়িতে
তো জল খায় কলাইয়ের মাসে। এ রকম রকমকে জিনিস তো কোনদিন
দেখিনি! মোয়ার চেয়েও অল্পত ঠেকে বদনাটা নবীর কাছে। এ জিনিসট
ওর চাই-ই। হ্যাঁ, এইটেই নেবে ও...বাপের কাছে ঘুনঘুন শুরু করে, বাজান
ইডা আমি নিমু।

ছেলের আবার শুনে দেদারের চক্ষুস্থির। বলে কি বেটা! কর্তা যে
জল খেতে দিয়েছেন এই তো ওর বাপের ভাগ্যি! উনি শুনলে ভাববেন
কি। চোখ টিপেই ছেলেকে শাস্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ভবী কুলবার নয়। নবীর বায়না বেড়েই চলে। এতক্ষণ ঘুনঘুন
করছিল এবার কান্নার স্বরেই ধ্বনি তোলে, অ বাজান, আমি এইডা নিমু।
অ বাজান...

দেদার ফাঁপরে পড়ে। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চূপ কর হারামজাদা!
ইডা কি করবি রে?

রসিক দলিল লেখায় ব্যস্ত থাকলেও নবীর আঁধার কানে পৌঁছতে বিলম্ব

হয় না। এতক্ষণ দম ধরে থেকে বদনাটার পরকাল সম্বন্ধেই শুধু ভাবছিল। না, হতাশ হবার কিছু নেই। সামান্য একটা পেতলের বদনা। বড় জোর পাঁচ সিকে ক্ষেত্র টাকা দাম। ওটা ও দিয়েই দেবে নবীকে। হ্যাঁ স্বপ্ন ত্যাগ করেই দিয়ে দেবে। মনের জোর নিয়েই দেদারকে প্রতিরোধ করে, কিরে, ওকে অতো ধমকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

না কত্তা, কিছু নয় নাই। একটু হকাল কইরা ছাইড়া ছান আমাগ, বেলা গেল।

কিছু চয়নি মানে! আমি বুঝি শুনি! তুই আচ্ছা লোক তো! ছেলে-মামুষ, সামান্য একটা বদনার বায়না ধরেছে তার জন্মই গালাগাল করছিস। নেরে বাপ, তুই ওটা নিয়ে যা, দাতা কর্ণের মতোই কথাগুলো বলে পড়ে রসিকের তরফ থেকে।

নবীর মুখে হাসি খেলে। দেদার তো ভেবেই গায় না, স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি সত্যি কর্তার মুখ থেকেই কথাগুলো শুনেছে ও। যে মামুষ হৃদের একটা কানাকড়ি ছাড়ে না সে মামুষ দামী বদনাটা দিয়ে দিচ্ছেন নবীকে।...

রসিক হয়তো দেদারের মনোভাব বুঝতে পেরেই বলে, ওরে ব্যবসা করি বলে কি আমি মামুষ নই। মায়্যা মমতা বলতে কি আমার কিছু নেই তুই বলতে চাস? আমার ঘরেও বাচ্চা-কাচ্চা আছে। ওটা ওকে আমি প্রাণ খুলেই দিলাম।

দেদার আর ভাবতে পারে না। নতুন করে যেন বেহস্তের দ্বার খুলে যায় ওর চোখের ওপর। আবেগের সঙ্গেই উত্তর কবে, আপনাগ দম্বাতেই বাইচা আচি কত্তা। ই পোলাপানও আপনাগই।

আবেগের উত্তর আবেগের সঙ্গেই দেয় রসিক, সবই তাঁর ইচ্ছা রে—সবই তাঁর মর্জি। তুই কোন দ্বিধা করিস নে, হাতে করে নিয়ে যা। ছেলেপুলে সঙ্কট হলে ভগবান সঙ্কট হন। আর এই নে টাকা কুড়িতে। এখানে একটা টিপসই দে।

দেদার বশীভূতের মতই সব করে যায়। টাকাগুলো টেকে গুঁজে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই রসিককে হাত তুলে আদব জানায়।

বাজানের দেখাদেখি নবীও হাত তোলে। বদনাটা নিজেই বয়ে নিয়ে চলে ও। ওটা আর কারো হাতে দেবে না। কিছুতেই না। এতো বদনা নয়, সাত রাজার ধন—গুপ্ত মণিক। নবীর মুখ চোখ খুলীতে ডগমগ।

রসিক উঠে এসে হাত দিয়ে ওর গাল টিপে দেয়। হাসতে হাসতেই বাপ বেটা বেরিয়ে আসে গদিঘর থেকে।

চরে ফিরে এসে বদনাটা সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতে পাকে নবী। বদনার জল ছাড়া এখন আর জল মুখে দেয় না ও। শিয়রে বদনাটা না থাকলে ঘুমোয় না। কাউকে হাত দিয়ে ছুঁতে পৰ্বস্ত দেয় না।

বৈশাখের পর দেখতে দেখতে আষাঢ় আসে। পাটের ফলন মন্দ হয় নি। আশালুঙ্গুপই প্রত্যেকে বাছ-পাট পায়। এখন দর উঠলেই সব জ্বালার অবসান। সামনেই রথযাত্রা। পাট ব্যবসায়ীদের প্রশস্ত দিন। সকলেই তৈরী হতে থাকে। মহাজ্ঞনরাও ওতপেতে আছে। চাষীর ঘরে টাকা উঠলেই নিজেদের ভাগ বসাবে! গত সন শেষ মরশুম খারাপ যাওয়ায় আদায় উল্ল কিছই হয়নি। এবার প্রথম পর্বেই সম্ভবমত টানতে হবে। তাছাড়া বাজারের কথা বলা যায় না। গাছ-পাটের দর যদি এবারও মন্দা যায় তা হলে চাষী তো মরবেই—মহাজ্ঞনও অনেকে খুলবে। সুদের লোভে অনেকেই কম হুদে নিজেদের সোনাদানা বন্ধক রেখে বেশী হুদে লগ্নি করেছে। হুদখোরদের ধরণ ধারণই আলাদা।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক তাই হলো। রথের মেলায় পাটের খরিদারই নেই। রেলি ব্রাদার্স এবারও খরিদে নামলে না। কাঁড়ি কাঁড়ি পাট নিয়ে ফিরে আসে চরের মানুষ। মহাজ্ঞনকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা নিজেদের কি দিয়ে কি হবে তাই এক সমস্যা। মাসখানেক পরেই গাছ-পাট লাগছে। কাটাই, বাছাই, ধোলাইএ খরচা কম নয়। চরের মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাগাদার ভয়ে কেউ আর ইদানীং হাটে বেরুচ্ছে না। দেড়ারও দিন কয়েক পালিয়ে চলে। কি বলবে গিয়ে ও রসিককে। বিপদে শুধু টাকাই ধার দেয়নি রসিক। স্নেহবশত নবীকে বদনাটা পৰ্বস্ত দিয়েছে। ও যে বরাবর বলে আসছে, বাছ-পাট বেচে কিছু দেবে তাকে। এখন কি উপায় হবে—ভাবনায় ভাবনায় রাজে ঘুম হয় না দেড়ারের।

দেড়ার পালিয়ে চললেও রসিক বুক ফুলিয়েই একদিন এসে চরে হাজির হয়। বেশ হুযোগই মিলেছে। দেড়ার গদিত্তে এসে দেখা করলে চরে আসতে সংকোচই হতো ওর। কিন্তু ভগবানই ওকে সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েচেন। কোলের ছেলে শিবুকে সঙ্গে করেই একদিন তোরে এসে

উপস্থিত হয় রসিক দেদারের বাড়িতে। মাত্র বছর পাঁচেক বয়েস শিবুর। বাপের সঙ্গে চরে যেতে কোন আকর্ষণই নেই ওর। কিছুতেই ও যাবে না। কিন্তু রসিক নাছোড়বান্দা, যেতেই হবে ওকে ওর সঙ্গে। বড়ের কিস্তি বড়ে দিয়েই দিতে হবে। বেটা, টাকা বদনা গিলে দিব্যি ডুব দিয়ে আছে। দেখা যাক, নরুনের বদলে নাক আদায় হয় কি না।...প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর নগদ এক আনা খরচ করে দুটো রসগোল্লা কিনে হাতে দিতেই অব্যাহা শিবু বশ মানে। দিব্যি গট্‌গট্‌ করতে করতেই বাপের হাত ধরে গিয়ে নৌকোয় ওঠে। বর্ষায় বংশী কানায় বানায় ফুলে উঠেছে। ভীষণ শ্রোতের টান। থানিকটা উজিয়ে গিয়ে পাড়ি দিতে হবে। সময় সাপেক্ষ। রসগোল্লা দুটো খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যায় শিবু। আবার নেমে যেতে বায়না ধরে। বিচক্ষণ রসিকের এ পাট জানা ছিল। বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকেই সে তাই তৈরী হয়ে আছে। রব তুলে কামার আগেই পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙাটা বার করে রসিক। শিবুর আজ পোয়াবারো। একটা না শেষ হতেই আবার একটা খাবার জুটছে। কই, বাবাকে তো এর আগে কখনো এমনটি দেখেনি ও। আজ তাহলে অনেক মজা আছে। ঠোঙাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার চাক্সা হয়ে ওঠে শিবু।

বৈরাগী খালের ঝাঁকটা ঘুরতেই দেদারের বাড়িটা সোজাহুজি নজরে পড়ে। চার পাঁচখানা খড়ের ঘর নিয়ে বাড়িটা। চারদিক জুড়ে কলাবাগান। বংশীর বৃকের ওপর যেন ভাসছে। ঘাট থেকে ভিটির ওপর উঠতেই একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কমলী। থানিক আগেই কান্দনীর লোক এসে সবটুকু দুধ নিংড়ে নিয়ে গেছে। বাছুরটা দুধের তেঁটায় বার বার বাঁটে মুখ লাগাচ্ছে। কিন্তু দুধ না পেয়ে থেকে থেকে মাথা দিয়ে গুঁতোচ্ছে। বিরক্তিতে কমলীও মাঝে মাঝে পেজের বাড়ি মারছে—পা ঝাটকা দিচ্ছে। কালো হাড় জিরজিরে বাছুর—কপালে সাদা চাঁদের টিপ। তাড়া খেয়ে ছুট দেয়।

রসিক দূর থেকেই আঙুল দিয়ে দেখায় শিবুকে। বাছুরটা দেখে শিবুরও খুব ভাল লাগে। অবাক হয়েই চেয়ে থাকে দেদারের বাড়ির দিকে। রসিক মনের ভাব বুরতে পেরে জিজ্ঞেস করে, ওটা তুই নিবি শিবু ?

হঁ, হাড় নেড়ে সম্মতি জানায় শিবু।

খুলী হয়ে রসিক বলে, তাহলে চল, আগে ওটা নিয়ে আসি।

চলো, শিবুর উৎসাহ বেড়ে যায়।

রসিক আবার জিজ্ঞেস করে, বাছুর তো নিবি, ওর মাকে নিবি নে ?

না।

না কি রে। ওর মাকে সঙ্গে না নিলে যে বাছুর তোর সঙ্গে যাবেই না।

তা হলে ওর মাকেও নেব।

বেশ বেশ। কি বলবি বল তো ?

শিবু কোন উত্তর দিতে পারে না। ক্যালক্যাল করে রসিকেব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রসিক বলে, বলবি, বাবা আমি গরু নেবো—বাছুর নেবো। কেমন, বলতে পাববি তো ?

হঁ, শিবু আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

রসিক খুশীতে গদগদ হয়ে মারিকে দেদারের ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলে।

উঠোনে বস কমলীব জগু নতুন দড়ি পাকাচ্ছিল দেদার—নৌকা ঘাটে লাগতেই আঁতকে ওঠে। রোজ এই আশংকাই কবছিল ও। কিন্তু কি করবে। এখন তো আর পালাবার পথ নেই। তাতে পায়ের ধরে যদি রেহাই পাওয়া যায়। তাতাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় দেদার। খেজুব পাতার পাটি বিছিয়ে দাওয়ার ওপর বসতে দেয়। বাড়ির ভেতবে ছোট্ট জলছাড়া বড় হাঁকোটার খোঁজে।

রসিক পেছন থেকে বাধা দেয়, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না রে দেদার। আমরা একুনি উঠবো। ও নৌকায় বেড়াবে বলে বায়না ধরেছিল, তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম।

দেদারের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। যাক, কর্তা তাহলে তাগাদায় আসেনি। কিন্তু কি দিয়ে খাতির করে খুদে কর্তাকে। ঘরে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু নেই। একটু আগে এলেও না হয় কান্দনী ঘোষের লোকের কাছ থেকে পেয়াটাক দুধ রাখা যেত। কিন্তু এখন কি করা যায়...তবু সবিনয়েই বলে, বেড়াইতে আইচেন তয় এত তড়াতিড়ি কিসের? সিদা দেই রান্না-বাগ্না করেন।

আরে না না, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না। পারিস তো এক ছিন্দু তামাক দে।

দেদার তাড়াতিড়ি তামাক সঙ্গে দেয়।

হকো টানতে টানতে রসিক জিঞ্জেস করে, রথের বাজার এবার কি রকম গেলো রে দেদার ?

•আর কত্তা কন ক্যান। বাজার আর কই। হগলেই ত পাট ফেরত লইয়া আইচে।

তবে তো দেখছি কিছুই দিতে পারবিনে।

তাই কন কত্তা, আপনাগই কি দিমু আর আমরাই কি থামু ?

কথা তো ঠিকই বলছিল, তবে তোদের সঙ্গে আমাদেরও যে মরতে হবে দেখছি।

হগলেই ইবার মরব কত্তা। চরের কেউ আর বাঁচব না।

দেখ, গাছ পাটেব দর ওঠে কি না।

আর উঠচে, আমরা মরলে যদি ওঠে।

ঈশ্বরকে ডাক, তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে। আজ উঠি রে তাহলে। কন কি কত্তা ! ছোটকত্তায় আইল, ছলা মুখে যাইব।

তোর মন যা চায় দে ওকে খেতে।

কি আর দিমু কত্তা, ধরে ত গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই নাই !

কেন রে, গুড় মুড়ি কি ধারাপ জিনিস হলো নাকি ! বাড়িতে আবার কি থাই আমরা ? ও খায় তো তাই দে ওকে।

দেদারের দুশ্চিন্তা অনেকটা হান্কা হয়ে যায়। না, কত্তার দেখছি আমাদের ওপর টান আছে। গুড় মুড়িতেও কোন রকম আপত্তি নেই, হস্তদস্ত হয়েই বাড়ির ভেতরে ছুটে যায়।

শিবুকে একা পেয়ে উস্কাকে চেষ্টা করে রসিক, কি রে, তুই বলে গরু বাছুর নিবি, কিছু বলছিস নে যে ?

শিবুর এখন আর কমলীর ওপর কোন বোঁক নেই। লাল ঝুঁটিওলা গোটা কয়েক মোরগ ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠানের ওপর দিয়ে। পাখনার রংয়ের কি বাহার। ভারি আশ্চর্য ঠেকে ওর। জীবনে কখনো এতো স্বন্দর পাখি দেখেনি। পাটি থেকে উঠে মোরগের পেছ পেছই ছুটতে থাকে। রসিকের প্রশ্নের কোন উত্তরই দেয় না।

বড় বিরক্তি বোধ হয় রসিকের। এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত সব গোলায় যাবে নাকি ? ব্যস্তমস্তভাবে পুনরায় শিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, শোন, দেদার এলে আমাকে বলবি, বাবা, আমি হান্কা নেবো, কেমন ?

না, আমি হাষা নেব না। ঐটে নেব, আঙুল দিয়ে বড় মোরগটাব দিকে ইঙ্গিত করে শিবু!

রসিক বেকায়দায় পড়ে দাঁত খিঁচোয়, উঃ, ঐটে নেব! ওটা দিয়ে কি হবে রে হতভাগা? হাষা নে দুধ খেতে পারবি।

না, আমি হাষা নেব না, জেদ বেড়ে যায় শিবুর।

রসিক আব বৈধ বাখতে পারে না। চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর বাঁ গালে।

শিবু ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

কি অইল, কি অইল, বলতে বলতে দেদার হস্তদস্ত হয়ে ফিরে আসে।

মোরগগুলো তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়। শিবুও কঁাদতে কঁাদতে পেছ নেয়।

হাসতে হাসতে দেদার মস্তব্য করে : ওয়া ত আরনারা ছুইবেন না কত্তা। নইলে ত এহনি একটা ছাড়াইয়া দিবার পারি!

রসিক স্বেযোগ বুঝে নাক সিঁটকায়, বামচন্দ্র রামচন্দ্র। এটা কি একটা কথা হলোরে! নে, আর দেরি করিস নে। কি আনবি আন।

না কত্তা, আর দেরি অইব না। বাড়া অইয়া গেচে। আমি যামু আব আমু, দেদার আবার ছুটে বাড়ির ভেতবে যায়।

ফাঁক বুঝে রসিক শিবুকে পুনরায় ধমকাতে থাকে, কি রে হাবামজাদা, হাষার কথা বললি নে যে?

না, আমি হাষা নেব না, শিবু অচল অটল।

ফের বজ্জাতি হতভাগা! আবার একটা চড় বসিয়ে দেয় রসিক শিবুর গালে।

শিবু আবার ডুকরে ওঠে।

দেদার নতুন একা এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে করে কিছু গুড় মুড়ি নিয়ে দৌড়ে আসে। ভাগিস্ রথের মেলা থেকে বাটিটা এনেছিল তাহেরা! তা না হলে কিসের মধ্যে খেতে দিতো ছোট কর্তাকে। দেদার এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেও শিবুকে কঁাদতে দেখে ফাঁপরে পড়ে। বিশ্বয়ের সঙ্গেই রসিককে শুধায়, আবার উনি কান্দে ক্যান কত্তা।

ওর কথা ছেড়ে দে। কত করে বারণ করলাম নৌকোয় বেড়িয়ে কাজ নেই। তা কে শোনে। এখন আবার এটা চাই, ওটা চাই, যত সব-বামেলা।

কি চান উনি?

সে তোকে বলা যাবে না। এখন কি এনেছিল দে, গিলুক।
দোহাই কত্তা, অল্পার কিরা লাগে। কন, উনি কি চায় ?
তুইও কি ক্ষেপে গেলি নাকি! ছেলেপুলের কথায় কখনো কান দিতে
আছে ?

তা হউক। আপনে কন, কি উনি চান ?

আরে চাবে আবার কি ! তোর ঐ গকটা নাকি নেবে বজ্জাতটা।

দেদারের মাথায় ঘেন সহসা আকাশ ভেঙে পড়ে। হায় হায়, কি সর্বনাশের
কথা ! কমলীই তো সংসারের একমাত্র লক্ষ্মী। ও আছে তাই এখনো
উপোস দিতে হচ্ছে না। ষড়যন্ত্র...সব ষড়যন্ত্র। বাপ বেটায় ষড়যন্ত্র করেই
কমলীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।...বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে দেদারের।
সহসা চোখ পড়ে সামনের ঘরের দাওয়ার ওপর। সূর্য কিরণে ঝকঝক করছে
বদনাটা। নবীর আঙ্গুর মতো আজো তেঁতুল আর বালি দিয়ে যন্ত্র করে
মেজেছে তাহেরা। দেদারের দু'চোখ বোধ হয় অন্ধ হয়ে যায়।

রসিক ওর মনের কথা বুঝে ক্লজিমভাবে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে—কই রে,
হাঁ করে বে দাঁড়িয়ে রইলি। কি দিবি দে, বেলা হয়ে যাচ্ছে না !

দেদার মুড়ির বাটিটা শিবুর হাতে দেয়। শিবু বাটি হাতে করেই মোরগের
পেছ পেছ ছুটতে থাকে। নিজে এক মুঠো মুখে দিলে তিন মুঠো ছিটিয়ে দেয়
মোরগের দিকে, কমলীর দিকে জক্ষেপও নেই। মোরগ নিয়েই মেতে ওঠে।

সাদাসিধে বুদ্ধি হলেও সবই বুঝতে পারে দেদার। এ চাল রসিকের
নিজেরই। বদনা দানের কথানি হাড়ে হাড়ে বার করছে। কিন্তু—কি আর
করা যাবে। শকুনির দৃষ্টি এখন পড়েছে তখন দিতেই হবে। গত সনের টাকা
স্বদে-আসলে জমেছে। এবারও কম হবে না। টান দিলে যে কোনদিন সব
কেড়ে নিতে পারে। কমলী তো দূরের কথা চাল-চুলো পর্যন্ত থাকবে না।
তবু যদি ক্ষুধিত দানবকে কিছু দিয়ে-থুয়ে সময় পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে
বলে, কত্তা, আপনাগ দিবার পারি এমুন কি আচে আমাগ। তাই বইলা
পেরথম দিন বাড়ি আইহা ছোট কত্তা সামান্ত এক জোড়া গরু বাছুরের বায়না
ধরচে পরাণ খুইলা তাই দিবার পারুম না। দোহাই কত্তা, কমলীরে আপনার
নেওয়নই লাগব...

তুই কি সত্যি ক্ষেপে গেলি দেদার ?—রসিকের কণ্ঠে বিশ্বয়ের স্বর।

দেদারের ইচ্ছে হয় শব্দতানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

কিন্তু পারে না। অতিথির সম্মান রেখেই অস্থরোধ করে, কস্তা, গরু আপনাগ কাছে সাক্ষাইত ভগবতী। আপনাগ কাছে অর অযত্ন অইব না। আমি বলে কইরা খাওয়াইবার পারচিলাম না অরে। দয়া কইরা লইয়া যান!

কি যা তা বলছিস তুই। আমি চললেম, উঠে দাঁড়ায় রসিক।

একটু খারন কস্তা, আমি অরে লইয়া আহি, দেদার আর উত্তরের অপেক্ষা না করে কমলীর দিকে ছোটে।

কিন্তু সফল হওয়ায় রসিক রসিয়ে রসিয়েই হুকো টানতে থাকে।

বাছুরটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাকাতে লাকাতে কলা-বাগানে ঢুকেছে। দেদার—‘হাসা আয়...হাসা আয়,’ ডাকতে ডাকতে গিয়ে থপ্ করে ধরে ফেলে। নতুন একগাছা পাটের দড়ি পরিয়ে দেয় গলায়।

উদগত অশ্রু অররুধ রেখেই কমলীকে নৌকোয় তুলে দিতে যায় দেদার। নবী তাতেরা দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বদনাটা নৃষ কিরণে তেমনিই জ্বলে। পথে বেতে যেতে হাসা লাফরাঁপ শুরু করে। কমলী ঘাড় বাঁকা করে গৌজ হয়ে থাকে। দেদার জোর করেই টানতে টানতে এগিয়ে যায়। পাঁজরার হাড়গুলো এক এক করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন ওর। শিবু মোরগের জগ্ন আছড়া-আছড়ি করতে থাকে। রসিক টানতে টানতেই ওকে নিয়ে নৌকোয় তোলে। হতভাগা নাক কাটালে আজ।

নৌকোয় ওঠার আগে লাফরাঁপ দিতে শুরু করেছিল কমলী। কিন্তু নৌকোয় উঠে কেমন যেন খিতিয়ে পড়ে! বড় বড় চোখ তুলে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দেদারের দিকে। ক্ষোভে দুঃখে দেদারও মুখে পড়ে। হালে চাড় দিয়ে নৌকো ছেড়ে দেয় মাঝি। স্রোতের টানে দেখতে দেখতে বাঁকের মোড়ে মিলিয়ে যায়। উদগত অশ্রু অঝোরে ঝরতে থাকে দেদারের হুঁচোখ বেয়ে। বংশীর অতো জ্বলেও বোধ হয় তার পরিমাপ হয় না।

॥ ৩০ ॥

চরের মাগ্নয়ের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পলান, দীঘ, করিমের ভাবনার অন্ত নেই। হুঁহাতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাটের দর গত সালের চেয়েও এবার মন্দ। শেষ পর্যন্ত কোন বিদেশী ক্রেতাকেই বাজারে দেখা যায়নি। আপান বোধ হয় পানিতেই ডুবে মরেছে। নিতাইয়ের কাছে সকলে মিলে

গিয়েছিল একদিন। সর্বনাশের জন্ম মুহূ অমুযোগ জানাতে ছাড়েনি। কিন্তু হলে কি হবে, এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে নিতাই। তার কি দ্বাধ। কাগজে যা দেখেছিল তাই সে জানিয়েছিল মাত্র। বাজার তো আর তার হাতের মুঠোর মধ্যে নয়। কাজ কারবারের কথায় কে আবার নিশ্চয়তা দিতে পারে! সম্ভাবনা ছিল তাই জানিয়েছে।...

সকলে মিলে নিতাইকে ছ'কথা শোনাতে গিয়েছিল উন্টো নিতাই-ই দলকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে! শুধু নিজের পক্ষে সওয়ালই করেনি। টাকার তাগিদও দিয়েছে। বছরের পর বছর কৈকিয়ত শুনে তার পেট ভরবে না। স্বদে-আসলে সমস্ত টাকাই তাকে শোধ করে দিতে হবে।

সহানুভূতি লাভের আশায় দুটো স্বধ-দুঃখের-কথাই একে বলতে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সহানুভূতির পরিবর্তে পেয়েছে তিরঙ্কার। ক্ষুধার কুটি চেয়েছিল ছটেছে প্রস্তর-খণ্ড। বরাত ধারাপ, কিছু বলার নেই। টাকা ধার দেবার জন্ম যে মানুষ চিরকাল চেষ্টা স্বত্ব করে এসেছে সেই মানুষই আজ বেপরোয়া। তাগাদা মুহূ হলেও তার ভেতরেই ওর হিংস্ররূপটি ফুটে উঠেছে। পলান নিজেকে বড় স্বপমানিত বোধ করে। গোলায় যা পাট আছে তা বেচে আসল না হোক স্বদের টাকা টেনেটুনে হয়ে যায়। নিতাই মুখে যাই কেন বলুক না স্বদ পেলে আবার সব ভুলে যাবে। ওরা তো ছারপোকাকার জাত। অস্থিচর্ম চায় না। শুধু প্রাণের রসটুকুই ওদের কাম্যা। অস্থিচর্ম নিয়ে যে যেভাবে পার বেঁচে থাক— শুধু রসটুকু মুগিয়ে যেনো। আসলে প্রয়োজন নেই, স্বদ পেলেই যথেষ্ট। পলান ভাবে, এখনকার মতো তাই দিয়ে দেবে। তারপর খেয়ে না খেয়ে আর এক কিস্তিতে আসলও। যদি কসল থেকে না পারা যায় তাহলে পরিমাণ মতো জমি বেচেই ঋণ মুক্ত হবে। ওসমান বয়সে ছোট হলে হবে কি, ঠিকই বলেছিল। দশ জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া কিছুটা কালির আঁচড়ও পেটে আছে। হারপোকাদের চিনতে ও ঠিকই পেরেছে। কি থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্য হাজার চারেক টাকা স্বদে-আসলে এখন নাকি দশ হাজারের ওপর দিতে হবে। ব্যাঙ্কের ছাতাই যেন কনকনিয়ে বাড়ছে দিনকে দিন। মনের বাসনা ওসমানকে খুলে বলে পলান। কিন্তু না, ওসমান কিছুতেই রাজী নয়। সমস্ত টাকা দিয়ে দিলে নিজেকে চলাবে কি করে। ধান তো ঘরে কিছুমাত্র :ই। সমস্ত কিনে খেতে হবে। তাছাড়া এত মোটা স্বদ কেন দেবে নিতাইকে? আইনে এত চড়া স্বদ আদায়ের রীতি নেই। সন্দের রোহিনী মুক্তার আইন

খেটেই পরামর্শ দিয়েছেন।...ওসমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দেয়, সাজী মশয়রে কও গা, টেকা যদি ঘরে নিবার চায় তাইলে স্বপ্ন ছাইড়া ছাওয়ন লাগব। নইলে একটা ফুটা পয়সাও ঘরে যাইব না। হাগ মতন মাইনঘেরে কেমন কইরা টিট কবন লাগে তা আমি শিকা আইচি (শিখে এসেছি)।

পলান সাদাসিদে মাছুষ। ওসব বোরপ্যাচ বোঝে না। টাকা ধার করেছে টাকা শোধ দেবে। এতে আবার শেখা-শেখিব কি আছে!...একটু বিরক্ত হয়েই ওসমানকে শুধায়, কি আবার শিকা আলিরে ?

ওসমান মনের উল্লাসেই মস্তব্য করে, শিকচি—শিকচি। ও হালা স্বপ্ন-খোররা যদি কতা না হোনে তাইলে একটা পয়সাও হালারা চরের খেইকা পাইব না।

আগে শিকচ্ কি তাই ক না, বিরক্তিতে খেঁকিয়ে ওঠে পলান।

ওসমান বলে, এমুন কিচু না। বুজাইয়া কইলে তুমিও বুজবার পারবা। হালারা যদি স্বপ্ন না ছাড়ে তাইলে সমস্ত ক্যাত খামার আম্মাজানের নামে বেনামী কইরা কালাও। দেখি কি করবার পারে।

তুই কচ্ কি ওসমান! তিনকাল গেচে এককাল আচে এই বলসে বেইমানী করুম! করাল কইরা টেকা আনচি, না দিলে কি ধম্মে সইব? ও কথা আব মুখে আনিচ না। নোকে (লোকে) হনলে মুখে থুথু দিব।...

ওসমান তবু নিজের গৌ ছাড়ে না। জোর দিয়েই বলে, নোকের (লোকের) মুখের কতায় কি ঘাইব আইব আমাগ। টেকা থাকলে হগলের মুখই বন্দ করন যাইব। আর তা না অইলে.....

মুখের কথা শেষ হয় না ওসমানের পলান গর্জে ওঠে, চূপ থাক হারামজাদা। অমুন বেইমানীর কতা আমার সামনে কইচ না। আমি কারুর মাখায় বাড়ি দিবার পারুম না।

না পার না পারবা। বেইচা কিনা সব দিয়া থুইয়া মাইনঘের দুয়ারে দুয়াবে মালসা লইয়া মাগগা, সমতা রেখেই জবাব দেয় ওসমান।

মালসা লইয়া মাগুম ক্যারে। খোদায় আমারে হাত-পাও দেয় নাই? দরকার অন্ন খাইটা থামু।

হ, ষাটলেই এত বড় সংসার চলব। ক্যান, তখন বে কইচ্চিলাম, দেনা কইরা রাজা উজীর অইবার কাম নাই। হা কতা হনচিলা ?

রাগের মাখায় ওসমানের গালে একটা চড় বসিয়ে দিতেই ঘাচ্ছিল পলান।

বিন্দু কি জানি কেন, শেষ পর্যন্ত তা পারে না। গলার স্বর কতকটা ধাদে নামিয়েই বলে, আমি ভগ্ন বালোর লেইগাই সব করচিলামরে; খোদায় আমার মুক রাখল না।

হের লেইগাই ত কই, ও হালারা যেমন কুকুর অগ লেইগা তেমন মুক্তরের ব্যবস্থা কর! কও ত আমি রুহিনী মুক্তারের লগে কতা কই।

না না না, অমন কতা মুকে আনিচ না। ছল-চাতুরী কইরা কি খোদার কাছে ঠেকুম, পলান দূতভাবে বাধা দেয়।

অভিমান ভরে ওসমান বলে, তবে মর, আমি আর কি করুম!

সত্যি, করার বোধ হয় আর কিছু নেই। সোনার সংসারে অলস্বীর বাতাস লেগেছে। সবই হয়তো উবে যাবে। পলান চোখে মুখে অন্ধকার দেখে।

দীহুর অবস্থা আরো শোচনীয়। সংসারের আবিলাতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। টাকা-কড়ি জিনিসপত্রে কল নেই। তাছাড়া আধা-আধি পাট আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় মড়ার ওপর খাড়াব ঘা পড়েছে। দর মন্দা বলে সমস্ত পাট মাচার ওপরে মজুত করা ছিল। কি করে যে আগুন লাগলো ভাবাই যায় না। আর একটু হলে পাট তো সম্পূর্ণই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো সঙ্গে ঘর-দোর পর্যন্ত। শনির কোপই পড়েছে। নয়তো এমন হবে কেন। বাকি পাট বেচে এখন আর একটা পয়সাও মহাজনকে দেওয়া যাবে না। না খেয়ে থেকে মানুষ কি করে ঋণ শোধ করতে পারে।...ভাবনায় ভাবনায় কাঁচাপাকা চুলের সব ক'গাছাই দিন দিন সাদা হয়ে উঠছে দীহুর। কুসুমের মনেও শাস্তি নেই। তা হলে কি ক্যাস্তর কথাই সত্যি! ময়না অপয়া। বাড়িতে ওর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে।...সারাদিন মুখভার করেই থাকে কুসুম।

আহ্লাদে আহ্লাদে মানুষ ময়না। শান্তডীর মুখ চোখের দিকে চাইতেও কেমন যেন ভয় করে ওর। আভাষে ইঙ্গিতে হলেও সব কথা বুঝতে ওর বাকি থাকে না। ওকে বিয়ে করেছে বলে নিশির আদর-যত্নও যেন দিন দিন কমছে। পার্বতী তো পারলে পাশ কাটিয়েই চলে। ওর ছেলেকে ছুঁতেও দিতে চায় না ওদের স্বামী স্ত্রীকে। একমাত্র বাড়ির কর্তা ঠিক আছে বলে মুখ ফুটে এখনো কেউ কিছু বলতে পারছে না। শান্তডীর তাড়নায় এর ভেতরেই তো হাতে গলায় গণ্ডা কয়েক মাছলি উঠেছে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে?

দুর্গার মনেও স্বপ্ন নেই। ঋণের জ্বালা তো আছেই তার ওপর ঘরেব কোণের কুটুমও কম জ্বালাতে শুরু করেছে না। মাঝে মাঝেই মেয়ের জন্ম খোঁটা মনেতে হয় ওকে। ক্ষেপ্তি তো এক কথাকে দশখানা করে এসে লাগাচ্ছে। কি আর করা যাবে। কপাল যখন পুড়েছে তখন সবই সহ করতে হবে। বাম-কান্ডর মনে কি আছে তাও বোঝা যায় না। এত সাহস ভরসা দিয়েছিলেন এখন রীতিমতোই ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। দিন দিন বড় উদাসীন মনে হচ্ছে ভট্টচার্যকে। সাধলে এখন আর তামাক পর্যন্ত খান না। কুমাব বাহাদুরকে কোন কিছু বলতে বললেও সোজা কাছারি আর গানবোট দেখিয়ে দেন। একটুও বুঝতে চান না, চুপি চুপি কর্ত্ত নেওয়া হয়েছে। কথাটা কানে গেলে বৈরাগীর কাছে মুখ দেখানো যাবে না।...সংসারে সকলেই মবে বেঁচেছে, একা যত দায় হয়েছে ওরই বেঁচে থেকে।...ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ভাল কবে ঘুমোতে পারে না দুর্গা।

নিতাই বসে সেই। তলায় তলায় মাকড়সাব জাল বুনেই চলেছে। কানায়ুযায় ওসমানের মতলবটা কানে আসতেই তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। এতদূর স্পর্ধা! হেলে চাষা আমাকে চায় বক দেখাতে! আচ্ছাবে আচ্ছা, টের পাবি। আব দুটো দিন সবু কর। তাহলেই বুঝতে পারবি, চাষার বুদ্ধিই বুদ্ধি না এই শর্মার বুদ্ধিই বুদ্ধি। যেমন বুড়ো আঙুল দেখাবার মতলব আঁটছিল তেমন ভিটেমাটি থেকে ঘাড় ধরে নামাবো তবে আমার নাম নিতাই সা। না, আর তায়-তাগালা নয়। চবেও আর নয়। নিতাই কাগজপত্র সোজা পাঠিয়ে দেয় অবনী উকিলের কাছে। তিলমাত্র ফাঁক রাখা হবে না। সমন নোটিশ চেপে এক তরফা ডিক্রি করতে হবে। তারপর সোজা ঢোল শহরৎ। না না, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো চলবে না। যেভাবেই হোক, ছরধরার ঐ শস্তভাণ্ডার পেতেই হবে। মা লক্ষী তো একরকম হাতের মুঠোয় তুলেই দিয়েছেন ওকে। এখন সামান্য একটু কোঁশল মাত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্ত্রেই আছে, বীর-ভোগ্যা বহুধরা। ষোগ্যা বস্ত্রের জন্তই ধন-দৌলত—সংসার। মূর্খ কিংবা দুর্বলের ঠাই নেই এখানে।... নিতাই মনে মনেই গর্জে ওঠে। মহাভারতের শকুনিই এসে ভর করে মগজে।

অত্রানের সকাল। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। চরধরার গাছে গাছে শিপির বিন্দুর বলক। সাকিনা বাসি হাত-মুখ ধুয়ে কাঠের উত্তন জ্বলে কেনাভাত

চাপিয়েছে। ছেলেরা কেউ ঘুম থেকে উঠেছে, কেউ ঘুমুচ্ছে। পলানের শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। রোজ বিকেলের দিকে জ্বর হচ্ছে। খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসে, ভোর রাত্রে ছেড়ে যায়। এতদিন ভাতই খাচ্ছিল, আজ দুদিন কিছুই মুখে দিতে পারছে না! খেতে বসলে ঠেলে বমি আসে। দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে শরীরটা। সারা রাত ঘুম হয় না। ঋণ আর রোগ অবিরত ছল ফোটাতে থাকে। বুঝি বা পাগল হয়ে যাবে ও। রাত পোহালে হাড়ি ভর্তি ভাত চাই। একবার নয় দিনে চারবার। পাট বেচে একটা পয়সাও নিতাইকে দেওয়া যায় নি। খেতে পরতেই সব উবে যাচ্ছে। নেই বলতে একটা পয়সাও রুজি-রোজগার নেই। ওসমান গণি টাকার অভাবে ঠায় বসে আছে। ধান চালেব কিস্তি বন্ধ। গস্তি ছুটো ঘাটে পড়েই পচছে।...

উহুনে কাঠি ঠেলেতে ঠেলেতে হঠাৎ ক্ষেতের দিকে চোখ পড়ে সাকিনার। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ—কুয়াশাচ্ছন্ন। এখনো মৃগ কলাইয়ের ডগা সবুজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অতোগুলো লোক ওখানে কি করছে! ঢোল, বাজছে কেন? বিস্ফারিত চোখেই চেয়ে থাকে সাকিনা সোনামুখী ক্ষেতের দিকে। লোকগুলো যে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাইক পেয়াদা পুলিশও রয়েছে সঙ্গে। তবে কি সর্বনাশই শুরু হলো! কাঁপা গলায় চেঁচাতে থাকে সাকিনা, ওরে, তরা ওঠরে। অ ওসমান, অ গণি, তড়া তড়ি ওঠে। ছাখ, ক্যারা ঘান সব আইবার নৈচে। ওঠে।

চোঁচামেচি শুনে ওসমান, গণি, কেবামৎ লাফ দিয়ে বাইরে আসে। কজলুল কাশেম ঘাটে গিয়েছিল ওরাও ছুটে আসে। সারা রাত ছটকট করে ভোরের দিকে পলানের দু'চোখ বুজে এসেছিল। পলানও লাফ দিয়ে উঠতে যায় কিন্তু পারে না। মাথা ঘুরে বিছানার ওপরেই পড়ে যায়। সাকিনা ছুটে গিয়ে দু'হাতে ওকে আগলে ধরে।

ঢোলে কাঠি দিতে দিতে আদালতের লোক ততক্ষণে বাড়ির ওপর এসে পড়ে। নিতাই নিজে আসে নি। তার বদলে এসেছে গোমস্তা ননীমাধব। মূলের চেয়ে শিকড়ের কড়কড়ানি বেশী। ননীমাধবের যেন আজ চৈত্রোৎসব। একবার ছুটে এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে। দেখে দেখে ওসমানের মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে। একবার ভাবে, ছুটে গিয়ে বলমটা নিয়ে আসে। এতবড় স্পর্ধা নইনা চোরার! শালাকে না হাটে বাজারে সকলেই

চোরা বলে ডাকে। দুদিন নিতাই সার গদিত্তে তামাক সাজ্জার কাজ পেয়েছে না, শালার ভবের ভাত উঠিয়েই দিতে হবে।—তিড়িং করে লাক দিয়ে শোবাঃ ঘরে ঢোকে ওসমান।

গণি একটু স্থির বুদ্ধির মানুষ। ব্যাপারটা বুঝতে আর্দো দেরি হয় না লজ্জায় অপমানে ওর কান মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের অক্ষমতা কথা বুঝে দাঁতে দাঁত চেপেই সব সহ করে যায়।

নিতাই হুচতুর। জীবন নাশের ভয়ে কিংবা চক্ষু লজ্জায় নিজেকে সজ্জ আসেনি কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্তার কিছুই ত্রুটি রাখেনি। বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে সারাসরি পুলিশের সাহায্য নিয়েছে। টাকায় সবই হয়। এখন বাবা দিতে যাওয মানে ভোপের মুখে এগিয়ে যাওয়া। গণিও ওসমানের সজ্জ সজ্জ লাক দিয়ে ঘরের ভেতরে যায়।

এক হাতে বল্লম ও আর-এক হাতে ঢাল নিয়ে বেবিয়ে আসছিল ওসমান, গণি শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরে ওর।

ওসমানের রাগ চরমে উঠেছে। বল্লমের একটা খোঁচা শেষটায় না গণি তল পেটেই পড়ে। কিন্তু গণিকে ঢিল দিলে চলবে না। ওসমানের বউও এসে সাহায্য করে। দু'জনে ধস্তাধস্তি করে হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় ঢাল আব বল্লম। রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে ওসমান। দশ হাজার তিনশ' টাকার ডিক্রি। কিছু দিয়েই কিছু করার নেই। ঘোষণা না কবেই যুদ্ধে দুর্ধ্ব ফৌজ পাঠিয়েছে নিতাই। আত্মসমর্পণ ছাড়া গতাস্তব নেই। মাথা নীচু করেই হাঁপাতে থাকে ওসমান।

ওদিকে পলান টেঁচাতে থাকে, কইরে, তরা সব গেলি কোনহানে? আমাবে সাজী মশর কাছে নিয়া যা না। দুইজা দিন সময় দেউক আমারে। আমি ছাব টাকা হুন্দে-আসলে সব দিয়া দিমু! অ গণি, অ ওসমান, ইদ্বিগে আয় না?

গণি ওসমানের আসার আগেই ননীমাধব তেড়ে আসে, আর কারো এসে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বেরবে তো বেরোয় মিক্রা।

ননীর আচরণে পলানের বুদ্ধের রক্ত টগবড়িয়ে ফুটে থাকে। হাতের কাছে একটা জলের মাস ছিল, ইচ্ছে করে ছুঁড়ে মারে চোরার মুখের ওপর। তবু নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে করুণভাবেই জিজ্ঞেস করে, সাজী মশর আছে নাই পাল মশর?

ননী স্বভাবহীনভাবেই দাঁত খিঁচোয়, কেন, সাজী মশর কি তোমার

কেনা গোলাম যে ডাকলেই হাজির হবেন? মিঞা, তাড়াতাড়ি বেরুবে তো বেবোও নয়তো ঘাড় ধরে বার করার ব্যবস্থা করবো।

কি কলি বেইমান... অসমাপ্ত কথা আব সমাপ্ত করতে পারে না পলান।
উত্তেজনায় মুছা যায়।

সাকিনা ডুকরে ওঠে।

ওসমান, গণি, কেরামৎ দৌড়ে আসে ও ঘর থেকে। বউরাও সব আসে। কাশেম ফজলুলকে আগেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে পুলিশ। ওরা দটি বাটি নিয়ে টানাটানি করছিল। ওরা আর আসতে পারে না।

পলানের অবস্থা দেখে সকলের চোখ দিয়েই জল গড়াতে থাকে। সাকিনা আঁচলে মুখ ঢেকে বিলাপ করেই কাঁদতে থাকে। মাকে সাম্বনা দেবার মতো কাবো মুখে কোন ভাষা নেই। ঘৃণা হলেও নাজিবের প্রাণেই কিঞ্চিং অল্পকম্পা জাগে। ননীমাধবের বাড়িবাড়ি দেখে কবেই এক চোট ধমকে দেয়। বেগতিক দেখে চোবা কিছুক্ষণ মুখ বুজেই থাকে।

নাজির গণিকে লক্ষ্য করে সহানুভূতির স্বরেই বলে, আমি বেশীক্ষণ সময় দিতে পারব না ভাই। তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বার ব্যবস্থা কর।

ভরসা পেয়ে গণি হাত জড়িয়ে ধরে নাজিরের, বাবু মশয়, দয়া কইরা একটা দিন সময় ছান। টাকার যোগার আমরা করবার পারুম।...

উত্তরে নাজির বলে, আইনের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা ভাই। আমি তোমাদের জগ্ন কিছুই কবতে পারব না।

আপনার পায়ে পড়ি বাবু মশয়। বাজান ফিট অইয়া পড়চে। দয়া কইরা একটা দিনের সময় আমাগ ছান, গণি আবার হাতজোড় করে।

ধরা গলায় নাজির বলে, তোমাদের বিপদ আমি বুঝতে পারছি ভাই। কিন্তু কিছুই করতে পারব না। সঙ্গে যে খেঁকী কুকরটা রয়েছে, ননীমাধবের দিকে ইঙ্গিত করে নাজির।

না না, ননীর মতো ইতরের কাছে কোন অল্পরোধ উপরোধ চলে না। বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে ওরা। ওসমান দীর্ঘশ্বাসে কেটে পড়ে, বাবু মশয়, তাইলে গাছতলাই বাইর কইরা দিলেন আমাগ ?

রুদ্ধ আবেগে নাজির উত্তর করে, কি করব ভাই, আমি আদালতের গকর।

একে একে সকলেই বেবিয়ে যেতে থাকে বাড়ি ছেড়ে। বৃড়ী বটের

ছায়াই এখন একমাত্র সফল। তারপর যদি চরের কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। একটা খাটিয়ার ওপর শোয়ানো অবস্থাতেই পলানকে ধরাধরি করে বার করা হয়! বেচারা, চেতনা থাকলে হয়তো কিছুতেই বার হতে চাইতো না। সাকিনা হাঁপাতে হাঁপাতেই পেছন নেয়। ভাতের হাঁড়িটা উম্মনের ওপর ফুটছিল। কে যেন একটা বাঁশ মেরে ভেঙে দিয়েছে। চার-দিক থেকে কাক, চিল, কুকুর, বেড়াল হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। পলানের সোনার সংসার মুহূর্তে অশানে পরিণত হয়। ননীমাধবের ইন্ধিতে ঢোলে কাঠি পড়ে—ডুম্ ডুম্ ডুম্...

॥ ৩১ ॥

পলান ব্যাপারীকে আশ্রয় দিতে চরের অনেকেই এগিয়ে আসে। চরফুট নগর থেকে দীঘু করিমও পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পলানের কারো আশ্রয়ই আবশ্যিক হয় না। মুছা ভাঙলেও ভাল করে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। জরের বিকারে থেকে থেকেই চিংকার করতে থাকে, আমার বল্লম, আমার বল্লম কোথায়? বেইমান, সব বেইমান...

চক্ৰিশ ঘণ্টা বুড়ী বটের ছায়ায় কাটিয়ে পরের দিন ভোরে দেখ ভ্যাগ করে পলান। সাকিনা আর গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে না। পলান বোধ হয় ওকেও সন্দেহ করেই নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দাঁত লাগছে হতভাগিনীর। সোনার সংসার, প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তছনছ হয়ে গেলো। ওসমান গণি ভেবে পায় না, কি করবে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এতকাল পলান ছিল বট গাছের মতোই ওদের মাথার ওপর। যত ঝড়-ঝাপটা ওর ওপর দিয়েই গেছে। ওরা সকলে ছিল নিশ্চিন্ত। হুকুম মতো কাজ করেছে, বাকী সময় ফুঁটি অধ্বলিত করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো তাদের ঘরের মতোই সে বটবৃক্ষ ঝড়ে ভেঙে পড়লো। এখন আর কে দেবে আশ্রয়—আশা ভরসা। পাশার ছকে হেরে পঞ্চপাতালের মতো বনবাসে ধেতে হবে ওদের। এখন সব চেয়ে মুশকিল হলো মৃত পলানকে নিয়ে। কোথায় ওকে ওরা গৌর দেখে। নেই বলতে যে নিজস্ব এক চটাক জমিও নেই। নর-রাক্ষস এক খাবায় সব গিলে খেয়েছে। চরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূঁইয়ার আজ সামান্য সাড়ে তিনহাত পরিমিত জমিও জুটছে না। হয়তো এত বড় একজন মামী লোকের দেহ ধলেশ্বরীক

জলেই ভাসিয়ে দিতে হবে। সামান্য সংকারটুকু পর্যন্ত হবে না।... দু'চোখ
 চলছিলিয়ে ওঠে পাঁচটি জোয়ান ছেলের। শোকের চেয়ে লজ্জাই বেশী।
 পলানের খন রয়েছে ওদের শিরা-উপশিরায়। হাত পেতে কারো কাছে
 ভিক্ষা চাইতে ওরা পারবে না। দীহু করিম হাজারবার বলেও রাজী করতে
 পারে না। বলে কি মোড়লরা, চরধল্লার বাদশা ধাবে চরফুটনগবের মাটি নিতে।
 না না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না। ওসমান জমির খোঁজেই বার হয়।
 চরধল্লার মানুষ যদি দয়া করতে চায় ওদের তবে এই দয়া করুক, যাতে ওরা
 উচিত মূল্যে একফালি জমি পায়। বউদের গঠনা বেচেই জমির দাম শোধ
 করবে। তবু পারবে না কারো কাছে হাত পাততে কিংবা দলেধরীর জলে
 আকাজানকে ভাসিয়ে দিতে।...

অনেকে অনেক পরামর্শই দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতিভাট্ট রহমানের
 কথাটাই মনে ধরে ওদের। বূড়ী বটের ছায়া-শীতল পীরতলাতেই গোর দেওয়া
 হোক মোড়লকে। ও গাছ তো মোড়লই একদিন নিজের হাতে লাগিয়েছিল।
 কম করেও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। ছোট্ট চারা শাখা-প্রশাখায়
 বিশাল এক মহীরুহ এখন। ঘুরতে ঘুরতে কোথেকে এক পীর এসে আশ্রয় নেন
 ছায়া-শীতল তরমুলে! বড় নির্ভাময় জীবনধাপন করতেন পীরসাহেব।
 পলানের হৃদয় গলে যায়। বিধা দুই জমি লিখে দেয় ও পীরের নামে।
 চরের মানুষ আপদে-বিপদে পীরের শরণ নেয়। জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুঁকে
 জমে ওঠে আসর। বটতলা—পীরতলায় পরিণত হয়। পীরসাহেব আজ
 আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর আসনের কাছে আজো মানুষ প্রতি সন্ধ্যায়
 মোমবাতি জ্বলে দেয়। বিপদে-আপদে স্মরণ করে তাঁকে। পলানকে তাঁর
 পাশেই গোর দেওয়া সাব্যস্ত হয়। চরের আবালবৃদ্ধ এসে জড় হয়। করিম
 নতজাহ্ন হয়ে প্রার্থনা করে স্বহৃদের জন্ত। দীহুও চোখের জল দিয়েই তর্পণ
 করে। সকল তাপ জালা থেকে মুক্তি পায় পলান।

পলান চির শান্তির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও চরের মানুষ গর্জে ওঠে।
 সাকিনাকেও দিনকয়েক আগে গোর দিতে হয়েছে পলানের পাশে। ওসমান
 গণিরা পাঁচ ভাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চরের শত শত জোয়ান মানুষও ওদের
 দলে। নিতাই একবার জমি চাষ করতে চরে এলে ওরা বেধে নেবে কত
 শক্তি ধরে সে। ওরা তো কেউ চাষ করবেই না, অল্প কাকেও তা করতে
 দেবে না।...

নিতাইয়ের ভাবনার অস্ত নেই। আইনের প্যাচে জমি দখলে পেয়েও ভোগে আনতে পারছে না। এ পর্যন্ত নিজে একটি দিনের জগাও চরে আসতে সাহস পায়নি। চরের মাংশষ যেভাবে ক্ষেপে আছে তাতে কোনদিন বা বেঘোরেই প্রাণটা যায়। এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় না করাই ছিল ভাল। আশুন নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন তো আর থামবার উপায় নেই! সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো মাথার ওপরে ছোবল পড়বে। পলানের উচ্ছেদে কেবল চরের লেজটাই খসে পড়েছে। এখনো পেট মাথা বাকি। মোড়ল সব ক'টাকে ঘায়েল না করা পর্যন্ত শাস্তি নেই। কিন্তু উপায় কি। ননী মাধবটাকে তো মুঠোভর্তি টাকা দিয়েও রাখা গেলো না। বেটা ভয় পেয়ে পালালো। আব ভয় না পেয়েই বা করে কি। পলানের ছেলে পাঁচটা তো স্তনছি আস্ত ডাকাত। শালারা নাকি দিনরাত আমাকেই খুঁজে বেড়ায়। করিম ককিরটা একটু শাস্ত-মেজাজেই আছে। কিন্তু আর-একটা গৌয়ার হচ্ছে বৈরাগীটা। চিন্দু হয়েও গলায় গলায় শালার নেড়েদের সঙ্গে ভাব। আচ্ছারে শালা, তোর বিব দাঁতটাই আগে ভাঙচি।...ননীমাধব প্রাণের ভয়ে কাজে ইস্তফা দিলে নিতাই নিজেই তব্বির তলারক শুরু করেছে। দীহুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। সেই একই ভাষ্যমতীর খেলা। সমন চেপে একতরফা ডিক্রিলাভ। নৌকো পথেই সদরে যাতায়াত করতে হয় নিতাইকে। তবে খুব সতর্ক ও। কখনো একা একা চলাকেরা করে না। সদা-সর্বদা কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সতর্ক থেকেও কেমন করে যেন ফাঁদে পড়ে যায় নিতাই। দীহুর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সদস্তে বাড়ি ফিরছিল। কাজের তাড়ায় সঙ্গীরা সব মাঝ পথে নেমে গিয়েছে। নিতাইয়ের মনটা খুঁতখুঁত করলেও তেমন কোন ভয় ভাবনা হয় না। কে আর দেখছে ওকে। তাছাড়া মাঝি দু'জন তো রয়েছেই।... ছেয়ের ভেতরে বসে বেশ আমেজের সঙ্গেই তামাক টানতে থাকে নিতাই। ধোঁয়ার সুগন্ধীর সঙ্গে মগজের বিলুর মধ্যও কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো। তিন হাজার টাকার ডিক্রিটা নগদ তিন হাজারেই কুমার বাহাদুর কিনে নিলেন। এবার টাঁড়ালের পো টের পাবে, কত ধানে কত চাল। বড্ডো বেড়েছে শালা। কত করে তোবামদ করনুম, চর দখল করতে আমাকে সাহায্য কর, আমি তোর সমস্ত হুদ মাপ করে দিচ্ছি। আসলও না হয় আরো

দু'বছর পরে দিল্। আমি লিখে পড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শালা কথাটা কানেই
 তুললে না। ফুটনি ঝাড়লে, নেমকহারামী করতে পারবো না। বলি শালা
 পলান সেক কি তোর বাপদ্দাদা চোদ্দ পুরুষ—না সেই শালাই তোকে ধার কর্ত্ত
 দিয়েছে?...এখন দেখি কোন বান্ধব তোকে রক্ষা করে। এ আর নিতাই সা
 নয় যে চোখ রাঙাবি। শক্ত মরদ বমেস্ত্রনারায়ণ। বৃকে বাঁশ ডলবে আর
 টেনে ঘর থেকে বার করবে।...ভাবতে ভাবতে মাথার পোকাগুলো কিলবিল
 করতে থাকে নিতাইয়ের। দীহুকে যদি কুমার বাহাদুর শায়ের্ত্তা করতে পারেন
 তাহলে পলানের ছেলেগুলোকে বাগে আনা যাবেই। তারপর যদি চরধল্লার জমি
 দখলে আসে তাহলে আর স্ত্রদের কারবার না করলেও চলবে। আইন তো
 অধিকার দিয়েছেই। এখন ঠ্যাঙারগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই হয়। দেখা
 যাক, কুমার বাহাদুর কি করেন।...হুকো বেথে একটু কাত হয় নিতাই।
 জলো হাওয়ায় দু'চোখ বৃজে আসে।

হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে নিতাই। বৃষ্টির গতি বেড়ে যায়। হাওয়াও জ্বরে
 বইতে থাকে। মাঝিরা টোকা মাথায় দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টেনে
 চলেছে। বৃষ্টির ধকলে আশেপাশের কোন কিছু নজরে পড়ছে না। নৌকোর
 ভেতবের লণ্ঠনটাও দমকা হাওয়ায় নিতে গেছে। চারদিক জুড়ে থমথম করছে
 ঘন অন্ধকার। কোনরকমে বাঁক ঘুরতে পারলে অহুকুল হাওয়া পাওয়া যাবে।
 এ পথটুকু যেতে শক্তির কসরতই কবতে হবে। তাই করে চলেছে বাপ-
 বেটায়। আর শ'থানেক হাত এগুতে পারলেই বাঁকের মোড়। ছেলেকে
 তাড়া দিয়ে পেছনের হালে ঘন ঘন চাড় দিতে থাকে বড় মাঝি। ছেলেও প্রাণ-
 পণ শক্তিতে ঘুরতে থাকে। ঢেউএ যেন এক-একবার তলিয়েই যাচ্ছে সামনের
 গলুই। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। ভয় নেই, মোড়টা ঘুরতে পারলেই
 নিশ্চিন্ত। একজন হালধরে বসে থাকবে। আর একজন সানকি দিয়ে সৈচে
 ফেলবে জল। মোড়ে তো একরকম এসেই পড়েছে। এখন হালটা ঘুরিয়ে ধরলেই
 নৌকো ঘুরে বাবে। বড় মাঝি সেই চেষ্টাই করতে যায়। হঠাৎ পাশ কেটে
 এসে একখানা বড় ডিঙি পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডিঙিতে পাঁচটি লোক।
 বড় দু'জনের মাথায় বাঁকড়া বাঁকড়া চুল। বাতাসে ফরফর করে উড়ছে।
 মালকোঁচা করে লুপি পরনে। কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা। বাকী তিন-
 জনও বেশ আঁটসাঁট। বড়জন হাঁকে, এই মিঞা, নাও ভিড়ায়।

বড় মাঝি প্রতিবাদ করে, ক্যা, নাও ভিড়ামু ক্যা। কি কইবার চাও ভোমরা।

কইবার চাই তোমার মাথা শালা। নাও ভিড়াইবা নাকি ভিড়াও।
নইলে... রূপ করে একটা বল্লম তুলে উচিয়ে ধরে গণি।

বৃষ্টির ধকল কমে এখন টিপটিপানী শুরু হয়েছে! বাতাস নেই বললেই
হয়। বড় মাঝি তবু ভাল করে চোখ ঝুলতে সাহস পায় না। পাঁচটি জল্লাদ
যেন ক্ষেপে উঠেছে। নিতাইকে আন্তে আন্তে গোটা দুই ডাক দিয়ে হাল
ধরে চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওসমান গণি ডিক্রি থেকে লাফ দিয়ে এসে নিতাইয়ের নোকোয় ওঠে।
ওসমানের হাতে একটা শানিত রামলা। গণির হাতে বল্লম।

মাঝির ছেলে ছোট মাঝি ভয়ে চেঁচাতে থাকে।

ওসমান খেকিয়ে ওঠে, এই শালা, চেঁচাবি ত দুই টুকবা কইরা ফালামু।
বালো চাচ্ ত চূপ কইরা বইহা থাক।

ছোট মাঝি দু'চোখ বৃজে ভয়ে কাঁপতে থাকে। বড় মাঝিও থ বনে যায়।
চোক গিলে জড়িত কণ্ঠেই অল্পবোধ জানায়, আমাগ ছাইড়া ছান সাবরা।
নায়ে কিছু নাই। আমাগ...

মুখের কথা শেষ করতে পাবে না বড় মাঝি—ওসমান আবার গর্জে ওঠে, চূপ
কর বেটা। ছাইড়া দিব। নায়ে তগ কিচু নাই, না? চামাব শালা কুথায়?

উত্তর আর মাঝিকে দিতে হয় না। চেঁচামেচি শুনে নিতাই আচমকা জেগে
ওঠে। ভয় জড়িত কণ্ঠেই শুধায়, নোকোয় কে? কাব সঙ্গে কথা বলছিস,
এই খলিল?—

তোমার বাবার লগে কথা বলছে শালা। বাইরইয়া আহ চামারের পো,
খলিল উত্তর দেবার আগে ওসমান ভেংচি কাটে।

ওসমানের কণ্ঠস্বরে নিতাই চমকে ওঠে। এক বল্লক চোখ চাইতেই দেখে,
সাক্ষাৎ যম শিয়রে দাঁড়িয়ে। কাঁপা গলায় অবস্থা লঘু কবতে চেষ্টা করে, কে,
বাবা ওসমান! কি চাই বাবা তোমাদের?

চাই তোমার মাথা শালা, ওসমানের কণ্ঠে খানখান হয়ে করে পড়ে
প্রতিহিংসার কর্কশ কণ্ঠস্বব।

নিতাইয়ের মুখে আর বাক্য সরে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

গণি ছেয়ের ভেতরে মাথা গলিয়ে তামাসা জোড়ে, কি সাজী মশয়, চরে
একবার নাম। এত জমিজমা পাইলা একবার দেইধা যাও।

নিতাইয়ের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। হাত জোড় করেই অল্পবোধ:

জানায়, আমাকে তোরা ক্ষমা কর বাবা। আমি তোদের সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেবো। আমাকে—

ইস, শালা আমাব বশ্পপ্তুব যুধিষ্টিব রে ! সব জমি আমাগ দান কববে !

ও শালাব লগে কতা কওয়নের কি কাম ? শালারে চাইনা বাইরে আন না। অব জমি অব গোয়া (পাছা) দিয়া ভইরা দেই, নিতাইয়েব মুখের মতো জবাব দিয়ে গণিকে আদেশ করে ওসমান।

গণি শ্লেষেব সঙ্গেই আবাব টিপ্তনী কাটে. আহেন সাজি মশায়, একডু বাইরে আহেন। ক্ষ্যাত খামাবেব দিকে একবাব চাইয়া ছাহেন, বলতে বলতে হাত ধবে টানাটানি শুরু কবে গণি।

নিতাই মাস্তুলেব বাশটা শক্ত কবে চেপে ধবে কাতরাতে থাকে, দোহাই তোদেব আল্লাব, আমাকে ছেড়ে দে। মা লক্ষ্মীর নামে শপথ কবছি, তোদের সমস্ত জমি আমি ফিবিয়ে দেবো। আমাকে ছেড়ে—

শা-লা, জমি ফিবাইয়া দিবি। বাজানবে আমরা কুথায় ফিবা পাম্বে শালা। তব নোকবে কত কইবা কইচিলাম, দুইডা দিন আমাগ সময় ছাও—সব টেকা আমবা দিয়া দিমু। ছমচিল শালা ?...ক্রোবে গজরাতে থাকে গণি।

নিতাই আবাব কাতরাতে থাকে, আমি আসিনি বাবা। আমি এলে নিশ্চয় তোমাদের কথা রাখতাম। ..

ইস, শালায় যান এখন কিচু জানে না। মার শালা চামাররে, বলতে বলতে এক হেচকায় বাইবে টেনে এনে লা দিয়ে কাঁধের ওপব কোপ বসিয়ে দেয় ওসমান।

বড় মাঝি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধবতে খাচ্ছিল ওসমানকে। কেলামৎ এক বল্লমের খোঁচায় গায়েল কবে কেলে ওকে। বাবারে-মারে বলে চীৎকার করতে কবতে লাক দিয়ে জলের ওপব গিয়ে পড়ে মাঝি। ছোট মাঝিও বাজানরে মাইরা ফালাইল, বাজানরে মাইরা ফালাইল বলে, চীৎকাব করতে থাকে।

গণি ওকেও বল্লমের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে জলের ওপব কেলে দেয়।

বাপ-বেটায় ভেসে চলে পাড়ের দিকে।

ওসমান একাই নিতাইকে কোপাতে থাকে। বায় দুই চিৎকার করেই গলা নিস্তক হয়ে আসে নিতাইয়ের। যন্ত্রণায় ছটকট করতে করতে লাক দিয়ে জলের ওপব পড়ে।

তীরে উঠে মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চোঁচাতে থাকে। বুট্টি নেই, ধমধম করছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পাড়ে কোলাহল শোনা যায়। আর্তনাদ শুনে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। নিতাই জীবিত কি মৃত দেখবার আর ফুরসত নেই। ডিঙি নিয়ে দ্রুত গা ঢাকা দেয় পাঁচ ভাই। দুঃশাসনের রক্তে পিতৃতর্পণ আজ সার্থক হলো ওদের। বেহস্তে নিশ্চয় তৃপ্ত হয়েছেন আত্মজান। আর কোন ভয় নেই। ফাঁসি, কালাপানি, কারাবাস হাসিমুখেই বরণ করবে ওরা।...

ক্ষণিকের জন্মও কারো মনের কোণে গানি উপস্থিত হয় না। নিতাইকে মৃত দেখে এলে আর কোন ভাবনাই থাকতো না। এখন ভাবনা শুধু ঐটুকুই। না না, নিতাই মরবেই। নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে যাবে। অধর্ম কখনো টিকে থাকতে পারে না... মনের জ্বারেই বৈঠায় খোঁচ দেয় পাঁচ ভাই। কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবই যেন এগিয়ে চলে।

নিতাই মরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, বেঁচে থেকেও যেমন অনেকে জালিয়েছে মরেও তেমনি জালাছে। মাঝিদের সোরগোল শুনে জল পুলিষের নৌকো এসে উদ্ধার করে আহত নিতাইকে। যন্ত্রণায় জলের ওপর দাপাদাপি করছিল। উখান শক্তি রহিত হলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি। অঝোরে খন বরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। উদ্ধার করে সাব ইন্সপেক্টর বমণীমোহন তাড়াতাড়ি ওর জ্বানবন্দী নিতে উত্তোঙ্গী হন। চারদিক থেকে আরও অনেকে এসে জড় হয়েছে। ডিঙি নিয়ে জলপথেও আসে কেউ কেউ। কারো হাতে লঠন, লাঠি, বল্লম। কারো বা খালি হাত। এঁটো হাতেও এসেছে অনেকে। বিপদে মানুষের পাশে ছুটে আসাই গ্রামের মানুষের ধর্ম। পরের জন্ম জান কবুল করতেও ওরা ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করতেও জানে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতাইয়ের বীভৎস মুখের দিকে চেয়ে অনেকেই শিউরে ওঠে। আহ-হা, কি সর্বনাশ করে গেছে বেচারার। একেবারে জানে খতম করে দিয়ে গেছে।...কিন্তু খুনেরা গেল কোথায়? এত তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। খুঁজলে এখনো ধরা যাবে।...যে যদিকে পারে এগিয়ে যায়। ডিঙি নিয়েও এমাথা ওমাথা খোঁজাখুঁজি করে একদল। কিন্তু কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। মাঝিরাও সঠিক কিছু বলতে পারে না। বড় মাঝি তো বেশ ষথম হয়েছে। ছোটর অবস্থাও সঙ্গীন। ভয়ে ঠকুঠকু করে কাঁপছে বেচার। কাকেও চিনতে পারেনি। বড় মাঝিও না। তিন্দু দেশী

মাহুঘ ওরা। হালে এসেছে এ অঞ্চলে নৌকো নিয়ে। রমণীমোহনের উপর্যুপরি জেরার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে পারছে, ডাকাতরা দলে পাঁচজন ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা। সহসা বাঁকের মোড়ে ডিক্কি নিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়!...

ডিক্কির কথা শুনে আবার হুঁপল হুঁদিকে ছুটে যায়। কিন্তু এবারও কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। ধলেশ্বরীর কোল খাঁ খাঁ করছে। আকাশ মন ক্রমশ মেঘে আচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি ঝুটি পড়ছে। হাওয়ার জোর নেই। কেমন যেন ধমধমে ভাব। সকলে মিলে ফিবে আসে নিতাইয়েব পাশে। রমণীমোহন ডাইরী লিখে চলেন। এক ঢোক জল গিলে কাতবাতে কাতরাতে শেষ জ্বান-বন্দী দেয় নিতাই, পলান ব্যাপারীবা পাঁচ ছেলে আমাকে খুন করেছে দারোগা সাহেব। ওসমান,... আর কিছু বলতে পাবে না নিতাই। মুর্ছায় চলে পড়ে। হয়তো বা নিভেই যায় জীবন দীপ। কলম বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপে ধবেন রমণীমোহন। না, এখনো দিকধিক্ কবে চলেছে ধমনীবা ক্রিয়া। সময় মতো সদবে পৌঁছানো দরকার। চেষ্টা কবলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। রমণীমোহন মিছিমিছি দেরি না করে তাড়াতাড়ি আব একখানি নৌকো যোগাড় করে গঞ্জের খানায় পাঠিয়ে দেন নিতাইকে। সঙ্গে যায় হুঁজন কনেষ্টবল আব উপস্থিত জনতার মধ্য হতে জনকয়েক বলিষ্ঠ মাহুঘ। আমাদের গ্রেপ্তার না করে নিজে কিরবেন না। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে সবাসবি পলানের বাড়ির দিকেই রওনা হন।

ওসমান, গণি, কেরামৎ সকলেই ওরা সবাসবি বাড়িতে এসে উঠেছে। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই ওদের মধ্যে। ছুটেও পালাবে না কেউ কোথাও। পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায়ই ধরা দেবে ওরা। আদালতে গিয়ে বুক ফুলিয়েই বলবে, ওরা কোন দোষ করেনি। নিতাইয়ের মতো পিশাচকে মারায় কোন দোষই হতে পারে না। খনের শাস্তি খুন। নিতাই একা ওদের অনেককে খুন করেছে—ভাতে মেরেছে! এই ওর উপযুক্ত শাস্তি। কোন গ্যায়বান বিচারক কখনো ওদের শাস্তি দিতে পারেন না। বরং পুরস্কার পাওয়াই ওদের উচিত। নিজেরা মরেও একটা কোঁশলী ডাকাতের হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে ওরা।... কাশেম, ফজলুল, কেরামৎ কিছুটা ভেঙ্গে পড়লেও গণি ওসমান ঠিকই থাকে।

রাতের নাস্তা খেয়ে শুতে যাবে সকলে, রমণীমোহন সদলবলে এসে বাড়ি বের দেন। ভয় না পেলেও এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পুলিশ আসবে একথা

কল্পনাও করতে পারেনি ওরা। বরং ভেবেছিল, কোন খোঁজই হবে না। নিতাইয়ের জ্বানবন্দী না পেলে হয়তো হতোও না কিছু। কিন্তু ভাগ্য দোষে অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। তা হলে কি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শয়তান! সকল চেষ্টাই তাহলে বিফলে গেলো! আব্বাজানের আত্ম তাহলে আর তৃপ্ত হলো না! অনন্তকাল তৃষ্ণার্তই থেকে যাবে! ভাগ্য ভাগ্য, সবই ভাগ্যের ফের। ...বেঁচে থেকে আর লাভ কি? ওসমান যেক্ষায়ই ধরা দেয়। গণি, কাশেম, কজলুল, কেরামৎ ও কোনরকম গোলমাল করে না। এত সহজে সকলকে গ্রেপ্তার করা যাবে রমণীমোহন কল্পনাও করতে পারেননি। মনে মনে তাই খুশী হয়েই সকলকে নিয়ে রাতারাতি খানায় ফেরেন।

নিতাইয়ের অবস্থা শোচনীয়। এ পথন্ত আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নাড়ীর অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। শত চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি। খবর পেয়ে ছেলে, বউ, মেয়েরা খানায় এসে দাপাদাপি শুরু করেছে। সকালে নৌকোয় উঠবার সময় চলতি এক জেলে নৌকো থেকে ইলিশ মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিল নিতাই। ফিরে এসে বোল ভাত খাবে। নিতাইয়ের বোয়েব বিলাপে পাষাণের বুক ফেটেও বোধ হয় কান্না বেরবে। এক গাদা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করছে বেচাবা। টাকা-কড়ি সবই চরে রয়েছে। কপাল পুড়লে খাবে কি তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ধণে প্রাণেই ওদের মেয়ে রেখে যাচ্ছে নিতাই। দুটো মুখের কথাও বলে যেতে পারছে না।

রাত বারোট। অচেতন নিতাইকে নিয়ে রমণীমোহন স্বয়ং সন্দের রওনা হন। জলপথে প্রায় ঘোল সতেরো মাইল পথ। যদি আর কোন নূতন উপসর্গ দেখা না দেয় তাহলে হয়তো কোনরকমে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে। আর দুটো কথা বলে যেতে পারলেই আসামীর ফাঁসী কেউ রুখতে পারবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওসমান খুন করেছে। তবু আইনের রায় বোকাবুঝির ব্যাপার নয়! বিধিমতো সোজাহুজ্জিই আসামীকে সনাক্ত করতে হবে। এত বড় খুনের মামলায় শাস্তি হলে নিশ্চয় পদোন্নতি আশা করা যায়। নিতাইয়ের স্ত্রী, পুত্র, কণ্ঠার সঙ্গে রমণীমোহনের চোখেও ঘুম নেই। অষ্টগ্রহর হাঁ করে মুখের কাছে বসে আছেন। কিন্তু নিফল চেষ্টা। মাঝ পথেই নিতাইয়ের ভবলীলা শেষ হয়ে যায়।

বিচারে ওসমানের বাবজীবন স্বীপান্তর ও গণি কেরামতের দশবছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কজলুল আর কাশেমের তিন বছর করে।

পলানের সোনার সংসার শ্মশানে পবিণত হয়। মেহেরার দুঃখে করিমও কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আর দয়াল চানের আসর বসে না। একতারার তার ছিঁড়ে গেছে।

দীর্ঘব মনেও স্বস্তি নেই। অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই দিন কাটছে। ডিক্রি-খানা রমেন্দ্রনারায়ণ কিনে নিয়েছেন। কে জানে কি আছে তার মনে। নিতাইকে তবুও না হয় অল্পরোধ উপরোধ করা যেতো। কিন্তু কুমার বাহাদুরের কাছে তো খেঁষবারও উপায় নেই। রামকান্ত ইচ্ছে করলে খোঁজ খবর দিতে পারেন। খব গলায় গলায় ভাব চ'জনের। উনি অল্পরোধ করলে সবকিছু চেপে যাওয়াও অসম্ভব নয়। মামী লোক হয়ে মামী লোকের সম্মান বাধাটাই স্বাভাবিক। নিতাই ছিল স্তদখোর—চামার। কুমার বাহাদুর তা নন। বনেদী বংশ, প্রশস্ত দিল।... কিন্তু মশাকিল হয়েছে ভট্টচাষ মশায়কে নিয়ে। চরের প্রতি দিন দিন কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠছেন। সমস্ত চর তো এযাবৎ মাথার মুকুট করেই বেখেছে ওঁকে। বিনিময়ে এটুকু দয়াও কি উনি করতে পারেন না!...দাওয়ার উপর বসে হাঁকো টানতে টানতে এলোমেলা ভাবতে থাকে দীর্ঘ।

নিভুতে বামকান্তকে কথাটা বলবে বলে ক'দিন ধরে ভাবছিল দীর্ঘ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। রামকান্ত এখন আর সে রামকান্তই নেই। আগে ওর সামনে হাঁকো খেতে পর্যন্ত সমীহ করতো। কিন্তু এখন যেন দিন দিন কেমন বেয়াড়া হয়ে উঠছেন। নিজে প্রকাশ্যে গ্লাস না ধরলেও খোলাখুলিই এখন উনি রমেন্দ্রনারায়ণের দোসর। মদ, গাজা, আড্ডা, ইয়ার্কিতে একরকম প্রকাশ্যেই ওঁর তোয়াজ করেন। গঞ্জের মানুষ তো বলে, ইদানীং ভট্টচাষই কুমার বাহাদুরকে উস্কাচ্ছে! নয়তো মাঝখানে বেশ সংঘতই ছিলেন উনি।...ছি ছি ছি, গুরু পুরোহিত জানেই চরের আবালবৃদ্ধ ওঁকে ভক্তি করে আসছে। শোক তাপে সকলে জর্জরিত। তবু কি ওঁর লজ্জা সরম নেই!...

প্রতি বছর বর্ষাতেই কুমার বাহাদুরের 'বোট' ঝালের মুখে এসে নোঙর ফেলে। মেয়েদের স্নানের ঘাট সেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকায় অস্থবিধা হলেও কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত তা নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি। শাস্তি বজায় রেখেই চলেছে। কিন্তু এবারের অবস্থা শোচনীয়। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই একরকম ষাটের কাছ খেঁবেই 'বোট'

বাঁধা হচ্ছে। মেরেরা কেউ আর এখন খুলে-মেলে স্নান করতে পারে না। অনেকে ঘাটে আসা ছেড়েই দিয়েছে। দু'জোড়া লোলুপ চোখ যেন অবিরত ওদের গিলে ধেতে ব্যস্ত। যেন তির্যগ দৃষ্টিতে উলঙ্গ করেই ওরা ওদেব দেখতে থাকে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রতিবাদ তো দূরের কথা অস্ববোধ উপরোধ জানাবার মতো সাহসও কারো নেই। আড়ালে আব-ডালেই চলে বিক্ষোভের গুঞ্জন। কেউ কেউ মোড়ল হিসেবে দীর্ঘ করিমের কাছেও নালিশ করে। কিন্তু কি করবে ওরা! পলানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথাই গুঁড়িয়ে গেছে। চরণলা তো এখন নিশ্চারণ নির্জীব। যাবা প্রাণে বেঁচে আছে তাদেরও মাথা তুলবার উপায় নেই। নিতাই তাদের হৃৎপিণ্ডে ভীতির ছায়া রেখে গেছে। রমেন্দ্রনারায়ণ হয়তো এই স্বযোগই চাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের মতো শুধু সূদেব কারবার ওর নয়। সাতপুরসেব জমিদারি। শিরায় শিরায় রয়েছে কৃটবুদ্ধির বীজ। নিতাই ভুল কবেছিল। কাল সাপকে কখনো লেজ কেটে ছেড়ে দিতে নেই। আহাম্মক—পাকা কলার কাঁদি দেখে কালনাগিনীর গতে হাত গলিয়ে দিলে। ছোবলের ভাবনা ভাবলে না। না না, নিতাইয়ের মতো ওব কখনো ভুল হবে না। মোড়ল দীর্ঘকে শুধু ভিটে ছাড়া করলেই চলবে না। লোক চক্র আড়ালেও পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হয়...না, তার আব প্রয়োজন হবে না। খুন গুমের চেয়েও ভাল রাস্তা আছে। কোনরকমের বুঁকি নেই অথচ নিশ্চিত ব্যবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। বাঁড়ের শত্রু বাঘে ধাবে।—ভাবতে ভাবতে কপালের বলি রেখাগুলো ফুলে ওঠে রমেন্দ্রনারায়ণের।

সেদিন সূর্য গ্রহণ। বিকেল পাঁচটায় রাহগ্রাস থেকে মুক্তি পাবেন দিনমণি। চরের নরনারী মাঝেই মুক্তি স্নানের পুণ্যার্জনে ব্যস্ত। অনেক দিন পর রাম-কান্ত আবার এসে কীর্তনের মাঝে যোগ দেয়। হয়তো গ্রহণ-দানের মধ্যেই রয়েছে ওর যোগদানের উৎস। চাল, ডাল, টাকা, পয়সায় মিলিয়ে পাওয়া মন্দ হবে না। স্নানযাত্রী মাঝেই কিছু না কিছু দান করবে। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও চরের মানুষ আজ আবার প্রাণপ্রার্থী মেতে উঠেছে। দুঃখ তো ওদের নিতাই লেগে আছে? পাপ থেকেই দুঃখের উৎপত্তি। আজকের এই পুণ্য দিনে নাম-গানে যদি সে পাপ কিছুটা দূর হয়। দীর্ঘর বাড়িতে এসেই সকলে জড় হয়। সেখান থেকে নগরকীর্তন বেরবে। সকলে মিলে একত্রে গ্রহণ-স্নান করবে।...

বেলা চারটে নাগাদ খোলে চাটি পড়ে। রামকান্তই আজ মূল গায়ন, দীলু খোল ধরে। উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনির পর শুরু হয় নাম-গান। ভাবাবেগে নাচতে থাকে কেউ কেউ। সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্থানের ঘাটে এসে দাঁড়ায় কীর্তনের দল। ঝুমরের তালে তালে চলে উচ্চকণ্ঠের নাম-গান। জয়ধ্বনি দিয়ে গান শেষ করে জলে নামতে যাবে সকলে, মেয়েদের ঘাট থেকে লোক ছুটে আসে। বউ-ঝিরা কেউ জলে নামতে পারছে না। 'গ্রীনবোট' প্রায় ঘাটের সংলগ্ন কবে বাঁধা হয়েছে। কীর্তনের মধ্যে ডুবে থাকায় এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। এবার ঘোরতর অসন্তোষ দেখা দেয়। চ্যাংড়াদের ভেতব কেউ কেউ ডিল ছুঁড়েই উপযুক্ত জবাব দিতে চায়। কিন্তু দীলু বাধা দেয়। ও জানে ফল তাতে ভাল হবে না। সকলে রামকান্তকেই অহুরোধ করে, কুমার বাহাদুরকে 'পোট' অগ্রত্ব সরিয়ে নিতে।

রামকান্ত মহা ফাঁপরে পড়ে। কুমার বাহাদুর তো দিবি বোটের ছাদের ওপর বসে ডেক-চেয়ারে ছিলেন। ইচ্ছে করেই তো মজা লুটছেন। বাধা দিয়ে ও কেন বিব নজরে পড়তে যাবে! ওর কি দায় পড়েছে! ওর তো আর বি-বউ কেউ নেই!...মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে রামকান্ত, আমার তো মনে হয় নাম-গান শুনতেই এসেছেন উনি। কীর্তন ওঁর খুব প্রিয়। অনর্থক বাজে কথা বলে মেজাজ খাবাপ করে দেওয়া হবে। তার চেয়ে মেয়েরা গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে স্থান করে নিক।

উত্তর শুনে রাগে দীলুর গা মাথা জলে উঠে। কোথায় কীর্তন আর কোথায় উনি। হাঁ করে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে শয়তান। ঢলে ঢলে সিগারেট ফুঁকছে। ভক্তি তো কত' একবার নেমে পর্ষস্ত এল না। কীর্তন শুনছে না, ছাই। ভটচাষ মিছেই ওর হয়ে ওকালতি করছেন। ভাগবত পাঠ করে এমন বেহেটটার সঙ্গে মেলামেশা করেন কি করে! আজকাল ওঁর নিজের চালচলনও ভাল ঠেকছে না।—রামকান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে দীলু নিজেই ঘায় ঘাটের দিকে। কীর্তনের দলের আরো জনকয়েক ওর সঙ্গ নেয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'বোটের' মাঝিদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি শুরু করে।

রমেশনারায়ণ সবই লক্ষ্য করছিলেন। এ রকম একটা কিছুর জন্তাই অপেক্ষায় ছিলেন উনি। দাসু সর্দার গোড়াগোড়িই প্রস্তুত আছে। ডেক-চেয়ারে হুলতে হুলতেই দীলুকে শুনিয়ে হালের মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি বলছে রে বিপিন?

বিপিন মনিবের মেজাজ বুকেই জোরালোভাবে সায় দেয়, পানসী ঘাটের খন সড়াইয়া নিবার কয় হজুর।

—কে বলছে এ কথা? রমেন্দ্রনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

হাত জোড় করে দীহু উত্তর করে, আইজ্ঞা, আমরাই কইছিলাম। মায়্যা ছাইলারা ছান করবার পারচে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ গা বাড়া দিয়ে উঠে বসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন, কেন, জলে কি কুমার আছে নাকি যে মেয়েরা স্নান করতে পারছে না! বোট হো অনেকটা ফাঁকেই রয়েছে।

আইজ্ঞা হজুর, তাইলেও মায়্যা ছাইলারা লজ্জা পাইবার নৈচে। দ্যা কইরা একটু ফাঁকায় লইয়া যাইবার হুকুম ছান।

না না, এখন নোঙর তুলবার মতো লোক নেই। মাঝিরা ফিরলে দেখা যাবে'খন।

দীহু দেখছে, চার-পাঁচজন মাঝি গলুইর সামনে বসে হাতের কাজ করছে। নোঙর তুলতে বড় জোর ছুঁজনের দরকার। কুমার বাহাজুর তাহলে ইচ্ছে করেই বদমাইসি করছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। কিন্তু ওর কিছু বলাব আগেই মদন লাফ দিয়ে জলের ওপর পড়ে একাই নোঙরের দড়ি ধরে টানতে থাকে।

মদনের সাহস দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ থ বনে যান। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে হুকুর ছাড়ে, ও শালা করে দাস্ত, বোটের কাছিতে হাত জোঁয়ায়? মা ব শালায় মাথায় লাঠির বাড়ি।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত কাঁপিয়ে পড়ে। শুধু লাঠির বাড়ি মেরেই ফাস্ত থাকে না। চুলের মুঠি ধরে মদনকে বোটের ওপর তুলে এনে একটার পর একটা কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে।

গায়ের জোর মদনেরও কম নয় কিন্তু হকচকিয়ে গেছে বেচারী। ভাল বুকে নিজেই হাতে নোঙর তুলতে গিয়ে যে অপরাধ করে ফেলেছে একথা ও ভাল তই পারে না। দাস্ত যত না ওকে নাকে খত দেবার জন্ত চেষ্টাচ্ছে ও ততোই রাগে ফুলছে। হয়তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ডই বাঁধবে।

দীহু কাঁপরে পড়ে। পাড়ে মদনের মা দাপাদাপি করছে, পোলারে মাইরা কালাইল। তোমরা যাও না গ, অরে ছাড়াইয়া স্নান...

দলের জোয়ান ছোকরারাও আবার কেপে ওঠে। মোড়ল হুকুম

করলেই একহাত দেখিয়ে দেবে। ও সর্দার-চাঁদারের ভয় ওরা করে না। দীহুর বৃক্কের রক্তও টগবগিয়ে ওঠে। বেশ ভাল কথা, আজ শক্তির পবীক্ষাই হোক। রোজ রোজ এত জ্বালাতন ভাল লাগে না। যা'হোক একটা হেস্টেনেস্ট হয়ে যাক।...কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার গরম রক্ত তিম শীতল হয়ে আসে। বণে আশু জয়লাভের সম্ভাবনা থাকলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কুমার বাহাদুরের এক তুড়িতে দলে দলে আসবে পুলিশ। প্রয়োজন হলে সৈন্য সাজীরও অভাব হবে না। দানবেব পদতাড়নায় চর ধ্বংস হয়ে যাবে—ধন প্রাণ হবে নিশ্চিহ্ন...সকলকে মাথা ঠাণ্ডা বাখাব উপদেশ দিয়ে দীহু একাই জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, বলে কয়ে মদনকে ছাড়িয়ে আনা।

কিন্তু উপস্থিত জোয়ানরা সে কথায় কান দেয় না। দীহুর সঙ্গে ওরাও জন কয়েক জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সাতাব কেটে তীব্র বেগে এগিয়ে যায় বোটের কাছে।

দীহু অল্প কাকেও কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই কুমার বাহাদুরের উদ্দেশ্যে কাকুতি জানায়, অরে ছাইড়া ছান হজুর। আমি আপনার কাছে মাফ চাইচি। ছাইড়া ছান...

দাহুর যতো হিম্মতই থাক চরের একগাছা লাঠির কাছেও সে দাঁড়াতে পারবে না! গত বাইচের সময়েই সে পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্তবরাং ফাঁপরে বামেস্ত্রনারায়ণও পড়েন। ভেবেছিলেন, চোখ রাঙিয়েই ইজ্জত বজায় রাখবেন। কিন্তু দাহুর বাড়াবাড়িতে অবস্থা এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। গোয়ারগুলো হয়তো বোটখানাই পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবে। কে জানে, লাঠির ঘায়ে মাথাটাও চোঁচির হয়ে যেতে পারে!...মানে মানে মদনকে ছেড়ে দেবার হুকুমই দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দাহু সে স্বযোগ দিলে না। দীহুর কাকুতির জবাবে ভেংচি কাটে, ছাইড়া দিমু কি তোমার ভয়ে নাকি বৈরাগী?

কতাবান্তা হিসাব কইরা কও সর্দার। বালো অইব না, দীহুর কুঠে দূততা প্রকাশ পায়।

কি বালো অইব না! কি করবি তুই চাড়ালের পো?

লঙ্কায় অপমানে দীহুর মাথার রক্ত বহ্নার দিয়ে ওঠে। মুখে আর কোন কথা না বলে কহুইতে ভর দিয়ে জলের ওপর থেকে এক লহমায় বোটের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন। দাহুর লাঠি উচিয়ে ধরাই সার হয়।

কে যেন থাকে। মেয়ে জলের ওপর ফেলে দেয় ওকে। অশান্ত মারিরা পুতুলের মতোই চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতেও থাকে কেউ কেউ। রমেশনারায়ণ পেছনের গলুই দিয়ে নেমে গিয়ে পায়খানার মধ্যে আত্ম-গোপন করেও স্বস্তি পান না। জলের মধ্যেই হয়তো ডুবে মরতে হবে আজ। দাস্ত্র তো বেশ কয়েকবার নাকানি-চোবানি খেলে। দীহু বাধা না দিলে মরেই যেতো বেচারী। চরের মানুষ কেপে উঠেছে আজ। লাঠির বাড়িতে টুকরো করে ফেলবে বোট। আর নয়তো মাঝ গাঙে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবে। অনেক অত্যাচার সহ করেছে ওরা। আর নয়। শয়তান ওদের ঘরের বউ-ঝিনেব ওপব এজব দিয়েছে। না, আজ আর কারো কথা শুনবে না ওরা! কোথায় পালালো শালা জানোয়ার!...পাড় থেকে আরো দলে দলে মানুষ সাঁতার কেটে এসে বোট ঘেরাও করে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তেও শুরু করেছে। রামকান্ত প্রথম বার কয়েক খামাতে চেপ্টা করেছিল। কিন্তু জনকয়েক ওর ওপরেও হামলা করবার উপক্রম করলে চূপচাপই গা ঢাকা দেয়। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। না, মানসন্ত্রম সবই গেলো। কুমার বাহাদুরবেব কাছেও আর মুখ দেখানো যাবে না। চর ছেড়ে পালানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তাই যাবে ও। আর নয়, চের শিক্ষা হয়েছে।

দীহু রামকান্তকেই খুঁজছিল। ওরা দু'জনই যদি সমবেত চেপ্টায় ক্রুদ্ধ জনতাকে খামাতে পাবে। কিন্তু কোথায় গেলেন উনি!...জনতা ইতিমধ্যে অশান্ত মারিদের ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। বোটের ওপরও দুন্দাম করে লাঠি মারছে কেউ কেউ। জনকয়েক ঠেলে বোটটাকে মাঝ নদীতে নেবারই মতলব আঁটছে। একা দীহু একজনকে আটকায় তো আর একজন এসে কেটে পড়ে। ভাগ্যি ভাল যে আনন্দ এর মধ্যে নেই। সর্দি জরে দু'দিন বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে হাতে ভীষণ বেদনা। দীহুকে একাকী বেসামাল দেখে বৃদ্ধাদের মধ্যে কে যেন ছুটে গিয়ে করিমকে খবর দেয়। করিম নামাজ পড়ছিল। খবর পেয়ে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসে। অনেক কষ্টে দুই মিতায় রমেশনারায়ণের সস্ত্রম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বোটখানারও এমন কিছু ক্ষতি হয়নি। সামান্য ছুঁচার টাকা খরচ করলেই মেরামত হয়ে যাবে। মদনকে ছাড়িয়ে নিয়ে সকলে মিলে চলে আসে বোট ছেড়ে।

রমেশনারায়ণ ভয়ে এতক্ষণ কাঁপছিলেন। মুক্তি পেয়ে কুটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জানোয়ারদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারা শক্ত। বুদ্ধির

জোরেই ওদের মাথায় ডাঙা মারতে হবে। বোট যেমন আছে তেমনই থাকে। দাস্ত সর্দারকেও ভিজ্ঞে কাপড়-জামা ছাড়তে দেন না। বোটের জিনিসপত্র নিজেরাই উলটাল করে রাখেন। কিছু কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে যড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। তারপর নিজেই ডিক্কি নিয়ে যান খানায়।

চবের মানুষ ভেতরের ব্যাপার কিছুই টের পায় না। খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে যে যাব মতো স্নান করে বাড়ি ফেরে। কেউ কেউ হুশিয়ার মধ্যও হাবুডুবু খায়। কিন্তু দীহুর উৎসে বেড়ে যায়। অপমানিত হয়ে চুপ করে থাকার লোক বমেস্তনারায়ণ নন। শীগগীরই এর সমুচিত জবাব আসছে। হয়তো ভিটেমাটি ছাড়াই কববেন। বাগে পেলো জান নিতেও কহুর করবেন না। কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই গ্রহের ফের। বিধাতা বোধ হয় ওদের কপালে স্মৃ লেখেন নি।...ভাবতে ভাবতে দীহুও একটা ডুব দিয়ে ঘাট থেকে উঠে যায়।

সন্ধ্যা সাতটা। গ্রহণের পব মাজা হাঁড়ি হেঁশেলে সবে রান্না চেপেছে। খেতে আজ একটু ঝাতই হবে। দীহু সামান্য একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খায়। করিমের বাড়ির দিকেই পা বাড়াতে যাবে এমন সময় চারদিক থেকে লাল পাগড়ি এসে ছেকে ধরে। বমেস্তনারায়ণের এজাহারে স্ববং রমণীমোহন এসেছেন সদলবলে। প্রকাশ্য দিবালোকে লুটপাট খুন-জখম করার মজা এবার দেখিয়ে ছাড়বেন।...

রমণীমোহনের মুখের ওপর কোন কথা বলার স্রমোগ পায় না দীহু। চবের সকল মানুষই থ বনে যায়। বলছেন কি দারোগাবাবু! খাজনা আদায় কবতে এসেছিলেন কুমার বাহাদুর, মোড়ল চরেব মানুষকে উসকিয়ে তাঁর দলিল দস্তাবেজ আঙন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে—টাকা-কড়ি লুট করছে। মাথার ওপর কি ধর্ম নেই! নিজে বেহায়্যাপনা করলেন উন্টা ওদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন! মা বোনদের ইজ্জৎ বাঁচাতে চরের মানুষ না হয় একটু মরিয়া হয়েই উঠেছিল। কিন্তু মোড়ল তো ওঁর মানসম্মত নষ্ট করতে দেখেনি। যেখানে লজ্জা পাওয়া উচিত উন্টা নিজেই সেখানে গায়ে পড়ে খানা পুলিশ করছেন!...দীহুর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। হাত জোর করে যতবার রমণীমোহনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলকে যায় রমণীমোহন ততোবারই ওর কথায় গর্জে ওঠেন। খুন ডাকাতির অভিযোগে কোমরে দড়ি বেঁধেই টানতে টানতে খানায় নিয়ে চলেন। করিম, রহমৎ, মদন কেউ বাধ যায় না। একা আনন্দ ছাড়া চরে জোয়ান মানুষ আর কেউ থাকে না। হয়তো ওদের মনের ভুল।

কিংবা অল্প কোন কারণে হতে পারে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। সামনেই পাট কাটার মরশুম। হাত সকলেরই শূন্য। গোলায়ও কিছু বলতে কিছু নেই। না খেয়েই মরতে হবে সকলকে। ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই পচবে।

রমণীমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা ও রমেন্দ্রনারায়ণের পাকা মাথার চালে কেউ নিস্তার পায় না। রামকান্ত স্বয়ং সাক্ষী দেয়। ও স্বচক্ষে দেখেছে, করিম আর দীক্ষ লোককে উসকিয়ে 'বোট' লুট করিয়েছে। কুমার বাহাদুরকে খুন করতেও চেষ্টা করেছিল। শুধু ভাগ্যগুণে উনি জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। দাঙ্গা সর্দারের আগ্রাণ চেষ্টাতেই তা সম্ভবপন্ন হয়েছে। সে নিজের জীবন পণ করে মনিবকে পালাবার স্বযোগ করে দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই ওরা ষড়যন্ত্র করছিল। খাজনা দেয়ার নাম করে ডেকে এনে কাজ হাসিল করবে।...

রামকান্তর সাক্ষী সাক্ষীতে দীক্ষ করিমের ওপর পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অগ্নাশ্রদের কারো তিন বছর, এক বছর, ছ'মাস।

সাক্ষী দিয়ে বহাল তবিয়তেই ফেরে রামকান্ত। তবে চরে আর নয়। সোজা রমেন্দ্রনারায়ণের কাছারিতে। নায়েবী না জুটলেও মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে খোদ মালিকের একান্ত সচিবের পদ জুটে যায়। এককালীন বকশিশ হিসেবেও মন্দ লাভ হয় না। আগেকার সমস্ত দায় দেনাই মাফ করে দেন কুমার বাহাদুর। ভিধারী রামকান্তর মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। আর ওকে অসভ্যের মতো ধেইধেই করে নাচতে হবে না। চাল চিঁড়েও আর চিবোতে হবে না। এবার প্রকান্তেই মাহ' মাংস খেতে পারবে। হরির আখড়ার বাবাজী এখন যত খুশি শিষ্ট করতে পারেন। ও আর চরে যাবে না। যদি যায়ও সে অশ্রুভাবে। মনিবের আদায় ওয়াশিলের জগুই যাবে। গুরুগিরি, পুরুতগিরি আর জীবনে করবে না। না-না-না।

রায় দানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে যায় দীক্ষ। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। হাকিমও বিচলিত হয়ে পড়েন। ধর্মান্তার ঠিকই বোঝেন, সব ষড়যন্ত্র। কিন্তু করার কিছু নেই। সাক্ষী প্রমাণে হাত-পা তাঁর বাঁধা। তবু সম্ভব মতো স্বযোগ হবিধা দিতে তিনি কস্মর করেন না। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে দীক্ষর ওপর। কয়েদী জীবনে হয়তো কঠোর শ্রমই করতে হবে ওকে। যে কাজ জানে না হয়তো সে কাজও করতে হবে।

না পারলে দাগাবেড়ী পড়বে। মেয়াদ আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।...হাকিম বাহাদুরের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়। সাধারণ জেলখানায় না পাঠিয়ে দীক্ষকে সোজাহাজি উনি হসাপাতালেই পাঠিয়ে দেন। বড়ো মাহুষ, অপমানের ধকলটা সহিতে পারছে না। কে জানে, প্রাণে বাঁচবে কি না বেচারী...বুকের ভেতরটা কেমন খেন মোচড়াতে থাকে ধর্মান্বিতাবের।

দীক্ষ অপমানে জ্ঞান হারিয়ে কেললেও করিম অতো সহজে কাবু হয় না। মনের কোণে ঝড় বইতে থাকে! এই বিচারশালা! এরই নাম গায় বিচার! বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে যারা উন্নত জনতার গতি রোধ করলো উল্টো তাদেরই শাস্তির ব্যবস্থা! না না, সংসারে ধর্ম বলে কোন বস্তু নেই। সব ভোজবাজী—খাল্লা। বুদ্ধিই গায় অগ্নায়ের মানদণ্ড। সে বুদ্ধি শুভ অশুভ খাই কেন হোক না। বুদ্ধির দৌলতেই মাহুষ, বাজা, প্রজা, উজীর, নাজির। ওরা বোকা। বুদ্ধির দাপটে নিতাইরা তাই ওদের বারে বারে ঠকায়— জেলে পাঠায়—জান মারে। হাকিমও ওদের কথায় সায় দেন। কে আর সত্যাসত্যের বিচার করছেন! আল্লাহ্ থাকলে তিনিই বা এমন সহিবেন কেন! না, ওরকম কেউ কোথাও নেই। বুদ্ধিমান মাহুষই বোকা মাহুষকে ঠকানোর জগ্ন আল্লাহ্ ঈশ্বরের দোহাই পাড়ে! হ্যাঁ হ্যাঁ, বুদ্ধিই সব। ঈশ্বর থাকলে তিনিও ওদের কাছে পরাজিত।—করিম চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। এতকাল যে হাতে একতারা বাজিয়ে প্রাণ খুলে গান করেছে ইচ্ছে করে, একতারা ছুঁড়ে কেললে সে হাতে শয়তানগুলোর গলা টিপে ধরে। কিন্তু উপায় নেই। বুদ্ধিমানরা তার আগেই শক্ত করে বেঁধে কেলছে ওকে। এখন তো ওদের হাতের ক্রীড়নক ও। ইচ্ছেমতো ধানি ঘুরাবে, ঘাস কাটাবে। ক্ষীপ্ত করিম অসহায় অবস্থায় মনে মনেই দাপাতে থাকে। ছেলে, বউ, শিশু, সামস্ত আদালতে অনেকেই উপস্থিত আছে। কিন্তু কারো চোখেই চোখ রাখতে পারে না। জীবনে কারো কোনদিন এতটুকু অমঙ্গল চিন্তা করেনি। ভক্তিরে দয়াল চানরে ডেকেছে, তারই পুরস্কার কি এই তরুর-লভা লাঞ্ছনা! দম বন্ধ হয়ে আসে করিমের। মাথা নীচু করেই গিয়ে কয়েদী গাড়িতে ওঠে।

রমেন্দ্রনারায়ণ ওদের জেলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীক্ষ চিরজনমের মতোই ওকে নিশ্চিন্ত করে যায়। আর কোনদিন ওকে

লাঠিয়াল দীহু বৈরাগীর কথা ভাবতে হবে না। চর নিয়েও আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কচকচে বালির টিপি এখন উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। সেলামী, নজরানা, খাজনা নির্বিঘ্নে আদায় হবে। এক একজনের নাকে দড়ি ধরে টান দেবে আর হুড়হুড় করে সব দখলে এসে যাবে। তারপর আবার বিলি-ব্যবস্থা আবার সেলামী, নজরানা। ঘণিচক্র। দেবে নেবে আবার দেবে।...

চাসপাতালে পৌঁছেই জ্ঞান কিরে পায় দীহু। সমস্ত শরীর অবশ। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। ডাক্তারের নির্দেশে নাস এক পেয়লা গরম দুধ নিয়ে আসে। কিন্তু দীহু এ পাপপুরীতে কিছু মুখে দেবে না। কি দরকার ওর চাপা হয়ে! জীবনের আর মূল্য কি। সাত পুরুষের নজিরে যা নেই ওর বরাতে শেষে তাই হলো! জেল—কাটক—কারাবাস! লোকে কথায় কথায় খোঁটা দেবে, খুনে, ডাকাত, দাগী! না না, তা ও সহিতে পারবে না। কখনো না... তাউহাউ করে কাঁদতে থাকে দীহু। দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুক ঠুক রক্ত বার করে ফেলে। উচু মাথা নীচু হয়েছে—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সম্বন্ধই যদি গেলো তবে আর রইলো কি! না না, ও কিছু থাকে না। একজনের ছাড়া পৃথিবীতে আর ও কারো কোন অল্পকম্পা চায় না! সে হচ্ছে চিরশান্তির অগ্রদূত যত্না-দেবতার। একমাত্র যত্নাই ওকে সমস্ত জালা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পেয়লা হাতে সেধে সেধে নাসের হাত ধরে যায়। ধমক দিতেও কহর করে না সে। কিন্তু দীহুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। দুধ থাকে ও কেমন করে? পেলে বরং বিষ খায়। কিন্তু কারাগারে কে দেবে ওকে সে মহামৃত! প্রাণের আবেগে নাসের ছ'হাত চেপে ধরে, দুধ আমি খামু না দিদি। দয়া কইরা আমারে একটু বিষ ছান। মইরা বাঁচি।...

নাস আর ধমক দিতে পারে না। ওর বাপের বয়সী দীহু। চোখে মুখে সরলতার ছোপ। বেচারি নিশ্চয়ই মিথ্যে জালে জড়িয়ে পড়েছে। বার্থ হয়ে দুধের কাগ টেবিলেও ওপর রেখে ওয়ার্ড ইন্সপেক্টকে খবর দিতে যায়। একে একে অনেকেই আসেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনরকম ভয় দেখিয়েও দীহুকে বসে আনা যায় না। দু'দিনে জলাবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেয়নি ও। শরীর ভেঙে পড়েছে। তিন দিনের দিন স্থির হয়, জোর করে ওকে গুঁরা ঝাওয়াবেন। কিন্তু সে স্বযোগ আর গুঁদের ও দিলে না। তিন দিনের দিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জয়ের মতো ও ফাঁকি দিলে।

সকাল ন'টা। বাবার অবস্থা আশংকাজনক সংবাদ পেয়ে অশ্বিনী মাকে সন্দেহ কবে জেলেই দীহুকে দেখতে আসে। বরাত ভাল যে গোলমালের সময় ও চরে ছিল না। পার্বতীকে সন্দেহ করে দিন কয়েকের জন্ত স্বপ্নরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। নয়তো ওকেও হান্ধামায় জড়িয়ে ফেলতো। এখন তো সব দিক থেকেই ওর ওপর দায়িত্ব এসে পড়ছে। বাড়ি-ঘর, ক্ষেতখামার সবই এর ভেতরে রমেন্দ্রনারায়ণ দখল করে নিয়েছে। মোড়লদের জেলে পাঠিয়ে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ করেনি শয়তান। সদস্তে হিটলারি অভিযান চালিয়েছে। একদিকে কয়েদী গাড়ি জেলের দিকে ছুটেছে আর দিকে আদালতের পাইক পেয়ালা চরের দিকে। বিনা বাধায় ডিক্রি জারি।

চর ছেড়ে চলেই যেতে হতো অশ্বিনীদেব। দীহুব নামে যা কিছু ছিল একে একে সবই নিলামে তোলেন রমেন্দ্রনারায়ণ। শুধু পারে না সামান্য এককালি জমি গ্রাস করতে। ও-টুকুন কুসুমের নামে আছে। আইনের বেড়াঙ্কালে সুরক্ষিত। বছর দুই আগে হরিহর তার ভিটেটুকু কুসুমকে লিখে দিয়ে গেছে। বংশীর মুখে মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি—খান দুই খড়ের ঘর। শেষ জীবন বড় কষ্টে গেছে হরিহরের। উপযুক্ত ছেলে, ওলাওঠায় চরিকশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ। সংসারে দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই। নিজেও বাতের রুগী। শোক-তাপ আর পেট নিয়ে হিমশিম। দু'পাঁচ টাকা করে করে প্রায় শ'খানেক টাকা কর্ত্ত করে ফেলে কুসুমের কাছে। মা লক্ষ্মীর রূপায় কুসুমের সংসার তখন জমজমাট। প্রতিবেশী হরিহরকে ও টাকা ও দান হিসেবেই দেয়। দুঃখী মাহুঘ—ঘরের কোণে না খেয়ে থাকবে। না না, তা হতে পারে না। কি সুন্দর নামগান গায় হরিহর কীর্তনীয়া। এমন মাহুঘকে এক হাতে দিলে দশ হাতে ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীরই নির্দেশ এ। কুসুম কোন রকম দাবী-দাওয়া না রেখেই যখন যা পেরেছে দিয়েছে। কিন্তু হরিহর ঋণ মাথায় করে পারে যাবে না। অস্তিম মুহূর্তের আগেই ও ভিটেটুকু কুসুমের নামে লিখে দেয়। এ শুধু ঋণ শোধ নয়। কুসুম যদি ওর ভিটেয় দীপ জ্বালে তা হলে পরলোকে থেকেও ও সুখ পাবে। কে আর আছে ওর সংসারে। কুসুম তো ওর মেয়েও হতে পারতো।

আপত্তি জানাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে কুসুম। হরিহর স্বর্গে গেছে—পাঁচ বছর। কিন্তু ভিটের দীপ জ্বালা একটি দিনের জন্তও বাদ পড়েনি। পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে কুসুম। দীহুর গর-বাহুর

হরিহরের বাড়িতেই থাকে। একজন রাখালও থাকে সেই হুবাদে। তাই শুধু দীপই জ্বলে না, হরিধ্বনিও পড়ে। কুহুম মাঝে মাঝে গিয়ে হরিহরের তুলসীমঞ্চ লেপে পুঁছে দিয়ে আসে। পালপার্বনে নিজে গিয়েই দীপ জ্বলে সন্ধ্যা দেখে—কীর্তিনিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

বড় বিচিত্র এ সংসার। বিধাতা যেন সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেন—হরিহর দেয় আশ্রয়। হ্যাঁ, একে আশ্রয়ই বলতে হবে। হরিহরের হাত দিয়ে বিধাতাই ওদের এ আশ্রয় লিখে দিয়েছিলেন। এ যেন রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা। তাড়া খেয়ে তাই আর বেশী ভাবতে হয় না। হোক সাজানো সংসার ছেড়ে কুটির বাস। তবু তো মাথা গুঁজবার ঠাই মিললো! এক হাতে চোখের জ্বল পুঁছে আর এক হাতে নতুন সংসার গুছাতে থাকে কুহুম। বজ্রাতরা লাগি মেবে অনেক জিনিস তছনচ করে দিয়েছে। তা দিক, দয়াল হরির দয়া থাকলে আবার সব হবে। অশ্বিনী নিশি এখন বেশ বড় হয়েছে। ওরা দু'ভাইয়ে খাটলে ক'দিন আর লাগবে সব গোছগাছ করতে! সেবার তো ওদের বাপ একাই সব খুঁকি সামলালেন। কিন্তু উনি অতো কেঙে পড়লেন কেন। এ ধরনের বিবাদ তো জীবনে কতবাবই গিয়েছে। এই ভাগ্য নিয়েই তো জন্মেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তো লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে। এ ওদের সকলের ভাগ্যের লিখন। এতে আবার মান-অপমানের কি আছে! চুবি-ডাকাতি তো আর করেন নি। ঋণ করেছেন তা শোধ দিতে পারেন নি। তাতে হয়েছে কি! না না, নিশির বাপের এ রকম জেদ অহেতুক। তাছাড়া জেল তো আর তাঁর একার হয়নি। চরের কোন ঘর আর বাদ গেছে? সকলে তো বেশ বুক ফুলিয়েই গব করছে। শয়তানের সঙ্গে সমানে যুঝে চরের ইচ্ছা বাঁচিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কেউ কোনদিন ওদের অপমান করতে সাহস পাবে না। আইনের বিচারে জেল হয়েছে—দু'দিন খেটে আসবে। কিন্তু ওরা তো জানে, কোন অন্ডায়ই ওরা করেনি।...টিকই তো। এতো গর্ব করবার মতোই ব্যাপার। তবে উনি এত ভেঙে পড়লেন কেন? স্বামীর অনাহারের খবর পেয়ে কুহুম মনে মনে বিরক্তই হয়। এ আবার একটা জেল নাকি। এতো গোরবের জয়টিকা।...

কুহুম নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছিল, স্বামীকে দু'কথাতেই চাক্ষু করে তুলতে পারবে! কিন্তু জেলের দরজায় পা দিয়েই দমে যায়। শক্ত-সমর্থ মাহুষটা

তিন-চারদিনে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দৈহিক জ্বালা যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক উত্তেজনাটাই এর মূল কারণ। চিকিৎসকরা তাই বললেন। কিন্তু এদিকে যে মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। ওই সামান্য সময়ে পারবে কি ও মোড়লকে চাক্ষু করে তুলতে? যদি একটা দিনও ওকে এখানে থাকবার অনুমতি দিতেন কর্তৃপক্ষ। না, তা আর কোনরকমেই হবার নয়। অস্তুতঃ এ যাত্রা তো নয়ই! আবার দরখাস্ত করলে যদি ওপরওয়ালা মঞ্জুর করেন। এরা তো সকলেই তাঁর ছকুমের চাকর। ঘড়ি ধরে কাজ করবে।...ইতস্ততঃ করতে করতেই দীঘুর বিছানার কাছে এগিয়ে যায় কুহুম। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কোন-দিনই বড় একটা ঘবের বার হয়নি, চারদিকের পরিবেশ দেখে শুনে সজোচ হতে থাকে। মাথার ঘোমটাটা আরো খানিকটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর গিয়ে বসে। অশ্বিনী চূপচাপই শিয়রের কাছে ঠাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের দু'জনকে দেখে দীঘু হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

কুহুম আঁচল দিয়ে চোখ মুঁছিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি কান্দ কান্দ? না পাইলে কি বাঁচবা?

কান্না খামিয়ে ক্ষীণ হয়ে ওঠে দীঘু, না না, ই পাপ-পুরীতে আমি কিচু খামু না। তোমরা আমারে একটু বিষ আইনা ছাও...

পোলাপানের সামনে কি যা তা কও? অব্জ আইলা নাকি?—দৃঢ়তাব সন্দেই বাধা দেয় কুহুম।

হ হ, কামি অব্জই আইচি। ই পরান আর রাকুম না...বলতে বলতে বুকের ওপর জোরে জোরে কিল মারতে থাকে দীঘু।

কুহুম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সাঙ্ঘনা দেয়, অমুম কইর না। পোলার মুখের দিগে চাইবা না? তুমি মরলে অগ দেখব ক্যারা? দেখতে দেখতে না পাঁচটা বছর কাইটা যাইব।

কাইটা গেলেই কি! ই মুক আমি চরের মাইনষেরে ছাহামু কেহুন কইরা? হগলে আমার মুকে থুথু দিব না?

ক্যারা তোমার মুকে থুথু দিব! হগলে না তোমার স্বখ্যাতিই করবার নেচে। তুমিই না হগলের মান বাঁচাইচ।...

হ, চোর ডাকাইতের আবার স্বখ্যাতি করবে নে মাইনষে। তোমবা আমারে পাগল পাইচ! ভোগা কথা বইলা বোকা বনাইবার চাও!...

অশ্বিনী এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। এবার মুখ খোলে, ভোগা কথা আমারা

কমু ক্যান, আদালতে ছাহ নাই চরের মাছুষ দল বাইন্না তোমাৰে দেখবাৰ আইছিল ? তারা না হগলেই হায় হায় করবাৰ নৈচে ।

তারা তোমাৰা দেখবাৰ আইছিল রে বাপ, তুই তাগ চিনচ নাই ।

তোমাৰা দেখবাৰ আইছিল ! তুমি কও কি ! না খাইয়া খাইয়া তোমাৰ মাখাৰ ঠিক নাই ! তারা না অনেকেই তোমাৰ লগে লগে জেলে আইচে ।

দীহু এবাৰ আৰ কোন উত্তৰ করতে পারে না । খানিক চূপ করে থাকে ।

নাৰ্স এক পেয়ালা নেবুৰ রস নিয়ে আসে ।

অশ্বিনী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে অশ্বৰোধ করে, আৰ মন ধাৰাপ কইৰ না । মাখাৰ উপরে ভগবান আছে, ইয়াৰ বিচাৰ করবই । খাইয়া লও । না খাইলে বাঁচবা কেমনে ?

দম ধরে ছিল দীহু, আবার উজ্জ্বাসে কেটে পড়ে, না রে বাপ না, আমি আৰ বাঁচবাৰ চাই না । আমাৰে আৰ খায়নের কতা কইচ না । বংশের কলক আমি ।

তুমি না বাঁচলে আমরা দাড়ামু কুখায় ?

ঘরে যা বাপ—ঘরে যা । চেষ্টা কইরা ছাথ, ভিটা খামাৰ রাখবাৰ পাৰচ কিনা ।

অশ্বিনী জবাব দেবাৰ আগে কুহুম কেটে পড়ে, ঘরে যাইবাৰ কও ঘৰ কি আৰ আছে । হাও না তারা কাইড়া নিচে ।

কি কইলা ! আমাকে ফাটকে পাঠাইয়াও তাগ শান্তি অইল না ! দুইডা দিনও তোমাগ সময় দিল না । বুজি, ই সবই ঐ বজ্জাত ঠাকুরের কাম । খাল কাইটা আমিই কুমইৰ (কুমীর) আনচিলাম চরে । হগলেই মাৰব শয়তান । একবাৰ যদি ছাড়া পাইতাম—চরে যদি একবাৰ যাইবাৰ পাৰতাম—চোথ মুখ রক্তবর্ণ করে গজরাতে থাকে দীহু ।

চেচামেচি শুনে ওয়ার্ড ইনচার্জ দৌড়ে আসেন । ধমক দেবাৰ আগেই দেখেন, মুখ বন্ধ হাখে গেছে রুগীৰ । কুহুম অশ্বিনী ডুকরে ওঠে । ওয়ার্ড ইনচার্জ নাড়ী পরীক্ষা করে বোম্বেন, দীহু আবাৰ মুছা গেছে । তাড়াতাড়ি ওয়ুধের ব্যবস্থায় ছুটে যান । সংবাদ পেয়ে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবও হাজির হন । কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসাৰ আগেই কুহুম অশ্বিনীকে চলে আসতে হয় । কুহুম কান্নাকাটি করেও টিকতে পারে না । চোখের জল মুছতে মুছতেই বেরিয়ে আসে ।

পরদিন সকালে অশ্বিনী খোঁজ নিতে গিয়ে আনে, শেষ রাত্রে মাৰা গেছে

দীহু। সমস্ত দিনই অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। জ্ঞান যতক্ষণ থেকেছে, খুন করুম—খুন করুম, চীৎকারে গগন ঝাটিয়েছে। জোর করে পথ্য দেবার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থার কেরে তা সম্ভবপর হয়নি। নিজের জেদ বজায় রেখেই চোখ বুজেছে মোড়ল।

এত শীগগীর বাবা ওদের ছেড়ে যাবে এ কথা ভাবতেও পারে নি অশ্বিনী। সহসা মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কুসুমের কথা ভেবেই চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। বাবাকে তো হারালোই, মাকেও আর বাঁচাতে পারবে না। সঙ্গে আসার জগ্ন ছটকট করছিলেন। এখন গিয়ে কি সাধনা দেবো। কিন্তু এ তো আর চাপবার কথা নয়। নির্মম কর্তব্য রয়েছে সম্মুখে। পিতার শেষ কাজ করতেই হবে।... অশ্বিনী দাঁতে দাঁত চেপেই যথাকর্তব্য করে যায়। কুসুমকে নিয়ে ওর যা আশংকা ছিল, ঠিক তা হয় না। কেমন যেন থ মেরে যায় বেচারী। কাঁদতে গিয়ে কাঁদতে পারে না। অশ্বিনী একবার ভাবে, মার হলো কি! আবার ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, না না, কর্তব্য-কর্ম করতেই মা এখন ব্যস্ত। কান্নাকাটি করার তো যথেষ্টই সময় পাবে।...

সদর হাসপাতাল থেকে নোকোয় করে চরে নিয়ে আসে ওরা মোড়লকে। চরের এত বড় সুন্দরকে অল্প কোনখানে দাহ করা চলে না। সাবেকী বাড়ি ঘর দোর না থাকলেও চরে সামান্য একটু মাথা গুঁজবার ঠাই ওদের আছে। তা ছাড়া ধরতে গেলে গোটা চরই তো মোড়লের কর্মভূমি। ভিনদেশের পাকা শ্রমিকের চেয়ে দেশের পলিমাটি ঢের ভাল। বড় দাগা পেয়েছে মোড়ল। স্নিগ্ধ-শীতল তটভূমিতে মর্মজালা জুড়াবে।...

পরের দিন ভোরে শব বোকাই নোকো চরে এসে লাগে। কুসুম এবার কান্নায় ফেটে পড়ে। অশ্বিনীও ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। নিশি, পার্বতী, ময়না একে একে সকলেই এসে জড়ো হয়। বলতে গেলে চরের সকলেই মোড়লের আপনার জন। কান্নায় কান্নায় সমস্ত চর মুছে পড়ে। চরের প্রকৃত জনককেই আজ হারালো ওরা। এবার তো দিনে দুপুরেই শেষাল শকুনীর উৎপাত শুরু হবে। বৈরাগী ধালের মুখেই চিত্তা সাজানো হয়। আঘাতের বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। ধালও নতুন জলে টেট-টব্বর। আকাশ থমথমে। অশ্বিনী নিশির হাতের আঙুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোড়ল।

চরের সবল সুস্থ হেন জন নেই যে মোড়লের চিত্তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি—

কিংবা অশ্রু বিসর্জন করেনি। সবল হুহু তো দূরের কথা অনেক রুগ্ন জনও কাতরাতে কাতরাতে এসে মোড়লের উদ্দেশ্যে দু' ফোটা অশ্রু-অর্ঘ দিয়ে গেছে। আসেনি শুধু একজন। সে রামকান্ত। কেউ ওর কথা মুখেও আনে না। শয়তানকে সকলেই চিনেছে। বুড়ো-বুড়ীর মধ্যে জনকয়েক থুথুই ফেলে নচ্ছারের উদ্দেশ্যে। এমন বেইমানও মাছুষ হতে পারে। বাপের বয়সী মোড়ল, বাপের মতো স্নেহ মমতা দিয়ে বিপদে আলগে রেখেছিল। শুধু স্নেহ-মমতাই নয়, হাজার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গুরুজ্ঞানেই ওকে ভক্তি করেছে—সম্মান দিয়েছে। কিন্তু নিমকহারাম এত বড় কুতল যে, এমন মাছুষের শেষ সময়ও একবার পাশে এসে দাঁড়ালো না। ছি ছি ছি, ওই আন্ত পশুটাকেই ওরা এতকাল ভক্তি করেছে, ভাগবতের আসরে বসিয়েছে। যাক, ভালই হয়েছে। মোড়লের শেষ ক্লান্তির সময় যে পাষাণটা ধারে কাছে আসেনি এটা মঙ্গলেরই চিহ্ন। অস্তিম্ব সময়ে মোড়ল ওর কুৎসিত রূপটা ঠিকই ধরে ফেলেছিলেন। শুনেছি, খুন করবার জন্তে ক্ষেপেও উঠেছিলেন। সে উত্তেজনাতেই নাকি মোড়লের প্রাণ নাশ হয়েছে। পাষাণের মুখ দর্শনে পাপই হয়। ও না এসেছে ভালই হয়েছে।...

অন্তপর সকলে ছি ছি করে শাস্ত হলেও অশ্বিনী অতো সহজে হান্কা হতে পারে না। এর প্রতিশোধ ওর চাই। এ মৃত্যু নয়—রীতিমতো হত্যা। ঘড়ফর করে রমেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্তই মোড়লকে মেরে ফেলেছে। ওরা দু'জনেই ঘাতক। ঘাতকের শাস্তি—প্রাণদণ্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোড়লের প্রাণের বিনিময়ে ওদের দু'জনকেও প্রাণ বলি দিতে হবে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—তা যেখানেই থাক পাষাণের নিস্তার নেই। নিতাই সা-ও নিস্তার পায়নি, ওরাও পাবে না। এখন ঠিক বুঝতে পারছি, কেন ওসমানরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নিতাইকে খুন না করে কেন ওরা শাস্ত হতে পারছিল না? সে কি করে সম্ভব। পিতার প্রতি পুত্রের যে এ এক বিরাট কর্তব্য। এ কর্তব্য না করলে পিতৃতর্পণ কখনো সার্থক হবে না। স্বর্গেও তাঁর শাস্তি হবে না।...ভাবতে ভাবতে দু'চোখ রাঙা হয়ে ওঠে অশ্বিনীর। পারে তো একুপি হত্যাকারীর মুণ্ড দু'টো কেটে এনে মোড়লের চিতায় আহতি দেয়। কিন্তু না, এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। গুরু দশার সময় শরীরে হিংসা ঘেব রাখতে নেই। শ্রীক শাস্তি হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কত শক্তি ধরে নায়েব আর তার খোদ মনিব।...অশ্বিনী অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে।

দীর্ঘ মরে বাঁচে। কিন্তু করিমের সে-দিক থেকেও নিস্তার নেই। দীর্ঘর মতো ও-ও কোন খাণ্ডবস্ত্র মুখে দিতে পারছে না। লজ্জায়, অপमानে, হুংখে দু'চোখ বেয়ে অবিবত জল ঝরছে। এমন বজ্জাতও মাছুষ হয়! একবার যদি ছাড়া পাই, শয়তান দু'টোর গলা টিপে মেরে ফেলবো না।... কোন হানে গলাইবা মশয়রা? যম তোমাগ লগেই আছে। এইত, এই—এই ধইরা ফালাইছি। ক্যা, এহন চেঁচাও ক্যা শালারা? বজ্জাতি করবার সময়ে মোনে আছিল না? মব—মর শালারা...ক্ষিপ্ত করিম নিজের গলা নিজেই টিপে ধরে। চোখ মুখ কেমন যেন বীভৎস হয়ে ওঠে। দু' চোয়াল বেয়ে অবিরত গেঁজলা বেকতে থাকে। জেল-প্রহরী থ বনে যায়। আরে, মিঞায় কি ফেইপা গেলো নাকি। অমুন করচে ক্যান!...তাড়াতাড়ি চাৰি দিয়ে দরজা খুলে গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে দিতে যায়। করিম কোঁকের নাথায় নিজের গলা চেড়ে দু'হাত দিয়ে সজোবে প্রহরীর গলা টিপে ধরে। হাঁ করে কামড়াতে যায় ওর নাকে মুখে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তিব পর বেচারি কোন রকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে দরজা বন্ধ কবে দেয়। তিল মাত্র দেরি না করে ঘন ঘন হুইসল্ বাজাতে থাকে। সঙ্কেত শুনে আশপাশ থেকে আরো জনকয়েক প্রহরী এসে জড় হয়। সংবাদ পেয়ে স্পারিনটেনডেন্ট সাহেবও আসেন। করিম ভুলতামি কবছে বলেই সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন উনি। জেলখানার নিয়নমাত্মিক দিনকয়েক কঠোরতা অবলম্বন করতেও কাৰ্পণ্য করেন না। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হয় না। করিম এখন ষোর উন্নাদ। অনাহার অযত্নে দিন দিন কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠছে ও। কেউ কাছে গেলেই তেড়ে আসে। খেতে দিলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জেল ডাক্তার সর্বশেষ ওকে পাগলা গারদে পাঠাতেই মনস্থির করেন। আশ্চর্য, পাগলের ওবা নিজেই আজ পাগল। আর দয়াল চানের আসর বসবে না। তেল পড়া, জল পড়া নিতেও চরে আর কেউ কোনদিন আসবে না। চরের গুলীরা একে একে সকলেই ডুবছে।

॥ ৩২ ॥

আনন্দকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। রোজ বিকেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। গঞ্জের সরকারী ডাক্তারখানা থেকে দিনকয়েক ওষুধ এনে খেয়েছিল, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। লোকে বলে, কুইনাইনের বদলে অল্প তেতো থাকে মিকসচারে। শরীর দিন দিন জেঙে পড়ছে আনন্দর। নিয়ম করে দিন

কতক খাওয়া-দাওয়া করেও ফল কিছু হচ্ছে না দেখে এখন আর কোন বাহ্যবিচার করে না। আর ধাবেই বা কি? নিয়মিত ছুটি ছুন ভাতই তো জুটছে না। কপীর খাত্ত কোথা থেকে আসবে! না না, আনন্দর আর ভাল লাগে না। মরে মরবে, এ নিয়ে আর কিছু ভাববে নাও। চর তো বীরশূত্রাই হয়ে পড়েছে। ওরই বা বেঁচে থেকে লাভ কি? ভগবানের ইচ্ছে নয় চরের মানুষ খেয়ে-পরে স্থখী হয়। এত পরিশ্রম করেও যখন দু'বেলা খাওয়া জুটছে না, তখন খেটে কোন লাভ নেই। রোগে ভাবনায় আনন্দ কাবু হয়ে পড়ে। ভাবনায় ভাবনায় দুর্গাও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। মোড়লের ঘরে মেয়ে দিয়ে ভেবেছিল, না জানি কত স্থখ হবে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পবিহাস যে স্থখ তো দূরের কথা এখন দিন চলাই ভার। বরাত যত মন্দই হোক, কুহুম বেয়ান ভাগ্যবতী। কোন যন্ত্রণাই ভোগ করলেন না। স্বামীর সঙ্গে সন্ধেই স্বর্গে গেলেন সতীলক্ষ্মী। আমি হতভাগী—মহাপাপী। যমও আমাকে চোখে দেখছে না। জানি না, বিধাতার মনে আরো কি আছে। রামকান্ত তো দম ধরে আছে। শয়তান, চরকে জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। কি কুক্ষণেই না হতচ্ছাড়ার কাছে হাত পেতেছি। এখন তো আর ওর সহস্রকে ভিন্ন মত পোষণ করার কোন তাৎপর্ষই নেই। চরহৃদ্য মানুষ ওর বঙ্কান্তি ধরে ফেলেছে। আমাকে নিয়ে হয়তো ভীষণতরই একটা মতলব আঁটছে। কিন্তু উপায় কি? মেয়েটাকে একা ফেলে যাই-ই বা কোথায়?... ঠাকুর শয়ান দিয়ে দাওয়ার ওপর বসে একাকী ভাবছিল দুর্গা। দিগন্ত জুড়ে খাঁ খাঁ করছে খন অঙ্কার। জন-মহুগ্নের সাড়াশব্দ নেই। দিন দুপুরেও এখন আর চরে কোনরকম হইচই শোনা যায় না। প্রাণচঞ্চল মানুষগুলো ঘেন প্রাণ হারিয়ে মরে আছে। কার্তিক মাস, পাল-পার্বণ নাম-গানে যে চর সন্ধ্যা-সর্বদা মুখরিত থাকতো সে চর আজ নিশ্চাপ, নিশ্চভ। ফকির সাহেবের মতো গুণী মানুষ কিনা শেষটায় পাগল হয়ে গেলেন! আর তা না হয়েই বা উপায় কি। শয়তানরা তো মিছিমিছাই জ্বালাতন শুরু করলে। মানুষ কত আর সহ্য করতে পারে। তা বেশ আছেন ফকির সাহেব। সব ভুলে আছেন। আমাকে যদি পাগলও করতেন তগবান!.....না না, পাগল হয়ে আমার চলবে না। শয়তানরা আমার ময়না নিশির পেছু নেবে! ওদেরও হয়তো গলা টিপে মারবে। পাগল হবার আগে ওদের দুটিকে নিশ্চিন্ত করতে হবে। আনন্দ তো বলছে, খুন করবে রামকান্তকে। সেই ভাল, খুনই করুক শয়তানকে

ঘরের শব্দে বিভীষণ। ও-ই সব কিছু জ্বালাবে। ওকে শেষ করতে পারলেই চর নিশ্চিন্ত। আমার ময়না নিশিও স্নেহে ধর করতে পারবে।...উত্তেজনার দুর্গার সমস্ত শরীর রোমাঙ্কিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ একা আছে। যদি এসেই পড়ে শয়তানদের কেউ? রামকান্তকে তো আর চিনতে বাকী নেই। বল্লমটা হাতের কাছে থাকাই ভাল। মরতে হলে, মেরেই মরবো।...গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল দুর্গা, সদরে ক্যান্ডর গলা শোনা যায়, বউ আচচ নাকিল, অ বউ.....

ক্যান্ডর গলা শুনে কতকটা নিশ্চিন্ত হয় দুর্গা। যাক, হুঁদুও বসে কথাবার্তা বলা যাবে। চর তো এখন শ্মশান। ক্যান্ডটা আর যাই হোক মিস্তকে আছে। আচার-ব্যবহারও আজকাল মন্দ করছে না। আগেকার আচরণের জন্ত নিজেই গায়ে পড়ে খেদ করেছে। আব যাই হোক ওকে দেখে বুক বল পাওয়া যায়। ডাক-হাঁক করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। রামকান্তের আদিখ্যেতা তো ও-ই বেশী করে করছে।...দুর্গা খোলা মনেই উত্তর করে, আচি দিদি, আহ। একা একা বালো লাগছিল না। ঘরে যাইবার নৈচিলাম।

অভ্যর্থনা পেয়ে ক্যান্ডও গদগদ হয়ে ওঠে, আর কচ্ ক্যান বইন। চবে এহন দিনে দুপইরে চলতে বয় (ভয়) করে।

হ দিদি, যা কইচ, গাটে (ঘাটে) পথে বাইরইতেও বুক কাঁপে এহন।

কইলাম ত তরে চম্পর ওহানে একবার ন (চল)। তুই ত আমার কতা কানেই গাচ না। ই মুহুকে হার মত গুণী কেউ নাই। এই যে এই গাচের শিকর টুকুন পইড়া দিচে, ইয়ার জ্বারেই না রাইত বিরাইত চইলা ধাই। নইলে কি আর রক্ষা আছিল! কবে না ঘাড় মটকাইত! চম্প কয়, বড় জবর একজন আচে ই চরে, বলতে বলতে লাল হুতো দিয়ে বাঁধা বাঁ হাতের মাছলিটা দুর্গাকে দেখায় ক্যান্ড।

ক্যান্ডর যুক্তিতে দুর্গা আগে কোনদিন সাড়া দিতে না পারলেও আজ আর কেন যেন প্রতিবাদ করতে পারে না।

ওকে নিরুত্তর দেখে ক্যান্ড পুনরায় আরম্ভ করে, তরা ত এতকাল করিম ককিররে লইয়াই নাচানাচি করলি, কিন্তু কি অইল এহন? হার ঘাড়ও ত মটকাইল। বলি, দেও দস্তির দিষ্ট, ও সব গান-বাজনার কুলাইব না। বৈরাগী মোড়লও হার পাচার পাচায় খাইকাই মরল। একবার যদি

চম্পরে দিয়া একটা কিরা করাইত তবে কি আর ই দশা অইত ? কোতায় পলাইত কুমার বাহাডর আর কোতায় পলাইত নিতাই সা। কপাল—কপাল, সবই কপালে করায়, কথা শেষ করে ক্যাস্ত নিজের কপালে করাঘাত করে।

হুর্গা এবার আর চূপ করে থাকতে পারে না। খোলাখুলিই উত্তর করে, হ দিদি, তোমার কতাই ঠিক। কপাল না অইলে কি আর পলান ব্যাপারীর মতন মাইনষের ওরকম অয় ! পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান পোলা, একটাও চরে রইল না।

তবেই বোঝ, তামসাডা কি ! তরে কই বউ, এহনও সময় আছে, ম্যায়া জামাইয়ের মোঙ্গল যদি চাচ্ তয় চম্পর কাচে একবার ন। আনন্দর হালডাও ত দেখবার নৈচচ, অস্থক কল্পে কি আর অধেদে কাম অইত না। অর উপুরেও তেনার নজর পড়চে। মোঙ্গল চাচ্ ত.....

ক্যাস্ত মুখের কথা শেষ করতে পারে না। হুর্গা কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেয়, হ দিদি, তাই যামু। এহন কবে যাইবা তাই কও।

আর দেরি কইরা কাম কি ? সামনের অমাবস্তাতেই ন না ? ঐ দিনেই চম্পর লগে তেনার মোকাবিলা অয়।

তবে তাই নও। কিন্তু আনন্দ জানবার পারলে ত যাইবার দিবার চাইব না। ও ওসব ভূত-পেতনী বিশ্বাস করে না।

অরে তর কইয়া কাম কি ? চম্প হুপূর রাইতে পূজায় বহে। আমরা হার কিছুডা আগে বাইরমু।

অত রাইতে একা একা যামু !

একা যামু ক্যান ! মোল্লার চরের জলধর মাজিও হার ম্যায়া বউ লইয়া যাইব। হারে কমুনে, আমাগ য্যান লইয়া যায়।

তয় ত (তা'হলে) কোন কতাই নাই। ঠালের মুকে (মুখে) নাও (নৌশে) রাখলেই ইটুকুন পথ আমরা হাঁইট। যাইবার পারকম। আনন্দ ত বিচানায় পড়ে কি মরে।

তয় ত আর বাবনার (ভাবনার) কিছু নাই। এই কতাই রইল, আমি এহন উঠি। একা একা আর বাইরে থাকিচনা। পাড়া ত ইয়ার মদেই নিজরুম অইয়া পড়ল।

হেই কতাজাই আমারে কও। ঐ শত্বুরে লইয়াই অইচে আমার

লা। অর পরানে বয় (ভয়) ডর বইলা কিছু নাই।—আনন্দর উদ্দেশ্যে
ববক্তি প্রকাশ করে দুর্গা।

ক্ষ্যাস্ত সান্ধনা দেয়, কি আর করবি, তেনার নজর পড়চে বইলাই অরে
অমুন বাড়াবাড়িতে ধরচে। পূজা দিলেই মতিগতি বালো আইব। ওঠ
এহন, আর বাইরে থাকিচ না, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় ক্ষ্যাস্ত।

দুর্গার গাটা সত্যি আজ কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। চরে আছে
অনেক দিন। কিন্তু এরকম ভয় ওর কোনদিন করেনি। ক্ষ্যাস্ত উঠোনের
ওপব থাকতে থাকতেই ঘবেব দরজা বন্ধ কবে দেয়।

॥ ৩৩ ॥

কার্তিক মাস। জলে টান ধবেছে। বাতাসে শেওলা পচা দুর্গন্ধ। হাঁটা
পথে খালের মুখে যেতে হলে কাঁদা জল ভেঙেই তা যেতে হবে। ক্ষ্যাস্ত দুর্গা
তাই ধাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষ্যাস্ত খড়ের গাদার পেছনে এসে অপেক্ষা করবে।
আনন্দ ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি উঠে যাবে দুর্গা। তারপর দু'জনে মিলে
একসঙ্গে যাবে খালের মুখে। সেখান থেকে চম্পর ওখানে। সমস্ত ব্যবস্থাই
পাকাপাকি আছে।

সারাদিন উপোস দিয়ে আছে দুর্গা। এতে ওর কোন ক্লান্তি নেই। একদিন
কেন, সংসারের আপদ তাড়াতে যদি আমরণও ওকে উপোস দিতে হয় তাহলেও
ও তা নিয়ে ভাববে না। ওর ভাবনা শুধু, ময়না নিশির কল্যাণ হবে কিনা—
আনন্দর জ্বর ছাড়বে কিনা। চম্পব দয়ায় পোড়া সংসারের শ্রী কিরে আসবে
কিনা...

অধিকাংশ দিনই আনন্দ সন্ধ্যা রাত্রে ধেয়ে-ধেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জ্বর গায়ে
কোথাও বেরায় না। কিন্তু যেদিন জ্বর না আসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মাছ
ধবতে আর নয়তো তাস-পাশার আড্ডা দিতে যাবেই। একবার বেরুলে,
কিরবে আবার সেই দুপুর রাত্রে। দুর্গা এ নিয়ে অনেক বকেবকে দেখেছে,
কিন্তু কল কিছু হয় নি। দিন দিন কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছে আনন্দ।
তাছাড়া পুরুষ মাছধ, দিনরাত ঘরেই বা আবদ্ধ থাকে কি করে! ইদানীং
অনেকটা টিলই দিয়েছে দুর্গা। কিন্তু আজকের ভাবনা যে বড় ভাবনা।
আজ আনন্দ ঘরে না গেলে ও বেরবে কেমন করে? যাক, ভগবান ওর মুখ
রেখেছেন। আনন্দ ধেয়ে-ধেয়ে অশ্রুদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই ধরে

গিয়েছে আজ। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে অসাড়ে। দুর্গা অন্তরে বল পায়।
লক্ষণ তো সব দিক দিয়ে শুভই মনে হচ্ছে। এখন জানেন মা কালী।

রাত আত্মমানিক এগারোটা। গগন জুড়ে বিষাদ-বন অমাবস্তার গাচ
অন্ধকার। চর নিস্তর। হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। কোন জন-মানুষের সাড়া
শব্দ নেই। ব্যাঙ-পোকা-মাকড়ের একটানা কলকণ্ঠে প্রহরে প্রহরে ভয়াল হয়ে
উঠছে অমাবস্তার রজনী। দুর্গা অন্ধকার ঘরে একা জেগে বসে আছে। সারাদিন
এলোমেলাে ভাবনার মধ্যে কেটেছে। সত্যিই কি চম্পর ঝাড়ফুঁকে সমস্ত
বিপদ কাটবে? ভাগ্যের লিখন মানুষ খণ্ডাবে কি দিয়ে? বিধাতা তো
জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কপালে ভাগ্যকল লিখে দেন। জীবনব্যাপী মানুষ তো
সেই পাশার ছকেই ঘোরে। তবে?...না না না, আর সংশয় নয়। ক্যাস্ট্র
বলেছে, চম্পর দয়ায় অনেকে অনেক ফল পেয়েছে। ভাগ্যই ওকে পথ
দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। আর ভাবনার কিছু নেই। চম্পর কাছেই
যাবে ও। দশজনের যদি শাস্তি হয়ে থাকে তবে ওর-ও হবে। কিন্তু ক্যাস্ট্র
এখনো আসছে না কেন? রাত তো গভীরই হলো। এই বেলা বেরিয়ে
পড়লে নিশ্চিন্তে কেরা যেতো। আনন্দর ঘুম ভাঙবে আর সেই ভোর রাত্রে।
ভাবনায় ভাবনায় অশান্তি বোধ করে দুর্গা।

ক্যাস্ট্র নির্দিষ্ট সময়েই খড়ের গাদার পাশে এসে হাজির হয়েছে। অনেকক্ষণ
অপেক্ষাও করেছে। কিন্তু দুর্গার কোন সাড়া শব্দ পায় নি। আন্তে আন্তে পা
টিপে টিপে তাই পূব দিকের জানালায় এসে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকে,
বউ, ওঠ, সময় অইচে। অ-বউ...

হঠাৎ জানালায় শব্দ হতে বৃকের ভেতরটা হ্যাং করে ওঠে দুর্গার। মই
চোখ মেলে তাকাতে পারে না।

ক্যাস্ট্র পুনরায় তাড়া দেয়, কইল, উইঠা আয়! নাও যে অনেকক্ষণ
ধইরা ভিড়া রইচে।

এবার আর দুর্গার কোনরকম সংশয় থাকে না। চোখ মেলে তাকিয়ে
কিসকিস করে বাধা দেয়, চূপ, আন্তে কতা কও, আনন্দ জাইগা যাইব।

আইছা, তুই তড়াতিড়ি আয়। আর দেয়ি করিচ না।

দুর্গা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘরে তালাচাবি দিয়ে তাড়াতিড়ি বেরিয়ে পড়ে
আনন্দ এতক্ষণ সত্যি সত্যি ঘুমিয়েই ছিল, কিন্তু খানিক আগে জেগেছে
বড় অশান্তি বোধ করছে। বাম দিগে জয় ছাড়তে শুরু হয়েছে। গাণ্

কোথায় অসম্ভব জ্ঞান। কিছুতেই বিছানায় থাকা যাচ্ছে না। গা থেকে কাঁথা
 কখন ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। হিমেল হাওয়ায় বেশ লাগে।
 বেশ স্বস্থই বোধ করছে এখন ও। কিন্তু হুঁচোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। পর
 পর তিন ছিলাম তামাক টেনে চূপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকে।
 কিন্তু না, ঘুম আর আসছেই না। বায়ু চড়ে গিয়েছে। গরমই বোধ
 হয়। উঠে গিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়। ওকি, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে
 এত রাতে দিদি যাচ্ছে কোথায়! হ্যাঁ হ্যাঁ, দিদিই তো! তবে না একা একা
 বাড়ির ভেতরে থাকতেও রাতে ওর ভয় করে। আর এখন? এখন যে দিদি
 মুক্কা একা বাড়ির বার হয়ে চলেছেন! তবে কি...না না, একি ভাবছি আমি।
 দিদির অবিশ্বাস! জীবনে যাকে এতটুকু নিষ্ঠা হারাতে দেখিনি তার সম্বন্ধে
 পাপ চিন্তা করছি। ওকি, সন্ধে ওটা আবার কে জুটল। ক্ষেপ্তি ছিনালটা না।
 হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো ক্ষেপ্তিই। ঐ তো সেই বাঁকা বাঁকা করে পা ফেলে চলেছে।
 তবে কি দিদি পাকেই ডুবছে!...আনন্দ আর স্থির থাকতে পারে না।
 মাথার রক্ত ঝংকার দিয়ে ওঠে। চুপি চুপি নিজেও খিল খলে বেরিয়ে পড়ে।
 বিপদের সঙ্গী লাঠিগাছা হাতে নিতে ভুল করে না। ভাবে, দিদি যদি সত্যি
 সত্যি পাপের পথেই পা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে সকলের আগে ওর মাথাটাই
 চোঁচির করে দেবে। বংশের কলঙ্কে আর জীবিত রাখবে না। দূরত্ব
 বজায় রেখে পেছ পেছই চলতে থাকে আনন্দ।

এক হাঁটু কাঁদা জল ভেঙে প্রায় খালের মুখে এসে পড়ে দুর্গা ক্যান্ড।
 ঠাক ঘুরেই নৌকায় গিয়ে উঠবে। না, ভাগ্য আজ সবদিক দিয়েই স্তম্ভসন্ন।
 এতটা পথ এল কোন চেনাঙ্গনো লোকের মুখোমুখি হতে হয়নি। মা হয়তো
 দত্তি আজ মুখ তুলে চাইছেন। এখন ভালয় ভালয় পূজা দিয়ে কিরতে
 গারলেই নিশ্চিন্ত।...দুর্গা বুকের বল নিয়েই পায়ের পর পা ফেলে এগুতে
 থাকে। ক্যান্ডও এগোয়। তবে পাশাপাশি নয়—পেছ পেছ। বৃদ্ধা
 ঠালুঘ হয়তো তাল রাখতে পারছে না।...দুর্গার মনে কোন সংশয় নেই।
 ঠার কতটুকুই বা পথ। ঐ তো নৌকোর মাঙ্গল দেখা যাচ্ছে। যাক, সব
 ব্যবস্থাই তাহলে করে রেখেছে ক্যান্ডদি। পড়শীর ওপর সত্যি সত্যি তাহলে দরদ
 থাকে বোচারার।...তরতর করে খালের মুখে এসে বাঁক ঘোরে দুর্গা। কিন্তু
 মুক্কা। বাসী নৌকো কোথায়! এষে দেখছি গ্রীনবোট। তবে কি সবই
 জ্ঞান্টি। ছিনালটা গেলো কোথায়?...পেছন কিরে চাইতেই শিউরে ওঠে

দুর্গা। ওকি, কাদের সঙ্গে কথা বলছে ও। ওরা তো সকলেই পুরুষ মানুষ। হাতে লাঠি, বল্লম, গ্যাট্রা-গোঁট্রা চেহারা। কুমার বাহাতুরেরই চাই হবে... সারাদিন উপোস গিয়েছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে চায় দুর্গা। মানুষ এমনও হতে পারে। ঠাঁহুর দেবতার নামেও বঙ্কতি!...নিশ্চিত বিপদ বুঝে দুর্বল শরীরেও প্রাণপণে ছুটতে যায়। ভরসা, কোনরকমে যদি চরার খাদে পড়ে চেঁচাতে পারে। চরের মানুষ যদি জড় হয়ে রক্ষা করে।...ক্রতই ছুটতে যায় দুর্গা। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারে না। পেছনের খাদে জনকয়েক দুবৃত্ত লুকিয়েছিল, তেড়ে এসে হুঁদিক থেকে হুঁজন হাত চেপে ধরে। আ-ন-আনন্দ—শুধু একবারটি চেঁচাবার অবকাশ পায় ও। দুবৃত্তরা জোর করে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়— অগত্যা শুধু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়িই সার হয়।...

আনন্দ দূরে ছিল, চীৎকার শুনে লাফাতে লাফাতে এসে হুকার ছাড়ে। ক্যান্ড বেগতিক দেখে পালাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পারে না। আনন্দের শক্ত হাতের লাঠি সর্বপ্রথম ওর মাথার ওপরেই পড়ে। ফাঁপা পের্পের ডালের মতো এক লহমায় মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্যান্ড। মাথা কেটে চোঁচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাকশক্তি রহিত। কাটা পাঠার মতো শুধুই দাঁপাতে থাকে। ক্যান্ডকে ছেড়ে দ্বিতীয় লাঠি উঁচিয়ে ধরে আনন্দ আর একজন দুবৃত্তকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নিফল চেষ্টা। তীরবেগে একটা বল্লম এসে ওর তলপেট ভেদ করে। একবারে এপিঠ ওপিঠ। অল্প কেউ হলে হয়তো এতেই কাবু হয়ে পড়তো, কিন্তু আনন্দ দমে না। ওর আপন দিদির ইজ্জৎ নষ্ট করছে শয়তানরা। জীবিত থাকতে কখনো ও এ অপমান সহ্য করবে না। বাঁ-হাত দিয়ে তল পেট চেপে ধরে ডান হাতে আবার লাঠি চালাতে উত্তত হয়। আর্তস্বরে চেঁচাতে থাকে, বয় নাই দিদি, বয় নাই, আমি আইলাম, বয় নাই...।

নিফল চেষ্টা, আবার আর একটা বল্লম এসে পাজরা ভেদ করে আনন্দের। চরফুটনগরের সেরা লাঠিয়াল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। কাতরাতে কাতরাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। দুর্গা পেছন দিকের দেববারও স্ত্র্যোগ পায় না।

কালরাত্রির শেষ প্রহর। দুর্গা ছাড়া পেয়েছে। দেহ ওর ক্ষতবিক্ষত। দেবার্চনার পুষ্পে ফুকুরে মুখ দিয়েছে। এ পুষ্প দিয়ে আর দেব-পূজো হবে না। সারা গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। শয়তানগুলো যদি গলা টিপে মেরে ফেলতো ওকে। আরো কি চায় ওরা?...গ্রীনবোট থেকে কখন যে নেবে

এসেছে জানতেও পারেনি। জ্ঞান ফিরলে দেখে, বংশীর চরে একা পড়ে আছে। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে অমাবস্ফাব ভয়াবহ অন্ধকার। তমিষা রান্ধুসী ঘেন গিলে খেতে আসছে ওকে। বেশ তাই থাক। বেঁচে থেকে আর লাভ কি? দেহ ওর অপবিত্র হয়ে গেছে। আর কারো কাছে মমতা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ময়না নিশির কাছে তো নয়ই। একমাত্র মুতাই ওকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু কেমন করে পাবে ও সে শাস্তির কোল?...টলতে টলতে খালের মুখে এসে দাঁড়ায় দুর্গা। ওকি, মাঝ গাঙে ও বিশ্বাস-বউ না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো বিশ্বাস বউই। দাঁড়াও—দাঁড়াও বিশ্বাস-বউ, যেয়ো না তুমি, আমি আসছি। লোকে তোমাকে কলঙ্কিনী বলে বলুক, আমি জানি, কেন তুমি ডুব দিয়েছিলে। তুমি দাঁড়াও—দাঁড়াও...টলতে টলতে সহসা পথ খুঁজে পায় দুর্গা। খালের মুখে দিন দুই আগে নন্দ মণ্ডলকে পোড়ানো হয়েছে। নন্দর শিয়রের মাটির কলসীটা আজো অখণ্ড আছে। দুর্গা ছুটে গিয়ে কলসীটা হাতে নেয়। জল ফেলে দিয়ে নিজের আঁচল ছিঁড়ে গলার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে নামে খালের মাঝে। বিশ্বাস-বউ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

॥ ৩৪ ॥

চরফুটনগর দিন দিন শাসান হয়ে উঠছে। একদিন চরের সমৃদ্ধি দেখে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল চরে ঘর বাঁধতে। আজ আবার ভয়ে অনেকেই পালাতে শুরু করেছে। মানইজ্জৎ রেখে চরে বাস করা এখন আর সম্ভবপর নয়। মোড়লরা একে একে সকলেই তলিয়ে গেলো। এবার চুনো-পুঁটিদের পালা। চরের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি জমি-জায়গাই রমেশ্রনারায়ণ আর নিতাইয়ের দল কেড়ে নিয়েছে। মধুর ভিটে মাটিতে ঘুঘু চরছে। ধনেপ্রাণে মারলে শয়তানরা। এখন আবার নতুন বিলি ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে। ভিন গাঁয়ের লোকই আনাগোনা করছে এখন। চরের মানুষ ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে কাঠ। অশ্বিনী নিশি কোনরকমে নতুন জিটটুকু আগলে আছে। চাষ আবাদ নেই, করবে কি? থাকে, পরবেই বা কি? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোন কিছুতেই আর ঠৈ পাওয়া যায় না। নিশি তো ঠায় বসে আছে। পেটে ভাতে সামান্য একটা রাখালের কাজও জুটছে না চরে। আর রাখবেই বা কে? সকলের অবস্থাই তো সমান। হালে কেউ পানি পাচ্ছে না। অশ্বিনী গঞ্জের

মহাজন হরিনাথ সাহার ইটের ভাঁটায় কাজ নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে দৈনিক আট আনা মজুরী। নিশিও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হরিনাথ রাজী হয়নি। এত কম বয়সী ছোকরা খাটতে পারবে না।

মাত্র আট আনা পয়সা রোজগার। এ দিয়ে আর ছ'টা প্রাণীর পেট চলে কি করে? দৈনিক তিন চার সের চাল কিনতেই তো চার পাঁচ আনা ফুরিয়ে যায়। নিজেকে জ্ঞান কোনরকমে দুটি চাল ফুটিয়ে নিলেও কচি বাচ্চা দুটোর জন্মে ছিটে ফোঁটা দুধ না হলে নয়। একটা দুধেল গরুও যদি এ সময়ে সংসারে থাকতো। দ্বিতীয় ছেলে হবার পর পার্বতীর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ...চিন্তায় চিন্তায় দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখে অশ্বিনী। একবার ভাবে, সব বেচে দিয়ে অন্ন কোথাও চলে যায়। এখানে এখন মানুষকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। আবার ভাবে, যাবেই বা কোথায়? পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কোথাও ঠাই নেই। তাছাড়া, মা বাবার স্মৃতি বিজড়িত এই চর। এখনও খালটা বাবার স্মৃতি বহন করছে। অল্পপর বে পালায় পালাক, বৈরাগী আর ককির বংশের কেউ এ চর ছেড়ে যেতে পারে না। পারা উচিত নয়। যাদের উত্তর পুরুষ খালি হাতে সংগ্রাম করে চর গড়ে তুলেছে, তাদের বংশধররা ভয় পেয়ে চর ছেড়ে যাবে! লোকে তা হলে ভাবে কি? গায়ে মুখে থুথু দেবে না! বাবা ছিলেন একা। তবু তো আমার পেছনে নিশি রয়েছে। তবে কেন পালাবো। কেন শয়তানদের ভয় করবো?...উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে অশ্বিনী। পিতৃ-তর্পণ এখনো বাকী। রামকান্ত হয়তো ভয় পেয়েই চর আর গঞ্জ তেড়ে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রমেন্দ্র-নারায়ণের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারেনি লম্পট। কোথায় গিয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণ? সে শয়তান তো বহাল তবিয়েতেই চর আর কাছারি করছে। চরের বউ-ঝিরা হয়েছে এখন ওর লালসার টোপ। একবার যদি গুছিয়ে উঠতে পারি—নিশিটা যদি একটু কাজেকর্মে লাগতে পারে তাহলে একবার দেখে নেবো কত বড় বীর শয়তান। ...অনাহার অনিদ্রায়ও অশ্বিনীর বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। ইদানীং প্রায় প্রতিরাতেই বাবাকে স্বপ্ন দেখে। চরের জ্ঞান দিনরাত ভাবছে মোড়ল, স্বর্গে গিয়েও শাস্তি পাচ্ছে না। না না, চর ছেড়ে কোথাও যাবে না ওরা। না—না—না।

অশ্বিনী দীঘর মতোই সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। যা পাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে তা দিয়েই কোনরকমে কাটিয়ে দিচ্ছে। ধার দেনার ধারে কাছেও আর যাচ্ছে না। অবশ্য বেশী কিছু গাবার মতো ভরসাও নেই। স্বপ্নধোররা ওর মুখের

দিকে চেয়ে একটা কানাকড়িও হাতছাড়া করবে না। স্বপ্ন তো শুধু মাত্র ভিটেটুকু। এর বিনিময়ে কতই বা আর পাবে? না না, ও পাপ চিন্তা মনের কোণে ঠাই দেবে না ও। হাজার গুণ খাকা সত্ত্বেও বাবা একমাত্র এই ভুল করেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন। রাতারাতি বড় লোক হয়ে কাজ নেই ওর। হুন ভাত যা জোটে তাই খাবে। না জোটে না খেয়ে মরবে, তবু আর হৃদযোনের দোর গোড়ায় যাবে না।...

চিন্তের যত দৃঢ়তাই থাক—ঋণ করা বোধ হয় ওদের ভাগ্যের লিখন। এতদিন যাহোক করে চলেছিল কিন্তু কাল হলো রোগ বালাই। পার্বতী স্মৃতিকায় কাবু হয়ে পড়েছে। নগদ পয়সা ভিন্ন ভোলা কবরের ধারে কাছেও যাবার উপায় নেই। মাসখানেক হলো ভাঁটার কাজও বন্ধ হয়ে আছে। জল কাদা না শুকোলে নতুন ইট আর পোড়াবে না হরিনাথ। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। অশ্বিনী বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলে গঞ্জের রসিক ঘোষের কাছে গিয়েই হাজির হয়। বড় ভয় ছিল প্রাণে, কে জানে, সময় বুঝে রসিকও বেকে বসবে কিনা? কিন্তু না, বেশী গরজ না দেখালেও একরকম বিনা তোবামোদেই রসিক রাজী হয়ে যায়। লোক ইদানীং আর কর্জ করতে আসছে না। স্বদের হারটা তাই একটু কম। টাকা প্রতি মাসিক মাত্র এক আনা। ডঃখের মধ্যেও অশ্বিনী মনে মনে কিছুটা সাঙ্ঘনাই পায়। কোনরকম জামিনদার কিংবা বাড়ি ঘর দোর রেহানের কথাও মুখে আনে না রসিক। শুধুমাত্র তমসুক কাগজে সহী করিয়ে নিয়েই নগদ পঁচিশটে টাকা দিয়ে দেয়। টাকা হাতে নিয়ে সকাল সকালই বাড়ি ফিরে আসে অশ্বিনী। নিশিকে বলা তো দু'রের কথা—পার্বতীকে পর্যন্ত কোন কিছু বলে না। থাক না থাক ঋণকে ওরা সকলেই বড় ভয় করে। অশ্বিনীর নিজেরও বৃকের ভেতর কাঁপতে থাকে। কিন্তু উপায় কি?...

অত্যন্ত হিসেব করেই টাকা খরচ করে অশ্বিনী। যেটুকু না হলে নয় কেবলমাত্র সেটুকুই কেনা-কাটা করে। কিন্তু তাতেই বা পার-কুল কোথায়? মোটে তো পঁচিশটে টাকা। ওধু পথ্যে কাঁদিনেই ক্ষতুর হয় যায়। ভাঁটার কাজ কবে শুরু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া সামান্য ঐ আয়ে খাবে পরবে, না ঋণ শোধ করবে?...কোন দিকেই পথ নেই। এক হতে পারে যদি আমার কথায় রাজী হয়। নিশিকে অনেক দিন থেকেই তার

কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্ত তাগিদ দিচ্ছে হরিহর মামা। সোনাকান্দা চরের সেও ছিল একদিন শক্তিশালী লাঠিয়াল। আনন্দর চেয়ে নাম-ডাক কম ছিল না। চাষ-আবাদও ছিল কিছু। কিন্তু কি হলো? অর্ধেক গিললো রান্ধুসী পদ্মা বাকী অর্ধেক হৃদযোররা। তারপরের দিন কতক তো উল্লেখ্য ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। আজো সে কথা মনে পড়লে গা ঘিন ঘিন করে হরিহরের। হারু চৌধুরীর বেটা চন্দ্র চৌধুরী কাজে নিয়েছিল ওকে। আপ খোরাকী ত্রিশ টাকা মাইনেতে সর্দারীর কাজ। দিনকতক যেতে না যেতেই বেটা বলে কি রোজ রাতে একজন করে পরের বি-বউ ধরে এনে দিতে হবে ওকে। শালায় বলে প্রজাপালক—জমিদার! লাধি মারো শালার মুখে! সর্দারী করি বলে কি রে সামান্য ক'টা টাকার জন্ত ইহকাল পরকাল খোয়াবো! পরশ্বী মায়ের জাত নয়রে শালা? মববি শালা চৌত্রিশ কোটি নরকে পচে...রাগের মাথায় বাঁ করে একদিন কাজে ইস্তকা দিয়ে বসে হরিহর। খাবে কি, পারবে কি কিছুই ভাবে না। দিন গেলে অন্ততঃ পাঁচ সের চাল চাই সংসারে। কম করেও সব মিলিয়ে দশ বাবো গণ্ডা পয়সার দরকার। হরিহর ফ্যাসাদেই পড়ে।

না ভেবে-চিন্তে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল হরিহর—না ভেবে-চিন্তেই আবার চাকরি পায়। সেন বাড়ির বড়বাবু রাখাল সেন কি বছর পূজায় বাড়ি আসেন। সারা বছর একরকম বন্ধই থাকে সেন বাড়ি। একমাত্র পূজোর সময়েই যা সরগরম হয়ে ওঠে। মস্ত বড় পরিবার। ভাইদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় সরকারী চাকরে। জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারও কেউ কেউ। তবে সকলের চেয়ে রাখাল সেনের অবস্থাই ভাল। কোন চাকরি করে না রাখাল। গোটা দুই কোলিয়ারী আর চা-বাগানের মালিক। মস্ত বড় আপিস কোলাকাতায়। গ্রামের অনেকেই তার আপিসে কাজ করে। খুব নাম-ডাক। কি বছর এই একটি মাত্র উপলক্ষেই সেন বাড়ির সকলের সঙ্গে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যে যেখানেই থাক, পূজোর সময় সকলেই বাড়ি আসবে। খুব ঘটা করে পূজো হয়, নিজেদের পরিবারের মধ্যে থিয়েটার গান বাজনা চলে।

গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের কথা কানে যায় রাখালের। শুনে বড় কষ্ট পায় অন্তরে। জ্ঞানান মানুষ—আপদে বিপদে গ্রামের রক্ষক—দুটি ভাত পাচ্ছে না! পরদিন সকালেই হরিহরকে ডেকে পাঠাবে ভাবে, কিন্তু তার আর দরকার হয় না। হরিহর রাতেই ছুটে আসে বড়বাবুর চরণধূলি নিতে। এসেই আটকে পড়ে। পূজোর ষাটাষাটুনি দেখাশুনো সবই ওকে করতে হবে।...

পূজা মিটে যায় কিন্তু হরিহর আজো ছাড়া পায়নি। কোলকাতার সদর আপিসের দারোগ্যান সে। মাস মাইনে বাট টাকা। বিনা ভাড়ায় থাকারও সুবন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে স্ত্রীপুত্র নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু হরিহর তা থাকে না। একাই থাকে। ইচ্ছে হলে তিন চার বছর পর স্ত্রী সারদা এক-আধ মাসের জন্ম বেড়িয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে খুঁকছিল হরিহর আবার প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে পায়।

হরিহরের আপন মায়ের পেটের বোন কুসুম। সৌভাগ্য নিয়েই বৈরাগী বাড়ির বউ হয়ে সংসারে ঢুকেছিল। কিন্তু বরাত মন্দ তাই কপালে বেশীদিন সুখ সইলো না। যা হোক, একদিক দিয়ে ভাগ্যবতীই বলতে হবে কুসুমকে। বেশীদিন আর বৈধব্য ভোগ করলে না। কিন্তু পেটের দুটোর আজ একি হাল! করে-কস্মে দুটি ভাতও যে আজ খেতে পাচ্ছে না! নিশি, অখিনীর কথা জানতে পেরে মনে বড় দাগা পায় হরিহর। বড় ভাগ্যে অখিনীকে অনেকদিন থেকেই তাড়া দিচ্ছে নিশিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অখিনী মামার কথায় এতদিন কোন গা করেনি। ঐ তো একরত্তি নিশা, কখনো বাড়ির বাইরে যায়নি, ওকি কখনো একা একা বিদেশে বিড়ুইয়ে থাকতে পারবে? এতদিন তো নেহাত-ই ছেলে ছোকরা ছিল, দোঁড়ঝাঁপ করেই কেটেছে। এই তো সব মাত্র বয়সে গা দিয়েছে। মনের স্থখে ঘর-সংসার করবার কথা। তা যদি এই বয়সেই বিদেশে বিড়ুইয়ে থাকতে হয় তাহলে আর সুখ পাবে কবে? লোকেই বা বলবে কি? মা-বাবা নেই, ছোট ভাইটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বৈরাগীর বড় বেটা! না না, যা জোটে তাই খাবে, তবু ওকে বিদেশে পাঠানো চলবে না। মনের পোড়ানীতে ও তো মরবেই ময়নাও প্রাণে বাঁচবে না। কাজ নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে, অখিনী সাত-পাঁচ ভেবে এ ঘাবৎ উড়িয়ে দিয়েই এসেছে মামার প্রস্তাব। কিন্তু আজ? আজ তো আর শুধু ভাবরাজ্যে বিরাজ করলে চলছে না! কর্জের টাকা একটি একটি করে সবই উজাড় হয়ে গেলো। ভাঁটার কাজ কবে চালু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে থাকলে যে উপোস দিয়েই মরবে ও! বিদেশে গিয়ে তবু যদি প্রাণে বাঁচতে পারে। ময়নাকে নিয়ে গিয়ে যদি একটু স্থখের মুখ দেখতে পারে...মনের সঙ্গে অনেক টানা-পোড়নের পর মামাকে চিঠি দিতেই মনস্থির করে অখিনী।

স্নাতকের সকাল। দাওয়ার ওপর বসে রোদে পিঠ দিয়ে হুকো টানছিল অখিনী। নিশিও পাশে বসেই রোদ পোয়ানো। রহসা নাম ধরে ডাকতে

ডাকতে এসে অশ্বিনীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায় ডাকপিয়ন। সপ্তাহে মাত্র দুদিন ডাক বিলি হয় চরে। নয়তো আরো দিন দুই আগেই চিঠিখানা পেতো অশ্বিনী। আহুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে হরিহরই উত্তর দিয়েছে। তার আপিসেই বেয়ারার কাজ করবে নিশি। মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। বিনা খরচায় থাকার জায়গাও পাবে। খেতে পরতে আর ক'টাকা লাগবে, বড় জোর আট-দশ টাকা। নিঃসন্দেহে প্রতি মাসে বিশ বাইশ টাকা বাড়ি পাঠাতে পারবে।...খিতিয়ে খিতিয়ে চিঠিখানা পড়ে অশ্বিনী ভাবতে পারে না, হাসবে কি কাঁদবে। পরের গোলামী করতে যাবে নিশা। তাও আবার বিদেশে বিভূঁইয়ে! বড় ভাই হয়ে একটা ছোট ভাই আর তার একবর্তি একটা বউকে দু'দিনও বসিয়ে খাওয়াতে পারলো না ও।...বেশ স্বাভাবিকভাবে বসেই হুকো টানছিল অশ্বিনী, সহসা দু'চোখ চলছিলিয়ে ওঠে। বৃকের ভেতরে বসে কে যেন পাখর ভাঙতে থাকে।...

দাদার ভাবান্তর নিশিও লক্ষ্য করে। উতলা হয়েই শুধায়, কার চিঠি আইল দাদা? মামায় দিচে না?

অশ্বিনী মুখে কোন জবাব দিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানায়।

নিশি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিতে নিতে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, কি লেকচে হয়?

অশ্বিনী এবারও কোন জবাব দিতে পারে না। চিঠিখানা নিশির হাতে দিয়ে হুকোটা মাটিতে নামিয়ে রাখে।

চিঠি পড়তে পড়তে নিশির বৃকের ভিতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। তবে কি সত্যি সত্যিই ওকে বিদেশে যেতে হবে! মইনী বাঁচবে কি করে তাহলে!...হাসি হাসি মুখ এক নিমেষে ছাইয়ের মতো ক্যাকাশে হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী আন সছ করতে পারে না। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যায়।

নিশি পদমুহূর্তেই নিজকে সামলে নেয়। ক'দিন ধরে ও দেখে আসছে, দাদা বারমুখো হতে পারছে না। রসিক না করলেও গঞ্জের দোকানীরা তাগাদায় পর তাগাদা শুরু করেছে। হয়তো সামান্যই পাবে ওরা কিন্তু ঐ সামান্যই বা আসবে কোথেকে? রুজি-রোজগার যে কিছুই নেই। যত ছেলেমানুষই হোক—এটুকু বৃকে ওঠবার বয়স এখন ওর হয়েছে। অশ্বিনী উঠে দাঁড়াতেই নিশি গম্ভীরভাবে বলে, আমি কাঁইলই কলকাতায় যামু দাদা।

পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না অধিনী। শাস্তভাবেই উত্তর দেয়-
কাইল যাবি কি রে। দিন খ্যান ছাহন লাগব না ?

দিন খ্যানের আবার কি আচে, জাহাজ ত গঞ্জের খনে রোজই ছাড়ে।
আমি কাইলই যামু।

অত উতালা অইচ না। আমি ত গঞ্জই যাইবার নৈচি, একবার যামুনে
কুঞ্জ গণকের কাচে। নতুন কামে যাবি, দিন খ্যান না দেখলে অয় !

তবে আইজই যাইয়, মামায় ত লেকচে দেরি করন যাইব না। ছাষে
(শেষে) না আবার কাম খান চইলা যায়।

যাইব না রে যাইব না। তুই এহন খা গা, আমি আইজই যামুনে কুঞ্জ
কাচে, ধরা গলায় জবাব দিতে দিতে অধিনী বেরিয়ে যায়। নিশি পাথরের
মতোই চূপচাপ বসে থাকে।

॥ ৩৫ ॥

“মঙ্গলের উষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।”

খনার বচনকেই সার করে কুঞ্জ গণক। কেন না, খুঁটিয়ে দিন দেখতে গেলে
আট দশ দিনের আগে কোন ভাল দিন নেই। কিন্তু অতো দেরি সইবে না
অধিনীর। একে মামার তাড়া রয়েছে দ্বিতীয়তঃ ভাল সঙ্গী না পেলে কার সঙ্গে
পাঠাবে নিশিকে। একা একা ও কোলকাতা যেতে পারবে না। আসছে
বুধবারেই গঞ্জের পচু পোন্ধার মাল গন্ত করতে কোলকাতা যাচ্ছে। এই সবচেয়ে
ভাল সঙ্গী। সবদিক ভেবে-চিন্তে বুধবার ভোরেই যাত্রার দিন ধার্য হয়।

নিশি ওকে ছেড়ে কোলকাতা যাচ্ছে শুনে ময়না আর ময়নার মধ্যে নেই।
তিন দিন ভাল করে খায়নি, ঘুমোয়নি। রাজে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলিনি
নিশির সঙ্গে। বলে কি এরা! দুটো ভাতের জন্ত মাহুশ বিদেশি বিড়ুইয়ে
যাবে! সেন্নানে যদি কোন অহুখ-বিহুক করে। কে দেখবে তখন!...

এ ক’দিন দম ধরেই ছিল ময়না। আষাঢ়ের মেঘের মতো ধমধম করছিল
কচি মুখখানা। প্রকাশে তো দূরের কথা নিভৃত ঘরেও কান্নাকাটি করেনি। নিশি
কিছু বলতে গেলে মুখ ঝামটা দিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। অভিমানে জুলে উঠেছে-
পাপড়ি পাপড়ি ঠোট ছুটি। কিন্তু মঙ্গলবার রাজে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে

অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরতে থাকে ময়নার ছুঁচোখ দিয়ে। সারা রাতই প্রায় ফৌপাতে থাকে। নিশির নিজের বুকখানাও বেদনায় টনটন করে ওঠে। সাত্বনা দেবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পায় না। ওরই কি ভাল লাগছে বিদেশে যেতে? বলতে গেলে তো এ নির্বাসনই। মেঘদূতের যক্ষের মতোই গোটা বছর বিরহ যজ্ঞা ভোগ করতে হবে। কিন্তু উপায় কি? যেতে যে ওকে হবেই। ময়নাকে দাদা বৌদিকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্মই যেতে হবে।...রাত ভোব হয়ে আসে, ধরা গলায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে নিশি, পাগলি কোন হানকার, কান্দ ক্যান? আমি তো রোজগার করবার লেইগাই যাইবার নৈচি। দেখবা, তোমাগ লেইগা কত সোন্দর সোন্দর জামা কাপড় পাঠামু। কাইন্দ না, নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে ময়নার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যায় নিশি।

ময়না এতক্ষণ আপন মনেই ফৌপাচ্ছিল। ইন্ধন পেয়ে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে, চাই না আমি তোমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড়। তুমি ইহান খনে যাও যদি আমি গাচের মদেই ডুইবা মরুম।

পাগলি কোন হানকার, ওকতা মুকে আনতে নাই! আত্মহত্যা মহাপাতক, জিত কেটে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে নিশি।

হউক মহাপাতক, তুমি একলা একলা গেলে আমি ডুইবাই মরুম।

তবে আর কি করুম, তুমি যহন বারণ কর তহন না-ই গোলাম। এইহানে খাইকাই হগলে মিলা না খাইয়া মরি, পাণ্টা অভিমানের সন্ধেই জবাব দেয় নিশি।

ময়না দমে না। সমতা রেখেই পুনরায় যুক্তি দেখায়, মরবা ক্যানে? যেমুন খাইবার নৈচ তেমনই খাও পর না। কি কাম আমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড় পইরা?

গলার স্বর খাঙ্গে নামিয়ে নিশি বলে, যা খাই পরি, তা যদি জুটত তবে কি আর ইহান খনে তোমাগ ছাইড়া যাইবার চাইতাম? দাদার মুকের দিকে চাইয়া ছাহ না, দিন দিন মুকখান কেমন শুকাইয়া যাইবার নৈচে। চেলা মাছের মতন রাইত দিনই ত পাওনাদাররা মাছঘটারে ঠোকরাইবার নৈচে, বালো থাকব কেমন কইরা?

নিশির কথার জবাব দেবার মতো কোন যুক্তি ময়না খুঁজে পায় না। আবার নিজের মনকেও প্রবোধ দিতে পারে না। বরবর করে শুধু জলই গড়াতে থাকে ছুঁচোখ দিয়ে।

নিশির চোখেও শ্রাবণের ধারা নামে। ধানিকরণ চূপ করেই অপেক্ষা করে। অবশেষে ধরা গলায় নৈব্যক্তিতাবেই আরম্ভ করে নিশি, একটা বছর দেখতে দেখতে কাইটা যাইব। হার পরেই ত একমাস ছুটি পাম্, তুমি অমুন কইর না। ছাহ নাই বছর শ্রাঘে মামায় কত জিনিসপত্তর লইয়া বাড়ি আহে ?

আপন মনেই কাঁদছিল ময়না, নিশিব কথায় কাঁজিয়ে ওঠে, তুমি বারে বারে আমারে জিনিসপত্তরের নোব (লোভ) ছাহাইও না। আমি চাই না তোমাগ জিনিস।

আইছা আইছা, কোন জিনিসপত্তর না নিলা, পূজার পর মামীর লগে কলকাতায় যাইয়, অনেক তামসা দেইখা আইবাব পারবা। তোমার মনে নাই, হাবার মামী ঘূইরা আইহা কত গল্প কল্প ? আজব শহর কলকাতা। বৃতাম টিপলে বাতি জলে, মাখার উপুর বনবন্ কইবা পাখা ঘোরে, টেলিফুনে দূরের মাহুষ কানে কানে কতা কয়—তাঙ্কব ব্যাপার, একটু হান্কাভাবেই কথা শেষ করে নিশি।

কাঁদছিল ময়না। নিশির হান্কা কথায় অনেকটা হান্কা হয়ে যায়। কাঁ করে উত্তর করে, পূজার ত এহনো অনেক দেরি।

দূর বোকা কোন হানকার! তুমি এক্কেবারেই কিচু বুঝবার পার না। আগে আমি গিয়া বাসা ঠিক কল্পে ত যাইবা।

ময়না বুকেও যেন বোকে না। কথায় কথায় ভোর হয়ে আসে। কান্নার বেগ বেড়েই যায় ওর।

নিশি কোঁচার খুঁট দিয়ে ওর দুঁচোখ মুছিয়ে দিয়ে কাঁপের কাটি খুলে বেরুতে যায়।

ময়না তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। একটু পরেই তো যাত্রা করবে নিশি। দশজনের সামনে আর স্ত্রযোগ পাবে না।

বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে নিশির বুকের ভেতরটা। জলজরা চোখেই দু'হাত দিয়ে ময়নাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে মাখায়, পিঠে হাত বুগিয়ে দেয়।

কাক ডাকার আগেই বাড়ি ছেড়ে ভিজিতে গিয়ে ওঠে নিশি।

প্রায় এক বছর রাখালের অধীনে কাজ করে চলেছে নিশি। ও ছাড়া

আরো কয়েকজন আরদালি, চাপরাশি আপিসে কাজ করে। কিন্তু বয়সে ও-ই সকলের ছোট। রাখাল খুবই স্নেহ করে ওকে! খাসা গোল-গাল ছেলেটি, ভারি সুন্দর টানা টানা চোখ জোড়া।...রাখালের নির্দেশ, কোন শক্ত কাজে কিংবা বাইরের কোন ট্রাম-বাসের ঝামেলায় যেন ওকে কখনো পাঠানো না হয়। টেবিল পৌছা, দোয়াতে কালি দেওয়া, ফাই-সরমাজ শোনাই শুধু নিশির কাজ। প্রথম দিনকতক বাড়ির জন্ম মনটা ভীষণ পোড়াতো নিশির। কাজকর্ম তো দূরের কথা রহস্যময়ী কোলকাতার কোন কিছুই ভাল লাগতো না ওর। রোজ একখানা করে চিঠি দিয়েছে ময়নাকে। বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি। এক কথা লিখতে বসলে সহস্র কথা মনে আসে। সব কথা হয়তো গুছিয়ে লেখাই হয় না। তবু প্রতি পত্রের জবাব ময়নার নিকট থেকে না এলে বৃকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। অভিমানে জীবনে আর কখনো পত্র লিখবে না বলেও প্রতিজ্ঞা করে ফেলে! কিন্তু দম রাখতে পারে না। শহরে থেকে ওর পক্ষে রোজ পত্র লেখা সম্ভবপর হলেও ময়নার পক্ষে তা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। পাড়াগাঁয়ে রোজ ডাকপিয়ন আসে না। তাছাড়া রোজ রোজ অতো পয়সাই বা কোথায় পাবে বেচারী?

...রাগ হয়েছিল নিশির আবার গলে জল হয়ে যায়। আবার একটার পর একটা পত্র লিখে যায়।

...ইদানীং অবশ্য নিশি জোড়া পোষ্টকার্ডই লিখতে শুরু করেছে। খামে লিখলেও ভেতরে আর একখানা খাম দিয়ে দেয়। একবার তো পাঁচ টাকার একখানা নোটই খামের ভিতরে দিয়ে দেয়। রোজ সকলের খবরাখবর না পেলে বিদেশ বিভূঁইয়ে ও একা একা থাকে কি করে?...

হালে আর অতোটা উতলা হচ্ছে না। ময়নার জন্ম, দাদা বোর্দির জন্ম মনটা সময় সময় পোড়ালেও অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। এখন শুধু চেষ্টা করছে, কি করে দুটো পয়সা বেশী উপায় করতে পারে। খেটে খেটে দাদার যে হাড়-মাস কালি হরে যাচ্ছে। দুটো পয়সা বেশী পাঠাতে পারলেই বেচারী একটু দম নিতে পারবে!...বড়বাবুকে খুশী করতে দৌড়ের আগে কাজ করে নিশি। আশা, বছর ঘুরলে যদি ভাল বেতন বৃদ্ধি হয়।...

হরিহরের আড্ডায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই খোল বাজিয়ে কীর্তন হয়। আপিসের ছাড়ের ওপরেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। বেশ আরামেই আছে ওরা।

মামা ভাগনেতে। কীর্তনে অগ্রাঙ্ক আপিসের চাপরাশি, আরদালিরাও অনেকে এসে যোগ দেয়। বিদেশে মনের আনন্দ উছলে পড়ে রসিকদের। নিশিও সকলের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়। ট্রাম, রিক্সা, দোতলা বাসে চড়েও দেখে পর পর। গেলো রোববার গন্ধার ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছে দেশবিদেশের সমুদ্রের জাহাজ। কত সব কলকল্লা। যেন ভাসমান দুর্গই এক একটা। ধর্মতলার এক সিনেমা হাউসে একদিন ছবি দেখিয়েও এনেছে হরিহর। তাঙ্কব ব্যাপার। ছবিব মধ্যে মানুষ কথা কয়—হাসে, নাচে, গান গায়...শহর দেখে দেখে গায়ের ছোট্ট মানুষটি হতবাকই হয়। মায়াবিনীর মায়ায় দেশের কথা অনেকটা ভুলেও যায়। সময় সময় ময়নার জন্ম মনটা পোড়ালেও এখন আর প্রতিদিন ওর চিঠি না পেলে তেমন ভাবে না। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ছু'খানা রঙীন শাড়ী পাঠিয়ে দেয়, একখানা ময়নার আর একখানা পার্বতীর। অখিনীর জন্মও মোটা ধুতি একজোড়া দিয়েছে। প্রতিমাসে নিয়মিত মনি-অর্ডারও করে আসছে। কিন্তু সংসার তবু অচল। ইটেব ভাটা উঠে গিয়েছে। অখিনীর কাজ নেই। ওর এই সামান্য টাকা ক'টাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাতে কি আর চার পাঁচটা লোকের পেট ভরে? ছোট বাচ্চা দুটোর জন্ম কিছুটা দুখও চাই আবার। বৌদির শরীরটাও নাকি তেমন ভাল যাচ্ছে না। দাদা এই সব সাত পাঁচ চিন্তা করেই মামাকে নিজের চাকরির জন্ম লিখেছেন। বেচারার আর সুখ হলো না। তা মন্দ হয় না, মামা যদি ওকেও একটা চাকরি নিয়ে দিতে পারেন তাহলে সকলে মিলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। বৌদির সঙ্গে ময়নাও নিশ্চয় আসতে পারবে। কি হবে ছাই মিছিমিছি ভিটে আঁকড়ে থেকে? জমি-জমা সবই তো গিয়েছে, এখন শুধু ভিটেটুকু। তা পাড়া-প্রতিবেশীদের বললে তারা একটু লেপে-পুঁছে রাখবেই। দিনকতক এখানে এসে বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকলে শরীর সকলেরই ভাল হবে। মামাকে একবার বলেই দেখা যাক। বড়বাবুকে নিজেরও বললে পারি। এতবড় আপিস, আর একটা লোকের জায়গা হবেই। তার আগে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। শেষ পর্যন্ত দাদা দেশ ছাড়তে রাজী হবেন কিনা সেটাও ভাল করে জানা দরকার...

আর এক মাস কাজ করলেই পুরো এক বছর কাজ হবে নিশির। তারপর নিয়ম-মাসিক এক মাস ছুটি পাবে। ছ'মাস আগে থেকেই দিন গুণতে থাকে

নিশি। মাস মাস নিয়মিত কুড়ি টাকা করে বাড়িতে পাঠিয়েও বকশিশ ইত্যাদিতে মিলিয়ে হাতে পঞ্চাশ টাকা জমেছে। বাড়ি যাবার সময় সকলের জ্ঞান জামা কাপড়, জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে শহরের আজব খাবারও কিছু কিছু মুগের পাপর, শন-পাপড়ি আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের কেক-বিস্কুট তো নিতেই হ... বড়বাবু সেদিন একথানা কেক দিয়েছিলেন, কি চমৎকার খাবার! ময়না ধরতেই পারবে না, কি দিয়ে তৈরী। সুন্দর খোশবু আর সুস্বাদ। ওর খানকয়েক নিতেই হবে। এক বছর শহরে কাজ হলো, খালি পায়েই বা যাবো কেন? আপিসের চাপরাশটা একদিন পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো না, কত বড়ো আপিসে কাজ করছি! আমাদের গায়ের কে পরেছে এমন জমকালো পোষাক। জুতো এক জোড়া নতুনই কিনতে হবে। বড়বাবু তো বলেছিলেন দেবেন, হয়তো ভুলে গেছেন। তাক বুঝে মনে করিয়ে দিলেই হলো। না, জুতো আর গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না। মুকুতই পাওয়া যাবে।...নতুন একটা পেটরা কিনে ছ'মাস আগে থেকেই এক এক করে সব কিছু গুছিয়ে চলে নিশি। ময়নার জ্ঞান কাঁচের চুড়ি, সুবাসিনী তরল আলতা, সিঁদুর, হিমালী কিছুই বাদ যায়নি। পার্বতীর জ্ঞানও এসবের আর এক প্রস্তু। শুধু হিমালী কিনেছে এক কোঁটো। ওটা আর খোলাখুলি বার করা যাবে না। বোঁদি তো মাথবেনই না, উণ্টো লোক হাসাবেন। তার চেয়ে চুপি চুপি ময়নার গালে মাথিয়ে দেবো, সেই ভাল। হিমালী পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশী হবে ময়না। সাজ-গোজে তো ওর খুবই সখ।...

গত পরশু একবছর পূর্ণ হয়েছে। বড়বাবুর কাছে মৌখিক ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। কাশিম্বারবাবুকে ডেকে ছুটির মাসের মাইনে আগাম দেবার জ্ঞানও নির্দেশ দিয়েছেন উনি। জুতো এক জোড়াও না চাইতেই পাওয়া গেছে। নিশির আনন্দ ধরে না। পায়ে দিয়ে দু'দিন ছাদের ওপর হেঁটে দেখেছে। কাজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া চম্পল দিয়েছিলেন বড়বাবু। কিন্তু সে তেমন পছন্দসই নয়। পায়ে দিতে ইচ্ছেই হতো না। কেমন যেন বুদ্ধটে ধরনের। এবার বেশ রুচি-মাকিক জুতো পাওয়া গেছে। কি সুন্দর কাবুলি স্ত্রাণ্ডাল জোড়া! রঙের জের্নিসই বা কি। ভাল করে তাকালে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়।...অতি সাবধানে জুতো জোড়া পায়ে দেখ নিশি। একটু ধুলোবাগি লাগলে মাথা থেকে তেল নিয়ে ঘষে ফেলে। কেউ না দেখলে সরাসরি মাথার

ওপরেই ঘষে নেয়। দোষের মধ্যে পায় একটু লাগে। ও কিছু নয়, ক'দিন পরলেই সেরে যাবে। দোকানী তো কিনবার সময়েই বলে দিয়েছে। এ রকম জুতো চরফুটনগরের কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি। টুকিটাকি নিস অনেকই হয়েছে। কিন্তু জুতো জোড়াই নিশির সবচেয়ে পছন্দ। না, রাস্তাবাটের জলকাদায় পায় দিয়ে নষ্ট করা চলবে না। যেমন জোলুস আছে ঠিক তেমনটিই থাকা চাই। চাপরাশ আর জুতো একসঙ্গে পরে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এখন যাবার দিন অল্পম ফৌরশালা থেকে চুলটা কাটিয়ে নিলেই হলো। কাউকে আর দেখতে হবে না। অল্প পর দূরের কথা, ময়নাই দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে।...ছুটির দরখাস্তখানা দস্তবাবুকে দিয়ে লেখিয়ে টুলের ওপর বসে স্বপ্ন জাল বুনতে থাকে নিশি। এখন বেলা দুটো, বড়বাবু ব্যস্ত আছেন। আর একটু পরে ভিড় কমলেই দরখাস্তখানা পেশ করবে। ছুটি তো হয়েই আছে, শুধু নিয়মরক্ষা। কাল আর আপিস করা হবে না। যাবার আগে একবার মা কালীর ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে। কাল ভোরে উঠে প্রথমেই যেতে হবে সেলুনে। তারপর স্নান করে সোজা মায়ের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে এক ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাঁধা-ছাদা করে সন্ধ্যা লাগতেই আবার রাত্রে খাওয়া খেয়ে রওনা হওয়া। বাবুদের সকলের সঙ্গে আজই দেখা-সাক্ষাৎ সেরে রাখতে হবে। কাল আর সময় হবে না। কেনাকাটার আর কিছু বাকী থাকলো কিনা মনে মনে সে হিসেবই করছিল নিশি, এমন সময় ওর নামে জরুরী এক 'তার' আসে। 'তার'। শুনে তো বুক শুকিয়ে ওঠে নিশির। কি সংবাদ আছে! তাড়াতাড়ি সই করে নিয়ে দস্তবাবুর হাতে দেয়। দস্তবাবু পড়তে থাকেন :

“অয়ার রুপিস্ ফিক্টি, লেটার ফলোস্”.....

অধিনী।

স্বপ্ন দেখছিল নিশি...মুখড়ে পড়ে।

সংবাদটা হরিহরের কানেও পৌঁছায়। এক মাসের টাকা অগ্রিম নিয়ে বেতন বাবদ ষাট টাকা পেয়েছে নিশি! মামার পরামর্শ মতো টেলিগ্রাম মনি-অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকাই পাঠিয়ে দেয়। টেলিগ্রাম আর মনি-অর্ডার খরচা বাবদ আরো চার টাকা খরচ হয়ে যায়। হাতে থাকে মাত্র ছ'টাকা। দীর্ঘ দিনের জমানো পঞ্চাশ টাকা টুকিটাকি জিনিসের গেছেন অনেক আগেই খরচ হয়ে গেছে। ছ'টাকায় যে গাড়ি ভাড়ার খরচাও কুলোবে না। তা ছাড়া

দাদার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত রওনাই বা হবে কেমন করে।...দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে নিশির। বাবুরা জল চাইলে কালির বোতল নিয়ে হাজির হয়। বড়বাবু কলিং বেল টিপে টিপে ক্ষেপে ওঠেন। সময়মতো হাজির না হওয়ায় এক টাকা জরিমানা করেন উনি। চাকরি জীবনে এই ওর প্রথম অপরাধ।

আপিস কখন ছুটি হয়ে গেছে জাক্ষেপ নেই। হরিহরের তাড়ায় কোন রকমে হাতের কাজ শেষ করে ওপরে উঠে আসে। চাপরাশ খুলে রেখে হাতে মুখে জল দিয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে লাশদীঘির সবুজ ঘাসের ওপরে এসে বসে। সমস্ত দীঘিটাই যেন পাইপাই কবে ঘুরছে ওর চোখের ওপর। দাদা “তার” করেছেন, নিশ্চয় খুব বিপদ! মন্ননার কোন অস্থ করেনি তো? বোঁদিও তো অনেক দিন থেকে ভুগছেন! কে জানে, কি ঘটেছে! আর কিছু খরচ করে যদি টেলিগ্রামেই মোটামুটি খবরটা জানিয়ে দিতেন দাদা।...মনের উত্তাপে কোথাও ভাল লাগে না নিশির। দুশ্চিন্তা মাথায় করে আবার বাসায়ই ফিরে আসে। হরিহর কিঘেনটাঁদ বাবুর দারোয়ান চোবেজীর মজলিসে গেছে। কাণ্ডয়া শুরু হয়েছে, এ কদিন ওখানেই আসর বসবে। ঘরে আলো না জ্বলে বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকে নিশি। দু’দিন দু’রাত্রি চোখে ঘুম নেই। তৃতীয় দিনের দিন বিকেলের ডাকে আসে অস্থিনীর চিঠি। বেশ বড় বড় হরপে লেখা।

চরফুটনগর

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

কল্যাণবরেন্দ্র

তাই নিশি, সংসারের ঠেকায় দুই তিন কিস্তিতে রসিক ঘোষের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করিয়াছিলাম। স্ত্রুদে আসলে উহা নাকি মোট একশত টাকা হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয় মুখে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া তলায় তলায় এক তরফা ডিগ্রি করিয়া বাড়ি ঘর জ্রোক করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক ধোসামোদের পর হাতে পায়ে ধরিয়া খরচ বাবদ নগদ পনর টাকা দেওয়ায় এক মাসের সময় পাইয়াছি। পঞ্চাশ টাকা সাত দিনের মধ্যেই দিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। হাতে একটুও পয়সা নাই। সামনের হাটে চাউল কিনিতে হইবে। বিশেষ আর

কি। ভগবৎ রূপায় সকলেই আমরা শারীরিক কুশলে আছি। মামাকে প্রশ্নাম জানাইও ও তুমি আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীঅম্বিনীকুমার মণ্ডল বৈরাগী।

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে নিশির। পঞ্চাশ টাকা পাঠাতেই তো এক মাসের বেতন আগাম নেওয়া হয়ে গেছে। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোথেকে আসবে? তা ছাড়া এক্সুনি আরো দশ পাঁচ টাকা না পাঠালে সকলে মিলে উপোস করে মরবে। হায় কপাল, ঋণের পাপ কি আর জন্মেও ঘাড় থেকে নামবে না!...ছুটি নেবার আর গরজ থাকে না নিশির। দত্ত বাবুকে দিয়ে যে দরখাস্তপানা লেখিয়ে রেখেছিল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে চলে কুচিগুলো। দেখে দেখে হুঁচোখ জলে ভরে ওঠে নিশির। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আপিস আজ ছুটি। নয়তো এক্সুনি ও ছুটতো বড়বাবুর হাত-পা জড়িয়ে ধরতে। ছুটির মাস কাজ করলে আর এক মাসের মাইনে যদি বেশী দেন ওকে উনি।...মনের স্বপ্ন দিয়ে হুঁমাস ধরে যে জিনিসগুলো কিনেছিল, এক এক করে তার সবগুলোই পেটেরা খুলে বার করতে থাকে। এগুলো বেচেও যদি নগদ কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কে আর কিনছে গুচ্ছের টুকটাকি জিনিস। খুব চেষ্টা করলে হয়তো দু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায়। দোকানীরা তো শাঁকের করাত। যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে। তাতে আবার বেশীর ভাগ জিনিসই কেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা। হয়তো মাটির ধরেও কেউ নিতে চাইবে না।...হতাশায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে নিশির।

হরিহর আজো চোবেজীর মজলিসে গিয়েই জমেছে। হয়তো রাত্রে আর কিরবেই না। হোলি উৎসব—সারা রাতই গান-বাজনা চলার কথা। খানা-পিনাও ওখানেই করবে। নিশি একা বাসায়। ছোট ছোট দুটি কুঠরি। একটাতে রান্না খাওয়া হয় আর একটাতে মামা ভাগনে শোয়। জল-কলও ওপরেই আছে। ছাদের আলসেতে দাঁড়ালে স্বন্দর গন্ধ দেখা যায়। ঘরের ভেতরে আর ভাল লাগে না নিশির। মনের আবেগে বাইরে এসে দাঁড়ায়। আলসেতে ভর করে সোজা গন্ধার দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় বলমল করছে হিল্লোলিত গন্ধ। হুঁধারের কল-কারখানাগুলো সবই আজ বন্ধ। হোলির ছুটি